কমলা।

কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, ব্যবসা ও বিজ্ঞান-বিষয়ক
মাসিক পত্রিকা।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ।

প্রথম খণ্ড।

অগ্রহায়ণ ১৩১০—কার্ত্তিক ১৩১১

জি, সি, বসু এণ্ড কোং
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
বসু প্রেসে
৬৩ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম খণ্ডের সূচি।

চিত্র।

কমলা।

[সচিত্র]

কৃষি বাণিজ্য শিল্প ব্যবসা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বৃহদাকারের মাসিক পত্রিকা।

[ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ফর্ম্মার অন্যূন ৪৮ পৃষ্ঠা]

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা, এক সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা।

ইহাতে কি থাকিবে—নিরন্ন বাঙ্গালীর ঘরে অন্ন যোগাইবার জন্য, বেকার লোকের কাজকর্ম্ম জুটাইবার জন্য, আমাদের আশে পাশে ধনরত্ন কোথায় কিরূপ আছে তাহার অনুসন্ধান ও তাহা কিরূপে পাওয়া যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন জন্য, আমাদের নষ্ট শিল্পবাণিজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষিপ্রাণ ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য, জগতের চারিদিকে কৃষিশিল্পাদি বিষয়ে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার শিক্ষার জন্য, যাহার ধন আছে তাহার সদ্ব্যবহার ও বৃদ্ধির উপায় নির্দ্দেশ জন্য, কৃষীর কৃষি, শিল্পীর শিল্প, ব্যবসায়ীর ব্যবসায়, গৃহস্থের গৃহস্থালী যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার আলোচনার জন্য, এই পত্রিকার আবির্ভাব। এক কথায়, ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কৃষী, ব্যবসায়ী, শিল্পী সকলেই নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় ইহাতে পাইবেন এবং ইহা হইতে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ এবং ধনবৃদ্ধির উপায় করিতে পারিবেন। **কমলার প্রসাদে গৃহে গৃহে কমলা বিরাজ করিবেন।**

অভাব পূরণ—বাঙ্গালীর সাহিত্য ও ধর্ম্মবিষয়ক ভাল ভাল অনেকগুলি পত্রিকা আছে বটে কিন্তু যাহাতে বাঙ্গালীর সাংসারিক অভাব ঘুচে এবং ভাণ্ডার পূর্ণ হয় এরূপ পত্রিকার অভাব অনেকদিন [illegible] লোকে অনুভব করিতেছেন, কিন্তু সে অভাব পূরণ করিবার বিশেষ চেষ্টা এপর্য্যন্ত [illegible] মধ্যে কৃষি ও শিল্পাদি বিষয়ক পত্রিকা কয়েক খানি বাহির হইয়াছিল [illegible]

পূরণের জন্ত। এই পত্রিকার সৃষ্টি। [illegible] পত্রিকা [illegible] এবং পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সর্ব্বসাধারণে ইহাকে অনুগ্রহ দৃষ্টিতে দেখিবেন এরূপ আশা করা যায়।

চিত্র—কমলার লিখিত বিষয়গুলি বুঝাইবার জন্ত চিত্র দেওয়া যাইবে। হাফটোন, লাইন, লিথো, ক্রমোলিথো, ফটো, এনগ্রেভিং প্রভৃতি ব্লক আবশ্যক মত ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। দুষ্প্রাপ্য বা অপরিচিত গাছ গাছড়া, জীবজন্তু অথবা কারুকার্য্যাদির পরিচয় জন্ত রঞ্জিত চিত্র থাকিবে। এ দেশে চিত্রের আয়োজন বহু ব্যয়সাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উৎসাহ ভিন্ন এ বিষয়ে লোকের মনস্তুষ্ট করা অসম্ভব।

ইহা সকলেরই সুখপাঠ্য—কৃষি বাণিজ্য শিল্প বিজ্ঞানাদি বিষয়ক পত্রিকার পক্ষে একটা ব্যাঘাত এই যে, তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ও সুখপাঠ্য হয় না। কিন্তু এই পত্রিকা সরল ও সুললিত ভাষায় লিখিত হইবে এবং সে জন্য স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ, গৃহস্থ ব্যবসায়ী শিল্পী, সকলেরই সুখপাঠ্য হইবে। ভাল নবেল বা গল্প পড়িয়া পাঠক পাঠিকা যে আমোদ পান এই পত্রিকাতে তাহা পাইবেন, অথচ ব্যবহারিক ও সাংসারিক বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিবেন। নিজ নিজ বিদ্যা বা ব্যবসায়ের পারদর্শী সুলেখকগণকর্ত্তৃক এই পত্রিকা লিখিত ও পরিচালিত হইবে। ফলতঃ পত্রিকাখানি ব্যবহারিক বিষয়ক হইলেও সাহিত্য হিসাবে অন্য কোন পত্রিকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে না। এই পত্রিকার লিখন ও পরিচালনকল্পে যাঁহারা ব্রতী আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম দেওয়া অসম্ভব।

তাছাড়া শুধু নামেও কাগজ বিকায় না। নিজে চক্ষে দেখিয়া ভাল মন্দ বিবেচনা করুন। যাঁহারা নমুনা দেখিবার জন্য ২।১ সংখ্যা চান তাঁহাদিগকে প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি ।০ আনা পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্পে বা নগদ পাঠাইতে হইবে।

পত্রিকা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় নাম ধাম ও মূল্য পাঠাইবেন। বিজ্ঞাপনের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

জি, সি, বসু এণ্ড কোং,
৬৩নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর,
বসু প্রেশ, কলিকাতা।



৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন।



কমলা

অগ্রহায়ণ, ১৩১০]   [১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

সূচনা।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষসিংহকেই কমলা আশ্রয় করিয়া থাকেন, এই ঋষিবাক্যটি মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

জীবন একটা ধারাবাহিক সংগ্রাম মাত্র। পারিবারিক, সামাজিক এবং সার্ব্বভৌমিক শক্তি-নিচয়ের সহিত প্রত্যেক জীবনের অনন্ত সংগ্রাম চলিতেছে, আবার এই সকল শক্তি নিচয়ের মধ্যেও পরস্পরের অনন্ত সংগ্রাম চলিতেছে। যে প্রবল, সেই জয়ী। যে দুর্ব্বল, সেই অধঃপতিত—বিলুপ্ত। এই সংগ্রামের মধ্যে ভারতবাসী আমাদের—বাঙ্গালী, আমাদের—বাঙ্গালী আমার স্থান কোথায়? উঠিতেছি না পড়িতেছি, জগতে থাকিতে পাইব, না বিলুপ্ত হইব? এটা একবার সকলে হুঁস করিয়া দেখুন—দেখিয়া যথাকর্ত্তব্য কর্ম্ম করুন।

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ মানুষের লভ্য। তন্মধ্যে অর্থ আমাদের এই পত্রিকার প্রতিপাদ্য—আলোচ্য। অর্থলাভের উপায় কর্ম্ম। কর্ম্ম কখনও নিষ্ফল হয় না। এই কর্ম্মফল অনন্ত, অবিনশ্বর। এটা ধ্রুব সত্য। তবে কর্ম্ম সকল সময়ে আমাদের অভীষ্ট ফল দেয় না। সেটা আমরা দৈব বা অদৃষ্ট জন্য বলিয়া থাকি।

দৈব বা অদৃষ্ট আর কিছুই নহে—যে সমস্ত দৈবশক্তি বা প্রাকৃতিক [illegible] নিয়ম আমাদের দৃষ্ট নহে বা দৃষ্টির [illegible] জগতে এলোমেলো [illegible] কিছুই [illegible], সকলই [illegible] [illegible] নিয়মের। মানুষের জ্ঞানের অ-দৃষ্ট। জ্ঞানের প্রসার যত হইবে, অদৃষ্ট [illegible] আর অ-দৃষ্ট থাকিবে না—দৃষ্টিশক্তির আয়ত্ত আসিবে। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কাল যেটা অ-দৃষ্ট বলিতাম, আজ জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সেটা আর অদৃষ্ট নাই—আবার আরও জ্ঞানের বৃদ্ধি হউক, আজ যাহাকে অদৃষ্ট বলিতেছি, তাহা ভবিষ্যতে আর অদৃষ্ট থাকিবে না।

সুতরাং কর্ম্মের মূলে জ্ঞান চাই। জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম পণ্ড হইবে, অর্থাৎ অভীষ্ট ফল দিবে না। কর্ম্ম পণ্ড হইল দেখিয়া ভাবিও না যে কর্ম্ম নিষ্ফল হইল। কর্ম্ম কখনও নিষ্ফল হয় না। হয় তুমি ফলটি দেখিতে পাইবে না, নচেৎ দেখিবে হিতে বিপরীত ঘটিয়াছে; ফলটি তোমার বাঞ্ছিত হওয়া দূরে থাকুক, তুমি যাহা পরিবর্জ্জন করিতে চাও সেই ফলই উৎপন্ন হইয়াছে। মানুষের বুদ্ধির দোষে অথবা অক্ষমতার জন্য যে হিতে বিপরীত হয়, এটা বুঝাইতে কষ্ট পাইতে হইবে না, সকলেই দুবেলা দেখিতেছেন। এরূপ স্থলে আমরা অদৃষ্টেরই দোষ দিয়া থাকি, কিন্তু সেটা অজ্ঞানতার বা অক্ষমতার দোষ। অদৃষ্ট আর অজ্ঞানতা একই [illegible]; তাহার ধাতুগত অর্থ এক, [illegible] অর্থও এক।

জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ ব্যতীত সাধনার আর একটা অঙ্গ আছে—ভক্তি-যোগ। ভক্তি না থাকিলে তন্ময়ত্ব জন্মে না, তন্ময়ত্ব না [illegible] কর্ম্ম অঙ্গহীন হয়, সুতরাং বাঞ্ছিত ফললাভ অসম্ভব।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ যে [illegible]

প্রয়াস আবশ্যক নাই। আমরা কমলার উপাসনায় প্রবৃত্ত। **মা কৃপা করুন,** আবির্ভূতা হইয়া গরীব বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুন!

এই পত্রিকায় কি কি থাকিবে এবং কিরূপ ভাবে ইহা পরিচালিত হইবে, তাহা স্থানান্তরে বিজ্ঞাপন পত্রে বিবৃত হইয়াছে। ইহার কার্য্যক্ষেত্র বহু বিস্তৃত, এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ইহা অনেকগুলি কৃতকর্ম্মা ব্যক্তির সাহায্য লাভে সক্ষম হইয়াছে। ফলতঃ যাহাতে পত্রিকাখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং যথার্থ কাজের হয়, তজ্জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।

কিন্তু একবারে সকল কার্য্যে সাফল্য লাভ হয় না। আর কোন বিষয়ে সকল সম্প্রদায়ের লোকের মনস্তুষ্টি করা অসম্ভব। পাঠকগণ এই পত্রিকায় অনেক ত্রুটি দেখিতে পাইবেন; ইহা এখনও আমরা আমাদের সম্পূর্ণ মনোমত করিতে পারি নাই; ইহার উৎকর্ষ সাধন করিবার এখনও অনেক আছে। কিন্তু সে সমস্ত সময়সাপেক্ষ এবং অর্থসাপেক্ষ। সাময়িক পত্রের উন্নতি অবনতি সর্ব্বসাধারণের উৎসাহ এবং সহায়তার উপর নির্ভর করে, পাঠকগণ যদি এটি বুঝিয়া থাকেন এবং ইহার সাফল্য আন্তরিক কামনা করিয়া ইহার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করেন, তবে আশানুরূপ ফল না পাইবার কোনও কারণ নাই।

নানা প্রসঙ্গ।

কমলার ১৭ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি বিষয়ে যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রতি একটু মনোযোগ দান করিতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি।

* * *

অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু শিক্ষা বিভাগের উচ্চ গ্রেডে উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিশ্বব্যাপিনী-প্রতিভা-শালী বৈজ্ঞানিক এত দিন যে নীচে চাপা ছিলেন, ইহাই বিচিত্র।

* * *

বাবু নলিন বিহারী সরকার, সি, আই, ই এবার কলিকাতার সেরিফের পদে বরিত হইয়াছেন। ইনি কলিকাতার এক জন বিশিষ্ট সওদাগর এবং নানা সদ্গুণে অলঙ্কৃত, তাঁহার এই নিয়োগে আমরা বিশেষ আনন্দিত।

* * *

শ্রীযুক্ত এন, বি, ওয়াগলে একজন উদ্যমশীল মহারাষ্ট্রী যুবক। ইনি কাচ প্রস্তুত প্রণালী শিখিবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন রথায় সেখানে থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া দেশে সিয়াছেন। ইনি ছোটনাগপুর অঞ্চলে একটি কাচের কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। মূলধন এক লক্ষ টাকার আবশ্যক। শীঘ্রই তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কথা আছে।

* * *

আমাদের এ অঞ্চলে কাচের কারখানা স্থাপন করিবার উদ্যোগ দুই বার হইয়াছিল। প্রথম উদ্যোগ টিটেগড়ের পাইওনিওর গ্লাস মানুফাকচারিং কোং। কয়েক জন বাঙ্গালী গণ্যমান্য লোক মিলিত হইয়া এই কারখানাটি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কারখানায় যে সমস্ত জিনিস পত্র তৈয়ারী হইত, তাহা আমরা দেখিয়াছি, উহা বিলাতী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। এই কারখানা হইতে আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় অকালে কারখানাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন সমস্ত পড়িয়া আছে।

* * *

আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে কারীকরের অভাবই এই কারখানা বন্ধ হইবার একটা কারণ। শিশি বোতলাদি প্রস্তুত করিতে হইলে মুখ দিয়া নলের মধ্যে ফুঁ পাড়িতে হয়। অনভ্যস্ত লোকে এই ফুঁ দিতে পারে না। ইহাতে কায়িক পরিশ্রম বেশী; বিশেষ দমের-আবশ্যক। আমরা শুনিয়াছি কারখানার কর্ত্তৃপক্ষেরা কারীকর তৈয়ারী করিবার জন্য পয়সা দিয়া শিক্ষানবীশ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়, বাঙ্গালার মাটীর গুণ—বাঙ্গালী বাবুরা সে পরিশ্রমে রাজী নহেন।

* * *

বাঙ্গালী যুবকদিগের এখন কল কারখানার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে সিদ্ধকাম না হইয়া উদরান্নের জন্য লালায়িত, তাঁহাদের এই একটি দ্বার উন্মুক্ত আছে। যদি এক দল যুবক কিছুদিন শিক্ষানবীশী করিয়া এই কারখানায় কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কর্ত্তৃপক্ষগণ পুনরায় কারখানাটি খুলিতে পারেন। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদের নিকট অথবা কলিকাতা ১২ নং ফিয়ার্স লেন শ্রীযুক্ত বিহারী লাল পাইনের নিকট অনুসন্ধান করিতে পারেন।

* * *

এই কারখানার কর্ত্তাদেরও আমরা একটা অনুরোধ করি। শ্রীযুক্ত ওয়াগলে এখানে আসিতেছেন। তাঁহাদ্বারা সুবিধা হইতে পারে। অথবা তাঁহারা জাপানী কারীকর আনাইয়া একবার দেখিতে পারেন। জাপানী কারীকরেরা ইয়ুরোপীয় কারীকরের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। জাপানে ইয়ুরোপের ন্যায় বিস্তৃত কাচের কারখানা আছে, সেখানে অসংখ্য লোক কাজ করে। তাহারা কাচ ও কাচের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে বিশেষ পটু। বেতনও অপেক্ষাকৃত কম, আর উৎপাতও কম। ইয়ুরোপ অপেক্ষা জাপানের নিকট আমরা শিল্পাদি বিষয়ে অধিক সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করি।

* * *

দ্বিতীয় কারখানাটি সোদপুর ষ্টেশনে স্থাপিত হয়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ আর্ম্মাণ সওদাগর ডালগিয়াস কোং তাহার

উদ্যোগী। একটি জইন্ট ষ্টক কোং উঁহার মালিক, ... লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিস্তৃত বাড়ী ঘর কল কারখানা তৈয়ারী হইয়াছিল, এখন সমস্ত পড়িয়া আছে। শুনা যায়, এখানে যে কাচ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত ভঙ্গ-প্রবণ। উপাদানের দোষ, কি চুল্লীর দোষ, অথবা কারীকরের দোষ, তাহা বলিতে পারি না। কারখানাটি বিদেশী মূলধনে হইলেও চলিলে দেশের অনেক উপকার।

* * *

সম্প্রতি দুইজন বাঙ্গালী যুবক জাপান হইতে বৈষয়িক বিদ্যা শিখিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এক জনের নাম শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্র গুহ, অপরের নাম শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায়। দুই জনই উদ্যমশীল ও নিজ নিজ বিদ্যায় পারদর্শী। গুহ মহাশয় ইতিমধ্যেই একটি প্রশংসনীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। "বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরী" (The Bengal Soap Factory) নামে একটি সাবানের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, গুহ মহাশয় তাহাতে সংসৃষ্ট। কলিকাতার মাণিকতলায় এই কারখানাটি স্থাপিত। আসামের অন্তর্গত বগড়ী বাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ চৌধুরীর উদ্যোগে এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত। গুহ মহাশয় ছাড়া দুই জন ভাল জাপানী কারীকর আনান হইয়াছে।

* * *

আমরা এই কারখানায় প্রস্তুত সাবান দেখিয়াছি। তাহা বিলাতী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কম দামের ও বেশী দামের সকল রকম সাবান তৈয়ারী হইতেছে। দাম বিলাতী জিনিসের তুলনায় সস্তা। বাক্স মোড়ক প্রভৃতি সুন্দর। বাজারে বিলাতী জিনিসের পরিবর্ত্তে বেশ কাটিবে এরূপ আশা করিতে পারি। দেশের লোকের উৎসাহ দেওয়া উচিত।

* * *

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট বিহারের অন্তর্গত পুষা নামক স্থানে একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। বাড়ী ঘর প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় এক বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইতে পারে।

* * *

নামতা যেমন মানুষের আবশ্যক, আজ কাল রসায়ন শাস্ত্রও সেইরূপ মানুষের প্রয়োজনীয় হইতেছে। আমাদের কলেজ-সমূহে রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আজ কাল বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে যে অভিনব শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে—তাহাতে রসায়নের দুই একটা স্থূল কথা বালকেরা শিখিতে পারিবে বটে, কিন্তু পরীক্ষা সহ (Experiments) শিক্ষা না হইলে সে শিক্ষা মিথ্যা। রসায়নের সরল দৃষ্টান্তগুলি পরীক্ষা দ্বারা শিখাইতে পারিলে অল্প বয়সেই বালকেরা রসায়নের স্থূল কথা গুলি জানিতে পারে।

* * *

কৃষিকার্য্যে, মানুষের আহারে ঔষধে, নানাবিধ পণ্য দ্রব্য প্রস্তুতে সকল বিষয়েই রসায়ন ভিন্ন চলা অসম্ভব। রসায়নের জ্ঞান না থাকিলে কোন কার্য্যই এখন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। জর্ম্মণি রসায়ন শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়াই নানাবিধ পণ্য দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতেছেন—এবং জগতে অন্য সকল জাতিকে এই কৃষি বাণিজ্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় রসায়ন শাস্ত্র হাতে কলমে শিখাইবার জন্য আমাদের বিজ্ঞান সভা (Indian Association for the Cultivation of Science) একটি রসায়ন বিভাগ খুলিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সাধারণে তাহার প্রয়োজনীতা বুঝিতে পারেন নাই। উক্ত শ্রেণীতে ... বৎসর দুইটি মাত্র ছাত্র পাঠার্থী হইয়াছিল। এক বৎসর পাঠের পর দুইটিই সরিয়া পড়িয়াছে। ছাত্রাভাবে বিভাগটি উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

* * *

জীবন সংগ্রামের এই দুর্দ্দিনে এরূপ হওয়ায় আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সহস্র সহস্র ছাত্র প্রতি বৎসর বাহির হইতেছে, তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় কি? রসায়ন শিক্ষা করিলে লোকে স্বাধীন ভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিতে পারেন, যাঁহারা চাকরীর প্রার্থী, তাঁহাদের চাকরীর অনেক নূতন পথ হইতে পারে, এরূপ অবস্থায় আমরা আমাদের যুবকবৃন্দকে এবং তাঁহাদের অভিভাবকগণকে এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। অন্ততঃ এণ্ট্রান্স পাস না হইলে এই শ্রেণীতে ছাত্র লওয়া হয় না। দুই বৎসর শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। দুই বৎসর শিক্ষার পর লোকে একটা মানুষ হইতে পারে।

* * *

আমরা বিজ্ঞানসভার কর্ত্তৃপক্ষগণকেও অনুরোধ করি যে তাঁহারা তাঁহাদের এই শ্রেণীর উপকারিতা সাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে জীবন সংগ্রামের এই দুর্দ্দিনে ছাত্রের অভাব হইবে না। যাঁহারা এবিষয়ের নিয়মাবলী সবিস্তার জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিজ্ঞান সভার কর্ত্তৃপক্ষ গণের নিকট আবেদন করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

* * *

শুধু এই রসায়ন শ্রেণী নহে, আমরা দেখিতে পাই অন্য বৈষয়িক বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে আমাদের যুবকবৃন্দ সম্পূর্ণ উদাসীন; যেখানে ভবিষ্যতে চাকরীর সুবিধা, সেই খানেই আমাদে যুবকেরা দৌড়েন। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না, একটা বিদ্যা শিখিয়া রাখিলে চাকরী না জুটিলেও নিজে নিজে স্বাধীন ভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে তাঁহারা সক্ষম হইবেন।

* * *

শিবপুর কলেজে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও ছাত্রের তেমন সমাবেশ নাই। এই বাঙ্গালা দেশে ভূমি অনেক পাওয়া যায়, একটু বুদ্ধি ও সামান্য টাকা খরচ করিলেই অনায়াসে কৃষিকার্য্যের দ্বারা লোকে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিতে পারেন; তথাপি তাঁহারা এবিষয়ে অবহেলা করেন কেন, আমরা বুঝিতে পারি না। এবিষয়েও দৃষ্টিপাত করিতে আমরা দেশের লোককে অনুরোধ করি।

* * *

এখন সরকারী আফিসে বল, বে-সরকারী আফিসে বল, সর্ব্বত্র চাকরী দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে এণ্ট্রান্স পাশ হইলে অনায়াসে ২০।২৫ টাকার চাকরী মিলিত, কিন্তু এখন তাহা মিলে না। এখন এফ এ পাশ না হইলে ২০।২৫ টাকার চাকরী

বাহিনার চাকরী ক্রমশঃ দুর্লভ হইতেছে, সুতরাং জীবিকার জন্য চাকরীর উপর লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না।

* * *

নদীয়ার কারিকরদিগের প্রস্তুত মৃন্ময় মূর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রশংসিত। পূর্ব্বে এদেশে প্রতিমা পূজা বড় অধিক পরিমাণে হইত, এখন আর তত হয়না, সুতরাং তাহাদের আয় কমিয়া গিয়াছে। বারোয়ারি প্রভৃতি উপলক্ষেও নদীয়ার কারিকরেরা সং প্রস্তুত করিয়া বিস্তর উপার্জ্জন করিত। এখন নদীয়ার কারিকরদিগের দিন চলা ভার। পেটের জ্বালায় জাতিব্যবসা ছাড়িয়া ইহারা কেরাণীগিরি প্রভৃতির জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। ইহাতে যে একটী জাতীয় শিল্প লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহা কেহ ভাবিয়াছেন কি?

* * *

কিন্তু এমন উপায় আছে যাহাতে এই লুপ্তপ্রায় শিল্পটীকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারা যায়। আমেরিকা এবং ইউরোপের লোকে আমাদের বঙ্গদেশীয় কারিকরের প্রস্তুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যায়। এ অবস্থায় যদি নদীয়ার কারিকরের প্রস্তুত মূর্ত্তিগুলি ইয়ুরোপের বাজারে যায় তবে তাহা আদরের সহিত অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে এবং তাহাতে একটা নূতন বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়।

* * *

কাশ্মীরের অন্তর্গত লাডডা নামক স্থানে সম্প্রতি কয়লার খনি বাহির হইয়াছে। এবিষয়ে আরও অধিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য, জিওলজিকাল ডিপার্টমেন্ট বা ভূতত্ত্ব বিভাগ হইতে অনেক দক্ষ খনিতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি কাশ্মীরে যাইতেছেন। কাশ্মীরে সোণারূপার খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে কার্য্য করিবার জন্যও কাশ্মীর দরবার আয়োজন করিতেছে। একজন খনিতত্ত্ববিৎ ব্যক্তির জন্য কাশ্মীর দরবার হইতে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে।

* * *

কৃষিবিভাগ হইতে মধ্যপ্রদেশ সমূহের তসরের উন্নতি করিবার চেষ্টা হইতেছে। সরকারি জঙ্গলে তসরের গুটী উৎপন্ন করায় উহার উৎপত্তির হ্রাস হইয়াছে। এই নিমিত্ত সরকারি জঙ্গল ব্যতীত যাহাতে অন্যান্য স্থানে গুটী জন্মে তাহার চেষ্টা হইতেছে। এদেশী গুটী হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য দেশীয় প্রথাই প্রশস্ত, ইহা বিবেচিত হওয়ায় যাহাতে চরকার উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে ঐ বিভাগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। দক্ষিণ ভারতে গুটী হইতে সূতা বাহির করিবার জন্য জাপানী প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইহাতে কিরূপ সূতা বাহির হয়, তদ্বিষয়ে সম্যক্ অনুসন্ধানের পর মধ্য ভারতেও উহার পরীক্ষা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

* * *

আমেরিকার সহিত এসিয়ার সংযোগ করিবার কথা শুনা যাইতেছে। বেরিং প্রণালীর উপর দিয়া সেতু তৈয়ারি হউক, আর উহার ভিতর সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়াই হউক, রেল বসাইবার জন্য রুষ টেকনিকাল সোসাইটীর রেলবিভাগ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া- [illegible]

তবে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা পরস্পরে সংযুক্ত হইবে। যাহাতে পারিসনগর হইতে আমেরিকার নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত বরাবর রেললাইন বসে, তাহার জন্য পারিস ও নিউইয়র্ক নগরে দুইটি রেল কোম্পানি গঠিত হইয়াছে। পারিসনগর হইতে বার্লিন মস্কৌ ইর্কটস্ক দিয়া বেরিংপ্রণালী পর্য্যন্ত রেল লাইন বসিলে উহার দৈর্ঘ্য ১১হাজার মাইল হইবে। উত্তর সাইবিরিয়া এবং এলাস্কার মধ্যে খনি অন্বেষণের জন্যই নাকি এই রেল লাইন বসিতেছে। ইহাতে কত টাকা লাগিবে আর তাহা যে কতদিনে উঠিবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির উদ্যমকে ধন্যবাদ করিতে হয়। এই উদ্যমের বলেই ইহারা জগতে সর্ব্বত্র জয়ী।

* * *

কৃষি কার্য্যের পরীক্ষা জন্য ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে অঞ্চলে যে শস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই অঞ্চলে সেই সেই শস্যের পরীক্ষা হইয়া থাকে। সংপ্রতি মধ্য প্রদেশ সমূহের হোসেঙ্গাবাদ এবং রায়পুরে এক একটী পরীক্ষা ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হোসেঙ্গাবাদের পরীক্ষা ক্ষেত্রে গম ও অন্যান্য রবিশস্যের পরীক্ষা হইবে এবং রায়পুর কৃষিক্ষেত্র কেবল ধান্যের পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নাগপুরে যে পরীক্ষা ক্ষেত্র পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতে ঐ স্থানের প্রধান ফসল তুলা এবং জোয়ারের পরীক্ষা হইবে। এতদ্ব্যতীত কিরূপ প্রণালীতে চাষ করিলে উহার উন্নতি হইতে পারে তাহা শিক্ষা দিবার কয়েকটী কেন্দ্র বাছিয়া লইয়া সেই সেই কেন্দ্রে কৃষি প্রণালীর শিক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে সেই সেই অঞ্চলের কৃষকগণকে হাতে কলমে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই রূপ ক্ষেত্র ছত্রিশগড়ে ৫টী, নন্দগাঁও এবং খয়রাগড় সামন্ত রাজ্যে ৮টী এবং হোসেঙ্গাবাদ জেলায় ৫টী সংস্থাপিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য সরকার হইতে এই সকল ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিত ক্লাই সাহেবের উপর ঐ সকল ক্ষেত্র পরিদর্শনের ভার দিয়াছেন।

* * *

ভারতবর্ষীয় ভূতত্ত্ব জরীপ আফিসে (Geological Survey of India) সুখ্যাতির সহিত ২০ বৎসর কার্য্য করিয়া শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু বি এস সি, এফ জি এস, পেন্সন লইয়া সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ভূতত্ত্ব-বিদ্যায় এক জন অসাধারণ পণ্ডিত এবং বাঙ্গালার একটি অলঙ্কার। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী উক্ত আফিসে এরূপ উচ্চ কর্ম্ম পান নাই। তাঁহার প্রণীত ইংরাজী ভাষায় ইতিহাস শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত।

* * *

প্রমথ নাথ সরকার কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন বটে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। ইঁহার নিজের বিস্তৃত কয়লার খনি আছে। ইনি সম্প্রতি খনিজ দ্রব্যের আবিষ্কার জন্য ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে গমন করিয়াছেন। আমাদের দেশের ধনিগণ ইঁহার সাহায্যে [illegible]

এদেশে বিলাতী জিনিসে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। দেশীয় দ্রব্যের প্রচলন একবারে লুপ্তপ্রায়। এজন্য যাঁহারা স্বদেশীয় জিনিসের কাট্‌তি বাড়াইতে উদ্যোগী তাঁহারা আমাদিগের সকলেরই ধন্যবাদার্হ। "স্বদেশী ভাণ্ডার" এই বিষয়ে পথ প্রদর্শক। কয়েক জন স্বদেশ হিতৈষী যুবক মিলিয়া যৌথ প্রণালীতে এই ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা কারবার গুটাইয়া লইয়াছেন। এক্ষণে "ভারত-ভাণ্ডার" (Indian Stores Ld.) স্থাপিত হইয়াছে। দেশের কয়েক জন গণ্যমান্য লোক এই ভাণ্ডার স্থাপনের উদ্যোগী এবং যৌথ প্রণালীতে ইহার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটে এই ভাণ্ডার স্থাপিত। দেশী থান, পরণের কাপড়, পোষাকের কাপড়, মোজা, গেঞ্জী, তসর গরদ, প্রভৃতি ও নানাবিধ শিল্প দ্রব্য এখানে বিক্রয়ার্থ সঞ্চিত থাকে। ভাণ্ডারটী দেখিলে মনের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, বুঝি বা ভারতের শুভদিন আবার ফিরিয়া আসিবে। যাঁহারা মনে করেন, বিলাতী জিনিস ছাড়া আমাদের উপায় নাই, তাঁহাদিগকে আমরা এই ভাণ্ডারটি একবার দেখিতে অনুরোধ করি।

* * *

ভাণ্ডারটি স্থাপিত হইবার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বাবু কুঞ্জবিহারী সেন কলিকাতা বড়বাজার মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে একটি স্বদেশী বস্ত্রের কারবার চালাইয়া আসিতেছেন এবং কারবারটিও বেশ চলিতেছে।

* * *

বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এ ইংরাজীতে লিখিত ডনপত্রিকার (Dawn) সম্পাদক বলিয়া পরিচিত। তিনি "ডনসভা" (Dawn Society) নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য স্বদেশী দ্রব্যের কাট্‌তির জন্য চেষ্টা। শুধু বক্তৃতায় কার্য্য শেষ না করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি স্বদেশী যুবকবৃন্দের মতিগতি ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতায় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান বিদ্যালয়ে (Metropolitan Institution) একটি ভাণ্ডারও খুলিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণও তাঁহাকে সবিশেষ উৎসাহ দিতেছেন। সতীশ বাবু আমাদের স্বদেশী ব্যক্তিবৃন্দের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। ভারতের সর্ব্বত্র এরূপ ভাণ্ডার স্থাপন বাঞ্ছনীয়।

* * *

তুলারবীজ এদেশে আবর্জ্জনার মধ্যে পরিগণিত, উহা বিশেষ ব্যবহারে লাগে না, কিন্তু অন্যান্য দেশে উহা একটি লাভজনক পণ্য দ্রব্য। আমিরিকায় তুলারবীজের তৈল একটা সাধারণ ব্যবহার্য্য জিনিস। তুলার বীজ গরুর খাদ্যের জন্যও ব্যবহার হয়। সম্প্রতি এদেশেও তুলার বীজ কাজে লাগাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতায় একটি সওদাগরী আফিস তুলার বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত জন্য বিলাত হইতে কল আমদানী করিতেছেন। মধ্য ভারত তুলার আড়ৎ, এখানে তুলার বীজের কল বসান হইবে। আমরা এই কোম্পানির সাফল্য কামনা করি।

* * *

ব্রহ্মের তৈল-খনির কাজ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ১০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মে যে পরিমাণে কেরোসিন জন্মিত, এখন তাহা, উপর তৈল ভারতবর্ষেই কাটিয়াছে। ব্রহ্মের তৈলের কাটতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রুষীয় ও আমেরিকান তৈলের কাটতি ক্রমশঃ হ্রাস হওয়া সম্ভব। এই উভয় দেশ হইতে এখন বৎসরে ৮ কোটি গালন তৈল আমদানী হয়।

* * *

অধ্যাপক ডেওয়ারের কল্যাণে আমাদের পরিচিত সর্ব্ব প্রকার বাষ্পীয় পদার্থ তরলাকারে পরিণত হইয়াছে। সকল বাষ্পীয় পদার্থের মধ্যে উদজান বাষ্প (Hydrogen) হালকা। তরল পদার্থের মধ্যে তরল উদজানও সর্ব্বাপেক্ষা শীতল। তরল অবস্থায় ইহা বর্ণহীন ও স্বচ্ছ। ইহা জল অপেক্ষা ১৪ গুণ হালকা। তরল জলা-বাষ্প (Marsh gas) আপেক্ষিক গুরুত্বে ইহার পরই গণ্য। ১৮৯৮ সালে এই পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। আকাশ-বায়ুর চাপে তরল উদজান -৪২২° (ফারেনহাইট) পরিমাণ তাপে ফোটে আর -৪৩২° তাপে ইহা কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। কঠিন ফেন দেখিতে যেরূপ, কঠিন উদজানেরও আকার সেইরূপ।

* * *

শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ফ্রান্সে কয়েক বৎসর থাকিয়া কলবলের ইঞ্জিনিয়ারিং (Mechanical Engineering) শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম ইনি বাঙ্গালা অক্ষরলিখনের (Typewriter) কল প্রস্তুত করিয়াছেন। শীঘ্রই বিক্রয়ার্থ বাজারে বাহির করিবেন। প্রত্যেক কলের দাম ৩০০ টাকা আন্দাজ হইতে পারে। ইংরাজী লিখনের কল এখন সর্ব্বত্র চলতি হইয়াছে। বাঙ্গালা অক্ষরেরকলও বিস্তর চলতি হওয়া উচিত।

* * *

বাবু দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় এক জন অবসর প্রাপ্ত প্রাচীন ইঞ্জিনিয়ার। কলিকাতায় ব্যাপারীটোলায় তাঁহার বাড়ী। সুখের বিষয় যে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ও শ্রমশীলতা অক্ষুণ্ণ আছে। ইনি বহুদিনের পরিশ্রমের পর একটি কাপড়ের টানার কল প্রস্তুত করিয়াছেন এবং পেটেন্ট করিবার জন্য পেটেন্ট আফিসে আবেদন পেস করিয়াছেন। পেটেন্ট পাইলে আমরা কলটির নকসা ও বিবরণ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

* * *

কলটি তিন অংশে বিভক্ত। এক অংশে সূতা জড়ান হয়। এক অংশে টানা বাঁধা হয়, আর তৃতীয় অংশে কাপড়ের বহর আঁটা হয়। কলটি লোহা ও কাঠে নির্ম্মিত। দাম আন্দাজ ১০০০ টাকা। ১৫।১৬ বৎসর টিকিবে। কলটি হাতে চলে, তাহাতে কাজ করিবার জন্য ৮ জন লোক আবশ্যক হয়। সমস্ত দিন চালাইবার খরচা ৫ টাকার অধিক নহে। সমস্ত দিন কাজ করিলে এই কলে ৩০০০ গজ অর্থাৎ ৩০০ জোড়া কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। কলটি সর্ব্ব প্রকারে এ দেশের উপযোগী। প্রচলিত হইলে এদেশে কাপড়ের ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া দিবে।

* * *

এদেশে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন জন্য গবর্মেণ্ট বিশেষ উদ্যোগী

বাঙ্গালার কৃষিবিভাগের

গত বর্ষের রিপোর্ট।

বঙ্গের কৃষি বিভাগের গতবৎসরের কার্য্য বিবরণী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় উক্তবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় বঙ্গের পশু চিকিৎসালয়, রেসমের উন্নতি এবং বিহারের অন্তর্গত পুষায় কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য পশু চিকিৎসালয় গুলির উন্নতিতে এদেশের প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা। কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় রেসমের উন্নতি জন্য বিশেষ চেষ্টিত। শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংসৃষ্ট যে কৃষি বিভাগ আছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং বিহারের অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গা জেলায় পুষা নামক স্থানে একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। এই স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর আর এখানে চাষের অনেক সুবিধা। নূতন কৃষি বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে, নূতন বাড়ী ঘর প্রস্তুত হইতেছে। আমরা আশা করি এই বিদ্যালয়টি খোলা হইলে বাঙ্গালী কৃষিবিদ্যা শিক্ষার বিশেষ সুবিধা পাইবেন।

বাঙ্গালার বর্দ্ধমান, শ্রীপুর, ডুমরাঁওঁ এবং শিবপুরে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র আছে, তাছাড়া পিপরা ও দলসিং-সরাইয়ে কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা চলিতেছে। এই সকল স্থানের কার্য্য সুচারু রূপে চলিতেছে।

বিদেশী চিনির উপর গবর্ণমেণ্ট যে শুল্ক বসাইয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য দেশী চিনির উন্নতি ও উৎপত্তিবৃদ্ধি, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাতে কোন ফল দেখা যায় নাই। ঐ শুল্ক বসানতে যে চাষ অধিক বাড়িয়াছে বা চিনি পরিশোধন করিবার জন্য যে লোকে বিশেষ চেষ্টা করিতেছে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

পাটের অবনতি বিষয়েও অনুসন্ধান গত বৎসরের ন্যায় চলিয়াছে। এদেশে যেথানে যেথানে পাট জন্মে সেই স্থান হইতে ভাল জাতির বীজ সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধমান কৃষি ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহার ফল সন্তোষজনক। ময়মনসিংহ জলপাই গুড়ি এবং ফরিদপুরেও এবিষয়ে পরীক্ষা হইয়াছিল। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে আরও মনোযোগ দেওয়া হইবে। পাট ভিজা থাকে বলিয়া বাজারে সর্ব্বদা অভিযোগ শুনা যায় এবং ব্যাপারীরা জল দিয়া পাট ভারী করে এরূপ কথা রাষ্ট্র। এবিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা হইবে এবং তাহা নিবারণেরও চেষ্টা হইবে।

বর্দ্ধমান এবং ডুমরাওঁর কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ সার, ফসল এবং কৃষি প্রণালীর পরীক্ষা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের কৃষিক্ষেত্রে প্রমাণ হইয়াছে যে শিবপুরের লাঙ্গল গুলি দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বোম্বাই হইতে যে সকল কৃষি কার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি আনা হইয়াছিল ডুমরাওঁ কৃষিক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষা হইয়াছে, কিন্তু তাহা এদেশের অনুপযোগী। কারণ এদেশের বলদ ওরূপ ভারি লাঙ্গল টানিতে কখনও অভ্যস্ত নহে। ডুমরাঁও পরীক্ষাক্ষেত্রে নানাজাতি কার্পাসের বীজের পরীক্ষা হয়। বঙ্গদেশের পক্ষে কোন্ বীজ উপযোগী তাহা এই পরীক্ষায় জানা যাইতে পারিবে। সারণের অন্তর্গত শ্রীপুর পশুশালায় গোতত্ত্ববিৎগণের পরামর্শে গোজাতির বংশবৃদ্ধির চেষ্টা সুফল লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে হিসারের ষণ্ড আনাইয়া এদেশীয় গাভীর বৎস উৎপন্ন করা হইত কিন্তু গত বৎসর উক্ত প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার পরিবর্ত্তে দেশীয় ষণ্ডের দ্বারা বৎস উৎপন্ন করিলে গোজাতির অধিক উন্নতি হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়ায় বঙ্গেশ্বর চট্টগ্রাম পশুশালা হইতে ষণ্ড আনাইতে অভিলাষ করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশের আরও কয়েকটী জেলায় ঐ প্রকার বন্দোবস্ত করিতে মনোযোগী হইয়াছেন।

বিগত ১৯০১-১৯০২ সালে গবর্ণমেণ্টের খাসে এবং ওয়ার্ডষ্টেটে সার প্রভৃতির বিষয়ে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে কোন ফললাভ হয় নাই। মিঃ এলেন তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে যাঁহাদিগের উপরে তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তাঁহাদিগের অমনোযোগিতাই এই নিষ্ফলতার কারণ। এই নিমিত্ত তিনি প্রতি জেলার সদরের

অনতিদূরেই এক একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ হইলে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসরেরা স্বয়ং ক্ষেত্র গুলির তত্ত্বাবধান করিতে পারেন, এবং যে অর্থ এখন সামান্য সামান্য কাজে ব্যয় হয় তাহা ঐ সকল ক্ষেত্রে ব্যয়িত হইলে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এলেন মহোদয়ের মতে উল্লিখিত উপায় অবলম্বিত হইলে বঙ্গদেশের কৃষি বিভাগের উপকারিতা লোকে বুঝিতে পারে এবং যে সকল লোক কৃষি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদিগের বিশেষ সুবিধা হয়। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

ছোট লাট বাহাদুর এলেন সাহেবের প্রস্তাবিত বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন যে বঙ্গদেশের কৃষি বিভাগে এক্ষণে অনুসন্ধানের কার্য্যই হওয়া উচিত, তবে ক্রমে ক্রমে এলেন সাহেবের প্রস্তাবিত প্রণালী আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে অবলম্বিত হইতে পারে। যাহা হউক এলেন সাহেবের প্রদর্শিত প্রণালীর মর্ম্মানুসারে ছোট লাট বাহাদুর স্থির করিয়াছেন, যে সকল স্থানে বীজ প্রভৃতির তত্ত্বানুসন্ধান হয় (Research Stations) যদি সেই স্থানে এক একটী কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং তাহার সহিত হাতে কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা যায় তবে রিসার্চ ষ্টেশন গুলির দ্বারা ভবিষ্যতে বঙ্গদেশীয় বীজ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইবার সুবিধা হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়ে উপকারও হইবে। বোধ হয় শীঘ্রই বঙ্গের অনেকগুলি রিসার্চ্চ ষ্টেশনে কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বঙ্গীয় রেসম সমিতি (Bengal Silk Committee) বঙ্গে রেসমশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশয়ে কয় বৎসর ধরিয়া রেসমপ্রস্তুতকারীদিগকে গুটী তৈয়ারী এবং কীট পালন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও সমিতিকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সমিতির চেষ্টা অনেকাংশে সুফল প্রসব করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর বীরভূমে সমিতির কার্য্য নিষ্ফল হইলেও আলোচ্য বর্ষে তথায় রেসম কীট উৎপাদনের অবস্থা আশাপ্রদ। পূর্ব্বে বগুড়া জেলায় অনেকে কীট পোষণ ও গুটী উৎপাদনের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গীয় রেসম সমিতির অবলম্বিত নূতন পদ্ধতির সাফল্য দেখিয়া সকলেই পুনরায় স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সমিতির চেষ্টায় মালদহ, মুরসিদাবাদ, রাজসাহীতেও কীটপালনের জন্য নূতন নূতন নর্শারি স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামপুর বোয়ালিয়াতে যে শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাতে রেসমতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ঐ বিদ্যালয়ে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে ঐ বিভাগে ৮টী বৃত্তি দেওয়া হয়। যে সকল রেসম প্রস্তুতকারীর পুত্র ঐ বিভাগে প্রবিষ্ট হয় তাহাদিগের নিমিত্তই ঐ সকল বৃত্তি অবধারিত আছে। এতদ্ব্যতীত মালদহের জেলা বোর্ড এবং পুটীয়ারাজসরকার হইতেও এইরূপ বৃত্তির বন্দোবস্ত আছে। বলা বাহুল্য ইহাতে অনেক রেসমশিল্পীর পুত্র রীতি মত শিক্ষা পাইতেছে।



মহানুভব জেমসেদজী এন্ টাটা

শ্রীযুক্ত জেমশেঠ্জী এন্ টাটা।

এই যে ঋষিতুল্য সৌম্যমূর্ত্তি পারসী মহানুভবের প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া গেল, ইনি উদ্যম, অধ্যবসায় ও কর্ম্মশীলতার মূর্ত্তিমান্ অবতার,—আঁধার ভারতের উজ্জ্বল মাণিক—অজ্ঞান তিমিরে আমাদের একমাত্র পথ প্রদর্শক।

পারসীরূগণ শিল্প বাণিজ্যবিষয়ে ভারতবর্ষীয়গণের শীর্ষ স্থানীয়—দানে তাঁহারা মুক্তহস্ত, ভারতবাসিগণের অনুকরণের আদর্শ। ইঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় মাত্র। কিন্তু ধনে, মানে, কর্ম্মিষ্ঠতায় ভারতের অগ্রণী। অধুনাতন কালে এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইতে যে সমস্ত স্বনামধন্য পুরুষ জন্মিয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছেন, ভারতের অপর কোন সম্প্রদায় হইতে সেরূপ হয় নাই। জিজিভাই, কামা, নৌরোজী, মেটা, টাটা প্রভৃতি নামের তুলনা অতি বিরল, ভারতের আধুনিক ইতিহাসে ইঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ইসলামের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপদিনে পারস্যের অধিবাসিবৃন্দ ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঐ সম্প্রদায়ের দলপুষ্ট করিল, আর যাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হইলেন, তাঁহারা নানারূপে উৎপীড়িত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। আশ্রয় জন্য নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে তাঁহারা গুজরাটে থাকিবার অনুমতি পাইলেন। সেই অবধি তাঁহারা ভারতের অধিবাসী। এখন অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতবর্ষও তাঁহাদের মাতৃভূমি। গুজরাটী ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা, পরিচ্ছদ এদেশী, একটু রূপান্তরিত মাত্র। ভারতে আসিবার পূর্ব্বেও তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষের বড় নিকট সম্বন্ধ। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের জ্ঞাতি। দুর্দ্দিনে পশ্চিম ভারত তাঁহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন, এখন সেই কৃতী সন্তানগণের গুণগ্রামে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল।

টাটা মহোদয় নীরব আপন কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত তাঁহার কীর্ত্তিধ্বনিতে উদ্ভাসিত। ভারতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গবেষণার জন্য তাঁহার মহীয়ান্ উদ্যোগ ও ৩০ লক্ষ টাকা দান উপলক্ষে, তাঁহার নাম ভারতের চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত। তাঁহার কার্য্যকারিতা এইখানেই শেষ হয় নাই। ভারতে লৌহ প্রস্তুত জন্য তিনি বিরাট আয়োজন করিতেছেন, সেই কার্য্যে আমেরিকানদিগের সাহায্য আহ্বান করিয়াছেন। কার্য্য সফল হইলে ভারতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। আমরা তাঁহার জীবনী কীর্ত্তিকলাপ সংক্ষেপে পাঠকগণকে উপহার দিব।

বিগত ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের অন্তর্গত নাওসারি নামক স্থানে টাটা মহোদয় জন্মগ্রহণ করেন। এলফিনষ্টোন কলেজে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয়। ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মিঃ টাটা প্রথম কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার পর কয়েক মাসের মধ্যে তিনি প্রথমবার চীনদেশে যাত্রা করেন। তথায় চারি বৎসর অবস্থিতিকালে টাটা মহোদয়ের চেষ্টায় পূর্ব্ব এসিয়াখণ্ডের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনার্থ হংকং এবং শাংহাই নগরে দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শীঘ্রই জাপান রাজ্য পর্য্যন্ত টাটামহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের বিস্তার হইয়াছিল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে টাটা মহোদয় প্রথমবার ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন প্রয়াসই তাঁহার বিলাত যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বোম্বাই নগরে সেই সময় টাকার বাজারে টান হওয়ায় তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। সেই সময়ে টাটা মহোদয়ের সামান্য পৈতৃক সম্পত্তি প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হওয়ায় তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। কিন্তু এখানে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বসিয়াছিলেন না। সেই সময়ে আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ বাধিয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হইয়া সেই যুদ্ধে কনট্রাক্টারের কার্য্য গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তি ঘটিলে সেই অর্থে টাটা মহোদয় কার্পাসসূত্র প্রস্তুত করিবার শ্রমশিল্পে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার চেষ্টায় বোম্বাই অঞ্চলে উল্লিখিত শিল্পের উন্নতির প্রথম সূত্রপাত হয়। তত্রত্য চিঞ্চপুগলি নামক স্থানে আলেকজাণ্ড্রা মিল স্থাপনপূর্ব্বক কিছুকাল লাভের সহিত কার্য্য করিয়া মিঃ টাটা অধিক লাভে তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলেন।

ইহার পর কার্পাসসূত্র শিল্পসম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত ১৮৭২ সালে টাটা মহোদয় ইংলণ্ডের ল্যাংকাশায়ারে গমন করেন। বলা বাহুল্য উল্লিখিত বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে আগমনের পর টাটা মহোদয় কারখানা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নাগপুরই কারখানা স্থাপনের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি তথায় এম্প্রেস্ মিলস্ নামক কারখানার প্রতিষ্ঠা করিলেন। যে দিনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "এম্প্রেস্ অব ইণ্ডিয়া" বা রাজ-রাজেশ্বরী উপাধির দ্বারা ভূষিত হন, সেই দিনে টাটা মহোদয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কারখানার কার্য্য আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য, কারখানার কার্য্যে টাটা মহোদয় এবং তাঁর বংশাবলী প্রচুর লাভবান হইয়াছিলেন। বিগত ২৫ বৎসর নানাবিধ কারণে অনেকগুলি কাপড়ের কারখানার কার্য্যবন্ধ অথবা বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু দূরদর্শিতার ফলে কখনও তাঁহাকে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি সর্ব্ব বিষয়েই কৃতী।

পরিণামদর্শিতার ফলেই তিনি লোকসান প্রভৃতি সহ্য করিতে এবং প্রচুর সম্পত্তি উপার্জ্জন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। তন্মধ্যে একটীর বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার পরিণামদর্শিতা কিরূপ তীক্ষ্ণ ছিল। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, জাপানে সভ্যতা এবং রাজনীতিক প্রভাব বৃদ্ধির সহিত কলকারখানার কার্য্য বাড়িয়া যাইবে। তাহাতে কেবল যে জাপানের বাজারেই বোম্বাইয়ে প্রস্তুত বস্ত্রের ক্ষতি হইবে তাহা নহে, চীনের সহিতও বস্ত্রব্যবসায়ে বোম্বাইয়ের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। কারণ জাপানে বড় বড় কাপড়ের কল বসিলে তথায় ভারতবর্ষীয় তুলার রপ্তানী অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে ভারতবর্ষে তুলার দর চড়িবে। এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ফলে তিনি স্থির করিলেন যে, ভারতবর্ষের বাজারে দেশী বস্ত্র আরও অধিক প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় তুলার আঁকড়াগুলি বড়ই ক্ষুদ্র বলিয়া এদেশের কলে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইবার অন্তরায় ঘটিল। তুলার উন্নতিকল্পে ইতিপূর্ব্বে সরকার হইতে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তাহার উপর কলের মজুরেরা কিছু কিছু সঞ্চয় করিলেই দীর্ঘকালের জন্য আপনাদের মুলুকে চলিয়া যায় বলিয়া তাহাদের হাত পাকে না। এই সকল অসুবিধা কিছু একদিনে দূর হইতে পারে না, এই ভাবিয়া টাটা মহোদয় একাগ্রচিত্তে কার্পাসের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এদেশে ইজিপ্সিয়ান কার্পাস উৎপন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। প্রথমে সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে এদেশে ইজিপ্টের তুলা উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই, টাটা মহোদয় ঐ জাতীয় তুলা উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। টাটা মহোদয়ও অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখন প্রার্থীদিগকে বিনা মূল্যে ঐ তুলার বীজ প্রদান করিয়া থাকেন। এখন ভারতবর্ষে লম্বা আঁশের তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। এক্ষণে টাটার কাপড়ের কলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া এদেশে বহুল পরিমাণে বিক্রীত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় শিল্পযুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া টাটা মহোদয় স্বদেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। বহুবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি প্রচুর সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সুসিদ্ধ হইলে ভারতবর্ষীয় শিল্পকার্য্যের ইতিহাসে একটী নূতন যুগের আবির্ভাব হইবে। লৌহশিল্পসম্বন্ধে এদেশের শিল্পিকুল ইউরোপীয়দিগের বহুপশ্চাদ্বর্ত্তী। টাটা মহোদয় এদেশের অধিবাসীদিগকে লৌহশিল্পে নিপুণ করিবার চেষ্টায় আছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মধ্যপ্রদেশে যে লৌহ পাওয়া যায় তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান লৌহ জগতের কুত্রাপি পাওয়া যায় না। সেই লৌহে টাটা মহোদয় এদেশে লৌহশিল্পের সম্যক্ বৃদ্ধি করিতে চান। শীঘ্রই তাঁহার চেষ্টার ফল দেখা যাইবে, শীঘ্রই ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা এদেশীয় লৌহ ও ইস্পাতনির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য বহুলপরিমাণে এদেশের লোকে ব্যবহার করিবে।

টাটা মহোদয় অতি সামান্য মূলধনে—একপ্রকার বিনামূলধনে—কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া অসামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য এবং তীক্ষ্ণ ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে

প্রচুর অর্থোপার্জ্জন এবং স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় মহীশূরে জাপানী প্রথার রেশমশিল্পের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, ভারতে শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তিনি একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাশিক্ষার্থী দেশীয় যুবকেরা বিলাতে গিয়া কোন বিশেষ শিল্পের বিষয় পড়িতে ইচ্ছা করিলে, তথায় তাঁহাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ টাটা মহোদয়ের যথেষ্ট অর্থ ফণ্ডে দেওয়া আছে। ভারতের অদ্বিতীয় সম্পত্তিশালী হইয়াও তিনি ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত নহেন, পক্ষান্তরে তাঁহার প্রকৃতি উদার এবং দয়ালু। কোন বিদ্যালয়ে বা অপর কাহারও নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি ভারতবর্ষীয় শিল্প-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই, কেবল উদ্যম, ধৈর্য্য এবং পরিশ্রমের দ্বারা সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তিনি প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন।

গোরক্ষা।

নিম্নলিখিত ছাপা আবেদন পত্র খানি আমাদিগের হাতে পড়িয়াছে।

"নিম্নে স্বাক্ষরকারী কলিকাতা নিবাসী বাঙ্গালী হিন্দু গোপগণ সর্ব্বসাধারণ হিন্দু মহোদয়গণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছে যে, গোপগণ যে রূপ পাপে পাপী হইয়াছে তাহা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন, তদ্বিষয় আন্দোলনের আবশ্যক নাই, হিন্দু মহোদয়গণ। আমাদের এই গোপজাতির অপরাধ ক্ষমা করিয়া বুদ্ধিহীন গোপগণকে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিবার উপায় করিয়া দেন। আমরা সকলে উপায় বিহীন হইয়াছি। যদ্যপি গোমাতা ও গোবৎসগণকে রক্ষা করিয়া গোপজাতিকে এই ঘোরতর পাপ হইতে মুক্তি করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন তাহা হইলে সমস্ত বাঙ্গালী গোপগণ সেইমত কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছে। কিছু দিন অতীত হইল আমরা "গোবৎস-সংরক্ষিণী" নামক একটী সভা সংস্থাপন করিয়া কসাইগণকে গোবৎস বিক্রয় বন্ধ করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি, ইতিপূর্ব্বে গোপগণ গোবৎস ভূমিষ্ঠহইবামাত্র কিম্বা ৩।৪ দিবস পরে কসাইগণকে বিক্রয় করিত। অল্পদিন হইল উক্ত মহাপাপ হইতে সকলেই বিরত হইয়াছে, যদ্যপি কোন গোপ ঐরূপ পাপ কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাকে উচিতমত দণ্ড করা হয়। যখন গোপগণের এরূপ মতিগতি হইয়াছে অর্থাৎ কসাইকে গোবৎস বিক্রয় অতীব গর্হিতকার্য্য এবং মহাপাপ বলিয়া জানিতে পারিয়াছে, তখনই কসাইকে গো বিক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে গোপগণের একটি বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, এই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে হিন্দু মহোদয়গণ সামান্য মাত্র সাহায্য করিলে এই "গোবৎস সংরক্ষিণী" সভার উদ্দেশ্য সফল হয়। উক্ত সভা এক বৎসর হইল সংস্থাপিত হইয়াছে; সভার সৎ উদ্যোগে অদ্যাবধি গোপগণ গোবৎস বিক্রয় বন্ধ করিয়াছে, তন্নিমিত্ত গোপগণের প্রতি গৃহে গোবৎস সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। আপাততঃ কলিকাতাস্থ গোপগণের গৃহে প্রায় ৩০০০ হাজারের অধিক পরিমাণে গোবৎস বর্ত্তমান আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গরীব গোপগণের গৃহে গোবৎস রক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান নাই, স্থানাভাবে গোবৎসগণের অত্যন্ত কষ্টে দিনযাপন হইতেছে, এমন কি মৃত্যুমুখেও পতিত হইতেছে, গোবৎস সকলের মৃত্যু দেখিয়া আমরাও অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি কোনরূপ উপায়ও দেখিতে পাই না। অতএব হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী গোজাতির প্রতিপালক দয়ালু ধর্ম্মাত্মা সজ্জন মহোদয়গণ সকলেই মিলিত হইয়া ইহার কোনরূপ উপায় স্থির করিয়া দেন যাহাতে গোধনের রক্ষা হয় এবং কসাইগণের হাত হইতে গোবৎস ও গোমাতাগণের জীবন রক্ষা হয় তাহার বিহিত বিধান করুন। * * *"

বলা বাহুল্য যে আবেদন খানিতে মনোযোগ করা ভারতবাসী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। গোধন ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রধান ধন, ইহার রক্ষা না হইলে ভারতবাসীর মঙ্গল নাই। কিন্তু কি উপায়ে ইহার রক্ষা হইবে তাহাই বিষম সমস্যা হইয়াছে। গো রক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইলে এই কয়টি বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হইবে (১) গোজাতির খাদ্য, (২) থাকিবার স্থান, (৩) গোচারণক্ষেত্র, (৪) বংশের উন্নতি, (৫) গোরক্ষা।

প্রথমতঃ খাদ্যের কথা। ভারতবর্ষে চিরদারিদ্র্য বিরাজমান, লোকে আপনার এবং স্ত্রীপুত্রের উদরান্ন সংস্থান অতি কষ্টেই করিতে পারে। আহার্য্য সমস্ত পদার্থই ক্রমে মহার্ঘ্য হইয়া উঠিতেছে, যে বঙ্গে আটমণ চাউল একটাকায় বিক্রয় হইয়াছিল, এক্ষণে সেই চাউল টাকায় আটসের বিক্রয় হইতেছে। মনুষ্যের খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে পশুর খাদ্যও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে খড় যে দরে পাওয়া যাইত, এখন আর সে দরে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন খড়ের মূল্য ২।৩ গুণ অথবা ৩,৪ গুণ চড়িয়া গিয়াছে। সাধারণ গৃহস্থ আপনাদিগের ভরণপোষণই চালাইবার অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহার উপর গবাদির খাদ্যের দর বাড়িয়া যাওয়ায় গবাদি পশুরা প্রায়ই অর্দ্ধভুক্ত থাকে। সুতরাং তাহার জন্য সস্তা খাদ্য প্রয়োজন।

খড় পশুদিগের প্রধান খাদ্য। যে বৎসর ধান্য ভাল না জন্মে, সে বৎসর দেশে তৃণাভাবও ঘটিয়া থাকে। আবার যে ধানগাছে ধান না ফলে, তাহার তৃণ সুস্বাদ না হওয়ায় গরু তাহা ভক্ষণ করে না। এ অবস্থায় ধান্য উৎপত্তির সহিত খড়ের উৎপত্তি নির্ভর করে। ধানগাছের গোড়ায় জল না থাকিলে ধান্য পরিপুষ্ট হইতে পারে না এবং খড়ও পশু খাদ্যোপযোগী হয় না। আবার ধান্যক্ষেত্রে অধিক জল থাকিলে ধান্য কাটিবার সময় গাছের মাঝামাঝি কাটিতে হয়। ইহাতে অনেক ধান জলে পড়িয়া নষ্ট হয় এবং খড়ও বড়ই অল্প পাওয়া যায়। এ অবস্থায় কেবল খড়ের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। খড় ব্যতীত পশুখাদ্যোপযোগী কয়েকপ্রকার তৃণও উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

রায়না, লুশার্ণ, লোণা দূর্ব্বা প্রভৃতি তৃণ পশুরা খড়ের ন্যায় রুচির সহিত ভক্ষণ করে। এদেশে এই সকলের চাষ আবাদ বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু ইহার চাষ হইলে, পশুজাতির জন্য একটা নূতন খাদ্যের উৎপত্তি হয়। ইহাতে গৃহস্থদিগের পক্ষে সুলভ মূল্যে তৃণলাভ ঘটে এবং পশুরাও অর্দ্ধভুক্ত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পায়। উল্লিখিত ঘাসচাষে লাভও অনেক অধিক। কারণ ঐ সকল ঘাস যতই কর্ত্তিত হয়, ততই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ২।৩ দিন অন্তরই ইহা কাটিতে পারা যায়। প্রতিনিয়ত এই ঘাস কাটিয়া লইলে ইহার শ্রীবৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ঘাস কাটা কল অথবা দেশীয় কাস্তের সাহায্যে ঘাসগুলি কাটিয়া বিচালীর মত সেইগুলিকে আটি বাঁধিতে ও তাহার পরে দুই তিন দিন সেই আটিগুলিকে উলট পালট করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। ঘাসগুলি বিশুষ্ক হইলে চাষীরা সেগুলিকে বায়ু যাতায়াত করিতে পারে এমন একটী খটখটে ঘরে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়া প্রতি স্তরে কিছু লবণ ছড়াইয়া দেয়। ইহাতে ঘাসে কোনপ্রকার দুর্গন্ধ হয় না। পশুরা সহজেই লবণযুক্ত ঘাস পরিপাক করিতে পারে এবং ইহার ব্যবহারে তাহাদিগের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। এতদ্ব্যতীত লবণযুক্ত অর্দ্ধশুষ্ক ঘাস ভক্ষণ করিলে গাভীর দুগ্ধ সুমিষ্ট হয়। কলিকাতা প্রভৃতি নগরে কাঁচা ঘাস দুষ্প্রাপ্য, গাভীকে খইল ও ভুষির সহিত খড় খাওয়াইতে হয়। এই নিমিত্ত এখানকার গোদুগ্ধ তত সুমিষ্ট হয় না। কিন্তু উল্লিখিত ঘাস ব্যবহারে গাভী সুমিষ্ট দুগ্ধ প্রদান করে। ইহার ব্যবহারে সুবিধা এই যে, অর্দ্ধ শুষ্ক শস্পে খইল দিবার প্রয়োজন হয় না—অথচ পশু হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। আজকাল অনেক পল্লীগ্রামে কাঁচা ঘাস দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ খইল ক্রয় করা অনেকের পক্ষে দুর্ঘট, এ অবস্থায় এই ঘাসের প্রচলন হইলে খইলের অভাব অনেকটা মিটিতে পারে। মফঃস্বলের অনেক জমি এমন আছে, যাহাতে ভালরূপ ধান বা অন্য কোন প্রকার ফসল জন্মে না, যদি সেই সকল জমি তে উল্লিখিত ঘাসের চাষ করা যায়, তবে গোজাতির জন্য একটা সস্তা খাদ্য অনেকটা অনায়াসলভ্য হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি চাষ করে তাহারও বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন হয়, এতদ্ব্যতীত এদেশে একটা নূতন কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায় চলে।

কিন্তু এই সকল চাষ প্রচলিত হইবার পক্ষে গোপালকদিগের যত্ন এবং জমিদারদিগের সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক। যে সকল স্থানে ঐ সকল ঘাসের বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায় ও কিরূপে চাষ করিতে হয়, যদি জমিদারবর্গ সচেষ্ট হইয়া তাহার বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানপূর্ব্বক স্ব স্ব জমিদারির এলাকাভুক্ত প্রজাসাধারণকে অবগত করেন এবং ঘাসের চাষের উপকারিতা বুঝাইয়া দেন তবে বোধ হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে নানা স্থানে ইহার আবাদ হয়।

খড় ও ঘাস ব্যতীত গোজাতির পুষ্টিকর অথচ নিতান্ত সস্তা খাদ্য অনেক আছে। ঐ সকলের অধিকাংশই আমরা অবগত নহি, অথবা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বোধে আবর্জ্জনার মধ্যে পরিগণিত করি। কার্পাস বীজ প্রভৃতি গোজাতির অতি পুষ্টিকর খাদ্য, ইহা ব্যবহারে গাভীর দুগ্ধ ও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমরা ইহার ব্যবহার বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃ তুলার বীজ ফেলিয়া দি। যদি কার্পাস বীজ ফেলিয়া দিবার পরিবর্ত্তে গোজাতির খাদ্যরূপ উহার ব্যবহার করা যায়, তবে অনেক সস্তায় গোজাতির একটা খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে।

বিহার অঞ্চলে মউয়াফল গোজাতির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সেখানে ইহার মণ ১৲ টাকার অধিক নহে। মউয়াফল বড়ই পুষ্টিকর পদার্থ, ইহা ব্যবহার করিলে গোজাতি বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট

হইতে পারে, কিন্তু এদেশে বোধ হয় অনেকে ইহার ব্যবহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ। যদি গোজাতিকে ইহা খাওয়ান যায়, তবে সস্তায় আর একটা খাদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এদেশে মউয়ার আবাদ হইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক এমন পদার্থ আছে, যে তাহার মূল্য অতি সামান্য, অথচ গোজাতির বল ও তেজবৃদ্ধির পক্ষে বিশেষরূপে সহায়তা করে। পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ সস্তায় গোজাতির খাদ্য অবগত থাকেন, তবে তাহা আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ গোজাতির থাকিবার স্থানের কথা। কলিকাতা সহরে দুগ্ধব্যবসায়ী গোয়ালারা গোজাতিকে যেরূপ স্থানে এবং যে ভাবে রক্ষা করে, তাহা দেখিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেরই মনে করুণার সঞ্চার হয়। একেত সহরের রাস্তায় বাহির হইবার যো নাই, তাহাতে যেরূপ আবর্জ্জনাময় স্থানে তাহাদিগকে রক্ষা করা হয়, তাহাতে গোজাতির স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পল্লীগ্রামের মধ্যেও অনেক স্থলে মিউনিসিপালিটির প্রতিষ্ঠা হওয়ায় গোজাতি "উদম" খাওয়া ভুলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে দুগ্ধবতী গাভীকে দোহন করিবার পর বাছুরটিকে রাখিয়া গাভী ছাড়িয়া দেওয়া হইত, কিন্তু প্রায় সকল পল্লীগ্রামে এখন আর গাভী ছাড়িয়া দিতে পারা যায় না, গাভীকে সমস্ত দিন রাত্রি বৎসের সহিত গোশালায় অবরুদ্ধ থাকিতে হয়। এদিকে ধনী লোকেরা কেবল দুগ্ধলাভের প্রত্যাশায় গরু পুষিয়া থাকেন এবং গোয়ালারা কেবল গোদুগ্ধ অধিক পাইবার উপায় এবং তদুপযোগী ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। এক কথায় এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে, গোধন রক্ষা করিতে হইলে তাহার থাকিবার স্থানটী যাহাতে বায়ুসঞ্চালনশীল হয় এবং সতত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। কদর্য্য স্থানে থাকিলে মনুষ্যের ন্যায় গোজাতিরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, ইহা যেন গোপালকগণের মনে থাকে।

তৃতীয়তঃ বিস্তৃতক্ষেত্রে বিচরণ ব্যতীত গোজাতি বলবান্ ও সম্যক্ পরিপুষ্ট হইতে পারে না। জনসংখ্যা লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে গোচারণ ক্ষেত্র বড় একটা দেখা যায় না। যে সকল বড় বড় মাঠে গরু চরিত, এখন সে সকল স্থান বাস ভবনে ও পতিত স্থানসমূহ কৃষিক্ষেত্রে বা উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। আবার আবাদ বৃদ্ধির সহিত পশুতে শস্যাদি নষ্ট করিবার ভয়ে পাউণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল কারণে আজ কাল গোজাতি চারণক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে না পাইয়া ক্রমে দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন হইতেছে। বলা বাহুল্য, অবিলম্বে ইহার প্রতীকার আবশ্যক। যাহাতে স্বেচ্ছা-বিচরণ করিয়া গোজাতির স্বাস্থ্য উন্নত হয়, তাহার চেষ্টা করা কি জমিদার কি প্রজা উভয়েরই কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে জমির কর বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল, আজ কাল জমির কর বৃদ্ধি হওয়ায় জমিদারেরা গোচারণ ক্ষেত্রের জন্য কর গ্রহণ ব্যতীত জমি ছাড়িতে পারেন না। এদিকে দরিদ্র প্রজার পক্ষে অর্থব্যয়পূর্ব্বক গোচারণ ক্ষেত্র জমা লওয়াও বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যদি জমিদারেরা অল্প জমায় গোচারণের জন্য জমি ছাড়িয়া দেন এবং গোপালক প্রজাসাধারণ সকলে মিলিয়া জমিদারকে সেই কর প্রদান করেন,তবে অনেক স্থানেই গোচারণক্ষেত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে জমিদারকে লাভের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া গোচারণের জন্য জমি ছাড়িতে হইবে এবং প্রজা সাধারণের মধ্যে যাহার যে কয়টা গোরু সেই ক্ষেত্রে বিচরণ করিবে, তাহাদিগের প্রত্যেকটীর প্রতি একটা হার স্থির করিয়া তাহা প্রদান করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ গোবংশের উন্নতি। কি উপায়ে গোবংশের উন্নতি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনেকগুলি মত প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে সকল স্থানে গোজাতি ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, সেই সকল স্থানে গোবংশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বলিষ্ঠ জাতীয় ষাঁড় আনাইয়া তাহার দ্বারা গোবংস উৎপন্ন করিতে হইবে। কিন্তু কেবল গোবৎস উৎপন্ন করিয়া লইলেই গোজাতির উন্নতি হয় না। গোজাতির খাদ্য ও বাসস্থান সম্বন্ধে সুবিধা এবং যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে বিস্তৃত মাঠে বিচরণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার পর উল্লিখিত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়। এই সঙ্গে আরও একটী কথা আছে। এদেশে Cow breeding বা গোজাতির বংশবৃদ্ধি সাধন এবং Cow farming অর্থাৎ গোজাতি পরিপোষণের ব্যবস্থার অধিক প্রচলন নাই। অশ্বজাতি সম্বন্ধে অনেক স্থানেই আছে—গোজাতিসম্বন্ধে সেই-

রূপ ব্যবস্থার প্রাচুর্য্য হইলে গোজাতির সম্যক উন্নতি-লাভ ও পরিপুষ্টি সাধিত হইতে পারে। উভয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত বড় বড় মাঠের প্রয়োজন। আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ, প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে বড় বড় ক্ষেত্র পাওয়া যায়। যদি দেশীয় ধনী সম্প্রদায় সেই সকল স্থানে গোজাতির বংশবৃদ্ধি-সাধন এবং তাহাদের পরিপোষণের নিমিত্ত সচেষ্ট হন, তবে দেশের একটা প্রকৃত কার্য্য হয়। পক্ষান্তরে তাঁহারাও লাভবান্ হইতে পারেন।

তাহার পর গোরক্ষার কথা। নানা কারণে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ গোহত্যা হইয়া থাকে। হিন্দু ভিন্ন অপরাপর জাতি গোমাংস ভক্ষণ করেন। তাহাতে অনেক গোরু নষ্ট হয়। অন্ততঃ যে সকল গাভী বৎস প্রসব করিতে সক্ষম, কসাই-দিগের হস্তে তাহাদের হত্যা নিবারিত হইলেও অনেক উপকার হয়। গোরক্ষিণী-সভা হইতে উল্লি-খিত উপায়ে গোজাতির উৎপত্তি ও প্রতিপালন এবং বৎসপ্রসব-সমর্থা গাভীর হত্যা নিবারণ চেষ্টা হইলে, গোজাতির রক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে।

বিলাতে গোচর্ম্মের ব্যবসায় ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায় এদেশে গোরক্ষা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইতেছে। বলা বাহুল্য, যে সকল গোরুকে হত্যা করা হয়, সেই সকল গোরুর চামড়া অধিকমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কাজেই অধিক প্রাপ্তির লোভে কষাই বা মুচিরা বিষপ্রয়োগে গোহত্যা করে। এই গোচর্ম্ম ব্যব-সায়ের কল্যাণে প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ হৃষ্ট-পুষ্ট বৃষ ও গাভী অতি নৃশংসভাবে নিহত হয়। একে গোজাতির ক্রমেই অবনতি ঘটিতেছে, তাহার উপর গোহত্যার এইরূপ বৃদ্ধি হইতে দেখিলে মনে হয়, বুঝিবা ভারতের গোধন অচিরে নির্ম্মূল হইবে।

সুখের বিষয়, অনেক স্থানেই এইরূপ গোহত্যার প্রতীকার প্রয়াস হইতেছে। কৃষিকার্য্যে উন্নতি এবং পাষণ্ডদিগের হস্তে গোহত্যা নিবারণের জন্য সংপ্রতি রায়পুরে একটী কৃষি ও গোরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উক্ত সভার সদস্যগণ, এই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তত্রত্য ডেপুটী কমিশনর মিঃ নেপিয়র মহোদয়কে জানাইয়াছিলেন। তাহাতে ডিপুটী কমিশনর মিঃ নেপিয়র বাহাদুর গোহত্যার প্রতিকারে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং পাঁচশত টাকা চাঁদা দিয়া আপনার বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গোহত্যার প্রতীকার কল্পে এ পর্য্যন্ত উল্লিখিত গোরক্ষিণী সভায় সাত হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে—আরও যে অধিক চাঁদা উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলে দেশবাসিগণের চেষ্টায় ঐ অঞ্চলে গোহত্যা ইহার মধ্যেই অনেক কমিয়াছে। কসাইকে আর কেহ গোরু বিক্রয় করে না।

গোজাতির উন্নতির আর একটা অন্তরায় দেশে ষাঁড়ের অভাব। পূর্ব্বে অনেক স্থানে ধর্ম্মের ষাঁড় দেখা যাইত। তাহারা প্রায়ই লোকের গাছ পালা বা শস্যাদি নষ্ট করিয়া বেড়াইত। ইহাতে লোকের কতকটা ক্ষতি হইত বটে, কিন্তু গোজাতির বংশবৃদ্ধি, বলিষ্ঠ বৎসের উৎপত্তির দ্বারা গোবংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন প্রভৃতির দ্বারা দেশের সমূহ কল্যাণ ঘটিত। এখন ৪।৫ খানি গ্রামের মধ্যে হয় ত একটীমাত্র ষাঁড় আছে, লোকের অনিষ্ট করিবার ভয়ে তাহাকেও আবার বাঁধিয়া রাখিত হয়। বাঁধা জাব খাইয়া এবং স্বেচ্ছা বিচরণ করিতে না পাইয়া ষাঁড়টী বিলক্ষণ দুর্ব্বল হয়। এদিকে ৪।৫টী গ্রামের গোবংশ-বৃদ্ধি সেই ষাঁড়টীর উপর নির্ভর করে। ইহাতে গোবংশের ক্রমোন্নতি-সাধন অথবা ধ্বংসমুখে অগ্রসর অবশ্যম্ভাবী, পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন। বস্তুতঃ গোবংশ উন্নত করিতে হইলে, ষাঁড়গুলিকে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইবার সহায়তা করিবার জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। মোট কথা, যাহাতে লোকের অনিষ্ট না হয়, অথচ দেশে বলিষ্ঠ ষাঁড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে, তদ্বি-ষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ না করিলে, কেবল খাদ্যাদি বৃদ্ধির দ্বারা গোজাতির বংশ রক্ষা হইবে না।

যদি ৪।৫ খানি গ্রামের অন্ততঃ ৪।৫ শত গাভীর বৎসের উৎপত্তি বিষয়ে একটী মাত্র দুর্ব্বল ষাঁড়ের (না হয় ধরিলাম বলবানই হইল) উপর নির্ভর করিতে হয়, তবে তাহার ঔরসজাত বৎস কিরূপ বলবান ও দীর্ঘ-জীবী হইতে পারে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে। প্রতিগ্রামে অন্ততঃ ২।৩টী করিয়া ষাঁড় রক্ষা করিলে, আপাততঃ অনেক উপকার হইতে পারে। সেই ষাঁড় পোষণের উপায় নির্দ্ধারণ গোপালকেরা পরস্পরের সাহায্যেই করিতে পারেন। যদি প্রত্যেক গাভীর প্রতি, গোপালকেরা প্রতিমাসে দুই পয়সা হিসাবে ধার্য্য করিয়া গ্রামের মধ্যে জনৈক বিশ্বাসী মাতব্বর লোকের নিকট গচ্ছিত রাখেন, তবে ৫০০ গাভীর জন্য ১৫৸৶০ আনা আদায় হয়। এই টাকায় ৩।৪টী ষাঁড়

অনায়াসে পুষিতে পারা যায়। এই ষাঁড়পোষা সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা রহিল, বারান্তরে বলা যাইবে।

কলিকাতার গোয়ালারা বৎস জন্মিবার কিছুদিন পরেই বৎসটীকে হত্যা করে এবং ফুঁকার সাহায্যে দুগ্ধ বাহির করিয়া লয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে গোবংশ-বৃদ্ধির সম্বন্ধে বিশেষরূপে অনিষ্ট হইতেছে। সুখের বিষয়, এই সর্ব্বনেশে প্রথার কথা কলিকাতা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে শুনা যায় না। তবে পাছে কলিকাতার দেখা-দেখি অন্য কোন স্থানে ইহার প্রচলন হয়, সে বিষয়ে সতত লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

ক্রমে বঙ্গদেশে যে গোজাতির অবনতি হইতেছে, ইহা কর্ত্তৃপক্ষকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। কি কি কারণে বঙ্গদেশে গোজাতির অবনতি হইতেছে, তাহা ১৯০১-২সালের সরকারি রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায়। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য সরকারি রিপোর্টের মর্ম্মাবলম্বন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। রিপোর্টের মর্ম্ম এইরূপ :—

উত্তর বঙ্গের কয়েকটি জেলা ব্যতীত খাস বাঙ্গালায় আর কোথাও গোজাতির অবস্থা ভাল দেখা যায় না। সাধারণতঃ যে সকল গোরু তথায় দেখা যায়, উহারা দুর্ব্বল এবং খর্ব্বকায়। ঐ সকল স্থানের অবস্থাও প্রকৃষ্টরূপে গোপালনের পক্ষে তেমন উপযোগী নয়। গোপালনের প্রতি লোকেরও তেমন চেষ্টা নাই। এঁড়ে বাছুরগুলিকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া পুষ্ট করিয়া ভাল ষাঁড় প্রস্তুত করণ, অথবা অন্য স্থান হইতে ভাল ষাঁড় আনাইয়া গোবংশের উন্নতি সাধন, ইত্যাদি বিষয়ে গোপালক গৃহস্থদের চেষ্টা ও আগ্রহ কম। অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্মের ষাঁড়দ্বারাই প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। ভূমিকর্ষণ, গাড়ী টানা প্রভৃতি কার্য্য প্রধানতঃ দামড়া গরু দ্বারাই ভাল হইয়া থাকে, সেজন্য ষাঁড় অপেক্ষা দামড়ার মূল্যও অধিক। গো-ব্যবসায়ীরাও বেশী লাভবান হইবার আশায় এঁড়ে বাছুরগুলিকে অধিকাংশ স্থলে দামড়াই করিয়া দেয়। তাহাতে দেশে ষাঁড় কম জন্মে। পরন্তু গোজাতির উন্নতি সাধন কল্পে ভাল ষাঁড় প্রস্তুত করিবার কল্পনাও অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। ইহাই এদেশে গোজাতির অবনতির একটী প্রধান কারণ।

কোর্ট অফ ওয়ার্ড এবং জেলা বোর্ডের তরফ হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ভাল ষাঁড় আনাইয়া গোজাতির উন্নতি চেষ্টা হইয়া থাকে। অনেক জমিদারও আপনাদের গোরুর অবস্থা উন্নত করিবার জন্য ঐরূপ ষাঁড় আনাইবার ব্যবস্থা করেন। পাটনার অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ এবং পাটনার জেলা বোর্ড বিলাতী ষাঁড় আনাইয়াছেন। জমিদার প্রভৃতিরা যে ভাল ষাঁড় আনাইয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য সকল স্থলে সাধারণ গোজাতির উন্নতিসাধন নহে, দুধের পরিমাণ যাহাতে বেশী হয়, এই অভিপ্রায়ে অনেক স্থলে তাঁহারা ঐ কার্য্য করিয়া থাকেন।

গোপালনের একটা বিশেষ প্রণালীসিদ্ধ ব্যবস্থা দেশের কুত্রাপি নাই। গোরু চরিবার উপযুক্ত তৃণ-ক্ষেত্রও প্রচুর পরিমাণে কোথাও দেখা যায় না। বাছুরগুলির অবস্থা সাধারণতঃ অতিশয় শোচনীয়। উহাদিগকে কতকটা অনশনেই রাখা হয়। দিবাভাগে এখানে ওখানে যাহা খুঁটিয়া পাইল তাহাই খাইল, রাত্রিতে গোয়ালে আটক পড়িল। অধিকাংশ গোয়ালের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। খাটাইবার সময়ে বলদগুলিকে খোল বিচালি ভুষি কলাই খাইতে দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু ক্ষেত্রের কাজ যখন না থাকে, তখন তাহাদের খাওয়াইবার জন্য আর ততটা যত্ন থাকে না। সময় বিশেষে উহাদের খাটুনিও অতিরিক্ত হয়। কোন কোন অঞ্চলে আবার গরিব কৃষকেরা গাভীর দ্বারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে।

গোজাতির যে অবনতি হইতেছে ইহার কারণ প্রধানতঃ গোরুকে যথেষ্ট পরিমাণে আহার দেওয়া হয় না; গোচারণ স্থান প্রয়োজনমত নাই; অপকৃষ্ট ষাঁড় সহযোগে বৎসের উৎপত্তি; বাছুর ও বকনাকে ভাল করিয়া খাইতে দেওয়া হয় না, বেশ সতেজ এঁড়েগুলিকে দামড়া করিয়া দেওয়া হয়।

যাহা হউক কর্ত্তৃপক্ষের যখন বঙ্গদেশের গোজাতির অবনতির প্রতি দৃষ্টিপাত হইয়াছে, তখন কি উপায়ে এ দেশে গোজাতির উন্নতি হইতে পারে, এই সময় তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিলে গোজাতির সমূহ উন্নতি সাধিত হওয়াই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি

বাঙ্গালী মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়।

কোথায় বিংশ শতাব্দীর উন্নতি আর কোথায় আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য। ইহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জীবন চরিত, অর্থনীতি, সমাজনীতি কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পাদিবিষয়ক গ্রন্থ কি আছে? সাহিত্য লইয়া আমাদের গৌরব করিবার কি আছে? জগতের কাছে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখাইবার কি আছে? গৌরবের কথা ছাড়িয়া দাও শুধু বাঙ্গালাগ্রন্থ পড়িয়া কি বাঙ্গালীর ছেলে পণ্ডিত হইতে পারে? তাড়িতালোকের কাছে মাটির প্রদীপ যেরূপ, অপর সাহিত্যের কাছে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যও সেইরূপ টিম্ টিম্ করিতেছে। জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি ভিন্ন জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে এটি যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন ত আসুন মাতৃভাষার সেবাকল্পে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে নিজ নিজ শক্তি সামর্থ নিয়োগ করুন।

মাতৃভক্ত বঙ্গসন্তান যদি কেহ উপরিউক্ত শাস্ত্র গুলির কোনটিতে কোন গ্রন্থ প্রকাশের বাসনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে গ্রন্থ প্রকাশযোগ্য হইলে আমরা নিজের খরচায় তাহা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

কবিতা কিম্বা নাটক নভেল সম্বন্ধে এ বন্দোবস্ত নহে।

জি সি বসু এণ্ড কোং,
৬৩ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[১৮৭৯ সালে স্থাপিত]
আজ ২৫বৎসর যাবৎ বিশেষ সুখ্যাতি ও সততার সহিত

বসু প্রেশে

জি, সি, বসু এণ্ড কোং

কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। এখানে ইংরাজী, বাঙ্গলা, নাগরী, এই তিন প্রকার অক্ষরে সকল রকম পুস্তক, ও সকল প্রকার জবওয়ার্ক বিশেষ যত্নের সহিত সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে ছাপা হইয়া থাকে। এখানে অক্ষর নূতন, ছাপা পরিষ্কার।

ঠিকানা—৬৩ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যবসায়ের মূলসূত্র।

ব্যবসা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা।

অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় ব্যবসায়ও একটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা। ঐকান্তিক একাগ্রতা কঠোর সাধনা এবং অবিচলিত অধ্যবসায় ছাড়া কোন বিদ্যা শিক্ষার আর কোন সহজ উপায় নাই। ব্যবসা শিক্ষার পক্ষেও তাই। যাঁহারা ব্যবসাকে সহজ বিবেচনা করেন তাঁহাদের ভুল—প্রকাণ্ড ভুল। এ বিদ্যা আবার পুঁথিগত নহে, ফলিত বিদ্যা; ইহা শিখিতে গেলে কায়, মন, বাক্য এ তিনটিই নিয়োগ করিতে হয়, তবে এ বিদ্যা স্ফূর্ত্তি পায়।

উপরে বলিয়াছি ব্যবসা একটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা। এ বিদ্যার মূল সূত্র গুলি কি, এ প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

উদ্দেশ্য।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ধন লাভ। যে জিনিসের মূল্য আছে, অর্থাৎ যাহার বিনিময়ে আমরা আমাদের আবশ্যক বা ইচ্ছা মত দ্রব্য সামগ্রী পাইতে পারি তাহাকেই ধন বলে। হীরা জহরত, টাকা কড়ি, জমি জমা, কৃষিজাত ইত্যাদি আমরা সাধারণতঃ ধন শব্দে অভিহিত করি; কেননা ইহাদের একটা মূল্য আছে। ইহাদের মধ্যে আবার যে জিনিসের মূল্য অধিক তাহারই আদর অধিক। কিন্তু, ছাই মাটী, আবর্জ্জনা এমন কি বিষ্ঠা পর্য্যন্তেরও যে মূল্য আছে তাহা কয়জন জানেন? যাঁহারা ব্যবহার অবগত তাঁহারা জানেন যে এ গুলিও হীরা জহরতাদি অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে। ফলে, জগতে এমন কোন জিনিস দেখিতে পাইবে না যাহার কোন মূল্য নাই বা যাহা কোন প্রয়োজনে আইসে না। কমলার পাঠকগণ ক্রমশঃ দেখিতে পাইবেন যে আমাদের পায়ের নীচে এবং আশে পাশে অগণিত ধনরাশি ছড়ান আছে, দেখিতে জানিলে এবং কুড়াইয়া লইতে পারিলেই তাহা পাওয়া যায়। নচেৎ যেমন বানরের কাছে রত্নহার তেমনি অজ্ঞ ও অক্ষমের কাছে রত্নের খনি এই বিশাল জগৎ। কোন জিনিসের ধ্বংস নাই উহা যেমন বিজ্ঞানের কথা, তেমনি কোন জিনিস যে নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন নহে ইহাও একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। জগতের

সকল জিনিসেরই প্রয়োজন এবং মূল্য আছে, সুতরাং সকল জিনিসই যে ধনপদবাচ্য ইহা একটি ধ্রুব সত্য।

দ্বিতীয় কথা **লাভ**। লাভ শব্দের অর্থ প্রাপ্তি ও ভোগের অধিকার। সমুদ্রগর্ভে ডুব দিয়া হাঙ্গর কুমিরের মুখ হইতে ডুবুরি যে রত্ন সংগ্রহ করিতেছে সে রত্ন লাভ করে কে? গ্রীষ্মের রৌদ্রে পুড়িয়া, বর্ষার জলে ভিজিয়া, শীতের হীমে কাঁপিয়া চাষা যে শস্য উৎপন্ন করে তাহার কয় আনা তাহার ভোগে আইসে? সুতরাং কোন জিনিষ লাভ করার অর্থ তাহা পাওয়া চাই, রক্ষা করা চাই এবং তাহার ভোগের অধিকার চাই।

কি কি প্রয়োজন।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ধন লাভ। ধন কি এবং লাভ কি বুঝিলাম। কিন্তু ধনের সন্ধান করা এবং লাভের উপায় করা বড় সোজা কথা নহে। ইহাতে **জ্ঞান** ও **সামর্থ** উভয়ের প্রয়োজন। কিসে কি হয়, কোথায় কি পাওয়া যায়, কোন্ জিনিস কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, কেমন করিয়া তাহা কাটাইতে হয়, তাহা সম্যক্ জানা চাই, আর তাহা করিতে গেলে যে টুকু শক্তি বা সামর্থ বা আয়োজন চাই তাহা থাকা আবশ্যক। শিক্ষা ব্যতিরেকে এই জ্ঞান বা সামর্থ লাভের উপায় নাই, সুতরাং **শিক্ষাই** ব্যবসায়ের মূল। এই শিক্ষা কায়িক, মানসিক ও বাচনিক।

ইংরেজ রাজত্বে আমাদের সামাজিক এবং আর্থিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটিয়াছে। প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ জাতি দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে—কেবল বাঙ্গালি বলি কেন, দুর্ব্বল ভারত বাসীকে একবারে চাপা দিয়া ফেলিয়াছে। পেটে এক মুঠা অন্ন দিব তাহা ইংরাজ নহিলে হইবে না; ইংরাজের লোহা নহিলে লাঙ্গল গড়া হইবে না, সুতরাং ধান চাষ হইবে না। একটুক নুন নহিলে সে অন্ন মুখে দেওয়া যায় না, কিন্তু সে নুনটুকু ইংরাজের লিবারপুল হইতে খরিদ করিতে হইবে। লজ্জা নিবারণের জন্য একটুক কাপড় কোমরে দিব, তাহা ম্যাঞ্চেষ্টা-রের কলে, ইংরেজ কারীকরে তৈয়ারী করিয়া ইংরাজের জাহাজে আনিয়া এখানে ইংরেজ বণিকে বেচিবে। একটা রোগ হইলে ইংরেজের ঔষধ না খাইলে মরিব। প্রতি পদে, আমাদের সাংসারিক প্রত্যেক ক্ষুদ্র কার্য্যে ও আমাদিগকে ইংরাজের হাত ধরিয়া চলিতে হইবে—কেন না আমরা একবারে সম্পূর্ণ অসহায়। এমন বিচিত্র ব্যাপার কেহ কখন দেখিয়াছে কি? জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কাণ্ড কি, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে আমি অসংকোচে বলিব ত্রিশ কোটি ভারত বাসীর এইরূপ শোচনীয় সম্পূর্ণ নিঃসহায় অবস্থা অপেক্ষা আর কিছু আশ্চর্য্য নাই। এখন ভারত-বাসীর যেরূপ অসহায় অবস্থা, জগতের কোন যুগে কোন জাতির সেরূপ ছিল না।

এ অবস্থা কি চিরকাল ছিল? এক শত বৎসর পূর্ব্বে দেখি ভারতবাসী ইংরাজের সহিত সমানে সমানে যুজিতেছে;—রণক্ষেত্রে, বাণিজ্যের হাটে, শিল্পকার্য্যে ইংরাজের সহিত ভারতবাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। পরে ক্রমশঃ ইংরাজের প্রসর বৃদ্ধি, আর ভারতবাসী একে একে সর্ব্বত্র হটিয়া এখন একবারে সম্পূর্ণ কোণঠেসা। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কেহ কি কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন? সন্ধান করিলে দেখিবেন ইহার কারণ—**বিজ্ঞান**। কেবল বিজ্ঞান এবং উৎকৃষ্টতর শিক্ষার বলেই ইংরাজ সর্ব্বত্র জয়ী। শুধু ইংরাজ কেন,—জগতের চারিদিকে চাহিয়া দেখ যেখানে উন্নতি সেখানেই তাহার মূলে বিজ্ঞান ও শিক্ষা। জর্ম্মণি ও আমেরিকায় ইংলণ্ড অপেক্ষা বিজ্ঞানের আলোচনা এবং শিক্ষার বিস্তার অধিক, সে জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঐ দুই জাতি ইংরাজের অপেক্ষা বাড়িয়া যাইতেছে এবং ক্রমশঃ ইংরাজকে হটাইয়া দিতে আরম্ভ করিতেছে। অধিক দূর যাইতে হইবে না, ইংরেজ এখানকার রাজা হইলেও এই ভারত বর্ষের বাজারেই দেখিতে পাইবে যে জর্ম্মণ শিল্পজাত দ্রব্যে ইংরাজের শিল্পজাত প্রায় চাপা পড়িয়াছে।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, ইংরাজের প্রতাপ এবং বিজ্ঞান তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বাঙ্গলা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের ফৌজকে বন্দুক ছাড়িয়া কোদাল ধরিতে বা মোট ঘাড়ে করিতে হইয়াছে। তাহার পর গবর্ণমেণ্টের নুন একচেটিয়া; দেশে ক্রমশঃ লবণ প্রস্তুত বন্ধ হওয়ায় লবণ ব্যবসায়ীরা পথে বসিয়াছে, তাহার পর মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল—তাঁতিকুল একবারে নির্ম্মূল। তাহার পর বিদ্যুৎগতিতে ইংরাজের

বিজ্ঞান চলিয়াছে এবং আমরা বিদ্যুৎ গতিতে দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছি। আবহমান প্রচলিত ব্যবস্থা উল্টা পাল্টা হইয়া যাওয়ায় দেশের সকল লোকেই বেকার, সকলেই ভেবাচেকা লাগিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ ভাঙ্গিয়াছেন এবং ভাঙ্গিতেছেন, কিন্তু ইংরাজ রাজা নূতন কিছু গড়িতেছেন না—দেশের লোক নিজের পথ নিজে না দেখিলে উপায় নাই। রাজা যদি নিজের কর্ত্তব্য না করেন তবে প্রজাকে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমরা ব্যবসার কথা বলিতে গিয়া বড় বড় প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিলাম। তাহা অপ্রাসঙ্গিক নহে। রোগের প্রকৃত নিদান না জানিলে প্রতিকার হইতে পারে না। দেশের প্রকৃত অবস্থা না বুঝিলে ব্যবস্থা হইবে কি রূপে?

ব্যবসা ছোট বড় সকল রকম আছে; তাছাড়া ব্যবসার সহস্র দ্বার। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকলই ব্যবসায়ের অন্তর্গত, সুতরাং বড় কথার অবতারণা নিষ্ফল বা নিষ্প্রয়োজন নহে। বড় ব্যবসা বড় আয়োজন আবশ্যক, ছোট ব্যবসায় অল্প আয়োজনেই চলে। কিন্তু ছোট হউক বড় হউক সকল ব্যবসায়ের মূল সূত্র একই।

শিক্ষা।

ব্যবসায়ের প্রথম প্রয়োজন **শিক্ষা**। ছোট হউক বড় হউক, কৃষি হউক শিল্প হউক বাণিজ্য হউক, ব্যবসা যেরূপই হউক না কেন, যিনি যাহা করিবেন তাহার সম্যক শিক্ষা চাই। শুধু ভাসা ভাসা জ্ঞান থাকিলে হইবে না, হাতে কলমে ভালরূপ শিক্ষা চাই। আমাদের দেশে ব্যবসা করিতে গিয়া অনেক ভদ্রলোক যে ঠকিয়াছেন তাহার কারণ শিক্ষার অভাব। ব্যবসার কোন জ্ঞান নাই, কখন ব্যবসা করিলাম না, পরের কথা শুনিয়া বা প্রতিবেশী একজনের উন্নতি দেখিয়া বা নিজের খেয়ালে একটা ব্যবসায়ে নামিলাম, ঠকিব না ত কি? আমাদের দেশে চাকরীর পথ ছাড়া যে যুবকবৃন্দ অন্ধকার দেখে, তাহার মূল কারণ শিক্ষার অভাব। পূর্ব্বে দেশে প্রায় সকলেই নিজ নিজ জাতিব্যবসায় করিত, কুমারের ছেলে কুমারেরই কাজ করিত, কামার কামারের, কাঁসারি কাঁসারির ইত্যাদি সকল জাতিই পৈতৃক ব্যবসায়ে ব্রতী ছিল। কোন বিষয়ের শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হইত,—শুধু বাল্যকাল বলি কেন, শিক্ষা বংশানুক্রমে হইত। এখন সমস্ত উল্টা পাল্টা হইয়া গিয়াছে। এখন কামার কুমার ছুতার ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেরই দশা এক হইয়াছে। এখন কামারের কাজে কামারের ছেলে আর কায়স্থের ছেলের সমান পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছে। দুজনেই সমানরূপ নাচার।

এদেশে বিদ্যালয়ে তিনটি ব্যবসা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে—ওকালতি, ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারি। ইহাতে কামার কুমার ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে—যে মন দিয়া শিখিতেছে সেই দু পয়সা করিতে পারে। কিন্তু এই তিনটি সংকীর্ণ পথে এত লোকের ঠেলাঠেলি হইয়াছে যে আর নূতন পথ বাহির না করিলে চাপে লোকে মরিয়া যাইবে। যাহাদের গোড়ায় একটু বিশেষ রস নাই তাহাদের পক্ষে এই ব্যবসায় গুলিতে প্রবৃত্ত হওয়াই এখন প্রকাণ্ড মূর্খতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর এ সমস্ত ব্যবসায়ে অর্দ্ধেক পথে আটকাইয়া গেলে একবারে সকল দিক মাটী। না এদিক না ওদিক। এরূপ অবস্থায় যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

গবর্ণমেণ্টের এ অঞ্চলে একটি মাত্র কলা শিল্প বিদ্যালয় আছে, তাছাড়া আর কয়েকটি নূতন পথ খুলিয়াছেন, যথা—বন বিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয়, পশু চিকিৎসালয়। কিন্তু এগুলিতে সাধারণ লোক এখনও বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই, আর হইলেও এগুলিতে কত লোকের সমাবেশ হইবে? দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট ছাড়া দেশের লোকের এবিষয়ে উদ্যোগ কিছুই দেখা যায় না।

জর্ম্মনি ও আমেরিকায় শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টিপাত, গবর্ণমেণ্ট প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন, এবং সে জন্য এই দুই জাতি জগতের সকলের অপেক্ষা দ্রুত গতিতে উন্নতি করিতেছে। আমাদের রাজজাতি ইংরাজই তাঁহাদের সহিত পাল্লায় ক্রমশঃ হটিয়া যাইয়া এখন ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, আমরা ত কোন ছার। গবর্ণমেণ্ট ছাড়া ঐ দুই দেশের লোকের উদ্যম যত্ন ও অধ্যবসায় দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

আমাদের দেশে যা ছিল তা নাই, যা আবশ্যক

তাহার কোন চেষ্টা বা উদ্যোগ নাই। গবর্ণমেণ্ট বিদেশী, তাঁহাদের স্বার্থ প্রজার স্বার্থের সহিত এক নহে, সুতরাং তাঁহাদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, স্বাবলম্বন চাই। এখন দেশের লোক সকলকেই নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া এবং পরস্পরে মিলিয়া এক যোগে কার্য্য করিতে হইবে, নচেৎ উপায় নাই।

একটা ডাক্তার হইতে বা উকীল হইতে বা ইঞ্জিনিয়ার হইতে যে পরিমাণ পরিশ্রম, টাকা ও সময়ের আবশ্যক, সেই পরিমাণ পরিশ্রম টাকা ও সময় ব্যয় করিলে যে কোন ব্যবসায়ে পারদর্শিতা লাভ করা যাইতে পারে এবং সে ব্যবসায়ের আয় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের আয় অপেক্ষা কম নহে। পুঁথি বাড়িয়া যায়, নচেৎ আমরা এবিষয় খতাইয়া লোককে দেখাইতে পারিতাম। তবে হিসাব জটিল নহে, যে কেহ খতাইয়া দেখিতে পারেন।

বিলাতে ছেলেদের ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প শিখাইতে হইলে অভিভাবক তাহাদিগকে শিক্ষিতব্য স্থানে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিয়া দেন। এই শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিতে যথেষ্ট পয়সা খরচ হয়। ঘরের পয়সা দিয়া বেগার খাটিয়া তবে লোককে কোন শিল্প বা ব্যবসায় শিখিতে হয়। আমাদের দেশেও সেকালে অনেক কাল চেলা গিরি করিয়া অনেক সাধ্য সাধনা সেবা শুশ্রূষার পর গুরু অথবা ওস্তাদের নিকট হইতে বিদ্যা আদায় করিতে হইত; সহজে কেহ কাহাকে বিদ্যা শিখাইত না; অনেক বিদ্যা আবার কেহ দ্বিতীয় ব্যক্তি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তিকে শিখাইত না। আমরা কিন্তু এখন সব ভুঁইফোড় ব্যবসাদার বা শিল্পী হইতে চাই। কাগজে দেখিলাম এই ব্যবসায়ে অমুক বিশেষ লাভ করিয়াছে, অমনি গোটাকতক টাকা খরচ করিয়া অনুষ্ঠান পত্র ছাপাইয়া একটা ব্যবসা জাহির করিলাম; ফল?—যাহাতে হাত দিলাম তাহাতে পুনরায় হাত দেওয়া ২০ বৎসর পিছাইয়া দিলাম। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় কতগুলা সদনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার কি হইল, কোথায় গেল? ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, ম্যাচ ফাক্টরি, গ্লাস ফাক্টরি প্রভৃতির দশা কি হইল? দেখিয়া শুনিয়া কি সহজে লোকে ঐরূপ কার্য্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হইতে চান? যদি কেহ এই সকল কার্য্য নষ্ট হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে তন্মধ্যে কারণের মধ্যে **শিক্ষার অভাবই** একটি প্রধান। যাঁহাদের হাতে কার্য্যভার পড়িয়াছিল তাঁহারা তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না।

আমরা আর একটু আশ্চর্য্য এই দেখি যে কোন চাকরীর জন্য লোকে ২।৩ বৎসর এপ্রেণ্টিশী করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ব্যবসায় শিক্ষার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করিতেও নারাজ।

ইংরাজ রাজত্বে পুরাতন ব্যবস্থা উল্টা পাল্টা হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু এখনও সমাজ নূতন করিয়া গড়ে নাই। কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য পূর্ব্বে শিল্প ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন না, তাঁহাদের সে বিষয়ে শিক্ষা আদৌ নাই। সেজন্য সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে অপর শ্রেণী অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিলেও শিল্প বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এজন্য সহজে তাহাতে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন না। সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, তিলি, তাম্বলি, শৌণ্ডিক প্রভৃতি জাতি এদেশে পূর্ব্বে শিল্প বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, এখনও এদেশে যে কিছু ব্যবসায় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ইঁহাদেরই মধ্যে আছে। কিন্তু আগেকার ব্যবস্থা পর্য্যুদস্ত হওয়ায় ইহাদেরও অবস্থা হীন হইয়াছে এবং দিন ২ ইহাদের অবনতি হইতেছে। আরও, ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ভালরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছেন তাঁহারা বাবু হইয়া গিয়া নিজ জাতিব্যবসায়ে বীতস্পৃহ হইয়াছেন, আর যাঁহারা ততদূর "উন্নত" হন নাই তাঁহারাও সাধারণ শিক্ষার অভাবে বর্ত্তমান শতাব্দীর উন্নতির নাগাল ধরিতে অক্ষম। যদি কায়স্থ ব্রাহ্মণাদির ব্যবসায় বুদ্ধি থাকিত, অথবা তাঁহাদের ন্যায় অন্যান্য জাতির শিক্ষার উন্নতি হইত তাহা হইলে এতদিনে দেশের শ্রী ফিরিত। এখনও যদি কেহ দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রত্যাশা রাখেন তাহা হইলে তাঁহাকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বাণিজ্যাদি শিক্ষার প্রসর বৃদ্ধি করিতে হইবে, নচেৎ উপায় নাই।

চরিত্রবল।

শিক্ষা ছাড়া ব্যবসায়ের আর একটি প্রধান উপাদান আছে। সেটি—**চরিত্রবল**। চরিত্রহীন লোকের ব্যবসায়ে কখন লক্ষ্মী হয় না। সততা, অধ্য-

বসায়, স্বাবলম্বন, মিতাচার এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এই গুলি না থাকিলে কোন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা যায় না। আমাদের দেশে যে ব্যবসায়ের উন্নতি হয় না তাহার কারণ উপরিউক্ত গুণ গুলির অভাব। যেদেশে "ব্যবসাদারী" কথার অর্থ জুয়াচুরী সে দেশে কথন ব্যবসার উন্নতি হয়? স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরাজের দোকান হইতে জিনিসপত্র কিনিতেন, লেখক একদা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দেন "বাপুহে—ইংরাজের দোকানে ঠকি তাহাতে ক্ষোভ নাই; কেন না, সেখানে সকল খরিদ্দার সমান ঠকে, কিন্তু দেশী দোকানে না ঠকিলেও কত ঠকিলাম এই ধুক্পুকুনিতে মনের শান্তি থাকে না।" কথাটার অর্থ বড় গভীর, পাঠক একটু তলাইয়া বুঝিবেন কি? আমাদের চরিত্রবল কত—লোকে আমাদের হাতে পয়সা কিম্বা কার্য্যভার দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে কি? আমরা সে বিশ্বাস রাখিতে পারি কি? কোন ব্যবসায়ী যদি দৈবক্রমে একটি বিশ্বাসী লোক পান তাহা হইলে তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতির অবধি থাকে না। দেশের লোকের টাকার অভাব নাই, খাটাইবারও অনিচ্ছা নাই; কিন্তু খাটায় কাহার হাতে,—কাহার হাতে বিশ্বাস করিয়া টাকা দিবে? আজ আমি একটি ব্যবসায়ের ফন্দি বাহির করিলাম। ফন্দিটি ব্যবসায়ের ফন্দি নহে, ফাঁকি দিয়া টাকা কুড়াইবার ফন্দি। পয়সা দিয়া জন খাটাও, তাহাতেও লোকের সততা নাই "বামুন গেল ঘর, ত লাঙ্গল তুলে ধর।" ফলে আমাদের সংসারিক এবং সামাজিক সকল ব্যাপারেই আমরা পরকে বিশ্বাস করিতে পারি না, এবং পরেও আমাকে বিশ্বাস করিতে পারে না। এরূপ স্থলে আমাদের উন্নতির আশা কোথায়? ইংরাজ জাতি যে এত বড় হইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান কর দেখিবে উহাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর কতদূর। ইংরাজের ব্যবসাও অনেক স্থলে ফেল হইতে দেখি; কিন্তু দেখিলাম এই অমুক সাহেবের আফিস ফেল হইল, আর তার পর দিন সেই সাহেবই অন্য আফিস খুলিলেন। বাজারে তাহার উপর বিশ্বাস কি ইহার কারণ নহে? ব্যবসায় ফেল হইবার কারণ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু যাহার সততার উপর সাধারণের বিশ্বাস টলে, সে কখনও পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে পারে না।

মূলধন।

ব্যবসায়ের আর একটি প্রধান উপকরণ **মূলধন।** কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতি সকল অঙ্গের ব্যবসায়ে মূলধন আবশ্যক। ব্যবসায়ের ওজন অনুসারে মূলধনের তারতম্য হইয়া থাকে। যিনি কোন ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হন সেই ব্যবসায়ের প্রয়োজনমত মূলধন তাঁহার নিজের থাকে ত ভালই, নচেৎ তাঁহাকে অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। আবার, পক্ষান্তরে যাঁহাদের হাতে টাকা সচ্ছল তাঁহারা টাকা খাটাইয়া উহা বৃদ্ধি করিতে উৎসুক। যদি টাকাটা মারা না যায় লোকের এ বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে অতি সহজেই টাকা পাওয়া যায়। এই বিশ্বাসের উপর গবর্ণমেণ্ট ৩।০ সাড়ে তিন টাকা হারে সুদ দিয়া বাজারে টাকা পান। এই বিশ্বাসের উপরই লোক বিনা সুদে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেন। অনেক কোম্পানির শেয়ারে সুদ শতকরা ৪।৫ টাকার অধিক হয় না। কিন্তু দেশী লোকের মধ্যে আদান প্রদানে টাকার সুদের হার অত্যন্ত অধিক। কারবারী লোকের মধ্যে যে টাকা আদান প্রদান হয় তাহার সুদের হার সচরাচর শতকরা ১২ টাকা হইতে ২৪ টাকা। সুদের এতটা হার বৃদ্ধির কারণ বিশ্বাসের অভাব।

ব্যবসায়ে সততা যে কত মূল্যবান তাহা এই টাকার সুদের হারেই বুঝিবে। এক বিশ্বাসের উপর সমস্ত বাজার চলিতেছে। বিশ্বাসের নড় চড় হওয়ার কারণ না থাকিলেও কত ব্যবসায় নষ্ট হয়, কত ব্যাঙ্ক ফেল হয়, তাহা আমরা চক্ষের উপর দেখিতেছি। আরও দেখিতেছি কেবল বিশ্বাসের উপর কত ভিত্তিহীন ফাঁকা ব্যবসা চলিতেছে।

বিশ্বাস ছাড়া লোভ আর একটা জিনিস যাহাতে লোকের টাকা আপনা আপনি বাহির হইয়া আইসে। স্ফূর্তি খেলায় বা জুয়াখেলায় টাকা দেওয়া এই লোভের নেশা। ১০ টাকা দিয়া লাখ টাকা মারিব, এই লোভে যে কত লোক বৎসর বৎসর কত টাকা স্ফূর্তিতে দেন তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু একটি লাভজনক বা দেশের হিতকর ব্যবসায়ে ১০ টাকা করিয়া সেয়ার খুলিয়া ইহাদের নিকট প্রাপ্ত

দেখি কয় খানা সেয়ার কিনেন ? কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্ণখনির লোভে পড়িয়া যে কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে তাহা কেহ দেখিয়াছেন কি ? মানুষের এই দুর্ব্বলতা আছে বলিয়া জুয়াচোরেরা চটক লাগাইয়া সহজেই লোকের নিকট টাকা বাহির করিতে পারে, আর ধর্ম্মভীরু লোক মোটেই সেখানে অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং কোন ব্যবসায়ে মূল ধন সংগ্রহ করা বড় কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে।

ব্যবসায়ের প্রয়োজন অনুসারে মূলধন সংগ্রহ যেরূপ আবশ্যক, সংগৃহীত মূলধনের পরিমাণ অনুসারে ব্যবসায় চালানও সেইরূপ আবশ্যক। ওজন ছাড়া চলিলেই পদে পদে বিপত্তি। ভিত্তি দৃঢ় করিয়া অল্প অল্প গাঁথুনি ভাল, কিন্তু আলগা গোড়ার উপর হুড়াহুড়ি করিয়া ঠাট খাড়া করা আদৌ যুক্তি সিদ্ধ নহে, কেন না তাহার পতন অনিবার্য্য।

সময়।

ব্যবসায়ে সাফল্যের পক্ষে আর একটি প্রয়োজন **সময়।** বীজটি পুতিয়া তদ্দণ্ডে ফল প্রত্যাশা করা যেমন অসম্ভব, ব্যবসা আরম্ভ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সাফল্য প্রত্যাশা করাও তদ্রূপ অসম্ভব। কৃষি বল, শিল্প বল, দোকানদারী বল, বাণিজ্য বল, সকল ব্যবসাই সময়সাপেক্ষ। কিছু কাল টিকিয়া না গেলে কোন ব্যবসায়েরই স্থায়িত্ব প্রত্যাশা করা যায় না। সকল প্রকার ব্যবসায়েরই যেমন একদিকে লাভের সম্ভাবনা আছে তেমনি লোকসানের সম্ভাবনা আছে ; সুতরাং সকল ব্যবসায়েই যেমন একদিকে গড়ে তেমনি আর এক দিকে ভাঙ্গে। জমা খরচ খতাইয়া জমার দিকে বাড়িতে থাকিলেই সেই ব্যবসায়ের উন্নতি বলিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, লাভ খতাইবার সময় অনেক হিসাব করিতে হয়—(১) মূলধন বজায় আছে কি না এবং তাহার সুদ পোষাইতেছে কি না, (২) যে লাভ দেখিতেছি, সেটা কাগজ কলমে থাকিতেছে বা বাস্তবিক তহবিলে আসিতেছে, (৩) বাজারের দেনা দিবার এবং বাজারসম্ভ্রম বজায় রাখিবার শক্তি আছে কিনা, (৪) আমি যে ব্যবসার জন্য গতর খাটাইতেছি তাহাতে আমার পারিশ্রমিক পোষাইতেছে কি না, (৫) আমি যে লোকজন খাটাইতেছি তাহারা পুরা পারিশ্রমিক পাইতেছে কি না এবং তাহারা সুখে আছে কি না, ইত্যাদি। অনেকে ব্যবসা ফাঁদিয়াই কাগজ কলমে লাভ খতাইয়া ধুমধাম আরম্ভ করেন, বা নিজের পেট চালাইবার জন্য অথবা সংসার খরচের জন্য বাধ্য হইয়া খরচ করিতে বসেন। ক্রমে কিছু দিন পরে দেখা যায় পুঁজি ফুরাইয়া আসিতেছে। এই বিপত্তি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। তা ছাড়া প্রায় সকল ব্যবসায়েই উহার প্রয়োজনের জন্য যে সমস্ত জিনিস পত্র বা উপকরণাদি খরিদ করিতে হয়, অধিকাংশ স্থলে তাহার মূল্য একবারেই মাটিয়া যায়। যে জিনিস ১০০৲ টাকায় খরিদ করিবে তাহা বিক্রয় করিতে হইলে ৫০৲ টাকা পাওয়া যায় ত বাপের ঠাকুর—সময়ে সময়ে ৫৲ টাকা পাওয়াও দুর্ঘট হইয়া উঠে। এ ব্যাপার সকলের চখের উপর দুবেলা ঘটিতেছে, সুতরাং উহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

কাগজে কলমে লাভ এবং তহবিলে আমদানী লাভ দুইটী স্বতন্ত্র জিনিস। বাজারে আমার ২০০০ টাকা পাওনা আছে, যতক্ষণ উহা হস্তগত না হয় ততক্ষণ তাহার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা জানেন যে ব্যবসায়ের পাওনা টাকা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, উহা স্বপ্নের ন্যায় অলীক ; কিন্তু দেনাটা ধ্রুব সত্য। যাঁহাদের এ জ্ঞান টুকু জন্মে নাই তাঁহাদের দ্বারা কোন ব্যবসা চলিবে না। যাঁহারা ব্যবসাদার নহেন তাঁহারা যদি কোন নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে চান তাহা হইলে এই তত্ত্বটুকু শিখিয়া রাখুন, নচেৎ ঠকিবেন।

তাহার পর বাজারের দেনা দিবার শক্তি না থাকিলে সে ব্যবসায়ের ভিত্তি দৃঢ় হয় না। কারবার বিশ্বাসের উপর চলে, সে বিশ্বাস একবার টলিলে আর রক্ষা নাই। যদি কোন গতিকে বাজারের সকল পাওনাদার এক সময়ে চাপিয়া ধরে তাহা হইলে কারবার রক্ষা করা দুষ্কর। যদি সে চাপ সহ্য হয় তবেই জানিবে সে কারবার পর্ব্বতের ন্যায় অটল।

তাহার পর নিজের পারিশ্রমিক। এটা বড় শক্ত কথা। এ দুনিয়ায় কেহ ছোট হইতে চায় না, সুতরাং আমি যে একটা মস্ত লোক এটা স্বতঃসিদ্ধ। আমি একটা কারবার করিতেছি সুতরাং আমিও রামদুলাল সরকার বা দুর্গাচরণ লাহার চালে কেন

না চলিব? এই গোলেই সমস্ত মাটী হইয়া যায়। লোকে নিজের ওজন না বুঝিতে পারিলে কোন কার্য্যেই সাফল্য লাভ অসম্ভব। যাহার ১০৲ টাকার মুরদ নাই, যিনি অন্য কোন উপায়ে ১০৲ টাকা রোজকার করিতে অক্ষম, তিনি যদি ১৫৲ টাকার আশা করেন তাহা হইলে চলিবে কেন? নিজের ওজন ঠিক রাখিয়া চলিতে পারিলে কখনও কারবার নষ্ট হয় না।

পারিশ্রমিক ছাড়া নিজের অভাব পূরণও আছে। আমার যাহা যাহা অভাব তাহা পূরণ করিতেই হইবে। এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে মানুষের অভাবের সীমা নাই, সকল বিষয়ের অভাব পূরণ জগতে হওয়া অসম্ভব, অতএব কোন কারবারে তাহা প্রত্যাশা করাই অন্যায়। কারবারের আয় বুঝিয়া খরচ না করিলে কারবার চলে না।

কারবারে নিজের সুখটুকু যেমন দেখা আবশ্যক, যাহাদের পরিশ্রমে এবং যাহাদের প্রসাদে কারবার চলে তাহাদের সুখ সাচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখা ততোধিক আবশ্যক। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ফলে এত দিক বজায় থাকিলে তবে কারবারটি বজায় থাকিবে। এ সমস্ত কি এক দিনেরকর্ম্ম? বহু দিনের সহিষ্ণুতা, বহু দিনের অধ্যবসায়, বা বহু দিনের সাধনা ব্যতীত কোন ব্যবসায়ে কৃতিত্ব লাভ হয় না। আমরা রামদুলাল সরকার বা দুর্গাচরণ লাহার নামোল্লেখ করিলাম—শুধু তাঁহারা কেন অন্য যে কোন কৃতী কারবারীর নাম কর না, তাঁহাদের জীবন চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে রাতারাতি কেহ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই. কত উঠতি কত পড়তির পর, কত সহিষ্ণুতা কত অধ্যবসায় কত বুদ্ধি খরচ কত সাধনার পর তাঁহারা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

উপরে যাহা বলিলাম তাহার সার এই—এ জগতে কুটা গাছটিরও মূল্য আছে এবং আমাদের আশে পাশে ধনরত্ন ছড়ান আছে, কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হয়। কিন্তু কুড়াইবার পক্ষে—(১) কিসে কি হয় তাঁহার জ্ঞান ও শিক্ষা চাই, (২) চরিত্র বল থাকা চাই, (৩) সামর্থ এবং মূল ধন চাই, (৪) সময় চাই।

মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

শুপারি লাগিলে বিলঘুঁটিয়া বা ঘুটিয়ার গন্ধ লইলে অথবা শীতল জল পান করিলে কিম্বা কিছু লবণ খাইলে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হওয়া যায়।

শিঙ্গী মাছের বিষে কষ্ট পাইলে যব চূর্ণ (বার্লি)ও গব্য ঘৃত মাখিয়া পিণ্ড করিবে, ঐ পিণ্ড নেকড়ার পুটুলীতে করিয়া আগুনে গরম করিয়া ক্ষত স্থানে সেক দিবে।

বিছায় কামড়াইলে দষ্ট স্থানে হুঁকার কাঠ দিবে। আমড়া তার রস ঐ স্থানে দিবে। গব্য ঘৃত গরম করিয়া সৈন্ধবের সহিত মিলাইয়া ঐ স্থানে দিবে।

বোল্‌তায় কামড়াইলে, তুলসী পাতার রস কামড়ান স্থানে দিবে, অথবা টাটকা গোবর ঐ স্থানে দিবে, অথবা এক কোয়া পিঁয়াজ মধ্যে কাটিয়া কাটা মুখ দিয়া ক্ষত স্থান ঘষিবে।

কাটা ঘায়ে দুর্ব্বা চিবাইয়া তাহার সহিত কলিচুণ মিশাইয়া ঘায়ের উপর দিয়া ২।৩ দিন বাঁধিয়া রাখিবে। কাটা ঘায়ের রক্ত বন্ধ করিতে হইলে, নোনা পাতা বাটিয়া ঘায়ের মুখে দিয়া বান্ধিয়া রাখিবে।

কেহ মদ্য পান করিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইলে দুই তোলা চিনি আধ পোয়া দুধের সহিত মিশাইয়া পান করাইলে, মত্ততা দূর হইবে। কেহ ধুতুরার বীজ খাইয়া মত্ত হইলে তাহাকেও উপরি লিখিত মুষ্টিযোগ ব্যবহার করাইলে, তাহার মত্ততা দূর হইবে।

শ্বেত রজনীগন্ধফুলে হিক্কা বন্ধ হয়। একটী ফুল বাটিয়া জলে গুলিয়া লইয়া সেই জল তিন চারি বার সেবন করাইতে হয়। অধিক সেবন করাইলে বমি হয়।

একজন বড় ডাক্তার নাকদিয়া রক্তপড়ার এইরূপ মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করেন। কোন জিনিষ চিবাইবার সময় যেরূপ চোয়াল নাড়িতে হয়, সেইরূপ করিয়া জোরে চোয়াল নাড়া আবশ্যক। এইরূপ চোয়াল নাড়িলে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ছোট ছেলের নাক দিয়া রক্ত পড়িলে একটু কাগজ লুটি পাকাইয়া তাহাকে চিবাইতে দিবে।

পাথুরে কয়লা।

১

উৎপত্তি, স্বরূপ ও জাতিধর্ম্ম।

পাথুরে কয়লা সকলেই দেখিয়াছেন। তাহার রং কালো, হাত দিলে হাত ময়লা হয়, কাপড়ে লাগিলে কাপড় ময়লা হয়; সৌখীন বাবুরা তাহা স্পর্শ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন, কিন্তু মানুষের এমন প্রয়োজনীয় সামগ্রী আর আছে কি না সন্দেহ। এই কদাকার বস্তুটির ন্যায় মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি এবং সভ্যতা বিস্তারের সহায় আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই।

যাহার রূপের চটক নাই, এমন বস্তু গুণে টেক্কা দেয়, প্রকৃতির এ এক বিচিত্র ব্যাপার। লোহা দেখ, সোণা রূপার ন্যায় ইহার রূপের ছটা নাই কিন্তু সোণা রূপা অপেক্ষা কত গুণে ইহা মানুষের প্রয়োজনে লাগে। তামাও সৌন্দর্য্যে লৌহ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কার্য্যকারিতায় ইহার সমকক্ষ নহে। প্রকৃতির এ বৈচিত্র আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাই। যে পাখিটি গানে প্রাণ মাতোয়ারা করে সেত তেমন রূপবান্ নহে, যে ফুলটি নিজ গন্ধে দিক আমোদ করে তাহার ত রূপের ছটা তেমন নাই, আর ঐ যে সুপুরুষটি দেখিতেছ, তাহার মুখের অনুরূপ হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ত নাই। এ কয়লার রূপ কালো কিন্তু গুণে জগৎ আলো। এই এক কয়লা মানুষের রন্ধন কার্য্য করে, ঘর গরম করে, আলো দেয়, ইট পোড়ায়, এঞ্জিন চালায়, আরও সহস্র কার্য্য করে। এই এক কয়লা হইতে কত ঔষধ, কত রং এবং কত প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন হয়, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা ক্রমশঃ সে সকলের পরিচয় দিব।

প্রথমে ইহার জাতি ও বংশের পরিচয় লওয়া যাউক। কার্ব্বন বা অঙ্গার নামে যে মূল পদার্থ আছে পাথুরে কয়লা তাহারই রূপান্তর মাত্র; অঙ্গার তিন মূর্ত্তিতে জগতে বর্ত্তমান। ইহার এক মূর্ত্তি উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, বর্ণহীন, কচিৎ বা রং বিশিষ্ট স্ফাটিকগঠন (দানাদার), অতীব কঠিন, এবং জগতে রত্নের মধ্যে দুর্ল্লভ—**হীরক**। পাঠক, রত্নের সার হীরক ও আমাদের রাঁধিবার সামান্য পাথুরে কয়লা যে একই পদার্থের ভিন্ন মূর্ত্তি, তাহা কি সহজে বিশ্বাস করিবেন? রসায়ন শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উভয়েই মূলে এক পদার্থ। হীরককে তাড়িত যন্ত্রের প্রচণ্ড উত্তাপ লাগাইলে, উহা ফুলিয়া উঠিয়া কৃষ্ণবর্ণের কোক্ কয়লার মত পদার্থে পরিণত হয়। উন্মুক্ত বায়ুতে ঐ পদার্থ অঙ্গারের ন্যায় পোড়ে এবং সেই দহনের ফল অঙ্গারায় বা কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প। কয়লা পুড়িলেও সেই পদার্থ পাওয়া যায়।

যেমন একদিকে রসায়ন-বলে হীরককে কয়লায় পরিণত করিতে পারা যায়, তেমনি সম্প্রতি কৃত্রিম উপায়ে হীরকও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তবে তাহার আকার অতীব ক্ষুদ্র, আর আসল হীরকের মত তত উৎকৃষ্ট নহে।

অঙ্গারের দ্বিতীয় মূর্ত্তি **কৃষ্ণসীস**, নামান্তর প্লম্বেগো (Plumbago) বা গ্রাফাইট্ (Graphite)। এক প্রকার কৃষ্ণসীস হীরকের ন্যায় দানাদার, আর এক প্রকার ঐরূপ বিশেষ-আকার-বিশিষ্ট নহে। কৃষ্ণসীস ধূসরবর্ণ, উজ্জ্বল এবং নরম, সিংহল দ্বীপে এবং দাক্ষিণাত্যের কয়েক স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে সিংহলজাত কৃষ্ণসীস অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।

অঙ্গারের তৃতীয় মূর্ত্তি—**ভূষাকালী, পাথুরে কয়লা** এবং **কয়লা**। ইহাদের গঠন দানাদার নহে।

হীরক, কৃষ্ণসীস, এবং পাথুরে কয়লা খনিজ—আর ভূষা কালী ও কাঠের কয়লা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয়। ভূষা কালী প্রায় বিশুদ্ধ অঙ্গার।

রূপে হীরকের কাছে দাঁড়ায় কে? উহা রাজাধিরাজ এবং সম্রাড্‌গণের মস্তকে স্থান পায়, আর আমাদের মাথার মণি সীমন্তিনীগণেরও মাথায় উঠে। কিন্তু রূপে বড় হইলেও হীরক মানুষের অতি সামান্য ব্যবহারে আইসে, কেবল কাচ কাটিবার জন্য হীরকের ব্যবহার দেখিতে পাই, আর হীরক-ভস্মের কথা কবিরাজী শাস্ত্রে শুনিতে পাই। হীরক-চূর্ণ দ্বারা হীরকখণ্ডকে পালিশ করিয়া উজ্জ্বল করা হয়।

কৃষ্ণসীস রূপে হীরক অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, কিন্তু মানুষের অনেক প্রয়োজনে লাগে। কাগজের উপর কৃষ্ণসীস টানিলে কাল দাগ পড়ে। আমরা যে পেন্সিল ব্যবহার করি, উহা কৃষ্ণসীসে প্রস্তুত

হয়। বিশুদ্ধ মৃত্তিকার সঙ্গে কৃষ্ণসীস মিশাইয়া জাঁতাকলে ফেলিয়া খুব চাপ লাগাইলে জমাট বাঁধিয়া যায়, এবং এই প্রক্রিয়ায় পেন্সিলের ভিতরের সীস প্রস্তুত হয়। উপরে বলিয়াছি, কৃষ্ণসীস সিংহলে এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। পেন্সিল-প্রস্তুত প্রণালী কঠিন নহে, সুতরাং এ দেশে চেষ্টা করিলে সহজে পেন্সিলের কারখানা করা যাইতে পারে।

বারুদের উপর কৃষ্ণসীস মাখাইয়া দিলে বারুদ সেঁত্‌সেতে হয় না। লোহার জিনিসের উপর ইহা মাখাইলে মরিচা ধরে না। ঘর্ষণ নিবারণ জন্য, কলকবজার খিলে দিবার জন্য, ইহার ব্যবহার হয়। কৃষ্ণসীস উৎকৃষ্ট তাড়িতপরিচালক, সে জন্য ইলেক্ট্রোটাইপ প্রস্তুত এবং আরও অনেক প্রকার তাড়িত প্রকরণে ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণসীস ও পোড়া মাটি একত্র মিশাইয়া ধাতু গলাইবার মুচি তৈয়ারী হয়। উহা প্রচণ্ড তাপ সহ্য করিতে পারে।

অঙ্গার অনেক কাজে লাগে, ক্রমশঃ তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

তৈল, আলকাতরা, ধুনা, কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পোড়াইলে যে ধোঁয়া হয়, তাহাই ভূষা-কালী বা অঙ্গার কণা। এই সব জিনিস ভাল করিয়া না পুড়িলে তাহাদের উপাদান ভূত অঙ্গারের কিয়দংশ ধূমাকারে বাহির হইয়া যায়। পোড়া বা দহন ক্রিয়া যত ভাল হইবে, ধোঁয়া তত কম হইবে।

জুতার কালী এবং ছাপাখানার কালী প্রস্তুত করিবার জন্য ভূষা ব্যবহার হয়।

কয়লা দুই রকম। কাঠের কয়লা এবং হাড়ের কয়লা। বাতাস বন্ধ করিয়া কাঠ পোড়াইলে কাঠের কয়লা প্রস্তুত হয় এবং ঐরূপে হাড় পোড়াইলে হাড়ের কয়লা তৈয়ারি হয়। যেখানে বাতাস লাগে এরূপ স্থানে যদি কাঠ পোড়ান যায়, তাহা হইলে সমস্ত কাঠ পুড়িয়া যায়, অল্প মাত্র ছাই অবশিষ্ট থাকে। এই ছাই কতকগুলি লাবণিক পদার্থ, ইহা পোড়ে না। যাহা পুড়িয়া যায়, তাহা অঙ্গার। অঙ্গার পুড়িয়া এক বর্ণহীন অদৃশ্য বাষ্পে পরিণত হয়, তাহার নাম অঙ্গারাম্ল বাষ্প বা কার্ব্বনিক এসিড্‌ গ্যাস (Carbonic acid gas).

কয়লা মানুষের অনেক উপকারে লাগে। (১) দুর্গন্ধ দূর করিবার এবং বায়ু শোধন করিবার শক্তি কয়লার যথেষ্ট আছে। সে জন্য রোগীর ঘরে, হাসপাতালে ও অন্যান্য যে সকল স্থানে বায়ু দূষিত হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়, সেখানে দুর্গন্ধনিবারণ এবং বায়ুশোধন করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। মাছ কিম্বা অন্য জিনিস পচিবার উপক্রম হইলে, তাহা তাজা রাখিবার জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়। বাড়ির কাছে ছুঁচা, ইঁদুর, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জন্তু মরিয়া পচিলে, তাহার উপর যদি কয়লার গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আর দুর্গন্ধ বাহির হয় না।

(২) জৈবিক (Organic) পদার্থ নষ্ট করিবার শক্তি কয়লার আছে। পানীয় জলে জৈবিক পদার্থ অনেক আছে, তাহা মানুষের বহু রোগের উৎপত্তি-কারণ। এজন্য পানীয় জল শোধন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। এই কয়লা দিয়া ঐ শোধন কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু একার্য্যের জন্য যে কয়লা ব্যবহৃত হয়, তাহা সর্ব্বদা পোড়াইয়া কিম্বা বদলাইয়া লইতে হয়। নচেৎ কয়লার ভিতরে যে সমস্ত সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহা ময়লায় বুজিয়া গিয়া কয়লার এই শোধন-শক্তি নষ্ট করে। কেবল তাহাই নহে, সেই অবস্থায় কয়লার জল শোধন করা দূরে থাকুক, তাহার ছিদ্রের ভিতরে সঞ্চিত দূষিত পদার্থ জলকে আরও দূষিত করে।

কয়লার আর এক শক্তি আছে—উদ্ভিজ্জ পদার্থের রং নষ্ট করে। কাঠের কয়লা অপেক্ষা হাড়ের কয়লার এ শক্তি অধিক পরিমাণে আছে, সে কারণে চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়। ইক্ষুরস বা বীটপালমের রস হাড়ের কয়লার সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইলে উহা নির্ম্মল ও বর্ণহীন হয়, তাহার পর জ্বাল দিয়া রস ঘন করিলে সুন্দর ও পরিষ্কার দানা বাঁধে।

উপরে কয়লা পোড়ানর কথার উল্লেখ হইয়াছে। উন্মুক্ত বায়ুতে কয়লা পোড়াইলে বর্ণহীন কার্ব্বনিক্‌ এসিড্‌ গ্যাস্‌ বা অঙ্গারাম্ল বাষ্প প্রস্তুত হয় তাহাও বলা হইয়াছে। "এই পোড়া"র অর্থ কি, কয়লা পুড়িয়া কি হয়, ইত্যাদি রসায়নের জ্ঞাতব্য কথা অনেক, বলিতে গেলে বর্ত্তমান প্রস্তাব বাড়িয়া যায়। বারান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

পাথুরে কয়লা অঙ্গারের ভিন্নরূপ মাত্র, কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ অঙ্গার নহে। অঙ্গার ছাড়া আরও অনেক

পদার্থ ইহার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। অম্লজান (অক্সিজেন), উদজান (হাইড্রোজেন্), যবক্ষারজান (নাইট্রোজেন), গন্ধক প্রভৃতি কয়েকটী অধাতব পদার্থ ইহার সহিত মিশ্রিত থাকে। ইহাদের পরিমাণ কিন্তু অধিক নহে। এই সমস্ত ছাড়া অপর কয়েকটি খনিজ পদার্থও ইহার সহিত মিশ্রিত থাকে; পুড়িলে তাহা ভস্মের আকারে অবশিষ্ট থাকে।

উত্তাপ, আলোক, এবং যন্ত্রচালনশক্তি উৎপন্ন করিবার যতগুলি উপাদান আছে, পাথুরে কয়লা তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথচ সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। রেলগাড়ি, কলের জাহাজ এবং বিবিধ কল কারখানাই মানুষের সভ্যতা বিস্তারের সহায়, এ সমস্তগুলি পাথুরে কয়লার সাহায্যে চলে। আজ যদি হঠাৎ পাথুরে কয়লার সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে সভ্য জগতের যে কিরূপ দুর্দ্দশা হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

বর্ত্তমান সময়ে পাথুরে কয়লার সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে এমন কোন সম্ভাবনা নাই, তবে ভূপৃষ্ঠে কয়লার আর নূতন সৃষ্টি হইতেছে না, অথচ সভ্য জগতের সকল দেশে বৎসর বৎসর প্রচুর কয়লা খরচ হইতেছে। সুতরাং ভূগর্ভে সঞ্চিত যে কয়লা আছে, ক্রমশঃ তাহা ফুরাইয়া আসিয়া একসময়ে নিঃশেষিত হইবার কথা। তখন সভ্য জগতের দশা কি হইবে, এটা ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে একটা ভাবনার বিষয় ছিল। কিন্তু তড়িতের প্রভাবে এখন সে ভাবনা দূর হইয়াছে। এখন তড়িৎ শনৈঃ শনৈঃ অথচ দৃঢ়পাদবিক্ষেপে পাথুরে কয়লার রাজ্যে ক্রমশঃ আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে। এখন তড়িৎ-বলে আলো দিতেছে রেল দৌড়িতেছে, জাহাজ চলিতেছে, কারখানা খাটিতেছে। কিছুকাল পরে জরাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় পাথুরে কয়লাও কাজের বাহির হইয়া যাইবে। তখন আর জাহাজের 'বঙ্কে' বা ইঞ্জিনের 'টেণ্ডারে' স্থান না পাইয়া প্রদর্শনী আগারে আশ্রয় লইবে, আর ভূতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের আলোচনার সামগ্রী হইবে।

সভ্যজগতে সম্প্রতি কয়লার আর এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব হইয়াছে—সেটি তরল বায়ু। সোণার পাথর বাটীর ন্যায় তরল বায়ু কথাটা শুনিতে অসম্ভব বটে, কিন্তু বিজ্ঞানবলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। বিজ্ঞান আমাদের এই আকাশের বায়ুকে জলের আকারে পরিণত করিয়াছে। অধ্যাপক ডেওয়ার (Dewar) প্রথম এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। এখন আমেরিকার মেঃ ট্রিপ্লার নামে একজন কারখানাওয়ালা মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত প্রচুর পরিমাণে ও সস্তায় তরল বায়ু তৈয়ারী করিতেছেন। এই তরল বায়ু দ্বারা ভবিষ্যতে মানুষের বহু প্রয়োজন সাধিত হইবে। ইতিমধ্যেই মেঃ ট্রিপ্লার ইহার সাহায্যে ছোট ছোট এঞ্জিন্ চালাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, কিছুদিন পরে ইহার বলে রেলগাড়ি, জাহাজ, এবং কারখানার সর্ব্বপ্রকার এঞ্জিন্ চালান যাইতে পারিবে। বায়ু বহুযোজন ধরিয়া আমাদের ভূপৃষ্ঠ পরিবেষ্টন করিয়া আছে এবং ইহার পরিমাণ অফুরন্ত সুতরাং ভবিষ্যতে কয়লা ফুরাইলে আমাদের আশঙ্কার কারণ কিছু নাই।

পাথুরে কয়লার জন্মকথা অতীব কৌতুকজনক, কিন্তু উপস্থিত প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবার ভয়ে আমরা আপাততঃ সে কথার উল্লেখ স্থগিত রাখিলাম। কেবল মোটা মুটি একটা কথা বলিয়া রাখি যে, পাথুরে কয়লা কাষ্ঠের বিকৃতি। আমরা চলিত কথায় "মানুষ ভেবে ভেবে কাঠ হইয়া যায়" বলি —কিন্তু সেটা রূপক মাত্র—তাহার অর্থ কাঠের ন্যায় শুষ্ক হয়। কিন্তু গাছ অবস্থার বৈগুণ্যে পাথর হয় কিম্বা পাথুরে কয়লা হয়, এটা রূপক নহে, বাস্তব সত্য। আমাদের এই পাথুরে কয়লা পূর্ব্বজন্মে কাষ্ঠ ছিলেন। আমরা অনেক পাথুরে কয়লার গায়ে পাতা, আঁশ, এবং গাছের অন্যান্য অবয়বের চিহ্ন স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই; কখন বা এমন কয়লা দেখিতে পাই, যাহা পর্দ্দায় পর্দ্দায় ছাড়ান যায়—পরীক্ষা করিলে দেখাযায়, যে পর্দ্দাগুলি অঙ্গারীভূত গাছের পাতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কয়লার মধ্যে বড় বড় গাছের গুঁড়ি কিম্বা ডালের বড় একটা চিহ্ন পাওয়া যায় না, কিন্তু এমন অনেক কয়লার স্তর দেখা যায়, তাহা কেবল খুব ছোট ছোট পাতায় গঠিত।

একদিনে কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই; গাছ পালা কতকাল ভূগর্ভে থাকিয়া কয়লায় পরিণত

হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে লক্ষ লক্ষ বৎসরে তাহা ঘটিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনও কয়লার সকল স্তরে সমভাবে হয় নাই। এমন কয়লা অনেক দেখা যায় যাহার দারুময় রূপ এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই; কয়লার চাঁইয়ের মধ্যে মধ্যে এখনও কাষ্ঠ অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে কাঠের কাষ্ঠত্ব ঘুচিয়াছে বটে, কিন্তু কাষ্ঠের অবয়ব-চিহ্ন এখনও বেশ স্পষ্ট বর্ত্তমান। তৃতীয় বা পরিণত অবস্থায় আর কাঠের কোন চিহ্ন দেখা যায় না ইহা একবারে পাথর হইয়া গিয়াছে।

কয়লার এই তিন জাতির তিনটি স্বতন্ত্র নাম আছে—(১) লিগনাইট (Lignite) অর্থাৎ কাষ্ঠ-প্রবণ; আমরা এই লিগনাইট কয়লাকে "লক্কড়" কয়লা (Lignus = লকড়ি = কাঠ) শব্দে অভিহিত করিতে পারি। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম বিটুমিনস্ (Bituminous) বা তৈলপ্রধান; ইহাকে 'তারী" কয়লা (Bitumen = তার, আলকাতরা) বলিলে অসঙ্গত হয় না; আর (৩) তৃতীয় প্রকার বস্তুতঃ "পাথুরে" কয়লা; ইহার ইংরাজী নাম Anthracite (Anthrax = জ্বলদঙ্গার + lithos = পাথর)।

"লক্কড়" কয়লায় (lignite) অঙ্গারের ভাগ (শতকরা) ৬৬ বিদ্যমান, আর তাহাতে অপর কয়লা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অম্লজান ও উদজান আছে। ইহাতে কাষ্ঠধর্ম্ম অধিক, জ্বালাইলে বাষ্পীয় পদার্থ অধিক পরিমাণ বাহির হয়, সুতরাং জ্বালাইলে শিখা বেশ বড় হয়। "পাথুরে" কয়লায় (anthracite) অঙ্গারের ভাগ ৯০, অম্লজান ও উদজানের পরিমাণ অতি অল্পই। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিরেট ও ভারী, পোড়াইলে শীঘ্র পোড়ে না, বিস্তৃত শিখাও নির্গত হয় না, কিন্তু অপর দুই জাতীয় কয়লা অপেক্ষা অধিক তাপ উৎপন্ন করে। "তারী" কয়লা (bituminous) উভয় জাতির মধ্যবর্ত্তী, ইহাতে অঙ্গারের ভাগ ৭৮। ইহাতে প্রভূত পরিমাণে আলো জ্বালিবার গ্যাস ও আলকাতরা উৎপন্ন হয়।

অল্পমূলধনে ব্যবসায়।

(১)

আমাদের ব্যবসায়ে যে আশক্তি নাই তাহার এক কারণ,—আমাদের ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শিক্ষা নাই. আর এক কারণ, আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবিশেষ মূলধন নাই, যাহা দ্বারা বড়রকম একটা ব্যবসায় চলিতে পারে।

আমাদিগের মধ্যে যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহারা কোন ব্যবসায় করেন না বলিয়া, অনেকে তাঁহাদের দোষ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রকার দোষ দেওয়া অতীব অন্যায়, কারণ, যে বিষয়ের কিছুই জানা নাই, তাহাতে অগ্রসর হইলে, সে কার্য্যে ক্ষতি হওয়াই সম্ভব; আমাদের এখনকার অবস্থায়, কেহ ব্যবসায়ে ক্ষতি করিলে, কেবলই যে তাঁহার ক্ষতি হইবে, তাহা নহে, তাহাতে দেশশুদ্ধ লোকের ক্ষতি হইবে। কারণ, এক-জনের ক্ষতি দেখিলে অপরে আর ব্যবসায়ের দিকে অগ্রসর হইবে না, লোকে আর শিল্প বা ব্যবসায়ে অগ্রসর না হইলে দেশের উন্নতি কোন কালেই হইবে না, বরং দিন দিন অবনতই হইবে।

আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নূতন শিল্পকার্য্য এবং নূতন নানা প্রকার ব্যবসায় প্রচলিত হওয়া একান্তই আবশ্যক, নতুবা দিন দিন যেরূপ অন্নের জন্য হাহাকার পড়িয়াছে, তাহাতে আর রক্ষা নাই।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের এরূপ ব্যবসায় করা উচিত, যাহাতে আমাদের ঘর হইতে বিশেষ অর্থ বাহির না করিয়াও ব্যবসায় সম্বন্ধে আমরা কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি, এবং সেই অভিজ্ঞতার ফলে ভবিষ্যতে আমরা দুই চারি জনে একত্রে অথবা নিজে নিজে স্বতন্ত্রভাবে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারি।

আমরা অদ্য যে ব্যবসায়ের উল্লেখ করিতেছি, তাহা দ্বারা অনেকগুলি কার্য্য সাধিত হইবে এমন আশা করা যাইতে পারে।

১। ইহাতে কাহারও বিশেষ মূলধন লাগিবে না।

২। ইহাতে টাকা না দিয়াও ব্যবসায়ে কিসে লাভ, কিসে লোকসান, তদ্বিষয়ে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন।

৩। এই ব্যবসায়ে লাভ নিশ্চিত।

৪। এই ব্যবসায়ের লাভ হইতে ভবিষ্যতে অনেক বৃহৎ কল কারখানা ইত্যাদি করা যাইতে পারে।

এখানে একটা কথা বলা একান্তই আবশ্যক। ব্যবসায় করিতে গেলে সততার একান্ত আবশ্যক।

আমরা যে ব্যবসায়ের কথা বলিতেছি, তাহাতে বিশ্বস্ত লোকের উপরই সমস্ত নির্ভর করিবে। কোন ব্যবসায় করিতে গেলে, কেবলই যে অমুক বিশ্বাসী বলিয়া জানা আছে বলিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, এমন নহে; যাঁহার উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে হইবে, রীতিমত তাঁহার সম্পত্তি অথবা নগদ টাকা জামিন লওয়া কর্ত্তব্য। এপ্রকার লোক না পাইলে কোন ব্যবসায়ই করা উচিত নহে। আমাদের দেশের লোকের ব্যবসায় করিতে গেলে যে প্রায়ই লোকসান হয়, এই প্রকার অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করা তাহার অন্যতর কারণ। একব্যক্তি আজন্ম সৎ হইতে পারেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে, নিজের পারিবারিক অভাবের জন্য বা কোন নূতন মোহ বা অন্য কারণে লোকের স্বভাব পরিবর্ত্তন হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু তাই বলিয়া একটা ব্যবসায়—যাহার উপর কত লোকের উপকার, উন্নতি, জীবিকোপায়, এমন কি একটা সমগ্র দেশের উন্নতি পর্য্যন্ত নির্ভর করে—সেইরূপ ব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়া কোনমতেই উচিত নহে। রীতিমত সম্পত্তির বা নগদ টাকার জামিন না লইয়া কোন লোককেই ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশ্বাস করিলে চলিবে না।

কি ব্যবসায়?

মনে করুন, আমরা ২০০ জনে যদি আমাদের সংসার খরচের টাকা একত্র করিয়া একজনের নিকট সংগ্রহ করি, তবে প্রত্যেকের গড়ে মাসিক খরচ ২০ টাকা ধরিলে ৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এই টাকায় আমরা খুচরা দোকানদারের নিকট দ্রব্যাদি না কিনিয়া পাইকারী মহাজনের নিকট দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া একস্থানে রাখিলাম। আমাদিগের মধ্য হইতে দুই তিনজনকে তাহার তত্বাবধারণের ভার দেওয়া গেল। (তাঁহাদের রীতিমত জামিন লইতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।) যাঁহারা তত্বাবধারণ করিবেন, তাঁহাদের পারিশ্রমিক বেতন অবশ্যই তাঁহারা লইবেন।

তাহার পর এই সংগৃহীত দ্রব্য হইতে আমাদের মাসিক খরচের সামগ্রী আমরা প্রত্যহ বা ২।৪ দিন অন্তর লইতে লাগিলাম, এবং আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত লোক দিগকেও তাহা হইতে দ্রব্য বিক্রয় করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য যে খুচরা দোকানে দ্রব্য খরিদ করিতে যে মূল্য দিতে হইত, আমরাও নগদ সেই মূল্য দিলাম।

তাহাতে আমরা—

(১) পুরা ওজনের দ্রব্য পাইলাম।

(২) বিশুদ্ধ দ্রব্য পাইলাম।

(৩) কোন কোন দোকানদার যেরূপ প্রতারণা করে তাহা হইতে বাঁচিলাম।

(৪) আর্থিক লাভ কিরূপ করিলাম। তাহাও দেখুন—

গৃহস্থলোকে যে সার্ট বা পিরাণ ১৶০ বা ১।০ মূল্যে খরিদ করেন, তাহা একত্রে বেশী পরিমাণ প্রস্তুত করিলে এইরূপ খরচ পড়ে:—

হৌস হইতে ১ বাক্স লংক্লথের মূল্য (৩৬ থানে ৫৫০ টা কামিজ হয়)	২৮৮৲
তাহা সেলাই করার মজুরী	১৪০৲
কফ্ ও কলারের ডক	২০৲
৫৫০টা কামিজের ধোলাই খরচ	২০৲
	৪৬৮৲
৫৫০ টা কামিজের বাজার দর— ১৶০ হিঃ	৬১৮৲
	১৫০৲

যখন ৪৬৮ টাকার দ্রব্যে ১৫০৲ টাকা লাভ করা যাইতে পারে তখন শতকরা ৩০৲ টাকারও বেশী লাভ।

আর একটি উদাহরণ।—

মাসের প্রথমে ৫০০৲ টাকায় ১২৫ মণ চাউল খরিদ করা গেল। যখন আমরা ২০০ জন খরিদ্দার আছি, তখন আমাদের প্রত্যেকের ৫ জন করিয়া পরিচিত লোক ধরিলে আরও ১০০০ জন খরিদ্দার হইতে পারে। এই এত খরিদ্দারে মাসে এক হাজার মণ চাউল খরিদ করিতে পারেন। সুতরাং ১২৫ মণ চাউল ৪ দিনেই নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে

৫০০৲ টাকার করিয়া চাউল আনিয়া মাসে এক হাজার মণ চাউল বিক্রয় করিতে পারিলাম। অনেকেই অবগত আছেন, যে বেলেঘাটা বা হাটখোলায় বেশী চাউল খরিদ করিলে যে দাম খুজরা এক মণ খরিদ করিলে তাহা অপেক্ষা প্রতি মণে ।০ আনা বা ।৵০ করিয়া অধিক দাম পড়ে। সুতরাং আমরা ৫০০৲ মাত্র টাকা লইয়া এক মাসে ১০০০ মণ চাউল বিক্রয় করিয়া মণ প্রতি ।০ হিসাবে ২৫০৲ টাকা লাভ করিতে পারি। তাহা হইলে শতকরা ৫০৲ টাকা লাভ করা হইল।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সকল প্রকার দ্রব্যে এরূপ লাভ সম্ভব নহে। তবে সকল প্রকারে গড়পড়তা শতকরা দশ টাকা লাভ হইতে পারে, একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।

এস্থলে আমরা মাসে ৪ হাজার টাকার এবং আমাদের পরিচিত লোকদিগকেও মাসে ৬ হাজার টাকার মোট ১০ হাজার টাকার দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারি। তাহাতে শতকরা ১০৲ টাকা লাভ ধরিলে মাসে ১ হাজার টাকা লাভ হইতে পারে। কম করিয়া ধরিলেও বৎসরে ৮।১০ হাজার টাকা লাভ হওয়া সম্ভব।

প্রতি বৎসরে ১০ হাজার টাকায় অন্য একটা ব্যবসায় হইতে পারে। কিম্বা এই ব্যবসায়ই বিস্তৃত ভাবে করা যাইতে পারে।

আমরা উপরে পাঁচজনে মিলিয়া যে ব্যবসায়ের কথা বলিলাম, তাহাকে কো-অপরেটিভ সোসাইটি বলে। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অন্তর্গত রকডেল নামক ক্ষুদ্র নগরে Rochdale Pioneers Society নামে একটি ক্ষুদ্র সমিতি প্রথমে স্থাপিত হয়। সেই সোসাইটি অতি সামান্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া শেষে বিস্তৃত কল কারখানা পর্য্যন্ত স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। মহাত্মা ফসেট কৃত অর্থনীতি পুস্তকে এই সোসাইটির বিস্তৃত বিবরণ আছে। ইংলণ্ড অপেক্ষা আমাদের দেশে এরূপ সমিতির দ্বারা আরও অনেক বেশী উপকার হইতে পারে। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

যদি বাস্তবিকই আমাদের দেশের লোকের অবস্থা দেখিয়া মন বিগলিত হইয়া থাকে, যদি বাস্তবিকই স্বজাতি ও স্বদেশ বলিয়া মনে কিছু মাত্র স্নেহ জন্মিয়া থাকে, তবে একা এই বঙ্গদেশে এইরূপ এক সহস্র সমিতি স্থাপিত হওয়া উচিত। সমস্ত ভারতবর্ষ ধরিলে তো কথাই নাই। সমগ্র ভারতে এরূপ এক লক্ষ সমিতি স্থাপিত হইতে পারে এবং ২০।২৫টি সমিতি একত্রে তাঁহাদিগের লাভ হইতে নানারূপ কল কারখানা, শিল্প ও ব্যবসায় স্থাপন করিয়া দেশের অন্নক্লিষ্ট প্রতিবেশী-দিগের উদর জ্বালা নিবারণ করিতে পারেন।

এ প্রকার সোসাইটি করিতে হইলে, প্রথমে কতজনে কত টাকা দিবেন, তাহার একটি তালিকা করা কর্ত্তব্য। তাহার নিয়মাবলী Indian Company's Act আইন মতে বিধিবদ্ধ করা চাই; তাহার পর কয়জন ডিরেক্টর মনোনীত করত সমিতি রেজেষ্টরী করিতে হয়। এই ডিরেক্টরেরা সম্পত্তি বা নগদ টাকা জামিন লইয়া একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করিবেন; তাহার উপর কার্য্যের ভার থাকিবে। সমিতির প্রত্যেক মেম্বরই আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং আপন আপন আপত্তি জানাইতে পারিবেন।

আমাদের পুর্ব্বে যে কয়েকটি জইণ্ট ষ্টক কোং হইয়াছিল, তাহাতে জামিন লওয়ার রীতি ছিল না এবং ডিরেক্টরেরা মনোযোগ না করায় তাহাতে লোকসান হইয়াছিল। সে প্রকার পুনরায় না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

গঙ্গাপ্রসাদ

আদি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

কুমারটুলী, কলিকাতা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়।

জগদ্বিখ্যাত কবিরাজ ৺ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় অন্যূন পঞ্চাশৎ বৎসর চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যেরূপ বহুদর্শিতা লাভকরেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এত দীর্ঘকাল চিকিৎসা ব্যবসার অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তিনি কয়েকটী অভিনব চিকিৎসা-তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন। এবং যাহার প্রভাবে তিনি লক্ষ লক্ষ রোগীকে কৃতান্ত-কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সকল তত্ত্ব ও তৎপ্রসূত অমোঘ ঔষধাবলি তিনি তদীয় প্রিয়তম সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেন সরস্বতী মহাশয়কে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং তৎকর্ত্তৃক ঔষধগুলি উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া জন সাধারণে প্রচারিত হইবে জানিয়া গোপনে সেই কয়েকটী ঔষধের প্রস্তুত ও ব্যবহার বিষয়ে কেবল তাঁহাকেই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং তদীয় আবিষ্কৃত দুর্লভ রত্নস্বরূপ ঔষধাবলি যাহাতে দরিদ্র ভারতবাসী অনায়াসে ক্রয় করিতে সমর্থ হন এই অভিপ্রায়েই সুলভ করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা উক্ত স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের সম্মানার্থ পশ্চাৎ লিখিত কয়েকটী মহৌষধ উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া সাধারণের উপকারার্থে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিতেছি এবং উক্ত মহৌষধগুলি স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের নামালঙ্কৃত করিয়া তদীয় স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ প্রকাশ করিতেছি। এতাবৎ সেই সমস্ত মহৌষধ প্রস্তুত করিয়া যে সকল রোগীকে ব্যবহার করিতে দিতেছি তাঁহারা সকলেই যেন দৈবশক্তি প্রভাবে অতি সত্বর সম্যক্ আরোগ্যলাভ করিতেছেন। আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে ঐ সকল ঔষধ বিনা মূল্যেই সর্ব্বসাধারণেকে বিতরণ করি। পরন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত ঔষধ সকল প্রস্তুত করিতে আমাদিগকে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। সুতরাং একেবারে বিনামূল্যে বিতরণ করা নিতান্ত অসম্ভব। তথাপি আমরা ঔষধগুলির বহুল প্রচার ও সাধারণের সুবিধার্থে কেবল ঔষধ প্রস্তুতির ব্যয় গ্রহণ করতঃ মূল্য ধার্য্য করিলাম। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে প্রথিতনামা কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এই সমস্ত অব্যর্থ মহৌষধগুলি জনসাধারণে ব্যবহার করিয়া ইহার অচিন্তনীয় উপকারিতা দর্শন করুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গঙ্গা প্রসাদ ঘৃত।

অথবা,

একমাত্র ধাতুপোষক মহৌষধ।

ক্ষীণ মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূরীকরণ ও নিস্তেজ মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তিসাধন পক্ষে ইহা একটী বীর্য্যবান মহৌষধ।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালীমতে যত প্রকার ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে এই প্রসিদ্ধ ভৈষজ্য উপাদানে প্রস্তুত গঙ্গাপ্রসাদ ঘৃতটী আধুনিক উন্নত আবিষ্কারের শুভময় পূর্ণ বিকাশ। মানসিক দৌর্ব্বল্য দূরীকরণের ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। অতিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর দেশে বাস জন্য ব্যাধি, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা, যৌবন-কালসুলভ অবৈধ কার্য্য হইতে যত প্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে তৎসমুদয় রোগ বিনাশে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র সদৃশ। নিম্নলিখিত রোগ ও তাহার আনুসঙ্গিক উপসর্গ সমূহ বিদূরিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়, যথা ;—স্নায়বিক ও ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, জীবনীশক্তি-রাহিত্য, দৈহিক ও মানসিক অবসন্নতা, মাংসপেশী সমূহের শিথিলতা, জীবিতকালের বিবিধ কর্ত্তব্য কার্য্যানুশীলনে ও সুখ উপভোগে অসমর্থতা, স্মৃতি-শক্তি হীনতা, মস্তিষ্ক ক্ষীণতা প্রভৃতি এবং যাবতীয় ক্ষয়করী পীড়ার একটী শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ ঔষধ। ইহা ভগ্ন-উদ্যমে উৎসাহ, বল এবং নব-জীবন প্রদান করিয়া থাকে। 'গঙ্গাপ্রসাদ ঘৃত

দোষ শূন্য ও শিশু হইতে প্রাপ্তবয়স্ক সকলে নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারে। ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দুর্ব্বলকে সবল করে।

পরিমাণ—প্রাপ্ত বয়স্ক　॥০ অর্দ্ধতোলা।
অপ্রাপ্ত　ঐ　।০ সিকি তোলা।

প্রয়োগ ব্যবস্থা।

প্রতিদিন প্রাতে একবার অল্প পরিমাণে দুগ্ধের মধ্যে পরিমাণানুরূপ ঘৃত নিক্ষেপ করতঃ অল্প মিছরি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

পথ্য—ভাত, রুটি, তাজা মাংস ও জীবন্ত মৎসের ঝোল প্রভৃতি। সাধারণতঃ আশুজীর্ণকর দ্রব্যই পথ্য।

নিষিদ্ধ—অম্ল, অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন এবং সর্ব্বপ্রকার অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যই নিষেধ।

মূল্য—একমাসের উপযোগী—৪৲ চারি টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

গঙ্গাপ্রসাদ তৈল।

বাতরোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

এই সুপরীক্ষিত তৈলটী আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে গেঁটে বাত, চলতি বাত, রস বাত, শোথ, পতন জনিত বাত, পাদগণ্ডির, কোমরের বাত, ঐকাঙ্গিন বাত, ফিক বেদনা, সন্ধিস্থল ফুলা, হৃদপিণ্ডের বেদনা প্রভৃতি যে কারণে যে প্রকার বাত বেদনা হউক না কেন এই তৈল মালিসে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। অনেক শয্যাগত বাতগ্রস্থ রোগীকে, এই তৈল ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

প্রয়োগ ব্যবস্থা।

প্রতিদিন প্রাতে একবার অল্প পরিমাণে দুগ্ধের মধ্যে পরিমাণানুরূপ ঘৃত নিক্ষেপ করতঃ অল্প মিছরি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

পথ্য—ভাত, রুটি, তাজা মাংস ও জীবন্ত মৎসের ঝোল প্রভৃতি। সাধারণতঃ আশুজীর্ণকর দ্রব্যই পথ্য।

নিসিদ্ধ—অম্ল, অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন এবং সর্ব্বপ্রকার অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য নিষেধ।

মূল্য—একমাসের উপযোগী—৪৲ চারি টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

গঙ্গাপ্রসাদ সালসা।

অথবা

দুষিত শোণিত সংশোধক।

এই সালসাটী দুষিত রক্ত পরিষ্কার এবং বলাধানের পক্ষে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা উপদংশ পারদ জনিত সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ, সর্ব্বপ্রকার বাত, শ্লেষ্মা, সর্দ্দি, শ্বাস, কাশ, গণ্ডমালা, দদ্রু, বিস্ফোটক, উরুস্তম্ভ, ব্রণ প্রভৃতি ও দুষিত রক্ত হইতে উৎপন্ন যাবতীয় রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে। ইহা সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং দুর্ব্বলকে বলশালী করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গার্হস্থ্য আশ্রমবাসীর পারিবারিক অবশ্যম্ভাবী ব্যাধি সমূহের এইটী নিয়ত প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহা ধীশক্তি সম্পন্ন ভিষকগণ কর্ত্তৃক দুষিত শোণিতের বিশুদ্ধি করণে উপযুক্ত ভেষজ বলিয়া অনুমোদিত। অত্যাশ্চর্য্য আরোগ্যকরী ক্ষমতা বিদ্যমান থাকাতে ইহা আবিষ্ক্রিয়ার সময় হইতে অদ্যাপি সমভাবে অব্যর্থ ঋষিবাক্য সদৃশ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহা শরীরের বলাধানও পরিবর্ত্তন সাধন করে। ম্রিয়মাণ যুবকের স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধন ও হীনবীর্য্য নিস্তেজ বৃদ্ধকে বীর্য্যমান ও সবল করিতে ইহার তুল্য সালসা ইতি পূর্ব্বে আবিষ্কার হয় নাই। ইহা সুবিশাল ভারতবর্ষের প্রতি জনপদ, নগর, গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীবাসী সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি ও সুখ সচ্ছন্দতা প্রদান করিয়াছে।

ব্যবস্থা। প্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে ১ দাগ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে অর্দ্ধ দাগ; দিবসে দুইবার সেবনীয়। অর্থাৎ প্রাতে ও বৈকালে।

পথ্য—রুটি ভাত, মাখম, ঘৃত, মাংস, মৎস্যের ঝোল এবং অন্যান্য বলকারক খাদ্যই সুপথ্য।

মূল্য—১৫ দিনের উপযোগী একটী আট আউন্স শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পশ্চিম ভারতে নবাবিষ্কৃত দুইটী ধাতুর আকর।

আমাদের ভারতমাতা রত্নগর্ভা। ইহার নানা স্থানে নানা রত্ন আবিষ্কৃত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা সাহেবেরা বহু প্রকারে ধনরাশি উপার্জ্জন করিতেছেন। তাঁহারা নূতন নূতন স্থানে মূল্যবান খনিজ দ্রব্যের জন্য রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতেছেন এবং অনেক স্থানে সফলকাম হইয়া ক্রোরপতি হইয়া যাইতেছেন। আর আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি। যে স্থান আজ জঙ্গল পরিপূর্ণ, আজ যে স্থানে পা দিতে বাঙ্গালী হিংস্রজন্তুভয়ে মহাভীত হইবেন, হয়ত সেই নিভৃত স্থানে কোনও সাহেব স্বর্ণানুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন; সাহেব যদি সফলকাম হইলেন তাহা হইলে বৎসরেক মধ্যে সেই অরণ্য সুবৃহৎ সহরে পরিণত হইল, তখন আমরা মহোল্লাসে তথায় কেরাণীগিরি করিতে দরখাস্ত পেশ করিলাম। মহীশূরে যে স্থানে কোলার স্বর্ণক্ষেত্র অবস্থিত, কিছু দিন পূর্ব্বে সেই স্থান মহাজঙ্গলময় ছিল। আজ কোলার স্বর্ণক্ষেত্র একটী সুবৃহৎ নগরী; তথাকার চাম্পিয়ন রীফ্ খনিতে (Champion Reef Mine) গত বর্ষে শতকরা ১৭৫ টাকা লাভ হইয়াছিল। অতি অল্প দিন হইল আসামে শিলং সহরের অতি সন্নিকটে একটী উৎকৃষ্ট কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু কয় জন বাঙ্গালী তাঁহাদের গৃহের কোণে অবস্থিত এই লাভজনক ক্ষেত্রের কথা অবগত আছেন? এত দিন সম্ভবতঃ সমস্ত কয়লাভূমিটাই সাহেবদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। অবশ্য কোনও বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে যে ইহার অন্ততঃ কতকটা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে না পারিতেন এমন নহে। তবে আমাদের সে উদ্যোগ নাই, সে উৎসাহ নাই।

আজ কাল আমাদের মধ্যে দুই চারি জন খনিজ দ্রব্যের দিকে কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়াছেন। তবে কয়লা এবং অভ্রের প্রতিই তাহাদের দৃষ্টি দেখা যায়, অন্য দিকে মনোযোগ নাই। এ দুই বিষয়েও যে কতকগুলি লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছে ইহাই আমাদের মঙ্গলের বিষয়। কয়লা এবং অভ্রের খনি করিয়া অনেকে বেশ উপার্জ্জন করিতেছেন, কতকগুলি লোক লক্ষপতিও হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, পক্ষান্তরে অনেকে লোকসানও দিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের এই লোকসানের কারণ নিজ অদুরদর্শিতা এবং দৃষ্টিকৃপণতা। লেখক অনেক স্থানে দেখিয়াছেন যেখানে কয়লা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, পাইলেও যেখানে কাজ করিয়া লাভবান হওয়া যাইবে না এবং সেই স্থানের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া হয়ত বড় বড় ইংরাজ কোম্পানি চারিদিকের কয়লা বাহির করিয়া লইয়া ঐ স্থানটী ফাঁক রাখিয়াছেন। কোনও বাঙ্গালী সামান্য মূলধন লইয়া এবং অতি সস্তায় বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ঐ স্থানে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি হয়ত ভাবিলেন যে এত সস্তায় পাইতেছি লইবনা কেন, আর ইহার চারিদিকে যখন কয়লা পাওয়া গিয়াছে তখন এখানেই বা না থাকিবে কেন? বন্দোবস্তের পূর্ব্বে তিনি একবারও ইহার প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না এবং এই স্থলের পূর্ব্বতন অধিকারীরা তাঁহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে ধনশালী হইলেও কেন এই স্থানে কার্য্য করেন নাই তাহাও একবার অনুসন্ধান করিলেন না। অতি সস্তায় বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছেন ইহাতেই আশায় বুক বাঁধিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। পরিণামে কি হইল আমার লেখা বাহুল্য। খনির কার্য্য করিতে হইলে যথোপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ এবং পারদর্শী লোক দ্বারা স্থান নির্ব্বাচন প্রধান কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি পশ্চিম ভারতের বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পালানপুর নামক ষ্টেটে মূল্যবান দুইটী খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের একটী টিনের আকর। টিন পৃথিবীতে অম্লজান বাষ্পের সহিত মিলিত হইয়া একটী যৌগিক পদার্থরূপে থাকে। ইংরাজীতে এই যৌগিক পদার্থের নাম ক্যাসিটেরাইট বা টিনষ্টোন (Cassiterite বা Tinstone) ভারতে এই টিনেরআকর বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বঙ্গদেশের হাজারিবাগ, গয়া প্রভৃতি স্থানে অতি অল্প পরিমাণে এই টিনপ্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিলাতের কর্ণওয়াল এবং ডেভন নামক জেলাদ্বয় এই টিনের জন্যই প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মদেশের মালয় উপদ্বীপেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্ম

দেশের এই টিনপ্রস্তর বালুকার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। টিনপ্রস্তর বালুকা অপেক্ষা অনেক ভারী, সুতরাং সেই স্থানের লোকে অতি সহজেই বালুকা হইতে টিনের আকর পৃথক করিয়া লইয়া তাহা হইতে টিন প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিম ভারতের এই টিন অপর প্রস্তরের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে। ইহার কার্য্য করিতে হইলে প্রস্তর চূর্ণ করিয়া উহা হইতে টিন পৃথক্ করিয়া লইতে হইবে। হয়ত শীঘ্রই শুনিব কোনও বিদেশী উদ্‌যোগী পুরুষ এই টিনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া শত শত মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছেন।

দ্বিতীয় পদার্থটি অতি দুষ্প্রাপ্য এবং অত্যন্ত মূল্যবান্। ইহার নাম 'গ্যাডোলিনাইট' (Gadolinite)। ইহাতে প্রধানতঃ বেরিলিয়ম, ইট্রিয়ম এবং সিরিয়ম (Berellium, Yttrium এবং Cerium) নামক কয়েকটি ধাতব মূল পদার্থ আছে। অনেকেই দেখিয়াছেন কলিকাতার রাস্তায় গ্যাসালোক আর পূর্ব্বের ন্যায় লাল নাই, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল ও শুভ্র হইয়াছে। একটু মনোযোগ দিলে দেখিতে পাইবেন যে গ্যাস-শিখাটী একটা জাল দ্বারা আবৃত, আর উহাতেই আলোকের উজ্জ্বলতা ও শুভ্রতা বৃদ্ধি করিতেছে। ঐ জালের প্রধান উপকরণ ইট্রিয়ম এবং সিরিয়ম প্রভৃতি কয়েটী ধাতব পদার্থ।

'মোনাজাইট' (Monasite) নামক আর একটী খনিজ পদার্থ হইতে প্রধানতঃ সিরিয়ম পাওয়া যায়। এই মোনাজাইটও একটি যৌগিক পদার্থ। ইহার উপাদান সিরিয়ম এবং ফস্ফরাস (Phosphate of Cerium)।

'গ্যাডলিনাইটে' সিরিয়ম অপেক্ষা ইট্রিয়মই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকে। ইহা নরওয়ে ও সুইডেনের কয়েকটী স্থান এবং আমেরিকার কলোরাদো নদীতীর ভিন্ন অন্যস্থানে উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত না। বোম্বাই অঞ্চলে যে আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পরিমাণ বহু বিস্তৃত। সুতরাং তাহাতে রীতিমত কার্য্য হইলে প্রচুর পরিমাণে গ্যাডোলিনাইট পাওয়া যাইবে এবং প্রচুর লাভ হইবে।

মোনাজাইটের মূল্য প্রতি টন তিন হাজার টাকা। উপরিউক্ত গ্যাডোলিনাইটের মূল্য ও যে উহা অপেক্ষা কম হইবে না ইহা নিশ্চিত।

গ্যাডোলিনাইট ক্ষেত্রে কাজ করিবার আর একটী সুবিধা এই যে ইহাতে খুব বেশী সাজ সরঞ্জাম, এঞ্জিন, বয়লার ইত্যাদির দরকার হইবে না। মাটীর উপরিভাগেই ইহা বহুলপরিমাণে বর্ত্তমান এবং যে পাথরে ইহা পাওয়া যায় তাহাও অত্যন্ত নরম, সুতরাং অল্পায়াসেই উহা খনি হইতে উঠান যাইতে পারিবে এবং গুঁড়া করা যাইতে পারিবে। অতএব এ ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য অত্যন্ত অধিক মূলধন বা কলচালনদক্ষ লোকজন অধিক প্রয়োজন হইবে না। সভ্য জগতে আজ কাল গ্যাসালোকের যেরূপ প্রভাব তাহাতে এই গ্যাডোলিনাইটের কাটতি যে বিস্তর হইবে এবং ইহার কার্য্য যে অতি লাভজনক হইবে তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। তা ছাড়া নবাবিষ্কৃত ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন বাড়িতেছে।

আমরা যে দুইটি নবাবিষ্কৃত খনির কথা বলিলাম বোম্বাই নগরের কএকজন জহুরী সে সমস্ত ক্ষেত্রের ইজারা লইয়াছেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা, এম এ।

লেখক বৈদ্যনাথ বাবু উপরিলিখিত প্রবন্ধে খনির আবিষ্কর্ত্তার নাম উল্লেখ করেন নাই। এটা তাঁহার বিনয়ের পরিচয়। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা জানাইতেছি যে বৈদ্যনাথবাবু নিজে ঐ দুইটি খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বিগত পূজার ছুটির সময় পালানপুরে বেড়াইতে গিয়া ঐ আকরদ্বয় আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈদ্যনাথ বাবু একজন প্রতিভাশালী যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন এবং একজন "রিসার্চ স্কলার"। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা প্রার্থনা করি।—সং।

২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা।

সুবিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক ফ্রান্সিস বর্ণিয়ার কর্ত্তৃক বর্ণিত।

[শাজাহান বাদশাহের রাজত্বের শেষ ভাগে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস বর্ণিয়ার মোগল রাজধানীতে আইসেন এবং এদেশে দ্বাদশ বৎসর অবস্থান করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক, ও বৈজ্ঞানিক এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত তৎকালের একখানি অতি সুন্দর ও মূল্যবান ছবি। ঐতিহাসিক হিসাবে এই গ্রন্থ খানি বিশেষ প্রামাণ্য। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে এবং আশে পাশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। আমরা তাঁহারই গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া দিলাম। বাঙ্গালার শিল্পবাণিজ্য কি ছিল, কি হইয়াছে, পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন।]

ইয়ুরোপায়েরা মিশর রাজ্যের শোভা এবং সমৃদ্ধির সুখ্যাতি সকল সময়েই করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতে পৃথিবীর মধ্যে এরূপ স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না; এমন কি আধুনিক লেখকেরা পৃথিবীর মধ্যে মিশরের ন্যায় সুন্দর স্থান আর থাকিতে পারে ইহা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমি দুইবার বঙ্গদেশে গমন করিয়া ঐ দেশ সম্বন্ধে যে সমস্ত জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহাতে বোধ হয় মিশরের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশের প্রতি সেইরূপ সুখ্যাতি প্রদত্ত হইলে উপযুক্ত হইত।

বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালার চাল কেবল পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অভাব পূরণ করে না, পরন্তু দূরদেশে রপ্তানী হইয়া তত্রত্য অধিবাসীগণের জীবন রক্ষা করে। বাঙ্গালার ধান্য ভাগিরথী দিয়া পাটনায় এবং সমুদ্রপথে মসলীপট্টন এবং করমণ্ডল উপকূলে প্রেরিত হয়। কেবল তাহাই নহে, ভারতবর্ষ ব্যতীত সিংহলদ্বীপ এবং মালদ্বীপেও বঙ্গদেশীয় ধান্যের রপ্তানী হয়।

বঙ্গদেশে ধান্যের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে চিনি জন্মে। গোলকুণ্ডা এবং কর্ণাটক প্রদেশে চিনি বড়ই অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় এই নিমিত্ত ঐ সকল স্থানে বঙ্গদেশের চিনি প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত মোকা এবং বসোরা নগর দিয়া আরব ও মেসোপোটামিয়া প্রদেশে এবং বন্দর আব্বাসপথে পারস্য দেশে বঙ্গদেশ হইতে চিনি রপ্তানী হয়।

বাঙ্গালা নানাবিধ মিষ্টান্নের জন্য প্রসিদ্ধ; বিশেষ যেখানে পোর্ত্তুগীজেরা বাস করে সেখানকার মিষ্টান্ন উৎকৃষ্ট। পোর্ত্তুগীজেরা ইহা প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত, আর তাহারা এ দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া থাকে। মিষ্টান্ন ছাড়া তাহারা জারিত করিয়া বা মোরব্বা করিয়া নানাবিধ ফলমূল রক্ষা করিতে পারে। এইরূপে রক্ষিত বাতাবী লেবু ঠিক বিলাতী দ্রব্যের ন্যায় উপাদেয়।" অনন্ত মূলের ন্যায় আকারের এক প্রকার মূল (?), আম্র, আনারস, আমলকী প্রভৃতির মোরব্বা অতি উৎকৃষ্ট। তাছাড়া পাতি লেবু ও আদাও এরূপ রক্ষিত হয়।

মিশরের ন্যায় বাঙ্গালাদেশে অধিক পরিমাণে গম জন্মে না, কৃষকদের ঔদাস্যবশতঃ যে সেরূপ হয় তাহা নহে। ভাতই বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য সামগ্রী, এখানকার লোকে কচিৎ রুটি খায়, সে জন্য গমের প্রয়োজন তত বেশী নাই। তবে দেশে যে পরিমাণে গম খরচ হয় তাহা সমস্তই দেশে জন্মে। এই গম হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও সস্তা বিস্কুট প্রস্তুত হয়। ইংরেজ, ওলন্দাজ, পোর্ত্তুগীজ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় জাহাজে ব্যবহার জন্য ইহার প্রচুর কাটতি আছে।

দেশের লোকের খাদ্য চাল, ঘি আর ৩।৪ রকম তরী তরকারী এত সস্তায় মিলে যে তাহা বিনা মূল্যেই বলিলে হয়। ১ টাকায় বেশ ভাল মুরগী ২০ টার অধিকও পাওয়া যায়; রাজহাঁস এবং পাতিহাঁসও সেই অনুযায়ী সস্তা। ছাগ মেষ প্রচুর, আর শূকরের সংখ্যা এত অধিক যে এখানকার অধিবাসী পোর্ত্তুগীজদের শূকর মাংসই প্রধান আহার। ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা শূকর মাংস লবণাক্ত করিয়া রাখে; ইহার ব্যয় অতি অল্প এবং তাহা তাহাদের জাহাজের লোকের জন্য ব্যবহার হয়। টাটকা অথবা লবণাক্ত নানাবিধ মাছও এইরূপ প্রচুর ও সস্তা। এক কথায়, বাঙ্গালায় মানুষের প্রয়োজনীয় সমুদায় সামগ্রী এত সস্তা যে সেই কারণেই পোর্ত্তুগীজ, সঙ্করবর্ণ ও খৃষ্টানগণ ওলন্দাজ কর্ত্তৃক অন্যান্য স্থান হইতে দূরীভূত হইয়া এত অধিক সংখ্যায় এখানে বাস করিয়াছে। এখানে জেসুট ও অগষ্টিন সম্প্রদায়ের বড় বড় গির্জ্জা আছে, বিধর্ম্মী বলিয়া তাহারা কোনরূপ উপদ্রুত হয় না। তাহাদের মুখে আমি শুনিয়াছি যে এক হুগলীতেই

৮১৯ হাজার খৃষ্টান আছে; আর এদেশের অন্যান্য স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ তাহাদের সংখ্যা ২৫ হাজারেরও অধিক হইবে। পোর্ত্তুগীজ, ইংরাজ এবং ওলন্দাজদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে বাঙ্গালা দেশে প্রবেশের শত দ্বার, কিন্তু তাহা হইতে বাহির হইয়া যাইবার একটিও দ্বার নাই। এ দেশের ধনধান্যের প্রাচুর্য্য এবং এখানকার রমণীগণের সৌন্দর্য্য এবং কোমল স্বভাবই এই প্রবাদের উৎপত্তির কারণ।

যে সমস্ত মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের লোভে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বিদেশীয় বণিকগণ আইসেন তাহা এদেশে এত প্রচুর এবং এত বিচিত্র, যে জগতে আর কোথাও সেরূপ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। শর্করার কথা উপরে বলা হইয়াছে, এই শর্করা একটা মূল্যবান্ পণ্য দ্রব্য। তা ছাড়া বাঙ্গালায় কার্পাস ও রেসমী বস্ত্র এত জন্মে যে এদেশকে ঐ দুই দ্রব্যসম্বন্ধে জগতের ভাণ্ডার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র হিন্দুস্থান এবং তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত দেশগুলি ছাড়া, ইয়ুরোপেও এই দুই দ্রব্য চালান যায়। একা ওলন্দাজেরাই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ জাপান এবং ইয়ুরোপে এত রকম ও এত অধিক পরিমাণে কার্পাসবস্ত্র চালান করে যে তাহা দেখিয়া সময়ে সময়ে অবাক্ হই। এই বস্ত্রের মধ্যে মোটা, মিহি, শাদা, রঙ্গীণ সর্ব্ব প্রকারই দেখা যায়। ওলন্দাজ ছাড়া ইংরেজ ও পোর্ত্তুগীজ এবং দেশীয় বণিকেরাও এই পণ্যের বিস্তৃত বাণিজ্য করে। এই যে কথা বলিলাম সর্ব্বপ্রকার রেসম ও রেসমী বস্ত্র সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। লাহোর এবং কাবুল পর্য্যন্ত সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে এবং বিদেশে প্রতি বৎসর কার্পাস বস্ত্র কত পরিমাণে রপ্তানী হয়, তাহার পরিমাণ করা সম্ভবপর নহে। এদেশের রেশমী বস্ত্র পারস্য, সীরিয়া, সৈয়দ এবং বেরটের বস্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম নয় বটে, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা দাম অনেক সস্তা। আর আমি একজন দক্ষ লোকের নিকট শুনিয়াছি যে যদি রেসম ভাল করিয়া বাছাই করিয়া আরও অধিক যত্নের সহিত বয়ন করা যায় তাহা হইলে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টতর বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। কাশিমবাজারে ওলন্দাজদিগের যে কুঠী আছে তাহাতে ৭০০।৮০০ দেশী কারীকর কাজ করে। ইংরেজ ও অন্যান্য বণিকদের কুঠীতেও ঐরূপ বহু লোক কাজ করে।

বাঙ্গালা সোরার প্রধান আড্ডা। পাটনা হইতে প্রভূত পরিমাণে এই দ্রব্য আমদানী হয়। নৌকাযোগে গঙ্গা নদী দিয়া এই দ্রব্য অতি সহজে আইসে। ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকেরা ইহা ভারত-বর্ষের নানা স্থানে এবং ইয়ুরোপে রপ্তানী করে।

বাঙ্গালায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট গালা, অহিফেন, মোম, মৃগনাভি, লঙ্কা ও নানাবিধ মশলা ও ঔষধ পাওয়া যায়। ঘৃত ও মাখন সামান্য দ্রব্য মনে হয়, কিন্তু ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তাহার আধার বৃহদাকারের হইলেও সমুদ্রযানে নানা দেশ বিদেশে রপ্তানী হয়।

বাঙ্গালা এরূপ ধনধান্যশালী হইলেও ইহার আবহাওয়া বড় ভাল নহে, বিশেষতঃ বিদেশী-গণের পক্ষে বড়ই মারাত্মক। যখন ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা প্রথমে এদেশে বাস করে তখন তাহাদের মধ্যে ভয়ানক মড়ক হয়। আমি বালেশ্বরে দুই খানি সুন্দর জাহাজ দেখিয়াছি। হলন্দের সহিত যুদ্ধ বাধায় উহা একবৎসর ঐ বন্দরে থাকিতে বাধ্য হয়। ঐ সময়ের পর যুদ্ধাবসানে লোকাভাবে আর উহা সমুদ্রে ভাসিতে পারিল না। ঐ জাহাজের অধিকাংশ লোকই রোগে মরিয়া গিয়াছিল। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সাবধান থাকায় উহাদের মধ্যে মড়ক অনেক কমিয়াছে।

জাহাজের কর্ত্তারা এখন নাবিক দিগকে পূর্ব্বের ন্যায় "পঞ্চ" মদ্য পান করিতে দেন না বা বাজারে বেড়াইতে দেন না। গুড় চোলাইকরা "এরাক" নামক মদ্যে, লেবুর রস জায়ফল এবং জল মিশাইয়া এই "পঞ্চ" প্রস্তুত হয়। ইহা খাইতে সুস্বাদু বটে কিন্তু বড়ই অনিষ্টকর।

বাঙ্গালার শোভা বর্ণন করিতে হইলে গঙ্গার উভয় পার্শ্বের খাল গুলির উল্লেখ করিতে হয়। রাজমহল হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য খাল আছে। এই খাল গুলি বহু পরিশ্রমে খাত। এগুলির উভয় পার্শ্বে বহুজনাকীর্ণ নগর ও জনপদ অবস্থিত। মধ্যে ধান, আখ, সরিষা, তিল, তুঁত প্রভৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্র।

বীমা পদ্ধতি।

মনুষ্য মাত্রেরই অসময়ের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় আবশ্যক। যাঁহারা এই টুকু বুঝেন না তাঁহাদের কোন কালে দুঃখ ঘুচেনা। আমাদের দেশে "ছুতরে কাণ্ড" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। একজন ছুতর মিস্ত্রী যাহা রোজগার করে আজ কাল একজন কেরাণীবাবুর তাহা করা দুর্ঘট, কিন্তু অধিক রোজগার করিয়াও ছুতরের ঘরে হাহাকার ঘুচে না। কেরাণী বাবুর ঘরে যে হাহাকার ঘুচে সে কথা বলিনা, কিন্তু উভয়ের তুলনায় আমরা আলোচনা করিতেছি। ইহার কারণ, এক জন দূরদর্শী ও সঞ্চয়ী, অপরে তাহা নহে। শুধু ছুতর কেন, আমাদের দেশে শ্রমজীবী মাত্রেরই এই দুর্দ্দশা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি একটী সরকারী কারখানায় কএকজন কামার ভাইস্‌মেন মাসে ৪০৲। ৫০৲ টাকা রোজগার করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা ২৫৲। ৩০৲ টাকার কেরাণীর অপেক্ষা অনেক গুণে হীন। পোষ্যবর্গের সংখ্যা বেশী বলিয়া এ দুর্দ্দশা নহে, আমরা বেশ দেখিয়াছি, অসময়ের জন্য সঞ্চয়ের অভাবই তাহার কারণ।

আয় আরও বাড়ুক তবে সঞ্চয় করিব, এরূপ যাঁহারা ভাবেন তাঁহাদের কোন কালেই সঞ্চয় করা হয় না। মনুষ্যের অভাবের শেষ নাই, খরচেরও শেষ নাই। যতই আয় বাড়ুক, সঙ্গে সঙ্গে খরচও বেশী হইবে। এই হিসাবে রাজরাজেশ্বরের দশা যা, আর সাত টাকা উপায়ী মুটে মজুরেরও তাই। সমস্ত অভাব পূর্ণ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকে জগতে এরূপ অবস্থার লোকের সংখ্যা বড়ই কম। তবে যাঁহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা আছে, যে অবস্থায় হউক না তাঁহারা তাহারই মধ্যে সঞ্চয় করিবেন। ইহা আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই। মানুষের অবস্থা আর বাস্পীয় পদার্থের অবস্থা একটা প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত দেখিতে পাই। বাস্পীয় পদার্থের স্বধর্ম্ম এই যে তাহার আকার বিস্তার প্রবণ। কোন আধারের মধ্যে আবদ্ধ না হইলে তাহার বাড় অনন্ত। আবার পক্ষান্তরে ঐ আধার আকারে ও আয়তনে যে যেরূপই হউক না, বাস্প তাহারই মধ্যে আপনার স্থান সংকুলান করিয়া লইবে। তবে আধার যত ছোট হইবে বাস্পের উপর চাপও তত বেশী হইবে। মানুষের অবস্থাও ঠিক তাই—তাঁহার বাড়ের সীমা নাই, তবে যখন যেমন—নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে যাইবার উপায় নাই। বাধ্য হইয়া সকলকে আপনার অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সেই অবস্থার মত ব্যবস্থা করিতে হইবে। যিনি তাহা না পারেন তিনিই উচ্ছন্ন গেলেন। সেই জন্য মানুষের অন্যান্য গুণের মধ্যে সঞ্চয়শীলতা শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক, নতুবা দারিদ্রের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই।

পূর্ব্বে এ দেশে লোকে লক্ষ্মীর কৌটায় কিছু টাকা কড়ি রাখিত, উহা প্রাণান্তেও খরচ করিতনা; যদি অনন্যোপায় হইয়া কখন তাহাতে হাত দিত তাহা হইলে প্রথম সুযোগেই সুদ সমেত সে টাকা যথা স্থানে পুনরায় রাখিয়া দিত। এখনও হিন্দু গৃহস্থের ঘরে এ প্রথা লোপ পায় নাই, কিন্তু তাহার মর্ম্ম লোপ পাইয়াছে। এখন উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কেবল নিয়ম রক্ষার জন্য অতি সামান্য মাত্র টাকাই লক্ষ্মীর কৌটায় থাকে। লক্ষ্মীর কৌটা শূন্য হওয়াতেই এ দেশ ক্রমশঃ লক্ষ্মীছাড়া হইয়া যাইতেছে।

সঞ্চয় অনেকে অনেক উপায়ে করে। আমরা দেখিয়াছি—এক ব্যক্তি একটী বাক্সের চারি দিক আঁটিয়া উপরের ডালায় একটী ছিদ্র রাখিয়া ছিলেন; পয়সা, দুআনি, সিকি, আধুলি অথবা টাকা যখন যাহা সুবিধা পাইতেন তাহার মধ্যে ফেলিতেন। তাহা সহজে বাহির করিবার আর উপায় ছিলনা। বাক্সটী পূর্ণ হইলে মিস্ত্রী দ্বারা খুলাইয়া সে গুলি বাহির করিতেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা গাঁথাইয়া কাগজ করিতেন এবং পুনরায় সেই বাক্স বন্ধ করিয়া ঐ রূপ করিতেন। বলা বাহুল্য, ইহাঁকে কোন দিন পয়সা অভাবে কষ্ট পাইতে হয় নাই। ফলে, সঞ্চয়ের উপর হাত দিব না, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রতিজ্ঞা না করিলে সঞ্চিত ধন অব্যাহত থাকিতে পারে না।

সঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে কেহ টাকা মাটিতে পুতিয়া রাখে, কেহ অলঙ্কার গড়ায়, কেহ বিশ্বাসী লোকের কিম্বা মহাজনের নিকট অথবা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে। এ দেশের লোক সোণা রূপার অলঙ্কারে অনেক টাকা আবদ্ধ রাখে বলিয়া সাহেবেরা আমাদের উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু এই

অলঙ্কার বিপদের সময় কি রূপ উপকারে আইসে তাহা যদি জানিতেন তবে কখন উপহাসের কথা মুখে আনিতেন না। রাত দুপরে হঠাৎ বিপদ পড়িলে ব্যাঙ্কের জমা বহি বা কোম্পানীর শেয়ার ছেঁড়া কাগজের সামিল—সোণা দানাই তখন বিপদের কাণ্ডারী। স্ত্রীলোকদিগকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত রাখিবে, ইহা আমাদিগের লোকহিতৈষী দূরদর্শী শাস্ত্রকারগণের আদেশ। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় ইহা অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কথা আর অধিক কিছুই হইতে পারে না। যাঁহার গৃহে গৃহলক্ষ্মীগণ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, অলক্ষ্মী তাঁহার গৃহের ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে না। তবে এরূপ সঞ্চিত টাকাটা আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার আর বৃদ্ধি হয় না, বরং ব্যবহারে কিছু ক্ষয় হয়। বর্ত্তমান অর্থনীতিশাস্ত্র মতে তাহা ব্যাকুবী।

সঞ্চয়ের সহায়তা ও অসময়ে উপায়ের জন্য অনেক লোকে অনেক মাথা ঘামাইতেছেন। সেভিংস ব্যাঙ্ক, কৃষি ব্যাঙ্ক, প্রবিডেণ্ট ফণ্ড, পেন্সন ফণ্ড, এনুইটী ফণ্ড, ইনস্যুরেন্স প্রভৃতি বহুধা সঞ্চয়ের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে Insurance বা বীমা পদ্ধতির আলোচনা করিব।

প্রতি দিন যদি কেহ ৻৫ এক পয়সা করিয়া একস্থানে ফেলিয়া রাখেন, তাহা হইলে মাসে ।৵১০ সাড়ে সাত আনা হইবে এবং বৎসরে (৩৬০ দিনে) ৫।০ পাঁচ টাকা চারি আনা হইবে। ৩০ বৎসরে ১৫৭৸০ হইবে। এটা কি সামান্য টাকা! একটা একটা পয়সা কতদিকে কত নষ্ট হয়, সেগুলি যত্ন করিয়া রাখিলে লোকের একটা পুঁজি হয়। পয়সায় যত্ন করিলে টাকার যত্ন আপনা আপনি হয়। ইংরাজী প্রবাদই আছে "Take care of the pennies and the pounds will take care of themselves"—পয়সা গুলি যত্নে রাখিও, টাকা নিজে নিজেই সাবধানে থাকিবে।

মাসে ২৲ টাকা করিয়া জমাইতে পারিলে বৎসরে ২৪৲ জমে এবং ৩০ বৎসরে ৭২০৲ হয়। যদি পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা যায় তাহা হইলে শতকরা ৩৵০ টাকা হারে সুদ হয় এবং এক বৎসর অন্তর উহা পাওয়া যায়। যদি টাকা স্পর্শ করা না যায় এবং প্রতি বৎসরই সেভিংস ব্যাঙ্কে ২৪৲ টাকা করিয়া জমা পড়ে তাহা হইলে চক্রবৃদ্ধির নিয়মানুসারে ঐ টাকা বাড়িয়া ৩০ বৎসরে ১১৯৪।৫ হইবে! এতটা টাকা আমাদের দেশের অনেকের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বিষয়।

যদি এই ২৪৲ টাকা শতকরা ৬'০ হিঃ সুদে খাটে আর ৬ মাস অন্তর ঐ সুদ আসলে জমে তাহা হইলে চক্রবৃদ্ধির নিয়মানুসারে ৩০ বৎসরে ২০৪৪৸৵০ টাকা হয়! আমাদের দেশে গরীব লোক ইহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে সময়ে সময়ে বাধ্য হয়। এখানে চাষীরা মহাজনকে ধানের বাড়ী দেড়া অর্থাৎ শতকরা ৫০৲ দিয়া থাকে!! সুতরাং ঋণ ঝট শোধ করিতে না পারিলে কোন কালে শোধ হয় না। পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন আমাদের দেশের গরীব লোক যাহারা মহাজনের হাতে একবার পড়ে তাহাদের এত দুর্দ্দশা কেন, আর যাঁহারা এ দেশে মহাজনী করেন এবং খাটাইবার ধন আদৌ স্পর্শ না করেন, তাঁহাদের ধন এত শীঘ্র বাড়িয়া যায় কেন।

এই যে সঞ্চয়ের কথা বলা গেল, উহা নিয়মিত রূপে হওয়া চাই; আর উহা হইতে কোন খরচ না হওয়া চাই। বাধা পাইলে অথবা ভাঙ্গা পড়িলে আর এত টাকা হইবে না। কিন্তু আমাদের এই দারিদ্রপ্রপীড়িত দেশে কয় জন এরূপ ভাবে নিয়মিত রূপে জমাইতে পারেন? আজ আমার রোজকার আছে, পারিলাম। কাল শরীরের অসুস্থতা, আয়ের লাঘব, পারিবারিক বিপদ, শ্রাদ্ধ বিবাহাদির ব্যয় প্রভৃতি নানা কারণে এরূপ নিয়ম পালন করা বিশেষ সুকঠিন। তা ছাড়া এরূপ নিয়ম পালনে আমাদের দেশের লোক অনভ্যস্ত।

এই সমস্ত কারণে সঞ্চয়ের এমন একটা উপায় করা আবশ্যক যে লোকের হাতে টাকা আসিলেই জমাইতে পারে, আর বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত হঠাৎ খরচ করিতে না পারে; অথবা যে প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয়, সেই প্রয়োজন ভিন্ন টাকা অন্য বাবদে প্রয়োগ করিতে না পারে। গবর্মেণ্ট পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে টাকার সুদ অত্যন্ত অল্প, আর প্রয়োজন হইলেই লোকে অনায়াসে টাকা উঠাইয়া লইতে

পারে। বিশেষ সঞ্চয়ী লোক ভিন্ন সাধারণ লোকের তাহাতে বিশেষ লাভ নাই।

জীবন বীমা বা Life Insurance সঞ্চয়ের অন্যতম উপায়। বীমা আফিসে বৎসর বৎসর কিছু কিছু টাকা জমা দিলে মৃত্যুর পর অথবা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর, থোক একটা টাকা পাওয়া যায়। বাৎসরিক যে টাকা হয়, তাহা ইচ্ছা করিলে মাসে মাসে অথবা তিন মাস কিম্বা ৬ মাস অন্তর দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহার মাসিক একটা নির্দ্দিষ্ট আয় আছে, তাঁহাদের মাসে মাসে দেওয়াই সুবিধা। যাঁহাদের খাজানার উপর আয়, জমিদার শ্রেণীর ৬ মাস অন্তর কিস্তির সময়ে দেওয়াই সুবিধা। কারবারী ব্যক্তিদের কারবারের মৌসুম অনুসারে বৎসরে একবার দেওয়াই সুবিধা। ফলে যাঁহার যেরূপ সুবিধা তিনি সেইরূপই বন্দোবস্ত করিতে পারেন। তবে দেখা যায়, বৎসরান্তে একবার দিলে যে টাকা দিতে হয়—খুচরা কিস্তিতে দিলে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী পড়ে।

মানুষের বয়স অনুসারে আবার বাৎসরিক দেয় টাকার তারতম্য হইয়া থাকে। যত বেশী বয়সে টাকা দিতে আরম্ভ করা যায়, বাৎসরিক দেয় টাকার হারও সেইরূপ বেশী হইয়া থাকে।

তা ছাড়া আর একটা হিসাব আছে। টাকা কত দিন দিব? এ বিষয়েও বন্দোবস্ত করা যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর টাকা দেওয়া যাইতে পারে, অথবা ২০ বৎসর, কিম্বা ১৫ বৎসর অথবা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত টাকা দেওয়া যাইতে পারে।

মৃত্যুর পর ১০০০৲ টাকা পাইতে হইলে কোন্ বয়সে কত টাকা দিতে হয় নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল। আজীবন দিতে হইলে কত টাকা দেয়, ২০ বৎসর দিতে হইলে কত দেয়, ১৫ কিম্বা ১০ বৎসরে কতই বা দেয়, পাঠক তাহাও এই তালিকায় দেখিতে পাইবেন। এই তালিকাটি কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ জীবন বীমা আফিসের তালিকা হইতে সংগৃহীত।

বয়ঃক্রম	আজীবন দিতে হইলে	২০ বার দিতে হইলে	১৫ বার দিতে হইলে	১০ বার দিতে হইলে
২০	২৪৸৵০	৩৫৵০	৪১৸৵০	৫৫।৵০
২১	২৫।০	৩৫৸০	৪২৵০	৫৬৲
২২	২৫৸০	৩৫৸৵০	৪২॥৵০	৫৬।০
২৩	২৬।৵০	৩৬॥০	৪৩।০	৫৬৸০
২৪	২৬৸৵০	৩৬৸৵০	৪৩॥৵০	৫৭॥৵০
২৫	২৭।০	৩৭।০	৪৪৵০	৫৮॥০
৩০	৩০।৵০	৩৯॥৵০	৪৭৲	৬২৲
৩৫	৩৪৲	৪৩।০	৫০৸০	৬৬৸৵০
৪০	৪০৲	৪৮৸৵০	৫৬॥৵০	৭৩।০
৪৫	৪৮৵০	৫৫৸০	৬৩৸৵০	৮১।৵০

অবশ্য এই হারটি উক্ত বীমা আফিসের হার। অন্য আফিসের হার ইহা অপেক্ষা কিছু তফাৎ হইতে পারে। কোন্ আফিসের হার অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক, কাহারও কিছু কম। কিন্তু বড় বেশী তফাৎ হইবার যো নাই, তাহার কারণ এই হার ইচ্ছামত ঠিক করিলে চলিবে না। গণিত শাস্ত্রের উপর ইহার ভিত্তি। অনেক দিক দেখিয়া শুনিয়া হিসাব করিয়া তবে চলিতে হয়। আমরা সে হিসাব বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

পাঠক উপরি উক্ত তালিকা হইতে কয়েকটি অঙ্ক লইয়া কষিয়া দেখুন। প্রথম পংক্তি হইতে (অর্থাৎ ২০ বৎসর বয়সে যত দিতে হয়) তাহা লওয়া যাউক।

১০ বার দিলে বাৎসরিক ৫৫।৵০ দেয়;

অতএব মোট ৫৫।৵০ × ১০ = ৫৫৩৸০

১৫ „ … … ৪১৸৵০

অতএব মোট ৪১৸৵ × ১৫ = ৬২৭৵০

২০ „ … … ৩৫৵০

অতএব মোট ৩৫৵০ × ২০ = ৭০২॥০

অর্থাৎ কুড়ি বৎসর বয়সের এক জন ব্যক্তি এই টাকা দিলে, মরণান্তে তাঁহার এক হাজার টাকা স্থিতি হইবে। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য না দেন, তাহা হইলে মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর ২৪৸৵০ দিতে হইবে।

এক জন মানুষ ৫৫ কিম্বা ৬০ বৎসর বাঁচিবে এরূপ আশা করা যায়। সুতরাং যাহার ২০ বৎসর বয়স, সে আরও ৩৫।৪০ বৎসর বাঁচিতে পারে। কাজেই না মরিলে অর্থাৎ আর ৩৫।৪০ বৎসর গত না হইলে সে টাকা পাইবে না। এই ৩৫।৪০ বৎসরে তাহাকে কত দিতে হইবে পাঠক তাহা কষিয়া দেখিবেন।

আমরা প্রস্তাবের প্রথমাংশে দেখাইয়াছি,

নির্দ্দিষ্ট নিয়মে টাকা জমাইতে পারিলে এবং তাহার উপর সুদ চলিলে ৩০ বৎসরে কত হয়।

আমরা উপরে যে হিসাব দিলাম মিয়াদ পুরা হওয়া পর্য্যন্ত ঐ টাকা দিতে হইলে, দেখা যাইবে যে, তাঁহার প্রাপ্য টাকা, দেয় টাকা এবং তাহার সুদ অপেক্ষা অনেক কম। এই টাকাটা বীমা কোম্পানির লাভ, আর তাঁহার লোকসান।

তা ছাড়া গহনা গড়াইলে, ব্যাঙ্কে রাখিলে, কোম্পানির কাগজ কিনিলে বা অন্য কোনরূপে সঞ্চয় করিলে, ইচ্ছা করিলে টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু বীমা কোম্পানিতে টাকা দিলে যখন ইচ্ছা উহা ফেরত পাওয়া যায় না। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হইলে জীবন বীমা বন্ধক রাখিয়া কিম্বা বেচিয়া ফেলিয়া টাকা যে পাওয়া যায় না তাহা নহে, তবে সেরূপ করিতে গেলে লোকসান বিস্তর। এই হিসাব করিয়া লাভালাভ খতাইলে জীবন বীমায় টাকা দেওয়া লোকসান।

তা ছাড়া যদি পাওনার সময় বীমা আফিস হইতে টাকা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকলই নিষ্ফল। সুতরাং যে জীবন বীমা আফিসে টাকা দেওয়া যায়, তাহার ভিত্তি কিরূপ দৃঢ় এবং তাহার টাকা দিবার ইচ্ছা ও সামর্থ কত দুর, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়।

এই ত গেল লোকসান ও বিপদের কথা। কিন্তু আর এক দিক দেখ। মানুষের জীবন কি নিশ্চিত? আজ আছে, কাল নাই। তখন? কোন সংসারের রোজগারী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যে কি বিপদ হয় তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক; সকলে নিত্য নিত্য তাহা দেখিতেছেন। মৃত্যুর কালাকাল নাই, হঠাৎ যখন তখন হইতে পারে। জীবনের এই অনিশ্চয়তা জন্যই বীমা পদ্ধতির প্রয়োজন এবং তজ্জন্য তাহার এত চলতি। ইহার কল্যাণে কত নিরাশ্রয় পরিবার যে অনশনের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিঘ্ন বিপদ হইতে রক্ষা করে বলিয়া এই পদ্ধতির নাম ইনসিওরেন্স। Insure শব্দের অর্থ নিশ্চয় করা। কেবল জীবন বীমা পদ্ধতি যে সমাজে প্রচলিত তাহা নহে। জীবন বীমা ছাড়া বহু প্রকারের Insurance আছে। জলের ভয়, আগুনের ভয়, প্রভৃতি অনেক ভয় আছে। সে সমস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য Marine Insurance, Fire Insurance প্রভৃতি আছে। পোষ্ট আফিস দিয়া টাকা পাঠাইতে হইলেও টাকা মারা যাইবার আশঙ্কা আছে। টাকার দায়িত্ব যদি পোষ্ট আফিসকে লইতে হয়, তাহা হইলে, তাঁহারা অতিরিক্ত ইনসিওরেন্স মাসুল লয়েন। সুতরাং যদি বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হয়, তাহা হইলে কিছু কিছু খরচ করিতে বা মাশুল দিতে লোকে কাতর নহে, আর সেরূপ দেওয়াও অসঙ্গত বা অবিবেচনা, সিদ্ধ নহে। এই সমস্ত কারণে ইনসিওরেন্স বা বীমা পদ্ধতি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মাটির বাসন।

যেমন বঙ্গদেশে কোন কোন দেবমন্দির পূর্ব্বকালে বিবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত পোড়া মাটির ইটে গাঁথা হইত এবং ঐ সকল ইটের উপর হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি ছাঁচে ঢালা হইত, উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব প্রভৃতি দেশেও তদ্রূপ মুসলমানদিগের রাজত্বকালে মসজিদাদির মেজে, দেওয়াল, থাম ইত্যাদি সুশোভিত করিবার জন্য বিবিধ বর্ণের ও চিত্রের চিক্কণ (Glazed) টাইল প্রস্তুত করা হইত। এইরূপে মধ্য-ভারত ও পশ্চিম প্রদেশসমূহে যেমন এক সময়ে পাথরের উপর হিন্দু-ভাস্করদিগের কারুকার্য্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সেইরূপ মুসলমানদিগের ধর্ম্মমন্দির, কবর ও কীর্ত্তিস্তম্ভাদিতে বহুবিধ মূল্যবান প্রস্তর-খচিত কারুকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সুন্দর চিত্রের বার্ণিস করা বা চিক্কণ (Glazed) পোড়ামাটির ইট ও টালিরও সমাবেশ দেখা গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা উপরি উক্ত উভয়বিধ শিল্পকার্য্যই বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে সেরূপ দেবদেবীর মূর্ত্তিযুক্ত ছাঁচে ঢালা ইট আর প্রস্তুত হয় না এবং উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য-ভারতে যে সকল রঙ্গীণ টালি প্রস্তুত হইত, তাহা আজকাল অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে, পোড়ামাটির রঙ্গীণ টালির চিত্র-শিল্প চীনদেশ হইতে আনীত হয়। এইজন্য পঞ্জাবের যে সকল মুসলমান কারিকর এই কার্য্যে

এখনও ব্রতী, তাহাদিগকে "চিনিগর" বলে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহার আদিস্থান সমরকন্দ ও পারশ্যদেশ। শেষোক্ত প্রবাদটী যে মিথ্যা, তাহাও মনে হয় না, কেন না, পারশ্যদেশের কার্পেট জগতে অতুলনীয়। ঐ সকল কার্পেটের মনোহর লতা-পাতার আদর্শেই এই সকল রঙ্গীণ টাইল সম্ভবতঃ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। যাহা হউক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই শিল্প এক্ষণে ভারতবর্ষের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণেই দৃষ্টিগোচর হয়। এখন আর সেরূপ বিবিধ চিত্রের ইট বা টালির আদর নাই। সুতরাং ক্রমেই সে ব্যবসায় বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কালের বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে? একদিকে মুসলমান-শাসনের অধঃপতন হইল, অন্যদিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত শিল্পিকুলের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। দেশবাসিগণের নিকট হইতে শিল্পিগণের অর্থাগমের পথ অবরুদ্ধ হইল। এদিকে ইংরেজদিগের রাজত্বসময়ে উক্ত শিল্পিগণের উপার্জ্জনের এক অভিনব পন্থা উদ্ভূত হইল। ইংরেজগণ দেখিলেন যে, ঐরূপ বিচিত্র বর্ণের বিবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত হইলে, তাঁহাদিগের গৃহাদি সুসজ্জিত হইতে পারে। সুতরাং ইংরেজদিগের অনুগ্রহে আজকাল বহুবিধ লোটা, থালা, সুরাহি (কুঁজা) প্রভৃতি পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, কচ্ছদেশ, জয়পুর, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও হায়দরাবাদে প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল দ্রব্য দেশীয় বড়লোকদিগের ভবনে প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত ইংরেজদিগের বাসগৃহমাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিছুকাল হইতে এই শিল্পের সমাদর বৃদ্ধি হওয়াতে আজকাল দুই একটী শিল্প-বিদ্যালয়েও ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। জয়পুর মহারাজের শিল্প-বিদ্যালয়ে বৎসরে বৎসরে অনেক রকম মাটির বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ শিল্প-বিদ্যালয়েও ইহা প্রস্তুত হয়। বোম্বাই শিল্প-বিদ্যালয়ের দ্রব্যগুলি এতই সমাদৃত হয় যে, টেলরী নামক কোন সাহেব এক্ষণে একটী কারখানা খুলিয়া উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপে দিল্লী, লাহোর, মূলতান, হালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, জয়পুর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত বহুবিধ দ্রব্য য়ুরোপের নানাস্থানের অধিবাসিগণের গৃহে শোভা পাইতেছে। সিন্ধুদেশের হালা নামক স্থানের বৃহদাকার মাটির দ্রব্যগুলির কোন কোনটীর মূল্য দুই শত টাকারও অধিক। এগুলি প্রধানতঃ পাত ও ধূসরবর্ণে রঞ্জিত। বোম্বাই সহরের টেলরী সাহেবের কারখানার দ্রব্যগুলিও অধিকাংশ ঐ রূপে চিত্রিত ও রঞ্জিত। কিন্তু অন্যান্য জায়গার মাটির বাসনগুলি প্রায়ই ফিকে নীল জমির উপর গাঢ় নীল রঙ্গে প্রস্তুত। পঞ্জাবের মধ্যে মূলতান সহরেই এইরূপ উৎকৃষ্ট নীলরঙ্গের দ্রব্যাদি তৈয়ার হইয়া থাকে। কলিকাতায় ১৮৯৩-৯৪ সালে যে সার্ব্বভৌমিক প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা হয়, তথায় ভারতবর্ষের যে সকল মাটির বাসন প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাছা বাছা দ্রব্যগুলি ভারতগবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া কলিকাতা যাদুঘরের ইনডষ্ট্রীয়ল বিভাগে সাধারণের দেখিবার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। মূলতানে প্রস্তুত দুইটী মাটির দ্রব্যের প্রতিকৃতি এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার সম্মুখে দেওয়া গেল। ছবি দুইটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের আর আর শিল্প যেমন স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এখানকার সামান্য মাটির বাসনও তদ্রূপ বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপের অধিবাসিগণের চিত্তাকর্ষণে কোন অংশে হীন নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের ধনিগণ, বিশেষতঃ রাজা মহারাজা প্রভৃতি যদ্যপি এই শিল্পিগণকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। *

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ধর, এফ আর জি এস,
(লণ্ডন)।

* ধর মহাশয় এই পত্রে প্রদর্শিত দুইটী চিত্র ১৮৯৫ সালে তদানীন্তন ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়ট ও বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সার আলফ্রেড ক্রফট বাহাদুরকে প্রেরণ করেন। ক্রফট সাহেব তাঁহার পত্রে ধর মহাশয়কে তাঁহার নিজের ও ছোটলাট সাহেবের অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া লিখেন যে drawings of such illustrations "would be very useful as models for the Drawing Classes which are being established in large numbers throughout Bengal".—সং।

উদ্ভিদ্ রোগ।

মানুষের এবং সাধারণ জীবসমূহের যেরূপ রোগ হইয়া থাকে, উদ্ভিদ্ জাতির মধ্যেও সেইরূপ রোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহমধ্যস্থিত রসরক্তাদির বিকৃতি ও যন্ত্রাদির বিশৃঙ্খলা হইতেই রোগ উৎপন্ন হয়। জল বায়ু তাপ প্রভৃতির মধ্যে কোনটীর অভাব অথবা আধিক্য হইলে উদ্ভিদেরও আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। এইরূপ বিশৃঙ্খলাতেই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণেও রোগ উৎপন্ন হয়।

মানব ও পশুসমূহের রোগ সম্বন্ধে যেরূপ অনুসন্ধান হইয়াছে, বৃক্ষাবলীর রোগ নির্ণয় করিবার জন্য তাদৃশ যত্ন করা হয় নাই। য়ুরোপ এবং আমেরিকায় এই বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছে এবং অনেক জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের সাহায্যে উদ্ভিদ্‌রোগ এবং তাহার নিবারণোপায় অনেকাংশে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের উদ্ভিদ্ সমূহের রোগ সম্বন্ধে তাদৃশ অনুসন্ধান হয় নাই। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষগণের অধ্যবসায় এবং যত্নে কতকগুলি রোগ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমরা প্রধানতঃ সেই সমস্ত পুস্তক হইতে উদ্ভিদ্ সকলের কয়েকটি রোগের বিষয় উল্লেখ করিব।*

উদ্ভিদ্ জাতি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর রোগদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। (১) ফঙ্গাস্ (Fungus) নামক একপ্রকার উদ্ভিদ (বেঙ্গের ছাতা এই জাতীয়) গাছের কোন অংশ আক্রমণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং দেহতন্তু সমূহের বিশ্লেষণ সাধিত করিয়া গাছকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই সমস্ত উদ্ভিদ আনুবীক্ষণিক, অর্থাৎ এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ ব্যতীত শাদা চোকে দেখা যায় না। ইহাদের বীজ বায়ুমণ্ডলে, মৃত্তিকায় অথবা জলে অবস্থান করে। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষের কোষ (cells) মধ্যস্থিত উপাদান সমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। পরে ঐ সকল বীজ হইতে সূত্রবৎ দীর্ঘ তন্তুসমূহ বহির্গত হইয়া বৃক্ষে মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারা বৃক্ষের কোষ মধ্যস্থিত পদার্থগুলি ক্রমশঃ আপনাদের পরিপুষ্টির জন্য ব্যয়িত করিয়া ফেলে। সুতরাং তাহাতে বৃক্ষ ক্রমশই নিস্তেজ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। এই জাতীয় উদ্ভিদের একটী লক্ষণ এই যে ইহারা অপরাপর বৃক্ষের ন্যায় স্বয়ং জল বায়ু মৃত্তিকা হইতে আহার সংগ্রহ করিতে পারে না। কোন জীবন্ত বৃক্ষের রস শোষণ করিয়া অথবা মৃত এবং পচনশীল পদার্থের উপর জন্মিয়া পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। বেঙ্গের ছাতা শেষোক্ত বিভাগের উদাহরণ স্থল।

২। কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বৃক্ষের শত্রু। সাধারণতঃ কীট সমূহের জীবনের চারিটী প্রধান অবস্থা আছে। এই চারি অবস্থায় চারি প্রকার রূপ যথা (১) অণ্ড, (২) কীট (Larva), সাধারণতঃ লোকে ইহাকে পোকা বলিয়া থাকে. (৩) গুটি, (৪) প্রজাপতি। যাঁহারা রেশমের পোকা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কীটের এই চারিটী অবস্থা সহজে বুঝিতে পারিবেন। পোকা অবস্থায় সাধারণতঃ কীটসমূহ আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গুটি হইতে বাহির হইয়া কীট আর বাড়ে না। কোন কোন কীটের পূর্ব্বোক্ত চারিটী অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন কোন কীট গুটি না বাঁধিয়াই প্রজাপতির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পূর্ণ অবস্থায় কীটসমূহের সচরাচর ৬টি পদ এবং ২টি শুঁড় থাকে। শরীর তিনটি অংশে বিভক্ত— মস্তক, বক্ষ এবং উদর। বক্ষোদেশেই পদকয়েকটি সংলগ্ন থাকে। কীটসমূহের মস্তকের নানারূপ গঠন প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন কীট মুখ দিয়া কেবল দংশন করিয়া থাকে, কেহ কেবল শোষণ করে এবং অপর কতকগুলি উভয় কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। সমস্ত কীটেরই লিঙ্গ ভেদ আছে। কতকগুলি কীট পুরুষ এবং কতকগুলি স্ত্রী। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতীয় কীট সকল আকারে বড় হইয়া থাকে। অধিকাংশ কীটই ডিম পাড়িয়া থাকে।

উদ্ভিদ সমূহের রোগ প্রকৃতরূপে নির্ণয় করিতে হইলে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

* (1) Indian Museum Notes.
(2) Surgeon-Major A. Barday's Papers on Fungiod Blights.
(3) Indian Fungi (Crop Disease and Pest Series no. 1.)

উপস্থিত ক্ষেত্রে এতদ্দেশীয় কয়েকটি প্রধান ফসলের রোগ সমূহ এবং তাহাদের নিবারণোপায় বর্ণনা করা যাইবে।

ধান্য।

(১) চালে যে পোকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বৈজ্ঞানিক নাম ক্যালাণ্ড্রা অক্সিজী (Calandra Oxyzeæ) এই কীট ধান গাছকে আক্রমণ করে না, কিন্তু গৃহসঞ্চিত ধান্যের ইহা বিশেষ শত্রু। যতদিন পর্য্যন্ত ধান্যের গায়ে তুষ থাকে সে পর্য্যন্ত এই জাতীয় কীট কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু ইহারা চালই বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া থাকে। ইহার আয়তন ⅙ ইঞ্চি হইতে কিছু বেশী। এই কীটের একটী লক্ষণ এই যে ইহার কৃষ্ণবর্ণ পক্ষাবরণের উপর চারিটি লাল বিন্দু আছে। ধান্য ব্যতীত গম এবং ভুট্টাও এই কীট দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।

"বাইসল্‌ফাইড্‌ অব কার্ব্বন, নিমপাতা, গন্ধক ইহা নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কোনটীর বিশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারা যায় না। যে স্থানে পূর্ব্বে পোকা লাগিয়াছিল সেরূপ দূষিতস্থলে শস্য না রাখা এবং শস্যের সহিত যাহাতে অধিক পরিমাণে ধূলা বালি আবর্জ্জনা প্রভৃতি মিশ্রিত না হয় সেরূপ উপায় অবলম্বন করা এই রোগ নিবারণের প্রশস্ত উপায়।

(২) বালেশ্বর এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধান্যের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বহির্গত হইলেই এক প্রকার কীট (Cut-worms Agrotis Suffura Habee) এই সকল চারা নষ্ট করিয়া ফেলে।

ঐ জাতীয় কীট যে সকল পাতা খাইতে ভাল বাসে সেইরূপ পাতায় প্যারিস গ্রীন্ (Paris Green) নামক বিষাক্ত পদার্থের জল ছিটাইয়া চারা বাহির হইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে রাখিয়া দিতে হয়। ইহাতে অধিকাংশ পোকা পাতা খাইয়া মরিয়া যায়।

(৩) বাখরগঞ্জ, কটক এবং হাজারিবাগ অঞ্চলে ও অপরাপর স্থানে ধান্যে ভোমা (Leptocorisa Acuta Thumb) নামক আর এক প্রকার কীট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের প্রথমে খুব বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইলে ইহা ধান্যের বীজ বা নূতন চারাগুলি আক্রমণ করে এবং সময়ে সময়ে বার আনা ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে।

উদ্ভিদ আবর্জ্জনা, যেদিকে বাতাস বহিতেছে সে দিকেই পোড়াইয়া ক্ষেত্রে ভাল করিয়া ধুঁয়া দিলে ইহাদের আক্রমণ নিবারণ করা যায়।

(৪) অপর এক প্রকার কীট বর্ষাকালে বহুল পরিমাণে ধান্যক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয় (Hispa Ænexeus Baly)। ইহারা গাছের পাতা এবং ডাঁটার ছাল খাইয়া ফেলে সুতরাং গাছের তন্তুগুলি বাহির হইয়া পড়ে। এই জাতীয় পোকা কখনও সমুদয় ফসল নষ্ট করে না। সাধারণতঃ উক্ত কীটের আক্রমণে শতকরা ১২ হইতে ৫০ ভাগ ফসল নষ্ট হইয়া যায়।

ইহা নিবারণ করিবার দুইটী উপায় রহিয়াছে:—১মতঃ ক্ষেত্রের জল বাহির করিয়া দেওয়া, কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সমস্ত গাছ জলে ডুবিয়া থাকে সে সমস্তই বেশীর ভাগ কীট দ্বারা আক্রান্ত হয়। ২য়তঃ খড়ের সহিত কাঁচা পাতা দিয়া আগুন লাগাইয়া দিতে হয়, ইহাতে ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে ধুঁয়া হইলে কীট মরিয়া যায়। পোকা অবস্থায়ই এই জাতীয় কীট গাছের অনিষ্টকারী।

ভুট্টা।

ভুট্টার এক প্রকার পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিদ জাতীয় রোগ হইয়া থাকে। ভূমির উপরিস্থিত গাছের সমস্ত অংশকেই ইহা আক্রমণ করিয়া থাকে। গাছের সর্ব্বশরীরে ছোট বড় গুটি বা ফুলা দৃষ্টিগোচর হয়; এই সমস্ত গুটি বা স্ফীত অংশ ফাটিয়া গিয়া এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ঈষৎ তরল পদার্থ নির্গত হয়। যখন ফল এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন আদৌ দানা হয় না, কেবল উহার গায়ে কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভুট্টা ক্ষেত্রেই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং কৃষকের সমূহ ক্ষতি সাধন করে। একটী গাছে রোগ প্রকাশ পাইলে ক্রমশঃ ক্ষেত্রস্থিত সমস্ত গাছ গুলিতে উহা ছড়াইয়া পড়ে এবং পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে রোগ আর নিবারণ করা যায় না। তজ্জন্য কোন গাছে রোগের লক্ষণ দেখিতে পাইলেই উহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে এবং সমস্ত আক্রান্ত অংশ পোড়াইয়া ফেলিবে। ভজিন

এই রোগ যাহাতে একবারেই না হয় তাহার একটী উপায় রহিয়াছে। বুনিবার পূর্ব্বে বীজ গুলিকে শতকরা ২ভাগ হীরাকস মিশ্রিত জলে ৩।৪ ঘণ্টার জন্য ভিজাইয়া রাখিবে। ইহাতে বীজের উৎপাদিকাশক্তি নষ্ট হয় না।

ইক্ষু।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক প্রকার ব্যারাম হইয়া বোম্বাই অঞ্চলে আখের চাষ ঐ প্রদেশ হইতে প্রায় এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। ঐ রোগের নাম ধসা (Dæatræa Bacharatis Fabur)। কোন কোন স্থলে কৃষকেরা ইহাকে মাজেরা বলিয়া থাকে। এই পোকা ডাঁটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্তু সমূহ বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করে, তাহাতে গাছ গুলি একবারেই অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। ১৮৫৭ সালে হুগলী, রঙ্গপুর এবং বর্দ্ধমান অঞ্চলে উৎপন্ন লাল বোম্বাই আখ এই কীটদ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রায় সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যে সময় জলের অভাব হয় সেই সময়েই এই ব্যারাম দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন এক জাতীয় আখ এক ক্ষেত্রে অধিকবার চাষ করিলে ঐ আখ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসে এবং তজ্জন্যই রোগে আক্রান্ত হয়। যখন প্রথম রোগের চিহ্ন দেখা যায় সেই সময়ে আখের ডগা অথবা ডাঁটা গুলি ক্ষেত্র হইতে যতদূর সম্ভব দূরে লইয়া গিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হয়, এবং ফসল তুলিয়া লইবার পর ক্ষেত্র হইতে সমস্ত আবর্জ্জনা সরাইয়া ফেলিতে হয়। এতদ্দ্বারা পুনর্ব্বার রোগ হইবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

আখের দ্বিতীয় শত্রু উই। টিকলি হইতে কল বাহির হইবার সময় এবং ক্ষেত্রে ইহারা আখের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে। ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে জল সেচন করিলে এবং উত্তমরূপ খুসিয়া দিলে ইহার অত্যাচার কতক নিবারিত হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কেরোসিন তৈলই নিবারণের সহজ এবং অব্যর্থ উপায়। উই পোকা কেরোসিনের গন্ধ আদৌ সহ্য করিতে পারে না। রোপণ করিবার পূর্ব্বে জলমিশ্রিত কেরোসিন তৈলে আখের টিকলির মাথা যদি ভিজাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে টিকলিতে প্রায় উই পোকা লাগে না।

আখের কোন উদ্ভিদ, ঘটিত ব্যারাম সম্বন্ধে সেরূপ অনুসন্ধান হয় নাই। তজ্জন্য সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবৃত করিবার নাই।

আলু।

(১) বোম্বাই, বাঙ্গালোর, নীলগিরি এবং বাঙ্গলা অঞ্চলে এই ব্যারাম আবির্ভূত হইয়াছে। রোগের প্রথম লক্ষণ এই যে গাছের ডগা শুকাইতে আরম্ভ করে। ঐ সময় হইতে আলুও আর আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। অনেক আলু পচিয়া এবং দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া যায়। আলু কাটিলে ইহার মধ্যে একটী কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার চিহ্ন দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। ক্ষেত্র হইতে সদ্য তুলিয়া আলুগুলি ভক্ষণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তুলিয়া কিছুদিন রাখিলেই পচিয়া যায়।

নিবারণোপায়--উত্তম আলুর বীজ রোপণ করিবে। এক জাতীয় আলু অধিক দিবস চাষ করিলে এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ নিবারিত হয়। তুঁতে /৭॥ সাড়ে সাত সের + চূণ /৸০ বার ছটাক + জল ৪০/৭ চল্লিশ মণ সাত সের। বিঘা প্রতি প্রয়োগ করিবে। কোন কাষ্ঠপাত্রে জল রাখিয়া একটী বস্ত্রে তুঁতে বাঁধিয়া উহাতে ঝুলাইয়া রাখিলে তুঁতে ক্রমশঃ গলিয়া যাইবে। অপর একটী পাত্রে জলের সহিত চূণ উত্তমরূপে মিশাইয়া চালনির দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া তুঁতের জলের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে অবশিষ্ট জল উক্ত তুঁতের জলের সহিত মিশাইয়া দিবে। এই প্রকারে প্রস্তুত জল তুঁতের জলের সহিত মিশাইয়া দিবে। এই প্রকারে প্রস্তুত জল ক্ষেত্রে ছেঁচ দিবার সময় উদ্ধৃত জলের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

(২) আলুর আর এক প্রকার রোগ হয় তাহাতে গাছের পাতা কোঁকড়াইয়া যায়। পরে গাছ আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ক্রমশঃ মরিয়া যায়। বাঙ্গালা প্রদেশে অনেক কৃষকই এই রোগ দেখিয়াছেন। দুই একটী গাছে এই ব্যারাম দৃষ্ট হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ পোড়াইয়া ফেলিবে। অধিক সংখ্যক গাছ এই ব্যারাম দ্বারা আক্রান্ত হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিবে। শত-

করা ১০০ভাগ জলের সহিত ৫ ভাগ হীরাকস মিশ্রিত করিবে। ঐ জল একটী পিচকারীর দ্বারা ক্ষেত্রের সমস্ত অংশে ছিটাইয়া দিবে। পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইতে পারিলে এই রোগ অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে যে সমস্ত রোগের কথা লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন আমাদের দেশীয় ফসল সমূহের আরও অনেক প্রকার রোগ হইয়া থাকে, কতকগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও জানা যায় নাই এবং কতকগুলির নিবারণোপায় এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। ফলতঃ উদ্ভিদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আমাদের দেশে শৈশবাবস্থা।

বিবিধ।

১। লণ্ডন পার্পল (London Purple)—১০ সের ময়দার সহিত ২।৪ ছটাক রং অর্থাৎ লণ্ডন পার্পল মিশ্রিত করিয়া একটী নেকড়ায় বাঁধিয়া উহা ৫মণ জলে মিশ্রিত করিয়া বৃক্ষে সেচন করিতে পারা যায়। আমগাছের পোকার পক্ষে ইহা বেশ উপকারী।

২। প্যারিস্ গ্রীন্—(Paris Green) ৬।৮ ছটাক প্যারিস্ গ্রীন্ ১০ সের ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা ৫মণ জলের সহিত লণ্ডন পার্পলের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩। কার্ব্বলিক্ এসিড্—১০০ ভাগ জলের সহিত এক ভাগ এসিড্ মিশ্রিত করিয়া গাছের মূলে অথবা পাতায় প্রয়োগ করা যায়।

৪। কেরোসিন এবং দুগ্ধ—৮ ভাগ দুগ্ধের সহিত ১ ভাগ কেরোসিন মিশ্রিত করিয়া গাছে শুয়া পোকা এবং অপর জাতীয় কীট নিবারণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫। তামাকের জল—তামাকের পাতা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া গাছের গায় ছিটাইয়া দেওয়া হয়। ইহার কোন মাত্রা নাই। যে স্থানে যেরূপ আবশ্যক হয় তথায় সেইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন চূণের জল, রন্ধনগৃহের ঝুল, হলুদ, পাঁশ, বাকস গাছের পাচন প্রভৃতি পোকা মারিবার প্রধান উপায়। অনেক স্থানের কৃষকেরা এই সমস্ত ঔষধের বিষয় অল্পবিস্তর অবগত আছেন।

যাঁহারা উদ্ভিদ রোগ সম্বন্ধে অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক হইতে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন।

1. Balfour—Agricultural Pests of India.
2. Indian Museum Notes.
3. A. B. Griffith's—Diseases of crops and their remedies.
4. Watt's-Dictionary of Economic Products. Pests Vol VI. Pt. I. p.p. 142-156.
5. Barclay's-Papers in Science Memoirs by Medical Officers of the Army of India, in Journal of Linnean Society, Journal of Botany and Journal of the Asiatic Society of Bengal.
6. Watt's-Dictonary of Economic Products. Fungi and Fungoid Pests Vol. III. p.p. 455-458.

শ্রীহরিদাস মিত্র, বি, এল,

কাশীপুর কৃষিশালা।

কমলা

পৌষ, ১৩১০]

[১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি

বাঙ্গালী মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়।

কোথায় বিংশ শতাব্দীর উন্নতি, আর কোথায় আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য। ইহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জীবন চরিত, অর্থনীতি, সমাজনীতি কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পাদিবিষয়ক গ্রন্থ কি আছে? সাহিত্য লইয়া আমাদের গৌরব করিবার কি আছে? জগতের কাছে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য দেখাইবার কি আছে? গৌরবের কথা ছাড়িয়া দাও, শুধু বাঙ্গালাগ্রন্থ পড়িয়া কি বাঙ্গালীর ছেলে পণ্ডিত হইতে পারে? তাড়িতালোকের কাছে মাটির প্রদীপ যেরূপ, অপর সাহিত্যের কাছে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যও সেইরূপ টিম্ টিম্ করিতেছে। জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি ভিন্ন জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে, এটি যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন, ত আসুন, মাতৃভাষার সেবাকল্পে, বাঙ্গলা সাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে নজ নিজ শক্তি সামর্থ নিয়োগ করুন।

মাতৃভক্ত বঙ্গসন্তান যদি কেহ উপরি উক্ত শাস্ত্র গুলির কোনটিতে কোন গ্রন্থ প্রকাশের বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গ্রন্থ প্রকাশ যোগ্য হইলে আমরা নিজের খরচায় তাহা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

কবিতা কিম্বা নাটক নভেল সম্বন্ধে এ বন্দোবস্ত নহে।

জি সি বসু এণ্ড কোং,

৬৩ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নানা প্রসঙ্গ।

ওহিও নগরের মেডিক্যাল টক (Medical Talk) নামক একখানি পত্রে অন্নের প্রশংসা শতমুখে ঘোষিত হইয়াছে! ঐ স্থানের রাসায়নিক পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ভাতে শতকরা ৮০ ভাগ পুষ্টিকর পদার্থ আছে। উল্লিখিত পত্রে প্রকাশ যে, ভাতের ন্যায় পুষ্টিকর, লঘু, এবং সুলভ খাদ্য জগতে আর নাই।

* * *

আলমোরার পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ জোসী নামে এক ব্যক্তি একটী রন্ধন যন্ত্র বা চুল্লী প্রস্তুত করিয়াছেন। চুল্লীটী ওজনে ১৫ মণের অধিক নহে। রৌদ্রের সাহায্যেই এই চুল্লীতে রন্ধন কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। নিম্মাতা এই যন্ত্রে কয়লা না দিয়াও ষ্টীম এঞ্জিনের কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। দাম অধিক বলিয়া ইহা এখন সাধারণের ব্যবহারে আসে নাই।

* * *

বেলুচিস্থানে একপ্রকার ঘাসের পুষ্পরেণু হইতে খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। ঐ ঘাসের ইংরাজী নাম Elephant Grass বা হাতিঘাস। রেণু গুলি পীতবর্ণ। উহাতে ময়দার মত রুটি প্রস্তুত হয়। বোম্বাই এবং সিন্ধুদেশের লোকেরা হাতিঘাসের পরাগে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করিয়া থাকে। সংপ্রতি ইহার উপর গবর্ণমেণ্টের নজর পড়িয়াছে।

* * *

শিল্প শিক্ষা করিবার জন্য নেপাল রাজ্য হইতে ৮টী ছাত্র জাপানে গমন করিয়াছে। তাহাদিগের শিক্ষার ব্যয়ভার নেপাল দরবারই বহন করেন। শিক্ষার্থিগণ শিক্ষা-সমাপ্তির পর দেশে ফিরিয়া আসিয়া নেপাল রাজ-সরকারে কার্য্য পাইবেন। নেপালে বহুবিধ ধাতুর আকর আছে, রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত নেপালীর দ্বারা উহার কার্য্য হইলে নেপাল-বাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

* * *

হুগলী জেলায় হাসনান নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ [illegible]

পোয়া হইতে এক সের পর্যন্ত হইয়া থাকে। উহার আস্বাদন বড়ই মধুর, উহার বীচিও বড়ই অল্প, এমন কি নাই বলিলেও চলে। এতদ্ব্যতীত উহার খোসা বড় পাতলা। অনেকে বড় বেগুণ উৎপন্ন করিবার জন্য হাসনান হইতে উল্লিখিত বেগুণের বীজ আনাইয়া তাহা বপন করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও চেষ্টা সফল হয় নাই, যে বেগুণ জন্মিয়াছিল সে গুলি অধিক বড় এবং সেরূপ সুস্বাদু হয় নাই। প্রবাদ এই, হাসনানের যে ক্ষেত্রে সেই বেগুণ জন্মে, সেই ক্ষেত্র ব্যতীত অপর জমীতে তত বড় বা তত সুমিষ্ট বেগুণ হয় না।

* * *

মাঠকড়াই বা চিনের বাদামের চাষ বাঙ্গলা দেশে অল্প পরিমাণে হয় বটে, কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে ইহার চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। ঐ দুই অঞ্চলের দরিদ্র লোকেরা ইহা অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করে, এতদ্ব্যতীত প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র মণ চিনের বাদাম ইউরোপ এবং আমেরিকায় রপ্তানী হইয়া থাকে। গত বৎসর বোম্বাই হইতে ৯৬ হাজার ২৪২ হন্দর এবং মান্দ্রাজ হইতে ১১ হাজার ৭৪৪ হন্দর পরিমাণ চিনা বাদাম বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য বন্দর দিয়া বহুপরিমাণে বিদেশে চালান হইয়াছে। তা ছাড়া দেশের লোকেও অপর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছে।

* * *

[চি]নের বাদাম আমাদিগের অনেক ব্যবহারে লাগে। ইহার পরিস্কার তৈল জলপাই তৈল বা অলিভ অয়েল (olive oil) এর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ইহার খইলে অধিক পরিমাণে যবক্ষারজান থাকায় জমির উর্ব্বরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি করে, এমন কি রেড়ীর খইল অপেক্ষা ইহার খইল অধিক কার্য্যকর। তবে রেড়ার খইল অপেক্ষা ইহার দাম কিছু বেশী। কিন্তু হইলে কি হয়, রেড়ার খইল অপেক্ষা ইহাতে কাযা এত অধিক হয় যে, কিছু মহার্ঘ হইলেও ইহার ব্যবহারে কৃষিকার্য্যে লাভ বই লোকসান নাই। হামবুর্গ, মার্সেলস প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে মাঠ কড়াই রপ্তানী হয়, আবার সেই সকল স্থান হইতেই তৈল বাহির করা হইলে, ইহার খইল এখানে বহুল পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। ইহার খইল যে কেবল জমির সারের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, গবাদি পশুরাও তাহা তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করে। যদি এদেশে ইহার আবাদ যথেষ্ট পরিমাণে হয়, তবে একটী লাভজনক কৃষির প্রচলন হইতে পারে।

* * *

জেলাবোর্ডের রিপোর্টের উপর গবর্ণমেন্ট যে মন্তব্য জারি করিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে শিল্পশিক্ষার অবস্থা বড় আশাপ্রদ নহে। অনেক জেলায় ফ্লাই শটল (Fly shuttle) দ্বারা কাপড় বুনিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই প্রায় নিস্ফল হইয়াছে। কোন কোন স্থানের তাঁতিরা ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারে নাই; আবার কোন কোন স্থানে তাঁতিরা চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে হাতের সাহায্যে তাঁতে বস্ত্র বয়নে অধিক সুবিধা বুঝিয়াছিল। এক স্থানে তাঁতিরা বলে তাহারা বড় গরীব, পয়সা না দিলে তাহারা কাজ শিখিতে অক্ষম। আর একস্থানে লোকে বৃত্তির লোভে শিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। কেবল চট্টগ্রাম এবং মানভূম জেলায় কতকটা কৃতকার্য্যতা দেখা গিয়াছে। যে দেশের শিল্পীরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ উন্নতোপায়ে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উপকারিতা বুঝে না, সে দেশের মধ্যে ক্রমে যাহাতে শিল্পীদিগের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

* * *

বিলাতে রমণীদিগকে কৃষিশিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটী বিদ্যালয় আছে। ১৮৯৮ সালে লেডি ওয়ারউইক নাম্নী একটী রমণী এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ বিদ্যালয়ে রমণীদিগকে সহজ উপায়ে চাষ এবং বাগান প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রীর নামানুসারে উহাকে লেডি-ওয়ারউইক কলেজ নামে অভিহিত করা হয়। ৫ বৎসর বিদ্যাশিক্ষার পর ৫৫০টী ছাত্রী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিলাত বা অন্যান্য উপনিবেশে উচ্চ বেতনে উদ্যান রক্ষিকা এবং dairy বা দুগ্ধাগার প্রভৃতি স্থানের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। কৃষিবিদ্যালয়ে এক একটী ছাত্রীর বৎসরে ৮০ হইতে ১২০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৮০০, টাকা পর্যন্ত খরচ হয়।

* * *

ক্রমেই লোকে হাতে কলমে কার্য্য শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে পারিতেছেন। অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত যুবক কার্য্যক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাতার ডন সোসাইটী Dawn Society বা উষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনেক শিক্ষিত যুবককে হাতে কলমে কার্য্যশিক্ষায় প্রণোদিত করিতেছেন। সমিতি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধন জন্য, এবং যাহাতে এদেশের লোকে এদেশী শ্রমশিল্পজাত দ্রব্য অক্লেশে ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার সুবিধা করিবার নিমিত্ত, উষা সমিতির অধ্যক্ষগণ ভারতবর্ষের যে স্থানে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তথা হইতে সেই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সুবিধা দরে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। শিক্ষিত যুবকবৃন্দ যাহাতে হাতে কলমে দোকানদারি শিখিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। যুবকেরা স্বহস্তে দ্রব্যাদি বিক্রয় করেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে যুবকদিগের ব্যবসায় শিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা হইতেছে। কিছু দিন ডন সোসাইটি স্থায়ী হইলে, অনেক শিক্ষিত যুবক ব্যবসায় শিক্ষা করিতে পারিবেন, অনেকে ব্যবসায়ের মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হইবেন, এরূপ আশা করা যায়।

* * *

যে সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র বরাবর দেশীয় দ্রব্য ডন সোসাইটির নিকট হইতে ক্রয় করেন, বৎসরান্তে তাঁহাদিগের নিমিত্ত এক একটী পারিতোষিক সমিতির লভ্যাংশ হইতে দিবার ব্যবস্থা আছে। যিনি যত অধিক টাকার দ্রব্যক্রয় করেন, তিনি তত অধিক মূল্যের দ্রব্য প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য, এই উপায়ে অনেক ধনী সন্তান দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে উৎসাহিত হইবেন, এরূপ আশা করা যায়।

* * *

গত ২৭ শে, ২৮ শে ও ২৯ শে ডিসেম্বর ডনসোসাইটি

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজ গৃহে একটী প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রথম দিন ৫ হাজার, দ্বিতীয় দিন ৬ হাজার এবং তৃতীয় দিন ৭ হাজার পরিদর্শক প্রদর্শনী দেখিতে আইসেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কয় দিনে অনেক টাকার পণ্য কাটিয়াছিল।

* * *

দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে ক্রমে এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের যেরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে তাহাতে এইরূপ সমিতি আরও অধিক প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়। যাহাতে কলিকাতা ব্যতীত অন্যান্য নগরেও এইরূপ সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাহাতে তদ্দেশবাসী শিক্ষিত যুবকবৃন্দের কার্য্যশিক্ষার বন্দোবস্ত হয়, এরূপ সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এরূপ ব্যবস্থা হইলে বোধ হয় এদেশে ব্যবসায় শিক্ষার অনেকটা অন্তরায় দূরীভূত হইতে পারে।

* * *

প্রদর্শনীতে বহুপ্রকার দেশীয় বস্ত্র, সাবান, রেশমের নানাবিধ কাপড়, পশমী নানাবিধ গাত্র বস্ত্র, টুপী, কার্পেট, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বহুবিধ দ্রব্য, নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য, এলুমিনামের বাসন প্রভৃতি বহুবিধ দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের নিমিত্ত আসিয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত যুবক অর্থগ্রহণ না করিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং বহু পরিশ্রমে প্রদর্শনীর কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। উষাসমিতির যুবকেরা দেশের শিল্প কার্য্যের উন্নতির জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং করিতেছেন, যদি অন্যান্য স্থানের শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হন, তবে কেবল এদেশের শিল্পীদিগকে শিল্পশিক্ষার উৎসাহ দান কেন, এদেশের অনেক শিক্ষিত যুবক ব্যবসায়শিক্ষায় নিপুণতা লাভ করিতে পারিবেন এ বিষয়ে অনুমাত্রও নাই।

* * *

এই সঙ্গে আর একটা বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। অধিকাংশ পল্লীগ্রামের লোকে জানে না যে, এদেশে অল্পমূল্যে দেশীয় বস্ত্র, গেঞ্জি, সাবান প্রভৃতি পাওয়া যায়। প্রচারই ব্যবসায়ের মূল মন্ত্র। দেশীয় দ্রব্য সস্তায় অথবা বিলাতীর ন্যায় দরে পাওয়া যায় লোকে ইহা যদি জানিতে পারে, তবে বোধ হয় অনেকে দেশীয় দ্রব্যই ক্রয় করিবে। এই নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে ডন সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে মফস্বলে প্রচারের জন্য শিক্ষিত লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। সেই সঙ্গে যাহাতে সকল সময়ে সকল দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থাও করিতে হইবে। অধিকাংশ মফস্বলে সপ্তাহে সপ্তাহে হাট বসে। সেই হাটে ৪।৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে লোকে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য এক একটা হাটে ৪।৫ হাজার লোক নানাস্থান হইতে হাট করে। যদি প্রতি হাটে কোন মফস্বলের এজেন্টের দ্বারাই হউক, আর অপর যে কোন উপায়েই হউক, দেশীয় দ্রব্যাদি প্রেরণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে প্রচার হইতে অধিক বিলম্ব হয় না।

* * *

কেবল ডন সোসাইটির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। উষা সমিতির ন্যায় শত শত স্থানে এক একটী সমিতি গঠন করিয়া প্রত্যেক স্থানের অধিবাসীদিগকে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে প্রণোদিত করিতে হইবে। যখন লোকে দেখিবে, বিলাতীর দরে দেশীয় দ্রব্য সকল দরকারের সময়ে পাওয়া যায়, তখন সকলেরই দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে অনুরাগ জন্মিবে। লোকের হাতে সকল সময় অর্থ থাকে না, সকলেই প্রয়োজনের সময় দ্রব্য ক্রয় করে. যদি প্রয়োজনের সময় একটা জিনিস পাওয়া না যায় তবে অনেককে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিলাতী জিনিস কিনিতে হয়। অতএব যাহাতে কি সহর কি মফস্বল সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সর্ব্বপ্রকার দেশীয় জিনিস থাকে, সেরূপ ব্যবস্থা না করিলে দেশীয় শিল্পের উন্নতি বা কাটতির জন্য যতই চেষ্টা হউক না, তাহার ফল বড়ই বিলম্বে ফলিবে বলিয়া বোধ হয়।

* * *

যে সকল মফস্বলস্থ ধনী দেশীয় শিল্পের অনুরাগী, তাঁহারা যদি চেষ্টা করিয়া আপন আপন এলাকার মধ্যে দেশীয় দ্রব্য চালাইতে সচেষ্ট হন, তবে প্রচার কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে। বিলাতী জিনিসে সর্ব্বত্র ছাঁকিয়া গিয়াছে; কি সহর, কি মফস্বল, সর্ব্বত্র সকল প্রকার বিলাতী দ্রব্য রাশীকৃত অবস্থায় রহিয়াছে, সেই বিলাতী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গেলে কেবল দাম কমাইলে চলিবে না। প্রয়োজনের সময় জিনিস মিলিলে কিছু অধিক মূল্যের জন্য কেহ পশ্চাৎপদ হয় না। বাজারে জিনিস জোগান চাই, ব্যবসায়ের উন্নতি অবনতি দ্রব্য প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেশীয় জিনিস উৎপন্ন করিয়া যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র তাহা অনায়াস লভ্য হয়, তদ্বিষয়ে প্রথমেই চেষ্টা হওয়া উচিত। ইহাতে কেবল যে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইবে তাহা নহে, অনেক যুবকও হাতে কলমে ব্যবসায় ও শিল্প শিক্ষালাভ করিয়া পরিশেষে আপনারাই শিল্পী এবং ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়াইবে।

* * *

শিক্ষার উন্নতির উপর জাতীয় উন্নতি যে কিরূপ ভাবে নির্ভর করে, জাপানই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে জাপানের যে এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহার এক মাত্র কারণ জাপানের শিক্ষার ব্যবস্থা। সম্প্রতি জাপানপ্রত্যাগত বাবু রমাকান্ত রায় জাপানের শিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতার ভারতবর্ষীয় শিল্প সভায় (Indian Industrial Association) একটী বক্তৃতা উপলক্ষে জাপানের শিক্ষা পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, সাধারণের অবগতির জন্য আমরা তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

* * *

জাপানে বিভিন্ন গ্রেডের বা পর্য্যায়ের অনেক গুলি বিদ্যালয় আছে। (১ম) প্রাইমারি বা প্রথম শিক্ষা, (২য়) মিড্‌ল বা মধ্য শ্রেণী (৩য়) হাই বা উচ্চশ্রেণী, (৪র্থ) ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটী বা রাজকীয় বিশ্ব বিদ্যালয়, (৫ম) স্পেশাল স্কুল বা বিশেষ বিদ্যালয়, (৬ষ্ঠ) টেকনিকাল বা শিল্প বিদ্যালয়, (৭ম) হাই বা উচ্চ শ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুল, (৮ম) হাই বা উচ্চ শ্রেণীর রমণী বিদ্যালয়, (৯ম) মূক এবং বধির বিদ্যালয়, এবং (১০ম) মিসেলেনিয়স বা নানাবিষয়িণী শিক্ষালয়। এই দশ প্রকারের স্কুল সর্ব্ব শুদ্ধ ২৯, ৩৩৫টী আছে। ৫২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬ জন ছাত্র

ও ছাত্রী ঐ সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। জাপানী ছাত্রকে নিম্ন শিক্ষা মধ্যশিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটীতে শিক্ষালাভ করিতে হয়। তবে যাহারা শীঘ্র শীঘ্র উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে যে কোন শিল্প বিদ্যালয়ে অথবা বিশেষ বা স্পেশাল স্কুলে প্রবেশ করিয়া কার্য্য শিক্ষা করিয়া লয়।

* * *

প্রথম শিক্ষা সমাপ্তির পর শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে ২ ৩ বৎসর লাগে। জাপানের অধিকাংশ স্থলে এইরূপ শিক্ষা করিয়া লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই নিমিত্ত শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয়গুলির অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইতেছে। শিক্ষার ব্যয়ও জাপান গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ হইয়া থাকে। বিগত ১৯০১-১৯০২ সালে সেণ্ট্রাল গবর্ণমেণ্টের ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬৭৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ইহা অপেক্ষা ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৬ হাজার ৯৬৭ টাকা কম খরচ হইয়াছিল।

* * *

জাপানের শিল্প বিদ্যালয়-সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) হাইয়ার বা উচ্চ, (২) টেকনিকাল ইউনিভার্সিটী কলেজ এবং (৩) লোয়ার বা নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়। ইহার মধ্যে শিক্ষানবিশ এবং শিল্পশিক্ষার জন্য সপ্লিমেণ্টারী স্কুল আছে। সর্ব্বশুদ্ধ কার্য্য-শিক্ষা বা শিল্পশিক্ষার জন্য জাপানে ৪০১টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ৯টি, সাধারণের ৩৬৫টি, এবং প্রাইভেট ২৭টি। এই সকল বিদ্যালয়ে ২,২৩৬ জন শিক্ষক শিক্ষা দান এবং ৩৬ ৭৮৭ ছাত্র শিক্ষা লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত এই সকল বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত একটি গবর্ণমেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউশন আছে। উল্লিখিত সমস্ত বিদ্যালয়েই কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে মৌখিক এবং হাতে কলমে কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

* * *

জাপানে যে সকল High Technological স্কুল অর্থাৎ শিল্পশিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে টোকিও নগরস্থ হাইয়ার টেকনোলজিকাল বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে রমাকান্ত বাবু বলেন যে মিডল স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রেরা ঐ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। উহাতে যে সকল পুস্তক ছাত্রদিগকে পাঠ করিতে হয়, তাহা তত কঠিন নহে। ঐ বিদ্যালয় দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) মেকানিকাল এবং (২) কেমিকাল বিভাগ। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পুস্তক পাঠ এই বিদ্যালয়ের অর্দ্ধেক কার্য্য এবং ব্যবহারিক রসায়ন (Applied Chemistry) কাচ, পোরসিলেনের কার্য্য, রং করিবার কার্য্য, বয়ন কার্য্য এবং বৈদ্যুতিক রসায়ন (Electrical Chemistry) শিক্ষা করা ইহার অপরার্দ্ধ কার্য্য। প্রত্যেক বিষয়ে পাঠ শেষ করিতে তিন বৎসর সময় লাগে। ব্যবহারিক রসায়নের মধ্যে কাগজ প্রস্তুত, তৈল পরিষ্কার করণ, সাবান প্রস্তুত, (৪) গন্ধতৈল-সমূহ চোলাই প্রণালী, চামড়ার পাট, সিরস প্রস্তুত, অলকাতরার কার্য্য, কেরোসিন তৈল প্রভৃতির কার্য্য, কাঠের কার্য্য, রবার, কর্পূর এবং রং করিবার জিনিষ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতে হয়। অবশ্য এই সকল শিক্ষা রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রণালীর (Chemical analysis) উপর প্রতিষ্ঠিত। কাচ এবং পোরসিলেন প্রস্তুত করিবার বিভাগের উৎকৃষ্ট সরঞ্জাম আছে। টোকিও বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক রসায়ন (Electio Chemi-try) শিক্ষা প্রণালী একটী অত্যাবশ্যক বিষয়। ইহাতে ইলেকট্রোপেটিং, ইলেকট্রোটাইপিং, কাপড় কাচিবার প্রণালী, তাম্রপাত্র রক্ষার প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। রমানন্দ বাবু জাপানের শিক্ষা প্রণালীর বিষয়ে যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বোধহয় বহুব্যয় সাপেক্ষ বিলাত প্রভৃতি স্থান অপেক্ষা এদেশের পাঠার্থীদিগের পক্ষে জাপানগমনই প্রশস্ত।

* * *

বাবু শরচ্চন্দ্র রুদ্র বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান। কলিকাতা তাহার জন্মস্থান। ইউরোপে গমন করিয়া খনি বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইউরোপ হইতে এদেশে ফিরিয়া আসিলে নেপালরাজ তাঁহাকে তথায় কর্ম্ম করিবার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু তিনি তখন দাক্ষিণাত্যের এক স্থানে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তথা হইতে তিনি সুদূর কোরিয়ায় গমন করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মান্দ্রাজের অন্তর্গত কুরুপম্ নামক স্থানের রাজা বাহাদুরের অধীনে কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার ন্যায় খনিতত্ত্ববিৎ পৃথিবীর মধ্যে অল্পই দেখা যায়। আমেরিকবাসীরা তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে তথায় আহ্বান করেন। তদনুসারে তিনি আমেরিকায় গমন করিয়া তথায় খনি বিষয়ক যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে আমেরিকার সর্ব্বত্র স্থানে মহাহুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতু সম্বন্ধে মিঃ রুদ্র অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। তিনি কুবেরের দেশ, আমেরিকায় স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্বন্ধে প্রথম যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতেই আমেরিকাবাসীরা চমকিত হইয়াছে।

ক্ষেত্রের নিঃস্বতা।

চাষ বাস করিতে হইলে ক্ষেত্রের স্বভাব ও কার্য্যশীলতার বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কি কি উপায়ে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সংরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, এ সকল ভাবিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ তাহা জানা উচিত। ক্ষেত্র যদি উর্ব্বর ও ক্রিয়াশীল হয়, তাহা হইলে উহার জন্য অধিক কিছু করিতে হয় না। দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিতে করিতে মানুষে নিস্তেজ ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাকে কিছুক্ষণ বা কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিতে অবসর দিলে, সে আবার উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে পারে। ক্লান্তির সময় যদি তাহাকে বিশ্রাম করিতে না দিয়া

ক্রমাগত কাজ করিবার জন্য পীড়ন করা যায়, তাহা হইলে আশানুরূপ কাজ দূরের কথা—তাহার চতুর্থাংশ কাজও তাহার নিকট হইতে পাওয়া যায় না। কেবল তাহাই নহে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম হেতু প্রভৃত বলশালী ও শ্রমশীল ব্যক্তিরও শরীর ভঙ্গ হয়, মনের প্রফুল্লতা বিনষ্ট হয় এবং আশা, উৎসাহ, শক্তি ও উদ্যম, একেবারে তাহার হৃদয় রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ক্ষেত্র সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। প্রতি নিয়ত ক্ষেত্রকে আবাদে রাখিলে তাহারও শক্তির হ্রাস হয়। এই কারণে বিচক্ষণ ক্ষেত্রস্বামিগণ স্ব স্ব ভূমিকে নিরন্তর কার্যশীল রাখিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

মৃত্তিকার ক্রিয়া ও শক্তি কি, এবং কিরূপে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এক্ষণে তাহা দেখিতে হইবে। কার্য্য দেখিয়া মনুষের ক্রিয়া ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্তিকার ক্রিয়া ও শক্তির পরিচয় লইতে হইলে তজ্জাত উদ্ভিদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। কারণ মৃত্তিকার যাহা কিছু শক্তি, যাহা কিছু ক্রিয়া, তাহা উদ্ভিদের অঙ্গপোষণ ও পরিপুষ্টির জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে। তাপমান যন্ত্রদ্বারা যেমন উত্তাপ পরিমিত হইয়া থাকে, সেইরূপ উদ্ভিদের অবস্থা দেখিয়া মৃত্তিকার ক্রিয়া ও শক্তির পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ উদ্ভিদকে মৃত্তিকার ক্রিয়া ও শক্তির পরিমাণ যন্ত্র বলিলে অতিরঞ্জন বা অত্যুক্তি হয় না। যে ভূমিতে উদ্ভিদ অমিত তেজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং অপরিমিত ফল ফুলে অবনত হইয়া পড়ে তাহাকেই উত্তম জমি বলিতে পারা। জমি যে পরিমাণে উর্ব্বরা, তজ্জাত ফসলও সেই পরিমাণে আশানুরূপ হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা দুটী জিনিষের উপর নির্ভর করে। প্রথম গঠন, দ্বিতীয় আবাদ।

স্বাভাবিক গঠন বলিলে বুঝিতে হইবে যে, যে যে উপাদানে উহা স্বভাবতঃ সংগঠিত। সকল ক্ষেত্র একই উপাদানে যে সংগঠিত, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাটির গঠন স্বতন্ত্র, এই কারণে সকল স্থানে ফসল ভালরূপ জন্মে না, কিম্বা ভালরূপ ফসল উৎপন্ন হয় না।

মাটিতে প্রধানতঃ চারিটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—কর্দ্দম (clay), বালুকা (sand), চূণ (lime) এবং জৈব পদার্থ (humus*), এই চারিটী পদার্থের পরিমাণের বা অনুপাতের ইতর বিশেষত্বের উপর মাটির গুণাগুণ অনেকটা নির্ভর করে। এই চারিটী পদার্থকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিলে মৃত্তিকার অস্তিত্ব থাকে না এবং তখন সেই সেই স্বতন্ত্রীকৃত পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিতে হয়। এই কয়েকটী সামগ্রীর কোন একটী একাকী মৃত্তিকার কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। কি কর্দ্দম, কি বালুকা, আর কি চূণ, কি জৈব পদার্থ, ইহার যে কোন একটিতে উদ্ভিদ রোপণ করিলে, তাহা জীবিত থাকিতে পারে না। এই কয়টীর সমতা ঘটিলে তবে তাহাতে উদ্ভিদ জন্মিবে, বর্দ্ধিত হইবে এবং ফল পুষ্প প্রদান করিবে।

মৃত্তিকায় বীজ পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইলেই, সেই ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে আপন খাদ্য সঞ্চয় করিতে থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে উদ্ভিদের জীবন ধারণোপযোগী বিবিধ পদার্থ নিরন্তর বর্ত্তমান থাকে, তবে বারম্বার অথবা দীর্ঘকাল উহাতে আবাদ হইলে, উদ্ভিদের জীবন-ধারণের ও বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকাস্থিত অনেক স্থূল পদার্থ ও বায়ব্য সামগ্রী উহাতে চলিয়া যায়। এক বিঘা জমি হইতে ধান্য, গোধূম প্রভৃতি যে কোন ফসল হউক, আমরা উঠাইয়া লই, তাহা ক্ষেত্র ও বায়ুমণ্ডলস্থিত পদার্থ-সমূহের রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই সংগৃহীত ফসলকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে কতকগুলি জিনিষ চলিয়া যায়, আর অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা স্থূল পদার্থ। এই স্থূল-পদার্থ উদ্ভিদগণ জীবনধারণায় ক্ষেত্র হইতে আহরণ করিয়াছিল। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর আবাদ হওয়ায় ক্ষেত্র হইতে রাশি রাশি পদার্থ চলিয়া যাইতেছে। সেই সকল সামগ্রী রূপান্তরিত হইয়া যদি পুনরায় ক্ষেত্রে আসিয়া স্থান পাইত, তাহা হইলে ক্ষেত্র-সমূহ আবহমান কাল সমভাবে উর্ব্বর থাকিত। কিন্তু ক্ষেত্রজাত ফসল-সমূহ রপ্তানি হইয়া যায়,—পাতা, লতা, গোড়া ও শিকড় প্রভৃতি যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও লোকের রন্ধনাদির জন্য জ্বালানীকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। তথাপি যদি এই সকল পদার্থের ছাই ক্ষেত্রে আসিয়া স্থান পায়,—তাহা হইলেও ক্ষেত্রের পক্ষে উহা বিশেষ লাভ। পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষেত্রের উৎপন্নের পরিমাণ যে

ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান কারণ হইলেও ক্ষেত্র যে একবারে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে, এমন কথা মনে করা উচিত নহে সাহারার ন্যায় যে সকল ভূমি বা প্রান্তর নিঃস্ব, তাহাদিগের উৎকর্ষতা সংসাধিত হইলে, তাহারাও যে শস্য শ্যামলা রূপ ধারণ করিতে পারে না, এমন কথাও নহে।

ক্ষেত্র হইতে কোন ফসল উঠিয়া যাইবার পরে কিছু দিন উহা নিঃস্ব ভাবাপন্ন হয়, কিন্তু তাহাতে চাষ আরম্ভ হইবার সময় হইতেই নবশক্তি সঞ্চারিত হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া ক্রমে যত চূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, তত বায়ুমণ্ডলস্থিত পদার্থ-সমূহ উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে, এবং সূর্য্যাকর্ষণে ভূগর্ভস্থিত রস উপরিভাগে আসিতে থাকে। এইরূপে বায়ুমণ্ডলের সহিত মৃত্তিকার যত ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকে, তত উহা সজীবতা লাভ করে। কিন্তু কেবল এই উপায়ের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, কারণ আজ কাল যেরূপ জীবন সমস্যার দিন পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইবে, নূতন নূতন প্রণালী অবলম্বন দ্বারা কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইবে। মানুষের পূর্ণ শক্তির সাহায্যে ক্ষেত্রের পূর্ণ শক্তিকে কার্য্যকারী করিতে হইবে, মাটির সহিত মানুষকে সংগ্রাম করিতে হইবে। তবে আমাদিগের নিত্য বৃদ্ধিশীল অভাবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আমরা সমর্থ হইব। যে ক্ষেত্র হইতে দশ মণ ধান্য বা গোধূম পাওয়া যায়, তাহা হইতে বিশ মণ কেন পাওয়া যাইবে না, তাহার বিষয় চিন্তা চাই, তাহার জন্য চেষ্টা চাই, অর্থ ব্যয় করা চাই। ইহাতে যিনি পশ্চাৎপদ হইবেন, ভগবান তাঁহাকে ভূমির কৃপা ও সৌজন্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

কৃষি কার্য্য করিতে হইলে কঠোর পরিশ্রমী ও শীত গ্রীষ্ম বর্ষাসহ হওয়া আবশ্যক। তদনন্তর ক্ষেত্রকে গভীররূপে কর্ষণ ও মৃত্তিকাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে। এতদর্থে আধুনিক যন্ত্রাদির ব্যবহার করিতে হইবে, মেষাকার বলীবর্দ্দকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রাচীন ক্ষুদ্রফাল-সংযুক্ত লাঙ্গলকেও বিদায় দিতে হইবে। কেবল ইহাতেই শেষ নহে, ক্ষেত্রে যাহাতে সমূহ পরিমাণে সার দিতে পারা যায়, যাহাতে উৎকৃষ্ট সার তৈয়ার করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা চাই, তার পর ক্ষেত্রে আবশ্যক মত জলসেচন করিতে হইবে। এ সকল কথাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অযত্নের পাঁচ বিঘার আবাদ অপেক্ষা সযত্নের এক বিঘা অধিকতর শস্যশালিনী হইয়া থাকে। পাঁচ বিঘা শুনিতে ভাল, কিন্তু সযত্নের একবিঘা অর্থিক চক্ষে ভাল। নিশ্চেষ্টভাবে অধিক পরিমাণ জমির আবাদ করিলে অনর্থক জমিকে আটক রাখা হয়, পরন্তু পাঁচজনে প্রত্যেক এক এক বিঘার উৎকৃষ্ট আবাদ করিলে অধিক সংখ্যক লোকে আবাদ করিবার জন্য ভূমি পাইবে। সুতরাং এ হিসাবে জনসমাজেরও একটী বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। তার পর পাঁচ বিঘা জমির পরিশ্রম ও ব্যয় এক বিঘায় নিয়োজিত হইলে, পাঁচের পক্ষে যাহা কিছুই নহে, একের পক্ষে তাহা প্রচুর, ইহা বিশেষরূপে জানা উচিত।

ইহা সত্য কথা যে, বহুদিন আবাদ হওয়াতে ক্ষেত্র হীনতেজ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু রীতিমত পাট হইলে উহাকে আবার সমূহ পরিমাণে উর্ব্বর করিতে পারা যায়। আবাদ করিতে করিতে ক্ষেত্র-সমূহের যদি একবারে নিঃস্ব হওয়া সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে অন্য এক পৃথিবীর অনুসন্ধান করিতে হইত। যাহারা প্রতি বৎসর তরি তরকারির আবাদ করিয়া থাকে, তাহারা ভূমির নিঃস্বতা আদৌ উপলব্ধি করে না। তাহার কারণ এই যে, তাহারা যে টুকু জমিতে তরি তরকারি উৎপন্ন করে, তাহাকে প্রতিবৎসরই উত্তমরূপে কর্ষণ করে, তাহাতে সমূহ পরিমাণে সার প্রদান করে, এবং মৃত্তিকা ও সারকে কার্য্যকরী করিবার জন্য ক্ষেত্রে জলসেচনেরও ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ কৃষিক্ষেত্রে এতটা যত্ন হয় না, অথচ প্রতিবৎসর উহাতে চাষ আবাদ হইতে থাকে। এই কারণে কৃষিক্ষেত্রে এত নিঃস্বতা উপলব্ধি হয়। বিনা সারে পুনঃ পুনঃ আবাদ করিলে কৃষিক্ষেত্রের শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কিন্তু শক্তি একবারে বিলুপ্ত হয় না। কারণ নিম্নস্তরস্থিত মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদগণ রসসংযোগে সার পদার্থ আহরণ করিয়া থাকে। উপরিস্থিত

মৃত্তিকার দুর্ব্বলতা বিনাশ করিবার জন্য গভীরভাবে কোদ্‌লাইয়া মৃত্তিকাকে যদি একবারে উল্টাইয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে আবার সে ক্ষেত্র বহু পরিমাণে উর্ব্বর হইয়া থাকে। ভূগর্ভ সার পদার্থে পরিপূর্ণ; সুতরাং সেই সারবান মাটিকে উপরি ভাগে আনিতে পারিলে একদিকে যেমন চাষ বাসের সুবিধা হইয়া থাকে, অন্যদিকে আবার উপবিভাগস্থিত মৃত্তিকা নিম্নাংশে চাপা পড়ায় বিরাম পায় ও সেই সঙ্গে তন্মধ্যস্থিত স্থূল পদার্থ-সমূহ ক্রমে বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত বর্ষার জলের সহিত উপরিভাগস্থিত কতক সারসামগ্রী নিম্নস্তরে গিয়া পড়ে। ফলতঃ তাহার দ্বারাও সেই ক্লিষ্ট মৃত্তিকা অধিকতর সারবান্ হইয়া উঠে এবং পর বৎসর মধ্যে আবার তাহাকে উল্টাইয়া উপরে আনিলে তদ্দ্বারা নূতন মাটির কাজ পাওয়া যাইবে। ভূমিকে নিরন্তর শক্তিশালী রাখিবার পক্ষে ইহা অতি সহজ উপায় এবং এই জন্য আজ কালের বিলাতী উল্টান ফাল বিশিষ্ট লাঙ্গল (turn wrist plough) বিশেষ উপযোগী। ইহার দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে উপরিস্থিত মাটি একবারে উল্টাইয়া নিম্নদিকে যায় এবং নিম্নভাগস্থিত মাটি উপরে আইসে। দেশী হালে তাহা ভাল হয় না, এজন্য দেশী হাল অপেক্ষা বিলাতী হাল ভাল।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

লবণ।

লবণ আমাদিগের একটী অতীব প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ইহার অভাবে আমাদিগের আহারীয় দ্রব্যাদি সুস্বাদু হয় না। কেবল সুস্বাদু নহে, ইহা স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ উপযোগী।

পূর্ব্বে লবণ মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার নানাস্থানে প্রস্তুত হইত, এবং তথা হইতে ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। পরে কোম্পানি বাহাদুর (British Government) স্বয়ং কলিকাতায় আনয়ন করিয়া লটারি করিয়া বিক্রয় করিতেন। ইংরাজ ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক লিবারপুল (Liverpool) হইতে লবণ এদেশে আমদানি হইতে আরম্ভ হইলে কোম্পানি বাহাদুর স্বয়ং ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া লবণের উপর একটী শুল্ক নির্দ্ধারিত করিলেন। বৎসরের আয়ব্যয় অনুসারে শুল্কের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; প্রথমে শুল্কের হার প্রতিমণে ২॥০ আড়াই টাকা ছিল, পরে ৩৲ টাকা, ৩।০ তিন টাকা চারি আনা, ৩৵০ তিন টাকা দুই আনা, ২৸৵০ দুই টাকা চৌদ্দ আনা, ২৲ দুই টাকা, ২॥০ আড়াই টাকা, এক্ষণে ২৲ দুই টাকা চলিতেছে।

আমাদের দেশীয় লবণ বন্ধ হওয়া অবধি নানা প্রকার বৈদেশিক লবণ বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আমদানি হইতেছে। উৎপত্তি স্থানের নামানুসারে লবণের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে। যথা— লিবারপুল লবণ (Liverpool salt), জার্ম্মান লবণ (German salt), ফ্রেঞ্চ লবণ (French salt), ইতালীয়ান লবণ (Italian salt) সেলিফ লবণ (Salif salt), পোর্টসৈয়দ লবণ (Port Said salt), জেদ্দা লবণ (Jeddha salt), মস্কট লবণ (Muscat salt), এডেন লবণ (Aden salt)। কেবল বোম্বাই (Bombay) ও মান্দ্রাজ (Madras) হইতে দেশীয় লবণ অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া কলিকাতায় আমদানি হয়। ইহার ব্যবহারও বেশী নহে।

লবণ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—পাঙ্গা (Powdered salt), ও কর্কচ (Kurkutch salt) প্রথমে যখন লিভারপুল হইতে পাঙ্গা লবণ আমদানি হইতে আরম্ভ হইল, হিন্দুগণ উহাকে অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত মনে করিয়া ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য হিন্দুগণ ফ্রান্স, ইতালি, জেদ্দা প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত কর্কচ অর্থাৎ ডেলা লবণ নিজ নিজ গৃহে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে সে ভ্রম অপসারিত হইয়াছে, তাঁহারা দুইপ্রকার লবণই ব্যবহার করেন।

লবণ দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। কয়েক প্রকার লবণ স্বভাবতঃ জন্মে, এবং কয়েক প্রকার জল হইতে উৎপন্ন করা হয়। লিবারপুল লবণ ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী চেসায়ারে (Cheshire) সমুদ্রের জল হইতে উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের লবণময় জল অল্প গভীর পুষ্করিণীতে আনীত হইলে, উহা সূর্য্যের উত্তাপে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। তৎপরে অবশিষ্ট কর্দ্দমময় জলকে বৃহৎ বৃহৎ লৌহ কটাহে জ্বাল দিয়া, অনাচ্ছাদিত স্থানে স্তূপাকারে রাখা হয়, রৌদ্রে ও শিশিরে ইহা পরিষ্কৃত হয়। লবণ যত পুরাতন হয়, তত শ্বেত ও সূক্ষ্ম হয়। লিবারপুল লবণ

আবার দুই প্রকার,—সূক্ষ্মদানা (stoved or fine) ও মোটাদানা (Butter salt)। ইহা জলপথে ভারতবর্ষে আনা হয়। প্রতি জাহাজে প্রথমোক্ত লবণ এক ভাগ ও শেষোক্ত লবণ দুইভাগ থাকে।

জার্ম্মাণ লবণ জার্ম্মাণির অন্তঃপাতী হামবর্গ (Hamburgh) আন্টয়ার্প (Antwerp) ও ব্রিমেন (Bremen) নগরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা স্বভাবতঃ ভূমির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় জন্মায়। তদ্দেশীয়গণ এই সকল পাহাড় হইতে লবণ কর্ত্তন করিয়া কলে পেষণ করত এ দেশে পাঠায়। পিষাই হইলে এই লবণ অতি সূক্ষ্ম হয়। লিবার পুল লবণ অপেক্ষা ইহাতে অধিক ক্ষার থাকে বলিয়া, ইহা অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তথাকার লোকেরা আহার ব্যতীত অন্যান্য অনেক প্রকারে ইহা ব্যবহার করে। লবণের পাহাড় হইতে কাচের ন্যায় পাতলা স্তর কাটিয়া লণ্ঠনে কাচের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে এবং বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার দরজায়ও বসান হয়। আমাদের দেশে কেবল গুঁড়া লবণই আইসে।

ইটালিয়ান লবণ। ইহা জল হইতে প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুত হইলে ইহা সোরার দানার মতন দেখিতে হয়, কিন্তু ইহা অত্যন্ত শ্বেত (Snowy white)। পূর্ব্বে আমাদের দেশের হিন্দুরা ইহা ব্যবহার করিতেন, এই জন্য ইহার আমদানি অধিক ছিল। কিন্তু এক্ষণে আর ইহার আমদানি নাই। তখন ইহাকে পুনর্ব্বার পিষিয়া ব্যবহার যোগ্য করিতে হইত।

সেলিফ্ লবণ। ইহা জল হইতে আপনিই জন্মে। সমুদ্রতীরস্থ পর্ব্বত সকলের তলদেশে সমুদ্রের তরঙ্গের আঘাতে এক রকম পলি পড়ে। সেই পলি জমিয়া গিয়া কঠিনাকার ধারণ করে। ইহাকে কর্ত্তন করিয়া আমাদের দেশে প্রেরণ করা হয়। ইহা আকৃতিতে ইটালিয়ান লবণের (Italian salt) ন্যায়, কিন্তু তদ্রূপ শ্বেত নহে। এ দেশে আসিলে ইহার কতক পরিমাণ গুঁড়া করিয়া বিক্রয় করা হয় ও কতক পরিমাণ সেই অবস্থাতেই বিক্রীত হয়।

পোর্ট সৈয়দ লবণ। ইহা ও সেলিফ্ লবণের ন্যায় জল হইতে প্রস্তুত করা হয় এবং আকারেও তদ্রূপ। কিন্তু ইহাতে জলীয় ভাগ অধিক থাকে বলিয়া ইহার শুক্তি অধিক।

জেদ্দা লবণ। ইহা জেদ্দায় প্রস্তুত হয় না, আফ্রিকার (Africa) অন্তঃপাতী মহম্মদ গোল ও রাস রাওগা নগরে (Mahomed Goal and Ras Rayogah) প্রস্তুত হইয়া থাকে ; জাহাজে করিয়া আমাদের দেশে আনিবার সময়ে আরব দেশের জেদ্দা নগরে ছাড় pass লইতে হয়, এজন্য সাধারণতঃ ইহাকে জেদ্দা লবণ বলে। ইহাও জল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, আকারে ইহা ডেলা ডেলা হয় ; ইহাকে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

এডেন লবণ (Aden salt)। ইহা আরব দেশের এডেন নগরে জল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, আকারে ইহা ছোট ছোট ডেলার ন্যায়। ইহারও শুক্তি (short in weight) অধিক হয়।

মস্কট লবণ (Muscat salt)। ইহাও আরব দেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার আকার এডেন লবণের ন্যায়, কিন্তু ইহার শুক্তি (short in weight) যৎসামান্য।

বোম্বাই প্রদেশে এক প্রকার লবণ প্রস্তুত হয়, ইহার বর্ণ কৃষ্ণ। দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকুড়ের ন্যায়। মান্দ্রাজের লবণ অনেকাংশে বোম্বাই লবণের ন্যায় হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত কয়েক প্রকার লবণ ব্যতীত বঙ্গদেশে কখন কখন আরও অন্যান্য স্থানের লবণ আইসে। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রকার স্বাভাবিক লবণ জন্মে, তাহা খেওড়া ও সম্বর (Samber) নামে অভিহিত। পূর্ব্বে সিন্ধু প্রদেশ (Sindh) হইতে লবণ আসিত ইহা সৈন্ধব লবণ নামে খ্যাত। এক্ষণে উহা আর উৎপন্ন হয় না। মস্কট হইতে এক প্রকার পার্ব্বতীয় লবণ আইসে, তাহাই সৈন্ধব নামে প্রচলিত। দুই তিন বৎসর হইতে সেলিফ্ (Saliff) হইতে এক প্রকার লবণ আসিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও সৈন্ধবের পরিবর্ত্তে চলিতেছে।

পূর্ব্ব আসাম অঞ্চলে দুর্গম পথহেতু লবণ আমদানি হইত না। সে স্থানের লোকেরা কলা গাছের বাসনা (খোলা) পোড়াইয়া আপনাদিগের ব্যবহারের জন্য টিপনি নামে এক প্রকার ক্ষার প্রস্তুত করিয়া লইত। কিন্তু এক্ষণে বিদেশীয় লবণের আমদানিতে টিপনির ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।



মহীশূরের মহারাজ

শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ রাজা উদেয়ার।

মহীশূরের মহারাজ

শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ রাজা উদেয়ার।

আজ কালি ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে দুই একজন যে স্বদেশের শিল্পোন্নতি কল্পে মনোনিবেশ করিতেছেন, ইহা দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয়। গত বৎ. জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের সময় বরোদার মহারাজ শিল্পপ্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন এবং তদুপলক্ষে উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া স্বীয় উদারতা ও দেশহিতৈষিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এ বৎসরও মহীশূরের নবীন ভূপতি জাতীয় মহাসমিতর সময় শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনোপলক্ষে মর্ম্মগ্রাহী বক্তৃতা করিয়া ভারতীয় শিল্পিকুলকে যথেষ্ট উৎসাহদান করিয়াছেন।

মহারাজ বয়সে নবীন, অল্পদিন হইল তিনি রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হয় যে, ভারতের ইতিহাসের শিল্প বিভাগে তাঁহার কীর্ত্তি চিরদিন অক্ষয় থাকিবে। অতি প্রাচীন রাজবংশে মহারাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত মহারাজের পূর্ব্ব পুরুষদিগের কার্য্যাবলী বিজড়িত। এই রাজবংশ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী।

ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন এই রাজবংশ পূর্ব্বাপর স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া হাইদার আলি কর্ত্তৃক কিরূপে বিতাড়িত হন, এবং টিপু সুলতানের পতনের পর ইংরাজকর্ত্তৃক কিরূপে পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান মহারাজের পিতা গদি প্রাপ্ত হন এবং মহারাজের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন।

মহারাজ দেশীয় শিল্পের উন্নতিবিষয়ে কিরূপ অনুরাগী, মহীশূরে শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত যে বিরাট আয়োজন হইয়াছে তাহা হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-পরিচালিত শিল্প জাতের সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে হইলে, এদেশের চিরপ্রচলিত হস্তচালিত শিল্প-সমূহ কিছুতেই সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত এই নবীন ভূপতি মহীশূর রাজ্যে উন্নত উপায়ে শিল্পশিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত অনুপ্রাণিত হন। পূর্ব্ব হইতেই মহীশূরে ৭ টী শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী বর্ত্তমান কালের প্রতিযোগিতার সময়োপযোগী নহে। যদি দেশের বহুসংখ্যক লোক উন্নত উপায়ে শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্য হাতে কলমে শিখিতে পারে, তবে কেবল নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার-সাধন কেন, অনেকে আত্মনির্ভরতার দ্বারা অন্নের সংস্থান করিতে সক্ষম হইবে, নবীন ভূপতির মনে ইহা উদয় হইল। বস্তুতঃ ইহা মহীশূরের বর্ত্তমান মহারাজের মহান্ হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

যাহা হউক মহারাজ হৃদয়গত কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত অচিরে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অল্পদিনের মধ্যে মহীশূরে আরও ৫ টী শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা হয়। মহীশূর রাজ-সরকারের ব্যয়ে ঐ সকল শিল্প বিদ্যালয়ের কার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তদনুসারে প্রথমে মহীশূরের অন্তর্গত চান্না পাটনা, সাগর, চিতলদুর্গ, চিকনগলুর এবং সিমোগা নামক কয়েকটী স্থানে একটী করিয়া শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয়।

মহীশূর রাজ কেবল সরকারের ব্যয়ে শিল্প বিদ্যালয়স্থাপনে নিশ্চিন্ত হইলেন না, যাহাতে শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার সুবিধার সহিত তাহাদিগের মনে উৎসাহবৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। সরকার হইতে ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত ২০টী বৃত্তির বন্দোবস্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থায় অনেক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে লোকে শিল্প শিক্ষার্থ মহীশূর রাজ্যে গমন করিতে পারিবে।

ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রবেশের আবেদনকারীদিগের মধ্যে মনোনীত ব্যক্তিকে এক একটী বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে মহীশূরে প্রতিষ্ঠিত শিল্প বিদ্যালয়েই শিক্ষা করিতে হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না হইলে কোন ছাত্রকেই বৃত্তি দেওয়া হয় না।

যাহাতে বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার সহিত ছাত্রের হাতে কলমে শিক্ষালাভ ঘটে, মহীশূরে তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। বয়ন কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য মহীশূর গবর্ণমেণ্ট অনেকগুলি তন্ত বা বয়ন বিদ্যালয় স্থাপনে মনস্থ করিয়াছেন। ঐ সকল বিদ্যালয়ের

সহিত একটী করিয়া ছুতারের কার্য্য শিক্ষা দিবার বিভাগ বা শ্রেণী সংযুক্ত থাকিবে। এই বিভাগে ছুতারের কার্য্য শিক্ষার সহিত প্রাথমিক নক্সার কার্য্য বা চিত্রবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত প্রাথমিক অঙ্কন শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। হোলনারাশীপুর, দদবল্লাপুর, চিকনাগাকানহাল্লি, এবং মোলাকালমরু নামক কয়েকটী স্থানে উল্লিখিত বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে দুই বৎসর কাল পরীক্ষামূলক শিক্ষা করিতে অর্থাৎ হাতে কলমে শিল্পকার্য্য শিখিতে হইবে। ইহার সহিত এক একটী রং করিবার বিভাগও সংযুক্ত থাকিবে।

মহীশূরের দশভাগের নয়ভাগ ভূখণ্ডে ধান্য প্রভৃতি আহার্য্য শস্য এবং তিল সরিসা প্রভৃতি তৈলোৎপাদক শস্য উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত এস্থানে তুলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ঐ স্থান স্বর্ণের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। মহীশূরে চন্দন কাষ্ঠ ও গজদন্ত নির্ম্মিত অনেক প্রকার খেলেনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং মহারাজের কল্পিত শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, মহীশূরজাত শিল্প কার্য্যের উপযোগী পদার্থ নিচয়ের উৎকর্ষ সাধনেরও পথ প্রসর হইবে। কারণ এই সকল বিদ্যালয়ের কার্য্য যত বৃদ্ধি হইবে, মহীশূরজাত শিল্পোপযোগী পদার্থ সমূহেরও তত উন্নতি হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

কেবল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া মহীশূরের শিল্পশিক্ষা প্রণালী পর্য্যবসিত হয় নাই। ইহার সহিত শিক্ষকদিগের শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা হইতেছে। অনেকে জানেন যে মহামতি টাটা বাঙ্গালোরে পরীক্ষাক্ষেত্রের (experimental farm) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ ক্ষেত্রে লোকে হাতে কলমে শিল্প শিক্ষা করিতে পারে। এইনিমিত্ত বাঙ্গালোর অঞ্চল হইতে কতিপয় স্কুল মাষ্টার বা বিদ্যালয়ের শিক্ষককে টাটা মহোদয়ের বাঙ্গালোরস্থিত শিল্পাগারে কার্য্য শিক্ষার্থ প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

টাটা মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রে উন্নত প্রণালীতে তুঁত গাছ উৎপাদন, রেশমের গুটী প্রস্তুতকরণ, এবং রেশমের পাট শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শিক্ষার্থী শিক্ষকদিগকে উল্লিখিত শিল্পাগারে তিন মাস কাল হাতে কলমে শিক্ষা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ইহাতে শিক্ষকদিগের হাতে কলমে কার্য্য শিক্ষা এবং ছাত্রদিগকে সেই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান উভয় কার্য্যই অতি সহজেই সম্পন্ন হইবে। বাঙ্গালোরে কার্য্য শিক্ষার সুবিধার জন্য শিক্ষকদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

এবার জাতীয় মহাসমিতির সময় শিল্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে মহারাজের কার্য্যকারিতার পরিচয় অনেকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহীশূরে যে রেশমের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, এবং মহারাজের চেষ্টায় রেশম শিল্পের যে শীঘ্র আরও উন্নতি সাধিত হইবে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যে স্থানে দেশের রাজা, প্রজাদিগকে শিল্পশিক্ষায় প্রণোদিত করিবার জন্য স্বয়ং উদ্‌যোগী, রাজকোষ হইতে প্রভূত অর্থরাশি ব্যয় করিয়া শিল্প বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার্থীদিগকে ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা প্রদানে অগ্রসর, সেখানে শিল্পোন্নতি অবশ্যম্ভাবী ইহা বলাই বাহুল্য।

আজ কাল শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত এদেশের অনেকে জাপান, আমেরিকা অথবা ইউরোপের নানাস্থানে গমন করেন। কিন্তু সকল স্থানে এ দেশের নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থ সম্বন্ধে অধিক শিক্ষা হয় না। বিশেষতঃ ঐ সকল স্থানে গমনপূর্ব্বক শিক্ষালাভ করিতে হইলে, বহু অর্থব্যয় আবশ্যক। যদি অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে দেশত্যাগী না হইয়াও লোকের শিল্প শিক্ষালাভ সুকর হয়, তবে দেশে থাকিয়াই অনেক লোকে শিল্পশিক্ষা করিতে পারে। কেবল তাহাই নহে, বিদেশ হইতে শিল্পশিক্ষা করিয়া যাঁহারা এদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এদেশের কোথায় কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কোন্ স্থান কোন্ কার্য্যের উপযোগী, তাহা জানিয়া লইতে বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করেন। যদি এদেশে থাকিয়াই লোকে হাতে কলমে উন্নত উপায়ে শিল্প কার্য্য শিক্ষা করিবার সুবিধা পায়, তবে অনেকেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া শিল্পশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে এরূপ আশা করা যায়। সুতরাং মহীশূরের নবীন ভূপতির স্বরাজ্যে শিল্পশিক্ষার উন্নতি বিধান কার্য্য যে তাঁহার প্রকৃত দেশহিতৈষণা এবং মহান্ হৃদয়ের পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যেরূপ প্রাচীন রাজবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীও তাহার অনুরূপ অতীব মহান্ হইয়াছে।

যদি মহীশূররাজের প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে ভারতের অন্যান্য স্থানের রাজন্যবৃন্দ স্বরাজ্যে শিল্পশিক্ষাবিস্তারে মনোযোগ প্রদান করেন, তবে অচিরে ভারতের শিল্পিকুলের উন্নতি সাধিত হইয়া ভারতভূমির নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার হয়, এবং ভারতের রত্নরাজি অজস্রধারে বৈদেশিক শিল্পিকুলের করতলগত না হইয়া এ দেশের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট অধিবাসিবৃন্দের জঠরজ্বালা নিবারণ করিতে পারে।

মহীশূর মহারাজের বক্তৃতা

এখনকার এই জীবন সংগ্রামের ঘোর প্রতিযোগিতার দিনে একটা কথা সর্ব্বদাই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শুনা যায় যে, দিন দিন বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি হইতেছে। অনেকে বলেন, এটা জগতের হাট বাজারে অন্যান্য বৈদেশিক জাতির চেষ্টা ও উন্নতির ফল। এ রোগ যিনি যে ভাবে বর্ণনা করুন না,ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। সে জন্য শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে আরও অধিক চেষ্টা হওয়া উচিত একথা সর্ব্বত্রই সকলে স্বীকার করেন।

এই ভারতবর্ষে এই সমস্যা একটু বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের দেশের বাণিজ্যের গতি ক্রমশঃ বিস্তারোন্মুখিনী; আর পার্লিয়ামেন্টের কাগজ পত্রে প্রকাশিত অঙ্ক তালিকা সংগ্রহ হইতে দেখান যাইতে পারে যে, দেশের সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িতেছে। কিন্তু আর এক দিকে দেখ, দেশের প্রাচীন হাতের শিল্পগুলি দিন দিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে, পূর্ব্বে যে সমস্ত শিল্প-বস্ত্রের জন্য ভারত এককালে প্রসিদ্ধ ছিল, প্রাচ্য দেশের কলের কাপড় তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে; আমাদের শিল্পসমূহের এমন নূতন জীবনীশক্তি দেখা যাইতেছে না, যদ্দ্বারা তাহারা দেশে বিদেশে অন্য জাতির শিল্প পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

চাষীর ঘরে অন্ন নাই, তাহারা আধপেটা খাইয়া চিরকাল চাষীই থাকে; যাহারা শিক্ষিত, তাহারা গবর্ণমেণ্ট-চাকরীর প্রার্থী অথবা আইন-ব্যবসায়ে প্রবেশ করে। আর দেশের শিল্পিগণ পিছাইয়া পড়িয়া আছে—তাহাদের সেই পিতৃ-পিতামহাগত প্রথায় আজিও জিনিস পত্র তৈয়ারী করে, সুতরাং কষ্টে সৃষ্টে কোন গতিকে প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম। একটা কথা শুনা যায় যে, ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ, আর চিরকালই ইহা কৃষিজীবী থাকিবে। কথাটা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমার বোধ হয় যে ভারতের নিত্য প্রত্যাগত দুর্ভিক্ষ দূর করিতে হইলে কেবল কৃষিকার্য্যের উন্নতিতে বা সস্তা তাঁত বসানতে বা জমীর খাজনার হার হ্রাস করায় তাহা সম্পন্ন হইবে না, পরন্ত এখানে যে সমস্ত অগণ্য জনসাধারণ কোন গতিকে আধপেটা খাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, আর দেশে অল্পমাত্র অজন্মা দেখা দিলেই সাধারণের দাতব্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, সেই সমস্ত লোককে চাষবাস হইতে সরাইয়া কোন রূপ শিল্প কার্য্যে নিয়োগ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

এখন আমাদিগকে উঠিয়া পড়িয়া কার্য্য করিতে হইবে। আমাদের পণ্যের জন্য নূতন বাজার চাই, শিল্পবাণিজ্যের অভিনব উপায় অবলম্বন করা চাই, হস্ত শিল্প নূতন করিয়া পরিপুষ্ট করা চাই। শিক্ষিত বেকার লোক হউক, অথবা আনাড়ী বা শিল্প-কুশল শ্রমজীবী হউক, যে সমস্ত লোকের অন্ন সংস্থান না থাকায় রাজ্যের একটা স্থায়ী অমঙ্গল মাথার ঝুলিতেছে, নব গঠিত উন্নতিশীল কাজকারবার খুলিয়া তাহাদের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে এ বিষয়ে চক্ষু ফুটিয়াছে, তাহা এই প্রদর্শনীতেই প্রমাণ। বাণিজ্য এবং শিল্প বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা জন্য দিন দিন আগ্রহ হইতেছে এবং এইরূপ প্রদর্শনী ঐরূপ শিক্ষার একটী প্রধান পরিচায়ক।

শিল্প শিক্ষার বিষয়ে অনেক লোকের অনেক মত। এই সময়ে ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন এরূপ দক্ষ লোক অনেক আছেন; আমি সেরূপ কার্য্যে সক্ষম বলিয়া ভাণ করি না; আজ এখানে লম্বা বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না। তবে মহীশূরে এ বিষয়ে কতকটা মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, এই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ পক্ষে যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন আছে, সে গুলিই আমরা সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। সম্ভবতঃ এই মান্দ্রাজেও সেই দশা। কিন্তু তাহা হইলেও আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। একটা পুরাতন কথা আছে যে, যে ব্যক্তি কখন কোন ভুল করে

মণ্ডপের ঠিক সম্মুখেই অবস্থিত ছিল। স্পিং গার্ডেনে শিল্পপ্রদর্শনীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ উদ্যানের বিস্তৃত ক্ষেত্র ও উহার দ্বিতল বাটী প্রদর্শনীর দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

মহীশূর হইতে আনীত দ্রব্যে প্রদর্শনীর এক-চতুর্থাংশের অধিক স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এমন স্থানে সে গুলি রক্ষিত হয় যে, প্রবেশ করিবা মাত্র সে গুলি নজরে পড়ে। দুইখানি দ্রব্য তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। এক খানিতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আনীত দ্রব্যের বিষয় এবং অপর খানিতে কেবল মহীশূরজাত দ্রব্যের বিষয় লিখিত ছিল।

মহীশূর এবং মান্দ্রাজ হইতে যে সকল পদার্থ প্রদর্শনীতে আনীত হয়, তাহার মধ্যে হস্তিদন্ত ও কাষ্ঠের কার্য্য এবং রৌপ্য ও চন্দন কাষ্ঠে খোদাই কার্য্যই প্রথমে বর্ণনা যোগ্য। টেবিল, চেয়ার, লিখিবার কেস নানাবিধ কাষ্ঠের কার্য্য প্রভৃতি, চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর পক্ষী, বিবিধ জন্তু, এবং কপাটের পেনেল ও গহনার বাক্সের উপর খোদিত নানাবিধ দেবদেবীর প্রতিকৃতি মহীশূরের শিল্পীদিগের কৃতিত্বের প্রকৃত পরিচায়ক। এই বিভাগের মধ্যে অরণ্য-জাত দ্রব্য-সমূহ উল্লেখ যোগ্য। ইহাতে নানাপ্রকার গাছের আঁশ এবং ঘাসের সমাবেশ ছিল। এতদ্ব্যতীত মহীশূরে রেশম বস্ত্রের কার্য্যও ইহার সহিত প্রদর্শিত হয়। এই রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য মহীশূর রাজ স্বয়ং বিশেষরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। মহীশূর-জাত কতকগুলি উৎকৃষ্ট রেশমের জিনিসও দেখা গিয়াছিল।

মান্দ্রাজের আর্ট স্কুলে প্রস্তুত নানাবিধ বস্ত্র, গৃহসজ্জা, এবং ধাতু-দ্রব্য-সমূহ প্রদর্শনীতে দেখা যায়। রেশমের বস্ত্র, পাগড়ীর নানাবিধ কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের একটি অর্দ্ধমূর্ত্তি ধাতু নির্ম্মিত পদার্থ সমূহের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই অর্দ্ধমূর্ত্তি ব্যতীত অনেকগুলি রূপার কার্য্য করা শামাদান, পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি, থালা প্রভৃতি দেখান হইয়াছিল। ইহাদিগের কারুকার্য্য প্রশংসনীয়।

মহীশূর ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে প্রেরিত শিল্পজাত পদার্থ গুলি ১৪ টী বিভাগে স্থাপিত হয়। ১ম গ্রুপ যন্ত্রাদি বা কল কজার জন্য, ২য় কলের সাহায্যে প্রস্তুত দ্রব্যসমূহের জন্য এবং ৩য় বৈদ্যুতিক যন্ত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ৪র্থ গ্রুপে যন্ত্রাদি রক্ষা করা হইয়াছিল। কয়েকটী বাজা ঘড়ি এই গ্রুপে দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্ভিন্ন অনেক গুলি বাদ্য যন্ত্র ও ছিল।

৫ম বিভাগ গৃহাদি নির্ম্মাণের মাল মসলা এবং ধাতব পদার্থের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহাতে গোদাবরী এবং কোকনদ অঞ্চলের নানা প্রকার চকোর, মান্দ্রাজের প্রস্তর এবং অভ্র নির্ম্মিত কয়েকটী পদার্থের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

৬ষ্ঠ বিভাগে সমস্ত বয়ন-শিল্পের সমাবেশ হইয়াছিল। কয়েকটি জেলখানা এবং মান্দ্রাজ আর্টস্কুল হইতে প্রদর্শনীতে কতকগুলি উত্তম নক্সাদার কার্পেট আসিয়াছিল। এই বিভাগে বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহুবিধ দ্রব্যের সমাবেশ দেখা যায়। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ষ্টোর হইতে পশমী বস্ত্র, কোর্ত্তা, মোজা, রেশমী বস্ত্র এবং কাশ্মীয়ারের কতকগুলি নমুনা প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গৌহাটী হইতে আসাম জাত রেশমে প্রস্তুত এক খণ্ড মুগা, বহরমপুর হইতে ৮ খানি খণ্ডা কাপড়, বারাণসীর গিরিধারী দাস হরিদাস কর্ত্তৃক প্রেরিত সোণার কাজ করা কয়েক খানি বারাণসী চেলী, মুলতানের শ্রীমতী দুর্গাদেবী প্রেরিত এক খানি বিবিধ চিত্র খচিত ঝালর শোভিত পাখা প্রদর্শনীর ষষ্ঠ বিভাগের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

৭ম বিভাগে ভারতবর্ষীয় উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ নানাবিধ দ্রব্যের সমাবেশ হইয়াছিল। ভারতবর্ষ এখনও বিবিধ শস্য, তামাক এবং অন্যান্য দ্রব্যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী আছে, তাহা এই বিভাগে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রদর্শনীতে চা এবং কফিও দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারত হইতে এই চায়ের আমদানি হয়। উত্তর ভারত হইতে প্রদর্শনীতে চা প্রেরিত হয় নাই। এই বিভাগে ভারতবর্ষীয় চিনি, মধু, রংয়ের গুঁড়া, বিভিন্ন প্রকারের তৈল, সিরাপ, নানাবিধ আচার, মোরব্বা, এবং বিস্কুটের নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

৮ম বিভাগ চামড়া, শৃঙ্গ, এবং কাগজের জন্য

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চর্ম্ম নির্ম্মিত বহু প্রকারের জুতা, কোমরবন্দ, ঘোটক সজ্জা, হরিণ শিং, শৃঙ্গ নির্ম্মিত কাগজ কাটা ছুরী, প্রভৃতি ঐ বিভাগে প্রদর্শিত হয়।

মাটির বাসন, পোরসিলন এবং কাচ নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জিনিস ৯ম বিভাগে প্রদর্শিত হয়। জয়পুর হইতে পোরসিলনের জিনিস প্রেরিত হইয়াছিল।

দশম বিভাগ ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আলুমিনিয়মের দ্রব্যগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য। অন্যান্য ধাতু নির্ম্মিত নানাবিধ আকার বিশিষ্ট পেয়ালা, ছুরি, কুঠার এবং ছোরা প্রদর্শিত হইয়াছিল। পিত্তল এবং লৌহ নির্ম্মিত নানাবিধ আকারের কুলুপ যথেষ্ট পরিমাণে এই বিভাগে দেখা গিয়াছিল। অধিকাংশ কুলুপই বোম্বাই অঞ্চল হইতে প্রেরিত। এই বিভাগে দাক্ষিণাত্যের চিরপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার পত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

একাদশ গ্রুপে নানাবিধ তৈল, গন্ধ দ্রব্য, রং, এবং কালী, সাবান, এবং বাতি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

১২শ গ্রুপে নানাপ্রকার গৃহসজ্জা ছিল। বাঁশের টিপাই, সাটিন কাষ্ঠ, এবং মেহগিনি কাষ্ঠের বাক্স, সেগুণ কাষ্ঠের বারকোষ, এবং নাচ ঘর সজ্জার উপযোগী নানাবিধ কারুকার্য্যযুক্ত দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

১৩ দশ গ্রুপে ছবি এবং অন্যান্য কলা শিল্প প্রদর্শিত হইয়াছিল। অভ্রের ছবি এই সঙ্গে ছিল। এতদ্ব্যতীত গজদন্ত নির্ম্মিত কলম, কাঠের ফ্রেম, কাগজ চাপা প্রভৃতিও এই বিভাগে প্রদর্শিত হয়।

চতুর্দ্দশ বিভাগে পালকের পাখা, নোট বুক, টেনিস খেলাইবার বল, দড়ি, এবং এইরূপ অন্যান্য পদার্থও প্রদর্শিত হয়।

অল্পমূলধনে ব্যবসায়।

(২)

অতি সামান্য মূলধনে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় হইতে পারে, তাহা বোধ হয় অনেকে বুঝিতে পারেন। তবে সেরূপ ব্যবসায় হইতে একটা কাণ্ড লাভের আশা করা যায় না।

তবে অতি সামান্য মূলধন হইতেও আশাতিরিক্ত লাভ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, যদি তাহার উপযোগী কতকটা বন্দোবস্ত বা Organisation করিতে পারা যায়।

যে সকল বিদেশীয় দ্রব্য আমাদের দেশে আমদানী হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে অনেক গুলি দ্রব্য এখানে প্রস্তুত করা তত কঠিন নহে, কিন্তু তাহা সাধারণে প্রচার করা এবং প্রচার করিয়া তাহা বহুল পরিমাণে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারাই অধিক কঠিন।

মনে করুন, যব (বার্লী), এরোরুট বা সরিষা (Mustard) ইত্যাদির চূর্ণ এখানে প্রস্তুত করা তত কঠিন নহে, কিন্তু তাহা প্রচার করিয়া বেশী পরিমাণে বিক্রয় করিতে পারাই কঠিন।

এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে অতি সামান্য মূলধনের আবশ্যক। যদি ভালরূপ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তবে সামান্য মূলধনেই ঐ ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ হইতে পারে।

কোন দ্রব্য বেশী পরিমাণে বিক্রয়ের জন্য তাহার ভূরি পরিমাণ বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে পারিলে তবে সেই দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্য হইতে পারে। (একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে দ্রব্যটির নিজের গুণও থাকা আবশ্যক,) কিন্তু এ প্রকার বিজ্ঞাপনাদি প্রচার এতদূর ব্যয় সাপেক্ষ, অথচ সকল সময়ে এমন ফলপ্রদ নহে, যে অল্প মূলধনের ব্যবসায়ী তাহা সাহস করিয়া করিতে পারেন। বিশেষ কতকগুলি অসৎ লোকে মন্দ দ্রব্যের গুরুতর বিজ্ঞাপন দিয়া, বিজ্ঞাপনের প্রতি লোকের এমন অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে যে ঐরূপ বিজ্ঞাপনের প্রতি নির্ভর না করাই ভাল।

এই সকল দ্রব্য আমাদের দেশে প্রস্তুত হইলে, যদি লোকের মুখে তাহার সুখ্যাতি হয়, তবে তাহার শীঘ্রই বিক্রয়াধিক্য হইতে পারে। এই জন্য যদি এই প্রকার ব্যবস্থা করা যায়, তবে বিলক্ষণ সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

Indian Stores যেমন দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সেইরূপ ভাণ্ডার স্থানে স্থানে স্থাপিত হওয়া উচিত। এবং প্রত্যেক কেন্দ্রের ভাণ্ডারের অধীনে ৪।৫শত এজেণ্ট থাকা আবশ্যক। মফস্বলে এবং সর্ব্বত্র এই সকল এজেণ্টের নিকট সকল প্রকার দেশীয় দ্রব্য ২।৪ টা করিয়া থাকিবে; তাহা হইলে এই সকল এজেণ্টের পরি-

চিত লোকে তাহাদিগের নিকট হইতে সকল প্রকার দেশীয় দ্রব্যের অস্তিত্ব ও গুণাগুণ জানিতে পারিবেন। আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন লোকে বোধ হয় জানেন না যে, দেশে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হয় এবং তাহা কোথায় পাওয়া যায়। এই প্রকারে প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারের অধীনে ৪।৫ শত করিয়া এজেণ্ট থাকিলে, দেশী সকল দ্রব্যের শীঘ্রই বিক্রয়াধিক্য হইতে পারে। এবং তাহা হইলে অল্প মূলধনে অনেকে অনেক ব্যবসায় করিয়া বিশেষ রূপে লাভবান হইতে পারেন।

একটা উদাহরণে তাহা বুঝিতে পারিবেন। মনে করুন যদি বার্লী প্রস্তুত ও তাহার ব্যবসা করা যায়।

ময়দার যে সকল রোলার মিল আছে, সেই সকল মিলে বার্লী উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও চূর্ণ হইতে পারে। এই সামান্য বার্লীর ব্যবসায় করিতে গিয়া কেহই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রোলার মিল করিতে পারেন না, অতএব কোন রোলার মিলে দৈনিক ভাড়া দিয়া বার্লী চূর্ণ করিয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলে এইরূপ ব্যয় পড়ে :—

২০ মণ উত্তম যবের মূল্য	৪০৲
২০ মণ যব চূর্ণ করিবার জন্য মিলের ভাড়াদি	২০৲
১০০০ টিনের মূল্য	৩০৲
টিনে পুরিবার মজুরী	৫৲
বাজে খরচ	৫৲
মোট খরচ	১০০৲

ভূসি ইত্যাদি বাদে—
১২॥০ মণ বার্লী চূর্ণে—
১ পাউণ্ড ১০০০ টিন—

প্রতি টিন ।৵ হিসাবে বিক্রয় হইলে ২৫০৲ টাকা হয়।

প্রতি মাসে ১০০০ টিন বার্লী প্রস্তুত করিয়া Indian Store এর ন্যায় একটা বড় মহাজনের কাছে দিতে পারিলে, তাঁহারা তাঁহাদিগের দেশ দেশান্তরের ৪।৫শত এজেণ্ট দ্বারা মাসে এক হাজার টিন বার্লী বিক্রয় করা আশ্চর্য্য নহে। তাহা হইলে অতি সামান্য অর্থাৎ ১০০৲।১৫০৲ শত টাকা মাত্র মূলধনে মাসে এক শত টাকাও লাভ হইতে পারে।

তবে Indian Store বা এইরূপ ভাণ্ডারের পক্ষে ৪।৫ শত এজেণ্ট করিতে পারা কিছু কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নহে।

বিলাতী দ্রব্যের যে এত অধিক বিক্রয় আমরা দেখিতে পাই, তাহার কারণ দ্রব্যের মূল্যের সুলভতা বটে, কিন্তু প্রধান কারণ এই বন্দোবস্ত (Organisation) আজ রেলি ব্রাদার যে কাপড় আনিলেন, ৩দিন পরে আপনি দেখিবেন, তাহা সুদুর পল্লীগ্রামের অতি অজানিত গ্রামের চাষী লোকের দ্বারে দ্বারে ফেরীওয়ালা কাঁধে করিয়া লইয়া গিয়াছে; আপনার দেশী দ্রব্য অতি সস্তা হইলেও পল্লীগ্রামে (বা সহরে) তোমার দ্বারে কেহই তো তাহা আনে না। কেন আনে না বলিতে পারেন?

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত।

শ্রীলশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ
বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত
সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬ ও ৩৬ নং ফৌজদারী-বালাখানা, কলিকাতা।

অশ্বগন্ধা রসায়ন।

অকাল বার্দ্ধক্যের মহৌষধ।

কালের কুটিল মাহাত্ম্যে—নিজের কপাল দোষে, কর্ম্মবশে, জলবায়ুর দূষিত রসে—লোকে কত কষ্ট পায়। সুখের সংসার শোকের কাল-কারাগার। অকাল বার্দ্ধক্য—অকাল মৃত্যুর প্রভাব কিসে নিবৃত্তি পায়?

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

ভগ্নদেহে, মগ্ন প্রাণে—নূতন সুঠাম; লাবণ্য-জড়িত, পীযূষ-পূরিত, শোভাময় নবীন গঠন; আশা,—উল্লাস,—আনন্দের যৌবন-জোয়ার। কতদিন পরে—আবার কত দিন পরে আঁধার ঘরে বাসন্তী পূর্ণিমা রজত ধারে আনন্দ মকরন্দের সৌরভ সারে, চারিধারে সুধা ঢালিবে; শূন্য পিঞ্জর কাকলীরবে আবার মুখরিত হইবে।

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

জরে—অনাচারে—অত্যাচারে—আহার বিহারের দোষে বারে বারে কত কষ্ট সহিলে; আজি প্রমেহ, কালি ধাতুদৌর্ব্বল্য, পরশ্ব শ্বাসকাস;—বারমাস দুঃখ-কষ্ট—যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কত বাজে ঔষধ ব্যবহার করিলে। কিন্তু কি ফল হইল? যাতনা দ্বিগুণ বাড়িল; আঁধার ঘোরতর হইল! এইবার—

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

দেখিবে ইহার মোহিনী শক্তি। ইহা ইন্দ্রজাল নহে, ভোজবাজী নহে। ঋষিবর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ জীবনীয় ঔষধ অশ্বগন্ধার বীর্য্য হইতে বিশুদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত

অশ্বগন্ধা রসায়ন।

ইহা স্বাস্থ্য-সংস্থাপক, রক্ত-সংশোধক, শুক্র-জনক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও আগ্নেয়। সেইজন্য ইহা শুক্রতারল্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, শোণিতবিকার ও ক্ষুধামান্দ্যের মহৌষধ। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তির পরিচয় পাইবে;—তরলশুক্র আবার গাঢ় ও ওজস্বী হইবে, ক্ষীণ পেশী ও স্নায়ুতন্তু যৌবনের উদ্দাম তেজে আবার দৃঢ় ও কঠিন, সবল ও কর্ম্মঠ হইবে, নিষ্ক্রিয় যন্ত্র ও ইন্দ্রিয় সকল আবার সত্বর কার্য্য-তৎপর হইয়া সংসার সুখময় করিয়া তুলিবে। একবার—

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

ইহা ছাত্রদিগের মহোপকারী; কারণ ইহা মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং অধিক অধ্যয়ন-জনিত কষ্ট ও দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া দেয়।

অশ্বগন্ধা রসায়ন—স্ত্রীদিগের রজঃ ও জরায়ু দুষ্টি, মৃতবৎসাদোষ ও প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া শরীর ও জরায়ু সুস্থ ও সবল করে।

মূল্য প্রতি শিশি ১।৷০ দেড় টাকা।
অঃ ভিঃ পিঃ ২/০ দুই টাকা এক আনা।
৩ শিশির মূল্য ৩৸০ তিন টাকা বার আনা।
১২ শিশির মূল্য ১৫৲ টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অপরের কথা কি বলিব।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন যাহা বলিয়াছেন, একবার দেখ; তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন
শ্রীযুক্তবাবু আদ্যনাথ বসু এল, এম্, এস,
ডাক্তার মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"মহাশয়ের আবিষ্কৃত "অশ্বগন্ধারসায়ন" নানা-স্থানে ব্যবহার করাইয়া যেরূপ আশাতীত ফল পাইয়াছি, তাহাতে আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইহা "শারীরিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।" অধিকন্তু ইহা দ্বারা প্রমেহের এবং মূত্রকৃচ্ছ্রেরও বিশেষ উপকার হয়।"

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন, চিকিৎসক।
১৪৬ নং ফৌজদারী-বালাখানা, কলিকাতা।

কলার আঁশ।

এ দেশে কলা একটি বিশেষ লাভের চাষ। ইহাতে পরিশ্রম অল্প অথচ লাভ প্রচুর। কলাও এদেশে পর্য্যাপ্ত জন্মে। কলার ফল, মোচা, থোড় মানুষের খাদ্য। পাতা একটি প্রয়োজনীয় ব্যবহারের সামগ্রী। কলার বাসনা শুকাইয়া পোড়াইলে ক্ষার পাওয়া যায়। এই ক্ষারে সেকালে কাপড় কাচা হইত এবং পাড়াগাঁয়ে লবণের কার্য্য করিত। ইদানীং ঐ দুই কার্য্যে ইহার ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে। এই ক্ষারে পটাশের ভাগ যথেষ্ট আছে। সেই জন্য এই ক্ষার জমীর সারের পক্ষে এবং কাপড় কাচার পক্ষে একটা মূল্যবান পদার্থ।

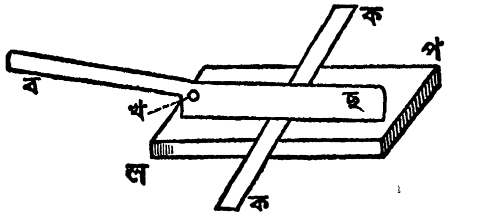
কলা গাছের কাণ্ডগুলা প্রায় এদেশে ফেলা যায়। এক শ্রাদ্ধের সময় কলার খোলার ব্যবহার হইতে দেখা যায়, কিন্তু অন্য ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু এই কাণ্ড অনেক প্রয়োজনে লাগে। টুকরা টুকরা কাটিয়া দিলে গবাদি পশু এই কাণ্ড রুচি পূর্ব্বক আহার করে। তা ছাড়া এই কাণ্ড কাগজের একটি উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিছু দিন পূর্ব্বে বালি, টিটেগড় প্রভৃতি কাগজের কলে বিস্তর কলাগাছ খরচ হইত এবং কলের নিকটবর্ত্তী স্থানে কলার চাষীরা গাছ বেচিয়া বেশ দুপয়সা পাইত। কিন্তু এখন সাবুই ঘাসে কাগজ প্রস্তত হওয়ায় কাগজের জন্য কলাগাছের ব্যবহার হয় না।

কলার পেটো বা খোলা হইতে আঁশ বাহির করা যায়। ফিলিপিন দ্বীপে কলার আঁশের বিস্তৃত কারবার আছে। এই কলার আঁশে দড়ী, কাপড় প্রভৃতি প্রস্তত হয় এবং বিদেশেও এই আঁশ প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হয়। ঐ দ্বীপে এক জাতীয় গাছ আছে, তাহার আঁশই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং আঁশের জন্য তথায় সেই জাতীয় কলার চাষ হইয়া থাকে। এই জাতীয় কলার নাম *Musa textilis*. ইহার ফল অপদার্থ, সে জন্য মানুষের ব্যবহারে লাগে না। কেবল আঁশের জন্য এই কলার চাষ হইয়া থাকে। এই জাতীয় কলা এদেশে রোপণ করিবার পক্ষে একটা ব্যাঘাত আছে। ইহার সান্নিধ্যে অন্য জাতীয় কলা নষ্ট হয়। কারণ এই জাতীয় কলার পুষ্পরেণু অন্য জাতীয় কলায় উপগত হইলে, ফলে বীজ জন্মিয়া তাহা মানুষের অখাদ্য হয়।

আমাদের দেশের কলার আঁশ বাহির করিতে পারা যায় কি না, তাহার পরীক্ষা আবশ্যক। পরীক্ষা সফল না হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না। এদেশে নানা জাতীয় কলা আছে, তাহার মধ্যে কোন না কোনটি আঁশ বাহির করিবার উপযুক্ত হইতে পারে। শুনা যায়, কাঁঠালী কলায় উৎকৃষ্ট আঁশ বাহির হইতে পারে।

আঁশ বাহির করিবার প্রণালী কঠিন নহে। খোলা গুলা ২ হাত ২॥ হাত আন্দাজ লম্বা রাখিয়া কাটিবে, পরে তাহা লম্বালম্বি ফালা করিয়া চিরিবে। ফালা গুলা ২।৩ আঙ্গুল চৌড়া থাকিবে। তাহার পর একখান সমতল তক্তার উপর ফেলিয়া একটা ভোঁতা বাঁশের ছুরী দিয়া চাঁচিবে। ছুরি খানার মুখও সমতল হওয়া চাই। এইরূপ চাঁচিলে উপরের শাঁসগুলা ছাড়িয়া গিয়া লম্বা লম্বা সূতা বাহির হইবে।

তক্তায় ফেলিয়া ছুরি দিয়া চাঁচা অপেক্ষা ছুরি ও তক্তার মধ্যে গছাইয়া ফালা গুলা টানিয়া লওয়া সহজ। সে জন্য ছুরি ও তক্তা এমন ভাবে আঁটা উচিত যেন না নড়ে। বাঁশের ছুরী ও তক্তার অপেক্ষা লোহার ছুরী ও লোহার পাতে বেশী কাজ হয়। ছুরী ও পাত কিরূপ ভাবে বসাইতে হইবে এবং পোটোর ফালা গুলা কিরূপ ভাবে তাহার মধ্যে গছাইয়া টানিতে হইবে, নিম্ন লিখিত চিত্রে আমরা তাহা দেখাইলাম। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, ছুরীর মুখ ভোঁতা হওয়া আবশ্যক আর ছুরীর ধার ও লোহার পাত পরস্পর সমান্তরাল ও সমতল হওয়া চাই, এবং লোহার পাতের উপর ছুরীর মুখ বেশ মিল হওয়া চাই।



১ম চিত্র।
আঁশ চাঁচা ছুরি।

এই চিত্রে ব খ ছ ছুরী, ল প সমতল লোহার

পাত। ছুরীর ধার লোহার পাতের উপর ঠিক সমান্তরাল ভাবে বসান। উহার মধ্য দিয়া পেটোর ফালা গুলা টানা যায়। এক একটা ফালা অনেক বার টানিলে তবে ক্রমশঃ শাঁস ছাড়িয়া সূতা বাহির হইবে।

প্রথমতঃ পেটোর ফালা গুলার ভিতরের পীঠ উপরে করিয়া ছুরীর মুখের দিকে দিতে হয়। ৭।৫ বার টান দিয়া তাহার পর উল্‌টাইয়া অপর পৃষ্ঠে টান দিতে হয়।

অবশ্য দুই হাত আড়াই হাত লম্বা ফালা গুলা সমস্তটা একবারে টানা যায় না। খানিকটা খানিকটা করিয়া টানিতে হয়।

এই টান দিবার প্রক্রিয়া একটু কটিন। অভ্যাস না থাকিলে ঠিক চাঁচিতে পারা যায় না।

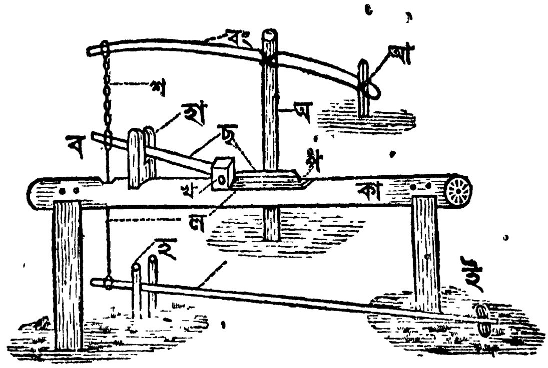
ছুরি খান ১৷৷০ হাত ২ হাত লম্বা, তন্মধ্যে বাঁট অর্দ্ধেক। ফাল খান ৸০ তিন পোয়া ১ হাত লম্বা এবং ৩।৪ আঙ্গুল চওড়া। ছুরীতে ৪।৫ সের লোহা আবশ্যক।

লোহার পাত খান ৪।৫ আঙ্গুল চওড়া, এক হাত ১৷৷০ হাত আন্দাজ লম্বা (অর্থাৎ ছুরীর ফালের অপেক্ষা কিছু বড়) হওয়া চাই। পাত খান ।০ ইঞ্চি পুরু হইলেই চলিবে।

উপরে বলা হইয়াছে ছুরী ও পাতের মধ্য দিয়া টানিবার সময় ছুরী ও পাতখানা না নড়ে, এরূপ ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। সে জন্য একটা বড় কাঠের উপর লোহার পাতখান ইসক্রু দিয়া আঁটিয়া দিলেই হইবে এবং ছুরী খানাও ঐ কাঠের উপর একটা ছোট হাড়কাঠ বসাইয়া তাহার মধ্য দিয়া একটা খিল করিয়া আঁটিয়া দিলেই আর নড়িবে না।

ফিলিপিন দ্বীপে কলার আঁশ বাহির করিবার জন্য যে সামান্য যন্ত্র ব্যবহার হয়, আমরা নিম্নে তাহার প্রতিকৃতি দিলাম। নীলগিরির গবর্ণমেণ্ট বোটানিকাল উদ্যানের অধ্যক্ষ প্রাউডলক সাহেব (Mr. Proudlock) কলার আঁশ বাহির করিবার যন্ত্র বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। উহা মান্দ্রাজের কৃষি বিভাগ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তিকা হইতে আমরা নিম্ন লিখিত ছবি খানি এবং এই প্রবন্ধের অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহ করিলাম।

এই যন্ত্রের প্রধান অংশ ছুরী ও লোহার পাত।



২য় চিত্র।

কলার আঁশ চাঁচিবার কল।

আমরা এই প্রস্তাবের প্রথম চিত্রে উহা বুঝাইয়াছি। পাঠকগণ দ্বিতীয় চিত্রেও ছুরী ও পাতখানি যথাস্থানে চিনিতে পারিবেন।

লোহার পাতখানি একটা বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ডে ইসক্রু দ্বারা আঁটা; এই কাষ্ঠখণ্ড আবার দুইটা খোঁটা দ্বারা জমীর সহিত আবদ্ধ।

যে কাষ্ঠ খণ্ডে লোহার পাত আবদ্ধ, তাহাতেই ছুরীর বাঁটের দুই দিকে দুইটা ছোট হাড়কাঠ। ফালের দিকে হাড়কাঠের সহিত ছুরীখান একটা লোহার খিল (চিত্রে খ) দিয়া আবদ্ধ। এরূপ হওয়ায় ছুরী কোন দিকে নড়িতে চড়িতে পারে না, অথচ খিলের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে।

বাঁটের শেষ দিকে হাড়িকাঠের মধ্যে ছুরী খান উপর নীচে উঠিতে নামিতে পারে, কিন্তু পাশের দিকে এধার ওধার সরিয়া যাইতে পারে না। ছুরীর এইরূপ অবস্থায় বাঁটের দিকে টান দিলে ফাল খান উপর নীচে উঠান নামান যায়, কিন্তু পাশের দিকে নাড়া চাড়া যায় না। উপরে উঠা নামার দরুণ ছুরীর ফালের নীচে লোহার পাতের উপর আবশ্যক মত ফাঁক পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্য দিয়া কলার খোলা চালান যায়।

যন্ত্রটির প্রধান অংশ বর্ণিত হইল। এখন চাপের কথা। ছুরীর উপর আবশ্যক মত চাপ না দিলে কার্য্য হয় না, এটা সকলেই সহজে বুঝিবেন। বাঁটের উপর দিকে টান দিলেই ছুরীর উপর চাপ পড়িবে। এই চাপ হাত দিয়া দেওয়া যাইতে পারে, অথবা যন্ত্রের সাহায্যে দেওয়া যাইতে পারে। হাত অপেক্ষা যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দেওয়া সহজ।

ছুরীর বাঁটের উপর টান দিবার জন্য একটা দড়ী বা শিকল, একটা বাঁশ ও কয়েক খণ্ড কাঠের আবশ্যক। দ্বিতীয় চিত্রে সে সমস্ত অংশ চিত্রিত আছে, নিম্ন লিখিত বর্ণনায় পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

অ এবং আ দুইটা খোঁটা। আ ছোট, অ লম্বা। অ আ এই দুই খোঁটায় এক খণ্ড বাঁশের ডগা বাঁধা। চিত্রে বাঁশের ডগাকে বং অক্ষরে চিহ্নিত করা আছে। এই বংশ খণ্ড ৪।৫ হাত লম্বা হইলে চলে।

এই বাঁশের ডগার সহিত যদি ছুরীর বাঁট একটা শিকল অথবা দড়ী দিয়া বাঁধা যায়, তাহা হইলে বাঁশটা স্প্রিংএর ন্যায় কার্য্য করিবে এবং ছুরীর বাঁটটা উপর দিকে টানিয়া রথিবে, সুতরাং ছুরীর ফালের উপর চাপ পড়িবে।

দড়ীর পরিবর্ত্তে শিকল ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, শিকলের ঘাট অনুসারে ছুরীর বাঁটটা আটকাইয়া দিলে ছুরীর উপরের চাপ আবশ্যক মত কম বেশী করা যায়।

ছুরী খান ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে পেটো গছাইবার জন্য নিম্নভাগের সরঞ্জাম আবশ্যক।

বাঁটের সহিত যে শিকল বাঁধা আছে, তাহা নীচের দিকে টান দিলেই ছুরী খান ফাঁক হইয়া যাইবে। এই কার্য্যের জন্য শিকলের সহিত একটু দড়ী বাঁধিয়া একখণ্ড লম্বা কাঠের মুখে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই কাষ্ঠের মুখ উঠিলে নামিলেই দড়ীতে পর্য্যায়ক্রমে আলগা ও টান পড়ে। ঢেঁকি কলের ন্যায় বন্দোবস্ত করিয়া পায়ে চাপ দিলেই এ কার্য্য সমাধা হয়।

চিত্রের নিম্নভাগ দেখিলেই এই বন্দোবস্ত পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

ছুরীর উপর কি পরিমাণ চাপ দেওয়া আবশ্যক তাহা একটু অভ্যাস হইলেই বুঝিতে পারা যায়।

এই প্রক্রিয়ায় যে আঁশ বাহির হয়, তাহা ছায়ায় শুকাইয়া লইতে হয়। যে খানে বেশ বাতাস বহে, এরূপ ছায়াযুক্ত স্থলে বাঁশ অথবা দড়ী খাটাইয়া তাহার উপর বিছাইয়া দিলেই অল্প ক্ষণের মধ্যে আঁশ গুলা শুকাইয়া যায়। কলার আঁশ ভাল করিয়া শুকাইলে ব্যবহারে আসে। রৌদ্র লাগিলে আঁশ গুলা গুঁড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা, সে জন্য রৌদ্র লাগিতে দেওয়া উচিত নয়। যে দিন গাছ কাটা হয়, সেই দিনই পেটো হইতে আঁশ বাহির করা আবশ্যক। নচেৎ আঁশ গুলা নষ্ট হইয়া যাওয়া সম্ভব।

বাহিরের পেটো গুলা ভিতর অপেক্ষা কঠিন। ভিতরের পেটো হইতে যে সূতা বাহির হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও নরম, আর উপরের পেটো হইতে যে আঁশ বাহির হয় তাহা মোটা এবং শক্ত। উপরের পেটো হইতে আঁশ ছাড়ানও অপেক্ষাকৃত কঠিন, সেজন্য সচরাচর উপরের কঠিন পেটো গুলা বাদ দেওয়া হইয়া থাকে।

দ্বারবঙ্গ রাজষ্টেটের উদ্যানসমূহের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে আর এক উপায়ে কলার আঁশ বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিগত ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখের হিতবাদীতে তিনি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে সেই প্রক্রিয়াটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কলাগাছের দুই অংশ হইতে দুই প্রকারের আঁশ বাহির হয়। পত্র দণ্ড (Stalk) হইতে যে সূতা বাহির হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, দৃঢ় ও মসৃণ; আর পেটিকা হইতে যে আঁশ বাহির হয় তাহা কিছু স্থূল, অল্প দৃঢ় ও চিক্কণতাবিহীন বলিলেই হয়। তাহা বলিয়া, এমন কথা বলি না যে, পেটিকাজাত আঁশ কোন কাজেরই নয়।

"আঁশ বাহির করিবার পূর্ব্বে পত্রের দণ্ড ও পেটিকাসমূহকে স্বতন্ত্র করিতে হইবে, নতুবা উভয়ের আঁশ একত্রে মিলিত হইয়া যাইবে। তাহা হইলে উভয়বিধ আঁশের পার্থক্য বা তারতম্য থাকিবে না। তদনন্তর পত্রের দণ্ড হইতে পত্রের অংশকে একবারে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, কেবল পত্রদণ্ডগুলিকে আকমাড়া কলের মধ্যে দিয়া উত্তমরূপে পিশিয়া লইতে হয়। এইরূপে পিশিয়া লইলে, দণ্ডমধ্যস্থিত সমস্ত রস বহির্গত হইয়া যায়। এক্ষণে সেই নিষ্পেষিত দণ্ডসমূহকে গরম জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া খাল বিল বা পুষ্করিণীতে পাটের ন্যায় উত্তমরূপে কাচিলেই আঁশ বাহির হইবে। পেটিকা হইতে আঁশ বাহির করিবার জন্য অন্য কোন স্বতন্ত্র নিয়ম নাই, উল্লিখিত প্রণালীতেই উহার আঁশ বাহির করা যায়। অতঃপর আঁশগুলিকে পরিষ্কার জলে কাচিয়া লইয়া ছায়াতে

শুষ্ক করিতে হইবে এবং তিন চারিদিন উপর্য্যুপরি রাত্রিতে বহির্দ্দেশে রাখিয়া শিশির খাওয়াইতে হইবে ও দিনে ছায়াতে বিস্তারিত করিয়া দিতে হইবে। রৌদ্র লাগিতে দিলে আঁশ কঠিন হইয়া যায় এবং সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ছায়ায় শুকাইয়া রাত্রিতে বাহিরে রাখিলে উহা কমনীয় ও উজ্জ্বল হয়, সুতরাং বস্ত্রাদি বয়নের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

"সকল অবস্থার গাছেই যে সমান রকমের আঁশ হয়, তাহা নহে। যে সকল গাছে সদ্য মোচা বাহির হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাদিগের আঁশই উৎকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ তাহা সূক্ষ্ম, দৃঢ় ও চিক্কণ হয়, কিন্তু যে গাছে কলা ফলিয়াছে, তাহার আঁশ তেমন হয় না, কারণ সে সময়ে আঁশগুলি সমধিক পাকিয়া যায়। পাকা গাছের আঁশ এই জন্য কঠিন হয় ও ভাঙ্গিয়া যায়, সুতরাং তাহার দ্বারা কোন বিশেষ কাজ হয় না।"

কলার মোটা আঁশ হইতে বেশ শক্ত দড়ী প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার সূক্ষ্ম আঁশ গুলি সূক্ষ্ম চিক্কণ অথচ শক্ত; উহা হইতে বেশ ভাল কাপড় তৈয়ারি হইতে পারে। ঢাকার শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র রায় ১৮৮৩।৪ সালের কলিকাতা প্রদর্শনীতে একখানি কলার আঁশে প্রস্তুত কাপড়ের উপর জরীর কাজ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ কাপড় খানি এখনও কলিকাতার যাদুঘরে (Economic Museum) রক্ষিত আছে। ঐ কাপড় সূতার কাপড় অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। উক্ত প্রদর্শনীতে ঢাকার অন্তর্গত নবাবপুর হইতে শ্রীযুক্ত নিতাই চরণ ও জগদ্বন্ধু বসাক কলার আঁশের সূত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এদেশে কলাগাছ যেরূপ প্রচুর তাহাতে এই আঁশ বাহির করিবার প্রক্রিয়া সফল হইলে দেশে একটা প্রভূত ধনাগমের উপায় হয়। এখন কলাগাছের কোন মূল্যই নাই, উহা ফেলা গিয়া থাকে। কলার মোটা আঁশ এবং সূক্ষ্ম আঁশ উভয়ই দেশের মধ্যে ত চলতি হইতে পারিবেই, তাছাড়া বিলাতে এই আঁশের অনেক কাটতি আছে।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।

শস্য পর্য্যায়।

এক জমীতে একই ফসল বৎসরানুক্রমে চাষ করিলে জমীর উর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমাগত একই ফসল উৎপাদন না করিয়া যদি বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন করা যায় তাহা হইলে জমীর তাদৃশ উর্ব্বরতা হ্রাস হয় না; তজ্জন্যই শস্যপর্য্যায় প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের দেশে শস্য পর্য্যায় প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু কি কারণে শস্যপর্য্যায় আবশ্যক, কৃষকদের তাহা মোটামুটি জ্ঞান থাকিলেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকায় তাহারা শস্য-পর্য্যায়ের উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের শরীর পুষ্টির জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আবশ্যক। জল, বায়ু ও মাটী হইতে এই সমস্ত পদার্থ আকর্ষণ করিয়া লইয়া বৃক্ষ আপনার শরীর পোষণ করে। সুতরাং এক জাতীয় উদ্ভিদ একই জমীতে ক্রমাগত রোপণ করিলে সেই জমী হইতে সেই জাতীয় বৃক্ষের প্রয়োজনীয় পদার্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই জন্য এক জমীতে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন করা আবশ্যক। বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ফসল জন্মে। সমস্ত ফসল গুলিকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—

(১) দাইল জাতীয় ফসল,—যেমন মুগ, কলাই, ছোলা, মটর, মুসুরী, খেসারী, অরহর প্রভৃতি। এই সমস্ত ফসল দাইলরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং উহাদের উৎপাদন প্রণালীও অনেকটা একরকম, সুতরাং ইহারা একজাতীয় ফসলের অন্তর্ভুক্ত।

(২) কন্দ বা মূলাজাতীয় ফসল,—অর্থাৎ সাধারণতঃ এই সমস্ত উদ্ভিদের কন্দ অথবা অন্তর্ভৌম কাণ্ড ব্যবহার করা যায়; যথা—হলুদ, আদা বীট, গাজর, শালগম, আলু, পেঁয়াজ, ওল, বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি। এই সমস্ত উদ্ভিদের মূল মাটির ভিতর কতকদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। অপরাপর ফসলঅপেক্ষা ইহাদের মূল সমধিক পরিপুষ্ট হয় বলিয়া ইহারা নিম্নস্তরস্থিত মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে। ইহাদের এই সকল সাধারণ গুণ থাকায় ইংরাজীতে ইহাদিগকে রুট্ ক্রপ্ (Root-

crop) বলিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ফসল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বেগুন, লঙ্কা, ঢেঁড়স্, ধুঁধুল, তুলা, মসিনা, পটল, বিলাতি বেগুন, কুমড়া প্রভৃতি কতকগুলি ফসলকে এই জাতীয় বলিয়া ধরা হয়। উহারা ঠিক এই জাতীয় না হইলেও অপরাপর ফসল অপেক্ষা এই শ্রেণীর ফসলের সহিত ইহাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তজ্জন্য ইহাদিগকে এই শ্রেণীর একটী স্বতন্ত্র বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা গেল।

(৩) ঘাস জাতীয় ফসল; ধান, গম, ভুট্টা, যব, আক, ভূরো, কোদো, কাউন, প্রভৃতি ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। ইহাদের চাষের প্রথা প্রায় একই প্রকার।

(৪) যে সমস্ত উদ্ভিদের পাতা ব্যবহৃত হয়। যথা পান, তুঁত নীল, আসপেরেগস, তামাক প্রভৃতি। এই সকল উদ্ভিদ কেবল পাতার জন্যই উৎপাদিত হইয়া থাকে।

ফসলসমূহ এই কয়েকটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত। কিন্তু এই বিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কন্দজাতীয় উদ্ভিদ্‌সমূহ লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। আমরা এক্ষণে সে সকল উল্লেখ না করিয়া এই কয়েকটী বিভাগই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব।

জাতিভেদে অভাব ভেদ।—সাধারণতঃ কন্দজাতীয় ফসলের জন্য অধিক পরিমাণে সার আবশ্যক। যে সকল ফসল অপেক্ষাকৃত ওজনে ভারি, তাহাদের জন্য অধিক পরিমাণে সার আবশ্যক হয় ইহা একটী সাধারণ নিয়ম। যেমন আলু; আয়তনের হিসাবে ধরিতে গেলে আলু অপরাপর ফসল অপেক্ষা ওজনে ভারি। তজ্জন্য আলুর চাষে সারও অধিক পরিমাণে আবশ্যক হয়।

ঘাসজাতীয় ফসল গুচ্ছমূল-বিশিষ্ট বলিয়া মৃত্তিকার উপরের স্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়। যে জমীতে বন্যার জল প্রবেশ করে, তাহাতে ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে বানের জল প্রবেশ করিলে জমীতে পলি পড়িয়া জমীর উপরিভাগে সার সঞ্চিত হয় এবং জমির উপরিভাগ হইতে ঐ সার গ্রহণ করিয়া ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ গুলি সমধিক বলশালী হইয়া উঠে। নদীর ধারে অথবা চরে ইক্ষু উত্তমরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন।

যে সমস্ত জমী বহুদিবস অনাবাদী পড়িয়া থাকে তাহাতে প্রথমতঃ দাইলজাতীয় উদ্ভিদ, যেমন অরহর, মুগ, কলাই প্রভৃতি, বপন করাই যুক্তিসিদ্ধ। পরে উক্ত জমীর মৃত্তিকা কিয়ৎ পরিমাণে ভাঙ্গিয়া গিয়া কোমল হইলে তাহাতে কন্দজজাতীয় ফসরোপণ করা উচিত। কারণ এই সকল ফসল জমীর নিম্ন স্তর হইতে পোষণোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করে এবং এই সমস্ত ফসল উৎপাদন করিলে জমী আরও নরম হইয়া যায়। যে সমস্ত জমি বহুকাল অনাবাদী পড়িয়া থাকে এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘাসে আবৃত থাকে, সেরূপ জমীর উপরিভাগে সারের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং সেই সমস্ত জমীতে দীর্ঘমূল বিশিষ্ট ফসল রোপণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। ফসলের ডাল পাতা প্রভৃতি অব্যবহার্য্য অংশ অন্যত্র ফেলিয়া না দিয়া জমীর উপরে রাখিয়া পচিতে দেওয়াই শ্রেয়। তাহাতেও জমি সমাধিক সার প্রাপ্ত হয়।

বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপাদন করিয়া জমীর উন্নতি-সাধন করা এবং জমীকে কিয়দ্দিবস বিশ্রাম দেওয়া শস্য পর্য্যায়ের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় প্রভৃত কয়েক মাসে আমাদের দেশে জমীতে কোনও ফসল থাকে না, কারণ ঐ সময়ে জমীর পাইট করা হয়। ইহা একটী সুনিয়ম। জমী বৎসরের সকল সময় চাষ না করিয়া কিছু দিনের জন্য ফেলিয়া রাখিলে পরবর্ত্তী ফসলের অনেকটা সুবিধা হয়। আমাদের দেশে শস্যপর্য্যায়ের কোনও সাধারণ প্রথা নাই। ধান্যক্ষেত্রগুলি বৎসরের কয়েক মাস অনাবাদী পড়িয়া থাকে এবং ধান্যের সময় আবার তাহাতে ধান্য রোপণ করা হয়। কোনও কোনও কৃষক ধান্যের চাষ শেষ হইয়া আসিলে, ঐ ক্ষেত্রে তিল, প্রভৃতি বুনিয়া থাকে এবং তিল, প্রভৃতির স্বতন্ত্র চাষও করিয়া থাকে। সচরাচর পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ এই কয় মাসে (লাউ, কুমড়া, করলা, উচ্ছে, প্রভৃতি) লতাখন্দ উৎপাদিত হয়। কিন্তু ধানচাষীরা এই সমস্ত ফসল উৎপাদন করে না। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ,

আষাঢ় এই কয় মাস জমী অনাবাদী অবস্থায় থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৈশাখ, হইতে হল চালনাদি করিয়া জমীর পাইট করা হয়, পরে ধান, পাট, কোদো, শ্যামা, চিনে, কাউন, ভূট্টা প্রভৃতি ফসল উৎপাদিত করে। বর্ষাকালে শসা, ঝিঙ্গে, ধুঁধুল, পুই প্রভৃতি জন্মে। এক জমীতে এই সকল ফসল প্রায়ই উৎপাদিত হয় না। সুতরাং ইহার পর্য্যায় কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ সকল জমীর পক্ষে সুবিধা জনক হয় এমন কোনও শস্যপর্য্যায়-প্রণালী নাই। যে জমীর যেরূপ উৎপাদিকা শক্তি এবং যে জমী যেরূপ ভাবে চাষ করিলে সুবিধা হয়, তাহা বুঝিয়া কোনও একটী পর্য্যায় প্রথা অবলম্বন করা উচিত। সচরাচর কন্দ জাতীয় উদ্ভিদের পর ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে।

ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েকটী শ্রেণী বিভাগ অনুসারে ফসল গুলির চাষ বিবৃত হইবে। এইরূপ প্রথা অবলম্বনের একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, প্রত্যেক ফসলের জমীর কথা প্রত্যেক বারে না বলিয়া একবার জাতি বিশেষের সম্বন্ধে বলিলেই যথেষ্ট হইবে। যদি কোনও ফসলের প্রকৃতির বিভেদ থাকে, তাহা যথা স্থানে বিবৃত হইবে। পাঠকের অবগতির জন্য বৎসরের কোন্ সময় কি কি ফসল উৎপাদিত হয়, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শস্য ও কাল।

বর্ষাকালীন ফসল—মাসকলাই, মুগ, বেগুন, লঙ্কা, রেড়ী, সিম, ঢেঁরস, ভুট্টা, পেঁপে, ওল, আনারস, কচু, কোদো, শ্যামা, চিনা, কাওন, মাড়ুয়া, বজরা, ধান ইত্যাদি।

শাকসবজীঃ—ঝিঙ্গে, ধুঁধুল, মূলা, হলুদ, আখ, আদা, পাট, তিল, কলাই।

শীতকালীন ফসল—বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, বিট, গাজর, শীতের মূলা, শালগম, কুল্‌তি, ছোলা, মটর, মুসুরী, খেঁসারী, সরিষা, কুসুমফুল, সরগুজা, আলু, পেঁয়াজ, গম, তামাক, তুলা, মসিনা, অরহর, যব, বিলাতি বেগুণ।

গ্রীষ্মকালীন ফসল—বিলাতী কুমড়া, লাউ, খেঁড়ো, শশা, করলা, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, চৈতে ধুঁধুল, পটল, ওল, পান, মার্কিন তুলা, নীল, চৈতালী, অরহর।

আমাদের দেশে যে সমস্ত প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদিত হয়, তৎসমস্তই উক্ত তালিকায় বিবৃত হইল; যে সমস্ত ফসল সাধারণতঃ আমাদের দেশে উৎপাদিত হয় না, অথবা অত্যন্ত অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে, তৎসমুদয় উহার অন্তর্ভুক্ত করা আমাদের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীহরিদাস মিত্র, বি, এল,
কাশীপুর কৃষিশালা।

উদ্ভিদ জাতির পরিণামদর্শিতা।

পিপীলিকার পরিণামদর্শিতার বিষয় অনেকে অবগত আছেন, মধুমক্ষিকাও পরিণামদর্শী বলিয়া বিখ্যাত। শীতকালে আহার সংগ্রহের অন্তরায় হইবে বলিয়া উহারা আপন আপন আবাস স্থানে গ্রীষ্মকালে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। উহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনুষ্যজাতিও সঞ্চয়ের কৌশল শিক্ষা করিতে পারে।

লোকে উদ্ভিদদিগকে জীবনীশক্তি এবং গতি-হীন বলিয়া জানে; কিন্তু গতি-শীলতা, জীবনী-শক্তি এবং পরিণাম দর্শিতার বিষয়ে তাহাদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিলে অনেক বুদ্ধিমান্ প্রাণীকেও অবনত মস্তক হইতে হয়।

উদ্ভিদ জাতির জীবনীশক্তি এবং পরিণাম-দর্শিতার একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, তাহারা কি রূপে ভবিষ্যতের নিমিত্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। যে সময় প্রচুর আহার্য্য পাওয়া যায়, সেই সময়ে উদ্ভিদ্ জাতি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য, আপন আপন শরীরের ভিতর সঞ্চয় করিয়া রাখে। উদ্ভিদের শরীরের এরূপ স্থানে ঐ সকল খাদ্য রক্ষিত হয় যে, ঐ খাদ্যের বিন্দু মাত্র নষ্ট হয় না।

পলাণ্ডু, মূলা, ওল, কচু, কলা, আলু, লাল আলু, শতমূলী, আরারুট, আদা প্রভৃতি উদ্ভি-দের বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের ভূগর্ভস্থিত মূল এবং কাণ্ডের মধ্যে তাহারা আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। কারণ

উৎপ্লথিত উদ্ভিদ্ গুলির মূল এবং কাণ্ড শীঘ্র নষ্ট হয় না। সাগু গাছ, ইক্ষু গাছ, কাণ্ডে (অর্থাৎ কাণ্ডের যে অংশ জমির উপর থাকে) এবং মুসব্বর ঘৃতকুমারি পাথরকুচি প্রভৃতি উদ্ভিদ্ পত্রের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। এই সকল বৃক্ষের প্রায় বীজ বা শস্য হয় না। অথবা এই সকল বৃক্ষে যে সকল বীজ জন্মে, তাহারা এরূপ নিস্তেজ হয় যে, তাহা হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে না। যদি ঐ সকল বৃক্ষের উৎপত্তি বীজের উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে তাহাদিগের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইত। কিন্তু পরিণামদর্শিতার বলে, তাহারা আপনাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। স্বাভাবিক বন্য অবস্থায় হউক অথবা গৃহপালিত অবস্থায় হউক, খণ্ডিত বা অখণ্ডিত শিকড়, মূল, ডাঁটা অথবা পত্র সাহায্যে এই সমস্ত গাছ বংশ বৃদ্ধি করে।

এই সকল বৃক্ষাংশ হইতে যে চারা জন্মে, তাহারা উক্ত বৃক্ষাংশের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। যখন চারাগুলি সম্পূর্ণ রূপে জমিতে বসিয়া যায় এবং আপনাদিগের খাদ্য আপনারাই আহরণ করিতে সমর্থ হয়, তখন যে সকল কন্দ বা মূল হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছিল, সে গুলি বিশীর্ণ হয়। কারণ, তাহাদিগের মধ্যে যে সকল সার পদার্থ ছিল, তাহা তখন নবোদ্গত উদ্ভিদ-শিশুর জীবন রক্ষায় ব্যয়িত হইয়া যায়।

যে সকল বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের বীজের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আহার্য্য পদার্থ সঞ্চিত থাকে। নারিকেল, কাঁটাল, হিজলি, বাদাম, আম্র, লিচু প্রভৃতি ফলের বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল বৃক্ষের ফলে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষের আহার্য্য সঞ্চিত থাকে। ধান, গম, যব, জোয়ারি, প্রভৃতি শস্যের ভিতরেও খাদ্য পদার্থের প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ বৃক্ষই বীজের দ্বারা বংশবিস্তার করে এবং যতদিন তাহাদিগের জীবন থাকে, ততদিন তাহারা বীজরূপ নিভৃত ভাণ্ডারে, ভাবী উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য, খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। মনুষ্যেরাই পুত্রাদি প্রতিপালনের জন্য পরিণামদর্শী হইয়া থাকে; কিন্তু যে পরিণামদর্শনের বলে উদ্ভিদেরা বীজ পরিপোষণে সমর্থ হয়, তাহার বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে, মনুষ্যের মানসিক শক্তির ঔজ্জ্বল্যও ম্লানমূর্ত্তি ধারণ করে। অনেকে জানেন যে, অণ্ডমধ্যবর্ত্তী কুসুমের চতুর্দ্দিকে যে অণ্ডলাল থাকে, তাহা কুসুমরূপী শাবকের পরিপোষণার্থ নিয়োজিত হয়। ফলের মধ্যবর্ত্তী শাঁস সেইরূপ বীজকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। বৃক্ষের সঞ্চিত ধন বীজের মধ্যে নিহিত হওয়ায়, সেই বীজ হইতে যে বৃক্ষ জন্মে তাহারা জীবন-সংগ্রামে স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

উদ্ভিদ জাতির পরিণাম-দর্শিতার আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিবর্ষে বৃক্ষের পুরাতন পত্র ঝরিলে নূতন পত্র উদ্গত হয়, ইহা সকলেই জানেন। পত্র সকল ঝরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই বৃক্ষেরা ধীরে ধীরে সেই সকল পত্রের ভিতর হইতে সমস্ত আহার্য্য পদার্থ টানিয়া লইয়া দেহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী অংশে রক্ষা করে। বৃক্ষ সকল পত্র সমূহ হইতে আহার্য্য টানিয়া লইতে আরম্ভ করিলে, পত্রগুলি পীতবর্ণ, ঈষৎ রক্তাভ অথবা ধূসর বর্ণ হইতে থাকে। পত্রের মধ্যে যে সবুজ পদার্থ থাকে তাহার দ্বারাই পত্র-সমূহ বায়ু হইতে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে। যদি সবুজবর্ণ পদার্থ থাকিতে থাকিতে পত্র পড়িয়া যায়, তবে তাহার সহিত তাহার সবুজ রঙ অনর্থক নষ্ট হইবে, এইজন্য বৃক্ষ সমূহ পাকা গৃহিণীর ন্যায় পত্রের ভিতর হইতে সবুজ রঙ টানিয়া লইয়া স্বীয় শরীরের স্থায়ী অংশে রক্ষা করে। বস্তুতঃ মনুষ্যদিগকেও বৃক্ষের নিকট হইতে পরিণামদর্শিতা শিক্ষা করিতে হয়।

পরিণামদর্শিতার দৃষ্টান্ত এখানেই শেষ হইল না। যে বৃক্ষ যেরূপ অবস্থায় থাকে, সে সেইরূপে আত্মরক্ষা করে। প্রয়োজনমতে বীজের অল্পতা বা বহুলতা জন্মে। প্রকৃতির ধ্বংসকারিণী শক্তি সহ্য করিবার জন্য বীজগুলি কঠিন আবরণে পরিবেষ্টিত হয়, অথবা এরূপ ভাবে গঠিত হয় যে, তাহাতে বীজের কোন অনিষ্ট হয় না। নারিকেলের গঠন প্রণালী সকলেই দেখিয়াছেন। উহার বীজ অতি দৃঢ় আবরণে আবৃত। নারিকেল সমুদ্রের ধারেই অধিক জন্মে, সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত হইতে তাহার বীজ রক্ষা করা প্রয়োজন; সুতরাং নারিকেল বীজ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র বসু।

আকন্দ।

আকন্দ এদেশে বন্য গাছ, যথা তথা জন্মে; কেহ ইহার চাষ করে না, কেহ ইহাকে যত্ন করে না, কিন্তু এটি একটি অমূল্য পদার্থ। আমরা জানিনা বলিয়া ইহার আদর নাই। যদি আমেরিকা বা অন্য কোন স্থানে এই গাছের উৎপত্তি হইত, তবে ঐ দেশের অধিবাসিগণ ইহাকে নানাপ্রকারে ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন।

আকন্দের সংস্কৃত নাম শ্বেতার্ক, গণরূপ, মন্দার, বসুক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প, অলর্ক এবং প্রতাপস *। ইহাকে হিন্দুস্থানে মাদার বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম (Calotropis Gigantia.)

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই গুল্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, চীনদেশের দক্ষিণাঞ্চলে, পারস্য এবং আফ্রিকা দেশেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। আকন্দের ন্যায় এরূপ কঠিন প্রাণ গুল্ম আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সে জমিতে যে সে সময়ে ইহা উৎপন্ন হয়, কঙ্কর অথবা প্রস্তরপূর্ণ স্থানেই হউক, পাহাড়ের উপরেই হউক, আর সমতলক্ষেত্রেই হউক, সর্ব্বত্রই আকন্দের চাষ চলিতে পারে। এদেশের রাস্তার ধারে, খানার ভিতরে, ধান জমিতে, প্রাচীরের উপরে, ভাঙ্গা ইমারতের ভিতে, যেখানে শিকড় চালাইতে পারে, সেখানে ইহা জন্মিয়া থাকে এবং অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ডাল পুতিয়া, বীজ ফেলিয়া, শিকড় পুতিয়া ইহা উৎপন্ন করিতে পারা যায়, একবার জন্মিতে পারিলে আর এ গাছের বিনাশ নাই। সুতরাং একবার চাষ করিতে পারিলে আর কখনও চাষের জন্য স্বতন্ত্র খরচ করিতে হয় না।

আকন্দের বহু প্রশংসা কবিরাজী শাস্ত্রে দেখা যায়, অনেক রোগে ইহার ব্যবহার হয় †। ইহার রস তিক্ত লবণ; বিপাক—কটু; বীর্য্য-গুণ—কফঘ্ন; বাত, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ব্রণনাশক; প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ ও ক্রিমি বিনাশক। ইহা অর্শ নিবারক এবং সারক। আকন্দ পুষ্প লঘুদীপক, পাচক, অরুচি, মুখস্রাব, কাশ ও শ্বাস নাশক, অর্শঘ্ন এবং বৃষ্য। আকন্দদুগ্ধ তিক্ত, লবণাস্বাদবিশিষ্ট, লঘু, স্নিগ্ধোষ্ণ, কুষ্ঠনষ্টকারী (ইহার প্রলেপ দিলে উৎকট চর্ম্মরোগ নষ্ট হয়), গুল্ম ও উদর অর্থাৎ যকৃৎ প্লীহা বাতোদর জলোদর প্রভৃতি পীড়া নাশক এবং প্রভাব বশতঃ ইহা একটী শ্রেষ্ঠ বিরেচক।

* শ্বেতার্কোগণরূপঃ স্যান্ মন্দারো বসুকোঽপি চ।
শ্বেতপুষ্পঃ সদাপুষ্পঃ স চালর্কঃ প্রতাপসঃ।

† অর্কদ্বয়ং সরং বাত কুষ্ঠ-কণ্ডু বিষব্রণান্।
নিহন্তি প্লীহ গুল্মার্শঃ শ্লেষ্মোদর যকৃৎ ক্রিমীন্।
অলর্ক কুসুমং বৃষ্যং লঘুদীপনপাচনম্।
অরোচক প্রসেকার্শঃ কাশশ্বাসনিবারণম্।
ক্ষীরমর্কস্য তিক্তোষ্ণং স্নিগ্ধং সলবণং লঘু।
কুষ্ঠগুল্মোদরহরং শ্রেষ্ঠমেতদ্ বিরেচনম।

ছাল।

আকন্দগাছের সকল অংশেরই কোন না কোন রোগোপশমকারী গুণ আছে। ইহার ছাল বিশেষতঃ মূলের ছাল পরিবর্ত্তক, বলকারক, ঘর্ম্মকারক, আমরস পাচক ও জ্বরঘ্ন—অনেকাংশে ইহা বিলাতী ঔষধ ইপিকাকুয়ানার তুল্য। এই নিমিত্ত অনেকে ইহাকে ভারতবর্ষীয় ইপিকাকুয়ানা নামে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ আকন্দের শিকড়ের ছাল চূর্ণ অধিক পরিমাণে খাইলে তৎক্ষণাৎ বমন আরম্ভ হয়, কিন্তু অল্পমাত্রায় সেবনে বমন নিবৃত্ত হইয়া যায়। একটী পরীক্ষিত বমন নিবারক যোগের বিষয় লিখিত হইতেছে :—

আকন্দমূলের সূক্ষ্ম চূর্ণ, রসসিন্দূর ও কড়ি ভস্ম প্রত্যেক সমান পরিমাণে লইয়া স্তনদুগ্ধে মাড়িয়া ছোলার ন্যায় বড়ী করিতে হয়। ঐ বড়ী অবস্থা বিশেষে আলতার জল, চাল ধোয়ান জল, মউরীর জল, ডাবের জল প্রভৃতি অনুপানের সহিত সেবন করিলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বমন বন্ধ হয়।

এতদ্ব্যতীত ইহার অনেক রোগআরোগ্যকারী শক্তি আছে। তাহার মধ্যে কয়েকটী দেওয়া গেল। ছাল, ডাঁটা, পাতা ও ফুলের সহিত সমস্ত আকন্দ গাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইয়া তাহা গরুর চোনায় সিদ্ধ করিবে। উহার "ভাপরা" লইলে বাত বা পুরাতন পারার দোষ অচিরে সারিয়া যায়।

পাকা আকন্দ পাতায় ঘৃত মাখাইয়া আগুনে উত্তপ্ত করিয়া তাহার রস গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা কর্ণ বিবরে প্রবেশ করাইলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। অথবা আকন্দ পাতায় মনসা (সিজ) পাতা বাঁধিয়া এক সঙ্গে অগ্নিতে আধপোড়া করিয়া উহার রস কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

আকন্দ পত্র সৈন্ধব লবণের সহিত মুখ বাঁধা হাঁড়ীর মধ্যে প্রচণ্ড আগুনে পোড়াইলে, ঐ লবণ অম্লপিত্ত শূল,, ও বিশেষতঃ যকৃৎ রোগে প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার হয়।

বুকে কফ বসিয়া গেলে আকন্দ পত্রে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া তাহার গরম স্বেদ বা সেক দিলে শ্লেষ্মা সরল হইয়া উঠিয়া যায়।

একশিরা বা কোষবৃদ্ধি রোগে আকন্দ পত্র কোষের চারিদিকে বাঁধিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত রাত্রিতে শয়ন করিলে ফল পাওয়া যায়।

বাতরোগে গ্রন্থিস্ফীত হইলেও ঐরূপ বাঁধিলে বিশেষ উপকার হয়। বাতের আর একটী উৎকৃষ্ট স্বেদ আছে—আকন্দের পাতা, আদা ও সৈন্ধব লবণ সমানাংশে শিলে পিষিয়া কাপড়ের পুঁটুলীর মধ্যে গরম করিয়া ব্যথাস্থানে সেক দিবে। ইহাতে অত্যন্ত বাতের ব্যথারও অনেক নিবৃত্তি হইতে পারে।

আঠা।

আঠার বিলক্ষণ রেচকগুণ আছে। এই আঠা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, যে স্থানে লাগে সেই স্থানে ঘা হয়। এই জন্য অন্য ঔষধের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়।

ধবল রোগে হরিতাল চূর্ণ আকন্দ আঠায় মাড়িয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

গোময় ভস্ম (ঘুঁটের ছাই) আকন্দ আঠায় উত্তম রূপে মিশাইয়া অর্থাৎ উহাতে ভিজাইয়া তাহা রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া শিশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। উহার নস্য লইলে আবদ্ধ ক্রূর শ্লেষ্মা নাসিকা মধ্য হইতে বাহির হইয়া যায়।

চারি ফোঁটা আকন্দের আঠা ও দশ ফোঁটা কাঁচা পেপের আঠা এক ঝিনুক গরুর চোনার সঙ্গে খাওয়াইলে কৃচ্ছ্র সাধ্য যকৃৎ রোগও ভাল হয়। শিশুকে অর্দ্ধ মাত্রায় দিতে হয়।

আকন্দের আঠায় সাজিমাটী ও চুণ মাড়িয়া ফোড়ার মুখে দিলে ফোড়ায় অস্ত্র করিতে হয় না, উহা অতি অল্প সময়েই ফাটিয়া যায়।

উমেনদিয়াম নামে জনৈক মান্দ্রাজী ডাক্তার বলিয়াছেন যে "আকন্দ পত্রের উপর যে শাদা শাদা গুঁড়া থাকে, উহার সহিত আকন্দের আঠা মাখাইয়া ছোট সুপারির মত বড়ী প্রস্তুত করত সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইবে—বড়ী খাওয়াইবার পর যদি বমি হয়, তবে রোগীর আরোগ্যের আশা আছে। একটু সবল হইলে রোগীকে লঘু অথচ পুষ্টিকর পথ্য দিয়া জোলাপ দিবে।" ঔষধটীর পরীক্ষা হওয়া উচিত। অনেক সাহেব ডাক্তার ইহার আঠার সর্প বিষ নাশক ক্ষমতার কথা স্বীকার করিয়াছেন।

কোন স্থানে মচ্‌কাইয়া গেলে আকন্দের আঠা ঐ স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। এতদ্ব্যতীত সমানাংশ মধুসহ এই আঠা লাগাইলে ঘা এবং এই আঠা মালিশ করিলে বাঁতের ফোলা ও দদ্রুরোগ আরোগ্য হয়।

আকন্দ ক্ষীর দুগ্ধে দিলে উহা অতি অল্প সময়েই দধি হইয়া যায়। এক সের গব্য দুগ্ধে একভরি আকন্দের আঠা মিশাইয়া দধি প্রস্তুত করিবে। ঐ দধি মন্থন করিয়া সেই ঘোল প্রত্যহ খাইলে অর্শ ও গ্রহণী রোগ উপশমিত হয়।

আকন্দ দুগ্ধে আফিং গুলিয়া অর্শের বলিতে দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া যায়।

ধাতু জারণ করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আকন্দ দুগ্ধের ব্যবহার আছে। প্রায় সকল প্রকার ধাতুই ইহার সাহায্যে জারিত হইয়া থাকে। কিন্তু কবিরাজেরা ভিন্ন ভিন্ন ধাতু জারিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রথা অবলম্বন করেন। এদেশের সন্ন্যাসীরা আকন্দ দুগ্ধের সহিত হরিতাল মাড়িয়া শিলাপিষ্ট পানের বোঁটায় আবরণ দিয়া ঘুঁটের আগুনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হরিতাল ভস্ম করিতে পারেন।

ফুল।

হিষ্টিরিয়া ও মৃগীরোগে ইহার টাট্‌কা ফুল অতি উৎকৃষ্ট ও সুলভ ঔষধ; যে পরিমাণে ফুল, সেই পরিমাণে গোল মরিচ একত্র মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। শুষ্ক ফুলের মাত্রা ৩ রতি কাঁচার মাত্রা ৬ রতি।

আকন্দফুল শ্বাস ও কাসরোগের অতি সুন্দর ঔষধ। ইহা আক্ষেপনিবারক ও কফনিঃসারক। শুঁট, পিপুল ও গোল মরিচ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান আকন্দের কাঁচা ফুল চূর্ণ মধুসহ মাড়িয়া ৵০ আনা মাত্রায় বড়ী করিয়া রাখিবে। এই বড়ী কাস রোগের অতি সহজ অথচ সুলভ ঔষধ।

দুবেলা দুইটী বড়ী মধুসহ সেব্য। ইহা মুখে করিয়া চুষিলে কাসের বেগ শান্ত হয়।

আকন্দের ফুলচূর্ণ বা মূলের ছালচূর্ণ থুলকুড়ীর রসের সহিত মাড়িয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ এবং অন্যান্য দুঃসাধ্য চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়।

এতদ্ব্যতীত

কবিরাজী শাস্ত্রোক্ত জ্বরাধিকারে পঞ্চানন রস, বিদ্যাধর রস, সন্নিপাত ভৈরব, বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব প্রভৃতি ঔষধে আকন্দের রস ব্যবহৃত হয়। প্লীহারোগের অভয়ালবণ, শঙ্খদ্রাবক; গ্রহণী অধিকারে অজাজ্যাদি চূর্ণ নামক ঔষধে, শ্লীপদ রোগের বিড়ঙ্গাদি তৈলে, শিরোরোগে রুদ্র তৈলে এবং ধ্বজভঙ্গরোগে মদনানন্দ মোদকে আকন্দের প্রয়োগ আছে। এতদ্ব্যতীত কুষ্ঠরোগে মরিচাদি ও কন্দর্পসার প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রধান তৈলের মধ্যেই আকন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জাতিভেদ।

দুই জাতীয় আকন্দ গাছ এদেশে দেখা যায়। শ্বেত ও রক্ত। উভয় জাতীয় আকন্দের গুণ প্রায় এক প্রকার। তবে রক্তার্কের গুন অপেক্ষাকৃত হীন বলিয়া কোন কোন কবিরাজ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহারা যে প্রমাণটীর উপর নির্ভর করিয়া বিচার করেন তাহা পুষ্প সম্বন্ধেই বিশেষত্ব বলিয়া বোধ হয়। *

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে ইহার গুণাধিক্য ও গুণান্তর এই পক্ষে আছে যে রক্তার্ক শ্বেত আকন্দের ন্যায় সারক নহে, পক্ষান্তরে ধারক এবং রক্ত পিত্তনাশ করা ইহার বিশেষ গুণ। কাস রোগের সহিত রক্তপিত্ত থাকিলে রক্তার্ক পুষ্পের রসে বিশেষ উপকার হয়। যাহা হউক উভয় প্রকার আকন্দের গুণের তারতম্য সম্বন্ধে মীমাংসার ভার কবিরাজ মহাশয়দিগের উপর রহিল।

অনেক সাহেব ডাক্তারও ইহার পরীক্ষায় অনেক ফল পাইয়াছেন। ইহার গুঁড়া সকল প্রকার চর্ম্মরোগেরই মহৌষধ।

তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আকন্দের আঠা (আকন্দদুগ্ধ), টাটকা পাতা অথবা মূল হইতে বাহির করিয়া লইয়া লবণ সহযোগে দন্তশূলরোগে এবং ইহার কুঁড়ি (Buds) কর্ণশূল রোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার পাতা গরম করিয়া তাহাতে পুলটিস দিলে কোন স্থানের অসহ্য ব্যথা সদ্য সদ্য সারিয়া যায়। ইহার পাতা শুকাইয়া লইয়া তাহার ভস্মে দুরারোগ্য ক্ষত আরোগ্য হয়।

খোস বা পাঁচড়া রোগে আকন্দের আঠায় ছিন্ন বস্ত্র ভিজাইয়া তাহার ভস্ম প্রয়োগ করিয়া অতি শীঘ্র উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। এক খানি ছিন্ন বস্ত্র আকন্দের আঠায় ভিজাইয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইবে। এইরূপ সাত বার ভিজাইয়া সাত বার শুকাইতে হয়। পরে উহা ভস্ম করিয়া খোস উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ধুইবার পর তাহাতে সেই ভস্ম প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র খোস শুকাইয়া যায়।

ঔষধে ব্যবহার ছাড়া আকন্দ অন্যান্য অনেক কাজে লাগে। ভারতবর্ষের মধ্যে কোন কোন স্থানের বন্য জাতি আকন্দ গাছ হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করে।

ইহার গোড়া পোড়াইয়া অতি উৎকৃষ্ট হালকা কয়লা প্রস্তুত হয়। তাহা বারুদ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়। আকন্দ কাষ্ঠের ছাইয়ে রঙের একটি উৎকৃষ্ট অস্তর হয়।

আকন্দের আঠায় একপ্রকার "গটাপার্চা" প্রস্তুত হয়। তাহা দেখিতে ঠিক বড় মাছের চামড়ার ন্যায়। তাহার দ্বারা চিরুণী ও নানাপ্রকার খেলেনা প্রস্তুত হয়। ডাক্তার রিডল এই আঠা স্তরে স্তরে বসাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া এই প্রকার গটাপার্চা প্রস্তুত করিয়াছেন। চামারেরা নূতন চামড়ার লোম উঠাইয়া উহার দুর্গন্ধ নষ্ট করিতে ও উহাকে পীতবর্ণ করিতে আকন্দ দুগ্ধ ব্যবহার করে।

তুলা।

আকন্দের ফল হইতে তুলা পাওয়া যায়। ঐ তুলা রেশমের ন্যায় সুচিক্কণ ও কোমল। তবে

---

* রক্তার্কের পুষ্প মধুর, তিক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, অর্শঃ ও বিষনাশক; রক্ত পিত্তঘ্ন, সংকোচক গুল্ম ও শোথ রোগে উপকারী।

রক্তার্কপুষ্পং মধুরং সতিক্তং
কুষ্ঠকৃমিঘ্নং কফনাশনঞ্চ।
অর্শোবিষং হন্তি চ রক্তপিত্তং
সংগ্রাহি গুল্মে শ্বয়থৌ হিতং তৎ।

আঁশ গুলা কিছু ছোট। এই তুলা কফবাতনাশক, স্নিগ্ধকারী ও সুখস্পর্শ। তজ্জন্য এদেশে লোকে শিশু ও জ্বররোগীকে আকন্দ তুলার বালিস প্রস্তুত করিয়া দেয়।

বোর্ণিও দ্বীপে এই তুলায় সূতা প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ অঞ্চলেও লোকে এই তুলার সূতা প্রস্তুত করে। লণ্ডন নগরে এই তুলার সূতার দ্বারা পাতলা ফ্লানেলের স্থায় এক প্রকার চমৎকার সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বেশ আরামের সহিত ব্যবহার করা যায়। পঞ্জাব প্রদেশের সাহপুর জেলে আকন্দ তুলায় যে সুন্দর গালিচা নির্ম্মিত হয়, তাহা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মেন্দর হালিঙস্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছিল। অনেক সুবিজ্ঞ ইউরোপীয় কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চাষের পারিপাট্য করিলে, আকন্দ তুলার উৎকর্ষ সাধন করা যায়, আর উহা হইতে লম্বা আঁশ পাওয়া যাইতে পারে। যত্নের সহিত এই তুলার উন্নতি করিতে পারিলে, ইহা রেসমের স্থান অধিকার করিতে পারে এবং তখন ইহা একটী লাভজনক বাণিজ্যবস্তু হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত এই তুলায় এক প্রকার মসৃণ উজ্জ্বল কাগজ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কিন্তু আকন্দ গাছের রীতিমত চাষ না থাকায় নানাস্থান হইতে তুলাসংগ্রহ করিয়া কাগজ প্রস্তুত করা পোষায় না।

আঁশ ছোট বলিয়া এক সময়ে লোকে বিবেচনা করিত যে ইহার তুলায় বয়ন কার্য্যোপযোগী সূত্র প্রস্তুত হয় না। কিন্তু এক্ষণে সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। ইহা হইতে সুন্দর বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারা যায় ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। যবদ্বীপের অধিবাসীরা ইহার রীতিমত ব্যবসায় চালাইয়াছিল, কিন্তু ব্যবসায়ী ও শিল্পীদিগের অমনোযোগিতা বশতঃ পূর্ব্বে যেরূপ দ্রব্য প্রস্তুত হইত, ও যেরূপ যত্নপূর্ব্বক চালান দেওয়া হইত, তাহার ত্রুটী হওয়ায় ইহার ব্যবসায় তথা হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

আঁশ।

ছালের আঁশ অত্যন্ত শক্ত, ইউরোপজাত শোণ বা কোষ্ঠার সহিত অনেকটা মিলে। পাকাইলে অতি উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুত হয়। ইহার আঁশ অত্যন্ত শক্ত বলিয়া এদেশের অনেক পল্লীগ্রামে আঁশের সূতা প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা লোকে মৎস্য ধরিয়া থাকে। পল্লীবাসীরা আকন্দ গাছ হইতে ছাল তুলিবার জন্য নিম্ন লিখিত উপায়টী অবলম্বন করে। গাছ গুলিকে কাটিয়া একদিন বা দুই দিন ফেলিয়া রাখে। পরে সে গুলিকে জলে এক দিন ব দুই দিন ভিজাইয়া তাহার আঁশ বাহির করে। আঁশগুলি অতি সুচিক্কণ দেখিতে ঠিক রেশমের মত ধপ্ ধপে শাদা। সুতরাং তাহার দ্বারা বস্ত্রবয়ন কার্য্য অথবা কাপড় সেলাইয়ের কার্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। একবার বিলাতে নানাপ্রকার আঁশ লইয়া পরীক্ষা করা হয় যে, কোনটা কিরূপ শক্ত। তাহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, আকন্দের আঁশই সর্ব্বাপেক্ষা টানসহ। এক ইঞ্চির আট ভাগের একভাগ পরিমিত তিন পাক দড়ি (Three strand one-eighth inch cord) ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায়, যে আকন্দের আঁশে প্রস্তুত দড়ী ৫৫২ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৭ মণ ওজনের জিনিষের ভার সহিতে পারে।

লণ্ডননগরে অত্যন্ত অধিক মূল্যে আকন্দের আঁশ বিক্রয় হয়। কিন্তু এই জিনিষ বড়ই অল্প পরিমাণে জন্মে এবং সকল সময়ে পাওয়ার ঠিক নাই বলিয়া ইহার উন্নতি হয় না। পাট প্রভৃতির স্থায় ইহার আমদানির স্থিরতা থাকিলে শীঘ্রই ইহার উন্নতি হইতে পারে। বলা বাহুল্য, ইহার চাষ রীতিমত হওয়া উচিত। এরূপ ভাবে চাষ করা চাই যে, বৎসরে সহস্র সহস্র মণ আঁশ পাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলেই বাজারে একেবারে ইহার অধিক কাটতি হয়। প্রয়োজনের সময় যদি উৎকৃষ্ট পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে বাজারে তাহার কাটতি হইবে না কেন? লণ্ডন নগরে একজন বড় হিসাবী বলিয়াছেন, এক টন অর্থাৎ প্রায় ২৭৷৷০ মণ আকন্দের আঁশ ৩৮ হইতে ৪০ পাউণ্ড অর্থাৎ অনধিক ৬০০ শত টাকা মূল্যে কাপড়ের কলওয়ালারা আনন্দসহকারে ক্রয় করিতে পারে।

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের কৃষি বিভাগের সেক্রটারি লিখিয়াছিলেন, বয়ন কার্য্যোপযোগী আঁশের কার্য্যের উন্নতি করিবার জন্য তিনি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছেন। সে সময় আঁশ বাহির করিবার কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় শীঘ্র শীঘ্র আঁশ বাহির হইত না, হস্তের সাহায্যে অনেক কষ্টে আঁশকে বৃক্ষচ্যুত করিতে হইত। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই, ইউরোপ এবং

আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় অনেক প্রকার আঁশ ছাড়াইবার কলের আবিষ্কার হইয়াছে। এখন এমন আঁশ যুক্ত বৃক্ষের গুঁড়ি, পত্র অথবা শিকড় নাই যন্ত্র সাহায্যে যাহার আঁশ ছাড়ান যায় না। মাঞ্চেষ্টর নগরস্থ জনৈক বণিকের নিকট আকন্দের আঁশ ছাড়াইবার যন্ত্র পাওয়া যায়। পাট অথবা শোণ গাছ হইতে যে উপায়ে আঁশছাড়ান যায়, আকন্দ গাছের আঁশও এই যন্ত্রের সাহায্যে সেইরূপে বাহির হয়। লণ্ডন নগরের টমাস বারাক্লফের যন্ত্রও (Thomas Barracloug'hs Machines) সকল প্রকার গাছের আঁশ বাহির করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত সাউর (Saure) এবং অন্যান্য আঁশ বাহির করিবার যন্ত্রদ্বারা ভালরূপে রিয়ার বা তদ্রূপ গাছের আঁশ বাহির করিতে পারা যায়। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিনে আকন্দ গাছের আঁশ বাহির করিতে পারিলে যে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মালয় দ্বীপপুঞ্জে আকন্দের আঁশ ও তুলা হইতে ব্যবসায়োপযোগী নানা পদার্থ প্রস্তুত হয়।

আকন্দের আঁশ অত্যন্ত হালকা। এক একার বা তিন বিঘা জমিতে ৭.৮মণের অধিক আঁশ পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে এই গুল্ম জন্মিতে পারে, এরূপ ভাবে ইহার চাষ না করিলে খরচা পোষায় না।

এদেশে একটা কিছু নূতন জিনিসের কথা উঠিলেই দিন কতক মহা হৈ চৈ পড়িয়া যায়, সেই সম্বন্ধে নূতন গবেষণা, বক্তৃতা প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা হয়, তারপর কার্য্যকালে আর কিছুই থাকে না। অধুনা রিয়ার আঁশ বাহির করিবার কথা লইয়া চারিদিকে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। রিয়ার আঁশ অত্যন্ত মূল্যবান্, ইহার আঁশ যন্ত্রের সাহায্যে বাহির করিতে পারিলে বিশেষ লাভ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; আর যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করায় রিয়ার আঁশ ভালরূপেই বাহির হইয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়, চাষ করিলে রিয়া কি পরিমাণে জন্মিতে পারে, তাহার ঠিক নাই, এবং কেবল এই এক মাত্র অন্তরায় থাকায় রিয়া ব্যবসায়োপযোগী হইতে পারিল না। শুনিতে পাই রিয়ার আঁশে প্রস্তুত হইতে পারে না, এমন কোন বয়ন শিল্প নাই এবং "রিয়া-প্রিয়েরা যখনই ইহার কথা উত্থাপন করেন তখনই ইহার গুণের প্রশংসা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়। কিন্তু আকন্দ গাছের কৃষি অনায়াসেই হইতে পারে, ইহা প্রচুর পরিমাণে যেখানে সেখানে জন্মিয়া থাকে, ইহার কৃষিতে ব্যয়ও অধিক নহে। অথচ ইহাকে লোকে অবজ্ঞা করে, জানিনা ইহা আকন্দের দগ্ধ ভাগ্যের গুণ, কি এদেশের লোকের অসাধারণ গুণগ্রাহিতার ফল। আকন্দের এমন কোন অংশ নাই, যাহাতে কোন না কোন কার্য্য সম্পাদিত না হয়। কি ঔষধে, কি শিল্প কার্য্যে সকল বিষয়েই আকন্দের উপকারিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিলেই ইহা হইতেই বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারা যায়। এরূপ একটী অতি প্রয়োজনীয় বিশেষ উপকারী বস্তুর আদর এদেশে নাই, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা কি হইতে পারে? কবি অনেক দুঃখেই বলিয়াছেন :—

"কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পদতলে,
কত কাচ শিরের বিভূষণ রে!"

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

সোহাগা।

সোহাগা শিল্পিগণের এক প্রধান শিল্পোপকরণ। নানাবিধ কার্য্যে সোহাগার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সোহাগা অস্মদ্দেশীয় স্বর্ণকারগণের এক বিশেষ পরিচিত বন্ধু। রূপ-গরিমা-বিস্তার-প্রয়াসিনী, কনক-ভূষণ-ধারিণী রমণী দৈহিক সুষমা-বৃদ্ধির জন্য সোহাগার নিকট অনেকাংশে ঋণী। 'সহজে দুর্ব্বল তুমি সোহাগায় গল,' বড় মুখ করিয়াই লৌহ স্বর্ণের এ অখ্যাতি করিয়াছিল। ধনবান্ যেরূপ চাটুকারগণের সোহাগপূর্ণ বচনে ঢল ঢল গলিয়া যান, ধাতুশ্রেষ্ঠ স্বর্ণও সোহাগা-সংমিশ্রণে সেইরূপ শীঘ্র গলিয়া থাকে। সোহাগার ইংরাজী নাম 'বোরাক্স' ও 'টিন্‌কাল্'। 'টিনকাল' নামটি বোধ হয় সংস্কৃত 'তঙ্কন' শব্দের অপভ্রংশ; এবং 'বোরাক্স' নামটী আরবী 'বুরাক' হইতে গৃহীত। 'বুরাক' শব্দ চাকচিক্য-বিধায়ক ও স্ফীত-কারক পদার্থ বাচ্য। 'বুরাক-এস্-সাগ্‌হা' সোহাগার আরবী নামান্তর। ইহার অর্থ রৌপ্যের চিক্কণতা প্রদায়ক পদার্থ বিশেষ। বঙ্গবাসীর নিকট 'সোহাগা', তিব্বতবাসিগণের

নিকট 'চুসাল, চৈনিকগণের নিকট 'পাংসা' বা 'ইউসিপ' নামে অভিহিত। অনেকে অনুমান করেন যে, দক্ষিণ ভারত হইতে "টিন্‌কাল" সংজ্ঞা-সহ সোহাগা প্রথমে য়ুরোপে প্রেরিত হইয়াছিল।

সোহাগা বা 'বোরাক্স' সোডাক্ষারসম্ভূত বোরিকাম্লজাত লবণ। ইহার রাসায়নিক উপাদান $Na_2B_4O_7 10H_2O$; অর্থাৎ দশ যৌগিকাণু জলযুক্ত সোডাক্ষার, বোরণ ও অম্লজান মিলিত যৌগিক লবণ।

স্বাভাবিক ও কৃত্রিম ভেদে সোহাগা দুই প্রকার। স্বভাব জাত সোহাগা, সাধারণ লবণ ও মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত অবস্থায়, পঞ্জাবের কোন কোন হ্রদোপকূলে, তিব্বত সন্নিহিত ভারতপ্রান্তে, তিব্বত, তাতার, পারস্য, সিংহল ও সুদূর আমেরিকার মধ্যে কলিফর্ণিয়া ও পিরুতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিব্বতের স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সোহাগা উৎপন্ন হয়।

কার্টিয়ার ও পেইন কৃত্রিম সোহাগার আবিষ্কর্তা। কৃত্রিম সোহাগা বোরাসিকাম্ল হইতে সোডাক্ষার সংযোগে উৎপন্ন হয়। ইটালীর অন্তর্গত মণ্টি-সার্কোলির নিকটবর্তী কতিপয় ক্ষুদ্র অগভীর হ্রদ হইতে বোরাসিকাম্ল উৎপন্ন হয় এবং তথা হইতে কৃত্রিম সোহাগা প্রস্তুত হইয়া দেশ বিদেশে প্রেরিত হয়। উক্ত টস্কানি প্রদেশের স্থলে স্থলে মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া বোরাসিকাম্ল মিশ্রিত জলীয় বাষ্প স্বতঃই উদ্গত হয়। এই বিদীর্ণ স্থান সকলের তৎ-প্রাদেশিক নাম "সফিয়নি" বা "ফিউমরিলো"। 'সফিয়নি' হইতে যে বাষ্পোদ্গম হয়, তাহা শীতল বায়ুসংস্পর্শে তরলাকার ধারণ করিলে, সেই জলীয়াংশ এক প্রকার বৃহদায়তন আধারে রক্ষিত হয়। এই জলীয়াংশের প্রায় শতকরা দুই ভাগ বোরাসিকাম্ল। বৃহদাকার কটাহে অগ্নুত্তাপে জলীয়াংশ দুরীভূত করিয়া লইতে হয়। ঐ সকল প্রদেশে জ্বালানি কাষ্ঠের অপ্রতুলতা বশতঃ জলপূর্ণ কটাহ সকল অপর 'সফিয়নির' উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। তদুৎপন্ন বাষ্পতাপে কটাহস্থ জল কিয়ৎ পরি-মাণে বাষ্পীভূত হইয়া যাইলে অপেক্ষাকৃত সারবান্ দ্রব অবশিষ্ট থাকে। তৎপরে নিয়মিত প্রক্রিয়া দ্বারা দানা বাঁধাইতে হয়। দানা বাঁধিলে তাহার সহিত সোডাক্ষার (Sodium Carbonate) দ্রব সম্মিলিত করিলেই কৃত্রিম সোহাগা প্রস্তুত হয়। ফ্রান্সে এই প্রক্রিয়া দ্বারা সোহাগা উৎপাদিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড ইটালীর শুষ্ক বোরাসিকাম্ল সোডা-ভস্মের (Soda Ash) সহিত মিশ্রিত করিয়া 'শিখাময় চুল্লী' (Reverberatory Furnace) দ্বারা অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয়। উপরিউক্ত চুল্লীর বিশেষত্ব এই যে, উহা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, অগ্নিশিখা সকল অনবরত দ্রব্যাদিতে সংশ্লিষ্ট হইয়া গুরুতাপ প্রদান করে। এই প্রক্রিয়ার সুবিধা এই যে, সোহাগা সহ এমোনিয়া নামক বাষ্প উক্ত চুল্লী হইতে উদ্গত হইয়া থাকে এবং উহাও রক্ষিত হইয়া বাণিজ্যের বিষয়ীভূত হয়।

১৮৫৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বোরাসিকাম্লের এক চেটিয়া বাণিজ্য কাউণ্টলার্ডারেলের করতলগত ছিল। তজ্জন্য বিদেশীয় সোহাগা-ব্যবসায়িগণকে সময় সময় অনেক ক্ষতি ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইত বলিয়া ইংরাজ বণিক্‌গণ ভারতীয় স্বাভাবিক সোহাগা গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ভারতের সহিত সোহাগা-বাণিজ্যে পরিলিপ্ত হন। তৎকালে ভার-তীয় সোহাগা যে একেবারে ইংলণ্ডে যাইত না, তাহা নহে; অতি অল্প পরিমাণেই গৃহীত হইত এবং বড় একটা কেহ আদর করিত না। লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে ইংরাজ বণিকগণ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভারতের সহিত সোহাগা ব্যবসায়ে প্রয়াসী হইয়া আপনাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তখন ইটালী হইতে ১১০০ টন বোরিকাম্ল এবং ভারত হইতে কেবল ৬০০ মণ সোহাগা প্রতি বৎসর ইংলণ্ড যাইত। লর্ড ডালহৌসি ইহা দেখিয়া ভারতীয় সোহাগার বাণিজ্যোন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান হন। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে লাডকের সোহাগা খনি আবিষ্কৃত হয়। লাডকের নিকট পুগা নামক উপত্যকাস্থ গন্ধক ও সোহাগাখনির বিষয় সাধারণে প্রচারিত হইয়া পড়ে। কনিংহাম মহোদয় পুগা উপত্যকার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে মাহাত্মা কাপ্তেন হে স্বয়ং পুগা উপত্যকা পরিদর্শন করিয়া সমুদায় তথ্য অবগত হন। তিনি বলেন, পুগা উপত্যকার যে স্থলে সোহাগা উৎপন্ন হয়, তাহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল এবং প্রস্থে প্রায় এক মাইলের ত্রি-চতুর্থাংশ। এক ক্ষুদ্র প্রবাহিনী পুগার সোহাগাময় ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুনদে মিলিয়াছে। উক্ত ভূমি বহু উষ্ণোৎস

সমাকীর্ণ। উষ্ণ নির্ঝরগুলির তাপ ১৩০° হইতে ১৬৭° ডিগ্রী পর্য্যন্ত। নির্ঝরিণী সকল উক্ত ক্ষুদ্র প্রবাহিণীসলিলে আপনাপন জীবন চালিয়া থাকে।

পুগা উপত্যকা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২০,০০০ মণ (কাঁচি) সোহাগা গৃহীত হইত। ইহার অধিকাংশ রামপুরে, কিয়দংশ মণ্ডি দিয়া কুলু নামক স্থানে এবং অবশিষ্টাংশ নুরপুরে আনীত হইত। রামপুরে আনীত অবিশুদ্ধ সোহাগা আবার সাবাথু ভাজি ইত্যাদি স্থানে নিম্ন ভূমিতে গমন করিত। এই সকল স্থানে কাষ্ঠ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তজ্জন্য শীতকালে এতৎস্থান সকলে সোহাগা পরিষ্কৃত ও পরিশ্রুত হইয়া জগাদ্রি নামক স্থানে নীত হইত। তথা হইতে গঙ্গা যমুনা নদী-যোগে সোহাগা আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান প্রধান সহরে প্রেরিত হইত। ভারতের জন্য আবশ্যক মত সোহাগা রক্ষিত হইয়া অবশিষ্টাংশ আবার ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে গমন করিত। ডেভিস সাহেব বলেন, রামপুরে আনীত সোহাগা প্রথমতঃ কাশ্মীরে ও তৎপরে করাচিতে লইয়া যাওয়া হয়। রামপুর ও সুলতানপুরে পূর্ব্বে প্রায় ২৫০০ মণ প্রতি বৎসর নীত হইত। তৎকালে জগাদ্রিই পরিশ্রুত সোহাগার প্রধান বাণিজ্য স্থল ছিল। এই স্থলে সোহাগা প্রতি মণ ১২৲ টাকায় বিক্রীত হইত। জগাদ্রি হইতে শকট যোগে ফরেক্কাবাদ ও ফরেক্কাবাদ হইতে জলযানে ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হইত। কিন্তু এক্ষণে জগাদ্রির সোহাগা বাণিজ্যের সেরূপ প্রাবল্য দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় জগাদ্রির সোহাগাবাণিজ্য লয় প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে।

পুগায় এক টাকায় তিনটী মেষ বোঝাই সোহাগা বিক্রীত হয়। পুগা হইতে কুলু পৌছিতে প্রায় একমাস লাগিয়া থাকে। ভারি বোঝাই লইয়া মেষগণ প্রতিদিন গড়ে এক ক্রোশ মাত্র পথ চলিতে পারে। কুলুতে ঐ ১ এক টাকার সোহাগা ৮ টাকায় বিক্রীত হয়। যদি পরিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে প্রতি মণ কাঁচি ৫ টাকায় বিক্রীত হয়। ঐ সোহাগা আবার কুড়লি, শিশোভা, টেকি প্রভৃতি অঞ্চলে ৬৲ টাকা মণ (কাঁচি)। তৎপরে উহা জগাদ্রির বণিকগণ ক্রয় করিয়া অবিশুদ্ধ হইলে বিশুদ্ধ করিয়া নানাস্থানে প্রেরণ করে।

পুগাভিন্ন তিব্বতের অনেকস্থলে সোহাগার খনি আছে। ব্যবসায়িগণ ব্যবসায়ের হানি হইবে বলিয়া সচরাচর খনিস্থল সাধারণে প্রকাশ করিতে চাহেনা। ইমাডকুচো নামক স্থানে বহু শতাব্দী হইতে সোহাগা উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। তথাকার অধিবাসিগণ কূপ খনন করিয়া রাখে, সেই সকল কূপে সোহাগা সঞ্চিত হইলে তুলিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী ভ্রমণকারী ব্যবসায়িগণকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া যায়। হিমালয়ের অপর পার্শ্বস্থ হ্রদসকলেও সোহাগা প্রাপ্ত হওয়া যায়। রডক নামক প্রদেশে যে সোহাগা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও উত্তম। রডকে যাইতে হইলে 'নাইট' নামক গিরিসঙ্কট দিয়া যাইতে হয়। রডকজাত সোহাগা এরূপ বিশুদ্ধ যে পরিশ্রুত না করিলেও চলে। রডকোৎপন্ন সোহাগা ছাগ ও মেষ পৃষ্ঠে আনীত হয়। পার্ব্বতীয় প্রদেশে ছাগ ও মেষই প্রধান ভারবাহী। শীতাগমে যখন হিমালয়স্থ গিরিবর্ত্ম সকল তুহিনপাতে অগম্য হয়, তখন সোহাগার ব্যবসায় কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত থাকে।

তিব্বত দেশীয় 'কানায়ারি' ও 'খাম্পোস' নামক ভ্রমণকারী জাতীয়েরা সাধারণতঃ সোহাগা ব্যবসায়ী। উহারা শীতাগমের পূর্ব্বেই পুগা, ও অন্যান্য স্থল হইতে সোহাগা সংগ্রহ করিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে লইয়া আইসে। তৎপরে শীতারম্ভ হইলে তথায় তাহারা মেষ চারণ ও সোহাগা পরিশ্রুত করণে নিযুক্ত থাকিয়া তদ্বিক্রয়লব্ধ অর্থ-দ্বারা এতদ্দেশীয় আবশ্যক দ্রব্যজাত ক্রয় করিয়া গ্রীষ্মাগমে স্বদেশে বিক্রয়ার্থ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

সোহাগা পরিশ্রুত করণ অধিক কষ্টকর নহে। প্রথমতঃ ২ ভাগ উষ্ণ ও দশ ভাগ শীতল জলে বিমিশ্র সোহাগা দ্রব করিতে হয়। তৎপরে অগ্নুত্তাপে কিয়ৎক্ষণ ফুটাইয়া শীতল হইতে দিলেই পরিশ্রুত সোহাগা দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে। বহুক্ষণ বায়ু-সংস্পর্শে চূর্ণীভূত হইবে না বলিয়া পূর্ব্বে বিমিশ্র সোহাগার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশান হইত। এক্ষণে ঘৃতের ব্যবহার রহিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধারণ লবণ ও মৃত্তিকা পৃথক্ হইয়া যাইলেও, সোহাগা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয় না। সোডা ফস্ফেট ও ফটকিরি সামান্য পরিমাণে থাকিয়া যায়।

অপর এক প্রক্রিয়া এই যে, প্রথমতঃ অবিশুদ্ধ সোহাগাকে চূর্ণীকৃত করিয়া অগভীর নালীর ন্যায় পাত্রে রক্ষা পূর্ব্বক দু এক ইঞ্চি গভীর করিয়া জল দ্বারা আবৃত করিতে হয়। পরে দুই অংশ জলে ২ পাউণ্ড পরিমিত চূণ (lime) দ্রব করিয়া, প্রতি দশ মণ সোহাগার সহিত মিশাইতে হয়। প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর উহা এক এক বার উত্তমরূপে নাড়িয়া লইতে হয়। পরদিবস উক্ত দ্রব্য বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে আড়াই গুণ পরিমিত ফুটন্ত জল মিশাইয়া ও প্রতি ১০ দশ মণে ১৬ পাউণ্ড চূণ মিশ্রিত করিয়া কিয়দ্দিবস রাখিয়া দিলে জলীয়াংশ বাষ্পীভূত হইতে থাকে। অবশেষে ফুঁদিলের ন্যায় আকার বিশিষ্ট কাংস পাত্রে রাখিয়া তাপ সংযোগে দানা বাধাইয়া লইতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সোহাগা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু প্রতি শত মণে ২০ মণ কমিয়া যায়।

তিব্বত হইতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যে সোহাগা আনীত হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বলিয়া প্রথমে চালনীর দ্বারা চালিয়া লওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সোহাগার অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর দানা সকল পৃথক হইয়া পড়ে। এই গুলির নাম 'চৌকি'। অবশিষ্ট ধূলির ন্যায় যে সোহাগা চালনী দিয়া গলিয়া পড়ে, তাহার নাম রেগ বা ধূলি সোহাগা। পূর্ব্বোক্ত 'চৌকি' সোহাগা এরূপ বিশুদ্ধ যে, উহা আর পরিশ্রুত করিবার আবশ্যক করেনা। শেষোক্ত রেগ সোহাগার সহিত মৃত্তিকাদি মিশ্রিত থাকে বলিয়া উহা জলে মিশ্রিত করিয়া দু তিন বার ফুটাইতে হয়। তৎপরে দানা বাঁধিলে মৃত্তিকাদি অবশিষ্ট জলের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া পৃথক হইয়া পড়ে। প্রতি ১০০ মণ মিশ্র সোহাগা চালনী দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে ৬০ মণ 'চৌকি' সোহাগা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশিষ্ট ৪০ মণ 'রেগ' সোহাগা প্রথমবার ফুটাইলে ১০ মণ পরিশ্রুত (কঞ্জ) সোহাগা প্রাপ্ত হওয়া যায় ও ৩০ মণ অবিশুদ্ধ সোহাগা (কাশ্তি) অবশিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় বার উক্ত ৩০ মণ কাশ্তি জল সহ ফুটাইলে উহা হইতে আবার ৫ মণ (কঞ্জ) সোহাগা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অবশিষ্ট ২৫ মণ মৃত্তিকা পড়িয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মহোদয় ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ভুটিয়াদিগকে উক্ত বিশুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে কৃতপ্রযত্ন হন, কেন না তাহ হইলে ঐ ২৫ মণ মৃত্তিকা বহন ভারের লাঘব হইয় অধিক পরিমাণে সোহাগা আনীত হইতে পারে কিন্তু জ্বালানি কাষ্ঠের দুর্লভতা ঐ সকল স্থানে উক্ত প্রক্রিয়ার এক প্রধান অন্তরায় বলিয়া ে চেষ্টা বিফল হইয়া যায়।

পূর্ব্বে প্রতি বৎসর পাঞ্জাব হইতে লাডক প্রভৃ স্থল হইতে আনীত প্রায় ১২,৪২৬ মণ সোহাগ ভারতের নানা স্থানে রপ্তানি হইত। ইহার মূ ৯৩,১০৯ টাকা। এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে তিব্বত হইতে আনীত প্রায় ৩৩,৮৫৬ মণ সোহাগ ভারতের নানা স্থলে প্রেরিত হইত। উহার মূ প্রায় ৩,৩৭,৯৩৮ টাকা। ভারতের বহির্ভাগে দে বিদেশে সোহাগা রপ্তানি বঙ্গদেশ ও বোম্বাই হইতে হইত। এই বঙ্গদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্র ১৬০৯৫ হন্দর (৩৫৪৬৯৯ টাকার) এবং বোম্ব হইতে প্রায় ১২১ হন্দর (৩৮১৯ টাকার) সোহা নিম্নলিখিত দেশ সকলে প্রেরিত হইত।—

ইংলণ্ডে	১৪১৩৪	হান্দর	২৯২৫৮৫ টাক
আরবে	৩৮	"	১১৩০
চীন ও হংকং	১৭১৩	"	৫৬৪২৪
ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট	২৫৮	"	৬১৪৭
আসিয়াটিক তুরস্ক	৩৬	"	১০৫৭
অন্যান্য দেশে	৩৭	"	১১৭৫
	১৬২১৬	"	৩৫৮৫১৮

উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হই যে, সোহাগা পূর্ব্বে ভারতের এক প্রধান বাণি দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। বহু টাকার সোহা ভারত হইতে দেশ বিদেশে রপ্তানি হইত। কি এক্ষণে স্বাভাবিক ভারতীয় সোহাগাবাণি একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেও হ আমেরিকার নবাবিষ্কৃত সোহাগা খনি ভারতে সোহাগাবাণিজ্যের এক বিষম প্রতিবন্ধক হই দাঁড়াইয়াছে। তদুপরি য়ুরোপীয় কৃত্রিম সোহ ভারতীয় সোহাগার এক দুর্দ্দমনীয় প্রতিদ্বন্দ্ব সুতরাং ভারত-বাণিজ্যের আর রক্ষা কোথা এ প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ভারতের আশা সু পরাহত। সোহাগার বহির্বাণিজ্য এখন একেবা রুদ্ধ, কেবল অন্তর্বাণিজ্যই সোহাগার একম নির্ভরস্থল হইয়াছে।

অধুনা তিন প্রকার সোহাগা বাজারে বিক্রীত হইতে দেখাযায়; প্রথম বিলাতি, দ্বিতীয় কানপুরী এবং তৃতীয় করাচির। বিলাতি সোহাগা পিপায় ভর্ত্তি হইয়া এদেশে আইসে। বিশুদ্ধ বিলাতি সোহাগার দর ও স্বল্পবিশুদ্ধ তিব্বতীয় সোহাগারদর প্রায়ই সমান। তিব্বতীয় সোহাগা থালার ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং করাচির সোহাগা মসৃণ, দানাদার ও খণ্ডীকৃত। স্বাভাবিক সোহাগা কৃত্রিম অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়ঃ।

সোহাগা স্বচ্ছ, দানাদার, উজ্জ্বল, গন্ধবিহীন, এক প্রকার শীতল ও মিষ্ট স্বাদজনক ও ক্ষারময়। প্রতি সোহাগার যৌগিকাণু দশ অণু জল ধারণ করে। এই জলই (Water of crystallization) দানা বাঁধিবায় প্রধান সহায়। এই জলীয়াংশের নূনাধিক্য বশতঃ সোহাগার দানার আকারও বিভিন্ন হইয়া থাকে। সোহাগা উত্তপ্ত করিলে এই জলীয়াংশ বহির্গত হইতে থাকে; তৎপরে গলিয়া যায়। তাপ প্রাপ্তিতে গলিত তরল সোহাগা স্ফীত হইয়া এক প্রকার শ্বেতবর্ণ সচ্ছিদ্র বৃহদাকার ধারণ করে। ইহাই সোহাগার খৈ বলিয়া অভিহিত হয়। অধিক উত্তাপ দিলে উক্ত খৈ পুনরায় দ্রবীভূত হইয়া স্বচ্ছ কাচের ন্যায় আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় যৌগিকাণু সংশ্লিষ্ট সলিল ভাগ একেবারে বিদুরিত হইয়া যায়। এই প্রকার কাচের ন্যায় আকার ধারণ করিলে ইহা সোহাগা স্ফটিক নামে উক্ত হইয়া থাকে।

সোহাগা স্ফটিক (Borax head) দ্বারা পদার্থে ধাতুর উপস্থিতি পরীক্ষিত হয়। ধাতুভেদে বর্ণহীন সোহাগা স্ফটিক বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে। বক্রনল (Blowpipe) দ্বারা দীপশিখায় ফুঁ দিলে দুই প্রকার শিখার উৎপত্তি হয়; বহির্ভাগে অম্লকর শিখা (Oxydising flame) এবং অভ্যন্তরে উহার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত অম্লনাশক শিখা, (Reducing flame)। এই অম্লনাশক শিখায় কোন এক ধাতুময় লবণ বিশেষ দ্রবে সোহাগা স্ফটিক ডুবাইয়া ধরিলে বর্ণ দ্বারা ধাতু সূচিত হইয়া থাকে। সোহাগা স্ফটিক অম্লনাশক শিখায় রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইলে তাম্র, হরিৎ হইলে লৌহ ইত্যাদি। আবার অম্লকর শিখায় ধরিলেও লবণ ভেদে বর্ণ ভেদ পরিলক্ষিত হয়; রক্তবর্ণ হইলে লৌহ, ভায়লেট হইলে ম্যাঙ্গানিস (Manganese), নীল হইলে কোবাল্ট ইত্যাদি ধাতু নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সোহাগা স্ফটিক এইরূপে লবণ বিশেষে ধাতু সমাগম বর্ণ বৈচিত্র দ্বারা সূচিত করে বলিয়া রসায়নিক বিশ্লেষণ কার্য্যে উহা রসায়নবিদের এক প্রধান প্রয়োজনীয় পদার্থ। এ প্রকার পরীক্ষার নাম শুষ্ক পরীক্ষা (Dry test)।

সোহাগা পরীক্ষার এক অতি সুন্দর উপায় আছে। অতি সামান্য পরিমাণ সোহাগার বিদ্যমানতা এই পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয়। সোহাগা মিশ্রিত দ্রবে গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) মিশ্রিত করিলে যে এক প্রকার উজ্জ্বল দানাদার পদার্থ অধঃপাতিত হয়, তাহা স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় ধরিলে শিখা উজ্জ্বল হরিৎবর্ণ ধারণ করে। সোহাগার উহা এক সুন্দর পরীক্ষা।

স্বাভাবিক সোহাগার সহিত প্রায় সাধারণ লবণ, সোডা ফস্ফেট, ফটকিরি ও মৃত্তিকা মিশ্রিত থাকে। পরিশ্রুত করণ কালে সাধারণ লবণ ও মৃত্তিকা সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হয়, কিন্তু ইহাতে সোডা ফস্ফেট ও ফটকিরি (alum) স্বল্প পরিমাণে থাকিয়া যায়।

সোহাগার এক অদ্ভুত শক্তি আছে। উহা পচন নিবারক। বিখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিৎ স্কিগ্লার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সোহাগা উদ্ভিজ্জ কোষ সহ জৈবিক রসের (Protoplasm) উপর অত্যধিক কার্য্য কারক। সোহাগা পচন কারক উদ্ভিজ্জাণুর বিনাশ সাধন করে বলিয়া তন্মিশ্রিত সামগ্রী সকল সহজে পচিয়া যায় না। প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ সকল সোহাগা সংযোগে বহুকাল অবিকৃতাবস্থায় থাকে।

ভিষক্‌গণ সোহাগা বহু রোগে ঔষধস্বরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ বহু পূর্ব্ব হইতে সোহাগার ব্যবহার ও উপকারিতা অবগত ছিলেন। সুশ্রুতে সোহাগা (তঙ্কন) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অস্মদ্দেশীয় কবিরাজগণ ক্ষুধাহীনতা, ক্লেশ প্রদায়ক অজীর্ণতা, শ্লৈষ্মিক ও শ্বাস রোগে সোহাগা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সোহাগার প্রয়োগ দুই প্রকার; বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। সোহাগার ক্ষত নাশক গুণ আছে বলিয়া ক্ষতে সোহাগা মিশ্রিত মলম প্রয়োগে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোরাসিক

অম্লযুক্ত মলম প্রয়োগ করিয়া ডাক্তারগণ বিশেষ ফল প্রাপ্ত হন। সোহাগা দ্রবে ক্ষত ধৌত করিলে ক্ষতস্থান শীঘ্রই পূরিত হইয়া থাকে। সোহাগার পচন নিবারিণী শক্তিই বোধ হয় ইহার কারণ। দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগে, স্ফোটক উদ্গমন বা রসনা ও মুখ গহ্বরে ক্ষত হইলে সাধারণতঃ দেশীয় পিতামহীগণ সোহাগার ব্যবস্থাই প্রথমে করিয়া থাকেন। হাকিমগণ বলিয়া থাকেন যে, ভোজনান্তে এক ঘটিকা পরে ১০ হইতে ১৫ গ্রেণ সোহাগা জল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পরিপাকশক্তি উদ্দীপিত হয়। এতদ্ভিন্ন স্ত্রী ব্যাধিতেও সোহাগার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। সোহাগার খৈ চূর্ণ করিয়া গুবাক ভস্ম অথবা কয়লার সহিত মিশ্রিত করিলে তাহাতে অতি সুন্দর দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হয়।

সোহাগা শিল্পকার্য্যের এক প্রধান সহায়। বস্ত্রাদিতে স্থায়ী (পাকা) রং করিবার জন্য সোহাগা ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ হরিদ্রা দ্বারা কার্পাস বস্ত্র রঞ্জিত করিতে হইলে, সোহাগার একান্ত আবশ্যক। পাত গালার সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার বার্নিস প্রস্তুত হয়। দন্ত চিকিৎসকগণ সোহাগা দ্বারা কৃত্রিম দন্তের পাত প্রস্তুত করিয়া থাকেন। গৃহীর নিকট সোহাগা অতি আদরণীয়। সোডা অপেক্ষা পরিষ্করণ কার্য্যে সোহাগা অধিকতর উপযোগী। সাবানের পরিবর্ত্তে বস্ত্রাদি ধৌত করণে সোহাগা ব্যবহৃত হয়। সোহাগা দ্বারা বস্ত্র ধৌত করিলে বর্ণ হানি হয় না।

সোহাগা স্বর্ণকারগণের এক প্রধান আবশ্যকীয় বস্তু। স্বর্ণ রৌপ্য দ্রবীভূত করিতে, ঝাল দিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি জুড়িতে এবং স্বর্ণ ও রজতালঙ্কারের উজ্জ্বলতা বিধান করিতে সোহাগাই স্বর্ণকারের একমাত্র সহায়। সোহাগার চাকচিক্যবিধায়িনী শক্তি অসীম। ধাতুদ্রব্যাদি ঝাল দিয়া জুড়িবার কালে সোহাগা প্রযুক্ত হয়। কেন না সোহাগা প্রথমতঃ ধাতু দ্রব্যের উপরিভাগস্থ ক্লেদ সকল বিদূরিত করে এবং তৎপরে উত্তাপ সংযোগে সোহাগা স্ফটিকে পরিণত হইয়া অম্লীকৃত (Oxidised) ধাতুময় পদার্থকে দ্রবীভূত করিয়া উপরিভাগের ঔজ্জ্বল্য বিধান করিতে ধাতুদ্রব্য সকল পরস্পর দৃঢ় সংযুক্ত হইয়া যায়। মৃৎপাত্র, চিনা বাসন প্রভৃতির চিক্কণতা ও মসৃণতা বিধান জন্য সোহাগা বিস্তৃত ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লৌহ ও অন্যান্য ধাতুর উপর এনামেল দ্বারা কলাই করিবার জন্য সোহাগার বহুল ব্যবহার হয়। ঘড়ির ডায়েলের উজ্জ্বলতা বিধান জন্য সোহাগা প্রযুক্ত হয়। সোহাগা শিল্পের এক প্রধান উপকরণ। দ্রব্যাদির চিক্কণতা মসৃণতা ও সুষমা বৃদ্ধি করে বলিয়াই বোধ হয় ভারতীয় শিল্পী সোহাগভরে ইহার সোহাগময় সোহাগা নাম দিয়াছে।

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ, বি এল্।

বৈদিক যুগের শিল্প।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে দশম অধ্যায়ে শিল্পকারের উৎপত্তি বিষয় এইরূপ কথিত আছে, অঙ্গিরা-পুত্র সুরাচার্য্য বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী বরস্ত্রীর গর্ভে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসজাত দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা——শূদ্রাতে বীর্য্যাধান করায় তাঁহার নয়টী শিল্পকারী পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে মালাকর, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক অর্থাৎ কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয়টী প্রধান। আর সূত্রধর, চিত্রকর, ও স্বর্ণকার এই তিনটী। ইহাঁরা ব্রহ্মশাপহেতু পতিত হওয়ায় অজাতি নিবন্ধন বর্ণসঙ্কর। অপিচ, অমরকোষের ভরত টীকায় শিল্পের অর্থ এইরূপ :—"বাৎস্যায়নোক্ত-নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিশ্চতুঃষষ্টি বাহ্যক্রিয়াঃ তথা আলিঙ্গনচুম্বনাদি চতুষষ্টিঃ অভ্যন্তর ক্রিয়াঃকলাঃ। আদিনা স্বর্ণকারাদকারুকর্ম্মগ্রহঃ। এতৎ সর্ব্বং শিল্পং কথ্যতে।"

অতএব, ভরত প্রস্থান অনুসারে আমাদিগকে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি আলিঙ্গনচুম্বনাদি ১২৮টী বাহ্যাভ্যন্তর ক্রিয়াগুলিকেও শিল্প বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্রে, শিল্প বা শিল্পকারের এইরূপ একটা আখ্যাব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু, শিল্পার্থ বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ইহাতে আমরা বৈদিক যুগের শিল্পের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

আর্য্যজাতি অতি সুপ্রাচীন কালেই সভ্যতা সোপানে আরূঢ় হইয়া শিল্পবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এক্ষণে, ভারতে শিল্পোন্নত বিষয়ে যথেষ্টই চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু, বৈদিক আর্য্যগণ অপেক্ষা আধুনিক ভারতবাসিগণ যে শিল্পবিষয়ে অধিক উন্নতি করিয়াছেন, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। আজকাল, কতকগুলি কলকারখানা লইয়াই আমাদের শিল্পবিদ্যার উৎকর্ষ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বস্তুতঃ কলকারখানা ব্যতীত আমাদের শিল্পোন্নতির উপায়ান্তর নাই। এ বিষয়ক উন্নতি চেষ্টাও আবার বৈদেশিক প্রকারে। যাহা হউক, যৎকালে জগতের তাবৎ জাতি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হইয়া বন্য পশুর ন্যায় অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতেছিল,—যৎকালে বর্ণমালার সৃষ্টি বিষয়ে অন্য কোন জাতি কল্পনাও করে নাই; তৎকালে আর্য্যজাতি যে কত শিল্পোন্নতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রাচীন আর্য্যজাতির শিল্পকীর্ত্তিকলাপের চিহ্নমাত্রও অধুনা দৃষ্টিগোচরের সম্ভাবনা নাই, সত্য। কিন্তু, তাঁহাদের যাবতীয় কীর্ত্তিনিচয়ের জ্বলন্ত ইতিহাস——আমাদের প্রাচীনতম অবলম্বন "বেদ" শাস্ত্রে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং সুপ্রাচীন আর্য্য শিল্পালোচনার পক্ষে বৈদিক যুগের শিল্পানুশীলনই সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য।

বৈদিক কালে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক মৃৎ কুটীর বড় একটা ব্যবহৃত হইত না। সাধারণতঃ, তাঁহারা ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ প্রাসাদ রচনা করিয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের গৃহগুলি ছাদযুক্ত এবং গবাক্ষ ও দ্বারবিশিষ্ট হইত (১।১১৩।৭)। গৃহ ইষ্টক নির্ম্মিত হইত এবং সবিশেষ প্রচলিত ছিল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য চুণ, সুরকি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত (৪।৪৭।২)। বেদে "ইষ্টকাস্তম্ভ," অট্টালিকা ইত্যাদি বহু শব্দ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার অস্তিত্ব বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। ঋগ্বেদে "সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ" (৭।৪৪।৫) "সহস্রস্তম্ভরক্ষিত প্রাসাদ" (২।৪১।৫), "বিস্তৃত বাসস্থান" (১৩৬।৪) "প্রস্তরগৃহ," "বক্রপ্রস্তর" ইত্যাদির বহুল প্রয়োগ বিদ্যমান। তৎকালে গৃহ নানারূপে ও নানা উপাদানে নির্ম্মিত হইত। গৃহ রচনা পদ্ধতি যে তৎকালে বিশেষ উন্নত ছিল তাহার একটী কারণ আমরা দেখাইতেছি। তৎকালে আর্য্যগণ এরূপ ভাবে গৃহ রচনা করিতেন যে, রচনা দোষে বায়ু পিত্ত-কফ কোন ধাতুই যেন বক্র বা দূষিত হইয়া গৃহবাসিগণকে ব্যাধিগ্রস্ত না করে (৬।৪৯।৯)। গৃহগুলি একতল হইতে ত্রিতল পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইত। অধিকন্তু, অধিক স্তম্ভযুক্ত থাকায় উহা যে অতি সৌন্দর্য্যময় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই (২।১।৫। ৫।৬২।)। বশিষ্ঠ-ঋষি "একটী ত্রিতল বাসভূমির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই বাক্য ত্রিতল গৃহের বিদ্যমানতার বিষয়ে সাক্ষী।

আর্য্যগণ পরিচ্ছদ বিষয়েও যথোচিত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ ও আজকালকার পরিচ্ছদে বড় বিশেষ পার্থক্য দেখা

যায় না। তাৎকালিক বস্ত্রবয়ন পটুতার বিষয় ঋগ্বেদে বহুবার কথিত হইয়াছে। (২।৩৮।৪ ; ২।৩।৬। ; ৬।৯।১ ; ৪।৪০।৬ ; ৩।৩।২। ; ১০।১০৭।৯ ; ৫।২৯।১৫) যজুঃ ও সামবেদে বস্ত্রের অনেক উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৮) স্বর্ণখচিত কার্পেটের উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক কালে বস্ত্রবয়নের চারিটী মাত্র উপাদান ছিল। পশম, চর্ম্ম, কার্পাস, মেষলোম (৩।৫।৪)। সূত্র গুলি কখন কখন বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করাও হইত। প্রত্যুত:, শ্বেত বস্ত্রই তৎকালে বিশেষ আদৃত হইত (৩।৩৯।২)। সচরাচর তন্তুনির্ম্মিত বস্ত্র, পিরাণ অথবা তনুত্রাণ (আঙ্গা) ও উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত। (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।২।১।৮ ; অথর্ব্ববেদ ১৫।২।১) স্ত্রীলোকগণ টানা ও পড়েন দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন (৬।৯।২)। তাঁহারা সর্ব্বশরীর সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিতেন এবং পরিধেয়ের উপর কঞ্চুক ব্যবহার করিতেন ও সর্ব্ব প্রকার উষ্ণীষ ধারণ করিতেন। বিবাহকালে মেষলোমের বস্ত্র ব্যবহৃত এবং যৌতুকস্থলে উহা উপহার প্রদত্ত হইত। আর্য্যগণেরা চর্ম্মের অতি পরিষ্কার কার্য্য জ্ঞাত ছিলেন। ভিস্তিরা চর্ম্মদ্বারা পথ জলসিক্ত করিত। আর্য্য স্বয়ং বহুবিধ জুতা ব্যবহার করিতেন (আর্য্য সভ্যতা-গ্রন্থোদ্ধৃত Buhlers Apastamba, p. 14)। এই সমস্ত জুতা চর্ম্মে প্রস্তুত হইত। ঋগ্বেদে নাপিত ও ক্ষৌর-কার্য্যের বিষয় উল্লিখিত আছে (১।১৬৪।৪৪ ; ১।৯২।৪ ; ১০।১৪২।৪ ;)। সুতরাং স্থির হইতেছে যে ক্ষৌরকার্য্যোপযোগী দ্রব্যেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। অলঙ্কার ধারণ প্রথা অস্মদ্দেশে বোধ করি চিরকালই প্রচলিত আছে। কেননা, সুদূর প্রাচীন বৈদিকযুগেও আমরা বহুবিধ সুন্দর অলঙ্কারের ব্যবহার বাহুল্য দেখিতে পাই। বৈদিকযুগেও স্বর্ণা-লঙ্কার (১।৩৫।৪), বলয়, (৪।৫৩।৪) অঙ্গুরীয় ও ও চিত্রিত কণ্ঠমালা (২।৩৩।১০), সুবর্ণ কুণ্ডল, মেখলা, মল (২।১২২।১৪) ইত্যাদি অলঙ্কার বিশেষ প্রচলিত ছিল। মুক্তাদি খচিত স্বর্ণ অলঙ্কারের যে খুব প্রচলন ছিল তাহা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩।৬৬৫)ও যজুর্ব্বেদের নানা স্থানে উক্ত আছে। "মালা" ব্যতীত বক্ষে "রুক্ম" নামে এক প্রকার অলঙ্কারও উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক কালে শঙ্খ প্রবালাদিও নানা কারুকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। ইহাও উক্ত আছে যে স্ত্রীলোকেরা নানারূপ নৈপুণ্যে তাঁহাদের কেশ বন্ধন করিতেন। (৪।৮৬) কিন্তু সে নিপুণতা কিরূপ তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমোদ প্রমোদের জন্য তাঁহারা শালগুঞ্জিকা (৩।৩২।২৩) ও অন্যান্য ক্রীড়া সামগ্রীর ব্যবহার করিতেন (৩৩।১৮৫) শত তারবিশিষ্ট বীণাযন্ত্র ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রও তৎ কালে প্রচলিত ছিল। বৈদিক আর্য্যগণ শিশু ব খদির কাষ্ঠনির্ম্মিত রথ ও গাড়ী ব্যবহার করিতেন (৪।৬৩ ৫ ; ৩।৫৩।১৯) অশ্ব ও গর্দ্দভ এই গাড়ী ও রথ বহন করিত। চক্রগুলি পিত্তল-নির্ম্মিত রথ শুম্ভাদি লৌহময়। বোধ হয়, ঐ সময়ে দু একখানি স্বর্ণমণ্ডিত রথেরও প্রচলন ছিল। এই রথগুলির বসিবার স্থান সকলও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। রথের সম্মুখে কাষ্ঠনির্ম্মিত অশ্বাদির সন্নদ্ধ থাকিত সাধারণতঃ, চর্ম্মতন্তু, চর্ম্মরশ্মি (লাগাম) ব্যবহৃত হইত। ফলতঃ, দেখা যাইতেছে যে বৈদিক রথ চালন বা গঠন বিদ্যা বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা হীন ছিল না। ঋগ্বেদে "ত্রিস্তম্ভবিশিষ্ট ত্রিকোণ যান' (১।৪৭।২), "তিনটী বসিবার স্থানযুক্ত যান' (২।২৮৩।১) ইত্যাদি প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয় মনোহরদৃশ্য জলযান (জাহাজ) ও নৌকা ব্যবহার বিষয় বেদে অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। বৈদিক আর্য্যগণ শুধু যে শিল্পী ছিলেন তাহা নয়, তাঁহারা বীরও ছিলেন, তাঁহারা যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য বর্ম্ম হস্তঘ্ন, চর্ম্ম (ঢাল) প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময় তাঁহারা বর্ষা, পরশু, বাশী (বাইশ), ধনুর্ব্বাণ ও লৌহাগ্র কাষ্ঠময় বিষাক্ত বাণ ব্যবহার করিতেন। রণবাদ্য, মধ্যে দুন্দুভি, ক্ষোণী, কর্করী ও ঢক্কা তাঁহা-দের ব্যবহারে আসিত। এই বস্তুগুলি যেমন তাঁহারা নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতেন, তেমনি তাঁহারা দক্ষতার সহিত নির্ম্মাণ করিতেন। এসমস্ত নির্ম্মাণ বিষয়ে তাঁহারা আধুনিকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে অবনত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

বৈদিক শিল্প বিষয়ে আর অধিক বলিবার আব-শ্যকতা নাই। আর্য্যদিগের পরিচ্ছদ, যুদ্ধাস্ত্র, অলঙ্কার ও গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইল তাহা হইতে তাঁহাদের তৎকালীন শিল্প বিষয়ের যৎসামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। তাঁহারা যে শিল্পোন্নতি

বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের এই আভাস দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে। যাহাহউক বৈদিক যুগের শিল্পালোচনা করিতে গিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে মৃণ্ময় এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, ও তাম্রময় দ্রব্য তৎকালে নির্ম্মিত হইত। সূত্রধর, কর্ম্মকার, তন্তুবায়গণ যথাক্রমে কাষ্ঠ কার্য্য, অলঙ্কার গঠন এবং বহুমূল্য সূক্ষ্মবস্ত্রবয়নে বিলক্ষণ পটু ছিল। তৎকালে গজদন্তের কারুকার্য্যেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা বোধ হয় কাচ ও রেশম ব্যবহার জানিতেন না। সে যাহা হউক, সুদূর প্রাচীন বৈদিক শিল্পনিচয় আলোচনা করিলে সকলকেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে, যে শুধু দু'একটি শিল্প বিষয়ে কেন, সমগ্র শিল্প বিষয়েই আর্য্যগণ এককালে সর্ব্ব জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

দুর্ভিক্ষের প্রতিকার।

খালখনন।

(Irrigation)

আমাদিগের নিজের উদ্যোগে আজ কাল দু একটি রেলওয়ে স্থাপিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে তারকেশ্বরে মগরা তারকেশ্বর, হাওড়া আমতা হাওড়া শিয়াখালা, রাণাঘাট কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকটী লাইট রেলওয়ে দেশীয়গণের আংশিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সম্প্রতি মগরা ত্রিবেণী রাণাঘাট বশিরহাট প্রভৃতি আরও দুই চারিটি স্থাপিত হইবার কল্পনা ও উদ্যোগ হইতেছে।

রেলওয়ে দ্বারা যাতায়াতের সুবিধা হয় বটে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক অমঙ্গলও সাধিত হইয়া থাকে। তাহার বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

কিন্তু আমাদের দেশের লোকে যদি রেল অপেক্ষা খাল খনন করিয়া দিবার পক্ষে মনোযোগ করেন, তাহা হইলে দেশের অতি বিস্তৃত পরিমাণে উপকার সাধিত হইতে পারে।

অনেকের বিশ্বাস যে খাল ইত্যাদি খনন কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি খাল খনন করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু যে রূপ অধিক পরিমাণে খাল খনন করিয়া দিলে দেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে, তাঁহা গবর্ণমেণ্ট করেন নাই। অনেকেরই বিশ্বাস এই যে, যাতায়াতের সুবিধার জন্য খালের পরিবর্ত্তে রেল হইলে সরকারী ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের স্বজাতি কুটুম্বদিগের অনেক উপকার সাধিত হয়। পাতিবার রেল, চলিবার গাড়ী, এঞ্জিন প্রভৃতি সমস্তই ইউরোপীয় বণিকদিগের। তাঁহাদের কুটুম্বেরা ভারতবর্ষে সেই সকল আমদানীর ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কুটুম্বিতা থাকিবে কিসে? বেশী রেল হইবার আরও কারণ আছে। সিপাহী-বিদ্রোহের ন্যায়, ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যদি কখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তবে অধিক পরিমাণে রেলওয়ের ব্যবস্থা থাকিলে, সকল স্থানে শীঘ্র সৈন্য প্রেরণের সুবিধা হইবে বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের প্রতি অধিক মনোযোগিতা প্রকাশ করেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের ন্যায়, বহু দূর বিস্তৃত বিদ্রোহ অথবা রুশিয়া কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ জনিত তুমুল একটা যুদ্ধ কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা অতি দুরপরাহত হইলেও রাজা, ভাবী আপদ নিবারণ জন্য প্রস্তুত থাকিবেনই। অতএব গবর্ণমেণ্টের এ বিষয় মনোযোগের ব্যত্যয় আমরা কিছুতেই করিতে পারিব না। সম্প্রতি যে Irrigation কমিশন বসিয়াছিল, তাহা হইতেও বড় অধিক ফলের আশা করা যায় না।

কিন্তু কোন কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ না করিলে কার্য্য হইবে না কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা গবর্ণমেণ্ট করিবেন না, তাহা পাঁচ জন দেশীয় লোকের চেষ্টায় না হইবে কেন? সার জর্জ চেসনী বড়লাটের সভায় বিখ্যাত মিলিটারী সদস্য ছিলেন, তাঁহার রচিত Indian Polity নামক পুস্তকে এই খাল খনন কার্য্য দেশীয়দিগের দ্বারা সম্পন্ন হইবে না কেন এ বিষয়ে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ আছে।

অধিক পরিমাণে খাল খনন করিয়া দিয়া মহীশূর রাজ্যে দারুণ অনাবৃষ্টি হইলেও লোকে খালের জলের সেচ দিয়া অনায়াসে ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে এবং সেই কারণেই দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। বিখ্যাত শোন খাল যাহা গবর্ণমেণ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার বলে গত দুর্ভিক্ষের সময়

ঐ খালের দুই তীরবর্ত্তী এক ক্রোশ প্রস্থ জমি অজন্মা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। সুতরাং খালের দ্বারা কত প্রকার সুবিধা তাহা বুঝিয়া দেখুন।

১ ম। আবদ্ধ অপরিস্কৃত জলের নিকাশ হইতে পারে।

২ য়। তাহাতে অনেক জমী কর্ষণ যোগ্য হইতে পারে।

৩ য়। অপরিস্কৃত জল নিকাশ হইলে, ম্যালেরিয়াদি রোগের প্রকোপ কমিবে।

৪ র্থ। অনাবৃষ্টির সময় জমীতে সেচ দিবার জল পাওয়া যাইবে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ নিবারণের ইহা একটী প্রধান উপায়।

৫ ম। খালের জল উবচাইয়া উঠিয়া নিকটবর্ত্তী জমী ডুবিয়া গেলে তাহার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিবে।

৬ ষ্ঠ। Sir William Hunter কৃত Fisheries of Bengal নামক পুস্তকে হিসাব করিয়া দেখান হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে মৎস্যের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। মৎস্য যে পূর্ব্ব ও মধ্য বাঙ্গলা দেশের প্রধান আহার্য্য, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। খালের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মাছের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাত্মা হণ্টার সাহেবের কথিত মৎস্যের হ্রাস হওয়ার কারণ এই যে, দীর্ঘকালে অনেক অল্প পরিসর নদী, বিল ও খাল ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে বলিয়াই বাসস্থান অভাবে মৎস্যকুল নির্ব্বংশ হইয়া যাইতেছে। আমরা অবগত আছি যে, পূর্ব্ব বঙ্গের একটি মাত্র সামান্য জমিদারীর মধ্যে প্রায় ১০ হাজার বিঘা জমী বিল ভরাটি জমী এবং এক্ষণে ঐ বিলের জমীতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিতেছে। তাহাতে কোন ফসল হইলে ক্ষতি নাই বটে, কিন্তু তাহার আবদ্ধ অপরিস্কৃত জল রোগের আকর তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব এই সকল আবদ্ধ জল নিকাশের জন্য এবং মৎস্যের আবাস জন্য খাল যে বিশেষ উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭ ম। রেলের দ্বারা যেরূপ যাতায়াতের সুবিধা হইতে পারে, খালের পথে পল্লীগ্রামে তাহা অপেক্ষা সুবিধা যে অধিক সে বিষয়ে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই স্বীকার করিবেন। অপরন্তু খালের পথে নৌকা করিয়া দ্রব্যাদি অনেক অল্প ব্যয়ে লইয়া যাইতে পারা যায়।

৮ ম। খালে নৌকা বহন করিবার জন্য এক শ্রেণী লোকের জীবিকার উপায় হইবে। এক রেল কোম্পানী হয়ত বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা মুনফা করিয়া লণ্ডনে দুই চারিজন ধন কুবের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইতেন. খাল খনন করিলে সেই মুনফার দশ লক্ষ টাকা অন্ততঃ ২০ হাজার দেশীয় লোক মাঝি মাল্লা দাঁড়ির কার্য্য করিয়া ক্ষুধিত দগ্ধ উদরের জ্বালা নিবৃত্তি করিবে।

আমরা এতক্ষণে বোধ হয় কতকটা বুঝিয়াছি যে খাল খনন করিয়া দিলে আমাদের দেশের পক্ষে অনেক উপকার।

কিন্তু কথা হইতেছে, যে তাহা কার্য্যতঃ করা দেশের লোকের ক্ষমতার মধ্যে কি না? আমাদের উত্তর এই যে, তাহা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে। দেশের লোকে যখন শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা লাভ মাত্র লইয়া অনেক কার্য্যেই সন্তুষ্ট, তখন এই অধিক লাভের কার্য্যে অগ্রসর না হইবেনই বা কেন? এবং তাহা করাতে ক্ষমতা না হইবেই বা কেন? বরং অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা এই কার্য্যে অল্পই বিচক্ষণতার আবশ্যক, অল্পই প্রবঞ্চনাদি হওয়া সম্ভব, পক্ষান্তরে লাভ অনেক বেশী হইতে পারে। লাভ কেবল দরিদ্র কৃষক, মাঝি, দাঁড়ি, মজুর ও ধীবরের নহে. যাঁহারা অর্থ ব্যয় করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাঁহাদেরও লাভ কম নহে। নিম্নে তাহার আনুমানিক একটা হিসাব দেওয়া গেল।

১২ ফুট প্রস্থ .৫ ফুট গভীর ২ মাইল প্রস্থ খাল কাটিবার	খরচ	১০০০০৲
১২ ফুট প্রস্থে × ২ মাইল দীর্ঘ অর্থাৎ ৫২ বিঘা জমীর	মূল্য	৫০০০৲
খালের তীরে সেগুন বাবলা শিশু ও খেজুর গাছ বসান ইত্যাদির	খরচ	৫০০৲
	মোট	১৫৫০০

বাৎসরিক আয়—

১ ক্রোশ দীর্ঘ খালের জলকর—বার্ষিক খাজানা	৮০০৲
খালের তীরের ১০০০ খেজুর বৃক্ষের বার্ষিক খাজানা	২০০৲
তীরের ২০০ সেগুন শিশু বা বাবলা বৃক্ষের ২০ বৎসরের মূল্য ২০০×৫০=১০০০০ বার্ষিক	৫০০৲
প্রতিদিন ২০খান নৌকা যাতায়াতের কুত ১০ হিঃ বার্ষিক	৫০০৲
	২০০০৲
১৫৫০০৲ টাকা মূলধনের শতকরা ১২৲ হিঃ সুদ	১৮৪০৲
বার্ষিক মেরামতি খরচ	১৬০৲
মোট	২০০০৲

আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে, এই খাল খনন কার্য্যে যাঁহারা মূলধন ন্যস্ত করিবেন, তাঁহাদের ইহাতে শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে সুদ পোষাইতে পারে। তবে কার্য্যক্ষেত্রে কিছু কম বা বেশীও হইতে পারে। শতকরা ১০।১২ টাকা লাভ কোন রেলওয়ে কোম্পানীই দিতে পারেন না এবং অনেক ব্যবসায়েই এই প্রকার লাভ হইতে পারেনা।

মূলধনের এই লাভ ছাড়া জমীর উর্ব্বরতা, অনাবৃষ্টির সময়ে জমীর সেচ, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থান হইতে আবদ্ধ জল নিকাশ, মৎস্য বৃদ্ধি এবং মাঝি মাল্লাদিগের কার্য্য বৃদ্ধি ইত্যাদি যে সকল মহোপকার সাধিত হইতে পারে, তাহা রেলওয়ে করিয়া বা কোন ব্যবসায় করিয়া সাধিত হইতে পারেনা। দুর্ভিক্ষ হইলে দেশের লোকের অনাহারে যেরূপ ভয়ানক ক্লেশ এমন কি শেষে অনশনে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, তাহা নিবৃত্তির জন্য প্রতি বিধান করা গবর্ণমেণ্টেরও যতদূর কর্ত্তব্য, দেশের প্রধান ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য তাহা অপেক্ষা কম নহে। যে জাতির হৃদয় আছে, যে জাতির হৃদয় আপন দেশীয়বর্গের দুঃখে বিগলিত হয়, সে জাতির দুঃখ থাকিবে কেন? আমরা হিন্দু, আমাদের হৃদয় বড কোমল বলিয়া আমরা পরিচয় দিয়া থাকি, তবে আমাদের তেমন কার্য্য কই?

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত।

পাথুরে কয়লা।

২

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাথুরে কয়লা দেখিতে কুৎসিৎ হইলেও ইহা হইতে আমরা নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কে জানিত যে এই কৃষ্ণবর্ণ কদাকার পদার্থের মধ্যে নয়নরঞ্জন নীল, পীত, লোহিত, হরিৎ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার লুক্কায়িত রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা যে বহুবিধ সুন্দর বর্ণ (Aniline and Alizarine colors) পাথুরে কয়লা হইতে উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তদ্দ্বারা রেশম পশম ও কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রাদি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিস্তৃত ভাবে রঞ্জিত হইতেছে। আবার এই কৃষ্ণবর্ণ কঠিন পদার্থ হইতে প্যারাফিন্ (Parafin) নামক শ্বেতবর্ণ মোমের ন্যায় কোমল এক প্রকার বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধুনা জ্বালাইবার জন্য মোমবাতির ন্যায় এক প্রকার বাতি এই প্যারাফিন হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। কে জানিত যে এই কঠিন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের মধ্যে জল অপেক্ষা লঘু, স্বচ্ছ, বর্ণহীন, সহজ দাহ্য বেন্‌জিন্ (Benzene) নামক তরল পদার্থ নিহিত রহিয়াছে! বেন্‌জিন অধুনা নানাবিধ শিল্পকার্য্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা হইতে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা নানাবিধ রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। নির্গন্ধ পাথুরে কয়লা হইতে যে উগ্র গন্ধযুক্ত এমোনিয়া (Ammonia) নামক অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা কেহ কখনও মনে করে নাই। এমোনিয়া হইতে উৎপন্ন নানাবিধ লবণ শিল্পকার্য্যে ও ঔষধের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এমোনিয়া ঘটিত সমস্ত পদার্থই আমরা পাথুরে কয়লা চোয়াইয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আবার পাথুরে কয়লার মধ্যে চিনি অপেক্ষা মিষ্ট ও শুভ্রতর সাকারিন্ (Sacharine) নামক পদার্থ যে বিদ্যমান আছে, তাহা কখনও কাহারও কল্পনার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই সুমিষ্ট পদার্থ পাথুরে কয়লা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে

নিষিদ্ধ ; চিনির পরিবর্ত্তে সাকারিন্ এই রোগে পথ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কার্ব্বলিক এসিড্ (Carbolic acid), স্যালিসিলিক এসিড্ (Salicyllic acid), স্যালল্ (Salol) এণ্টিফেব্রিন (Antifebrin), এণ্টিপাইরিন (Antipyrin) ফিনাসিটিন্ (Phenacetin) প্রভৃতি যে কত মহোপকারী ঔষধ আমরা পাথুরে কয়লা হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সেই জন্যই পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাথুরে কয়লা কৃষ্ণবর্ণ কদাকার হইলেও উহা নানাবিধ মহৎ গুণের আধার।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল পদার্থের উল্লেখ করা গিয়াছে পাথুরে কয়লা চোয়াইলে তাহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটি রুদ্ধ লৌহপাত্রের মধ্যে পাথুরে কয়লা রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয়। পাত্রের উপরিভাগে একটি মাত্র ছিদ্র থাকে এবং উহাতে লৌহ নির্ম্মিত একটি নল সংযুক্ত থাকে। ঐ নলের অপরমুখ জলপূর্ণ অপর একটি পাত্রের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। পাথুরে কয়লায় উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ তিন প্রকার পদার্থ উৎপাদন করে, যথা—

(১) কোল্‌গ্যাস্ (Coal-gas)—ইহা নলের মধ্য দিয়া দ্বিতীয় পাত্রস্থিত জল হইতে বুদ্বুদাকারে নির্গত হয় এবং প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া বৃহদাকার পাত্রে সঞ্চিত হয় এবং তথা হইতে নল দ্বারা সহরের রাজপথে নীত হইয়া রাত্রিকালে আলোক প্রদান করে।

(২) এমোনিয়া বাষ্প (Ammonia gas)—ইহা দ্বিতীয় পাত্রস্থিত জলের মধ্যে দ্রব হইয়া থাকে; প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা আমরা এই দ্রাবণ হইতে এমোনিয়ার নানাবিধ লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকি।

(৩) কোল্‌টার (Coal-tar) বা আলকাতরা—ইহা দ্বিতীয় পাত্রস্থিত জলের তলদেশে সঞ্চিত হইয়া থাকে; ইহা নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা হইতে বহুবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত হয়।

উত্তাপ সংযোগে পাথুরে কয়লা হইতে এই তিন পদার্থ বহির্গত হইয়া গেলে পর পূর্ব্বোক্ত লৌহপাত্রের মধ্যে যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম কোক্ কয়লা (Coke)। ইহা আমরা রন্ধনের নিমিত্ত ইন্ধন রূপে ব্যবহার করি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাথুরে কয়লা চোয়াইয়া আমরা কোল্‌গ্যাস, এমোনিয়া, আলকাতরা এবং কোক্ কয়লা প্রধানতঃ এই চারিটী পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমরা ক্রমশঃ জানিতে পারিব যে আবার এই আলকাতরাকে চোয়াইলে বহু সংখ্যক শিল্পে ব্যবহার্য্য ও ঔষধোপযোগী দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে পরে বর্ণিত হইবে। পাথুরে কয়লা হইতে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, নিম্নে তাহাদিগের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল। পাথুরে কয়লা হইতে অধঃস্তন সপ্তম পুরুষের নাম ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ এই তালিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে বলা উচিত যে, এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে। বাহুল্য ভয়ে সপ্তমাধিক নিম্নতর পুরুষদিগের পরিচয় এ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইল না।

পাথুরে কয়লা

কোল্‌গ্যাস্ — আলকাতরা — এমোনিয়া — কোক্ কয়লা

লঘু তৈল (Light oil) — গাঢ় তৈল (Heavy or Dead oil) — পিচ

বেন্‌জিন — টলুইন্ — জিলিন্ — আইসোকিউনিন্ — কার্ব্বলিক্ এসিড্ — কুইনোলিন্ — ন্যাপ্থালিন্ — এন্থ্রাসিন

নাইট্রো-বেন্‌জিন্ — সাকারিন্ — ন্যাপ্থল্ — এলিজেরিন্

এনিলিন্ — পিক্রিক্ এসিড্ — স্যালিসিলিক্ এসিড্ — ফিনাসিটিন্ — এলিজেরিন্ রং

এনিলিন্ রং

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পাথুরে কয়লাকে চোয়াইয়া যে জ্বালানি বাষ্প নির্গত হয় তাহার নাম কোল্‌গ্যাস্। বড় বড় সহরের রাস্তায় ও আবাস গৃহে আলোক প্রদানের নিমিত্ত এই বাষ্প প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি গ্যাসের পরিবর্ত্তে তাড়িতালোক অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতেছে—কলিকাতা সহরের হারিসন রোড, হাবড়ার পোল প্রভৃতি এবং সহরের অনেক বড়-লোকের বাটী এক্ষণে তাড়িতালোক দ্বারা আলোকিত।

১৭৯২ খৃঃ অব্দে উইলিয়াম মার্ডক্ (William Murdak) নামক একজন ইংরাজ আলোক প্রদানের নিমিত্ত প্রথমে কোল্‌গ্যাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে বার্মিংহামের নিকট সোলিস্ (Solis) নামক স্থানে একটি কারখানা গ্যাসের আলোক দ্বারা উজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে লণ্ডন নগরের রাজপথ গ্যাসের আলোকে ভূষিত হইয়াছিল এবং ১৮২২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই এইআলোকের প্রচলন হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে কলিকাতা সহরের রাজপথ গুলিকে গ্যাসের আলোকে উজ্জ্বলিত করা হয়।

কেহ কেহ বলেন মিঙ্কেলার (Minckelar) নামক একজন ওলন্দাজ রসায়ন তত্ত্ববিদ্ কোল্‌গ্যাস্ আবিষ্কার করেন।

আমাদের সহরের পূর্ব্বাংশে শিয়ালদহের নিকট কোল্‌গ্যাস্ প্রস্তুত করিবার একটি প্রকাণ্ড কারখানা আছে। ওরিয়েন্টাল্ গ্যাস্ কোম্পানী এই কারখানার স্বত্বাধিকারী। এইস্থানে পাথুরে য়লা চোয়াইয়া যে গ্যাস প্রস্তুত হয় তাহাই হর ও সহরের উপকণ্ঠে আলোক প্রদান করিবার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কার্য্যে যে আলকাতরা ও কোক্‌কয়লা প্রস্তুত হয়, তাহা ইঁহারা বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইঁহারা যদি আলকাতরা হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিস্তর লাভ করিতে পারেন এবং অনেক শ্রমজিবী লোকও এইরূপে প্রতিপালিত হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা তাঁহাদিগের মনোযোগ প্রদানে অনুরোধ করিতেছি। এমন কাতরা ক্রয় করিয়া এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও তাহা লাভের ব্যবসা হইবে বলিয়া মনে হয়।

জর্ম্মাণির একটি কারখানায় শুদ্ধ আলকাতরা হইতে নানাবিধ রং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কারখানায় প্রত্যহ ৫০০০ লোক কার্য্য করে এবং ২৫০ জন রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি এই সকল পদার্থ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এই কারখানায় নিযুক্ত আছেন। ইহাতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে শুদ্ধ আলকাতরা হইতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত করিবার ব্যবসা কতদূর লাভজনক।

পাথুরে কয়লা চোয়াইলে যে এমোনিয়া বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমতঃ জলে দ্রব হইয়া থাকে। এই দ্রাবণের সহিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে এমোনিয়ম্ ক্লোরাইড (নিসাদল) নামক এমোনিয়ার একটি লবণ প্রবণ প্রস্তুত হয়। নিসাদলের সহিত কলিচূণ মিশাইয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে বিশুদ্ধ এমোনিয়া বাষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবক সংযুক্ত হইলে এমোনিয়ার বিবিধ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল লবণ ঔষধ ও শিল্পকার্য্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পাথুরে কয়লা হইতে আমরা আলকাতরা (Coal-tar) প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আলকাতরা একটি মিশ্র পদার্থ অর্থাৎ ইহা অনেক গুলি পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এই সকল পদার্থ একে একে পৃথক্ হইয়া পড়ে। একটি মাত্র ছিদ্রযুক্ত লৌহ নির্ম্মিত রুদ্ধ পাত্রের মধ্যে আলকাতরা রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ ঈষৎ পাটল বর্ণের এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ পৃথক হইয়া আইসে। ইহা জলের উপর ভাসে বলিয়া ইহাকে "লঘু তৈল" (Light-oil) কহে।

এই "লঘুতৈল" পুনরুত্তপ্ত হইলে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বেন্‌জিন্ (Benzene) নামক পদার্থটী সর্ব্ব প্রধান।

বেন্‌জিন একটি বর্ণহীন, তরল পদার্থ; ইহা জল অপেক্ষা লঘু এবং তৈলের ন্যায় জলের সহিত

ইহা একটি উদ্বায়ী (Volatile) পদার্থ অর্থাৎ খোলা পাত্রে রাখিলে শীঘ্র উড়িয়া যায়। রবর, নানাবিধ বৃক্ষনির্য্যাস (Resin) এবং অন্যান্য তৈলময় পদার্থ দ্রব করিবার নিমিত্ত বেন্‌জিন ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহার প্রধান ব্যবহার বহুবিধ এনিলিন্ রং (Aniline colors) প্রস্তুত করিবার জন্য।

এনিলিন্ রং প্রস্তুত করিতে হইলে বেন্‌জিনের সহিত প্রথমতঃ নাইট্রিক্ এসিড্ মিশ্রিত করিতে হয়। এই রূপে বাদামের গন্ধযুক্ত একটি ঘন তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহার নাম নাইট্রোবেন্‌জিন্ (Nitrobenzene); ইহা সাধারণতঃ এসেন্স্ অব্ মারবেণ্ (Essence of Mirbane) নামে পরিচিত। ইহা গন্ধদ্রব্য রূপে নানাবিধ পদার্থের সহিত মিশ্রিত করা হয়। বিস্কুট্, কেক্, ও অন্যান্য বিলাতী খাদ্যদ্রব্যে এবং নানাপ্রকার সাবানে যে আমরা বাদামের গন্ধ পাই, তাহার কারণ এই পদার্থ উহাদিগের সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়া। ইহা অধিক মাত্রায় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে বিষের কার্য্য করে, এজন্য ইহা দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য গন্ধযুক্ত করা উচিত নহে।

নাইট্রোবেনজিনকে এসিটিক্ এসিড্ (Acetic Acid) ও লৌহচূর্ণের সহিত একত্র করিয়া উত্তপ্ত করিলে একপ্রকার বর্ণহীন তৈলাক্ত পদার্থ পৃথক হইয়া পড়ে। ইহার নাম এনিলিন (Aniline)। ইহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন ধাতব পদার্থ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে বহুবিধ বিবিধ বর্ণের রং উৎপন্ন হয়। ম্যাজেণ্টা একটি এনিলিন রং, ইহা দেখিতে সবুজ বর্ণ ও চিক্কণ, কিন্তু জলের সহিত মিশ্রিত হইলে রক্ত বর্ণের দ্রাবণ প্রস্তুত হয়। এনিলিন এবং পার্ক্লোরাইড্ অব্ মর্কারি নামক পারদ ঘটিত লবণ একত্রে উত্তপ্ত করিলে ম্যাজেণ্টা প্রস্তুত হয়। এইরূপে অন্যান্য ধাতব পদার্থের সহিত এনিলিন্ উত্তপ্ত হইলে বহুসংখ্যক বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যত প্রকার রঙ্গিন্ রেশমী বিলাতী ফিতা আমরা দেখিতে পাই তাহারা সমস্তই এনিলিন্ বর্ণে রঞ্জিত। অধুনা এই বর্ণ দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই হইতে উৎপন্ন এলিজেরিন (Alizarin colors) নামক আর এক প্রকার রং বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহার বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।

পূর্ব্বে সাকারিণ (Sacharin) নামক যে সুমিষ্ট পদার্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত "লঘুতৈল" হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা শুভ্রবর্ণ, দানাযুক্ত ও আস্বাদনে অত্যন্ত মিষ্ট; বহুমূত্র রোগে চিনির পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হয়।

শ্রীচুণিলাল বসু।

দোষ শূন্য। শিশু হইতে প্রাপ্তবয়স্ক সকলে নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারে। ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দুর্ব্বলকে সবল করে।

পরিমাণ—প্রাপ্ত বয়স্ক ।০ অর্দ্ধতোলা।

অপ্রাপ্ত ঐ ।০ সিকি তোলা।

প্রয়োগ ব্যবস্থা।

প্রতিদিন প্রাতে একবার অল্প পরিমাণে দুগ্ধের মধ্যে পরিমাণানুরূপ ঘৃত নিক্ষেপ করতঃ অল্প মিছবি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

পথ্য—ভাত, রুটি, তাজা মাংস ও জীবন্ত মৎসের ঝোল প্রভৃতি। সাধারণতঃ আশুজীনকর দ্রব্যই পথ্য।

নিষিদ্ধ—অম্ল, অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন এবং সর্ব্বপ্রকার অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যই নিষেধ।

মূল্য—একমসের উপযোগী—৪৲ চারি টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

গঙ্গাপ্রসাদ তৈল।

বাতরোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

এই সুপরীক্ষিত তৈলটী আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে গেঁটে বাত, চলতি বাত রসবাত, শোথ, পতন জনত বাত, পাদগণ্ডির, কোমরের বাত, ঐকাঙ্গিন বাত, ফিক বেদনা, সন্ধিস্থল ফুলা, হৃদপিণ্ডের বেদনা প্রভৃতি যে কারণে যে প্রকার বাত বেদনা হউক না কেন এই তৈল মালিসে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। অনেক শয্যাগত বাতগ্রস্ত রোগীকে, এই তৈল ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

মালিসের ব্যবস্থা—এই তৈল অল্প পরিমাণে হস্তে লইয়া অনুলোম দিলে আস্তে আস্তে মালিস করিবে। মালিসকারির তৈল সিক্ত হস্ত মাঝে মাঝে অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া লওয়া উচিত। এইরূপে প্রাতে ও বৈকালে দুইবার মালিস প্রয়োজন।

পথ্য—রুটি, তরিতরকারী, দুগ্ধ প্রভৃতি। নিষিদ্ধ—অম্ল, দধি, কলায়ের ডাইল প্রভৃতি। সাবধান—কোন প্রকার ঠাণ্ডা না লাগে। মূল্য ৪ আউন্স শিশি ৪৲ চারি টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

গঙ্গাপ্রসাদ সালসা।

অথবা

দূষিত শোণিত সংশোধক।

এই সালসাটী দূষিত রক্ত পরিষ্কার এবং বলাধানের পক্ষে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা উপদংশ পারদ জনিত সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ, সর্ব্বপ্রকার বাত, শ্লেষ্মা, সর্দ্দি, শ্বাস, কাশ, গণ্ডমালা, দদ্রু, বিস্ফোটক, উরুস্তম্ভ, ব্রণ প্রভৃতি দূষিত রক্ত হইতে উৎপন্ন যাবতীয় রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে। ইহা সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং দুর্ব্বলকে বলশালী করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গার্হস্থ্য আশ্রমবাসীর পারিবারিক অবশ্যম্ভাবী ব্যাধি সমূহের এইটী নিয়ত প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহা ধীশক্তি সম্পন্ন ভিষকগণ কর্ত্তৃক দূষিত শোণিতের বিশুদ্ধি করণে উপযুক্ত ভেষজ বলিয়া অনুমোদিত। অত্যাশ্চর্য্য আরোগ্যকরী ক্ষমতা বিদ্যমান থাকাতে ইহা আবিষ্ক্রিয়ার সময় হইতে অদ্যাপি সমভাবে অব্যর্থ ঋষিবাক্য সদৃশ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহা শরীরের বলাধান ও পরিবর্ত্তন সাধন করে। ম্রিয়মাণ যুবকের স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধন ও হীনবীর্য্য নিস্তেজ বৃদ্ধকে বীর্য্যমান ও সবল করিতে ইহার তুল্য সালসা ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কার হয় নাই। ইহা সুবিশাল ভারতবর্ষের প্রতি জনপদ, নগর, গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীবাসী সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি ও সুখ সচ্ছন্দতা প্রদান করিয়াছে।

ব্যবস্থা। প্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে ১ দাগ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে অর্দ্ধ দাগ; দিবসে দুইবার সেবনীয়। অর্থাৎ প্রাতে ও বৈকালে।

পথ্য—রুটি ভাত, মাখম, ঘৃত, মাংস, মৎস্যের ঝোল এবং অন্যান্য বলকারক খাদ্যই সুপথ্য।

মূল্য—১৫ দিনের উপযোগী একটী আট আউন্স শিশির মূল্য ১৷০ দেড় টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কমলা

মাঘ, ১৩১০] [১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কমলার পরিচালকগণ শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি সম্বন্ধে কাগজ লিখিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। যাহাতে কার্য্যতঃ ঐ সকলের শ্রীবৃদ্ধি হয় তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ উদ্যোগী। সেজন্য তাঁহারা কমলার পাঠকবর্গকে তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতে সাদর আহ্বান করিতেছেন।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীগণ সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে অনেক সহায়তা পাইতে পারিবেন।

শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ে যদি কেহ নূতন কোন পন্থা বাহির করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সম্পাদককে জানাইলে তদ্বিষয়ে যথা সাধ্য সাহায্য পাইতে পারিবেন।

ঐ সম্বন্ধে যদি কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে লিখিলে তাহাদের প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর এই পত্রে প্রকাশিত হইবে।

নানা প্রসঙ্গ।

ভারতে শ্রম শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা দুই ভলমে হেষ্টিংস ষ্ট্রীট গবর্ণমেণ্ট ছাপাখানা হইতে বাহির হইয়াছে।

* * *

মেসার্স উইলিয়ম ওয়াটসন কোংর বেঙ্ক ফেল হইয়াছে। লণ্ডন, বোম্বাই, কলিকাতা, করাচি, কেপটাউন এবং ডরবানে তাহাদের কারবার ছিল।

ঢাকা বিভাগের দৌলখাঁতে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিবার কল্পনা হইতেছে।

* * *

গয়াজেলায় চাটকুড়িয়া নামে গবর্মেণ্টের একটি মহাল আছে। সেখানে অভ্র পাওয়া যায়। গবর্মেণ্ট সেখানে অভ্র খনির লাইসেন্স দিয়াছেন। শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ হইবে।

* * *

বাঙ্গালার কৃষিবিভাগ কিছুদিন পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া হইতে আঙ্গুর বীজ আনাইয়াছিলেন। দার্জিলিং ডিষ্ট্রিক্টে ঐ বীজের পরীক্ষা হইতেছে।

* * *

উড়িষ্যার অন্তর্গত তালচেরের রাজা নিজ তালুকে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। নরসিংপুর এবং পাল লহরা ষ্টেটেও দুইটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। নরসিংপুরে গো-বংশের বৃদ্ধি ও উন্নতিপক্ষেও সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

* * *

মহীশূরের প্লাণ্টারগণ কাফির চাষে আর তেমন লাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা সম্প্রতি রবার বৃক্ষের চাষে মন দিয়াছেন। মহীশূরের গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সহায়তা করিতেছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্টের নর্শারি হইতে রবারের চারা পাওয়া যায়।

* * *

১৯০৩ সালের নভেম্বর মাসে ১০৯৪৮১২১ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও ১৩০৭০৪৮২ টাকা মূল্যের রৌপ্য ভারতে আমদানী হইয়াছে। ঐ মাসে টাকশালে ১৫৫৭৩০৪৬ টাকা প্রস্তুত হইয়াছে।

* * *

এ বৎসর আফিম বিক্রয় দ্বারা ও সরকারী রেল সমূহ হইতে গবর্ণমেণ্টের এত অধিক অর্জ্জন হইয়াছে যে, লবণের শুল্ক হ্রাস ও আয় করোপযোগী আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় ঐ দুই বিভাগের আয় পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অল্প হইলেও গবর্ণমেণ্টের হাতে অনেক টাকা মজুত থাকিবে।

* * *

চব্বিশ পরগণার মাতলা গ্রামে ২০ জন লোক লবণ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করার অপরাধে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হয়। তাহাদের ২০০ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

সাতান গাছির কয়েক জন লোক ধানিমদ চোলাই করিয়া বিক্রয় করিয়াছিল এই অপরাধে তাহাদের ১০০ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

* * *

অষ্ট্রেলিয়া হইতে কাঁচা মাংস বরফ পূর্ণ জাহাজে করিয়া ইউরোপে লইয়া যাওয়া হয়। এই ব্যবসায়ে অষ্ট্রেলিয়াবাসীদিগের বিলক্ষণ দুপয়সা লাভ থাকে। সম্প্রতি নূতন কতকগুলি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া চায়না জাপানের সহিত এই কারবার স্থাপনের চেষ্টায় আছেন।

* * *

যোগ বিয়োগ রসায়ন শাস্ত্রের কার্য্য। কোন পদার্থ কি উপাদানে গঠিত তাহা নির্ণয় করা এবং ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সংযোগে নূতন পদার্থের সৃষ্টি করা ইহার উদ্দেশ্য। রসায়নের কৃপায় আজিকালি কত নূতন ও অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

* * *

স্বভাবজাত পদার্থ সমূহ যে যে উপাদানে গঠিত তাহা বিশ্লেষণ করা সহজ. কিন্তু সেই সেই উপাদান লইয়া স্বভাবজাত কোন পদার্থ কৃত্রিম প্রস্তুতকরা তত সহজ নহে। তবে দিন দিন রসায়ন শাস্ত্রের যেরূপ উৎকর্ষ হইতেছে তাহাতে ভবিষাতে রাসায়নিকের কারখানায় অনেক স্বাভাবিক পদার্থই কৃত্রিম তৈয়ারি হইবে। ভবিষ্যতে একদিন মানুষের খাদ্যও যে ক্ষেত্রে উৎপন্ন না হইয়া রাসায়নিকের কারখানায় প্রস্তুত হইবে এরূপ কল্পনা করা নিতান্ত বাতুলতা নহে। শিল্প বিষয়ে রসায়ন অনেকদুর অগ্রসর হইয়াছে।

* * *

রসায়ন কৃত্রিম উপায়ে হাতীর দাঁত প্রস্তুত করিয়াছে। কৃত্রিম নীল আমাদের নীলকে বাজার হইতে তাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। আবার সম্প্রতি কৃত্রিম কর্পূর বাহির হইয়াছে। আমেরিকায় নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত পোর্ট চেষ্টার নামক স্থানে কৃত্রিম কর্পূর প্রস্তুত হইতেছে। তার্পিণ তৈল হইতে এই কর্পূর তৈয়ারী হয়।

* * *

তার্পিণ তৈলে যে যে উপাদান আছে কর্পূরেও তাহা, অধিকন্তু অক্সিজেন আছে। তার্পিণ হইতে শতকরা ২৭ ভাগ কর্পূর উৎপন্ন হয়। আসল কর্পূরে ও নকল কর্পূরে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। নকলের দর আসল অপেক্ষা অনেক সস্তা।

* * *

আসল কর্পূর একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ফর্ম্মোসা দ্বীপে এই বৃক্ষ পর্য্যাপ্ত জন্মে। তথা হইতে কর্পূর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত।

* * *

এ অঞ্চলে কাশীপুরে বিলাতী ধরণে চিনি প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা আছে। সেটি অবশ্য সাহেবদিগের। উত্তর পশ্চিমের কাণপুরেও ঐরূপ একটী চিনির কারখানা আছে। ঐ কারখানার নাম Cawnpore Sugar Works. কোম্পানির লাভ বেশ হইতেছে। এই কারখানাও সাহেবদিগের।

* * *

সাহেবেরা চিনির কারখানা করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। ইঁহারা আকের চাষেও মন দিয়াছেন। স্থানে স্থানে চাষ আরম্ভ করিয়া ছেন শুনিতে পাওয়া যায়। কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হওয়ায় নীলে ব্যবসায় ক্রমশঃ মাটি হইতে চলিল, সে জন্য নীলের পরিবর্তে আকের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে তাঁহাদের সহায়তা করিবেন বোধ হয়।

* * *

সরকারী গণনা অনুসারে বাঙ্গালা দেশে প্রায় ২৪ লক্ষ বিঘা আকের চাষ এবং প্রতিবৎসর ২ কোটি ৪৬॥০ লক্ষ মণ গুড় ইক্ষু হইতে প্রস্তুত হয়। ইক্ষু ছাড়া খেজুর তাল প্রভৃতির গুড় বৎসরে প্রায় ৪৩॥০ লক্ষ মণ উৎপন্ন হয়। গুড় ও চিনি এদেশে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ। সুতরাং ইহার ব্যবসার সীমা নাই কিন্তু সাহেবদের প্রতিযোগিতা দাঁড়াইলে দেশের লোককে জাল গুটাইতে হইবে। অতএব দেশের লোকের এইবেলা চৈতন্য হওয়া উচিত।

* * *

অভ্রের কার্য্য এতদিন ভারত বর্ষেরই একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল কিন্তু এক্ষণে আমেরিকা এই ব্যবসায়ে প্রবল প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইতেছে। উত্তর আমেরিকার কানাডা এবং ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে অভ্রউৎপন্ন হইতেছে, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে বিস্তৃত অভ্রক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং ভারতে আর একচেটিয়া থাকে না।

* * *

সাঁওতাল পরগণায় এবং ছোটনাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ ডিষ্ট্রিক্টে বিস্তর অভ্রের খনি আছে। অনেকগুলি সাহেব কোম্পানির এবং কএকটি দেশীয় লোকের অভ্রের কারবার আছে। মান্দ্রাজের অন্তর্গত ভেল্লোর ডিষ্ট্রিক্টেও অভ্র উৎপন্ন হয়। এই স্থানের অভ্রই আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

* * *

কানাডা এবং ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে যে অভ্র জন্মে তাহা বাজারে কাটতি অপেক্ষা পরিমাণে কম, সুতরাং এখনও ঐ স্থানে বিদেশী অভ্রের আমদানী বন্ধ হয় নাই। কিন্তু বিদেশী অভ্রের উপর অধিক শুল্ক বসাইয়া বিদেশী অভ্রের আমদানী বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। ব্রেজিলে অভ্র অপর্য্যাপ্ত জন্মিতেছে, উহার রং লাল, এবং উহা স্বল্পায়াসে পাওয়া যায়।

* * *

নিউইয়র্ক এবং লণ্ডন নগরে প্রতিবর্ষে প্রভূত পরিমাণে অভ্রের কাটতি আছে। ঐ দুইটী স্থানই জগতের মধ্যে অভ্র বিক্রয়ের প্রধান আড্ডা। বিগত ১৯০০ সালে ১৭০০ টন অভ্র বিলাতে চালান যায়। তাহার মূল্য ১৭৫,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ইহার অর্দ্ধেক বাঙ্গালা হইতে এবং প্রায় অর্দ্ধেক মান্দ্রাজ হইতে রপ্তানী হয়। ইউনাইটেড ষ্টেটস হইতেও অনেক অভ্র বিলাতে আইসে, লণ্ডন নগরে উহার অধিকাংশ বিক্রীত হয়, অবশিষ্ট যাহা পড়িয়া থাকে পুনরায় তাহা নিউইয়র্কে ফিরিয়া যায়।

* * *

ভারতবর্ষের মধ্যে দিল্লী এবং পাটনায় অলঙ্কারের জন্য অভ্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় চুল্লীর গবাক্ষ প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার বহুল ব্যবহার আছে।

ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে কাচের চিমনি ফাটিয়া যায়, কিন্তু অভ্রের চিমনিতে সে ভয় নাই, এই নিমিত্ত ইউরোপের অনেক স্থানে অভ্রের চিমনি ব্যবহার হয়। বৈদ্যুতিক কার্য্যাবলী সম্পাদনের জন্য, দর্পণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, ইহার প্রয়োগ যথেষ্ট। এতদ্ব্যতীত ইহা ডাইনামাইটের ন্যায় "মাইকা পাউডার" (Mica powder) নামক একপ্রকার বারুদ প্রস্তুতের একটা প্রধান উপকরণ।

* * *

বাঙ্গালোর সহরে সুপ্রসিদ্ধ টাটা মহোদয়ের একটি রেসমের কুঠী আছে। তাহাতে জাপানী প্রথায় রেসম প্রস্তুত করিবার পরীক্ষা হইতেছে। পরীক্ষা সফলও হইয়াছে। এই প্রথায় প্রস্তুত রেসম এক বস্তা বিলাতে চালান গিয়াছে। সেখানে ইহার দর প্রতি পাউণ্ডে (॥০ সের) ১৩ টাকা পাওয়া গিয়াছে। সচরাচর দেশী প্রণালীতে প্রস্তুত রেসমের দর ৫।৬ টাকা। যাঁহাদের রেসমের ব্যবসা আছে এবিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি করা উচিত।

* * *

আহম্মদাবাদ, ধারওয়াড় এবং সিন্ধুদেশের অন্তর্গত হায়দারাবাদ অঞ্চলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে কৃষিশিক্ষা দিবার জন্য কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ সকল অঞ্চলের কৃষিশিক্ষকেরা ঐ সকল বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু হাতে কলমে শিক্ষা না করায় তাঁহাদিগের শিক্ষাদানে ততটা সুবিধা হয় না এবং ছাত্রেরাও সকল কথা ভালরূপে বুঝিতে পারে না। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত ঐ সকল কৃষিশিক্ষাবিদ্যালয়ের সহিত এক একটী ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র যোগ করিয়া দিবার কথা হইতেছে। ঐ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা হাতে কলমে কৃষিকার্য্য শিক্ষা ও পরীক্ষা করিয়া ছাত্রবর্গকে তাহা শিক্ষা দিতে পারিবেন।

* * *

উপায়টী নবোদ্ভাবিত না হইলেও এ দেশে নূতন তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপ কৃষিকার্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত কৃষিবিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটু করিয়া জমিতে কৃষিকার্য্যের পরীক্ষা হইলে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। কোন্ জমীতে কিরূপ সার দিলে কোন্ শস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, জমি ক্রমশঃ অনুর্ব্বর হইয়া গেলে, অথবা একেবারে অনুর্ব্বর থাকিলে কিরূপ কৌশলে তাহাকে উর্ব্বর করিতে হয়, ইত্যাদি কৃষিকার্য্যের অত্যাবশ্যক প্রণালীগুলি কেবল মৌখিক শিক্ষায় অধিক পরিমাণে কার্য্যকর হয় না. সঙ্গে সঙ্গে জমিতে তাহার পরীক্ষা না হইলে কি শিক্ষক, কি ছাত্র সকলকেই কার্য্যের সময় অনেক স্থানে বিফলমনোরথ হইতে হয়।

* * *

বিলাতে বা অন্যান্য স্থানে এইরূপ পরীক্ষার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র প্রায় অধিকাংশ কৃষিবিদ্যালয়ের সহিত প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাতে ঐ সকল অঞ্চলের ছাত্র ও শিক্ষকবর্গ শিক্ষাগ্রহণ বা শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকলের পরীক্ষা করিবার সুবিধা পান, তাঁহাদিগের শিক্ষাও কার্য্যকরী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, কৃষিপ্রধান দেশ, অথচ উন্নত প্রণালীতে কৃষিশিক্ষার নিমিত্ত এখানে বিশেষ কোন বন্দোবস্ত দেখা যায় না। এক শিবপুরে সরকারি বিদ্যালয়ের সহিত কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্র আছে। তদ্ব্যতীত কুত্রাপি কৃষিশিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয়ও নাই। বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, হাতুয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে পরীক্ষাক্ষেত্র আছে বটে কিন্তু সেখানে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত নাই। এদিকে দেশের কৃষককুল চিরপ্রচলিত প্রণালী অনুসারে কৃষি কার্য্য সম্পাদন করাই সুবিধাজনক মনে করে। আবহমান প্রচলিত প্রথা ব্যতীত কোন প্রকার উন্নত প্রণালীতে চাষ করিতে পারা যায়, এদেশের কৃষকদিগের নিকট একথা উত্থাপন করিলে বরং বিদ্রূপ হইতে হয়।

* * *

এ অবস্থায় কৃষককুলের হস্তে সমস্ত কৃষিকার্য্যের ভার নির্ভর করিলে চলিবে না। যাহাতে কৃষক কুলের মধ্যে ক্রমে ক্রমে উন্নত প্রথানুসারে কৃষিকার্য্য শিক্ষার বিস্তার হয়, অচিরাৎ এরূপ ব্যবস্থা না করিলে কিছুতেই দেশের হাহাকার ঘুচিবেনা। এখন যাহাতে অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার উপায় শিক্ষা না করিলে ক্রমে জমির জমা এবং জনের মজুরী যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে অল্পদিনের মধ্যে আর কাহাকেও কৃষিকার্য্যে লাভবান হইতে হইবে না।

* * *

অনেকস্থলে কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিয়া বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারে না। তাহাদের কৃষিক্ষেত্রে যে সকল ফসল উৎপন্ন হয় তাহাতে জমীদারের খাজনা, মহাজনের দেনা বাদে অনেকের সমস্ত বৎসরের স্বচ্ছন্দে আহারোপযোগী ফসল থাকে না। বৎসরের কয়েক দিন ব্যতীত অনেকের যে হাহাকার সেই হাহাকার থাকিয়া যায়। কাজেই তাহারা বাধ্য হইয়া জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করে। যদি দেশের অব্যবহিত দূরে চটকল প্রভৃতি থাকে, তবে কৃষকতনয় লাঙ্গল ছাড়িয়া কুলিগিরি করিয়া সংসার প্রতিপালন করে। এই সকল কারণে লোকজনের অভাবে বঙ্গের অনেক স্থানেই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করা ক্রমশঃ বড়ই অসুবিধাজনক হইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থায় উন্নত প্রণালীতে কৃষি শিক্ষার দ্বারা অল্প জমিতে অধিক শস্য উৎপাদন প্রণালী শিক্ষার বহুল প্রচার ব্যতীত উপায় নাই। কি জমিদার, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র, শস্যোৎপত্তির উপর সকলেরই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবন যাপন ব্যাপার নির্ভর করে। সুতরাং আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবেনা।

* * *

বাবু রমাকান্ত রায়ের সহিত আমাদের পাঠকবর্গ পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত আছেন। খনির বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি জাপানেই কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুরা তাঁহাকে দেশে আসিবার কথা লিখিলে তিনি প্রত্যুত্তর করিতেন যে তিনি দেশে আসিলে হয়ত উপযুক্ত চাকরী পাইবেন না। কথাটার মধ্যে যে একেবারে সত্যের অংশ নাই এ কথা আমরা বলি না। "গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না" কথাটা আমাদের দেশ সম্বন্ধে যতদূর প্রযুক্ত অন্য দেশ সম্বন্ধে ততটা নয়। যাহা হউক আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি

যে রমাকান্ত বাবু দেশে আসিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই উপযুক্ত চাকরী পাইয়াছেন। কাশ্মীর রাজ্যে এক জন খনি-বিশারদের প্রয়োজন হয়। অনেক সাহেব সুবাও দরখাস্ত করিয়াছিলেন। গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া কাশ্মীররাজ রমাকান্ত বাবুকেই নির্ব্বাচন করিয়াছেন। শ্বেতকৃষ্ণের ভেদাভেদ না করিয়া কাশ্মীর রাজ যে গুণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে সবিশেষ ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। আমাদের খুব আশা আছে রমাকান্ত গুণে কাশ্মীরের খনিজ পদার্থ সমূহে যুগান্তর আনয়ন করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

* * *

এই প্রসঙ্গে আমাদের বাঙ্গলায় দুই এক জন ধনী ব্যক্তিকে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কি রমাকান্ত বাবুকে দেশের মধ্যে রাখিতে পারিতেন না? মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর সিয়ারসোলের কুমার বাহাদুর, রায় শ্রীনাথ পাল ইঁহাদের প্রত্যেকেরই বিস্তৃত কয়লার খনি আছে। ইচ্ছা করিলে ইঁহাদের যে কেহ রমাকান্ত বাবুকে দেশের একটা উপযুক্ত কাজ দিতে পারিতেন। কয়লার ব্যবসায় অবস্থা বর্ত্তমানে তত লাভ জনক নহে। জাপানী কয়লার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙ্গালার কয়লা মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি বাজার হইতে অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে এবং সেই জন্যই বাঙ্গলায় কয়লার ব্যবসায়ের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শোচনীয় হইয়াছে। রমাকান্ত বাবু জাপানপ্রত্যাগত, সম্ভবতঃ তথাকার কয়লার বিষয়ে অনেক তত্ত্ব তিনি অবগত আছেন। বাঙ্গালার কয়লার খনিতে কোন কাজের সুবিধা পাইলে তিনি বাঙ্গলার এই বিস্তৃত ব্যবসায়ের যাহাতে ক্রমোন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিবার অবসর পাইতেন। কয়লার খনির নিকট অনেক স্থলে লৌহের আকর থাকে। আমরা জানি না রাণীগঞ্জ অঞ্চলে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না। আমরা যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে না হওয়ারই সম্ভব। কেন না তাহা হইলে বেঙ্গল আইরন ও ষ্টীল কোম্পানি বরাকরে অবস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। যাহা হউক ইহা স্থির যে রমাকান্ত বাবুর ন্যায় খনিতত্ত্বজ্ঞ দেশে থাকিলে এই সকল বিষয়ে দেশের অনেক উপকার হইত।

* * *

লণ্ডনের এক দোকানে সেদিন এক খান দুই আনা দামের হরিদ্বর্ণ মরিসস ডাক টিকিট (১৮৪৭ সালের) ১৪৫০ পৌণ্ড (২১৭৫০ টাকায়) বিক্রয় হইয়াছে। শুনা যায় সে টিকিটখানি যুবরাজের ভাণ্ডারে স্থান পাইবে—হামষ্টেড বাসী এক ভদ্রলোক বাল্যকালে কতকগুলি টিকিট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অল্পদিন হইল তাহারই মধ্যে ঐ খানি তিনি দেখিতে পান। ঐ রূপ আরও ৪।৫ খানি টিকিট আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার একখানি ১১৯০ পৌণ্ড মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। "রাখে রাখি সেই রাখে"।

* * *

পুরাতন ডাক টিকিট সংগ্রহ করা সাহেবদের একটা সখ। কেবল পুরাতন নহে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন আকারের বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন মূল্যের ডাক টিকিট সংগ্রহ করিয়া মোটা পুরু কাগজে আঁটিয়া রাখিতে অনেক বড় বড় সাহেবের আগ্রহ দেখা যায়। এইরূপ সংগৃহীত টিকিটের আসল মূল্য বেশী না হইলেও সংগৃহীত টিকিট মালার মূল্য এক এক সময়ে অত্যন্ত অধিক হয়। এত অধিক যে সহজে বিশ্বাস করা যায় না। টিকিট ডাকে ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত হউক তাহাতে বড় আসিয়া যায় না।

* * *

পুরাতন টিকিটের সংগ্রাহকও সময়ে সময়ে বহুবায় হয়। যাহারা অত্যধিক সংগ্রহ করিয়া রাখে তাহারা সময়ে সময়ে সাহেবদের নিকট আশাতিরিক্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় করে।

* * *

সকল সভ্য দেশেই ডাক টিকিটের ব্যবহার আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি মহাদেশের—ও অন্যান্য উপনিবেশের প্রচলিত টিকিট কত প্রকারের আছে তাহার সংখ্যা নাই। যাঁহারা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকেন মনে করিলে সময়ে সময়ে ২৪ খান ভিন্ন প্রকারের বাবহৃত টিকিট সংগ্রহ করিতে পারেন। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সহিতই ভারতের সংস্রব হইয়াছে সুতরাং সর্ব্ব দেশের সংবাদ পত্র, ও চিঠি পত্র ভারতে নিত্য আসিতেছে। ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা থাকিলে সর্ব্ব প্রকারের টিকিট সংগ্রহ করা যায়। এবং অতি পুরাতন টিকিট ও পাওয়া যাইতে পারে। কলিকাতায় এইরূপ ডাক টিকিটের কয়েকটি দোকান আছে। অল্প মূলধনে এ একটা ব্যবসায় মন্দ নহে। তবে সংগ্রহ করার জন্য আগ্রহ ও যত্ন চাই।

* * *

ইতালী দেশীয় এক বৈজ্ঞানিক বলেন যে নগর মধ্যে তাড়িত বলে ট্রাম গাড়ী চলিলে নগরের বায়ু শোধন হয়। লাইনের ঊর্দ্ধস্থিত তারে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। গাড়ীর চাকাতে ও বিদ্যুৎ সংঘর্ষে স্ফুলিঙ্গ উদগম হয়। সেই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বায়ুস্থিত অক্সিজেনকে ওজোন পদার্থে পরিণত করে। ওজোন পদার্থের দোষ নিবারণী ও বিশোধীকরণী শক্তি আছে। যে পরিমাণে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় বায়ু বিশোধনের পক্ষে তাহা প্রচুর, বিশেষতঃ যে সকল লাইন সংকীর্ণ পথ দিয়া গিয়াছে তাহাতে ইহার ফল আরও সন্তোষজনক।

* * *

অমৃতসরের 'অমৃতসর কটন মিল কোংর" বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত কোম্পানির ডিরেক্টরগণ ১৯০৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর যে বৎসরের শেষ হইল অর্থাৎ ১৯০৩ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানির খরচ খরচা বাদে নিট ৬০,৬৬৭।৩ সাইট হাজার ছয়শত সাতষট্টি টাকা চারি আনা তিন পাই লাভ হইয়াছে।

* * *

এই কোম্পানির মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা, এক শত টাকা করিয়া পাঁচ হাজার অংশে বিভক্ত। এ বৎসর অংশীদারগণ প্রত্যেকে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ সাত টাকা আট আনা হিসাবে লাভ পাইয়াছেন। মিলের কাজ ভালই চলিতেছে। শ্রীযুক্ত ভগবান সিংহ সভাপতি। এই মিল খাঁটী দেশীয় লোক দ্বারা

পরিচালিত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনা করি।

* * *

রুষের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধারম্ভ এই মাসের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা। ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের দ্বিপ্রহর নিশীথে জাপান পোর্ট আর্থর সম্মুখে জলযুদ্ধে রুষিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। এই যে আগুন জ্বলিল তাহা কতদিনে এবং কোথায় গিয়া নিবিবে তাহা ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত।

* * *

রাজনীতি আমাদের পত্রিকার আলোচ্য নহে। যুদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধীয় বিবরণ বিবৃতকরা আমাদের বিষয়ের বহির্ভূত, পাঠকগণ দৈনিক পত্র সমূহে তাহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। কিন্তু একটা বিষয়ে পাঠক গণকে লক্ষ্য রাখিতে বলি। পাঠক বর্গ দেখিবেন এখনকার যুদ্ধ প্রণালী সেকালের যুদ্ধ প্রণালী অপেক্ষা কত বিভিন্ন।

* * *

এখন গায়ের জোরে যুদ্ধ হয় না। এখন শিল্প বিজ্ঞানের জোরে যুদ্ধ চলে। এখনকার যুদ্ধের উপকরণ কালান্তক কলের বন্দুক কামান, বিবিধপ্রকার ধুমহীন বারুদ; নূতন আকারের গোলাগুলি, রেলওয়ে, তারহীন টেলিগ্রাফ, ভীমকায় লৌহ পোত, সর্ব্বনেশে টর্পিডো বোট ইত্যাদি ইত্যাদি কত বর্ণনা করিব। আর সকলের মূল টাকা। এখন যুদ্ধের অর্থ বিজ্ঞানের যুদ্ধ, শিল্পের যুদ্ধ, টাকার যুদ্ধ আর organising faculty র যুদ্ধ (ইহার বাঙ্গালা কি করিব—দল এবং শৃঙ্খলা বাঁধিবার শক্তির যুদ্ধ?) পাঠক দেখিবেন, শিল্প বিজ্ঞানে কোন জাতি পিছাইয়া পড়িলে এখন জগতে তাহার অস্তিত্ব লোপ হইবে।

* * *

জাপান যে হঠাৎ একটা প্রথম শ্রেণীর ইয়ুরোপীয় শক্তির সহিত বল পরীক্ষায় সাহসী হইবে, দুইদিন পূর্ব্বে একথা কেহ ভাবে নাই। কিন্তু এখন জাপানের পূর্ণ গৌরব জগতের সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে বিভাসিত হইয়াছে। আজ সমস্ত জগৎ জাপানের শিল্প বিজ্ঞান কৌশল, ক্ষিপ্র কারিতায়, কার্য্য কারিতায় মুগ্ধ, বিস্মিত। আজ ৩০ বৎসর হইল জাপানের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে। জাপান দেখিয়াছে বুঝিয়াছে আধুনিক শিল্প বিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষার সাধনা করিতে না পারিলে জগতে অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে. জাপান তাই এই কয়েক বৎসর ধরিয়া নীরব কঠোর সাধনা করিয়াছে। সাধনার পর সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে পা বাড়াইয়াছে। উহার অস্তিত্ব অনস্তিত্বের বিষম পরীক্ষা উপস্থিত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে জাপানের জয় কামনা করি।

শিল্প শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট একটী সদনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন। এতদিন পরে গবর্ণমেণ্ট দেখিতে পাইয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য সভ্য দেশগুলি শিল্পোন্নতি বিষয়ে ভারতবর্ষকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়াছে। শিল্প বাণিজ্য কৃষির উন্নতি না হইলে কিছুতেই ভারতের দরিদ্রতা ঘুচিবে না। উপর্য্যুপরি কয়েকটী দুর্ভিক্ষে বিগত দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের অনশনে প্রাণত্যাগ সত্ত্বেও এতদিন যে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু উন্মীলন হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। যাহা হউক ইংরাজীতে বলে "Better late than never" অর্থাৎ কোন কার্য্য একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বরং বিলম্বে হওয়া ভাল। এবং সেই জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ ইহাতে কিরূপ লাভবান্ হন কার্য্যক্ষেত্রে তাহা দেখা যাইবে।

উদ্দেশ্য—যাহাতে ভারতবর্ষের লোক উচ্চতর শিল্প বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা বর্ত্তমান দেশজ ব্যবসা-গুলির শ্রীবৃদ্ধি, অথবা সম্ভবপর হইলে নূতন ব্যবসার সৃষ্টি ও তাহার উন্নতি সাধন করিতে পারে. তাহার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ পরীক্ষা স্বরূপ অল্প কতকগুলি শিল্পবৃত্তি প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। ভবিষ্যতে কর্ম্মিষ্ঠ হইতে পারেন এরূপ উপযুক্ত শিক্ষার্থী পাইলে গবর্ণমেণ্ট এই বৃত্তি প্রদান করিবেন; যাহাকে তাহাকে এই বৃত্তি প্রদান করা হইবে না। শিক্ষার্থী যে বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন তাহাতে তিনি যে পূর্ব্বেই সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহা দেখাইতে হইবে।

বৃত্তির মূল্য—প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২২৫০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করা হইবে। ইহা ভিন্ন তাঁহার যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় ও বিদ্যালয়ের মাহিনা গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। প্রয়োজন মনে করিলে স্থলবিশেষে গবর্ণমেণ্ট উপর্য্যুক্ত বৃত্তির টাকার পরিমাণ কিছু বাড়াইতে পারেন।

কোথায় এবং কতদিন বৃত্তি দেওয়া হইবে।—সাধারণতঃ প্রত্যেক বৃত্তি দুই বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। প্রয়োজন বোধে স্থলবিশেষে এই সময়ের হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

গ্রেটব্রিটেন অর্থাৎ ইংলণ্ড স্কটলণ্ড আয়র্লণ্ড ওয়েলসের যে কোন স্থানে, অথবা ইউরোপ বা

আমেরিকার যে কোন দেশে থাকিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভের প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাকে সেই খানেই থাকিতে দেওয়া হইবে; এবং যে দিন তিনি ঐ দেশে উপস্থিত হইবেন সেই দিন হইতে তাঁহার বৃত্তি আরম্ভ হইল।

শিক্ষার বিষয়—আইন, পশুচিকিৎসা, কৃষি, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যবহারিক-বিদ্যা-শিক্ষার্থী এই বৃত্তি ভোগ করিতে পারিবে। বাঙ্গলায় যে সকল খনিজ দ্রব্য আছে, তাহাদের ব্যবসার উৎকর্ষ সাধন এই বৃত্তি প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য; এবং তদ্রূপ প্রয়োজনীয় কোন কার্য্যের সাহায্য এবং উন্নতির জন্যও এই বৃত্তি প্রদত্ত হইতে পারিবে।

সকল ব্যবসায়ে দেশীয় লোক সকল লিপ্ত আছেন অথবা ভবিষ্যতে যে সকল ব্যবসা তাঁহাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা, শিক্ষার জন্য সেই সকল বিষয় মনোনীত করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিবেচনার কাজ হইবে; কেননা তাহা হইলে শিক্ষিতব্যক্তি স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর তাহার কার্য্যকুশলতা ও ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র সহজেই পাইতে পারিবেন।

বৃত্তি প্রাপ্তির উপযোগিতা—আইন মতে যাঁহারা ভারতজাত বলিয়া গণ্য তাঁহারাই কেবল এই বৃত্তি পাইবার অধিকারী। ইংরাজী ভাষায় সম্যক্ জ্ঞান, অথবা যে দেশে শিক্ষালাভের বাসনা করেন সেই দেশের ভাষায় সম্যক্ জ্ঞান থাকা শিক্ষার্থীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ভাষা শিক্ষার জন্য বিদেশে সময় নষ্ট করিতে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে।

শিক্ষার্থীর বুদ্ধিশক্তি এবং কার্য্যকুশলতা এবং যে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন তাহাতে শিক্ষার্থীর অধিকার ও আগ্রহ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি প্রদানের যোগ্যাযোগ্যতা নিরূপণ করিবেন। শিক্ষা লাভের পর স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেই বিষয়ের উন্নতির জন্য তাঁহার শক্তি নিযুক্ত করিবেন এরূপ সঙ্কল্পের কথাও তাঁহাকে বলিতে হইবে। প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এই সকল বিষয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় না;—সেই জন্যই শিক্ষার্থীনির্ব্বাচনের সময় কোন রূপ পরীক্ষা গ্রহণ করা গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক মনে করেন না, এবং তাহা করিবেন না। কিন্তু শিক্ষার্থীকে দেখাইতে হইবে যে তাঁহার মনোনীত বিষয়ে দেশে থাকিয়া যতদূর শিক্ষা লাভ সম্ভব তাহা তিনি করিয়াছেন। শিল্প শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ আছে ইহা যিনি কার্য্যতঃ দেখাইতে না পারিবেন তাঁহাকে বৃত্তি প্রাপ্তির উপযোগী বলিয়া মনে করা যাইবে না।

বয়স সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কোনরূপ বাঁধাবাঁধি থাকিল না, কিন্তু স্থল বিশেষে গবর্ণমেণ্ট উহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

বৃত্তিপ্রার্থীদিগকে সচ্চরিত্রতা, যে দেশে শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন সেই দেশের ভাষাজ্ঞান, এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

ইংলণ্ডে অবস্থান করিলে শিক্ষার্থীগণ সেক্রেটারি অফ ষ্টেটের তত্ত্বাবধানে থাকিবেন। অন্য দেশে হইলে ঐ দেশের তৎস্থানীয় ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবেন। যে সকল নিয়মে ভারত গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে এই বৃত্তি সম্বন্ধেও সেই সকল নিয়ম খাটিবে এবং শিক্ষার্থী শিক্ষায় উন্নতি দেখাইতে না পারিলে অথবা তাঁহার ব্যবহার অসন্তোষজনক হইলে বৃত্তি রহিত করিয়া তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

শিক্ষা সমাপ্তির পর দেশে ফিরিয়া আসিলে শিক্ষার্থীকে গবর্ণমেণ্ট বা অন্য কোন বেসরকারী আফিসে কার্য্য করিতে হইবে এরূপ কোন বাধ্য-বাধকতা শিক্ষার্থীর সহিত থাকিবে না। যেরূপে তিনি তাঁহার জীবনের উন্নতি করিতে চাহেন সেই রূপ করিতে পারিবেন। উপযুক্ত অবসর পাইলে গবর্ণমেণ্ট আহ্লাদের সহিত তাঁহাদিগকে শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন অথবা যাহাতে তাঁহাদের অর্জ্জিত জ্ঞান কোন স্থানীয় ব্যবসা বা শিল্প বিষয়ে কাজে লাগিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ খনিজ ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধন মানসে এক বা ততোধিক ব্যক্তির আবেদন গ্রহণ করিবেন। বৃত্তিপ্রার্থীগণ কত দূর পড়া শুনা করিয়াছেন, কোন

বিষয় শিক্ষার জন্য মানস করিয়াছেন এবং তাহার জন্য ভবিষ্যতে কি কি বস্তুর প্রয়োজন এই সমুদয় আবেদনের সহিত পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিবেন। আবেদন কারীরা স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া কোন পথ অবলম্বন করিয়া ভবিষ্য জীবন অতিবাহিত করিতে চাহেন সম্ভব হইলে তাহাও লিখিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সকল বৃত্তি প্রদান করিবেন।

শ্রীলশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ

বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬ ও ৩৬ নং ফৌজদারী-বালাখানা, কলিকাতা।

অশ্বগন্ধা রসায়ন।

অকাল বার্দ্ধক্যের মহৌষধ।

কালের কুটিল মাহাত্ম্যে—নিজের কপাল দোষে, কর্ম্মবশে, জলবায়ুর দূষিত রসে—লোকে কত কষ্ট পায়। সুখের সংসার শোকের কাল-কারাগার। অকাল বার্দ্ধক্য—অকাল মৃত্যুর প্রভাব কিসে নিবৃত্তি পায়?

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

ভগ্নদেহে, মগ্ন প্রাণে—নূতন সুঠাম; লাবণ্য-জড়িত, পীযূষপূরিত শোভাময় নবীন গঠন; আশা,— উল্লাস,— আনন্দর যৌবন জোয়ার। কতদিন পরে—আবার কত দিন পরে আঁধার ঘরে বাসন্তী পূর্ণিমা রজত ধারে আনন্দ মকরন্দের সৌরভ-সারে, চারিধারে সুধা ঢালিবে; শূন্য পিঞ্জর কাকলীরবে আবার মুখরিত হইবে।

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

জ্বরে—অনাচারে—অত্যাচারে—আহার বিহারের দোষে বারে বারে কত কষ্ট সহিলে; আজি প্রমেহ, কালি ধাতুদৌর্ব্বল্য, পরশ্ব শ্বাসকাস;—বারমাস দুঃখ-কষ্ট—যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কত বাজে ঔষধ ব্যবহার করিলে। কিন্তু কি ফল হইল? যাতনা দ্বিগুণ বাড়িল; আঁধার ঘোরতর হইল! এইবার—

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

দেখিবে ইহার মোহিনী শক্তি। ইহা ইন্দ্রজাল নহে, ভোজবাজী নহে। ঋষিবর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ জীবনীয় ঔষধ অশ্বগন্ধার বীর্য্য হইতে বিশুদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত

অশ্বগন্ধা রসায়ন।

ইহা স্বাস্থ্য-সংস্থাপক, রক্ত-সংশোধক, শুক্র-জনক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও আগ্নেয়। সেইজন্য ইহা শুক্রতারল্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য শোণিতবিকার ও ক্ষুধামান্দ্যের মহৌষধ। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তির পরিচয় পাইবে;—তরলশুক্র আবার গাঢ় ও ওজস্বী হইবে, ক্ষীণ পেশী ও স্নায়ুতন্ত্র যৌবনের উদ্দাম তেজে আবার দৃঢ় ও কঠিন, সবল ও কর্ম্মঠ হইবে, নিষ্ক্রিয় যন্ত্র ও ইন্দ্রিয় সকল আবার সত্বর কার্য্য-তৎপর হইয়া সংসার সুখময় করিয়া তুলিবে। একবার—

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

ইহা ছাত্রদিগের মহোপকারী; কারণ ইহা মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং অধিক অধ্যয়ন-জনিত কষ্ট ও দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া দেয়।

অশ্বগন্ধা রসায়ন—স্ত্রীদিগের রজঃ ও জরায়ু দুষ্টি, মৃতবৎসাদোষ ও প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া শরীর ও জরায়ু সুস্থ ও সবল করে।

মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ দেড় টাকা।

আঃ ভিঃ পিঃ ২/০ দুই টাকা এক আনা।

৩ শিশির মূল্য ৩৸০ তিন টাকা বার আনা।

১২ শিশির মূল্য ১৫৲ টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অপরের কথা কি বলিব।

বঙ্গের সিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন যাহা বলিয়াছেন, একবার দেখ; তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন

শ্রীযুক্তবাবু আদ্যনাথ বসু এল, এম্, এস,

ডাক্তার মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"মহাশয়ের আবিষ্কৃত "অশ্বগন্ধারসায়ন" নানাস্থানে ব্যবহার করাইয়া যেরূপ আশাতীত ফল পাইয়াছি, তাহাতে আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইহা "শারীরিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।" অধিকন্তু ইহা দ্বারা প্রমেহের এবং মূত্রকৃচ্ছ্রেরও বিশেষ উপকার হয়।"

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন, চিকিৎসক।

১৪৬ নং ফৌজদারী-বালাখানা, কলিকাতা।

সার ব্যবহার করি কেন?

আমরা যে ক্ষেত্রে নানাবিধ সার ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি,—ইহা জ্ঞাত থাকিলে, সারের ব্যবহারের প্রতি স্বতঃই লোকের প্রবৃত্তি জন্মিবে। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সংরক্ষিত করা কিম্বা ফসলের পরিমাণের বৃদ্ধি করা ভিন্ন আরও একটী মহদুদ্দেশ্য সাধিত করিবার জন্য ক্ষেত্রে সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা যে সকল দ্রব্য পান বা আহার করিয়া থাকি, তৎসমুদয় সাক্ষাৎ বা পরোক্ষরূপে ক্ষেত্রজাত ফসলের সহিত সম্বন্ধ। আহারীয় বা পানীয় সামগ্রীনিচয় যাহাতে পুষ্টিকর হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য থাকে। উদর পূরণ করা ব্যতীত শরীরের পুষ্টি সাধিত করিবার জন্য আহারের প্রয়োজন, এবং এই কারণে আমরা পুষ্টিকর সামগ্রীর জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি। ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর সামগ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু এ সকল সামগ্রী অধিক খাওয়া চলেনা; আর যদিই চলে, বহুমূল্যতা হেতু সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে, ফলতঃ অধিকাংশ লোককেই ক্ষেত্রজাত ফসলের উপর নির্ভর করিতে হয়। ক্ষেত্রজাত ফসল যাহাতে পুষ্টিকর হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। সারহীন ও সারসংযুক্ত ক্ষেত্রের ফসল লইয়া স্বতন্ত্রভাবে রাসায়নিক পরীক্ষা করিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এতদুভয়বিধ ফসলের মধ্যে কত বিভিন্নতা। নিকৃষ্ট ফসলে কেবল উদর পূরণ হইয়া থাকে কিন্তু সযত্নোৎপন্ন ফসলে উদর পূরণও হয় এবং শরীরের পুষ্টিও সংসাধিত হয়। শরীরের উন্নতির সঙ্গে স্নায়বীয় শক্তি বৃদ্ধি পায়, মেধার বিকাশ হয়। এই সকল কারণে আহারীয় সামগ্রীর পুষ্টিকারিতা বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা পাওয়া কৃষির প্রধান কার্য্য।

কৃষিক্ষেত্রে নানাবিধ সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং উদ্ভিদ্‌শরীরে প্রত্যেক সারেরই কার্য্য স্বতন্ত্র। কোন সারে যবক্ষারজান সমধিক পরিমাণে অবস্থিত, কোনটীতে ফস্‌ফরস্‌, কোনটীতে পটাশ ইত্যাদির আধিক্য আছে। উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতে এই সকল পদার্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে এ সকলের অভাব দৃষ্ট হইলে এবং তাহা পূরণ করিতে হইলে সার ব্যবহার করিতে হয়। উদ্ভিদগণ এই সকল সার পদার্থে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুষ্টিকর ফসল প্রদান করে এবং এরূপে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাতে সারের অংশ অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়; ফলতঃ সেই পুষ্টিকর ফসল আমরা উদরস্থ করিয়া পুষ্টিলাভ করি এবং ফসলে যে যে পদার্থ আছে, তাহার উত্তমাংশ শরীরের মধ্যে ধরিয়া রাখি। ঈষৎ গভীরভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই যে, আমরা যে কিছু জিনিষ পান বা আহার করি, তৎসমুদায়ই নানাবিধ আবর্জ্জনার রূপান্তর মাত্র। গোবর মধ্যে নাইট্রোজেন আছে,—আর ইহা শরীরের পুষ্টিসাধনকল্পে বিশেষ আবশ্যক, তাহা বলিয়া তাল তাল গোবর আহার করা চলে না। অস্থিসারে ফস্‌ফরস্‌, লবণ প্রভৃতি সামগ্রীর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে, শরীর মধ্যে তাহা প্রবিষ্ট করাইতে পারিলে শরীর দৃঢ় হয় ইত্যাদি, তাহা বলিয়া মাঠঘাট হইতে কতকগুলি হাড় সংগ্রহ করিয়া কেহ উদরস্থ করিতে পারে না, কিম্বা ফস্‌ফরস্‌ গ্রহণের জন্য কেহ বিলাতি দিয়াশলাই ভক্ষণ করিতে পারে না। চিনি খাইতে হইলে মাঠে গিয়া ইক্ষুদণ্ড কামড় দিলে চলে না। ইক্ষুকে কাটিয়া আনিয়া পেষণ যন্ত্র সাহায্যে উহা হইতে রস বাহির করিয়া লইতে হয়, পরে তাহাকে অগ্ন্যুত্তাপে জ্বাল দিলে গুড় প্রস্তুত হয়। আবার সেই গুড়কে শোধনাদি করিলে তবে চিনি পংপন্ন হয়, এবং তখন উহা আহার করা চলে। মোট কথা, কাঁচা মালকে (raw material) নানা উপায়ে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়। গোবর, চোনা, হাড়, ছাই প্রভৃতি কাঁচা পদার্থকে উদরস্থ করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী কল বা যন্ত্র সাহায্যে আমরা উহাদিগকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লই মাত্র। এই সকল যন্ত্রের মধ্যে, প্রথম—মৃত্তিকা, দ্বিতীয়—উদ্ভিদশরীর।

সারসমূহ মৃত্তিকায় সংযুক্ত হইলে ক্রমে বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হয়। অতঃপর উদ্ভিদগণ সেই বিগলিত পদার্থসাহায্যে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া ফল ফুল ধারণ করে এবং এই সকল ফল ফুল ও উদ্ভিদে সারমধ্যস্থিত তাবৎ পদার্থের অস্তিত্ব অল্পাধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের ভিতর দিয়া আমরা কিরূপে সার সামগ্রী শরীরস্থ করিতে পারি তাহা দেখা

গেল। উহাদিগের পরে আর একটী যন্ত্র সংস্থাপিত করিলে আমরা অধিকতর পুষ্টিকর সামগ্রী ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে পারি। ক্ষেত্রজাত ফসলকে গাভীরূপ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দুগ্ধে পরিণত করিয়া লইতে পারিলে অধিকতর পুষ্টিকর সামগ্রী পাইলাম না কি? আবার যাঁহারা মাংসভোজী, তাঁহারা ছাগ, মেষ, হংস, পারাবত প্রভৃতির মাংস পাইলে অধিকতর পুষ্টিকর সামগ্রী মনে করেন না কি? হিন্দু হইয়া গো বা কুক্কুটের নাম নাই বা উল্লেখ করিলাম।

জীবদেহে যে সমুদায় পদার্থ আছে, প্রায় তৎসমুদয় উদ্ভিদশরীরে পাওয়া যায়, তবে উদ্ভিদ শরীরে অল্প, আর প্রাণীদেহে অধিক। এই কারণে ক্ষেত্রজ ফসল অপেক্ষা মাংস অধিক পুষ্টিকর ও বলপ্রদায়ক।

ক্ষেত্রে সার প্রযুক্ত করিবার উদ্দেশ্য যখন জানিতে পারা গেল, তখন ক্ষেত্রকে যাহাতে সর্ব্বদা উর্ব্বরা রাখিতে পারি তাহার চেষ্টা পাইতে হইবে। ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিবার প্রধান উপকরণ সার।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সার অনেক প্রকারের, এবং তাহার প্রত্যেকেরই কার্য্য স্বতন্ত্র। কোন্ প্রকারের সার কোন্ ক্ষেত্রের ও কোন্ ফসলের উপযোগী তাহা বিবেচনা করিয়া সারের নির্ব্বাচন ও তাহার প্রয়োগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। এ সকল বিষয় বিবেচনা না করিয়া সার ব্যবহার করিলে অনিশ্চিত ফল লাভের সম্ভাবনা, কারণ হয়ত তাহাতে ফসলের উপকার হইতে পারে, আবার না হইতেও পারে। কোন সারে গাছের পাতার পরিমাণ ও আয়তনের বৃদ্ধি সাধিত করিতে পারে,—কোন সার দ্বারা ফুল ও ফল উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইতে পারে,—তৃতীয় প্রকার সারের দ্বারা হয়ত অন্তর্ভৌম কাণ্ডজ উদ্ভিদের উপকার হইতে পারে। এইরূপ সকল সারেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে, সুতরাং তাহাদিগের ফলও স্বতন্ত্র। অবিমৃষ্যভাবে সারের ব্যবহার করিলে অর্থ ও শ্রম নষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য কৃষিকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি মাত্রেরই সার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কার্য্যক্ষেত্রে একটী বিষম অন্তরায় থাকায় সকলের ভাগ্যে অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়া উঠে না। এই অন্তরায়টী,—কার্য্যক্ষেত্রে আমাদিগের সহিষ্ণুতার অভাব এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির observation উপর হতাদর। যে বিষয়েই হউক, যিনি দৃঢ়চিত্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে থাকিতে পারেন, এবং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্যাবলীর তাবৎ প্রণালী পদ্ধতি ও তাহার ফলাফলের উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে পারেন, অভিজ্ঞতা লাভ করা তাঁহার পক্ষে বড় অধিক কথা নহে। অভিজ্ঞতা লাভ যত অধিক হইতে থাকে, কার্য্যকুশলতা সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকে। তখন তিনি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক অল্প পরিশ্রমে ও অল্প খরচে কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইবেন। এই জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শের মূল্য এত অধিক।

আজকাল যে কৃষি বিষয় লইয়া কাগজে কলমে এত আন্দোলন চলিতেছে, সে কেবল শিক্ষিত মণ্ডলীর জন্য। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে কৃষিক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইলে, কৃষকদিগের প্রথায় চাষ আবাদ করিলে চলিবে না। কৃষকদিগের অভাব অল্প এবং সঙ্গতি সঙ্কীর্ণ; সুতরাং শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ক্ষেত্র হইতে যাহাকিছু উৎপন্ন করিতে পারে, তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু সেই পরিমাণ উৎপন্নে ভদ্রলোকের অভাব মোচন হইতে পারে না। কৃষকের একখানি জীর্ণ শীর্ণ মলিন কাপড় হইলেই চলিয়া যায়,—শীত কালের দিনে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া থাকিলেই শীত নিবারিত হয়, কিন্তু ভদ্র লোকের ত তাহাতে হয় না, কাজেই তাঁহাকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হইবে—ক্ষেত্রের শেষ শক্তিটুকু পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করতঃ নিজের শেষ শক্তি সামর্থকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে, তবেই ভদ্রলোকের পক্ষে কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত, নতুবা নহে। কৃষকে সার ব্যবহার করিতে পারে না—অর্থাভাবে, কিন্তু কোন ভদ্রলোকের পক্ষে এ কারণ দর্শান উচিত নহে।

পূর্ব্বে কেবল আহারীয় ফসলের কথা বলিয়াছি। কেবল তাহারই আলোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইলে চলিবে না। সার প্রয়োগদ্বারা অপরাপর ফসলের উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা পাওয়া যে বিশেষ অবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পাট, শণ, কার্পাস, প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় ফসলের উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে

হইবে। পাটের আঁশ যাহাতে দীর্ঘ হয়, দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক হয় ;—কার্পাস গাছে যাহাতে ফল বড় ও বেশী হয়, উহার আঁশ বড় সূক্ষ্ম সুচিক্কণ ও দৃঢ় হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে ; কিন্তু এ সকলই সারের কার্য্যকারিতার উপরে নির্ভর করে। সার ব্যবহার করিতে কিছু খরচ আছে সত্য, কিন্তু তাহা যখন জলে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, তখন সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার ব্যবহার করিলে, পারিবারিক কল্যাণ,—ফলতঃ দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

অল্প মূলধনে ব্যবসায়।

৩

অতি সামান্যরূপ শিক্ষা বিশী করিতে পারিলে, সামান্য মূলধনে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় করিতে পারা যায়। ক্ষুদ্র কেন, তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে অতি বৃহৎ রকমের ব্যবসায়ও করা যাইতে পারে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই প্রকার কার্য্য শিখিবার ব্যবস্থা এ দেশে কিছু মাত্র নাই। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালীতে অন্য কোন দোষ থাকুক আর না থাকুক, কোন শিল্প কার্য্য শিখিবার ব্যবস্থা যে নাই, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? ইংরাজী ভাষা শিখিবার জন্য আমাদের বিদ্যালয় আছে, কিন্তু ইংরাজী ভাষার সার যে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান তাহা শিখিবার ব্যবস্থা, বিশেষতঃ কার্য্যকর বিজ্ঞান (Applied Science) শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুই নাই বলিলেই হয়। আমাদের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডফরিণ আমাদের এই অভাব বিশেষ করিয়া বুঝিয়া ছিলেন এবং বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য এদেশে আমদানী হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কোন্ গুলি এখানে অল্প শিক্ষায় প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন, এবং কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, এ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকেরা তাহা শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে উপার্জ্জনে সক্ষম হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু তিনি যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গবর্ণমেণ্টের এই শুভ প্রস্তাব চাপা পড়িয়া যায়। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বাস্তবিকই দেশের একটা মহোপকার সাধিত হইত। গবর্ণমেণ্ট নানা কারণে এ সকল শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলেও আমরা নিজে নিজেও তাহা না করি কেন?

আমরা অদ্য যে একটি দ্রব্য প্রস্তুত করার কথা বলিতেছি, তাহা শিক্ষা করিয়া কার্য্যতঃ করিতে বোধ হয়, এক মাসের অধিক সময়ের আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কারিগরী কার্য্যের ব্যবসায় করিতে গেলে, নিজের হস্তেই যে সকল কার্য্য করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, তবে, কারিকর শ্রেণীর লোকের দ্বারা কার্যটি সহজে হইতে পারে, সে সকল কৌশল ও উপায় নিজের জানা আবশ্যক। আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে যখন শিক্ষার অন্য ব্যবস্থা নাই, তখন নিজে কার্য্যটির পদ্ধতি বুঝিয়া পরে দুই এক জন কারিকর লইয়া কার্য্যতঃ তাহার পরীক্ষা করা আবশ্যক। এইরূপ করিতে গেলে অবশ্যই কিছু ব্যয় আছে ; কিন্তু সে রূপ ব্যয় যে একেবারেই নিষ্ফল হইবে, এমন বোধ হয় না।

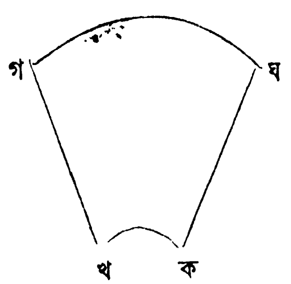
যে সকল দ্রব্য ইয়োরোপে প্রকাণ্ড কলের সাহায্যে প্রস্তুত, সে সকল দ্রব্য কারিকরের দ্বারা কেবল হস্ত সাহায্যে করিতে যাওয়া আমাদের বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, তাহা আমরা কখনই স্বল্প ব্যয়ে প্রস্তুত করিতে পারিব না। যে সকল দ্রব্যে অধিক কলের সাহায্য নাই সেই সকল দ্রব্য আমরা ইয়োরোপের দ্রব্য অপেক্ষা সুলভে প্রস্তুত করিতে পারি, কারণ আমাদের দরিদ্র কারিকরের বেতন ইয়োরোপীয় কারিকর অপেক্ষা অনেক অল্প।

বিদেশ হইতে যে সকল দস্তামাখান লোহার (Galvanised Iron) বাল্‌তী এদেশে আমদানী হইয়া থাকে, তাহা আমরা সহজেই নির্ম্মাণ করিতে পারি ; কারণ তাহাতে বৃহৎ কলের সাহায্য কিছুই আবশ্যক করে না। লোহা পিষিয়া চাদর করিবার জন্য সুবৃহৎ এঞ্জিন ও রোলারের আবশ্যক আছে বটে, কিন্তু যে লোহার চাদর করিবে সে আর বাল্‌তী ইত্যাদি করিতে যাইবে না, সুতরাং আমরা অপরের কৃত লোহার চাদর খরিদ করিয়া তাহা হইতে বাল্‌তী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে পারি।

এই লোহার চাদর যদি আমাদের দেশে প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে সুলভ মূল্যে পাইতে পারিতাম, কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ লোহার কারখানা আদৌ নাই। রাণীগঞ্জের নিকট বরাকরে একটি বৃহৎ লোহার কারখানা আছে, সেখায় Iron Ore এবং লৌহ-প্রস্তর হইতে লৌহ নিষ্কাশিত করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু লোহার চাদর করিবার ব্যবস্থা নাই। সুবিখ্যাত মহাত্মা জামসেদজী টাটা মহোদয় এ দেশে সুবিস্তৃত লোহার কারখানা স্থাপনের চেষ্টায় আছেন, আমরা আশা করি, তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইবে।

এখন সুইডিস্ চাদর হইতে আমরা উপরউক্ত বাল্‌তি করিতে পারি। প্রথমতঃ চাদর হইতে বাল্‌তীর আকারে খণ্ড খণ্ড কাটিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ চাদর এমন করিয়া কাটিতে হয়, যাহা মুড়িলেই বাল্‌তীর আকার হইবে। বড় চাদর হইতে বাল্‌তীর আকারে চাদর কাটিয়া লইলে অনেকটা ছাঁট বাদ যাওয়া সম্ভব। সেই জন্য এক খণ্ড মুড়িয়া বাল্‌তী না করিয়া দুই খণ্ড জোড় দিয়া একটা বাল্‌তী করিলে অনেক কম ছাঁট বাদ যাইবে; কিন্তু একটা অধিক জোড় দিবার পরিশ্রম বেশী লাগিবে।

যে প্রকার আকার করিয়া কাটিতে হইবে পার্শ্বে তাহার একটি সংক্ষেপ চিত্র দেওয়া গেল। এই আকারে দুই খণ্ড চাদর জুড়িয়া একত্র করিলেই বাল্‌তীর আকৃতি হইবে। এখন ক ঘ ও খ গ এই দুই কিনারা একত্র করিয়া ভাঁজ দিতে হইবে; ভাজ দিয়া তাহা জুড়িতে হইবে।



জুড়িবার দুই প্রকার উপায়; এক রাং ঝাল দিয়া; আর এক উপায় রিবেট বা নাচি করিয়া।

রাং দিয়া জুড়িতে গেলে, যে স্থানে রাং লাগাইতে হইবে, তাহা লোহার Scraper বা আচড়া দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হয়, তৎপরে সেই স্থানে Muriatic মিউরিয়াটিক এসিড লাগাইতে হয়, পরে অগ্নিতে পূর্ব্ব হইতে উত্তপ্ত তাতাল (Soldering Iron যাহা দ্বারা রাং লাগাইয়া দেয়) লাল করিয়া তাতাইয়া তাহা দ্বারা রাং লাগাইতে হয়। বলা বাহুল্য যে ইংরাজীতে রাংকেই টিন বলিয়া থাকে। আমরা সচরাচর টিন্ বলিলে যাহা বুঝি তাহা বাস্তবিক টিন নহে; তাহা টিন বা রাং মাখান লোহার চাদর। টিনের ক্যানেস্তারা অনেক দিন জলে রৌদ্রে পড়িয়া থাকিলে টিন উঠিয়া গিয়া লোহা বাহির হইয়া পড়ে, সকলেই দেখিয়াছেন।

দুই মুখ জুড়িবার আর এক উপায় রিবেট করা। এই উপায়ে অপেক্ষাকৃত মজবুত কার্য্য হইয়া থাকে। সকলেই দেখিয়াছেন, এঞ্জিনের বয়লার (Boiler) (যাহাতে জল থাকে) এবং বড় বড় জল রাখিবার ট্যাঙ্ক (Tank) বড় বড় লোহার চাদর দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল চাদর রিবেট করিয়া জোড়া। এক খণ্ড পেরেকের ন্যায় মাথা মোটা লৌহ খণ্ডের নাম রিবেট (Rivet)। যে দুই খণ্ড চাদর জুড়িতে হইবে, তাহাতে সারি সারি ছিদ্র করিতে হয়। এমন ভাবে ছিদ্র হওয়া চাই, যে এক খান চাদরের এক সারি ছিদ্র অপর চাদরের ছিদ্রের উপরে পড়ে তাহার পর প্রত্যেক ছিদ্রে একটি রিবেট দিয়া রিবেটের যে মুখ মোটা ছিল না সেই মুখ হাতুড়ি দিয়া নাচি করিয়া দিতে হয়, ইহাকেই রিবেট করা বলে।

বাল্‌তীর এই পার্শ্বদেশ জোড়া হইলে তখন একটা গোল চাকতি তলায় রাং দিয়া লাগান উচিত। তাহার পর একটা বেড় করিয়া বাল্‌তীর পায়া এবং একটা লোহার শিকের হাতল লাগাইলেই বাল্‌তী তৈয়ারী সম্পূর্ণ হইল।

উপরে যাহা লেখা হইল, তাহা পাঠ করিয়া কেহই বাল্‌তী নিজ হস্তে করিবেন না তাহাতো নিশ্চিত, তবে একটা ধারণা স্থির করিয়া কারিকর দ্বারা তাহা নির্ম্মাণ করাইতে পারেন। আমাদের দেশে যে সকল কারিকরেরা পিতলের চাদর দ্বারা বাসন নির্ম্মাণ করে, তাহারা অথবা কর্ম্মকারেরা অনায়াসে বাল্‌তী তৈয়ারী করিতে পারে। ইহার কোন কার্য্যই তাহাদিগকে দেখাইয়া বা শিখাইয়া দিতে হয় না। তবে বেশী পরিমাণে কোন দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে গেলে তাহার কার্য্যের

বিভাগ হওয়া আবশ্যক। এক জনে কেবল বালতীর আকারে চাদর কাটিবে; একজন কেবল পাশটা জুড়িবে, একজন তলা জুড়িবে, একজন হাতল লাগাইবে ইত্যাদি; এইরূপ কার্য্যের বিভাগ করিয়া দিলে শীঘ্র শীঘ্র অনেক গুলি দ্রব্য তৈয়ারী হইবে, সুতরাং ব্যয়ও কম পড়িবে।

আমরা উপরে যে বালতী তৈয়ারীর কথা বলিলাম, তাহা দস্তামাখান (Galvanised) চাদর হইতে করিতে গেলে, বড় সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। শুধু লোহার চাদরের করিলে অনেক সস্তা পড়িবে। পল্লীগ্রামে মাটির কলসীর স্থানে এরূপ বালতী অনেক কাল টিকিবে। একটা রং বা আলকাতরা মাখান থাকিলে শীঘ্র মরিচা ধরিবেনা। যাহাতে শীঘ্র মরিচা না ধরে সেই জন্যই লোহার উপর দস্তা বা টিন মাখাইবার আবশ্যক। টিন অত্যন্ত মহার্ঘ্য। একমণ টিনের মূল্য ৭০৲ টাকা; কিন্তু এক মণ দস্তার মূল্য ১২৲ টাকা। এই জন্যই দস্তা লাগানই বেশী প্রচলিত।

বড় চাদর খণ্ড হইতে বালতীর আকারের চাদর কাটিয়া লইয়া, তাহাতে দস্তা মাখাইবার ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়।

দস্তা লাগাইবার পক্ষে Dr Ure কৃত Dictionery of Arts and Manufactures পুস্তকে এবং Scientific American, নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে ঐ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত উপায় লিখিত আছে;—

দস্তামাখান—Galvanising—লোহারপাতের উপর দস্তা মাখাইয়া "গাল্‌ভানাইজড্" করিবার সহজ উপায় এই। একভাগ মিউরিয়াটিক বা সালফিউরিক এসিড ও চারিভাগ জল একত্র মিশাইয়া লোহার চাদর (যতক্ষণ না তাহার সমস্ত গাত্রটি পরিষ্কার সমতল হয়) তাহাতে ডুবাইয়া রাখিতে হয়, গায়ের আঁশ বা চটা তুলিবার জন্য তারের বুরুষ, বালি বা নারিকেল ছোবড়া দিয়া তাহা উত্তম রূপে ঘষিতে হইবে। পরে আর একটি পরিষ্কার মিউরিয়াটিক এসিডের মিশ্রণে (যাহাতে চারি ভাগ জল এক ভাগ এসিড ও প্রত্যেক গালনে এক আউন্স নিশাদল আছে) তাহাকে ডুবাইয়া দাও। তাহাকে শীঘ্র শুষ্ক করিবার জন্য বৃহৎ চুল্লীর কিংবা উষ্ণ লৌহপাতের প্রয়োজন। একটু জল, কিংবা পেরেক বা জোড়ের মুখে বা ফাঁকে, একটু সামান্য ভিজা থাকিলে তদবস্থায় গলিত দস্তায় (Zinc Bath) ডুবাইলে ভয়ানক উৎপ্রসারণ (Explosion) হইবে। দস্তা পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করিবার জন্য দস্তা গলাইয়া তাহাতে খানিকটা নিশাদল ছড়াইয়া দাও। পরে সেই পরিষ্কৃত সমতল লৌহ চাদর তাহাতে ডুবাইলে লৌহচাদর Galvanised হইয়া যাইবে।

লাভ লোকসান।

প্রতিদিন ৫ মণ লোহার চাদর হইতে বালতী করিতে হইলে;—

৫ মণ চাদরের মূল্য— প্রতি হন্দর ৭৲ বা প্রতি মণ ৫৲ টাকা— হিসাবে	২৫৲
১২ জন কারিকরের মাসিক বেতন— ১৫০৲ টাকার হিঃ প্রাত্যহিক ...	৫৲
আর ও অন্যান্য খরচ	২৲
	৩২৲

উপরিউক্ত ৫ মণ চাদরে—১২ ইঞ্চি উচ্চ বালতী—প্রত্যেকটা ✓৷৷০ সেরের হিসাবে—প্রতি মণে ২৪ টা করিয়া হইতে পারে, সুতরাং ৫ মণে ১২০টা বালতী হয়। ১২০টা বালতী প্রত্যেকটা ।৵০ করিয়া বিক্রয় হইলে ৪০৲ টাকা হয়।

দস্তা লাগাইতে হইলে উপরিউক্ত ৩২৲ টকা খরচের উপর ৷৷০ মণ দস্তার, মিউরাটিক এসিড, নিশাদল প্রভৃতির জন্য আরও ৮৲ টাকা খরচ ধরলে সর্ব্বশুদ্ধ ৪০৲ টাকা খরচ পড়ে। তাহা হইলে প্রত্যেক বালতী ।৶০ বা ।৵০ আনা করিয়া বিক্রয় হইলেও প্রতিদিন ৮৲। ১০৲ টাকা লাভ হওয়া সম্ভব। ১২ ইঞ্চি বালতী ৷৷/০ বা ৷৷৵০ মূল্যে বিক্রীত হয়, সুতরাং আমাদের কৃত বালতী ।৶০ বা ।৵০ আনা মূল্য বিক্রয় হওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত।

কোঙা।

বর্দ্ধমানের পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেল রাস্তার ধারে ধারে ও পল্লীগ্রামের ভিতর একপ্রকার গাছ দেখা যায়—দেখিতে ঠিক আনারসের ন্যায়—দেশের লোকেরা তাহাকে বন আনারস অথবা 'মুগা' কহে। ইহা নিবিড় বনমধ্যে জন্মায় না—খোলা মাঠের ধারে বা পাহাড়ের উপর অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। রেল কোম্পানি রেল রাস্তার ধারে তারের বেড়ার নিকট ইহা সারবন্দ করিয়া পুতিয়া জন্তু ও মনুষ্যের রেল পথের উপর আগমনের উপায় বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার আবাদের জন্য কোন হাঙ্গামা করিতে হয় না। শিকড় হইতে নূতন বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া ইহার সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে থাকে।

ইহার পাতা আনারস পাতা অপেক্ষা অনেক পুরু এবং ভারি এবং ঘন সবুজবর্ণ। দুপাশে কাঁটা থাকিলেও আনারসের ন্যায় অত লম্বা হয় না। বড় জোর দেড় হাত বা দুই হাত লম্বা হইতে দেখা যায়। পাতার ডগা ক্রমে সরু হইয়া কাঁটায় পর্য্যবসিত হয়। আনারসের ফলের ন্যায় ইহার কোন ফল হয় না। রজনীগন্ধ ফুলের ন্যায় মাঝ হইতে একটা শীষ বাহির হইয়া প্রায় ৪।৫ হাত লম্বা হইয়া উঠে তাহাতেই গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটিয়া থাকে। ফুলের বিশেষ সুগন্ধ নাই বটে, কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর; এই নিমিত্ত অনেক ইহাকে ফুল বাগানের শোভা বর্দ্ধনের জন্য রাখিয়াছেন।

ইহার পাতার ভিতর হইতে যে আটা বহির্গত হয়, তাহাতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। শুনা যায় ডাকাতেরা নাকি চোট লাগিলে ক্ষতস্থানে মুগার পাতা ছেঁচিয়া রস দিয়া ক্ষত আরাম করিত।

আমেরিকায় এই জাতীয় একপ্রকার গাছ দেখা যায়। তাহাকে aloe বলে। তাহার পাতার রস হইতে অত্যুৎকৃষ্ট বিরেচক প্রস্তুত হয়। সেই রসে স্ত্রীলোকের বাধক ব্যারামও আরোগ্য হয়।

সম্প্রতি অনেক স্থানে মুগার আঁশ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। নীলের ব্যবসায় ক্রমশঃ উঠিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হওয়ায় নীরকর সাহেবদের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁহারা এ বিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

কোঙার আঁশে খুব উত্তম শক্ত দড়ি তৈয়ারী হয়, এমন কি নারিকেল কাতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে ও দেখিতে আরও সুন্দর হয়। ইহা প্রায় জাহাজের কাছি প্রভৃতি ভারসহ কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়। মেজের ম্যাটিংএর জন্য এই দড়ি ব্যবহার হইয়া থাকে।

শুনিতে পাই পূর্ব্বে বর্দ্ধমান অঞ্চলের বিধবাগণ এই কোঙা হইতে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহারা এই গাছের পত্র পচাইয়া তাহার মধ্য হইতে সূতা বাহির করিয়া সেই সূতা চুলের ন্যায় বিনানি করিয়া স্ত্রীলোকের কবরী বন্ধনের ডোর বাজারে বিক্রয় করাইয়া নিজ জীবিকার উপায় করিতেন। আজকাল বিলাতী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সে সকল পাঠ উঠিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি মধুপুরে এই আঁশ বাহির করিবার একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তাহার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব।

১৯০১ সালের প্রারম্ভে দুইটি ভদ্রলোক ভ্রমণোপলক্ষে মধুপুর যাত্রা করেন। পথে এই জাতীয় গাছের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তাঁহাদিগের এই গাছ হইতে কোন কাজ আদায় করিবার জন্য কৌতূহল জন্মায়। তাঁহারা কতিপয় পাকা পাতা সংগ্রহ করিয়া জলে পচাইতে দেন। অবশেষে একখানা মোল তক্তার উপর রাখিয়া তাহার উপর একখানা লোহার হাল চাপ দিয়া অনেক যত্নে পাতার সবুজ পদার্থটাকে বাদ দিয়া আঁশ সংগ্রহে কৃতকার্য্য হন*। পরে তাহাকে বেশ করিয়া জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। সেই শুষ্ক আঁশ গুলি এরূপ শক্ত যে দুই গাছা বা তিন গাছা একত্র করিলে টানিয়া ছিঁড়িতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। এই আঁশ হইতে দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিলে তাহা যে বাজারে বেশ কাট্‌তি হইয়া লাভ হইতে পারিবে সে বিষয়ে তাঁহাদের কোন সন্দেহ থাকিল না। তাঁহারা এই রূপে যথেষ্ট আঁশ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় অনেক ব্যবসায়ী বন্ধুর নিকট পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইলে অনেকে এই উত্তর দেন যে এই ব্যবসা আরম্ভ করিতে গেলে যথেষ্ট মূলধনের আবশ্যক,

* গত সংখ্যক কমলায় কলার আঁশ বাহির করিবার যে যন্ত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

আর ভবিষ্যতে কিরূপ ফল হইবে তাহা নিশ্চয় নাই। এই রূপে তাহাদের সকল বন্ধুই পশ্চাৎ-পদ হইলেন। অবশেষে তাঁহারা নিরুপায় হইয়া দুই একটী বর্দ্ধিষ্ণু ইংরেজ ব্যবসাদারদিগের শরণ লইতে বাধ্য হন। একজন বণিক তাঁহাদের কথার মর্ম্ম বিশেষ করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ও নমূনা স্বরূপ প্রেরিত আঁশ অনেক পরীক্ষা করিয়া ও বিলাতে পাঠাইয়া তাহার বিক্রয় বিষয়ে বন্দবস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্মত হয়েন, এবং একজন সাহেবকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যকুশলতার পরীক্ষা গ্রহণ করেন।

তখন তাঁহারা কুলীর দ্বারা কার্য্য করাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদের কার্য্য এই প্রণালীতে চলিতেছিল। প্রত্যেক পাতা পাঁচ পোয়া ওজনে হইত। একমন পাতা পাহাড় হইতে কাটিয়া আনিয়া দিলে তিন পয়সা মজুরী পড়িত। প্রত্যেক মণ হইতে পাঁচ পোয়া মাত্র আঁশ বাহির হইত। সমস্ত দিন ধরিয়া কাজ করিলে সেই পাতা হইতে পাঁচ সের অপেক্ষা অধিক আঁশ বাহির করা যাইত না। প্রত্যহ পাঁচ সের পরিমাণ আঁশে কিরূপে বাজার চলিতে পারে এবং হাতের দ্বারা কার্য্য চালাইলে অধিক খরচ পড়িয়া যায় এই জন্য সেই সাহেব তাঁহাদিগকে কলে কাজ চালাইবার পরামর্শ দেন এবং কল আনাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন।

এক্ষণে আঁশ কলের সাহায্যেই বহির করা হইতেছে। কলটী এই কার্য্যের জন্য বিশেষ রূপে নির্ম্মিত।—মানুষের দুখানি ঠোটের ন্যায় দুখানি ছুরি উপর উপর বসান আছে তাহার পাশে একটা রোলার ষ্টীমের সাহায্যে অনবরত ঘুরিতেছে।

পাতা খানি ঠোঁটের ন্যায় ছুরি দুখানির মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলে পর ঘূর্ণিত রোলারটী জিহ্বার ন্যায় জড়াইয়া পাতাটীকে ভিতরে টানিয়া লইতে চেষ্টা করে এবং ছুরি দুইখানি ইত্যবসরে পাতার উপর ও নীচের গায়ে আসিয়া পড়ে ও চাপ দেয়। তাহাতে উপরকার এবং নিম্নেকার সমুদয় ত্বক্ অংশটা চাঁচা হইয়া পড়িয়া যায়, কেবল মাত্র আঁশ গুলি সংলগ্ন থাকে। পাতাটী কলের মধ্যে পাছে ঢুকিয়া যায় এই জন্য তাহার একপ্রান্ত হাতে করিয়া ধরিয়া থাকিতে হয় এবং আবর্জ্জনা গুলি রোলারের নীচে স্তূপাকারে জমা হয়।

কলের কার্য্যের জন্য পাতাকে জলে ভিজাইতে হয় না, শুকনা পাতা কাটিয়া আনিয়া লোকদ্বারা তাহার দুপাশের কাঁটা গুলি বাদ দেওয়া হয় এবং পাতার সরু ভাগ গুলি ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া হয়, কারণ তাহা হইতে ভাল আঁশ পাওয়া যায় না। আর একটী লোক সেই পাতা এক একটী করিয়া কলের নিকট বাড়াইয়া দেয়। তৃতীয় একজন পাতার এক প্রান্ত ধরিয়া কলের ঠোঁটের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয়। তাহাতে পাতার এক পৃষ্ঠের আঁশ বাহির হইয়া পড়ে; পুনরায় সেই পাতাটী উল্টাইয়া লইয়া যে অংশ হইতে আঁশ বাহির হয় নাই সেই পিঠটি কলের মধ্যে প্রবিষ্ট করান হয়। এই উপায়ে পাতা হইতে সমস্ত আঁশ বাহির হইয়া পড়ে। তখন আর তাহাতে পাতার চিহ্ন মাত্র থাকেনা, এক গোছা শোঁয়ার ন্যায় দেখায়। সবুজ পদার্থ আঁশের সঙ্গে লাগিয়া থাকে বলিয়া আঁশকে জলে ভাল করিয়া কাচিয়া পরিষ্কার করা হয়। অনন্তর সেই গুচ্ছ গুলিকে একদিন ধরিয়া ভাল করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়, তারপর তাহাকে ওজন করিয়া পাটের গাঁটরীর ন্যায় গাঁটরী বাঁধা হয়।

কলের তৈয়ারী আঁশগুলি হাতের তৈয়ারী আঁশ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। বরং পাতাকে পচাইয়া লওয়া হয় না বলিয়া হাতের তৈয়ারী অপেক্ষা পরিষ্কার হয়। প্রত্যেক আঁশ গুলি ঘোড়ার বালাম্ অপেক্ষা একটু সরু এবং প্রায় লম্বায় সমান। মধুপুরে আপাততঃ দুইটী কল একত্রে কাজ করিয়া থাকে।

কলের কাজে পাতা হইতে অধিক আঁশ বাহির হয় না বটে, তবে কাজ এত শীঘ্র হয় যে সমস্ত দিনে একটি কলে এক মণ আঁশ তৈয়ারী হইতে পারে। এই আঁশ কলিকাতায় দশ টাকা মণ বিক্রয় হয় এবং বিলাতে কুড়ি টাকা পাওয়া যায়। কলের খরচ ও কুলী খরচ ও বহন ব্যয় প্রভৃতি বাদ দিয়াও প্রতিমণে ৩।৪ টাকা বেশ লাভ হয়।

বিস্তৃত কারবার করিতে হইলে কলের সংখ্যা বাড়াইলেই চলে।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।



কেশরঞ্জন তৈল।

কেশরঞ্জনে—সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ নাশ হয়।
কেশরঞ্জনে—সুন্দরীর সুন্দর কেশ সুন্দর হয়।
কেশরঞ্জনে—সকলপ্রকার শিরোরোগ দূর হয়।
কেশরঞ্জনে—মস্তিষ্কের উষ্ণতা বিদূরিত হয়।
কেশরঞ্জনে—চিন্তাজনিত অবসাদ বিনষ্ট হয়।
কেশরঞ্জনে—পরীক্ষার্থী ছাত্রের মস্তিষ্ক সবল হয়।
কেশরঞ্জনে—সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগ নিবারিত হয়।
কেশরঞ্জনে—সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগ দূর হয়।
কেশরঞ্জনের তুলনা জগতে দুর্লভ।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ।/০ আনা, ৩ শিশির মূল্য ২।০ টাকা, ডাঃ মাঃ ॥/০ আনা।

শ্বাসারিষ্ট

ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শ্বাসরোগ, এবং তজ্জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বক্ষোমধ্যে ভার ও আকর্ষণ-বোধ, মুখমণ্ডল ফিকা ও ধূম্রবর্ণ, সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম, হস্তপদাদির শীতলতা, শ্লেষ্মসহ রক্তদর্শন, প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রব সকল নিশ্চয়রূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। এক শিশি ঔষধ ও ১ কৌটা বটিকার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। প্যাকিং ও পোষ্টেজ ।/০ আনা।

সচিত্র কবিরাজি শিক্ষা

অষ্টম সংস্করণ।

পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত।

সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সার মন্থন। পুরু কাগজে প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠারও উপর বড়বড় আটটী খণ্ডে সমগ্র পুস্তক বিভক্ত। অতি সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায় কেবল চিকিৎসকের নয়, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষেও ইহা একখানি নিত্য-ব্যবহার্য্য গ্রন্থ। নাড়ী-পরীক্ষা এবং মূত্র ও তাপ-পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রোগের নিদান, চিকিৎসা-প্রণালী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ, তৈল ও ঘৃতাদির প্রস্তুতবিধি, এবং বিষ চিকিৎসা, দীর্ঘজীবনলাভের উপায়স্বরূপ স্বাস্থ্য-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা, স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের পূর্ণ বিবরণ, রোগীর পরিচর্য্যা, ও দ্বিতীয় খণ্ডে মহর্ষিদের গৌরবের ধন সুশ্রুত সংহিতা অষ্টম সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২॥০ দুই টাকা আট আনা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৷০ বার আনা।

অশোকারিষ্ট

আমাদের "অশোকারিষ্ট" উদ্ভিজ্জ উপাদানে প্রস্তুত। অশোক ছাল ইহার প্রধান উপকরণ। কষ্টকর ও দোষজনক ঋতুর সহজস্রাব করানই অশোকারিষ্টের প্রধান কার্য্য, এ সম্বন্ধে ইহা অমোঘ ও অব্যর্থ। ইহার সেবনে বাধক, রজঃ-অনির্গম, উদরে বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও গর্ভ-গ্রহণে অক্ষমতা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া জরায়ু পরিশোধিত হইয়া থাকে, এবং প্রসবান্তে ইহা সেবন করিলে দুরারোগ্য ভীষণ সূতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া, অকালে প্রাণবিনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হয়।

এক শিশি অশোকারিষ্ট ও এক কৌটা (১৬টী) বটিকার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।/০ আনা মাত্র।

পাথুরে কয়লা।

৩

উত্তাপ সংযোগে আলকাতরা হইতে "লঘুতৈল" নির্গত হইয়া গেলে পর হরিদ্রাবর্ণ আর একপ্রকার তৈলময় পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। ইহা ঘন ও জল অপেক্ষা ভারী, এজন্য ইহা "গাঢ় তৈল" (Heavy or dead oil) নামে অভিহিত হয়।

"গাঢ় তৈলের" সহিত সোডার দ্রাবণ (Caustic Soda) মিশ্রিত করিলে কার্ব্বনেট অব সোডা নামক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়; এই পদার্থের সহিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড মিশ্রিত করিলে কার্ব্বলিক এসিড (Carbolic acid) নামক অতীব প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কার্ব্বলিক এসিড বর্ণহীন ও দানবিশিষ্ট পদার্থ, কিন্তু কিছুদিন আলোক সংস্পর্শে থাকিলে গোলাপীবর্ণ ধারণ করে এবং তরল হইয়া যায়। ইহার গন্ধ আলকাতরার ন্যায়, ইহা শীতল অপেক্ষা উষ্ণ জলে অধিকতর দ্রবণীয়। এজন্য কার্ব্বলিক এসিডের দ্রাবণ প্রস্তুত করিতে হইলে উষ্ণ জলের সহিত উহাকে মিশ্রিত করিতে হয়। কার্ব্বলিক এসিড একটি উৎকৃষ্ট পচন নিবারক পদার্থ (Antiseptic) এজন্য ইহা ঔষধার্থে এবং সংক্রামক রোগের বীজধ্বংসের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্ত্রচিকিৎসায় ইহা একটী মহোপকারী ঔষধ। কার্ব্বলিক পাউডার, ফেনলিন্, ফেনল্ প্রভৃতি পচন ও দুর্গন্ধনিবারক পদার্থ কার্ব্বলিক এসিডের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; ইহাদিগের মধ্যে কার্ব্বলিক এসিডের পরিমাণ অধিক থাকে না, কিন্তু আলকাতরা হইতে উৎপন্ন কার্ব্বলিক্ এসিডের ন্যায় অপর কয়েকটি পচননিবারক পদার্থ অধিক পরিমাণে উহাদিগের সহিত মিশ্রিত থাকে।

কার্ব্বলিক্ এসিড একটি বিষাক্ত পদার্থ; ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে পাকস্থলীর প্রদাহ ও সংজ্ঞা লোপ হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়। ইহা শরীরের কোনও স্থানে লাগিলে ঐ স্থান পুড়িয়া যায় ও কৃষ্ণবর্ণ দাগ হয় এবং অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হয়, এইজন্য এই পদার্থ অতি সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ইংলণ্ডে কার্ব্বলিক্ এসিড খাইয়া অনেক লোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে।

কার্ব্বলিক্ এসিডের সহিত উগ্র সল্‌ফিউরিক্ ও নাইট্রিক এসিড একত্রিত করিলে হরিদ্রাবর্ণ দানাবিশিষ্ট পিক্রিক্ এসিড (Picric acid) নামক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহা রংএর নিমিত্ত এবং কতিপয় দ্রব্য পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা কদাচ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সালিসিলিক্ এসিড্ (Salicylic acid) একটি উৎকৃষ্ট পচন নিবারক পদার্থ ও মহোপকারী ঔষধ। ইহা পূর্ব্বে কতকগুলি উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইত; অধুনা ইহা কার্ব্বলিক্ এসিড হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। লেবু ও অন্যান্য ফলের রসের সহিত সালিসিলিক্ এসিড স্বল্প পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া রাখিলে উহারা বিকৃত হইয়া যায় না। অধিক মাত্রায় এই পদার্থ সেবন করিলে বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার লবণ গুলিকে সালিসিলেট্ (Salicylates) কহে; ইহারা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত কার্ব্বলিক্ এসিড্ হইতে ফিনাসিটিন্ (Phenacetin), স্যালল্ (Salol) প্রভৃতি নানাবিধ উপকারী ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত গাঢ় তৈল হইতে ন্যাপ্‌থালিন্ (Napthalene) নামক পদার্থ বাষ্পাকারে পৃথক হইয়া আইসে। ইহা শীতল হইলে শুভ্রবর্ণ দানার আকারে জমাট বাঁধে; ইহার গন্ধ আলকাতরার গন্ধের ন্যায়। ইহা একটি কীট নাশক পদার্থ; বস্ত্র ও পুস্তকাদির সহিত রক্ষিত হইলে উহাদিগকে কীটের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে, এজন্য ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ন্যাপ্‌থল্ (Napthols) নামক কতিপয় পচন নিবারক ঔষধ এই পদার্থ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

"গাঢ় তৈল" হইতে ন্যাপথালিন্ বহির্গত হইয়া গেলে পর এন্থ্রাসিন্ (Anthracene) নামক অপর একটি পদার্থ বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া আইসে এবং শীতল হইলে উহাও জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহা শ্বেতবর্ণ, দানাবিশিষ্ট কঠিন পদার্থ; ইহার গন্ধ আলকাতরার গন্ধের ন্যায়। এন্থ্রাসিন্ হইতে বহুবিধ উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা এলিজেরিন্ রং (Alizarine colors) নামে পরিচিত। এনিলিন্ রং এর ন্যায় ইহারাও বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার জন্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উত্তাপ সংযোগে পাথুরে কয়লা হইতে "লঘু তৈল" ও "গাঢ় তৈল" বহির্গত হইয়া গেলে পর পাত্র মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ চটচটে এক প্রকার পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। ইহাই পিচ্ (Pitch) নামে পরিচিত। ইহা শীতল হইলে কঠিন হইয়া জমাট বাঁধে। পিচ্ বহুবিধ শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আস্ফাল্টের (Asphalt) আকারে মেজের উপর ঢালিয়া দিলে মেজে ভিজা থাকে না।

শেল্ (Shale) নামক একপ্রকার পাথুরে কয়লাতে সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ করিলে মোমের ন্যায় কোমল ও শ্বেতবর্ণ প্যারাফিন্ (Parafin) নামক পদার্থ নির্গত হয়। ইহা সহজেই দগ্ধ হইয়া উজ্জ্বল আলোক প্রদান করে, এজন্য মোমবাতির ন্যায় বাতি প্রস্তুত করিবার জন্য এই পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই বাতিকে প্যারাফিনের বাতি (Parafin candles) কহে। বাতি ব্যতীত নানাবিধ মলম প্রস্তুত করিবার জন্য প্যারাফিন্ ব্যবহৃত হয়।

যে পাত্রের মধ্যে পাথুরে কয়লাকে চোয়ান হয়, তাহার অভ্যন্তরে ও পাত্রের গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ কঠিন গ্যাস কার্ব্বন্ নামক এক প্রকার কয়লা জমাট বাঁধিয়া থাকে। এই পদার্থ সুন্দররূপ তড়িত পরিচালন করে, এজন্য কতকগুলি তড়িৎকোষ (Electric battery) নির্ম্মাণের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এক্ষণে ভারতবর্ষজাত পাথুরে কয়লা সম্বন্ধ দুই চারিটী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ১১১৩ খৃঃ অব্দে কতিপয় ধর্ম্মযাজক দ্বারা ইউরোপে পাথুরে কয়লার খনি প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু ভারতবর্ষের কয়লার খনির অস্তিত্ব ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কেহই জানিত না। ১৯০১ খৃঃ অব্দে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া ৭৮ কোটি ১০ লক্ষ টন্ (ton) পাথুরে কয়লা খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল। ২৭ মণে ১ টন হয়; সুতরাং ইহার পরিমাণ কল্পনা দ্বারা অনুভব করিতে গেলে ও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে করুন ১০ টন্ (২৭০ মণ) কয়লা এক এক খানি কয়লা গাড়িতে বোঝাই করা যাউক; এইরূপে সমস্ত পৃথিবী হইতে ১৯০১ সালে যে পাথুরে কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে তদ্দ্বারা সমস্ত গাড়ী বোঝাই করিয়া ঐ গাড়ী গুলি যদি এক খানির পর আর এক খানি সাজান হয় তাহা হইলে সেই গাড়ী গুলি দৈর্ঘ্যে ৪২৬০০ মাইল পথ অবরোধ করিয়া থাকিবে—অর্থাৎ এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর পরিধি দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক স্থান অধিকার করিবে। ইহা প্রামাণিক সত্য হইলেও সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

এই যে এত কয়লা সমস্ত পৃথিবী হইতে উত্তোলিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ হইতে শতকরা ৮ ভাগ মাত্র উঠিয়াছে। আমেরিকা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হইয়া থাকে (শতকরা ৩৩.৮ ভাগ); তৎপরে গ্রেট ব্রিটেন (২৮.২ ভাগ) পরে জর্ম্মাণি (১৯.৪) ইত্যাদি। জাপান ও ভারতবর্ষ হইতে প্রায় সম পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হয়। জাপানে কিঞ্চিৎ বেশী মাত্র (.৯ ভাগ)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সকল প্রকার পাথুরে কয়লা দগ্ধ করিলে সমপরিমাণ উত্তাপ প্রদান করে না। যে কয়লা যত অধিক উত্তাপ প্রদান করে, কল চালাইবার জন্য তাহারা তত অধিক উপযোগী। বিলাতী কয়লা পোড়াইলে এদেশীয় কয়লা অপেক্ষা অধিক উত্তাপ উৎপন্ন হয়, এজন্য বিলাতী কয়লা ভারতবর্ষজাত কয়লা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। সমুদ্রে দ্রুতগামী জাহাজ (Mail steamer) চালাইবার জন্য বিলাতী কয়লা সবিশেষ উপযোগী, এজন্য এই সকল জাহাজে বিলাতী কয়লাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বিলাতী কয়লার দাম এদেশী কয়লা অপেক্ষা অনেক বেশী, এজন্য যে সকল জাহাজ এদেশে নদীর উপর দিয়া গমনাগমন করে, তাহাতে বিলাতী কয়লা মোটে ব্যবহৃত হয় না। এতদ্ব্যতীত রেলগাড়ী ও কলকারখানা চালাইবার জন্য এদেশীয় কয়লা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং এই সকল কার্য্যের জন্য ভারতবর্ষজাত কয়লা অন্যান্য দেশেও যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। কিন্তু কয়লা উত্তোলন করিবার দোষে এদেশীয় কয়লার উপর বিদেশী লোকের ক্রমে অনাস্থা জন্মিতেছে। এদেশের খনি হইতে যে কয়লা উত্তোলিত হয়, তাহার সহিত প্রায়ই অধিক পরিমাণে গুঁড়া কয়লা ও মাটি মিশ্রিত থাকিয়া

উহার উত্তাপপ্রদায়ক গুণের ক্ষতি করে; এই কারণে লোকে ভারতবর্ষজাত কয়লার উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছে। তবে কার্য্যে অসুবিধা সত্বেও শুদ্ধ খরচ কম হয় বলিয়া স্বদেশ ও বিদেশস্থ অনেক কারখানায় ও ষ্টীমারে এদেশীয় কয়লাই অদ্যাবধি ব্যবহৃত হইতেছে। যাঁহাদের কয়লার খনি আছে, তাঁহাদের দৃষ্টি সম্প্রতি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহাতে কয়লাতে এই সকল দোষ না থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সচেষ্ট হইয়াছেন। আর এক অসুবিধা এই যে, যে সকল স্থান কয়লা উত্তোলিত হইতেছে, তথা হইতে উহাকে অন্যত্র বহন করিয়া লইয়া যাইবার সুবিধা এখনও সর্ব্বত্র সমভাবে ঘটিয়া উঠে নাই; অতএব শুদ্ধ বহন-সৌকর্য্যের অভাবে এদেশীয় কয়লা আশানুরূপ পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে না। এই সকল অসুবিধা দূর হইলে ভারতজাত কয়লার ব্যবসা বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশা করি যে, আমরা শীঘ্র সেই শ্রীবৃদ্ধির দিন দেখিতে সমর্থ হইব।

শ্রীচুণিলাল বসু।

সঞ্চয়ের সহজ উপায়।

সঞ্চয় সভ্য সমাজের অতি প্রধান অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত। যে জাতির সর্ব্ব সাধারণে সঞ্চয়ে সক্ষম, সেই জাতি ভবিষ্যতে উন্নতির আশা করিতে পারেন; কিন্তু যে জাতি তাহাতে পরাঙ্মুখ, তাহাদিগকে অসভ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত হইতে হয়। আবার যে জাতি অসভ্য না হইয়াও সঞ্চয়ে অক্ষম, তাঁহাদিগকে অসভ্য না বলা যাউক, তাঁহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই যে অসভ্য আদিম নিবাসীদিগের সমভাব প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের দুরদৃষ্ট বশতঃ আমরা এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়িতেছি। হিন্দুজাতি কত শত সহস্র বৎসর হইতে সভ্যতার আদর্শস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে সেই সভ্য সমাজে তাহাদিগের স্থান কোথায়?

সভ্যতার মূলসূত্র, মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা; সেই ভালবাসার বলে সমাজের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, এবং সমাজের সুখ স্থায়ী করিবার জন্য সমাজের শৃঙ্খলা স্থাপন। যে সমাজে যত অধিক পরিমাণে সুশৃঙ্খলা বর্ত্তমান আছে, সেই সমাজ তত অধিক পরিমাণে সুখ ও সভ্যতার শীর্ষস্থানীয়। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার ও ভালবাসা সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু রীতিনীতি যে প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল, তাহা আর কোন জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল না।

এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কেন যে ঘটিয়াছে, তাহার কারণানুসন্ধান অবশ্যই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পর্কে যেমন আমাদের অনেক স্থলে উপকার হইতেছে তেমনি আবার অনেক স্থলেই পুরাতন গ্রন্থি শিথিল করিয়া দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড স্রোত আমাদিগকে কোন্ অকূল পাথারে লইয়া ফেলিতেছে।

এক এই সঞ্চয়ের উদাহরণ হইতেই বুঝিবেন, আমরা কিরূপ দুঃখের দশায় পড়িতেছি। সঞ্চয় ব্যক্তিগত উপার্জ্জন বা আয়ের প্রাচুর্য্যের ফলস্বরূপ। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-শৃঙ্খলার আয়ের প্রাচুর্য্য হওয়া দূরে থাক, শতকরা ৯৬জনের পরিবার প্রতিপালোনোপযোগী যথেষ্ট আয় আছে কি না সন্দেহ। যে দেশে বৈদেশিক শিল্প, দেশী শিল্পীদিগকে স্থানচ্যুত করিয়া কৃষিজাত উৎপন্নের প্রতি নির্ভর করিতে বাধ্য করিয়াছে, যে দেশে কামার, কুমার, তন্তুবায়, সকলেই জমীর প্রার্থী হইয়া জমীর খাজানার হার দুর্ম্মূল্য এবং জমী দুষ্প্রাপ্য করিয়াছে, যে দেশে নিরক্ষর কৃষকের হস্তে জমী ক্রমাগত সার না পাইয়া ক্রমেই উর্ব্বরতা বিহীন হইয়াছে, যে দেশে কৃষককুল, মূলধন-বিহীন এবং ঋণগ্রস্ত, সে দেশে কৃষি কার্য্যে যে কেহই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এক বৎসরের অত্যধিক বা অত্যল্প বৃষ্টিতেই অজন্মা ঘটিয়া একেবারে দারুণ মন্বন্তর উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন কৃষকের এমন কিছু সঞ্চয় থাকে না যে, একবৎসর কোন ক্রমে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। তখন মরিশস্, ডিমারারা প্রভৃতি দূর দেশ হইতে মুষ্টিভিক্ষা আসিয়া এবং বিস্তৃত অন্ন-সত্র খুলিয়াও গবর্মেণ্ট তাহাদিগের সকলকে অনশন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন না।

বাকী মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা কিরূপ? যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা করেন তাঁহারই মধ্য শ্রেণীর মধ্যে। একা এই বঙ্গদেশে প্রায় ১৬ লক্ষ বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে প্রতিবৎসরে তাহার দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ প্রায় দেড় লক্ষ বালককে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ লাভ করে। এই দেড় লক্ষ বালকের মধ্যে উপার্জ্জন-ক্ষম হয় কয় জন? যদি এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পাশ করিলে উপার্জ্জনে ক্ষমবান্ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও এণ্ট্রান্স, এফ এ, বি এ, এম এ, ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারী, মোক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি সকল প্রকারে সমস্ত বঙ্গদেশে প্রতি বর্ষ সর্ব্বশুদ্ধ ৬ হাজার বালক পাশ হইয়া থাকে; অতএব সংসার-প্রবেশী দেড় লক্ষ বালকের মধ্যে ৬ হাজারের কথঞ্চিৎ উপার্জ্জনের ক্ষমতা হইয়া থাকে মাত্র। বাকি এক লক্ষ ৪৪ হাজার বালকের পরিণামে ১০।১৫ বা কুড়ি টাকা মাসিক বেতন ছাড়া অধিক উপার্জ্জনের কিছুমাত্র আশা থাকে না। অতএব বলা যাইতে পারে, শতকরা ৯৬ জনের কিছুমাত্র উন্নত হইবার আশা থাকে না।

এই প্রকার অবস্থার ভদ্রলোকে জীবনের মধ্যাহ্নে অথবা শেষ বেলায় অপোগণ্ড শিশু এবং জীবনের চির-সঙ্গিনী গৃহিণীকে নিঃসম্বল অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করা ব্যতীত আর উপায় কি আছে? এ প্রকার দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিলে, চির আদরের গৃহিণী পরের পরিচারিকা বৃত্তি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু গুলির ভিক্ষা ভিন্ন আর কি উপায় থাকে? পিতার জীবিতাবস্থায় যে ক্ষুদ্র শিশুর সামান্য রোগের অসুখে পিতার বুক ফাটিয়া যাইত, পিতার অবর্ত্তমানে, তাহারা হয়ত, রোগে ঔষধ পায় না, ক্ষুধায় অন্ন পায় না; শীতে বস্ত্র পায় না, শিক্ষা পায় না; হয়ত পেটের দায়ে দুর্বৃত্ত হইয়া যায়, হয়ত, ক্ষুধার জ্বালায় কুলী হইয়া আসামে বা মরিসসে চলিয়া যায়, হয়ত সেথায় পশুপালের ন্যায় কুলীদলের মধ্যে বেত খাইয়া কায করে, শেষ অকালে কাল কবলিত হইয়া তাহার সকল দুঃখের অবসান হয়। এই হৃদয় বিদারক চিত্র দেখিয়া মনে হয়, যে আমরা আর সে প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা অথবা হিন্দু নাম ধরিবার উপযুক্ত নহি।

আমরা এত কথা বলিলাম, যদি এই সকল ভাবিয়া কাহারও এই সকল দুঃখের প্রতিবিধানে মনোযোগ হয়। অনেকে বলেন যে, এই সকলে অনেকের মন আছে, কিন্তু কোন উপায় মনে আসে না বলিয়া কোন কার্য্য হয় না। তাহাই যদি হয়, আমরা নিম্নে একটী উপায়ের কথা বলিলাম, আমাদের মধ্যে কৃতী এবং প্রধান মহাশয়েরা তাহাতে মনোযোগ করিলে সমাজের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

ইয়ুরোপের Continent অংশে এমন অনেক কোম্পানী আছে, যাহাদের কার্য্য,—সঞ্চয়ে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে সঞ্চয়ে সাহায্য করা।

এই প্রকার একশ্রেণীর কোম্পানী Life Insurance অর্থাৎ জীবন বীমা কারক কোম্পানি। কিন্তু যাঁহারা জীবন বীমা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সঞ্চয়ে অক্ষম বলা যায় না। জীবন-বীমা কোম্পানীকে প্রতিমাসে যে প্রিমিয়ম দিতে হয়, তাহা লোকের আয় হইতে উদ্বৃত্ত হয় বলিয়াই লোকে তাহা দিতে পারে, অতএব তাহাদিগকে সঞ্চয়ে অক্ষম বলা যায় না।

মহেন্দ্র একেবারেই সঞ্চয়ে অক্ষম, যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে কোন ক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়; এখন তাহার যদি কিছু সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা হয়, তবে কি সে তাহা পারিবে না? উপরি উক্ত কোম্পানীর ন্যায় ব্যবস্থা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে মহেন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তিও সঞ্চয়ে সক্ষম হইবে।

মহেন্দ্র একটি একহাজার টাকার সম্পত্তি করিবে, বলিয়া উক্ত কোম্পানীকে জানাইলেন। কোম্পানী একহাজার টাকায় জমী খরিদ করিয়া দিলেন। মহেন্দ্রকে তাহার Earnest money বা বায়না স্বরূপ ৫০টি টাকামাত্র দিতে হইল। এই ৫০৲ টাকা মহেন্দ্র কোনমতে কর্জ্জ করিয়া জোগাড় করিল। Life Insurance বা জীবন বীমার পদ্ধতি অনুসারে মহেন্দ্রকে মাসে ৩ টাকা করিয়া উক্ত কোম্পানিকে দিতে হইবে, তদ্ব্যতিরিক্ত মহেন্দ্র যদি ঐ জমী এখন হইতেই দখল করিতে ইচ্ছা করে, তবে ঐ কোম্পানীকে তাহাদের ১০০০৲ টাকার সুদ অন্ততঃ ৬৲ টাকা হারে ৫৲ টাকা দিতে হইবে। মহেন্দ্রের নিজের সঞ্চয় ক্ষমতা

নাই, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবে মহেন্দ্র প্রতি মাসে এই ৮৲ টাকা কোথা হইতে দিবে? মহেন্দ্র ঐ জমীর আয় হইতেই ঐ টাকা দিতে সক্ষম হইবে। পল্লিগ্রামে জমাদারের মাটের জমী প্রায় ৪০।৫০ বিঘা ১০০০৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে অতএব ঐ জমীর আয় বৎসরে খরচ খরচা বাদ অন্ততঃ ২০০৲ টাকা হইতে পারে এদিকে মহেন্দ্রকে দিতে হইবে ;—

কোম্পানির প্রিমিয়ম মাসিক

৩৲ হিঃ বৎসরে ৩৬৲

ঐ টাকার সুদ মাসে ৫৲ হিঃ ঐ —৬০৲

জমীদারের খাজনা সেস হিঃ ঐ —৬০৲

১৫৬৲

ঐ জমী হইতে মহেন্দ্র বৎসরে ২০০৲ টাকা পাইলেও এক বৎসরেই মহেন্দ্র বাজনার ৫০৲ টাকা হিসাব করিবে, বৎসর বৎসর কিছু লাভও দিবে এবং মৃত্যু অন্তে পুত্রাদির জন্য একটা মূল রাখিয়া যাইতে পারিবে। এখন পুত্রদিগকে কোম্পানীকে আর কিছুই দিতে হইবে না; কেবল জমীদারের খাজনা দিয়া তাহারা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐ সম্পত্তি ভোগদখল করিতে পারিবে।

এদিকে এইরূপ সম্পত্তি করিয়া দিয়া উক্ত কোম্পানীর লোকসানের কোন কারণ নাই ত নাই, বরং অনেক লাভের সম্ভাবনা আছে।

কোম্পানীকে দিতে হইল —১০০০৲

তার বদলে কোং পাইলেন—

৮ × ১২ (একজনের জীবন কাল) ২৫ বৎসর—২৪০০৲

তদতিরিক্ত প্রতি মাসে ১৲ টাকা করিয়া দিয়া সুদে খাটাইলে ২৫ বৎসরে তাহার সুদ হয় হয় দেখুন,—

$$\frac{১ \times ৬ \times ৩০০}{১০০ \times ১২} = \frac{৩০০}{২০০} = ৩০০ \text{ মাসের সুদ} —$$

$$\frac{১ \times ৬ \times ২৯৯}{১০০ \times ১২} = \frac{২৯৯}{২০০} \text{ পরবর্ত্তী মাসে জমান ১৲ টাকার ২৯৯ মাসের সুদ}$$

$$\frac{১ \times ৬ \times ২৯৮}{১০০ \times ১২} = \frac{২৯৮}{২০০} = \text{ পরবর্ত্তী মাসে জমান ১৲ টাকার ২৯৮ মাসের সুদ}$$

$$\frac{৩০০}{২০০} + \frac{২৯৯}{২০০} + \frac{২৯৮}{২০০} + \ldots + \frac{১}{২০০} = \frac{৪৫০০০}{২০০} = ২২৫৲$$

∴ প্রতি মাসে ১৲ জমাইলে ২৫ বৎসরের সুদ = ২২৫৲

∴ " ঐ ৮৲ জমাইলে ঐ ৮ × ২২৫ = ১৮০০৲

৮ × ৩০০ = ২৪০০৲

অতএব কোম্পানী এক হাজার টাকা দিয়া ২৫ বৎসরে ৪২০০৲ টাকা পাইতে পারেন। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে সকলেই Insure করার পরে ২৫ বৎসর বাঁচিবে না। সুতরাং এইরূপ মৃত্যুর রিস্ক বা দুর্ঘটনা ধরিলে কোম্পানী আরও কিছু কম টাকা পাইবেন। আবার অপর পক্ষে কেহ সম্পত্তি লইয়া ৫।৭ বৎসর পরে মাসিক প্রিমিয়মের টাকা দিতে অপারগ হইলে কোম্পানী ঐ সম্পত্তি ফেরত পাইয়া অনেকটা লাভবান্ হইতে পারিবেন। ফল কথা, Life Insurance কোম্পানী অপেক্ষা যে এই কোম্পানী অধিক লাভবান্ হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কোম্পানীর পক্ষে আরও একটা সুবিধা হইবে, Life Insurance কোম্পানীগণ মৃত্যুর পরে যথার্থ টাকা দেবেন কি না, এবিষয়ে অনেকের সন্দেহ। তাহা ব্যতীত মরিবার পরে উত্তরাধিকারী কিছু পাইবে কি না সে বিষয়ে অনেকে অমনোযোগী হইয়া অনেক Life Insurance করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু আমাদের কথিত কোম্পানী জীবিতাবস্থাতেই সম্পত্তি করিয়া দিবেন বলিয়া, লোকে তাহাতে ইচ্ছা করিয়া অগ্রসর হইবে এবং Life Insurance কোম্পানী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিশ্বাসও করিবে।

যাঁহারা বড় বড় সহরে বাটি ভাড়া করিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে বাটির ভাড়ার উপর আর কিঞ্চিৎ দিতে পারিলেই বাটিটি তাঁহাদের নিজের হইতে পারিবে।

মনে করুন একটি বাটির মাসিক ভাড়া—৩০৲ এইরূপ উপায়ে বাটিটি নিজের করিতে হইলে মাসে দিতে হইবে ;—

৫০০০৲ টাকা মূল্য ধরিলে কোম্পানীর প্রিমিয়ম—১৫

৫০০০৲ টাকার ৬৲ হারে সুদ—২৫৲

মাসিক—৪০৲

বোধ হয় ঠিক হিসাব করিয়া দেখিলে প্রিমিয়মের হার আরও কম হইতে পারে।

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত।

কাচ।

(পূর্ব্বাভাষ)

"এলাম এ ভবহাটে হাটক কিনিতে।
কাচ পেয়ে ভুলিলাম নারিনু চিনিতে"।

কবির চক্ষে কাচের এত হতাদর হইলে আধুনিক সভ্য জগৎ কাচকে ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কবিগণের সূক্ষ্ম নেত্রে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকলও সময়ে সময়ে অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাই কবি উত্তমের সমবায়ে অধমের উৎকর্ষতা প্রদর্শনার্থ উপমাস্থলে বলিয়া থাকেন—"কাচঃ কাঞ্চন-সংসর্গাৎ ধত্তে মারকতীং দ্যুতিং"—কবি-নেত্রে যেরূপ পরিলক্ষিত হউক না কেন, আধুনিক সকলেই কাচের মহোপকারিতার বিষয়ে অল্প বিস্তর অবগত আছেন।

কাচের স্বচ্ছতা, মসৃণতা, উজ্জ্বলতা, অপরিচালকতা, কাঠিন্য, অন্যান্য দ্রব্য সংস্পর্শে অবিকৃতি প্রভৃতি গুণ কাচকে মনুষ্যের নিত্য ব্যবহার্য্য করিয়াছে। কাচের ন্যায় পানীয়ের আধার আর কে হইতে পারে? তেজাময় অম্লাদিকে কাচ ভিন্ন অপর কোন্ পদার্থ অবিকৃত ভাবে রাখিতে পারে? কোন্ পদার্থ কাচের ন্যায় প্রাণ ধরিয়া আলোককে ভিতর দিয়া অবাধে যাইতে দেয়? কাচ ভিন্ন অপর কে জড়ি বড়ি চিরুণিকরা তাম্বুলরাগরঞ্জিতাধরা গরবভরা গরবিণীর মুখখানি সযত্নে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক কেশে নেপোলিয়ন অথবা পাতা কাটিয়া দেয়? হীরক ভিন্ন কাচের ন্যায় আর কঠিন পদার্থ জগতে কি আছে? "একোহি দোষোগুণ সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দুকিরণেষ্বিবাঙ্কঃ", তাই এক ভঙ্গ প্রবণতা দোষ অগাধ গুণ সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

মানুষের মনের মত কাচের জিনিস এক বার ভাঙ্গিলে আর জোড়া লাগে না। বড়ই কঠিন তাই চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি নমিত হয় না। পাকা গিন্নির ন্যায় কাচ এক হীরক ভিন্ন আর কাহাকেও উপরে বড় একটা দাঁত ফুটাইতে দেয় না। নৈতিকগণ হয়ত বলিবেন, যে কাচ জগতের অনেক অপকারও করিয়াছেন। সভ্য য়ুরোপীয়গণ কাচনির্ম্মিত দ্রব্যের চাকচিক্যে মুগ্ধ করিয়া কত আফ্রিকাবাসীর স্বাধীনতা-ধন অপহরণ করিয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজক কাচের প্রলোভনে অনেক অসভ্যকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন! অনেক প্রবঞ্চক মণিমাণিক্যের অনুরূপ কাচখণ্ড অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যাহাই বলুন, বহু গ্রন্থাধ্যয়ন-জনিত দৃষ্টি শক্তির স্বল্পতা-নিবারণে আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণের কাচ ভিন্ন আর কে অন্ধের যষ্টি আছে?

কাচের উৎপত্তি কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে ময়দানব যে মায়াময় স্ফটিকপুরী নির্ম্মিত করিয়া দুর্য্যোধনের দারুণ দুরবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা কাচ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল কি না, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎই বলিতে পারেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কাচের প্রয়োগ দুই একটী দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কোন্ সময়ে কোথা হইতে কাচের প্রবর্ত্তন ভারতে হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা বড়ই দুর্ঘট। কাচের কাল নির্ণয় আমাদিগের প্রবন্ধের বিষয়ীভূত না হইলেও তৎসম্বন্ধে দু একটী কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, প্রাচীন ফিনিসীয়গণ বহুকাল হইতে কাচের নির্ম্মাণ পদ্ধতি ও ব্যবসায় অবগত ছিল। তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ফিনিসীয়গণ Natrom (সোডাক্ষার) নামক পদার্থে বালুকা ও কাষ্ঠের সংযোগে কাচ প্রস্তুত করিত। ফিনিসীয় উপকূলে ঐ সকল পদার্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু ফিনিসীয়গণ কোথা হইতে কাচ নির্ম্মাণ-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না।

পুরাকালে মিশর-অধিবাসিগণ কাচের ব্যবহার জানিত। কাচের অলঙ্কার মৈশর রমণীর বড়ই আদরের দ্রব্য ছিল। মুশার (Moses) লিপি সমূহ মধ্যে যদিও কাচের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু মুশা যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ের অনেক সমাধি মন্দির হইতে কাচনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথিত-নামা

প্রাণিতত্ত্ববিৎ প্লিনি (Pliny) ও বিখ্যাত ভূবেত্তা ষ্ট্রাবো (Strabo) বলেন যে, তাঁহাদের সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া ও সাইডনে কাচের কারখানা ছিল। চিত্র বিচিত্রিত, গিল্টি করা ও নানা বর্ণে রঞ্জিত কাচ খণ্ড মূল্যবান প্রস্তরের অনুরূপ প্রস্তুত হইয়া অঙ্গনার অঙ্গের সুষমা বর্দ্ধিত করিত। প্রাচীন মিশরবাসীরা কাচের ব্যবহার বিদিত ছিল। প্রাচীন রোমীয়গণও কাচ দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভিসুভিয়স্ নামক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে হারকিউলেনিয়ম ও পম্পিয়াই নগরদ্বয় গিরি নিঃসৃত গলিত ধাতুময় পদার্থে প্রোথিত হইবার বহুকাল পরে খনকগণ খনন-পূর্ব্বক ভূগর্ভ-নিহিত নগরদ্বয়ের অস্তিত্বের পুনরুদ্ধার সাধন করিলে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, হারকিউলেনিয়ম নগরীর অনেক গৃহে কাচের সার্সি বসান আছে। সুতরাং আধুনিক কালের ন্যায় না হইলেও রোমীয়গণ যে কাচের বিশিষ্ট ব্যবহার জানিত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন খৃষ্টীয় ও মুসলমানগণের মধ্যে বিষম ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusade) বাধিয়াছিল, সেই সময়ে য়ুরোপীয়গণ ফিনিসীয়দিগের নিকট হইতে কাচ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি শিক্ষা-পূর্ব্বক ইয়ুরোপে প্রচার করে। প্রথমে ভিনিসের বণিকবর্গ কাচের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। প্রচার হইবার ভয়ে উহারা বহুকাল উক্ত বিদ্যা প্রচ্ছন্ন রাখে। তৎপরে ফরাসীরা কাচের বিস্তৃত ব্যবসায়ে যখন পরিলিপ্ত হয়, তখন ইংলণ্ডে কাচের ব্যবসায় আরম্ভ হয়। এক্ষণে সকল সভ্য দেশেই কাচের কারখানা আছে। নাই কেবল পোড়া বাঙ্গালায়।

কাচের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্লিনি (Pliny) বলেন, ফিনিসীয় বণিকেরা একটী জাহাজে সোডাক্ষার (Natron) বোঝাই লইয়া যাইতেছিল। প্রবল ঝটিকাবেগে ঐ জাহাজ বেলস নামক নদীর মোহানার সন্নিকটে সৈকতভূমে উৎক্ষিপ্ত হইলে নাবিকগণ সমুদ্রতটে রন্ধন করিতে বাধ্য হয়। উহারা জাহাজ হইতে সোডাক্ষারের (Natron) বৃহৎ বৃহৎ খণ্ড লইয়া তদ্দ্বারা বালুকাময় বেলাভূমির উপর চুলী প্রস্তুত পূর্ব্বক পাক করিতে থাকে। রন্ধনাবসানে ভস্ম মধ্যে উজ্জ্বল প্রস্তরের ন্যায় পদার্থ দেখিয়া উহারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়। এই প্রকারে উহারা কাচ নির্ম্মাণ শিক্ষা করে। উহারা তখন জানিত যে বেলস বালুকারই গুণে এবম্প্রকার পদার্থের উৎপত্তি। বেলস নদী ক্রামেল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া গ্যালিলী প্রদেশ প্রবাহিণী। বহুকাল কাচ প্রস্তুতের জন্য বেলস নদীর বালুকা দেশ বিদেশে রপ্তানি হইত। আর একটী অনুরূপ প্রবাদ আছে। ইহাতে নাবিকগণ কালু নামক বৃক্ষের দ্বারা বেলাভূমে রন্ধন করে। পাকাবসানে দেখিল ভস্মের পরিবর্ত্তে সুন্দর চিক্কণ পদার্থ চুল্লীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। আমাদের দেশেও শুনিতে পাওয়া যায় যে অনেকের খড়ের গাদা পুড়িয়া কাচ হইয়াছে। আশ্চর্য্য কিছুই নহে, কারণ ক্ষার বালুকা ও উত্তাপই কাচের উপাদান। প্লিনি যাহাই বলুন, তিনি কাচের যে কাল নির্দ্দেশ করেন তাহার বহুকাল পূর্ব্বে কাচের আবিষ্কার হইয়াছিল।

প্রাচীন লেখকগণের মধ্যে এগ্রিকোলা কাচের সম্বন্ধে অল্প বিস্তর লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যেরূপ চুল্লী ও নির্ম্মাণ পদ্ধতির বিবৃতি করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে বর্ত্তমান কালের অনুরূপ নেরি, কঙ্কেন্, হেঙ্কেল, পট্, একর্ড প্রমুখ রাসায়নিকগণ কাচের সম্বন্ধে অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নেরি, বস্, লয়সেল ও এলট্ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন *।

কাচ প্রথমে ভিনিসীয়গণের একচেটিয়া ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎপরে ফরাসীগণ শিখিয়া আসিয়া কাচের বহুল উন্নতি সাধন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলবার্ট দর্পণের কাচ অতি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত করিয়া অনেক সামসময়িক কাচ ব্যবসায়ীর ঈর্ষা উৎপাদন করিয়াছিলেন। তৎকালে ফ্রান্সের রাজাও কাচের উন্নতি সম্বন্ধে সবিশেষ চেষ্টিত হন এবং যাহাতে সম্ভ্রান্ত মণ্ডলী কাচ ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েন তজ্জন্য যত্নবান হইয়া অনেক নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন।

ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে কাচের প্রচলন হয়। বিগত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড কাচ ব্যবসায়ে বড়ই উন্নতি করিয়াছে। কয়েক প্রকার কাচ

* Vide Cylopedie Methodique

ইংলণ্ডে যেরূপ সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইতেছে এরূপ আর কোথায়ও হয় না।

১৫৫৭ খৃঃ অব্দে লণ্ডন নগরে ক্রুচেড ও ফ্রায়ার্স নামক স্থলে প্রথম সার্সির কাচ প্রস্তুত করিবার এক কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্পদিন পরে স্যাভয় হাউস নামক স্থানে বেলোয়ারি কাচের কারখানা স্থাপিত হয়। এতাবৎকাল কাচ প্রস্তুতের জন্য কাষ্ঠই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে রবার্টম্যান্সেল কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে পাথুরিয়া কয়লা উত্তাপার্থ ব্যবহার করেন। বকিংহামের ডিউক ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে ল্যাম্বেথ নামক স্থানে ভিনিস্ হইতে কারিকর আনাইয়া প্রথম আরসি ও গাড়ির জানালার কাচের চাদর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

১৬৮৮ খৃঃ অব্দে আব্রাহাম থেভার্ট প্রথমে ফ্রান্সে আরসির কাচের ঢালাই কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপরেই তথায় সেণ্ট গোবিয়ানের সুবিখ্যাত কাচের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহারা যেরূপ সুন্দর আরসির কাচ প্রস্তুত করিতেন সেরূপ কাচ তখন আর কোথায়ও প্রস্তুত হইত না। এই সময় হইতেই ইংরাজগণ কাচ ব্যবসায়ে ফ্রান্সের এক বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন। তথন ইংলণ্ডের কাচ ফ্রান্সের ন্যায় সুন্দর না হইলেও মূল্যে অতি সুলভ ছিল।

ক্রমে রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির সহিত কাচেরও উন্নতি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কাচ নির্ম্মাণার্থ যে সমুদয় দ্রব্য ব্যবহৃত হইত তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ থাকিত না, তজ্জন্য জিনিসও ভাল হইত না। এক্ষণে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধির জন্য কাচ সুন্দরতর হইয়াছে। ভার্জিলিয়স নামক প্রথিত যশা রাসায়নিক সিলিকন (বালু) নামক মূল পদার্থের অগ্নোৎপাদিনী শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ নিরাকৃত করিলে কাচ উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

বাঙ্গালার এ অঞ্চলে দুইবার কাচের কারখানা করিয়া চালাইবার বৃথা প্রয়াস হইয়া গিয়াছে। প্রথম টিটেগড়ে পাইওনিয়র গ্লাশ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, দ্বিতীয় সোদপুরে হালগিয়ার্স কোংর উদ্যোগে স্থাপিত কারখানা। শিক্ষার অভাবই উভয়েরই ধ্বংসের মূল। একে আমাদিগের উদ্যোগ নাই, তাহাতে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য, সুতরাং কার্য্যকরী বিদ্যার অভাবে এই দুরবস্থা। তাহার উপর যে দুএকটা অশিক্ষিত কারীকর আছে তাহারা অনেকে শিক্ষা ও পরিশ্রমে নারাজ। সুখের বিষয় যে ওয়াগলে প্রমুখ কয়েকটি যুবক বিদেশ হইতে কাচ কার্য্য শিক্ষা পূর্ব্বক স্বদেশে প্রবর্ত্তনার্থ যত্নবান হইয়াছেন। যদি দেশের অর্থবান লোকসকল উঁহাদের অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন, তাহা হইলে উন্নতির আশা আছে।

শ্রীশিব চন্দ্র ঘোষ।

মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

অশ্বত্থ গাছের কয়লা। অশ্বত্থ গাছের গায়ে যে ছাল শুকাইয়া যায় তাহাকে চলিত ভাষায় অশ্বত্থের "চটা" বলে। এই চটা দগ্ধ করিয়া কয়লা করিতে হইবে। চটা পুড়িয়া গেলে ভস্ম হইবার পূর্ব্বে তাহা চাপা দিয়া ফেলিলে কয়লা হয়। সেই কয়লা অনেক ব্যাধি নিবৃত্ত করিতে পারে। (১) ক্রমাগত বমন হইতে থাকিলে ঐ কয়লা ভিজাইয়া সেই জল পান করিতে দিলে তৎক্ষণাৎ বমন থামিয়া যায়। (২) ঐ কয়লার চূর্ণ পুরাতন এবং অসাধ্য সকল প্রকার ক্ষতের মহৌষধ। ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইয়া তাহাতে চূর্ণ দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ইহাতে ৩।৪ দিনে ক্ষত শুকাইয়া যায়।

লশুন। (১) শরীরের যে কোন স্থান অথবা একাধিকস্থান গভীর ভাবে কাটিয়া তাহা হইতে প্রবলবেগে রক্তপাত হইতে থাকিলে ২।৩টা লশুন শিলে পিষিয়া থেঁৎলাইয়া একটা পাকা কলার সহিত ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে ১।৩ মিনিটের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ হয় এবং ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে বেদনার অর্দ্ধেক হ্রাস হইয়া যায়। (২) লশুন বাতের মহৌষধ। বাতব্যাধিতে ব্যথিত বা আক্রান্ত স্থানে লশুনের ফোমেণ্ট বা সেক দিলে অথবা লশুন বাটিয়া সেই স্থানে ১।৩ মিনিট বাঁধিয়া রাখিলে তৎক্ষণাৎ বেদনার নিবৃত্তি হয়। সেক দিবার নিয়ম - লশুন থেঁৎলাইয়া লইয়া তাহা একটু বস্ত্র খণ্ডের মধ্যে রাখিবে। ইহাকে চলিত ভাষায় লশুনের পুঁটলি বলে। ঐ পুটলী উত্তপ্ত করিয়া তাহার দ্বারা ব্যথিত স্থানে ক্রমাগত সেক দিলে ক্ষণের মধ্যে ব্যথা কমিয়া যায়। সেই সঙ্গে লশুনের ২।৪টা কোষ বাটিয়া খাইলে আরও ভাল। (৩) কর্ণশূল রোগে এক কোষ লশুনের ভাগ থেঁৎলাইয়া তাহা কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে কর্ণশূলের নিবৃত্তি

অজীর্ণ ও ম্যালেরিয়ার মুষ্টিযোগ।

(১) পাতি বা কাগজি লেবুর রস অর্দ্ধ ছটাক বা এক আউন্স পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে ঐ দুইটি রোগ ১০।১৫ দিনে সারিয়া যায়। লেবুর রস কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। জ্বর আসিবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এক ছটাক লেবুর রস পান করিলে জ্বর আসা বন্ধ হয়। (২) উষা পান। প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বিছানা হইতে উঠিয়াই অর্দ্ধসের বা এক গ্লাস শীতল জল পান করিলে বহুকাল ব্যাপী দারুণ অজীর্ণ রোগ এবং ম্যালেরিয়া সারিয়া যায়। কিন্তু জলপানের পর প্রাতর্ভ্রমণ নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা বাতের পীড়া জন্মিতে পারে। এরূপ ভাবে ভ্রমণ করিতে হইবে যে যেন বেড়াইতে বেড়াইতে ঘর্ম্ম বাহির হয়। যাহাদিগের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না তাঁহাদিগের পক্ষে উষাপান অত্যন্ত উপকারী।

রক্ত নিবারক ঔষধ। (১) আয়াপান। ইহার অপর নাম বিশল্যকরণী—কাটা স্থানের রক্ত নিবারণ করিবার জন্য ইহা বাটিয়া তাহাতে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইয়া কাটা স্থান জুড়িয়া যায়। রক্তামাশয়, রক্তবমন, নাক দিয়া রক্ত পড়া প্রভৃতি রোগের ইহা মহৌষধ। দারুণ রক্তামাশয়ে ও রক্তপিত্ত রোগে কাশীর চিনির সহিত অর্দ্ধছটাক পরিমাণে আয়াপানের রস দিবসে তিনবার অথবা ৩ ঘণ্টা অন্তর একবার করিয়া সেবন করিলে এক বা দুই দিনেই ঐ দুই রোগের উপশম হয়। নাক দিয়া প্রবলবেগে রক্ত পড়িতে থাকিলে ইহার রস নাক দিয়া শুষিয়া লইলে তৎক্ষণাৎ রক্তপাত বন্ধ হইয়া যায়। (২) দূর্ব্বার রসের গুণ ও ব্যবহার অবিকল আয়াপানের ন্যায়। (৩) ডালিম পাতার রস। (৪) গাঁদা পাতার রস (৫) কামিনী পাতার রস; ইহারা সকলেই এক গুণ ও এক ধর্ম্ম বিশিষ্ট। একটীর অভাব হইলে অপরটী তাহার স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রক্তামাশয়ের ঔষধ। শিরীষ গাছের কচি ডগা ৩ হইতে ৭টী পর্য্যন্ত সেই পরিমিত গোলমরিচের সহিত চন্দন পানা করিয়া বাটিয়া সেই পরিমাণে কাশীর চিনির সহিত মিশাইয়া একটী পাথর বাটীতে সরবত করিয়া ৩ দিন সকালে পান করিলে রক্তামাশয় রোগ আরোগ্য হয়। মাত্রা—৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ৩টি, ৫ হইতে ১২ পর্য্যন্ত ৫টি, তদূর্দ্ধ ৭টি। পথ্যের ব্যবস্থা। মৎস্যের ঝোল ও ঘোলের সহিত পুরাতন চাউলের অন্ন ও লঘু পাক দ্রব্য আহার করিবে।

জমীর সার।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে কৃষিকার্য্যের বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীর সভ্য জাতিগণ কৃষি-কার্য্যে এতাদৃশ অগ্রসর হইয়াছেন যে, কৃষিকার্য্য সাধারণ রাজনীতির একটী অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সকল দেশেই শাসন বিভাগের সহিত কৃষিবিভাগও সংযুক্ত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-কার্য্য সম্পাদনের প্রথা অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হইল প্রচলিত হইয়াছে।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক গাস্টাস্ ভন লিবিগ (Gustus Von Leybeg) কৃষিবিজ্ঞানসম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। রাসায়নিক কৃষিবিজ্ঞানের উৎপত্তি ঐ সময় হইতেই হইয়াছে এবং বলিতে হইবে সেই পুস্তক কৃষিরসায়নসম্বন্ধীয় প্রথম পুস্তক বলিয়া পরিগণিত। ঐ সময় হইতেই কৃষিরসায়ন ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে। কৃষিরসায়ন বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে সাধারণ রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আবশ্যক। বৃক্ষের সহিত জল, মৃত্তিকা ও বায়ু প্রভৃতির যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তৎসমুদয় জানা নিতান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আমরা কৃষিরসায়নের কতকগুলি মূল সূত্র বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। এই সমস্ত বুঝিতে হইলে রসায়ন শাস্ত্রে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক;

একটী সাধারণ বৃক্ষ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিদ্যমান আছে।

একটি বৃক্ষে 'জল' শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ ভাগ আছে।

অম্লজান ...	...	৩৩
উদজান ...	...	৫
যবক্ষারজান	...	১/২ .. ৪
অঙ্গার ...	...	৫০
টাইনসিয়ম, কেলসিয়াম, মেটালিক অক্সাইড	}	১ ... ৪, কোন কোন স্থানে ১ হইতে ২০

সাধারণ বৃক্ষে নিম্নলিখিত মূল পদার্থগুলি দৃষ্ট

হয়। অঙ্গার (Carbon) উদজান (Hydrogen) অম্লজান (Oxygen) সোরাজান (Nitrogen) ফস্‌ফরাস্ (Phosphorous) গন্ধক (Sulphur) ক্লোরিন (Chlorine) সিলিকন (Selecon) কেলসিয়ম্ (Calcium) লোহ (Iron) ম্যাগনেসিয়াম্ (Magnesium) পোটাসিয়াম্ (Potassium) সোডিয়াম্ (Sodium) ম্যাঙ্গানিস্ (Manganese.)

বৃক্ষপোষণোপযোগী মূলপদার্থগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভাগ করিতে পারা যায়। উদ্ভিদগণ আপনাদের শরীরপোষণোপযোগী কতকগুলি পদার্থ পত্রদ্বারা বায়ু হইতে এবং মূলদ্বারা মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। বায়ুস্থিত পদার্থগুলি অঙ্গারক আর মৃত্তিকাস্থিত পদার্থগুলি অনঙ্গারক। একটী বৃক্ষ পোড়াইলে ভস্মরূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে তৎসমস্তই প্রায় অনঙ্গারক, বৃক্ষের অঙ্গারক পদার্থগুলি প্রায়ই বায়ুতে মিশিয়া যায়। ভস্মের সহিত কিয়ৎপরিমাণে অঙ্গারক পদার্থও মিশ্রিত থাকে। বৃক্ষশ্রেণী সূর্য্যের আলোকে কার্ব্বণিক্ এসিড্ গ্যাস গ্রহণ করিয়া নিজ দেহ পরিপুষ্ট করে এবং ঐ সময়েই তাহারা অক্সিজেন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অন্ধকারে উহারা কার্ব্বণিক্ এসিড্ গ্যাস পরিত্যাগ করে। আমরা প্রশ্বাসদ্বারা যে কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস পরিত্যাগ করি, উদ্ভিদেরা তাহা গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। এবং উদ্ভিদেরা যে অক্সিজেন পরিত্যাগ করে তদ্দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা হয়। ফলতঃ জীব জগতের সহিত উদ্ভিদ জগতের এরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে, পৃথিবীতে কোন প্রাণীই জীবন ধারণ করিতে পারিত না। কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস বৃক্ষের একটী প্রধান খাদ্য। অগ্নি প্রজ্বালনদ্বারা, জীবদিগের প্রশ্বাস দ্বারা এবং পচা জীবজন্তু হইতে কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস বাহির হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলে প্রত্যেক ৩৩০০ অংশে ১ অংশ কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস রহিয়াছে। যদি এই পৃথিবী কেবল বৃক্ষপুঞ্জপূর্ণ হইত তাহা হইলে পৃথিবীর উপরিস্থিত কার্ব্বণিক্ এসিড্ গ্যাস নিঃশোষণ করিতে বৃক্ষরাজির অন্ততঃ ৮ বৎসরকাল লাগিত। উদ্ভিদেরা বায়ুমণ্ডল হইতে যে সমস্ত দ্রব্য (অর্থাৎ কার্ব্বণ, অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন ইত্যাদি) গ্রহণ করে, তৎসমুদয় বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে বৃক্ষের গ্রহণোপযোগী পদার্থগুলিকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। আমরা সেই বিভাগ ধরিয়া যথাস্থলে পদার্থগুলির বিষয় সমালোচনা করিব।

ক। উদ্ভিদগণ বায়ুমণ্ডল হইতে যে সমস্ত পদার্থ গ্রহণ করে :—

(১) কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস —। ইহার গুণাবলি পূর্ব্বেই একপ্রকার বিবৃত হইয়াছে। উক্ত গুণাবলি ব্যতিরেকে ইহার আর একটী মহৎ গুণ আছে। এই বাষ্পমিশ্রিত জল খনিজ পদার্থগুলিকে দ্রব করিতে পারে। বৃক্ষের মূল হইতেও এই বাষ্প বহির্গত হয়। বৃক্ষের এই বাষ্প উদ্গীরণ করার শক্তি থাকায় মৃত্তিকাস্থিত দ্রব্যগুলিকে আপনার পরিপুষ্টির জন্য দ্রব করিয়া টানিয়া লইতে পারে। বৃক্ষের অন্তর্দ্দাহ (আসমোসিস্) নামক শক্তিদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস বৃক্ষের অঙ্গারক ভাগ পরিপুষ্টির উপায়।

(২) অম্লজান এবং উদজান—উদ্ভিদেরা জল এবং বায়ু হইতে এই দুইটী পদার্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহারা উদ্ভিজ্জ জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ।

(৩) সোরাজান—ইহা বৃক্ষের একটী প্রধান খাদ্য। পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণে সোরাজান্ বিদ্যমান আছে। উদ্ভিদ তিন প্রকার উপায়ে সোরাজান সংগ্রহ করিতে পারে। (১) বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজানরূপে, (২) এমোনিয়ারূপে (৩) মৃত্তিকা হইতে নাইট্রিক্ এসিড্‌রূপে। বায়ুমণ্ডলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকিলেও বৃক্ষ তাহা সহজে গ্রহণ করিতে অশক্ত। সংপ্রতি ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, কতকগুলি মটর জাতীয় (Papillionaceal) গাছের মূলের সোরাজান সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা আছে। জর্ম্মণ দেশীয় বৈজ্ঞানিক হেলরিগেল (Hellriegel) প্রমাণ করিয়াছেন যে মৃত্তিকাতে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র কীটাণু আছে তাহারা ঐ জাতীয় বৃক্ষের মূলে অবস্থিতি করে এবং তাহাদের সাহায্যে উক্ত মটর জাতীয় উদ্ভিদ সমূহ সোরাজান্ সংগ্রহ করিতে পারে। সোরাজান দ্বারা উদ্ভিদের শাখা পল্লব

পরিপুষ্ট হয় এবং পাতায় হরিতবর্ণ প্রগাঢ় হয়। বৃক্ষে ফুল ধরিবার সময় সোরাজান ঘটিত সার ব্যবহার করা অন্যায়। কারণ তদ্দ্বারা কেবল বৃক্ষের পল্লব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ফুল ফল প্রসবের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে। সোরাজান ঘটিত সার সচরাচর জলে ধুইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য উক্ত সার সমূহ অতি সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

খ। উদ্ভিদেরা যে সকল পদার্থ মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করে।

(১) ফস্‌ফরাস্ — ইহা বৃক্ষের একটী প্রধান উপাদান। ফস্‌ফরাসে দুইটি যৌগিক পদার্থ আছে, উহারা বৃক্ষজীবনের পক্ষে বিশেষ উপকারী। একটী অদ্রবণীয় "ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট", অপরটী দ্রবণীয় "কাল্‌সিয়াম্ ফস্‌ফেট"। প্রথমটী বৃক্ষের পক্ষে তাদৃশ উপকারী নহে, কিন্তু স্বয়ং পরিবর্ত্তিত হইয়া এবং অপরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বৃক্ষের হিতকর হইয়া থাকে। দ্বিতীয়টীর অপর নাম "সুপার ফস্‌ফেট অফ লাইম"। ইহা কয়েকটি গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। ইহাকে জলের সহিত মিশাইতে পারা যায়। তজ্জন্য ইহা বৃক্ষের পক্ষে বিশেষ উপকারী, ফস্‌ফরসের বাঙ্গালা নাম "হাড়্‌জান"।

(২) পটাস্ (ক্ষারজান)—উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতে ক্ষারজানরূপে যে উপাদান সংগ্রহ করে তাহা বৃক্ষাদি পচিত হইলে মৃত্তিকাতেই থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ বৃক্ষের কোমল এবং বর্দ্ধনশীল অংশগুলিতে অধিক পরিমাণে ক্ষারজান পাওয়া যায়। বৃক্ষ হইতে ক্ষারজানঘটিত সার প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত অংশগুলি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সচরাচর ছাই, ধান্যের তুঁষ, তুলার বীজ, তামাকের খাড়ি ইত্যাদি হইতেই ক্ষারজান পাওয়া যায়।

(৩) ক্যাল্‌সিয়াম্ (চূণ)—আমাদের দেশের জমীতে সচরাচর চূণের ন্যূনতা অতি অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চূণ একটী উৎকৃষ্ট সার এবং একই স্থলে ইহা দ্বারা আশ্চর্য্যজনক ফল লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। চূণের কয়েকটি প্রধান গুণ নিম্নে লিখিত হইল। (১) অপরাপর দ্রব্য অপেক্ষা চূণ অতি সত্বর সার যুক্ত মৃত্তিকাকে বোদমাটিতে পরিণত করিতে পারে। (২) আমাদের দেশে সূর্য্যের প্রখর কিরণে ঐ সারকে পরিবর্ত্তিত (Oxidised) হইতে দেয় না। (৩) এই চূণ বোদমাটির সাহায্যে অথবা অপর কোন উপায়ে বৃক্ষপোষণোপযোগী হাড়্‌জান এবং ক্ষারজান সংগ্রহ করে। (৪) যাহাতে মৃত্তিকায় যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকিতে পারে তদ্রূপ কার্য্য করে। (৫) চূণ মাটির ছিদ্র পরিষ্কার রাখিয়া বৃক্ষের পরিপুষ্টি সাধন করে।

মটরজাতীয় বৃক্ষের পক্ষে চূণ সময়ে সময়ে উপকারী। বিঘা প্রতি অৰ্দ্ধমণ পর্য্যন্ত চূণ দেওয়া যাইতে পারে। কোন উদ্ভিদ রোপণ বা বপন করিবার অন্ততঃ পাঁচ মাস পূর্ব্বে জমীতে চূণ দেওয়া উচিত নতুবা চূণের ঝাঁজে বৃক্ষ শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

(৪) জিপসম্ (Gypsum) মৃত্তিকায় প্রয়োগ করিলে সোরাজান্ এবং এমোনিয়া নষ্ট হইবার অতি অল্পই সম্ভাবনা।

(৫) সোডিয়াম্ সল্‌ফেট (Sodium Sulphate) ইহা যব, গম, খেসারী কলাই, আলু প্রভৃতি শস্যে বিঘা প্রতি এক সের হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৬) সোডিয়াম্ ক্লোরাইড (Sodium Chloride)—লবণ জমীতে আগাছা মারিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখন কখন খড় এবং ডাটা শক্ত করিবার জন্য ও চূণ ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ সোয়ালো নামক পক্ষীর বিষ্ঠার সহিত উহা ব্যবহার করেন।

(৭) ম্যাগনেসিয়ম্ (Magnesium) ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডিজর্ডিনে এর মত যে স্থানে দ্রাক্ষা, কিস্‌মিস্ প্রভৃতির চাষ করা হয় সেস্থানে ম্যাগনেসিয়াঘটিত সার থাকা বিশেষ আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত উপাদান গুলি ভিন্ন মৃত্তিকায় আরও অনেক বৃক্ষপোষণোপযোগী পদার্থ আছে। কিন্তু উদ্ভিদেরা তাহা অতি অল্প মাত্রায় গ্রহণ করে বলিয়া আমরা তাহাদের বর্ণনা করিতে বিরত হইলাম।

এপর্য্যন্ত আমরা সার অর্থে বৃক্ষের খাদ্য গুলিরই উল্লেখ করিলাম। সার বাস্তবিকই বৃক্ষের খাদ্য। আমাদের যেরূপ খাদ্যের অভাব হইলে শরীর শুষ্ক হইয়া যায় বৃক্ষের পক্ষে সারও ঠিক সেইরূপ। উদ্ভিদের তিনটী প্রধান খাদ্য। সোরাজান, হাড়্‌জান ও ক্ষারজান। বৃক্ষবিশেষের পুষ্টির জন্য এই তিনটী খাদ্যের মধ্যে কোন একটী খাদ্য যোগাইতে হয়,

অথবা তিনটীই যোগাইতে হয়। যে সারে যে খাদ্য প্রধান তাহাকে সেই প্রধান সার বলিয়া থাকে। যথা ক্ষারজান প্রধান অর্থাৎ উক্ত সারে অপরাপর পদার্থ অপেক্ষা ক্ষারজানই অধিক পরিমাণে রহিয়াছে এবং বৃক্ষকে ক্ষারজান যোগাইবার জন্যই উক্ত সার ব্যবহার করা যাইতেছে। আমরা নিম্নে বৃক্ষের উক্ত তিনটী প্রধান খাদ্য কিরূপ পদার্থসংযোগে পাওয়া যাইতে পারে তাহার একটী তালিকা দিলাম।

১। সোরাজানপ্রধান সার।

সার সমূহের মধ্যে সোরাজান একটী প্রধান সার। সোরা আমাদের দেশে অনেক স্থানে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিহার প্রদেশে সোরা সংযুক্ত মাটি আফিং এর চাষে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে তামাক, গম প্রভৃতি ফসলের জন্য সোরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সোরা-সারের কার্য্য অতি শীঘ্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ছাই প্রভৃতির ন্যায়, সোরার সারের উপকারিতা তত স্থায়ী নহে। সুতরাং এক আবাদে যে পরিমাণে সোরা আবশ্যক হইতে পারে তাহাই ব্যবহার করা উচিত। বিঘা প্রতি ৩, মণ হিসাবে সোরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজ বুনিবার সময় বা গাছ বাহির হইলে সোরা জমীর উপর ছড়াইয়া দিতে হয়, কিন্তু জমীতে জল সেচন না করিলে সোরার কিছুই উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল জমীতে জল সেচনের অসুবিধা সেখানে সোরা না দেওয়াই ভাল। এক জমীতে ক্রমান্বয়ে ৩ বৎসরের অধিক সোরা ব্যবহার করিলে সোরার উপকারিতা আর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ছাইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সোরা ব্যবহার করাই ভাল।

কিন্তু সোরা দুষ্প্রাপ্য সার, ইহার মণ ৩, টাকা হইতে ৮, টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সাধারণ কৃষকের মধ্যে ইহা ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই; কেবল ইক্ষু তামাক প্রভৃতি যে সকল ফসলে অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলেই সোরা ব্যবহৃত হইতে পারে। সোরার সহিত খড়ি নিমক, লবণ, প্রভৃতি অপর দ্রব্যও মিশ্রিত থাকে।

২। রক্তের সার।

শুষ্ক রক্ত উত্তম সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ রক্তে ৮০ ভাগ জল, ৪ ভাগ সোরাজান, ১ ভাগ ফস্ফরিক এসিড্ এবং অন্যান্য জিনিস আছে। কাঁচা রক্তে দশ গুণ জল মিশাইলে ফলকর বৃক্ষের অত্যুত্তম সার হয়। রক্তসার নিম্নলিখিত উপায়ে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। একটী টিন অথবা অপর কোনরূপ ছিদ্র বিহীন বাক্সে সদ্য রক্ত ধরিয়া এবং উহা ৫ গুণ চূণের সহিত মিশ্রিত করিবার পর আর এক স্তর চূণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে উহা কিছুদিন পরে শুষ্ক হয় এবং এই প্রকার রক্তের সার অনেক দিন অপরিবর্ত্তিত ভাবে থাকিতে পারে। সাধারণতঃ ফলকর বৃক্ষের পক্ষে এই সারই বিশেষ উপকারী। রক্তের সহিত আয়রণ সল্ফেট মিশাইয়া কঠিন গন্ধহীন উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই সার নীল, ছোলা, তুঁত প্রভৃতি বৃক্ষের পক্ষে বেশ উপকারী। সচরাচর বালুকাময় মৃত্তিকাতেই রক্তসারের তেজ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা সর্ব্বপ্রকার জমীতে এবং সর্ব্বপ্রকার সোরাজানভুক উদ্ভিদের ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। ডাক্তার গ্রিফিথ্‌স্ শুষ্ক রক্তের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

সোডিয়ম্ ফস্ফেট ...	১৬.৭৭
ক্যাল্সিয়াম্ এবং ম্যাগনেসিয়াম্ সল্ফেট	৪.১৯
আয়রণ অক্সাইড, " ফস্ফেট	৮.২৮
লবণ ...	৫৯.৩৪
ক্ষারজান	৬.১১
চূণ	৩.৮৫
জিপসম্ এবং পরীক্ষায় ক্ষতি ...	১.৪৫
	১০০.০০

৩। তৈলযুক্ত সার।

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার তৈলযুক্ত সার রহিয়াছে; যেমন মসীনা, রেড়ি, তিল, তুলাবীজ ও নারিকেল প্রভৃতির তৈল। আমাদের দেশে সাধারণতঃ এই সমস্ত দ্রব্য অতি সামান্য মাত্রাই সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদেশীয়েরা ঐ সমস্ত দ্রব্য সার করিবার জন্য অথবা গবাদি জন্তুদিগকে খাওয়াইবার জন্য লইয়া যায়। উভয়

কার্য্যের জন্যই এই সমস্ত দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে যে তালিকা দিলাম তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, আমাদের দেশে যে তৈলযুক্ত ফসল উৎপাদিত হয়, তন্মধ্যে প্রায় ১/৬ অংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষীয় কৃষকেরা এখনও এই সমস্ত দ্রব্যের গুণ ভালরূপ বুঝিতে পারে নাই। আমরা ইহাদের মধ্যে এক্ষণে কয়েকটী সারসম্বন্ধে কিছু বলিব।

তৈলবীজ	উৎপন্ন টন্ ১ টন = ২৭ মন।	রপ্তানি বীজ	রপ্তানি তৈলের সমান পরিমাণ বীজ। টন	রপ্তানি খৈল টন
তিসি ..	৬৪৭০০০	৪৫০০০০	১২০০০	
রাই এবং সরিষা	১২২১০০০	২৩৭০০০	২১০০	
তৈল ..	১৭৬০০০	১১৬৭০০	[illegible]	
তুলা ...	৯৯২০০০	৪৮০০	....	
চিনের বাদাম ..	৩৮৫০০০	১১৯০০০	২০০	
	৩৪২১০০০ ...	৯২০৪০০ .	৭৫০০০ ..	২৩০০০

Agricultural Ledger No. 8 of 1897. Page 23.

রাই এবং সরিষা—সরিষার খৈল সাধারণতঃ গবাদি জন্তুদিগের একটী প্রধান খাদ্য এবং কোন কোন স্থানে সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খাঁটি সরিষার খৈলে শতকরা ৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। কিন্তু সরিষার খৈলের সহিত বালি ধূলা প্রভৃতি অপর দ্রব্যও মিশ্রিত থাকে।

তুলার বীজ—তুলার বীজ বিদেশে অতি অল্পই রপ্তানি হইয়া থাকে। উহা এতদ্দেশীয় জন্তুদিগকে খাওয়াইবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পুণাকৃষিক্ষেত্রে ইক্ষুর জন্য এই সার প্রয়োগ করিয়া খৈলের সারের সমান ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে শতকরা ৩।৪ ভাগ নাইট্রোজেন আছে।

রেড়ির খৈল—ইহা জন্তুদিগের খাদ্য নহে। পুনাকৃষিক্ষেত্রে ইক্ষুর সারের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান অঞ্চলের কৃষকেরা আলুর চাষে এবং ধান্য ও পাটের চাষে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে নাইট্রোজেনের হিসাব ধরিতে গেলে ৬/ মণ রেড়ির খৈল ১৫০/ মণ গোবর সারের সমান।

এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে আরও অনেক প্রকার তৈল সংযুক্ত সার পাওয়া যায়। কিন্তু তৎসমুদয় সাররূপে ব্যবহৃত হয় না। যে সকল জন্তুকে খৈল খাওয়ান হয় তাহাদিগের মলমূত্র সমধিক পরিমাণে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। ঐ মল এবং মূত্রে প্রভূত পরিমাণ সার পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে উহাতে দুইটী কার্য্য সাধিত হয়। জন্তুদিগের পুষ্টিসাধন এবং জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৪। বিবিধ।

পাঁক—পাঁক একটী সারবান পদার্থ। পুকুরে বৃক্ষাদি এবং জল জন্তুসমূহের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা যে পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাকেই চলিত ভাষায় পাঁক বলিয়া থাকে। সদ্য পাঁক সাররূপে ব্যবহার করা নিয়ম বিরুদ্ধ। কারণ সদ্য পাঁকে এমন কতকগুলি অঙ্গারক দ্রাবক রহিয়াছে যে উহা পরিবর্ত্তিত অবস্থায় প্রয়োগ না করিলে বৃক্ষের সমধিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। পাঁক সাধারণতঃ ফলবৃক্ষের জন্য ব্যবহৃত হয়। ধান্য চাষে পাঁক ব্যবহার করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। বড় বড় ফলকর বৃক্ষের জন্য প্রতি /৫ সের পাঁকে অর্দ্ধসের হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। এবং কলাগাছের মূলে পাঁক প্রয়োগ করিলে অধিক ফল বৃদ্ধি হইতে পারে।

পচা মাছ—পচা মাছ সাধারণতঃ ফলবৃক্ষের পক্ষে উপকারী। প্রত্যেক গাছের মূলে /২॥ সের হিসাবে এই সার প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

জন্তুদিগের মল এবং মূত্র—ইয়ুরোপ এবং

আমেরিকা মহাদেশে জন্তুদিগের মলমূত্র সাররূপে অনেক প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং এই সার পশুশালার আবর্জ্জনার সহিত মিশ্রিত হইলে উহাকে ফার্ম্ ইয়ার্ড ম্যানিয়োর্ (Farm-yard manure বলিয়া থাকে। এই সার প্রস্তুত প্রণালী পরে বর্ণিত হইবে। জন্তুদিগের মলমূত্রে যে সার পাওয়া যায় তাহাতেই বৃক্ষপোষণোপযোগী অনেক পদার্থই নিহিত থাকে। জন্তুদিগের অবস্থানুসারে সারের পরিমাণও নির্দ্ধারিত হয়। সাধারণতঃ উক্ত পশু সারকে নিম্ন লিখিত কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম। ঘোড়ার বিষ্ঠা—ইহা উত্তাপের সহিত সত্বর বিশ্লেষিত হইয়া যায়। এই জন্য ইহার নাম উষ্ণসার।

২য়। ছাগল ও ভেড়ার বিষ্ঠা—ইহাতে সোরাজান এবং উদজান্ এই দুইটী পদার্থ ঘোড়ার সার অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে আছে। কিন্তু ইহাতে ঘোড়ার সার অপেক্ষা ক্ষারজানের ভাগ কম।

৩য়। শূকরের বিষ্ঠা—ইহা বিশ্লেষিত হইবার সময় তাদৃশ উত্তাপ উৎপন্ন হয় না তজ্জন্য ইহাকে শীতল সার বলা যাইতে পারে। ইহা সাধারণতঃ অপর সারের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা উচিত।

আমাদের দেশে ঘোড়া এবং শূকরের সার অপেক্ষা গোবর এবং ভেড়ার সার অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মলত্যাগ করিবার জন্য ভেড়ার পালকে রাত্রে জমীর উপর রাখা হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে ভেড়ার সার তত প্রচলিত নহে। সাধারণতঃ গোবর সারই এখানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোবর সার যত্নের সহিত রক্ষিত হইলে উৎকৃষ্ট সার হয়। গোবর সার এতদ্দেশে আবর্জ্জনার সহিত মিশ্রিত করিয়া একস্থানে স্তূপাকার করিয়া রাখা হয়। কিন্তু তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ সার ভালরকম পচিতে পায় না, দ্বিতীয়তঃ সার শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় বৃক্ষপোষণোপযোগী অনেক পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ বৃষ্টির জলে এমোনিয়া, পটাস্, ফস্ফরিক্ এসিড্ প্রভৃতি দ্রবণীয় অংশ ধুইয়া যায়। গোবর সার ভাল করিয়া সংগ্রহ করিতে হইলে উহা একটী বড় গর্ত্তের মধ্যে রাখিতে হয় এবং উহার সহিত আকের পাতা, অরহরের পাতা প্রভৃতি মিশ্রিত করিতে পারিলে আরও সুবিধা হয়। গোবর সার শীঘ্র শুকাইয়া যায়। যাহাতে শীঘ্র না শুকায় এবং সরস থাকে এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত। উক্ত সারের সহিত গোমূত্র সংযোগ করিলে বৃক্ষপোষণী শক্তি বৃদ্ধি পায়। এবং সারের মাত্রা ও বাড়িয়া যায়। মূত্রের সহিত কিয়ৎপরিমাণে চুণ মিশ্রিত করিলে আরও ভাল হয়। কারণ তাহাতে মূত্রের এমোনিয়া অংশ নষ্ট হইতে পারে না। গোবর সার রীতিমত প্রস্তুত করিতে পারিলে উহা অনেক বিদেশীয় ভাল সার অপেক্ষাও অনেক উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রত্যেক কৃষকেরই গোবর সার সংগ্রহ করা আবশ্যক। কোন একটী গরুকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার দিয়া তাহার বিষ্ঠা (রাত্রিতে) একত্র করিলে বৎসরে প্রায় ৪১।৹ মণ হয়। সকল গরুই যে বৎসরে সমান পরিমাণ বিষ্ঠা ত্যাগ করে এমন নহে। ফলতঃ অধিকাংশ গরুই বৎসরে গড়ে প্রায় ৪ /৹ মণ বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে গোবর সঞ্চিত হয়। তন্মধ্যে জ্বালানি ঘুঁটে প্রস্তুত করিতে কতক ব্যয়িত হইয়া যায়, উহাদ্বারা বৃক্ষের বিশেষ কোন উপকার হয় না। গোবর সারে সাধারণতঃ বিভিন্ন সারের মাত্রা নিম্নলিখিত পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শিবপুর ১৮৯৫	কানপুর গোবর	গোবর এবং চোনা	সাধারণ পশুসার	ডুমরাওন গোবর	বর্দ্ধমান গোবর	বর্দ্ধমান গোবর	বর্দ্ধমান গোবর	বর্দ্ধমান গোবর	বর্দ্ধমান গোবর	
৬৫. ৪৮	৪৬ ৬০	২৫ ৩৮	৩৩. ৮৬	৩২. ৮৫	৭১. ৫৯	২৫. ৯৬	৫৯. ১৯	৭২. ৩৩	৬৭. ৮৪	জল
১৭. ১৬	২১ ৩০	১২. ৬৯	১৭. ১১	২৪. ২২	,,	,,	,,	,,	,,	অঙ্গারক
১২. ২১	২৪. ৫৬	৫২. ৩৯	৪০. ৯৮	৩১. ২৮	১২. ৮৫	৪১.৪৫	২২.৩০	১১. ৩৮	১২. ৮৫	
.৫৯৭	.৫৬৬	.২৯০	.৪৯৮	.৩৮৭	.২৯৯	,,	,,	,,	,,	ফস্ফরিক এসিড্
.৬০৬	.৮১১	.৪৬০	.৬৫২	.৬৫৬	.৪৮৩	.৮৪৭	.৬১৩	.৪৬৪	.৪৭৫	নাইট্রোজেন

Agricultural Ledger No. 8 of 1897. Page 8.

এই তালিকা দৃষ্টে বিভিন্ন স্থানের গোবর সারে বৃক্ষপোষণোপযোগী পদার্থ সমূহের পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইবে। সাধারণতঃ গোবর সার অনেক ফসলে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। এবং ইহার সহিত সোরা মিশাইয়া ধান্য, ইক্ষু প্রভৃতি ফসলে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

আমাদের দেশে "পক্ষীর সার"। হাঁস, মুরগী, পায়রা, প্রভৃতির মল মূত্র সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের সার অতি উৎকৃষ্ট। মুরগীর এবং পায়রার বিষ্ঠা শাকসব্জী চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। /৫ সের জলের সহিত অর্দ্ধ পোয়া সার মিশাইলেই যথেষ্ট হয়। মুরগীর মলে ইউরিক্‌এসিড্ থাকায় উহা বৃক্ষের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

উল্লখিত সারসমূহ ভিন্ন আরও অনেক প্রকার দেশীয় ও বিদেশীয় সার পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তৎসমুদয় উল্লেখ করা গেল না। কিন্তু দুই একটী সারের কথা উল্লেখের যোগ্য। চামচিকার বিষ্ঠা ইক্ষু চাষের পক্ষে বেশ উপকারী হাতী এবং উটের মল শক্ত মাটিকে আল্‌গা করিয়া দিতে পারে, উক্ত সার শাকসব্জী চাষের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নীলের সিটিও শাকসব্জীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। রন্ধন গৃহের ঝুল পোকা নিবারণ করিতে পারে। ইয়ুরোপ এবং আমেরিকার অনেক স্থানে জন্তুদিগের সারের পরিবর্ত্তে এক প্রকার রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি এই পরিমাণে আছে।

করাত গুঁড়া	... ...	৭০ মণ
কয়লা ,,	... ...	২৷৷০ "
হাড়ের ,,	... ...	৭ "
সলফেট অব সোরা		১৬ এক মণ ষোল সের
সল্‌ফেট অব মেগনেসিয়া		৷৷৮ আটাইস সের
লবণ	... ...	৷৷৮ আটাইস সের
চূণ	... ...	১১
	সর্ব্বশুদ্ধ	৬৪৷১ সের

উক্তপরিমাণ সার আমাদের দেশে ১৫ বিঘা জমীতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। জন্তুগণের মল মূত্র ব্যবহার করিলে যেমন উপকার দর্শে ইহাতে ও তাদৃশ উপকার দর্শিতে পারে।

ইতর জন্তুদিগের সারের বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিখিত হইল। এক্ষণে মনুষ্যের মল মূত্রের উল্লেখ করা আবশ্যক। অনেকে এবিষয়ে ঘৃণা প্রকাশ করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে এই ঘৃণা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। উন্নতিশীল সভ্যজাতিগণ ইহার বৃক্ষপোষণী শক্তি অবগত হইয়া সাররূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সার প্রস্তুত করণ প্রথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং অনেক বৈজ্ঞানিক ইহা হইতে সার প্রস্তুত করণের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে ইহা গাছের পক্ষে অত্যন্ত তেজস্কর। আলু, কপি প্রভৃতির চাষে ইহার সারবত্তা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সকল ফসলই ইহা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। ইংলণ্ড প্রদেশে সহরের জল স্রোতে যে মল মূত্র ধুইয়া যায় সে তাহা একস্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, পরে তাহাতে ফট্‌কিরী কয়লা মাটি এবং শুষ্ক রক্তের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে সারের অংশ নিম্নে জমিয়া যায় এবং জল পরিষ্কার হইয়া জলাশয়ে পতিত হয়। আমাদের দেশেও নানা স্থানে মনুষ্যের মল মূত্র হইতে সার প্রস্তুত করিবার বহুবিধ প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুণা জেলায় যে প্রণালী অনুসারে উক্ত সার প্রস্তুত করা হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথমে রাস্তা প্রভৃতির আবর্জ্জনা দগ্ধ করিয়া ভস্ম প্রস্তুত করা হয়। যে স্থলে মনুষ্যের মলমূত্র সার প্রস্তুত করা হইবে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে উক্ত ভস্ম সঞ্চিত করিয়া রাখিতে হয়। পরে ১৮ বর্গ ফুট এবং এক ফুট গভীর একটী চতুষ্কোণ গর্ত্তের তলদেশ ইটের দ্বারা বাঁধাইয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ ঐ গর্ত্তে ১ ইঞ্চি উচ্চ করিয়া উক্ত ভস্ম ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর ৫ ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ করিয়া মল নিক্ষেপ করা হয়। এবং তাহার উপর আবার ১ ইঞ্চি পরিমিত ভস্ম দিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ মল নিক্ষেপ-পূর্ব্বক উক্ত গর্ত্তটী পূর্ণ করিয়া ১ দিন অনাবৃত অবস্থায় রৌদ্রে রাখিয়া দিতে হয়। বর্ষাকালে অন্ততঃ ৩ দিনের জন্য উহার উপরিভাগ কোন প্রকার আবরণে আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। পরে ঐ ভস্মমিশ্রিত মল ওলট পালট করিয়া নাড়িয়া দিয়া অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত ভস্ম চাপা দিতে হয়। এইরূপ

অবস্থায় গ্রীষ্মকালে ৩ দিন এবং বর্ষাকালে ৮ দিন পর্য্যন্ত রাখিতে হয়। তৎপরে উহাকে উত্তমরূপ নাড়িয়া চাড়িয়া উপরে তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। ভালরূপ শুষ্ক হইলে উহা বিক্রয়ের উপযুক্ত হইয়া উঠে। ইয়ুরোপে এই মল হইতে সদ্য সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত প্রণালী ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফসেল মেন কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। প্রথমতঃ মূত্র ধরিয়া উহার সহিত সম পরিমিত চুণ মিশ্রিত করিতে হয়, তৎপরে এই শুষ্ক পদার্থের ৫ ভাগের সহিত ৪ ভাগ শুষ্ক মল মিশ্রিত করিয়া যে সার প্রস্তুত হয় তাহা একবারেই কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

জন্তুর সারের গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ প্রস্তুতকরণ প্রণালীর উপর অনেকটা নির্ভর করে। কারণ উক্ত প্রণালীতে অসাবধানতা ঘটিলে এমোনিয়া নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি সারাংশ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। পচিবার সময় ফারণহিটের ১৫০ ডিগ্রী উত্তাপের অধিক হইলেই উক্ত আশঙ্কা ঘটে। অতএব পচাইবার সময় গলনশীল দ্রব্যের সহিত কয়লা, চুণ প্রভৃতি দেওয়া আবশ্যক। মলমূত্রের সার ব্যবহারে আর একটী ভয় এই যে উহাতে পোকা জন্মিতে বা থাকিতে পারে। সার প্রয়োগ করিলে এই পোকা বর্দ্ধিত হইয়া বৃক্ষের অনিষ্ট সাধন করে, তজ্জন্য সার পচাইবার সময় উহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে তুঁতিয়া, চুণ মিশ্রিত করা উচিত।

শ্রীহরিদাস মিত্র, বি, এল,
কাশীপুর কৃষিশালা।

পুরাতন অক্ষর বিক্রয়।

লক্ষটাকা উপার্জ্জন

লক্ষটাকা উপার্জ্জন—এ কথা শুনিলে, লোকে উন্মত্তের প্রলাপ মনে করে। কিন্তু যদি লোকে মনে করে যে, লক্ষটাকা উপার্জ্জন করিব, তবে সে ঐ টাকা নিশ্চয়ই উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহা ধ্রুব সত্য। চিত্তের বলে মনুষ্য করিতে পারে না, এমন কার্য্য নাই, যদি ক্রমাগত তীব্র চিন্তাশক্তি প্রয়োগে লক্ষ টাকা উপার্জ্জনের পন্থানুসন্ধিৎসু হওয়া যায়, তবে এক দিন না এক দিন উহার প্রাপ্তির উপায় নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইবে।

কিন্তু কেবল মানসিক শক্তির বলে কোন কার্য্য সাধিত হয় না, উৎকট চিন্তার সহিত প্রবল চেষ্টা চাই। যে চেষ্টার বলে লোক ১০ টাকা উপার্জ্জনে সক্ষম হয়, সেই চেষ্টার অধিকতর কৃতকার্য্যতায় আবার সেই ব্যক্তিই ২০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। ক্রমে মানসিক বল এবং সাহসের বৃদ্ধির সহিত চেষ্টাশক্তি যতই বর্দ্ধিত হয়, উপার্জ্জনের ক্ষমতাও তাহার ততই অধিকতর হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, আজ যাহার দুই পয়সা উপার্জ্জনে ক্ষমতা নাই, চেষ্টার সাহায্যে কাল সে দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, কালে সেই ব্যক্তি সেই চেষ্টার বলেই লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিবে, তাহার আর বৈচিত্র কি?

উদ্যমই চেষ্টার প্রধান সহায়, চেষ্টা একবার দুইবার কেন, শত সহস্রবার ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু উদ্যম ছাড়িলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ-মুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মী অর্থাৎ প্রচুর সম্পত্তি লাভে সক্ষম হয়।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এ কথা যদি উন্মত্তের প্রলাপ না হয়, তবে তন্ময় হইয়া একই বিষয়ের চিন্তা এবং উপযুক্ত উদ্যম ও চেষ্টা প্রয়োগ করিলে লক্ষ কেন, কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। একজন মনুষ্য যাহা করিয়াছে, অপর মনুষ্য তাহা পারিবে না কেন? কিন্তু অন্যের কার্য্যফল দেখিয়া ফলের প্রত্যাশা করিতে গেলেই বিড়ম্বনাভোগ ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ হয় না। একব্যক্তি ওকালতী বা অন্য কার্য্যের দ্বারা প্রচুর

সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছেন, যদি তাঁহার কার্য্য ফল দেখিয়াই কেহ সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার সমস্ত আশাই বিনষ্ট হইবে।

কার্য্য শিক্ষার উপর উপার্জ্জন নির্ভর করে। যে কার্য্যে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে পারদর্শিতা লাভ করিবে, সেই কার্য্যে তাহার উপার্জ্জন ততই অধিক হইবে কার্য্যের ছোট বড় নাই। সকল কার্য্যই সমান—সকল কার্য্যেই শিক্ষার গুণে সমান লাভ হইয়া থাকে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী শিক্ষার গুণে যেরূপ সম্প ও উপার্জ্জন করিতে পারেন, ওকালতি করিয়াও আর একব্যক্তি সেই পরিমাণে বা ততোধিক সম্পত্তির অধীশ্বর হইতে সক্ষম হন, আবার মুদিখানা বা পুস্তকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেওয়া যাইতে পারে।

সামান্য অবস্থা হইতে প্রচুর সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখান যায়। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট গ্রামের জনৈক নিরক্ষর কৃষক উদ্যম, উৎসাহ, চেষ্টা এবং মানসিক শক্তির বলে ২০ বৎসরের অন্যূন সময়ের মধ্যে দরিদ্র কাঠুরিয়ার কার্য্য হইতে এক্ষণে ১০ হাজার বিঘা জমির অধিকারী। তাহার আয় বৎসর ২০ হাজার টাকার ন্যূন নহে।

উপার্জ্জন করিতে গেলে, অভিমান পরিত্যাগ করিতে হয়। এ কার্য্য ছোট এ কার্য্য বড়, মনোমধ্যে এরূপ ভেদজ্ঞান থাকিলে, তাহার কখনও উন্নতি হয় না। এতদ্ব্যতীত কিছু না জানিয়া কাহারও অবলম্বিত উপায়ের অনুকরণ করিতে গেলেও বিড়ম্বনাভোগ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, তাহাতে আপনার অনিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে যে কার্য্যের অনুকরণ করা যায়, তাহাও নষ্ট হয়। অতএব এক ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে দেখিলে, তাহার ফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কি উপায়ে সে কৃতকার্য্য হইল, সেই উপায়টীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা অবলম্বন করিতে হইবে।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে "First deserve then desire" অর্থাৎ প্রথমে যোগ্যতা লাভ কর, তার পর আশা করিও। যে, যে কার্য্যের যতটুকু যোগ্য, তাহার সেই কার্য্যে সেরূপ প্রাপ্তিই ঘটিবে। এই যোগ্যতা লাভ করিতে গেলে, অসাধারণ সহিষ্ণুতা, উৎকট পরিশ্রম এবং অদম্য উৎসাহ চাই। পরিশ্রমের ফল কখনই ব্যর্থ হয় না। আপাততঃ অধিক উপার্জ্জন না হইলে, অথবা একেবারে অকৃতকার্য্যতা ঘটিলেও পরিশ্রমের ফলে অন্ততঃ একটু অধিক অভিজ্ঞতাও জন্মিবে। যে কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রম করা যায়, সে কার্য্যে সেইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারে।

পরিশ্রম দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক। যে ব্যক্তি উভয়বিধ পরিশ্রম একই কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন, তাঁহার সেই কার্য্যে সফলতা-লাভ অবশ্যম্ভাবী। মানসিক শ্রমে বুদ্ধি বৃত্তি তীক্ষ্ণ এবং শারীরিক পরিশ্রমে দেহ কর্ম্মক্ষম হইয়া থাকে। এইরূপ পরিশ্রমী ব্যক্তি যে কার্য্যই চেষ্টা করুন না কেন, অবলীলাক্রমে তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, কঠিন পরিশ্রমশীল ব্যক্তির অসাধ্য কোন কার্য্য থাকিতে পারে না।

কোন কার্য্যে লাগিয়া পড়িয়া না থাকিলে, কিছুতেই লোকে উন্নতি করিতে পারে না। লাগিয়া পড়িয়া থাকিতে গেলে সহিষ্ণুতার যথেষ্ট প্রয়োজন। লাভ লোকসান যাহাই ঘটুক না, যতই বিপৎপাত হউক না, সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া সতত অটল থাকিতে হইবে। নতুবা আপাততঃ কিছু অধিক লাভের প্রত্যাশায় এক কার্য্য হইতে অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পূর্ব্ব-অনুষ্ঠিত কার্য্যের সহিত পূর্ব্বকার্য্যের পরিশ্রমও বৃথা নষ্ট হয়, একথা মনে রাখিয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইতে হইবে। জীবনের যেন এক মুহূর্ত্তও বৃথা অতীত না হয়, এরূপ ভাবে, সাহস এবং সহিষ্ণুতার সহিত যে ব্যক্তি কার্য্য করিবেন, সেই ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

অলসতা সমস্ত কর্ম্মই বিফল করে। বিশ্রামের চেষ্টা হইতে অলসতা উপস্থিত হয়। "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ"—অজর অমরের ন্যায় বিদ্যা এবং অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে। বিদ্যা অর্থাৎ কার্য্য-শিক্ষা অর্থোপার্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত করে। সুতরাং কার্য্য-শিক্ষা বা উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কারের এবং অর্থ উপার্জ্জনের সময় রোগের অথবা মৃত্যুর চিন্তা করিলে অভীপ্সিত কার্য্যে

অন্তরায় উপস্থিত হয়। 'আর পরিশ্রম করিতে পারি না, একটু জিরাইয়া লই" কার্য্যে সময় এরূপ চিন্তা মনোমধ্যে একটী বার উদয় হইলে, আর পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। পরিশ্রমের সময় যাহাতে শ্রান্তিদূর করিবার চিন্তা মনে আসিতে না পারে, উপার্জ্জনোৎসুক ব্যক্তিকে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

আত্মশক্তির উপর সমস্ত কার্য্য নির্ভর না করিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। বেতনগ্রাহী ভৃত্য, বেতন ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য করে, সুতরাং ভৃত্যের হস্তে কোন কার্য্য সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিলে, সেই কার্য্যে লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতিই হইবে।

উপার্জ্জনের প্রধান সহায় জোগাড়। যে যেরূপ জোগাড় করতে পারে, সে সেইরূপ উপার্জ্জনে সমর্থ হয়। সমগুণবিশিষ্ট দুই ব্যক্তির মধ্যে জোগাড়ের বলে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা উন্নতি করিতে পারে কিন্তু এই জোগাড়ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। কত চেষ্টা, কত উদ্যম, কত কৌশল, কত যুক্তি, কত দৌড়াদৌড়ি করিয়া কার্য্যের জোগাড় করিয়া লইতে হয়। অসামর্থ্য-প্রযুক্ত জোগাড়ে ক্রটী করিলে কার্য্যে আশানুরূপ সুফল লাভের প্রত্যাশা করা যায় না। যে ব্যক্তি যেরূপ জোগাড় করিতে পারেন, তিনি ততই কাজের লোক। জোগাড়ে পটুতাই কার্য্যদক্ষতার পরিচায়ক। এই নিমিত্ত কেহ বা অনেক পরিশ্রমেও দুই টাকার জোগাড় করেন, আবার কেহ বা অল্প পরিশ্রমে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন। এ ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, যে ক্ষেত্রে যে উপায়ে কাজের যোগাড় করিতে হয়, কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি তাহার বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন।

মনুষ্য প্রথমে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অনন্যমনে সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে এবং সেই কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে, পরিশেষে সেই কার্য্যের দ্বারাই তাহার লক্ষ কেন কোটি টাকা উপার্জ্জন হইতে পারে।

কিন্তু ঐ কার্য্যে তাহাকে devoted বা কায়মনোবাক্যে সংলিপ্ত থাকিতে হইবে। কবীর বলিয়াছেন "যো যাকো শরণ লিয়ে, সো রাখে তাকে লাজ, উজান জলে মছলী চলে, বহি যায় গজরাজ" —অর্থাৎ যে যাহাকে শরণ লয় সেই তাহার লজ্জানিবারণ করে অর্থাৎ সেই তাহার সহায় হয়, যেমন জলের মধ্যবর্ত্তী আশ্রয়গ্রহণকারী ক্ষুদ্র মৎস্যও স্বচ্ছন্দে প্রতিকূল স্রোতে গমন করিতে পারে, কিন্তু বৃহৎকায় হস্তী তাহাতে ভাসিয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে, যে কোন একটী কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিলে, কায়মনোবাক্যে তাহার উন্নতি কামনা করিলে, ক্রমেই সেই কার্য্যের সম্বন্ধে তাহার অত্যধিক অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে। ক্রমেই সে তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব বাহির করিয়া তাহা হইতে উপার্জ্জনের নূতন উপায়ের আবিষ্কার করে।

বস্ত্র বয়ন, মৃন্ময় মূর্ত্তাদির গঠন, কৃষিকার্য্য, সূক্ষ্ম শিল্প, দ্রব্যের কারু প্রভৃতি যে কোন কার্য্য, শিক্ষার গুণে প্রচুর অর্থদানে সমর্থ। সুতরাং কোন কার্য্য ছোট বলিবার যো নাই। কার্য্যের উৎকর্ষতা অথবা অপকর্ষতার উপরেই উপার্জ্জনের ইতর বিশেষ নির্ভর করে। আজ যে হস্ত-পরিচালিত শিল্পকার্য্য, প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে যন্ত্র পরিচালিত শিল্পের সমকক্ষতা লাভে অসমর্থ, এ যন্ত্রের আবিষ্কারও উৎকৃষ্ট পরিশ্রম ও চিন্তাশক্তির ফল।

কার্য্যে বিরক্তিই অবনতির মূল। অমুক কার্য্যে আমার বিরক্তি বোধ হয়, উপার্জ্জনোৎসুক ব্যক্তিকে এরূপ চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে গেলে, বিরক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আনন্দিত চিত্তে কার্য্য আরম্ভ করিলে, সে কার্য্যের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। উন্নতি সীমাবদ্ধ নহে—উন্নতির শেষ নাই। যে যেরূপ ভাবে উন্নতির কামনা এবং চেষ্টা করে, তাহার সেইরূপ পরিমাণে উন্নতি হইয়া থাকে। সুতরাং লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে গেলে অগ্রে ঐ টাকা উপার্জ্জনের উপযোগী উন্নতি লাভ করিতে হইবে, ঐ টাকা উপার্জ্জন হইলে, আপনাকে তাহা রক্ষা করিবার উপযুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিতে হইবে, নতুবা বিনা চেষ্টায় বিনা পরিশ্রমে, বিনা সামার্থ্যে যখন ১ টাকাও উপার্জ্জন হয় না, তখন লক্ষ টাকা উপার্জ্জন দূরের কথা।

আপনার শক্তির প্রতি অবিশ্বাস এবং অপরের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ উপার্জ্জনের প্রধান অন্তরায়। শক্তির উৎকর্ষ-চেষ্টায় শক্তির বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। যে বিষয়ে শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করা যায়, সে বিষয়ে শক্তি সামর্থ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কুস্তি করিলে শারীরিক

বল এবং বিদ্যা লাভের চেষ্টা করিলে মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন বিষয়ে শক্তির অভাব বিবেচিত হইলে, যাহাতে সেই শক্তির স্ফুরণ হইতে পারে, অলসতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বদা তদ্গতপ্রাণ হইয়া সে বিষয়ের চেষ্টা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি মন্দির-নির্ম্মাণ করে, তাহার গতি ক্রমে উর্দ্ধ দিকে এবং কূপ-খননকারীকে ক্রমে নিম্নদিকে গমন করিতে হয়।

অপরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আত্ম-সামর্থের প্রতি অনেক সময়ে অবিশ্বাস জন্মে। অবস্থার উন্নতি করিতে গেলে, কেবল আপনার অবস্থা এবং লক্ষ্য বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কুরুবালকদিগের অস্ত্র-শিক্ষা-সমাপ্তির পর পরীক্ষা-গ্রহণ কালে দ্রোণাচার্য্য, শিষ্যবর্গকে বৃক্ষোপরিস্থিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী খঞ্জন পক্ষীর দক্ষিণ চক্ষু বিঁধিতে বলিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেন। কারণ সকলেই তন্ময়চিত্তে লক্ষ্য পদার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই। পরিশেষে অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ হস্তে পরীক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? অর্জ্জুন বলিলেন, আমি পক্ষী ও তাহার চক্ষু দেখিতেছি। গুরু তাঁহাকে তীর নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে বলিলেন। বিশেষরূপ লক্ষ্য করিবার পর যখন অর্জ্জুন বলিলেন, তীরের অগ্রভাগ ও খঞ্জনের চক্ষু ব্যতীত কিছুই দেখিতেছি না, তখন গুরু অর্জ্জুনকে তীর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। খঞ্জনের চক্ষু বিদ্ধ হইল। অর্জ্জুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপ অনন্য লক্ষ্য না হইলে অর্জ্জুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন কি? অতএব কার্য্যকালে অনন্যলক্ষ্য হইয়া কার্য্য করিলে, যে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে (১) সাহসী হইয়া মনে বল সঞ্চয় ও ক্রমাগত একই বিষয়ে তদ্গত-চিত্তে চিন্তাশক্তি প্রয়োগ (২) অনন্যকর্ম্মা হইয়া লক্ষ্য বিষয়েই চেষ্টা (৩) রীতিমত শিক্ষালাভ ও কার্য্য দক্ষতা (৪) অভিমান পরিত্যাগ (৫) কার্য্যে ভেদজ্ঞান পরিশূন্যতা (৬) একই বিষয়ে মানসিক ও শারীরিক উৎকট পরিশ্রমের নিয়োগ (৭) লক্ষ্য বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ এবং পরিশ্রম দ্বারা তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন (৮) জোগাড় (৯) আত্ম উপযোগিতা প্রতিপাদন (১০) অনন্যদৃষ্টি হইয়া লক্ষ্য বিষয়ের প্রতি আশক্তি—এই কয়টী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে মানুষে করিতে পারে না, এমন কার্য্য নাই।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

পশুখাদ্য। *

যত দিন যাইতেছে, ততই লোকের পেটের দায় বাড়িতেছে। মানুষের পেটের দায় অর্থে মানুষের আশ্রিত জীবজন্তু সকলেরই পেটের দায় বুঝিতে হইবে। আমরা সখ করিয়া কতক জীব-জন্তু পুষি, ব্যবসার জন্য কতক জীব জন্তু পুষি, আর বাধ্য হইয়া প্রয়োজনবশতঃ কতক জীব জন্তু পুষি। আমাদের দেশে গোরু এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তগত। গোরু না হইলে একদিনও আমাদের চলে না। গোরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক—গোরু এরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া গোরুর কারবারও বিস্তর। মানুষের পেটের দায় দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, গোপালনও মানুষের পক্ষে দিন দিন সেইরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রবোধ বাবু এ সম্বন্ধে বলেন—"পূর্ব্বে মানুষের অভাব অতি সামান্যই ছিল, কাজেই তখনকার লোকের অধিক পরিশ্রম করিবার আবশ্যক ছিল না। সহজেই যাহা উৎপন্ন হইত, তাহাই তাহা-দের যথেষ্ট অপেক্ষা অধিক হইত, এবং সেই জন্য পশুগণও যথেষ্ট খাইতে পাইত,—আবশ্যকমত যত্ন পাইত। কিন্তু এক্ষণে সে রাম নাই—সে অযোধ্যাও নাই। লোকের অভাব বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। মানুষকে অধিকতর পরিশ্রম করিতে হইতেছে সেই সঙ্গে পশুদিগেরও অধিক পরিমাণে কঠিন কাজ করিতে হইতেছে। মানুষ আপন অভাবমত নিজ নিজ উপায় করিয়া লয়; কিন্তু নিরীহ পশুগণ ত তাহা পারে না। অথচ আমরাও তাহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি না। কাজেই তাহাদিগের অধোগতি। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকাল ব্যাপিয়া তাবৎ মাঠ ময়দান ফসলে পূর্ণ থাকে। কাজেই পশু-

---

* শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে F. R. H .S. (Lon o) প্রণীত মূল্য।০ চারি আনা মাত্র।

গণের চরিবার স্থানাভাব। বৎসরের বাকী কয়টী দিন মাত্র যে ক্ষেত্র খালি থাকে, তখন তাহারা চরিতে পায় বটে, কিন্তু তখন মাঠে খাইবে কি? সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ মাত্র! নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে, গৃহপালিত পশুদিগের দুরবস্থা আরও যে ঘনীভূত হইয়া পড়িবে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইতিমধ্যেই যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই অতি শোচনীয়। দ্বারভাঙ্গার জল-হাওয়া ভাল, পশুগণের স্বাভাবিক আকার ও গঠন-পরিপাট্যও মনোরঞ্জক, তথাপি খাদ্যাভাবে ইহারা অস্থিপঞ্জর-সার। ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে?"

অভাব সকলেই অনুভব করিতেছেন, কিন্তু কি করিলে অভাব দূর হয় সে এক বিষম সমস্যা। প্রবোধ বাবু এরূপ ব্যবস্থা করিতে বলেন—'পশুদিগের খাদ্যাভাব দূর করিতে হইলে, প্রথমতঃ গো-চারণের মাঠের বিশেষ আবশ্যক। এই সকল মাঠকে যথারীতি আবাদ করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক ও পুষ্টিকর ফসলের আবাদ করিতে হইবে। প্রকৃতির কৃপার উপর নির্ভর করিলে নিত্যবৃদ্ধিশীল পশুকুলের আহারের সঙ্কুলান হইবে না। ছয় মাসের পরিশ্রমজাত ফসলকে কয়েকটী গবাদি পশুতে অল্পদিন মধ্যেই নিঃশেষ করিয়া দিবে। সুতরাং চারণ-ক্ষেত্রকে এমনই ভাবে রাখিতে হইবে যে, উহাতে বারোমাসই কোন না কোন ফসল প্রচুর পরিমাণে থাকিতে পারে। এতদ্ব্যতীত উহাতে এমন ফসলের আবাদ করিতে হইবে যে, অল্পপরিমিত স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, ফসল পুষ্টিকর হয়, এবং অল্পদিন মধ্যেই বাড়িয়া উঠে ইত্যাদি"।

এই ব্যবস্থা করিয়া গ্রন্থকার বলেন—"ইহা ব্যয়সন্তব ব্যাপার হইলেও যে লাভজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" এইটুকুই মারাত্মক। এ পোড়া দেশে এ ব্যয়সন্তব ব্যাপারে কে হাত দিবে? লাভজনক কার্য্যও অনেক আছে, কিন্তু সে লাভের জন্য পয়সা খরচ করিতে অগ্রসর কয় জন? সেরূপ উদ্যোগী পুরুষ এদেশে অধিক থাকিলে আর ভাবনা কি?

গ্রন্থকার যতটুকু বলিয়াছেন, আমরা তাহা অপেক্ষা অধিক বলি, "ইহা ব্যয়সন্তব ব্যাপার হইলেও লাভজনক" শুধু একথা বলি না, আমরা তাহার উপরও বলি যে এ ব্যয়সন্তব ব্যাপারে কোন লাভ না থাকিলেও ইহা এত প্রয়োজনীয় যে, এ বিষয়ে সকলে উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে ভবিষ্যতে বিষম অনিষ্ট অনিবার্য্য। এদেশের গোধন ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছে গোধন নষ্ট হওয়ার অর্থ আমাদের কৃষির অবনতি ও খাদ্যের অসচ্ছলতা। যদি ইহা নিবারণের জন্য পয়সা খরচ না করিবে তবে লোকে পয়সা খরচ করিবে কিসে?

দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহাদের হাতে প্রধানতঃ গোরুর প্রাণ, তাহাদের দ্বারা এ কার্য্য হওয়া অসম্ভব। এদেশে চারি শ্রেণীর লোক গোরু পোষে; (১) গৃহস্থ (২) চাষী (৩) গোয়ালা (৪) শকটচালক। এদেশে গাড়ী চালাইবার জন্য যে সকল লোক গোরু পোষে, তাহাদের সংখ্যা অতি সামান্য এবং সে সকলকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাছাড়া বড় বড় সহরে শকটচালক স্বতন্ত্র শ্রেণী, কিন্তু পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে চাষের গোরুই আবশ্যকমত গাড়ী টানে। এই কয় শ্রেণীর মধ্যে গোজাতির উন্নতির জন্য পয়সা খরচ করিবার ক্ষমতা আছে কয় জনের?—অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের কাহারও দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হইতে পারে না, কিন্তু মিলিত ভাবে চেষ্টা করিলে অনেক কার্য্যই হইতে পারে। অতএব যাহাতে সকলে মিলিত ভাবে কার্য্য করিতেপারেন, এরূপ গ্রামে গ্রামে চেষ্টা হওয়া উচিত জমীদার এবং গবর্ণমেণ্ট উভয়কেই এবিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে, নচেৎ বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমরা জমীদারগণকে এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে অনুনয় করি। আর অনেক স্থানের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কৃষি ও শিল্পোন্নতি বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকেন, কৃষিপ্রদর্শনীর জন্য স্থানে স্থানে উদ্যোগ করিয়া থাকেন—তাঁহারা যদি এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে অনেক কাজ হইতে পারে।

গ্রন্থকার পশুখাদ্যের জন্য এই সমস্ত আবাদ করিতে বলেন—(১) রিয়ানা বা হাতিঘাস (২) গিনী ঘাস (৩) বরু ঘাস (৪) জুয়ার (৫) ভুট্টা (৬) গাজর (৭) খাড়ি থাক (৮) লুসার্ণ (৯) জেরুজিলাম আর্টিচোক।

এই সমস্ত চাষ কিরূপে করিতে হয় এবং এই

সমস্ত পদার্থের গুণাগুণ টীকা গ্রন্থে বিবৃত আছে। পুস্তকখানির মূল্য অতি সামান্য, সকলেই উহা এক খণ্ড ক্রয় করিয়া দেখিতে পারেন। যিনি ক্রয় করিবেন তাহার চারি আনা নষ্ট হইবে না। আর যাঁহারা এবিষয়ে বাস্তবিক হাতে কলমে কিছু করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে পুস্তক খানি অমূল্য, তাঁহারা জানিবার অনেক তত্ত্ব ইহাতে পাইবেন।

গ্রন্থকার পুস্তক খানির নাম পশুখাদ্য রাখিয়াছেন। কিন্তু কয়েক প্রকার তৃণ ও তাহার আবাদের বিষয় বলিয়াছেন মাত্র অবশ্য সুলভ খাদ্যের উল্লেখ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সকল প্রকার তৃণ, শস্য ও অন্য খাদ্যের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং গ্রন্থখানি আমরা অসম্পূর্ণ মনে করি এবং তাঁহার নিকট অপরাপর খাদ্যের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, তিনি ভবিষ্যতে এবিষয়ে আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন

শাঁক আলু বা রস আলু।

(“নীহার” হইতে উদ্ধৃত।)

শাঁক আলু বা রস আলু এদেশে সকলের নিকট সুপরিচিত। কঠোর শিবরাত্রির অহোরাত্র উপবাস ও জাগরণের পরদিন পারণের ব্রতিগণের শুষ্ক তালুতে রসোৎপাদন করিতে এরূপ সুমিষ্ট রসাল সামগ্রী আমাদের দেশে অতি বিরল। শাঁকআলু এদেশের কৃষকেরা অতি অল্প পরিমাণে চাষ করিয়া থাকে এবং সাধারণতঃ কাঁচা খাইবার জন্য হাটে বাজারে বিক্রীত হয়। কিন্তু উহা হইতে কৃষকেরা নানা উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের কষ্টের সংসারে সুবিধাজনক জীবিকার পথ প্রসর হয়।

উহার আবাদের জন্য বিশেষ যত্ন বা অর্থ ব্যয় করিতে হয় না, সহজে উহার আবাদ হইয়া থাকে। কৃষকবালক বা স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে উহার আবাদ করিতে পারে। আমি শাঁক আলুর পালো, আবির, গুড় ও চিনি প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। আশা করি কৃষকগণ এই সহজ উপায়ে শাঁকআলুর গুড় ও চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবে। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, শাঁক আলু হইতে উত্তম চিনি, গুড়, পালো ও আবির প্রস্তুত হয়।

শাঁকআলুর পালো—শাঁক আলু হইতে যে কোন উপায়ে রস বাহির করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থির-ভাবে একটি পাত্রে রাখিলে পাত্রের তলাতে সাদা রংএর এরারুটের ন্যায় পালো জমিয়া যাইবে। উহা এরারুটের ন্যায় রোগীর পথ্য এবং কর্পূরার পালোর ন্যায় রোগীর ও সুস্থ ব্যক্তির উপাদেয় আহার্য্য। এই পালো বাজারে প্রতি সের চারি আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত মূল্যে স্থান বিশেষে বিক্রয় হইতে পারে। এরারুটের বা কর্পূরার পালো অপেক্ষা উহা কিছুতেই নিকৃষ্ট নহে বরং স্বাদুতায় উৎকৃষ্ট। উহাতে স্বাস্থ্য হানির কোন আশঙ্কা নাই, কারণ সকলেই উহা চিরদিন আদরের সহিত ব্যবহার করিতেছেন।

শাঁক আলুর গুড় ও চিনি—পাত্রের তলায় পালো জমিলে পর, পাত্র হইতে রস লইয়া অন্য পাত্রে উনোনে বসাইয়া দাও, কিয়ৎক্ষণ জাল দিলে পর এবং ছাঁকা দ্বারা গাদ তুলিয়া লইলে গুড়ের গাদ বাহির হইবে এবং স্বল্পক্ষণ পরে পরিষ্কার সুমিষ্ট গুড় প্রস্তুত হইবে। উহা মিষ্টতায় খেজুরের গুড় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সুগন্ধযুক্ত। খেজুরের রসে সাধারণতঃ দশ সেরে একসের গুড় হইয়া থাকে। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম উহাতে স্বল্প ব্যয়ে ভাল গুড় অক্লেশে হয়। গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করার প্রণালী লেখা বাহুল্য মাত্র।

শাঁক আলুর আবির—প্রস্তর খণ্ডের উপর বা কোন এক কঠিন দ্রব্যের উপর আলু ঘসিলে সহজে অধিক পরিমাণে পালো এবং রস বাহির হইতে থাকে; উক্ত পালোকে রৌদ্রে শুকাইয়া লাল রং করিয়া লইলে উত্তম আবির হইবে এবং আলুর খোসাগুলি শুকাইয়া চূর্ণ করত সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া পালোর সহিত মিশাইলে এবং রং করিলে উত্তম আবীর অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইবে। উহা বাজারে প্রতিসের ৵০ আনা হইতে ৷৵০ আনা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইতে পারে।

দেশের কৃষকগণকে এই সকল বিষয় এখন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি এবং বিশ্বাস করি এই সামান্য পদার্থ হইতে তাহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। আজকাল

সকল বৎসর ধান্য ফসল ভাল হয় না। সুতরাং অন্য উপায় অবলম্বন না করিলে তাহাদের প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। শাঁক আলু বলিয়া ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে। এখন বিলাতী বিট চিনিতে ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইয়াছে, কালে শাঁক আলুর চিনি দ্বারা বিট চিনির আমদানী হ্রাস হইতে পারে।

শ্রীযাদবেন্দ্র নন্দন দাস মহাপাত্র।

উদ্ভিদ জাতির আত্মরক্ষা।

মনুষ্য শারীরিক সামর্থ্য এবং বুদ্ধি বলে আত্মরক্ষায় কৃতকার্য্য হয় এবং অপর মনুষ্য ও পশুপক্ষীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার ও শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করে। পশুরা মনুষ্যের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন নহে, তাহাদিগের আত্মরক্ষার উপায় তাহাদিগের শরীরেই দেখা যায়। গরু, মহিষ, মেষ, ছাগ প্রভৃতি শৃঙ্গবান পশু শৃঙ্গের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে। হরিণ ও কালসার শৃঙ্গ ক্ষুর এবং দ্রুতগতির দ্বারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়; কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পশুরা তাহাদিগের তীক্ষ্ণ নখর সংযুক্ত থাবা ও দন্তের সাহায্যে অন্য প্রাণীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে; তাহারা আঘ্রাণের দ্বারা আপনাদিগের বিপত্তির পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়।

পশুদিগের ন্যায় পক্ষিজাতিও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। কাকাতুয়া, ময়না, ঈগল প্রভৃতি পক্ষীগণ দৃঢ় চঞ্চু ও তীক্ষ্ণ নখরের সাহায্যে অপর প্রাণীর আক্রমণ নিবারণে সক্ষম হয়। সরীসৃপ জাতির মুখমধ্যে এরূপ অস্ত্র লুক্কায়িত আছে যে, তাহার সাহায্যে তাহারা কেবল আত্মরক্ষা-সাধন করে এমন নহে, অপর প্রাণী তাহাদিগের ভয়ে অস্থির হয়। সর্পের হস্ত পদ নাই, কিন্তু তাহাদিগের তীক্ষ্ণদন্ত এবং বিষদন্তের ভয়ে, বলবান্ প্রাণীও তাহাদিগের অনিষ্ট সাধনে সাহসী হয় না।

পশুপক্ষী ও সরীসৃপ জাতির যে সমস্ত আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্রের বিষয় উল্লিখিত হইল, ঐ সকল প্রাণীরা তাহাদিগের সাহায্যে অপর প্রাণীর অনিষ্ট সাধন করিতেও ত্রুটী করে না। শৃঙ্গধর শৃঙ্গের দ্বারা, দন্তী ও নখী দন্ত ও নখের দ্বারা, এবং বিষধর বিষের দ্বারা অন্যান্য প্রাণীর অনিষ্ট করিয়া থাকে।

প্রাণীদিগের আত্মরক্ষার ন্যায় উদ্ভিদেরাও আত্মরক্ষা করিতে পারে। তবে প্রাণী জগতে আত্মরক্ষার জন্য সাজ সরঞ্জামের যেরূপ বৈচিত্র ও বাহুল্য দেখা যায়, উদ্ভিদ জগতে ততটা দেখা যায় না।

পলতা, নিম, রাংচিত্রা, লালভেরেণ্ডা, বাগভেরেণ্ডা প্রভৃতি উদ্ভিদের রস এরূপ তিক্ত এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য যে, পশুরা ঐ সকল ভক্ষণ করিতে পারেনা। এই নিমিত্ত লোকে শেষোক্ত তিন জাতীয় গাছে বাগানের বেড়া তৈয়ারি করে। ওল, কচু, মানকচু প্রভৃতি উদ্ভিদ এরূপ তীক্ষ্ণবীর্য্য যে, গবাদি পশু তাহা খাইতে পারে না। এই কারণে পশুদিগের দ্বারা অনিষ্ট হইবার ভয় তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত কম।

গন্ধভাদালী, তুলসী, ধনিয়া, মউরি, সুল্পাশাক প্রভৃতি উদ্ভিদের গন্ধ অতিশয় উগ্র। পশুরা উগ্রগন্ধে তাহাদিগের নিকট ঘেঁসিতেই পারেনা। বিশেষতঃ গন্ধভাদালীর দুর্গন্ধ গো ছাগাদি গৃহ পালিত পশুদিগের নিতান্ত অসহ্য। এই নিমিত্ত লোকে বাগানের বেড়ায় ইহা লাগাইয়া দেয়; পশুরা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিবে কি, দুর্গন্ধে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না।

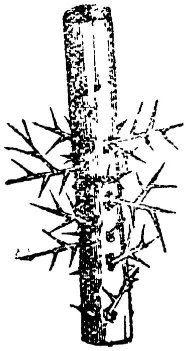
ধনিয়া শাক, সুল্পাশাক প্রভৃতি গুল্ম যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে, বাজারে উহাদের কাটতিও অনেক। পশুদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগের উগ্রগন্ধই প্রধান অবলম্বন। কেবল তাহাই নহে, অন্য শস্যের ক্ষেত্রে এই সকল গুল্মের দুই এক ঝাড় মাঝে মাঝে লাগাইলে, ইহাদের দুর্গন্ধে সে শস্যে গবাদি পশুর এবং কীট পতঙ্গের উপদ্রব কম হয়।

বিছুটি, আলকুশী, লালবিছুটী প্রভৃতি উদ্ভিদ অনেকে দেখিয়াছেন। দুষ্ট বালকদিগের অবাধ্যতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণে, বিছুটী পল্লীগ্রামস্থ গুরুমহাশয়দিগের প্রধান সহায়। ইহাদিগের ডাঁটা ও পাতার গায়ে যে সকল তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সোঁয়া থাকে, সেই সকল সোঁয়াই ইহাদিগকে আত্মরক্ষার কৃতকার্য্য করে। শেওড়া, ডুমুর প্রভৃতি গাছের পত্র

বড়ই খস খসে। পত্রের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ সোঁয়া থাকাতে পত্রগুলি এইরূপ খস খসে হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই কারণে পশুরা ডুমুর প্রভৃতির পত্র ভক্ষণ করিতে পারে না। কাজেই পত্রের সাহায্যে উহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে।

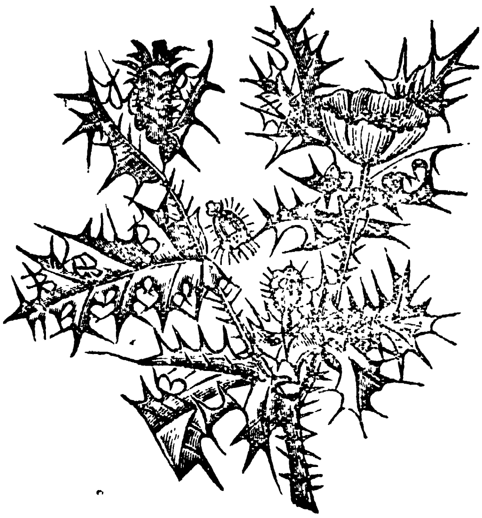
এতদ্ব্যতীত যে সকল গাছে কাঁটা আছে, তাহারা কাঁটার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। সিমুল বৃক্ষ অনেকেই দেখিয়াছেন। ঐ বৃক্ষের গায়ে মোটা মোটা তীক্ষ্ণ কণ্টক বিদ্যমান। কাঁটাগুলি বৃক্ষের গোড়া হইতে কিছুদূর উপর পর্য্যন্ত সাজান। গোড়ার কাঁটাগুলি যেরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট, উপরের কাঁটাগুলি তত নহে এবং অধিক উচ্চে কাঁটা নাই বলিলেও হয়। পশুরা প্রথমে বৃক্ষের বল্কলই আক্রমণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের আক্রমণ নিবারণ জন্য ঠিক যেন ইহারা নিম্ন কাণ্ডে কাঁটা সাজাইয়া রাখে।

ময়না, পানিয়ালা প্রভৃতি বৃক্ষও অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার কণ্টকে পরিপূর্ণ। তাহাদিগের নিম্নকাণ্ডে কাঁটাগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে, উপরে কাঁটা আদৌ দেখা যায় না।



পানিয়ালার যে চিত্রখানি এস্থলে দেওয়া গেল তাহাতে আমাদের কথাগুলি বিশদ বুঝা যাইবে। কাঁটানটীয়ার গাছ সকল স্থানেই জন্মে। ইহাদিগের বীজ কেহ বপন করে না, গাছ হইতে পরিপক্ক বীজ পড়িলে যেখানে সেখানে এই গাছের বংশবৃদ্ধি হয়। ইহার পত্র পশুদিগের বড়ই প্রিয়। সুতরাং এই অনায়াসলভ্য পদার্থ ভক্ষণ করিয়া গবাদি পশু স্বচ্ছন্দে পরিতৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু ইহাদিগের গায়ের কাঁটাগুলি এরূপ তীক্ষ্ণ যে, পশুরা ইহাদিগের গায়ে মুখদিতে গেলেই তাহাদিগের মুখে কাঁটা ফুটিয়া যায়। সুতরাং ভক্ষণ করিবে কি, তাহারা ইহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, তীক্ষ্ণ কণ্টকের সাহায্যেই কাঁটানটীয়া পশুদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশের অনেক অনাবাদী পতিত জমিতে শিয়ালকাঁটা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার হরিদ্রা বর্ণের ফুল বড়ই সুদৃশ্য। এস্থলে যে



চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা দেখিয়া পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, কি আশ্চর্য্য উপায়ে ইহারা আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়া থাকে। ইহাদের গোড়ায় কাঁটা, পাতায় কাঁটা এবং এমন কি ফলে ও ফুলেও কাঁটা দেখা যায়। কাঁটাগুলি বড়ই ধারাল। সুতরাং সহজে প্রাণীতে ইহার অনিষ্ট করিতে পারে না।

কাঁটার বিষয়ে বাবলা গাছও বড় মন্দ নয়। বাবলার পাতা এবং ডালে যেরূপ কাঁটা সাজান আছে, তাহাতে ইহারা কাঁটার সাহায্যে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। বাবলার কাঁটার একটু কেতা আছে। বৃক্ষের চূড়া প্রদেশের ডালে ও পাতায় যে কাঁটা থাকে তাহার মুখ নীচের দিকে থাকে, বৃক্ষের মধ্যভাগে যে সমস্ত কাঁটা দেখা যায় তাহাদের মুখ ধরাতল রেখার সমান্তরালে থাকে, আর গোড়ায় যে সমস্ত কাঁটা থাকে তাহার মুখ উপরদিকে।

বেলের কাঁটাও যেরূপ ভাবে সজ্জিত, তাহাতে তাহারা আত্মরক্ষায় যথেষ্ট সমর্থ।

মনসাজাতীয় সকল গাছেই বিস্তর কাঁটা। বঙ্গদেশে ফণী মনসার গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছ পশুদিগের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। কিন্তু ইহারা এরূপ তীক্ষ্ণধার কণ্টকাকীর্ণ যে, পশুরা ইহাদিগের দিকে মুখ লইয়া যাইতে সাহস করে না।

এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদজাতি আত্মরক্ষার্থ অন্যবিধ উপায়ও অবলম্বন করিয়া থাকে। একটু মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে সকল উদ্ভিদ স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষায় অক্ষম তাহারা অপর উদ্ভিদের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। এই সমস্ত উদ্ভিদের শরীরে আত্মরক্ষার্থ কণ্টক বা অন্য কোন গন্ধাদি তীব্র পদার্থ থাকে না। সুতরাং তাহারা সুদৃঢ় এবং বলবান বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এই উপায় অবলম্বন ব্যতীত গবাদি পশু, এবং কীটাদির আক্রমণে তাহাদিগের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কেবল তাহাই নহে, পশ্বাদির আক্রমণ হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পাইলেও তীক্ষ্ণ আতপতাপে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। কতকগুলি ফার্ণ, ও শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ, যদি অন্য সুদৃঢ় বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় গ্রহণ না করে, তবে তাহাদিগের আত্মরক্ষাসাধন দুরূহ হইয়া উঠে। তবে তাহাতে একটা বিপত্তি আছে। মনুষ্য কোন বড় লোকের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক আত্মরক্ষা সাধনে সক্ষম হইলেও, যেমন অন্য প্রবল প্রতিবেশীর আক্রমণে ধ্বংস মুখে পতিত হয়, এই সকল শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ্ও সেইরূপ সেই বৃক্ষের আশ্রয়-গ্রহণকারী অন্য উদ্ভিদের আক্রমণে বিনষ্ট হয়।

এখন কথা এই যে প্রাণী ও উদ্ভিদ্ গণের মধ্যে কাহারও কাহারও আত্মরক্ষার উপযোগী যন্ত্রাদি আছে, কিন্তু অপরের নাই এরূপ হইবার কারণ কি? এ তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইলে প্রাণী ও উদ্ভিদ জাতির উৎপত্তি ও বংশরক্ষার বিষয় আনুপূর্ব্বিক অনুসন্ধান করিতে হয়। সে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বহু বিস্তীর্ণ। আমরা দেখিতে পাই যে, কঠোর জীবন সংগ্রামে দুর্ব্বল জাতি আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ক্রমশঃ লোপ পায়, আর যাহারা প্রবল তাহারাই টিকিয়া যায়।

অতি সত্বর বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা এবং আত্মরক্ষার জন্য যন্ত্রাদি, এই দুইটিই প্রাণের বলবৃদ্ধির সহায়, এই দুইয়ের অভাবই দুর্ব্বলের লোপাপত্তির কারণ। এই তত্ত্ব ধরিয়া অনুসন্ধান করিলে মোটামুটি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যে সমস্ত জাতি অতি সত্বর বংশ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ তাহাদের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির বিশেষ আবশ্যক না হইতে পারে; পক্ষান্তরে যাহারা আত্মরক্ষার উপযোগী বর্ম্মাদিতে সজ্জিত সম্ভবতঃ তাহাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা তত সত্বর নহে।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু।

প্রাণী ও উদ্ভিদ্।

শাদা কথায় আমারা প্রাণী বলিলে এই বুঝিয়া থাকি, যে ইহা একটা প্রাণবিশিষ্ট জীব, অর্থাৎ একটী জীব যাহার নড়িবার চড়িবার এবং শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে, এবং উদ্ভিদ বলিলে এই ধারণা হয় যে একটা পদার্থ যাহা একস্থান হইতে অন্যস্থানে নড়িতে পারে না এবং যাহার ভাবিবার বুঝিবার বা উপভোগ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। স্থূলচক্ষুতে এরূপ দেখিলেও যতই আমরা প্রাণীর উচ্চ হইতে নিম্নজাতিতে নামিয়া যাইব ততই যে সকল গুণদ্বারা তাহাকে প্রাণীশ্রেণীভুক্ত করিতেছিলাম সেই সকল গুণের ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধানই দেখিতে পাইব। অবশেষে আমরা এরূপ স্থলে গিয়া উপনীত হইব যথায় আর উদ্ভিদ্ হইতে প্রাণীকে বিভিন্ন করিবার বিশেষত্ব খুঁজিয়া পাইব না। এই কারণেই বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম চক্ষু আজ পর্য্যন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ্ এই দুই জীবের মধ্যে একটা সুন্দর রেখা স্থাপন করিতে পারে নাই। প্রাণী জগতের খুব নিম্নস্তরে পলীপ ও সাইফনোফ্রা (Polyp, Siphonophra.) নামে দুইটি জাতি বর্ত্তমান। বাহ্যাবয়বের সাদৃশ্যে, বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির নিয়মও ক্রমের দ্বারা এবং ইতস্ততঃ গতিশক্তির অভাবে তাহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলিয়া ভ্রম হইত। বাস্তবিক বিশেষ করিয়া দেখিতে গেলে প্রাণী ও উদ্ভিদের পার্থক্যের কোন বিশেষ গুণ পাওয়া যায় না।

প্রাণীদিগের শরীরের যাবতীয় নৈসর্গিক কার্য্যের

জন্য নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ত্তমান। খাদ্যগ্রহণ ও অসার পদার্থের পরিত্যাগের জন্য, শরীরের বিশেষ অবয়বের পুষ্টির নিমিত্ত, খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজনীয় স্থানে বহনের জন্য, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও প্রতিগ্রহণ জন্য এবং বংশ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্র আছে এবং এই সকল যন্ত্র বিশেষ বিশেষ আকার বিশিষ্ট আবরণের মধ্যে নিহিত আছে।

এদিকে উদ্ভিদের এই সকল কার্য্যের জন্য সেই সকল যন্ত্র আছে বটে, তবে তাহা প্রাণীদিগের ন্যায় অত পরিস্ফুট নহে। ইহাদিগের খাদ্যগ্রহণের জন্য বহুদূরবিস্তৃত মূল, শাখা, পল্লব আছে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কাণ্ড ও পত্র আছে, খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজনীয় স্থানে বহন করিবার জন্য সূক্ষ্ম তন্তু আছে এবং নূতন জীব উৎপন্ন করিবার জন্য বিশেষ উপায় আছে। তবে ইহাদিগের অবয়ব গুলি কোন বিশেষ আবরণের মধ্যে বদ্ধ নহে।

প্রত্যুত বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কেবল উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদদিগের মধ্যেই এই সকল বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ত্তমান। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কখনও কখনও এক দুই বা ততোধিক—এমন কি সকল যন্ত্র ও অবয়ব দৃষ্ট হয় না; তখন জীবটী একটী গোলাকার বা বিশেষ আকার বিহীন মণ্ডের ন্যায় দেখায়; উচ্চ শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের ফুসফুস্ ক্রমে কর্ণকূপে (gills) পরিণত হয় (যেমন মাছেদের দেখা যায়) এবং তাহাও ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া অবশেষে উদ্ভিদের ন্যায় Protozoa জাতিকে শরীরের বহির্দ্দেশ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। উচ্চ জন্তুর উত্তপ্ত ও লোহিত শোণিত ক্রমে উভচর ও সর্প জাতিতে শীতল, এবং চিঙ্গড়ীমাছ ও পোকায় বর্ণশূন্য হইয়া যায়। রক্ত বহনের শিরা সমূহও অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া রক্ত শরীরের সমস্ত খোলের ভিতর পরিচালিত হইয়া বেড়ায়। খাদ্য গ্রহণ এবং পরিপাক যন্ত্রেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। খাদ্য পরিপাকের প্রধান সহায় যকৃৎ ও মুখের লালা ক্রমশই লোপ পাইতে থাকে। অন্নবহপ্রণালী ক্রমে একদিকে বদ্ধ ও বহু বিভক্ত (Trematoda) হইয়া গিয়া পরিশেষে দেহের মধ্যে একটী থলিতে পর্য্যবসিত হয় (Coelentrata)। অবশেষে মুখ এবং মল পরিত্যাগের দ্বার ও পাক প্রণালী সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া কৃমিজাতীয় জীবগণের (Cestoda) খাদ্য নৈসর্গিক নিয়মানুসারে বাহির হইতে শরীরে চর্ম্ম ভেদ করিয়া দেহাভ্যন্তরে উপস্থিত হয়। এইরূপে যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এমন কি বিশেষ ইন্দ্রিয় বা উপভোগের ক্ষমতাও তিরোহিত হইয়া যায়।

সেইরূপ মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল সংযুক্ত উদ্ভিদই পূর্ণউদ্ভিদ্ এবং ইহারও এক একটী করিয়া সমস্ত অবয়বের বিলোপ হইতে দেখা যায়। বৃক্ষে ফল হইবার কারণ বীজোৎপত্তি এবং ফলের জন্যই বৃক্ষে ফুল হইয়া থাকে। একজাতীয় উদ্ভিদ্ আছে (Cryptogams) তাহার বীজ ফল হইতে উৎপন্ন হয় না তাহার পরিবর্ত্তে বীজগুলি (Spores) পাতার উভয় পৃষ্ঠে নির্গত হইয়া থাকে। পত্র বৃক্ষের আহার্য্য ও নিশ্বাস গ্রহণে সাহায্য করিয়া থাকে। জলের মধ্যে যে বৃক্ষ হয় তাহার দ্বারা শেষোক্ত কার্য্য সম্ভব হয় না সেই কারণে জলজাত বৃক্ষের পত্র ক্রমশই লুপ্ত হইয়া আসে কিন্তু এই জাতীয় বৃক্ষে রস গমনাগমনের পথ গুলি অত্যন্ত স্থূল ভাবে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। (Thallophyta) জাতীয় উদ্ভিদে আর পত্র কাণ্ড বা মূল বিভিন্ন করিবার উপায় থাকে না। বর্ষার পরে পথে যে কলঙ্কিত শৈবাল অসাবধান পথিককে ভূমি চুম্বন করায় তাহাই বহুদূর ব্যাপী প্রকাণ্ড শাখাপ্রশাখাধারী সুবৃহৎ মহীরুহের শেষ পরিণতি। এই খানেই ইহার শেষ নহে, শেষ উদ্ভিদের সমস্ত অবয়ব একটী মাত্র কোষের (cell) মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া যায় তাহার তন্মধ্যে আহার ব্যবহার বিচরণ ও উদ্ভাবন সমস্ত কার্য্যই হইয়া থাকে। (Bacterea) ও (Yeast) এবং কোন কোন ব্যধির অঙ্কুর (germs) এই উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে উদ্ভিদের ও প্রাণীর শেষ পরিণতি একটী কোষ মাত্র এবং তাহাদের প্রাণধারণোপযোগী সমস্ত কার্য্য সেই কোষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং প্রাণী ও উদ্ভিদ জাতির শেষ ও আরম্ভ কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই নিমিত্ত সম্প্রতি হেকেল্ (Hackel) নামক এক জন বৈজ্ঞানিক প্রাণী ও উদ্ভিদের সর্ব্ব নিম্নস্তরের জীব-

গুলিকে একটী স্বতন্ত্র জাতিতে (Protista) পরিগণিত করিয়াছেন।

জগতে সমস্ত জীবের আহারের আবশ্যক, নচেৎ তাহাদিগের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র এই আহারান্বেষণের নিমিত্তই জীবের গতি শক্তির প্রয়োজন। যে প্রাণীর আহার্য্য যেরূপ অল্প এবং সুপ্রাপ্য তাহার গতিশক্তিও তত অল্প। Amœba নামক ক্ষুদ্রতম প্রাণী অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্ জীবের (Bacteria) দ্বারা প্রাণধারণ করিয়া থাকে, তাহার প্রাচুর্য্যতা হেতু এই প্রাণীকে বিশেষ কষ্ট করিয়া নানাস্থানে গমন করিতে হয় না। ইহাদিগের খাদ্যটুকু আহরণের নিমিত্ত যৎটুকু গতিশীলতার প্রয়োজন ইহাদের গতিশক্তিও তন্মধ্যে সীমাবদ্ধ। জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মনুষ্য; তাহার খাদ্য দ্রব্যও নানাবিধ এবং দুষ্প্রাপ্য, এইহেতু তদাহরণে তাহাদিগের বল ও গতিশক্তি প্রভূত। কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্য জগতে এত পর্য্যাপ্ত যে ভূমণ্ডলে এমন স্থান নাই যথায় ইহাদের খাদ্যের অভাব আছে। অসীম অনন্ত আকাশ ইহাদের খাদ্যে পরিপূর্ণ এবং ভূমির মধ্যে ও ইহাদের খাদ্য প্রচুর। পৃথিবীতে ভূমি ও আকাশ শূন্য অন্য কোন স্থান নাই, অতএব ইহাতে কোন স্থানে উদ্ভিদের খাদ্যের অভাব নাই, সুতরাং তদন্বেষণে ইহাদিগকে স্থানে স্থানে নড়িয়া যাইতে হয় না; তথাপি উত্তপ্ত মরুভূমি মধ্যে অথবা প্রচণ্ড শীত প্রধান দেশে যে উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না তাহা কেবল অত্যুত্তাপ ও শীতাধিক্য প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণের জন্য। সাধারণতঃ উপরে উদ্ভিদের শত সহস্র পত্র যেন হাত বাড়াইয়া আকাশের অনন্ত খাদ্য ভাণ্ডার হইতে খাদ্য লুটিয়া লইতেছে ও নিম্নে মূলের অসংখ্য শাখা প্রশাখা ধরিত্রী দেবীর হৃদয় হইতে আহার্য্য শোষণ করিয়া লইতেছে। যাহার আহার এত অনায়াসলভ্য তাহার আহারান্বেষণের জন্য স্থানান্তরে পরিক্রমণের আবশ্যক কি? কেবল এই নিমিত্ত আমরা সাধারণতঃ উদ্ভিদকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে নড়িয়া যাইতে দেখি না। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদের সাধারণতঃ একস্থানহইতে স্থানান্তরে পরিক্রমণ ক্ষমতা না থাকিলেও তাহাদিগের ন্যায় গতিশক্তি বর্ত্তমান। এই হেতু গতিশক্তি প্রাণীও উদ্ভিদের প্রভেদের কারণ হইতে পারে না। পরে আমরা এই গতিশক্তির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

অনেকে বলেন প্রাণী ও উদ্ভিদের রাসায়নিক গঠন বিভিন্ন। সাধারণতঃ উদ্ভিদ অঙ্গার, অম্লজান ও উদজান (C, O, H) এই তিনটী পদার্থের দ্বারা গঠিত এবং প্রাণীর মধ্যে এগুলি ছাড়া নাইট্রোজেন গ্যাস অধিকন্তু বর্ত্তমান। এ বিষয় যথার্থ হইলেও ইহাকে প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রভেদ পক্ষে তুলাদণ্ড করিতে পারা যায় না। কারণ প্রাণীদেহের চর্ব্বি ও Carbohydrate এর মধ্যে প্রাগুক্ত তিনটি দ্রব্য বর্ত্তমান আছে। আবার কতকগুলি পদার্থ কেবলমাত্র উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও অন্যটীতে কখনও কখনও দেখা যায়। যে পদার্থের দ্বারা উদ্ভিদে সবুজবর্ণ হয় (Chlorophyll) তাহা অতি নিম্নস্তরের জন্তুতেও দেখা যায় (Hydras, Bonellia, Stentor)। আবার এই পদার্থই উদ্ভিদের নিম্নশ্রেণীতে (Fungus) পাওয়া যায় না। কোষের আচ্ছাদন (cellulose) কখনও কখনও উদ্ভিদের প্রাণী হইতে বিভিন্ন করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া কেহ নির্দ্দেশ করেন; এই আচ্ছাদন উদ্ভিদে বর্ত্তমান, প্রাণীতে নহে। কিন্তু ইহাও Ascidian জাতীয় জীবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলী উদ্ভিদে নাই, কিন্তু স্নায়ুর একটি প্রধান উপাদান Cholesterin মাঝে মাঝে কড়াইসুটী জাতীয় গাছে (Leguminosæ) দেখিতে পাওয়া যায়।

Drosera বৃক্ষের পত্র প্রাণীর ন্যায় ক্ষুদ্র পোকামাকড় আক্রমণ করে ও তাহার আবশ্যকীয় পদার্থ গুলি শোষণ করিয়া লয়। প্রাণীগণের খাদ্য পরিপাক করিবার প্রণালীর ন্যায় তাহাদিগের ভিতরে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

জীব উৎপাদন বিষয়ে প্রাণীও উদ্ভিদের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। নিম্ন শ্রেণীর বৃক্ষ ও প্রাণীর মধ্যে শরীরের একাংশ খসিয়া পড়িয়া নবজীবন লাভ দ্বারা জীববৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উচ্চ শ্রেণীদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন দ্বারা প্রাণী উৎপন্ন হয়। জন্তুদিগেরও বৃক্ষদিগের ন্যায় জননেন্দ্রিয় শরীরের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইয়া থাকে। প্রায়ই প্রাণীর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে এই রূপ দেখা যায়। বৃক্ষ বিশেষের ন্যায় জন্তু বিশেষের

(জোঁক বা সামুক জাতিতে) এক শরীরের মধ্যে স্ত্রী ও পুংজননেন্দ্রিয় উভয়েরই বর্ত্তমানতা দেখা যায়। তাহাদিগকে ইংরিজিতে (Hermaphrodite) বলে এবং তাহাদের বংশ বৃদ্ধি একপ্রকারেই সমাধিত হয়।

ফলে বিশ্ব সংসারে ক্রমবিকাশই দেখিতে পাওয়া যায়। কি জড় কি জীব সকলের মধ্যেই এক স্তর হইতে আর এক স্তরের ক্রমোন্নতি দেখা যায়, উভয়ের সন্ধিস্থলে উভয়ে পরস্পর মিলিত। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডারউইন এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা বলিয়া জগতে সম্পূজিত।

শ্রীবিরিঞ্চিমোহন কর।

দোষ শূন্য। শিশু হইতে প্রাপ্তবয়স্ক সকলে নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারে। ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দুর্ব্বলকে সবল করে।

পরিমান—প্রাপ্ত বয়স্ক ॥০ অর্দ্ধতোলা।
অপ্রাপ্ত ঐ ।০ সিকি তোলা।

প্রয়োগ ব্যবস্থা।

প্রতিদিন প্রাতে একবার অল্প পরিমাণে দুগ্ধের মধ্যে পরিমাণানুরূপ ঘৃত নিক্ষেপ করতঃ অল্প মিছরি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

পথ্য—ভাত, রুটি, তাজা মাংস ও জীবন্ত মৎসের ঝোল প্রভৃতি। সাধারণতঃ আশুজীর্ণকর দ্রব্যই পথ্য।

নিষিদ্ধ—অম্ল, অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন এবং সর্ব্বপ্রকার অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যই নিষেধ।

মূল্য—একমাসের উপযোগা—৪৲ চারি টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

গঙ্গাপ্রসাদ তৈল।

বাতরোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

এই সুপরীক্ষিত তৈলটী আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে গেঁটে বাত, চল্‌তি বাত, রস বাত, শোথ, পতন জনিত বাত, পাদগগুির, কোমরের বাত, ঐকাঙ্গিন বাত, ফিক বেদনা, সন্ধিস্থল ফুলা, হৃদপিণ্ডের বেদনা প্রভৃতি যে কারণে যে প্রকার বাত বেদনা হউক না কেন এই তৈল মালিসে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। অনেক শয্যাগত বাতগ্রস্থ রোগীকে, এই তৈল ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

মালিসের ব্যবস্থা—এই তৈল অল্প পরিমাণে হস্তে লইয়া অনুলোম দিলে আস্তে আস্তে মালিস করিবে। মালিসকারির তৈল সিক্ত হস্ত মাঝে মাঝে অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া লওয়া উচিত। এইরূপে প্রাতে ও বৈকালে দুইবার মালিস প্রয়োজন।

পথ্য—রুটি, তরিতরকারী, দুগ্ধ প্রভৃতি। নিষিদ্ধ—অম্ল, দধি, কলায়ের ডাইল প্রভৃতি। সাবধান—কোন প্রকার ঠাণ্ডা না লাগে। মূল্য ৪ আউন্স শিশি ৪৲ চারি টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

গঙ্গাপ্রসাদ সালসা।

অথবা

দূষিত শোণিত সংশোধক।

এই সালসাটী দূষিত রক্ত পরিষ্কার এবং বলাধানের পক্ষে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা উপদংশ পারদ জনিত সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ, সর্ব্বপ্রকার বাত, শ্লেষ্মা, সর্দ্দি, শ্বাস, কাশ, গণ্ডমালা, দদ্রু, বিস্ফোটক, উরুস্তম্ভ, ব্রণ প্রভৃতি ও দূষিত রক্ত হইতে উৎপন্ন যাবতীয় রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে। ইহা সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং দুর্ব্বলকে বলশালী করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গার্হস্থ্য আশ্রমবাসীর পারিবারিক অবশ্যম্ভাবী ব্যাধি সমূহের এইটী নিয়ত প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহা ধীশক্তি সম্পন্ন ভিষকগণ কর্ত্তৃক দূষিত শোণিতের বিশুদ্ধি করণে উপযুক্ত ভেষজ বলিয়া অনুমোদিত। অত্যাশ্চর্য্য আরোগ্যকরী ক্ষমতা বিদ্যমান থাকাতে ইহা আবিষ্ক্রিয়ার সময় হইতে অদ্যাপি সমভাবে অব্যর্থ ঋষিবাক্য সদৃশ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহা শরীরের বলাধান ও পরিবর্ত্তন সাধন করে। ম্রিয়মাণ যুবকের স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধন ও হীনবীর্য্য নিস্তেজ বৃদ্ধকে বীর্য্যমান ও সবল করিতে ইহার তুল্য সালসা ইতি পূর্ব্বে আবিষ্কার হয় নাই। ইহা সুবিশাল ভারতবর্ষের প্রতি জনপদ, নগর, গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীবাসী সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি ও সুখ সচ্ছন্দতা প্রদান করিয়াছে।

ব্যবস্থা। প্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে ১ দাগ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে অর্দ্ধ দাগ; দিবসে দুইবার সেবনীয়। অর্থাৎ প্রাতে ও বৈকালে।

পথ্য—রুটি ভাত, মাখম, ঘৃত, মাংস, মৎস্যের ঝোল এবং অন্যান্য বলকারক খাদ্যই সুপথ্য।

মূল্য—১৫ দিনের উপযোগী একটী আট আউন্স শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কমলা

ফাল্গুন, ১৩১০]   [১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

নানা প্রসঙ্গ।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট রত্ন গিরি জেলায় বাকোলিতে একটী সুবৃহৎ শিল্প বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

* * *

বিলাতে শ্রমশিল্প শিখাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এদেশ হইতে যে ছাত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার জন্য বর্ত্তমান বৎসর আয় ব্যয় তালিকায় ৪৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

* * *

জ্যামেকা দ্বীপ হইতে ইংলণ্ডে বৎসর বৎসর বিস্তর কলা রপ্তানী হয়। কলা যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য জাহাজে শীতল বাতাস সঞ্চালিত হয়। আমাদের দেশেও প্রচুর কলা জন্মে। ইহা বিদেশে চালান করিয়া লাভের চেষ্টা করিবার কি কেহ নাই?

* * *

সরকারী কাগজ পত্রে ভারত বর্ষের বাণিজ্য বৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল কাগজ পত্রে প্রকাশ যে গত বৎসরে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় বিশ কোটি টাকার অধিক রপ্তানি হইয়াছে এবং আমদানিতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। অবশ্য এ বাণিজ্যবৃদ্ধির ফলভাগী আমরা নহি।

* * *

দাক্ষিণাত্যে রাজারাম নামে এক জন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক একটী চামড়ার কারখানা খুলিয়াছেন। ইনি এক জন ধনীর সন্তান। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে যত চামড়ার কারখানা আছে তাহা পরিদর্শন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে ইনি যে অচিরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কারখানার যথেষ্ট উন্নতি সাধনে সমর্থ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজারামের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের ধনী সন্তানদিগের অনুকরণীয়।

* * *

দেশীয় রাজ্য সমূহের মধ্যে মহীসূর একটী আদর্শ রাজ্য। এখানকার শাসন প্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতিও যথেষ্ট হইতেছে। রাজ সংসার হইতে সাধারণ শিক্ষার জন্য যেমন অর্থাদি ব্যয় হইয়া থাকে সেইরূপ শ্রমশিল্পাদির শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। বিগত ১৩।১৪ বৎসরের মধ্যে তথায় শ্রমশিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ১৮৯০ সালে হাসেন জেলার একটী হাই স্কুলের সঙ্গে সূত্রধরের কার্য্য শিখাইবার জন্য একটী শ্রেণী খোলা হয়। ইহাই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগ। কিন্তু এক্ষণে মহীসূরের প্রত্যেক বিশিষ্ট জেলাতেই একটা না একটা রকমের শ্রমশিল্প শিক্ষার বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। যে জেলার লোকদিগের যেরূপ শিল্পশিক্ষার মেধা দৃষ্ট হয়, অথবা যে স্থান যে কোন বিশেষ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ, সেখানে সেই রকম শিক্ষা দিবার একটী বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়।

* * *

৭।৪টী জেলায় বস্ত্র বয়ন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং যাহাতে সেখানকার তন্তুবায়গণ ফ্লাই সাটল (fly shuttle) ব্যবহার দ্বারা অল্প সময়ে অধিক বস্ত্র বয়ন করিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। মোলাযামারা নামে একটী স্থানে রেসমের কাপড় তৈয়ার হইত, কিন্তু বিলাতি প্রতিযোগিতায় সে ব্যবসা মাটী হইয়া যাইতেছে, এজন্য মহীসূর গবর্ণমেণ্ট সেখানে রেসমী বস্ত্র বয়ন ব্যবসা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ কোন স্থানে চন্দন কাঠের উপর নক্সা তৈয়ার, কোথাও সূত্রধরের কার্য্য, কোথাও কামারের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, বই বাঁধান, দড়ী প্রস্তুত করণ, মালিগিরী, কৃষিকার্য্য, দরজীর কার্য্য প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ে শিক্ষা দিয়া মহীসূররাজ প্রজাগণের অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেছেন।

* * *

উল্লিখিত ও অন্য নানাবিধ ব্যবসায়ে শিক্ষা দিবার জন্য খাস মহীসূরে একটী বৃহৎ বিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য এক জন উপযুক্ত কারিগর আছেন। এই বিদ্যালয়ে প্রায় এক শত ছাত্র নানা প্রকার ব্যবসায়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত এই বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ইঞ্জিনিয়ারী শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। কেবল শ্রমশিল্প শিক্ষা দিবার জন্য সমস্ত মহীসূর রাজ্যে প্রায় ১৭টী বিদ্যালয় আছে। মহীসূরের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। এতদ্ব্যতীত যাহাতে মহীসূরের লোকে বোম্বাই বা মান্দ্রাজে গিয়া উচ্চতর শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে সে জন্য মহীসূররাজ স্বতন্ত্র বৃত্তির ব্যবস্থা

করিয়াছেন। এতদর্থে রাজ সরকার হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আট হাজার টাকা ব্যয় করা হয়, আর যাহারা বিলাতে বা মার্কিন দেশ বা অন্যত্র শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন তাঁহাদিগের জন্যও বিশেষ বৃত্তি আছে। ক্ষুদ্র মহীশূর রাজ্যের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজগণের অনুকরণীয় এবং আমাদিগের বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বিশেষ অনুকরণীয়।

* * *

একখানি মার্কিন সংবাদ পত্রে দেখিলাম সেণ্ট লুইর মহা-প্রদর্শনীতে এক প্রকার চেয়ার প্রদর্শিত হইবে, তাহাতে বসিয়া যথা তথা যাওয়া যাইতে পারে। ইহা এত দ্রুত গতিশীল যে ঘণ্টায় তিন মাইল পথ যাইবে, চড়াই বা উতরাইয়ে সমান বেগে যাইবে। এই চেয়ারের পিছন দিকের পায়ার নিচে দুইখানি ছোট চাকা আছে। বসিবার আসনটী বেতে আচ্ছাদিত এবং তাহার পশ্চাতে একটী বাক্স আছে, তাহাতে কল চালাইবার ব্যাটারী আছে। এই চেয়ারে দুইজন লোক ও একজন চালক বসিতে পারে।

* * *

ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের নাম অনেকেই জানিতে পারেন। জীবদ্দশায় তাঁহার অপেক্ষা বড় উকীল ভাগলপুরে কেহ ছিলেন না। সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে তাঁহার ঐকান্তিক সহানুভূতি ছিল। মৃত্যুর পর তাঁহার ত্যজ্যসম্পত্তি হইতে এক লক্ষ টাকা বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কারের সহায়তার জন্য কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সমর্পণ করিতে তাঁহার পুত্রদিগকে অনুমতি করিয়া যান। তদনুসারে তাঁহার পুত্রেরা ঐ টাকা শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দিবেন প্রকাশ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত, রায় বাহাদুর তাহা বিলক্ষণ জানিতেন এবং দেশের মঙ্গল কামনা মৃত মহাত্মার মনে কত উচ্চ স্থান অধিকার করিত এই অসামান্য দান তাহার পরিচয়।

* * *

বার্লিনের টেকনিকাল রিভিউ নামক পত্রে প্রকাশ দক্ষিণ আমেরিকায় একজাতীয় গাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে চিনির অংশ আছে। ৮ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত গাছগুলি উচ্চ হয়। রাসয়ন বেত্তা বারটনি সাহেব বলেন এই ফসলের চাষ বড়ই লাভজনক, কারণ ইহার রসে সহজেই চিনি হয় এবং সে চিনি প্রচলিত চিনি অপেক্ষা বহু পরিমাণে তীব্র-মধুর-স্বাদবিশিষ্ট। ইহার আর একগুণ এই যে ইহার রস সহজে মাতিয়া যায় না। এসংসনদ্বীপের কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ইহার আবিষ্কার এবং চাষ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ইক্ষুজাত বা বিটজাত চিনি অপেক্ষা এই চিনি কুড়ি বা ত্রিশ গুণ অধিক মিষ্ট। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Eupatorum rebundican.

* * *

নাগপুরে এবং আহম্মদাবাদে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশীয় শিক্ষিত সমাজের দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারের প্রতি ক্রমেই আগ্রহ বাড়িতেছে ইহা অবশ্য বড়ই সুখের বিষয়। কিন্তু আহম্মদাবাদে কত প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহা অনেকেই বোধ হয় জানেন না। অনেক দিন হইতে এদেশে রেলীর ৪৯ নম্বরের থান প্রচলিত আছে। আপিসের কেরাণী হইতে সম্ভ্রান্ত জমিদার পর্য্যন্ত এই থান ব্যবহার করেন; কিন্তু আহম্মদাবাদের কলে যে রেলীর সমতুল্য থান প্রস্তুত হইতেছে সে কথা কয় জন জানেন বলিতে পারি না। ফল কথা, অনেকের বিশ্বাস যে আহম্মদাবাদের কলে কেবল পাড়ওয়ালা পরিবার ধুতি ও শাড়ীই প্রস্তুত হয়, রেলীর ৪৯ নম্বরের ন্যায় উৎকৃষ্ট থান প্রস্তুত হইতে পারেনা। বলা বাহুল্য এরূপ সংস্কার নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। আহম্মদাবাদের কলে যে রেলীর অনুকরণ ৪৯ নম্বর থান প্রস্তুত হয় তাহা অতি চমৎকার, অবিকল রেলীর ন্যায়। পরন্তু উহা রেলীর থান অপেক্ষা অধিকদিন স্থায়ী হইয়া থাকে। আবার রেলীর থান যেরূপ ফাটিয়া যায়, এই থান সেরূপ ফাটেনা, দামও আজকাল বিলাতী অপেক্ষা অনেক সস্তা। এ অবস্থায় যদি দেশীয়দিগের মধ্যে ঐ থানের বহুল প্রচার না হয় তবে বুঝিব যে এদেশের লোকের দেশীয় শিল্প প্রবর্ত্তনের চেষ্টা বৃথা।

* * *

গত বৎসর আমেরিকার তূলা ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে আমদানি না হওয়ায় অধিক পরিমাণে বিলাতী কাপড়ের উৎপত্তির অন্তরায় ঘটিয়াছে, কাজেই এ বৎসর বিলাতী কাপড়ের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে কাপড় ১।৹ টাকা জোড়া বিক্রীত হইত তাহা এক্ষণে ১৸৹ আনার কমে পাওয়া যায় না। কত দিন বিলাতী কাপড়ের মূল্য এরূপ অবস্থায় থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং মার্কিন এবং জর্ম্মাণী ভারতের বস্ত্র ক্ষেত্র অধিকার করিবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ যদি এসময় জর্ম্মনী ও আমেরিকা সস্তায় কাপড় বিক্রয় করিতে পারেন, তবে তাহাদেরই জিনিসে বাজার ছাইয়া পড়িবে, সুতরাং বিলাতী কাপড়ের স্থান অচিরাৎ জর্ম্মনী ও আমেরিকা অধিকার করিবে। কিন্তু তাহাতে আমাদিগের কিছুমাত্র লাভালাভ নাই। আমাদের পক্ষে মাঞ্চেষ্টর পাইলেও যা, মার্কিন বা জর্ম্মনী পাইলেও তাই। কিন্তু এ অবস্থায় এদেশীয় কলে প্রস্তুত কাপড় যদি বাজার অধিকার করিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই এই সময় হইতে জন সাধারণের মধ্যে দেশী কাপড়ের প্রচলন হয়। এদেশে বিলাতীর ন্যায় কাপড় প্রস্তুত হয় এবং তাহার মূল্য বিলাতী কাপড় অপেক্ষা অধিক নহে। যাঁহারা এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাঁহারাও জানিতে পারেন যে এদেশেও নয়নসুখ, মলমল, রেলী, লংক্লথ প্রভৃতির অনুকরণে বস্ত্র বিলাতী কাপড়ের দরে বিক্রীত হইতেছে। তবে প্রায় সমস্ত কাপড়ই ধোলাই করা নহে। যাহা হউক যখন বিলাতী কাপড়ের দর চড়িয়াছে, এবং কিছু অধিক দিনের জন্য বাজার এরূপ চড়া থাকিবে, তখন যদি এই সুবিধায় দেশীয় বস্ত্র বাজার অধিকার করিতে পারে তবে জানিব যে এদেশে দেশীয় শিল্পের প্রচলন জন্য আন্দোলন কালে সফল হইবে।

* * *

এতদুপলক্ষে এদেশীয় শিল্পজাত ব্যবসায়ীদিগের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিবার আছে। চতুর্দ্দিকে দ্রব্যের প্রচার ও রপ্তানি ব্যবসায়ের প্রধান অঙ্গ। দেশীয় জিনিষ এদেশবাসি

ক্রয় করিয়া থাকেন। এদেশে কোন্ কোন্ দ্রব্য জন্মে বা প্রস্তুত হইতেছে যাঁহারা ক্রয় করিবেন যদি তাঁহারাই অজ্ঞাত রহিলেন তবে জিনিষের কাটতি কিরূপে হইবে? ইণ্ডিয়ান ষ্টোর, বাবু কুঞ্জবিহারী সেন, ডন্ সোসাইটী প্রভৃতি দেশীয় বস্ত্র বিক্রেতৃগণ যদি জনসাধারণকে কোন্ কোন্ দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা না জানান, তবে লোকে কিরূপে জানিবে যে বিলাতীর ন্যায় দেশীয় অনেক দ্রব্যই পাওয়া যাইতে পারে। আর যদি জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারের বন্দোবস্ত না করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তবে সে ব্যবসায়ের ফল কিরূপ দাঁড়ায় তাহা যাঁহারা ব্যবসায় বুঝেন তাঁহারাই দেখিতে পাইতেছেন। প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যদি প্রচারের সুবন্দোবস্ত করা না যায় তবে ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

* * *

অনেকে অল্প মূলধনে বা বিনা মূলধনে ব্যবসায় করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, মূলধন যত অল্প হয়, পরিশ্রম ততই অধিক করিতে হয়। আমাদিগের মধ্যে আরামপ্রিয়তা যত বৃদ্ধি হইতেছে ততই লোকে আর খাটিয়া খাইতে চাহেনা। বিনা পরিশ্রমে অথচ বিনা পুঁজিতে অথবা অল্প পুঁজিতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা সকলেই করিয়া থাকে। আর দুর্দ্দশাও তত অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। যৌবনকালে অর্থাৎ পরিশ্রম করিবার সময় ফাঁকি দিয়া অর্থোপার্জ্জনের কল্পনায় ও চেষ্টায় কাটাইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় কত লোক যে অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সম্মুখে অর্থোপার্জ্জনের সহস্র সহস্র দ্বার উন্মুক্ত আছে কিন্তু পরিশ্রমের ভয়ে কেহই সেদিকে অগ্রসর হইতে চাহে না। কিন্তু একটু চেষ্টা করিলে বিনা পুঁজিতে অথবা অল্প পুঁজিতে অর্থ উপার্জ্জন সকলেই করিতে পারেন।

* * *

দালালী কার্য্যটী বিনা পুঁজীর ব্যবসায়, কিন্তু ঐ কার্য্য করিতে গেলে অত্যন্ত শ্রম সহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক। বাজারে ময়দা, চিনি, গুড়, ঘৃত, তৈল, মশলা প্রভৃতি যে সকল ব্যবসায়োপযোগী দ্রব্য বিক্রীত হয় সেই সকল দ্রব্য দালালের দ্বারাই বিক্রীত হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্রব্যের দালালেরা দালালি করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। কিন্তু হইলে কি হয় ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা বহু শ্রম সাপেক্ষ বলিয়া কেহ অগ্রসর হইতে অভিলাষ করে না। প্রথমে রাস্তার ধুলা খাইতে হয়, ক্রেতা বা বিক্রেতার মুখ ভঙ্গি সহ্য করিয়া কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়, তবে শেষে অর্থোপার্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। তাই কোন আফিসে ১৫।২০ টাকার একটা চাকুরী খালি হইলে ২১৫ শত দরখাস্ত পড়িয়া যায়। এ অবস্থায় এ দেশের উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনার বিষয় নয় কি?

* * *

হলাণ্ডে সক্ষম সবলকায় ব্যক্তি যাহাতে ভিক্ষাবৃত্তি করিতে না পায় সরকার হইতে এরূপ বন্দোবস্ত আছে। তথায় দরিদ্রদের চাষবাসের জন্য অনেক জমি আছে। দরিদ্র বেকার লোক অন্য কোন কাজ কর্ম্ম না পাইলে এই স্থানে প্রেরিত হয়। নিজের চাষবাসের জন্য কতকটা জমি তাহাকে স্বল্প-ভাড়ে ইজারা দেওয়া হয়, এইরূপে সে ক্রমশঃ নিষ্কর্ম্মা ও পরের গলগ্রহ হইতে একজন উপায়ী কৃষক হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এইরূপ একটা বন্দোবস্ত হইলে মন্দ হয় না।

* * *

ইংলণ্ডের মুক্তি ফৌজ শুধু দরিদ্রের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিয়া নিরস্ত নহেন, তাঁহারা দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ভরণপোষণের উপায় জন্য স্থানে স্থানে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্র হইতে উপার্জ্জন করিতে শিখিয়া বহুসংখ্যক লোক আলস্য ও পাপের পথ হইতে মুক্তিলাভ করে। এ বিষয়ে মুক্তিফৌজ নামের সার্থকতা আছে।

* * *

এদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষের সুযোগ্য পুত্র বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ তাহার উদ্যোক্তা ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার আর একজন সম্পাদক, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন তাহার সভাপতি এবং কোচবিহার ও ময়ূরভঞ্জের মহারাজদ্বয় এই সভার সংগৃহীত ফণ্ডের ট্রষ্টি। সভা যে অনুষ্ঠান পত্র প্রচার করিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

* * *

"আমাদের জন্মভূমির কল্যাণ কামনায় বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত An Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education নামক এক সভা স্থাপন করা স্থির হইয়াছে। এই সভা সর্ব্বপ্রকার ব্যয় বাদে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সেই লক্ষ টাকা নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য ব্যয় করা হইবে। চাঁদাদাতৃগণ ইচ্ছা করিলে অতঃপর এসম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

১। ২৫০০০, টাকা দ্বারা বৃত্তি স্থাপন করিয়া সুযোগ্য ছাত্রদিগকে ইউরোপ, আমেরিকা অথবা জাপানে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইবে।

২। ৪০,০০০, টাকা প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে অগ্রিম দেওয়া হইবে, যাঁহারা বিদেশ হইতে শিল্প বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়া স্বদেশে কারখানা স্থাপন বা তাঁহাদের অধীত বিদ্যা শিক্ষা দান করিবেন।

৩। ১০,০০০, টাকা দ্বারা বৃত্তি স্থাপন করিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত ছাত্রদিগকে ইউরোপ অথবা আমেরিকায় উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইবে।

৪। ২৫,০০০, টাকা দ্বারা কলিকাতার কলেজ সমূহের বিশেষতঃ বে-সরকারী কলেজ সমূহের ছাত্রগণের ব্যবহারের জন্য এক শিল্পশালা সজ্জিত করা হইবে।

যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গলকামনা করেন, তাঁহাদিগকে বৎসরে অনূ্ন চারি আনা চাঁদা দিতে অনুরোধ করিতেছি। যাঁহারা প্রতি বর্ষে চারি আনা চাঁদা দিবেন, তাঁহারা এই সভার সভা শ্রেণীভুক্ত হইবেন। যাঁহারা সভা হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিকট পত্র লিখিবেন।

আমরা আশা করি স্বদেশহিতৈষী মাত্রেই আমাদের সঙ্কল্পিত কার্য্যের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইবেন।

যাঁহারা এই সমিতি সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক "শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা" এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

শ্রীকালীচরণ বন্দোপাধ্যায়,	জে, এস, জেমিন।
শ্রীরাসবিহারী ঘোষ,	সেয়দ আমীর হোসেন,
শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন,	শ্রীআনন্দমোহন বসু,
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়,	শালিগ্রাম সিংহ,

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

*

উদ্দেশ্য অতি সাধু, এদেশে প্রতিবৎসর লক্ষটাকা সংগৃহীত হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু দেখা যায় এ হতভাগা দেশে প্রত্যেক শুভ কার্য্যেই দেব গড়িতে বানর হইয়া যায়। সুতরাং বৎসর বৎসর এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হওয়া আমাদের এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যদি বাস্তবিক নবপ্রতিষ্ঠিত সভাটি বৎসর বৎসর লক্ষটাকা তুলিতে পারেন এবং কতকগুলি শিক্ষার্থীগণকে বিদেশে পাঠাইতে পারেন তাহা হইলে অল্পদিনে দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইবে। গভর্ণমেন্টও এইরূপ সংকল্পে কয়েকটী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহা আমরা গতবারে উল্লেখ করিয়াছি। তাহার উপর আমরা দেশের লোক যদি আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র পাঠাইতে পারি তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইবে। আমরা আশা করি দেশের প্রত্যেক লোকই এই সাধু সংকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।

* * *

আমরা আশা করি তাঁহারা যে শিল্পশালা স্থাপন করিবেন তাহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া একটী প্রথম শ্রেণীর শিল্পবিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। আমাদের মনে হয় প্রথমে একটী শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এদেশে শিল্পবিষয়ে যতদূর শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহা দিয়া উপযুক্ত ও কৃতী ছাত্রদিগকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য বিদেশে পাঠাইলে অধিকতর সুবিধা হয় এবং ফলও অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে, এই শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রের অভাব হয় না, আর গোড়া বাঁধিয়া দিলে ছাত্রদিগেরও অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে শিক্ষা পরিসমাপ্ত হয়।

* * *

সভার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অতি সমীচীন। শুদ্ধ বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবেনা। ছাত্রেরা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে তাহাদের অর্জ্জিত বিদ্যা যাহাতে কার্য্যে ফলাইতে পারা যায় তজ্জন্য বিশেষ সহায়তা করা কর্ত্তব্য। অবশ্য শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রগণ ফিরিয়া আসিয়া এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে বেকার বসিয়া থাকিবেন না। কিন্তু সভা যদি তাঁহাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে একটা প্রকাণ্ড উদ্দেশ্য সাধিত হইবে,—সে উদ্দেশ্য শিল্প-বিজ্ঞানের ধারাবাহিক উন্নতি। শিক্ষিত ছাত্রগণ লক্ষ্যহীন হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সুদূরপরাহত।

আমরা গত বারে যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম তদনুসারে অনেক প্রশ্ন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি স্থানাভাবে এবারে প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হইল না।

নাইট্রেজেন—NITRAGEN.

কমলার সুযোগ্য লেখকগণ এই পত্রিকায় বৃক্ষাদির খাদ্যের কথা, জমির সারের কথা অনেক লিখিয়াছেন। আমরা অদ্য একখানি ইংরাজি সাময়িক পত্র হইতে সার সম্বন্ধে কয়েকটী নূতন কথা পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

অধ্যাপক নব্বে (Professor Nobbe) জর্ম্মণির একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। ইনি জর্ম্মণির রাজকীয় কৃষিসভার সভাপতি। ইনি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বৃক্ষাদির উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি পক্ষে মাটির কোন প্রয়োজন নাই; তাহাদের শরীর পোষণোপযোগী দ্রব্যগুলি পাইলে তাহারা যথা তথা জন্মিতে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে।

পাঠক অনেক জলজ উদ্ভিদ দেখিয়াছেন, তাহারা জলের উপরেই ভাসমান থাকে, মাটির সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। এই সমস্ত উদ্ভিদ জল ও বায়ু হইতেই আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া নিজ শরীর পোষণ করে। আর এক প্রকার উদ্ভিদকে আসমানী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহারা অপর গাছের উপর বা পাহাড়ের উপর বা অপর কোনও অবলম্বনের উপর জন্মে; মাটির সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই, ইহারা বায়ুমণ্ডল হইতেই আপনাদের দৈহিক পুষ্টি সম্পাদন করে।

যে সকল গাছ মাটিতে জন্মে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এমন আছে যে মাটী হইতে তুলিয়া জলে রাখিলেও বাঁচিয়া থাকে ক্রোটন বা পাতাবাহার এবং আরও কয়েক জাতীয় গাছ অনেকে গৃহমধ্যে জলাধারে রাখিয়া থাকেন; তাহারা সেখানে বাঁচিয়া থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। অধ্যাপক নব্বে দেখাইয়াছেন যে, প্রায় সকল গাছই উপযুক্ত আহার ও তাপ প্রাপ্ত হইলে মাটির সহিত সম্পর্কবিচ্ছিন্ন হইয়াও বাঁচিতে পারে। তিনি বহুপ্রকার গাছ

এইরূপে জলের মধ্যে জন্মাইয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষাগারে জলাধারের মধ্যে নানাবিধ গাছ জন্মিতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে ও ফল ফুল প্রসব করিতেছে। এই সমস্ত বৃক্ষের আহারের জন্য অধ্যাপক পোটাস্ (Potash), মেগনেসিয়ম, (Magnesium), ফসফরস (Phosphorus), নাইট্রেট (Nitrate) প্রভৃতি দ্রব্য যথোপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটী রাসায়নিক খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। চারি সপ্তাহ অন্তর এই কৃত্রিম পদার্থের খানিকটা জলে গুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইতে ঐ সমস্ত বৃক্ষ নিজের শরীর পোষণ করে।

এইরূপে উৎপন্ন কয়েকটী গাছ লইয়া অধ্যাপক পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, যে কয়েকটী রাসায়নিক পদার্থ তিনি যে পরিমাণে জলমধ্যে যোগাইয়াছেন, গাছগুলিতে সেই সকল পদার্থ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সমস্ত পদার্থ যে আকাশবায়ু হইতে সংগৃহীত এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। বায়ু হইতে বৃক্ষাদি নিজের শরীর পোষণ করে এ তথ্য বৈজ্ঞানিকদিগের বিদিত ছিল; অধ্যাপক নব্বের পরীক্ষা তাহা আরও বিশদ করিয়া দিয়াছে।

অম্লজান বা অক্সিজেন, অঙ্গার বা কার্ব্বণ, জলজান বা হাইড্রোজেন, এবং সোরাজান বা নাইট্রোজেন — এই কয়েকটি পদার্থ বৃক্ষশরীরের প্রধান উপাদান। এগুলি ছাড়া উহাতে পোটাসিয়ম, ফসফরস, লৌহ, গন্ধক, ম্যাগনিসিয়ম্, এবং কালসিয়ম্ (চূণ) অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে নাইট্রোজেন, পোটাসিয়ম্ এবং ফসফরস্ উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য নহে, অন্যগুলি সহজেই পাইয়া থাকে। জমীর উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে ক্রমান্বয়ে ফসল উৎপন্ন হইয়া জমীতে এই কয়েকটি পদার্থ কম পড়িয়া গিয়াছে। জমীর উৎপাদিকা শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই পদার্থগুলি জমীতে পুনর্ব্বার মিশাইতে হয়। ছাইতে পোটাস্ বর্ত্তমান, হাড়ে ফসফরস্ বর্ত্তমান, আর পশ্বাদির মলমূত্রে নাইট্রোজেন বর্ত্তমান, অতএব এই পদার্থগুলি জমীর উৎকৃষ্ট সার। সোরায় প্রভূত পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে, এজন্য সোরাও জমীর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট সার, কিন্তু ইহার মূল্য অধিক

সচরাচর লোকে সারের জন্য সোরা ব্যবহার করিতে পারে না। ভিটেমাটীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সোরা অর্থাৎ নাইট্রোজেন বর্ত্তমান, এজন্য ভিটেমাটি জমীর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। যাঁহারা কৃষিকার্য্য করেন তাঁহারা দেখিয়াছেন ভিটেমাটীতে কিরূপ সতেজ বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সোরাপ্রধান ভিটেমাটি সহজলভ্য নহে, লোকে ফসলের খাতিরে ভিটা চষিতে পারে না।

উপরে বলা হইয়াছে নাইট্রোজেন বৃক্ষাদির পক্ষে সহজলভ্য নহে। কথাটী একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা আবশ্যক। আকাশবায়ুতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ও কার্ব্বণিক এসিড় বর্ত্তমান। এই কয়েকটির মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; আকাশবায়ুর পাঁচ ভাগের প্রায় চারি ভাগ বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন। এই পৃথিবী বায়ুসাগরে বেষ্টিত, আর এই বায়ুসাগরের প্রায় চারিপঞ্চমাংশ নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেন জগতে যত প্রচুর, অন্য কোন পদার্থ তদ্রূপ নহে। কিন্তু আশে নাইট্রোজেন, পাশে নাইট্রোজেন, তথাপি বৃক্ষাদি নাইট্রোজেনের অভাবে মরে। অপার জলধি মধ্যে মানুষ যেমন তৃষ্ণায় মরে, সেইরূপ অপার নাইট্রোজেন-সাগরের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও বৃক্ষাদি নাইট্রোজেন-তৃষ্ণায় একেবারে মরে। তাহার কারণ বৃক্ষাদি আকাশবায়ু হইতে স্বয়ং নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে অক্ষম। এমোনিয়া সোরা প্রভৃতি নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থ মাটীর সহিত মিশাইয়া দিলে তবে বৃক্ষাদি শিকড় দিয়া নাইট্রোজেন শোষণ করিতে সক্ষম। মাটীতে যৎটুকু মাত্র নাইট্রোজেন পায়, বৃক্ষাদি তাহা সত্বর খাইয়া ফেলে। সুতরাং ব্যয়িত নাইট্রোজেনের পূরণ জন্য মাটীতে নাইট্রোজেন প্রধান সার দেওয়ার এত প্রয়োজন।

এইত গেল নৈসর্গিক নিয়ম। গম, যব, জৈ প্রভৃতি ফসল এক জমীতে উপর্য্যুপরি চাষ করিলে জমী ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়ে — ইহার নাইট্রোজেন-ভাগ ক্রমশঃ ফুরাইয়া যায়। কিন্তু এরূপ নিঃস্ব জমীতে clover, lupin, মটর প্রভৃতি দাইল জাতীয় ফসল দিলে উহা বেশ ভাল জন্মে। কেবল তাহাই

পর সেই জমীতে গম প্রভৃতি বুনিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। তখন দেখা যায় যে জমীর পূর্ব্ব নিঃস্বতা ঘুচিয়াছে। উহা পুনর্ব্বার কোনরূপে নাইট্রোজেন-বহুল হইয়াছে। clover, lupin মটর প্রভৃতি শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদে প্রভূত পরিমাণে নাইট্রোজেন বর্ত্তমান, এই নাইট্রোজেন অবশ্য ভূমি হইতে আকর্ষিত হইয়াছে। যে জমীতে নাইট্রোজেন পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল, সেই নিঃস্ব জমীতে ইহারা নাইট্রোজেন পাইল কোথা হইতে? - এ সমস্যার মীমাংসা কি?

বৈজ্ঞানিকদিগের এ সমস্যা মীমাংসা করিতে মাথা ঘুরিয়া গেল। পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা ইতিমধ্যে দেখিয়াছেন যে এই clover, lupin, মটর প্রভৃতি শুঁটী জাতীয় উদ্ভিদের গোড়ায় ছোট ছোট ফোস্কা বা ফুলা আছে, এই ফুলা গুলি nodule এই পারিভাষিক শব্দে অভিহিত। এই ফুলা গুলি কি, ইহার কার্য্য কি, এ পর্য্যন্ত কিছুই নির্ণীত হয় নাই। সাধারণতঃ এই ফুলা গুলি উক্ত জাতীর উদ্ভিদের এক প্রকার রোগ বলিয়াই গণ্য হইত।

কিন্তু ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা ছাড়িবার পাত্র নহেন। বহুবিধ পরীক্ষার পর অধ্যাপক হেলরীগেল (Professor Hellriegel) দেখিলেন যে, যে সমস্ত লুপিনের গায়ে ফোস্কা আছে তাহারাই নিঃস্ব জমীতে ভাল জন্মে, কিন্তু যাহাদের গায়ে ফোস্কা নাই তাহারা ভাল জন্মে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে কোন অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় এই সকল ফোস্কাই আকাশবায়ু হইতে জমীতে নাইট্রোজেন সংগ্রহের সহায়তা করে।

পরীক্ষা চলিতে লাগিল—শেষ সাব্যস্ত হইল যে, এই ফোস্কা গুলি এক প্রকার রোগ বটে—ইহা মাটীতে স্থিত এক জাতীয় ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) বা উদ্ভিদণুর* কার্য্য। অধ্যাপক বেইয়েরিঙ্ক (Professor Beyerinck) এই ব্যাকটেরিয়া বা উদ্ভিদণুর নাম রাখিলেন রাডিওকোলা (Radiocola)। যখন এই আবিষ্ক্রিয়া হয় সেই সমকালেই জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক কক (Professor Koch) ব্যাকটেরিয়া বা উদ্ভিদণু কর্ত্তৃক রোগোৎপত্তির তত্ত্ব জগতে ঘোষণা করিতেছেন।

এই সময়ে অধ্যাপক নববের্ণরও গবেষণা চলিল। যদি এই ফুলাগুলি ব্যাকটেরিয়ার কার্য্য হয়, তবে মাটীতে অবশ্যই ব্যাকটেরিয়া আছে। যদি জমীতে ব্যাকটেরিয়া না থাকে তবে কোন কৃত্রিম উপায়ে এই ব্যাকটেরিয়া জন্মান যাইতে পারে কি না? যদি কোন রূপে এই ব্যাকটেরিয়া মাটীতে জন্মাইতে পারা যায় তবে সেই মাটীতে শুঁটিগাছ পুতিলে উহা আকাশ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে পারে কি না? যদি নিঃস্ব জমিতে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে সুফল পাওয়া যায়, তবে যে কোন প্রকার জমিতে বা বিশুদ্ধ সাগরবালুকাতেও সুফল পাওয়া যায় কি না? এই সমস্ত প্রশ্ন স্বভাবতঃ তাঁহার মনে উদয় হইল এবং এই সমস্ত তথ্য নিরূপণ জন্য অধ্যাপকপ্রবর উঠিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এ সমস্ত ১৮৮৮ সালের কথা।

অধ্যাপক কতকগুলি মটর ও সীমের ফুলা সংযুক্ত মূল সংগ্রহ করিলেন এবং সে গুলি শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া জলে গুলিলেন। তৎপরে অল্প চিনি, এসপারাগিন (Asparagine) ও অন্যান্য কয়েকটি পদার্থ মিশ্রিত করিয়া একটী জিলাটিনের (Gelatine) সরবৎ প্রস্তুত করিলেন এবং সেই সরবতে পূর্ব্বোক্ত গুঁড়া মিশ্রিত জল মিশাইলেন। দেখা গেল সরবতে ব্যাকটেরিয়া জন্মিতেছে। এক প্রকারের নহে—অনেক জাতির ব্যাকটেরিয়া জন্মিতেছে। তাহাদের মধ্য হইতে অধ্যাপক মহাশয় রাডিওকোলাকে স্বতন্ত্র করিয়া খালি রাডিওকোলার এক স্বতন্ত্র চাষ করিলেন। ইহাতে কোটি কোটি রাডিওকোলা প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর গাছ জন্মাইবার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পরীক্ষার জন্য তিনি কতকটা বিশুদ্ধ বালুকা লইলেন। সেই বালুকাতে কোনরূপ নাইট্রোজেন বা কোনরূপ উদ্ভিদণু না থাকে এজন্য উপর্য্যুপরি তিন বার খুব উৎকট তাপে তাহাকে উত্তপ্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ্যীকৃত Sterilize)* করিয়া লইলেন।

---

* Bacteria প্রাণী কি উদ্ভিদ ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের

* কোন পদার্থে ব্যাকটেরিয়া বিদ্যমান থাকিলে তাহার বংশ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কোন উপায়ে ব্যাকটেরিয়া তাড়াইতে

তাহার পর ভাগ করিয়া তিনটি স্বতন্ত্র পাত্রে ঐ বালুকা সংস্থাপন করিলেন এবং প্রত্যেক পাত্রে উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী ফস্‌ফরাস, পোটাসিয়ম্‌, লৌহ, গন্ধক প্রভৃতি সম্বলিত রাসায়নিক পদার্থ অল্প পরিমাণে মিশাইয়া দিলেন। প্রথম পাত্রটিতে নাইট্রোজেনঘটিত কোনরূপ পদার্থ দিলেন না; দ্বিতীয় পাত্রে খানিকটা সোরা দিলেন—এ সোরা নাইট্রোজেনমূলক বস্তু এবং উদ্ভিদের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। তৃতীয় পাত্রে তাঁহার প্রস্তুত ব্যাকটেরিয়া আরক দিলেন। তাহার পর তিনটি পাত্রেই মটর বুনিয়া সোৎকণ্ঠে ফল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনটি পাত্রেই সম পরিমাণে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন—এই জল সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ ও ব্যাকটেরিয়াবর্জ্জিত বা বন্ধ্যীকৃত (sterilized)।

যথা সময়ে তিনটি পাত্রেই মটর অঙ্কুরিত হইল। এক সপ্তাহ কাল তিনটি পাত্রের অঙ্কুরগুলি দেখিতে প্রায় এক রূপই রহিল। এই সপ্তাহ কাল পরেই কিন্তু তাহাদের চেহারা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। প্রথম পাত্রে—যাহাতে নাইট্রোজেন বা ব্যাকটেরিয়া উভয়ের কোনটাই ছিল না,—কলগুলি বিবর্ণ হইয়া ক্রমশঃ শুখাইয়া অবশেষে একেবারে মরিয়া গেল; মানুষ আহার না পাইলে যেরূপ ক্রমশঃ মরে—নাইট্রোজেন অভাবে ঠিক সেই ভাবেই অঙ্কুরগুলি মরিয়া গেল। দ্বিতীয় পাত্রে—যাহাতে নাইট্রোজেন যোগান হইয়াছিল,—কলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ মাটীতে যেরূপ বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় সেইরূপই হইল। কিন্তু তৃতীয় পাত্রে কলগুলির বৃদ্ধি আশ্চর্য্যরূপ হইল। পাঠক অবশ্য মনে রাখিয়াছেন যে প্রথম পাত্রে যেরূপ কোন নাইট্রোজেন ছিল না, এই তৃতীয় পাত্রেও সেইরূপ কোন প্রকার নাইট্রোজেন ছিল না; তথাপি তৃতীয় পাত্রে গাছের অসাধারণ বৃদ্ধি। এই তৃতীয় পাত্রের গাছগুলি লইয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেল তাহা নাইট্রোজেনবহুল। আরও দেখা গেল যে কেবল তৃতীয় পাত্রে উৎপন্ন গাছ গুলির গোড়াতে ফুলা (nodoules) জন্মিয়াছে—অপর কোনটিতে নহে। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, জমীতে ব্যাকটেরিয়া প্রবিষ্ট করাইলে, তাহাতে সুফল উৎপন্ন হইতে পারে।

অধ্যাপক মহাশয় অতঃপর অনেক প্রকার গাছ সম্বন্ধে অনেক প্রকার পরীক্ষা করেন, সে সমস্ত পরীক্ষার বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবে অধ্যাপকপ্রবরের সিদ্ধান্ত গুলি মোটামুটি এই:—

(১) এই নাইট্রোজেনশোষী উদ্ভিদাণুগণ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকিলেও সকল জমিতে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না, আর এই ব্যাকটেরিয়া কেবল কয়েক প্রকার শুঁটি-জাতীয় গাছেই ফুলা (nodule) উৎপন্ন করিয়া থাকে।

(২) সাধারণতঃ প্রথমাবস্থায় এই উদ্ভিদাণুগণ বিশেষ ক্রিয়াশীল নহে, অর্থাৎ প্রথম বারেই কোন উদ্ভিদবিশেষের উপর তাহাদের ক্রিয়া প্রবলরূপে প্রকাশ পায় না। কিন্তু কোন এক জাতীয় উদ্ভিদের উপর তাহাদের ক্রিয়া আরম্ভ হইলে ক্রমশঃ তাহাদের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। মনে কর প্রথমতঃ একটা নিঃস্ব জমীতে কলাইশুঁটি বুনিলে; বুনিবার পরই এই ব্যাকটেরিয়া তাহাতে ফুলা (nodule) জন্মায় এবং ক্রমশঃ কলাইশুঁটির উপযোগী হইয়া উঠে। এজন্য দ্বিতীয় বারের কলাইশুঁটির ফসল প্রথম বারের অপেক্ষা পর্য্যাপ্ত হয়। আরও রহস্য এই, এক জাতীয় উদ্ভিদের উপযোগী হইয়া উঠিলে অপর জাতীয় উদ্ভিদের উপর এই ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া বিশেষ স্ফুরিত হয় না। এক জাতীয় ব্যাক্‌টেরিয়া কেবল এক জাতীয় উদ্ভিদের উপর ক্রিয়া বিকাশ করে।

(৩) এই জীবাণুগণের ক্রিয়া অতি বিচিত্র। মাটীর অবস্থানুসারে ইহাদের ক্রিয়ার বিকাশ হয়। যে মাটী সতেজ—প্রচুর সারবিশিষ্ট, যেখানে ইহাদের ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই, সে স্থানে ইহাদের ক্রিয়ার বিকাশ দেখা যায় না, এরূপ ক্ষেত্রে সহজে গাছের গোড়ায় ফুলা (nodule) জন্মে না; কিন্তু মাটীর তেজ যত কমিবে ইহাদের ক্রিয়ার বিকাশ তত অধিক দেখা যাইবে,—সম্পূর্ণ নিঃস্ব জমীতে ইহাদের ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদের ক্রিয়া দেখিয়া বোধ

ইংরাজী নাম Sterilize করা, তাহার বাঙ্গলা বন্ধ্যীকৃত করা

যেরূপ আবশ্যক, বিবেচনা করিয়া সেখানে সেইরূপ কার্য্য করে।

পরীক্ষাগৃহে এই সমস্ত ফল ত পাওয়া গেল, কিন্তু তাহা ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগাইতে পারা যায় কি না, অধ্যাপক অতঃপর তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এই ব্যাকটেরিয়ার আরকের নাম করণ করিলেন—নাইট্রেজেন (Nitragen—আমাদের পরিচিত সোরাজান নাইট্রোজেন Nitrogen নহে)। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ফসলের উপযোগী নাইট্রেজেন আলাহিদা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ১৮৯৯ সালে এই নূতন সার—ব্যাকটেরিয়া উৎপাদক আরক নাইট্রেজেন—বাজারে বাহির হইল এবং সম্পূর্ণ অদ্ভুত ও অভিনব হইলেও ইহার কাটতি খুব হইতে লাগিল। এখন জর্ম্মনির একটি প্রধান রাসায়নিক কারখানায় প্রচুর পরিমাণে এই আরক প্রস্তুত হইতেছে। ছোট ছোট কাচের শিশিতে করিয়া এই পদার্থ রক্ষিত ও বিক্রীত হয়। এক এক জাতীয় ফসলের জন্য এক এক প্রকার আরক এক এক শিশিতে থাকে। শিশিতে জিলেটিন ঘটিত যে তরল পদার্থ থাকে তাহার রং হরিদাভ; উপরিভাগে ছাতা পড়ার ন্যায় ঘোলা; এই ঘোলা বা ছাতা শুদ্ধ ব্যাকটেরিয়ার সমষ্টি। একটি শিশিতে প্রায় ১৷০ বিঘা ভূমির সারের কায হয়; মূল্য অতি সামান্য ৫০ সেণ্ট ১৷০ টাকা মাত্র।

এই আরক টাটকা ব্যবহার করিতে হয়, অধিক দিনের হইলে ব্যাকটেরিয়াগুলি মরিয়া যায় এবং তখন তাহাতে কোন কাজ হয় না। ইহার ব্যবহার অতি সহজ। খানিকটা গরম জলে এই আরক গুলিতে হয়, তাহার পর যে শস্য বোনা হইবে তাহার বীজগুলি অল্প মাটীর সহিত মিশাইয়া এই জলে ভিজাইতে হয়। তাহার পর বীজগুলি নাড়িয়া বেশ মাটীমাখা হইলে পর আরও মাটি মিশাইতে হয়; তৎপরে একটু রস টানিয়া গেলে ঐ বীজ বুনিতে হয়। বোনা হইবামাত্র বীজসংলগ্ন মাটী হইতে ব্যাক্‌টেরিয়াগুলি জমীতে সংক্রামিত হয় ও তথায় তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়; মাটীই তাহাদের স্বাভাবিক আবাস। যে সময়ে বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া গাছে পরিণত হয় এবং তাহারা আপনাদের কার্য্য করে। এই ব্যাক্‌টেরিয়া কেমন করিয়া আকাশবায়ু হইতে নাইট্রোজেন আকর্ষণ করে তাহার তথ্য এখনও নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু তাহারা যে জমীতে নাইট্রোজেন আকর্ষণ করে, এ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

জর্ম্মণ কৃষকেরা এই অভিনব নাইট্রেজেন ব্যবহার করিয়া বেশ সুফল পাইয়াছেন। একজন কৃষিজীবী অধ্যাপক নব্বেকে লিখিয়াছেন যে প্রথমতঃ এই পদার্থের উপকারিতা বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বীজ বপনের সময় তাঁহার ক্ষেত্রের মধ্যে খানিকটা জমীতে এক বড় N অক্ষরের আকারে এই সার সংযুক্ত বীজ রোপণ করিলেন; অবশ্য ক্ষেত্রের অপরাংশে চলিত প্রথামতে বীজ বপন করিলেন, একমাস পরে দেখিলেন N অক্ষরটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এবং সেই ভাগের ফসল ক্ষেত্রের অন্যান্য ভাগের ফসল অপেক্ষা সতেজ ও সুন্দর।

আমেরিকা আবার জর্ম্মণের উপর যান। জর্ম্মণির এই সমস্ত পরীক্ষা দেখিয়া ইউনাইটেড-ষ্টেটসের কৃষি বিভাগ পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তাহার ফল আরও উন্নত আকারের সার প্রস্তুত। অধ্যাপক নব্বের সার তরল, শিশির মধ্যে রাখিতে হয়। আমেরিকানেরা সেই পদার্থ নিরেট আকারে জমাইয়াছেন। সহজে আমদানী রপ্তানীর পক্ষে এই নিরেট বস্তুই সুবিধাজনক। ব্যবহারের সময় জলে গুলিয়া লইলেই হইল।

এটা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই নাইট্রেজেন পদার্থ জমীতে নাইট্রোজেন আনে। যদি জমীতে নাইট্রোজেন বা সোরাজানের প্রয়োজন হয়, তবেই সেই জমীতে ইহা ব্যবহার করা আবশ্যক, নতুবা নহে। যদি জমীতে ফসফরাস বা পটাশ বা অন্যবিধ পদার্থ আবশ্যক হয় তাহা হইলে নাইট্রেজেন ব্যবহার করিলে কোন ফলই পাওয়া যাইবে না*।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।

* কাঁচা ফসলের সার বা Green manuring নিঃস্ব জমির পক্ষে বড়ই উপকারী। উহার উপকারিতার কারণ এই

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার

M.D., D.L., C.I.E.

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার সমস্ত বঙ্গ দেশকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। শুদ্ধ বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ আজি একটী মহামূল্য রত্ন হারাইয়া শোকাশ্রু বর্ষণ পূর্ব্বক হৃদয়ের গভীর বেদনার পরিচয় দিতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ দেশের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণ বহু সময় সাপেক্ষ।

সকল দেশেই প্রকৃত বড় লোকের সংখ্যা অল্প; বর্ত্তমান ভারতে তাঁহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ধন থাকিলে প্রকৃত বড় লোক হয় না, বিদ্যা থাকিলে প্রকৃত বড় লোক হয় না, প্রভুত্ব, যশ ও সম্মানের অধিকারী প্রকৃত বড় লোক নহে, চরিত্র-বলই (Character) প্রকৃত বড় লোকের লক্ষণ। ধন, বিদ্যা, প্রভুত্ব, যশ, সম্মান প্রভৃতি মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত বিষয়গুলি বিদ্যমান থাকিলেও এক মাত্র চরিত্র-বলের অভাবেই মানব-জীবন একটী অসার পদার্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে; এক মাত্র চরিত্র-বলই মানবকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ।

ভারতে আজ কাল প্রকৃত মানুষের অভাব হইয়াছে, কিন্তু চিরদিন এরূপ ছিল না। এমন সময় ছিল যখন মানুষ সত্যের অনুরোধে জীবনের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিতে সঙ্কুচিত হইত না; এমন সময় ছিল যখন কর্ত্তব্য পালনের জন্য মানুষে বহুআশাপূর্ণ, অতি প্রিয় হইতেও প্রিয়তর নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। তখন ভারতের ঐশ্বর্য্য ছিল, জ্ঞান ছিল, বল ছিল; তখন ভারত হইতে জগতে প্রকৃত সভ্যতার আলোক বিস্তারিত হইয়াছিল; তখন ভারত সমস্ত জগতের শিক্ষাগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজি সেই চরিত্রবলের অভাবেই ভারত সন্তান এরূপ দীনভাবাপন্ন, অবসন্ন ও বিপন্ন। যে দুই চারিজন ভারতবাসীর মধ্যে চরিত্র-বলের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাই ভারতের এই দুর্দ্দিনে ভারতবাসীর উপাস্য দেবতা স্বরূপ; তাঁহাদিগেরই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া হীনশক্তি ভারতবাসী পুনরায় পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার এই রূপ এক জন প্রকৃত মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার জীবনের নানা অনুষ্ঠানে তিনি যেরূপ হৃদয়বল ও চরিত্র-বলের পরিচয় দিয়াছেন, নানা বাধা ও বিপত্তি, নানা অত্যাচার ও উৎপীড়ন সত্বেও তিনি যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, নির্ভীক চিত্তে তাহার পূজা করিয়া যেরূপ সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরদিন জগতে প্রকৃত মহাপুরুষের স্থান অধিকার করিয়া পূজার যোগ্য হইবেন। এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে যে জাতির মধ্যে থাকুক না কেন, সেই জাতিই পরম গৌরবান্বিত; বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব যে নিতান্ত আশাপ্রদ ও সৌভাগ্যসূচক, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের ন্যায় মনুষ্য সকল জাতিরই শীর্ষ স্থান অধিকার যোগ্য।

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার এ দেশে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রথম পথ-প্রদর্শক। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে নিরন্ন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের সবিস্তার আলোচনা না হইলে পাশ্চাত্য জগতের সহিত জীবন-সংগ্রামে ভারতের মৃত্যু অনিবার্য্য। তাই তিনি তাঁহার সময়, সম্পদ ও সমগ্র শক্তি উৎসর্গ করিয়া ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সভার স্থাপনে তিনি যেরূপ অধ্যবসায়, উদ্যমশীলতা, একাগ্রতা, ত্যাগ ও কার্য্য-কুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ কামনায় তিনি এই দুরূহ কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন। এ দেশের লোকে যাহাতে স্বল্প ব্যয়ে বা বিনা ব্যয়ে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব গুলি শিক্ষা করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভা ২৮ বৎসর কাল সেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এই সৎ কার্য্যের জন্য তিনি দেশের লোকের নিকট হইতে যে পরিমাণ সহানুভূতির প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া সর্ব্বদা হৃদয়ে একটী গভীর বেদনা অনুভব করিতেন। কেবল

একমাত্র ঈশ্বরের মঙ্গল বিধানের উপর বিশ্বাস দ্বারাই তাঁহার নিরাশা কতক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। গত ২৬শে নবেম্বরে (১৯০৩) বিজ্ঞান-সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল; তখন তিনি শয্যাগত ছিলেন বলিয়া সেই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ২৮ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম তিনি বিজ্ঞান-সভার বার্ষিক অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়া তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"I have very little to tell you about our Association, and that little, I am afraid, is likely to be the last. All that I had to say I have said on every occasion I had the pleasure of meeting you. I have only now to reiterate my conviction that if our country is to advance at all and take rank and share her responsibilities with the civilized nations of the world, it can only be by means of Science or positive knowledge of God's works. To this end I have given the best portion of my life, but I am sorry to leave this world with the impression that my labours have not met with the success which the end aimed at deserves. However, I do not despair of our future. My faith in an overruling Providence has not abated an iota on account of my own ill success. I fully believe that there is a deeper design in the events that are passing than what we see on the surface. I believe every thing has been ordered for good and accordingly I believe that my removal from the scene of my labours is undoubtedly necessary for the good of the Assosiation and of our country. Younger men should come and step in to take my place and work with more energy than I have been able to put forth."

গত কয়েক বৎসর বিজ্ঞান-সভায় তাঁহার সহিত আমি একত্রে কার্য্য করিয়া এরূপ নিরাশার কোন কারণ দেখিতে পাই না। কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-প্লাবিত ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার একটী নূতন পদার্থ; নূতন পদার্থের উপর জনসাধারণের বিশ্বাসস্থাপন কিঞ্চিৎ সময়-সাপেক্ষ। ডাক্তার সরকার যে মহৎ কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গবাসী দিন দিন তাহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। কালে বঙ্গবাসীর দ্বারাই এই সভার সমস্ত অভাব পূর্ণ হইবে—কালে বঙ্গবাসীরই যত্নে এই সভা সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য ও পরিপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এমন দিন আসিবে যে দিন তাঁহার অমরাত্মা স্বর্গ-ধাম হইতে তাঁহার হৃদয়ের শোণিত দ্বারা পুষ্ট এই সভার পূর্ণ সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া বঙ্গবাসীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিবেন।

ডাক্তার সরকারের মহতী প্রতিভার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; জীবনের সকল অনুষ্ঠানেই তাহার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সামান্য অবস্থা হইতে মানুষ শিক্ষা, অধ্যবসায়, সৎসাহস, একাগ্রতা, সত্যপ্রিয়তা ও উদ্যমশীলতার গুণে কিরূপে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে, ডাক্তার সরকার তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ছাত্রাবস্থায় তিনি বহু পারিতোষিক ও যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, যখন তিনি মেডিকেল কলেজের নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কতকগুলি বক্তৃতা করিয়া তৎকালীন বিদ্বজ্জনসমাজে প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি (M. D.) প্রাপ্ত হন। যে সকল পদ বা সম্মানের জন্য আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই লালায়িত, তিনি সে সকল অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ৪ বৎসর কাল কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Artsএর প্রেসিডেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং উপর্য্যুপরি ১০ বৎসর সিণ্ডিকেটের সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। Faculty of Medicineএ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বলিয়া তাঁহার সভ্য নিযুক্ত হইবার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যুক্তি বলে সেই সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া ঐ পদে মনোনীত হইয়াছিলেন; পরে তিনি স্বেচ্ছায় ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৭ সালে কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৩ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C. I. E. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে

তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ বৎসরেই তাঁহাকে কলিকাতার সেরিফ্ পদ প্রদান করা হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ডি, এল, (D. L.) ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

তিনি অনেক বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক সভার সভ্য ছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার মত ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় অতি সম্মানের সহিত গৃহীত হইত।

এলোপ্যাথি চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অবলম্বন করা তাঁহার সত্যপ্রিয়তার একটী লক্ষণ। তিনি অর্থাগমের প্রত্যাশায় নব চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। তিনি যে সময়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন, তখন উহা এ দেশে সম্পূর্ণ নূতন মত—নূতন মতের উপর তখনও লোকের অনুরাগ হয় নাই. ইহার উপর কেহই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। ১৮৬৩ সালে যখন British Medical Associationএর একটী শাখা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তাহার সম্পাদক এবং পরে ঐ সভার সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন; ঐ সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিরুদ্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষা করেন এবং বহু পরীক্ষার পর ঐ মত তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন ও পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন মতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতভেদ থাকিলেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে তিনি সত্যের অনুরোধেই আয়, প্রতিপত্তি ও সম্মানের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র কার্ডিনাল্ নিউম্যানের প্রণীত নিম্নলিখিত একটী ক্ষুদ্র কবিতার কয়েক ছত্রে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে :—

"Perish policy and cunning,
Perish all that fears the light,
Whether losing, whether winning,
Trust in God and do the right.
Some will hate thee, some will love thee,
Some will flatter, some will slight,
Cease from man and look above thee,
Trust in God and do the right."

তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি শীঘ্রই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি "Calcutta Journal of Medicine নামক এক খানি চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্র প্রচার করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর কাল তিনি একাকী ইহা চালাইয়া আসিয়াছেন। এই কার্য্য হইতেই তাঁহার অধ্যবসায় ও একাগ্রতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি যে শুদ্ধ বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই বিশদরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ইংরাজী ভাষায় যেরূপ সুলেখক, সেইরূপ সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার ভাষা যেরূপ বিশুদ্ধ, সেইরূপ তেজস্বিনী এবং কবিত্ব ও যুক্তিপূর্ণ। সেই সুকণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হইয়াছে; সে মর্ম্মস্পর্শী ও যুক্তিপূর্ণ বাক্য আর আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না!

ডাক্তার সরকার বড় স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন; তিনি কখন কাহাকেও চাটুবাক্যে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি গুণীলোকের গুণের মর্য্যাদা সকল সময়েই করিতেন, কিন্তু সত্য কথা অপ্রিয় হইলেও তিনি ব্যক্তিবিশেষ বিবেচনা না করিয়া স্পষ্ট ভাবে কহিতেন। এই জন্য অনেকে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না—কোন কোন স্থানে অপ্রিয়বাদী বলিয়া তাঁহার অখ্যাতি ছিল; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারা বুঝিতেন যে তাঁহার অপ্রিয়বাদিতা অসত্যের প্রতি বিরাগ-প্রদর্শন মাত্র।

তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল; মানুষের দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। হীনাবস্থাপন্ন রোগীগণ অনেক সময়ে তাঁহার অকৃত্রিম দয়ার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি হীনাবস্থাপন্ন ছাত্রদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজে অসুবিধা ও কষ্টে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন

তাহা কখনই বিস্মৃত হন নাই। হীনাবস্থাপন্ন ছাত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি আপন পাঠাবস্থা স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন। যখন বৈদ্যনাথে বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত গিয়াছিলেন, তখন সেখানকার আশ্রয়হীন, নির্ব্বান্ধব, গলিতদেহ কুষ্ঠ রোগীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার কোমল প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি শীতাতপ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ৭০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া সেখানে একটী কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেন।

তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। কেহ বলেন তিনি নাস্তিক ছিলেন; অনেকে বলেন তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন বা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন বা তাঁহার লেখা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তিনি একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, সাকার উপাসনা বা পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। এই বিরোধী মত কখন গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন নাই; সেই জন্য তিনি দেশের এক শ্রেণীর লোকের নিকট বিরাগভাজন ছিলেন। তিনি চিরকাল সত্যের পূজা করিয়া আসিয়াছেন; পৌত্তলিকতা অসত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি তাহার বিরুদ্ধে যথোচিত প্রতিবাদ করিয়াছেন। এদেশে মনুষ্য-পূজা বড়ই প্রবল ভাবে বিদ্যমান; ডাক্তার সরকার মনুষ্য পূজার ভয়ঙ্কর বিরোধী ছিলেন। তিনি সৃষ্টিকে পূজা না করিয়া স্রষ্টাকে পূজা করিতেন। ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল; জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে তিনি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন। তবে ঈশ্বর পূজায় তিনি বাহ্য আড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার রচিত কয়েকটী বাঙ্গলা গীত ঈশ্বরে তাঁহার আত্মসমর্পণের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছে:—

(১)

Resignation, the true worship of God.

আশাবরী।—মধ্যমান।

যা যা নে করি আমার, তা সকলি তোমার; কি দিয়ে তবে পূজিব তোমায়।

আত্ম সমর্পণ করি, লওহে (নাথ) দয়া করি; তোমার ধন তুমি লও, কায নাই আমার তায়।

এইমাত্র ভিক্ষা করি, যেন দিবা শর্ব্বরী; রাখিতে পারি মনে সদাই তোমায়।

স্মৃতি পথে থাকলে তুমি, ভাবনা কি আর করি আমি; সকল ভাবনা ঘুচে যাবে, মুক্তি পাব তব কৃপায়॥

(২)

Reflections on approach of Death.

ললিত—আড়া ঠেকা।

ভয় করোনা রে মন, দেখে শমন আগমন,
শত্রু নয় সে পরম বন্ধু, তারে কর আলিঙ্গন।
এসেছে প্রভুর আজ্ঞায়, লয়ে যাইতে তোমায়,
করিতে তোমার সব দুঃখ জ্বালা বিমোচন।
বাঁধা আছ ভূমণ্ডলে, কঠিন মায়া শৃঙ্খলে,
এসেছে সে কাটিতে, ঐ দারুণ বন্ধন।
দেহ পিঞ্জরের দ্বার, করিয়ে উন্মোচন,
দিতে তোমায় সুখময় অনন্ত জীবন।
পাইয়া নূতন জীবন, দেখিবে তুমি তখন,
যে সব দুঃখ পেয়েছিলে যায় নাই বিফলে,
সে সব দুঃখ হয়ে আছে, নিত্য সুখের কারণ,
(কৃপাময়ের শাসন) নহে কভু নহে কভু অনর্থক পীড়ন।

ডাক্তার সরকার সামাজিক অমঙ্গলকর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে কখনই সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি বাল্যবিবাহের বড়ই বিরোধী ছিলেন। যখন ব্রাহ্ম বালিকাদিগের কত বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত এই বিষয়ে কেশব বাবু প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণ সবিশেষ আন্দোলন করিয়া ব্রাহ্ম-বিবাহ-বিধি বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন ডাক্তার সরকার নির্ভীকচিত্তে সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিজ্ঞানসম্মত স্বীয় মত প্রকাশ দ্বারা কেশব বাবুর সদুদ্দেশ্য সাধনে সবিশেষ সহায়তা করেন।

তিনি কোন ব্যক্তি বা বর্ণ বিশেষকে অযথা সম্মান প্রদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; বর্ণ-নির্ব্বিশেষে তিনি গুণী লোকের মর্য্যাদা করিতেন। বিদ্যা বা জ্ঞান কোন এক জাতি বা বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ থাকা সমাজের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্টের

কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; জ্ঞান বা বিদ্যায় কোন জাতি বা বর্ণবিশেষের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

ডাক্তার সরকার প্রকৃত "হাতে কলমে" লোক ছিলেন। জগৎ মিথ্যা কি সত্য, জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রভৃতি যে সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা কখন হয় নাই এবং কখন হইবার সম্ভাবনা নাই, এই সকল বিষয় লইয়া যাঁহারা নিষ্ফল তর্ক করিতেন তাঁহাদিগের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, তর্কে জগৎকে মিথ্যা বলিতেছি অথচ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাসে সমস্ত কার্য্য করিতেছি, ইহাতে নিজের জীবনে কেবল অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র; এরূপ অমূলক কল্পনায় মানুষ দিন দিন হীনশক্তি, অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে নিষ্ফল দার্শনিক তত্ত্বালোচনার বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাই বলিয়া তিনি দর্শনপ্রণেতা ঋষিগণের প্রতি যে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না, তাহা নহে। তাঁহাদিগের জ্ঞান ও বহুদর্শিতার প্রতি তিনি সর্ব্বদা বিশেষ ভাবে ভক্তি প্রদর্শন করিতেন।

তিনি যে শেষপত্র বিজ্ঞান সভায় লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার জীবনের শেষ অভিলাষ পাঠককে জ্ঞাপন করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম :—

"To you, my dear colleagues, from whom I have received the heartiest sympathy and support, and to all our educated young men who have not yet come forward as they should have, I leave this Science Association of ours as a legacy which, calculated to regenerate our country, you will, I dare say, try your best to improve and develop to its utmost capacity."

শ্রীচুণীলাল বসু।

ছাপাখানার কার্য্য।

দিন দিন এদেশে ছাপার কার্য্য যতই বাড়িতেছে ছাপাখানার সংখ্যা তত বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ব্যতীত বিন্দুমাত্র সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায় না। আজকাল কলিকাতার এমন গলি নাই যেখানে অন্ততঃ একটাও ছাপাখানা দেখা যায় না। মফঃস্বলের সকল নগরেই এক বা ততোধিক ছাপাখানা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন ছাপাখানা একটাও নাই যেখানে নিয়মিত সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে অথবা সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার একমাত্র কারণ ছাপাখানায় অশিক্ষিত লোকের প্রবেশবাহুল্য। প্রায়ই দেখা যায় মূর্খ লোক ব্যতীত এদেশে ছাপাখানার কার্য্য শিখিতে লোকে ঘৃণা বোধ করে। আর অশিক্ষিত লোকের দ্বারা কার্য্য কিরূপ সমাধা হয় তাহার ফলও আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিলাতে যে ছাপাখানার এত উৎকর্ষ হইয়াছে ইহার কারণ ঐ অঞ্চলে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা ছাপাখানার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে সকল জাতির জীবনী শক্তি আছে, যাঁহারা উপার্জ্জনের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন এবং উপার্জ্জন করিতেও জানেন তাঁহারা কোন কার্য্যকেই ঘৃণা করেন না, এই নিমিত্ত ছাপাখানার কার্য্যকে ঐ সকল দেশের অধিবাসী উপেক্ষার চক্ষে না দেখিয়া শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করেন।

কিন্তু এদেশের লোকের চিত্ত এরূপ দুর্ব্বল যে সামান্য শিক্ষা পাইলেই ছাপাখানার কম্পোজ শিক্ষা করাটা বড়ই অপমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে। বরং কোন সওদাগরি কারখানার গুদামে ধুলা খাইয়াও ১০৲ টাকা মাহিনায় চাকুরি করিবে অথবা ১৫৲ টাকা মাহিনা প্রাপ্তির আশায় দুই বৎসর ধরিয়া বিনা বেতনে শিক্ষানবিশী করা সেও স্বীকার, তথাপি ছাপাখানায় প্রেস্‌রসিকতার কার্য্য শিক্ষা করিতে কেহ প্রস্তুত নহে। কৌতুকাবহ ছাপাখানার উপর সামান্য শিক্ষিত্ প্রদ। এই গ্রন্থ হইলে ত কথাই নাই তৃতীয় ইংরাজী সংবাদ পত্রে পর্য্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন আলোচনা পাঠ করিয়া দানী- উন্নতি কখন হইবে র্ড নর্থব্রুক নিজ ব্যয়ে ইহার বিষয় আজকাল করিয়া লয়েন। অনেক দিন শিক্ষিত ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, আর ততটা কালের অনেকেই ইহা পাঠ করিকেহ কেহ প্রতিজ্ঞয়েন নাই। যতদিন শিক্ষিত লোকেন মাত্র। ডাকমাশুল /০।

পোড়ো জমি।

পল্লিবাসী মাত্রেই অবগত আছেন যে প্রত্যেক গ্রামেই এমন কতক জমি আছে যাহাতে চাষ আবাদ হয় না, অথচ বাসগৃহও নাই। জেলার গণ্ডগ্রাম সমূহে ও সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এই জমির সংখ্যা অল্প হইলেও অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পল্লিতে এই প্রকার জমির সংখ্যা অল্প বা তাহাদিগের পরিসর নিতান্ত কম নহে। এই সকল ভূমিখণ্ড সাধারণতঃ জঙ্গলে আবৃত, কোন কোন স্থান গোচারণার্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু অধিকাংশ স্থলই তৃণাদিশূন্য প্রান্তররূপে অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছে। স্বীকার করি যে এইরূপ পতিত জমিতে বর্ত্তমান সময়ে আট আনা রকম চাষ হইতেছে, কিন্তু তাহা হইলেও এখন যে গুলিতে আবাদ হয় নাই, তাহাতে চাষ হইলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারে। আমরা অদ্য পাঠকবর্গকে এইরূপ পতিত জমির উন্নতিকল্পে দুই একটী কথা নিবেদন করিব।

অর্থনীতি শাস্ত্রের নিয়ম এই যে বাজারে মাল বেশী থাকিলে ও খরিদ্দার কম থাকিলে জিনিষ সস্তা দরে বিক্রীত হয়। আমাদিগের দেশে এখন মসীজীবী বহুসংখ্যক, এজন্য তাঁহাদিগের দর বেশ কমিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এই কলিকাতা মহানগরীর অধিকাংশ বাঙ্গালী বেরাণী হইলেও, তাঁহাদিগের অনেকেরই স্ব স্ব গ্রামে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি আছে, সুতরাং যদি তাঁহারা এ সকল জমি (যাহা তত্ত্বাবধান ব্যতীত পতিতের ন্যায় রহিয়াছে) হইতে যৎকিঞ্চিৎ উপকার লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে পোড়ো জমির সংখ্যা প্রত্যেক জেলায় নিতান্ত কম নহে, সুতরাং যদি সেগুলি আবাদ করা যায় তাহা হইলে শস্যও কম উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কোন কোন স্থান হয়ত শত শত বৎসর পতিত থাকিয়া এত অনুর্ব্বরা হইয়া গিয়াছে, যে চাষ করিলে তাহাতে প্রথম ২।৪ বৎসর যে শস্য উৎপন্ন হইবে তাহাতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, আবাদের ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইবে না। আবার কোন কোন স্থান হয়ত এত উচ্চ যে কাটিয়া তাহা নিচু করিতে যে অর্থব্যয় হইবে, তাহাতে স্বচ্ছন্দে অন্য উর্ব্বরা ভূমি ক্রয় করা যাইতে পারে। প্রধানতঃ এই সকল ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য কারণে ভূমি পতিত থাকে। (Ricardo) রিকারডো সাহেব বলেন যে জমিদার যে খাজনা ধার্য্য করেন তাহা এই নিয়মের উপর স্থাপিত। যে প্রদেশে জমি বিলি হইতেছে সেই প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আবাদী জমি হইতে যে পরিমাণ শস্য পাওয়া যায়, ও তদপেক্ষা উর্ব্বরা সমপরিমাণ ভূমি চাষ করিলে যে শস্য সংগ্রহ হয়, খাজনা, এই উভয় জমির ফসলের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহার মূল্যের সমান। অর্থাৎ মনে করুন এই হুগলী জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমিতে বিঘা প্রতি ৬।৭ মণ ধান ও উপযুক্ত পরিমাণ খড় পাওয়া যায় ঐ জমির নামমাত্র একটী খাজনা দিতে হয়, যেমন চারি আনা। এই যে ৬।৭ মণ ধান ও খড়, ইহাতে চাষে যে মূলধন ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সুদ, যাহারা আবাদ করিয়াছে তাহাদিগের বেতন, ইত্যাদি পোষায় এবং দুই চারি আনা ব্যতীত বিশেষ কিছু হাতে থাকে না। এখন যদি সেই প্রদেশে এমন কোন জমি পাওয়া যায় যাহাতে ৬।৭ মণের পরিবর্ত্তে ১০।১১ মণ ধান ও তদুপযুক্ত খড় পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ জমির খাজনা ৪।৫ মণ ধানের সমান; অর্থাৎ ১॥০ হিঃ মণ হইলে ঐ জমিতে ৬৲ টাকা হারে খাজনা পাওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ লোকে জমি জমা দিবার সময় এত হিসাব করে না ও বঙ্গীয় কৃষকগণও লাভালাভের দিকে তত দৃষ্টি রাখিয়া চাষ আবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু রিকারডো সাহেবের হাতে জমিজমা ধার্য্য করিবার নিয়ম, এবং এই নিয়মেই কাজ চলিতেছে।

রিকারডো সাহেবের নিয়মানুসারে এতদ্দেশীয় পতিত জমি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে অধিকাংশ পতিত জমি (যাহার কথা বলা-যাইতেছে) লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর। যৎসামান্য রোডসেস দিয়া ঐ সকল ভূখণ্ড রক্ষা করিতে হয় মাত্র। সুতরাং লোকে তাহাদিগের দিকে তত নজর রাখিতে চাহে না। আবার অনেক পতিত জমি আছে যেগুলি জমাইজমির অংশভুক্ত হইলেও অন্যান্য উর্ব্বরা জমির সহিত একত্র সংশ্লিষ্ট

এই কারণে ঐ সকল পোড়ো জমির খাজনা দিতে কষ্ট বোধ হয় না, কেননা এক মাঠের অন্যান্য জমির ফসলে যে লাভ হয় তাহাতে ঐ খাজনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও যথেষ্ট লাভ থাকে। এখন দেখা যাইতেছে যে পতিত জমি আবাদ করা লোকে ততটা আবশ্যক বোধ করে না। কেননা আবাদ না করিয়াও তাহাদিগের খাজনা দিতে কষ্ট বোধ হয় না। রিকারডো সাহেব যে নিয়মের কথা বলিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডের ন্যায় যে দেশে প্রতিযোগিতা আছে, তথায় খাটে। ইংলণ্ডে এখন আর পোড়ো জমি দৃষ্ট হয় না। পতিত ভূমি আবাদ করাইবার নিমিত্ত ভূস্বামীরা একটী সুন্দর কৌশল অবলম্বন করেন। প্রথমে কোন অব্যবহার্য্য জমি একজন প্রজাকে নামমাত্র খাজনায় বিলি করা হয়। সে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া ঐ জমি উর্ব্বরা করিতে চেষ্টা পায়, * এবং ২।৫ বৎসরের মধ্যে তথায় যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে ইংলণ্ডে প্রতিযোগিতা আছে, সুতরাং জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সহিত জমিদারের খাজনা বাড়িয়া যায়, কেননা অন্য লোকে এক্ষণে ঐ জমি অধিক কর দিয়া দখল করিতে অগ্রসর হয়। এইরূপে পতিত জমি ক্রমশঃ আবাদ হইয়া যায়।

যাহা হউক ইংলণ্ডের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষে পতিত জমি আবাদ হইবার পক্ষে যে অনেক বাধা আছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এদেশে কৃষিকার্য্য ঘৃণিত, ব্রাহ্মণ সন্তানপক্ষে কর্ষণ কার্য্য নিষিদ্ধ ও অন্যান্য উচ্চ জাতির পক্ষেও কতকটা ঐরূপ। সুতরাং ভারতের কৃষিকার্য্যভার "কৃষক" নামক একদল নিরীহ নির্ধন ও নিঃসহায় লোকের উপর ন্যস্ত। তাহাদিগের পূর্ব্বোক্তরূপে জমিদারের নিকট হইতে অনুর্ব্বর জমি লইয়া চাষ করিয়া তাহা উর্ব্বরা করিবার ক্ষমতা নাই আর তাহারা যে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ করেনা, দেখান গিয়াছে। কিন্তু দারিদ্রভার প্রপীড়িত ভারতে জমি পতিত থাকে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। বৎসর বৎসর রাশি রাশি চাউল, গোধূম ও অন্যান্য শস্য অবাধে বিদেশে প্রেরিত হইতেছে শস্য সঞ্চয় অভাবে শত শত লোক অন্নাভাবে হাহাকার রব তুলিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছে, আর বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড সকল পতিতাবস্থায় তৃণমাত্র ধারণ করিয়া বন্যজন্তুর আবাস ভূমি হইয়া রহিয়াছে।

ভদ্রসন্তানেরা বা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চাষের কার্য্যে অগ্রসর না হইলে যে বাস্তবিক আমাদিগের দেশের পতিত ভূমি কর্ষিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। ভদ্রসন্তানের চাষ করা অর্থ এই যে, তাঁহারা ব্যবসার স্বরূপ চাষ করিবেন। এরূপ ঘটনায় লাখেরাজ জমি ও জমাই জমি উভয় প্রকার পোড়ো জমিই কর্ষিত হইবে। এদেশে উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের অধিক খাজনা বৃদ্ধির পদ্ধতি না থাকায় তাহারা যে যত্ন পূর্ব্বক এই সকল জমিতে শস্য উৎপাদন করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন দুর্ভিক্ষপূর্ণ ভারতে আরও সহস্র সহস্র ব্যক্তির অন্নসংস্থান হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতকে বিশ্বাস নাই, এবং ভদ্র সন্তানদিগের কৃষিকার্য্যের প্রতি ঔদাস্য এখনও কমে নাই, এজন্য আমরা সহজ উপায়ে যাহাতে পোড়ো জমি হইতে যৎকিঞ্চিৎ লাভ পাইতে পারি তাহা বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইব।

১। জমি সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে হইলে এবং যেখানে হইলে যদি তদুপরি জঙ্গল থাকে, তাহা হইলে কলা গাছ বসাইয়া দিলে বেশ লাভ হয়। মধ্যে মধ্যে জঙ্গল কাটিয়া বর্ষাকালে একবার একটী করিয়া কলার তেউড় পুতিয়া দেওয়া বিশেষ পরিশ্রমের কার্য্য নহে, অথচ তাহাতে লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট। কলিকাতার ন্যায় সহরে কলাপাতা, থোড়, মোচা সমস্তই বিক্রয় হয়, ইহা কি কম সুবিধা। আবার যদি কলাগাছে লাভ হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া যাইবে, এবং তখন অধিকতর লাভজনক শস্য উৎপন্ন করিবার প্রয়াস জন্মিবে।

সাত হাত অন্তর এক হাত বাই,
কলা পোঁতগো চাষা ভাই;

এই কলা গাছ রোপণ করিবার মূল মন্ত্র।

* ইংরাজীতে এই প্রকার জমিকে Land under the margin of cultivation বলে। সুন্দরবনে বর্ণিতরূপে 'আবাদ' বা অনুর্ব্বর জমিতে চাষ হইতেছে তাহা অনেকেই জানেন।

২। যদি জমি সেঁতানে হয় এবং তাহাতে বিশেষ জঙ্গল না থাকে এরূপ স্থলে আনারসের চাষ বিশেষ ফলপ্রদ। আনারস ১২। ১৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও সহরে পাঠান যায়, অথচ তথায় উহার মূল্যও কম নহে। ইহার চাষ অতি সহজ, বর্ষাকালে ১ হাত অন্তর করিয়া গেঁড়ো পুতিলেই হইল, অধিক পাইট করিতে হয় না।

৩। যদি জমি মধ্যম অর্থাৎ অত্যন্ত নীরস বা অত্যন্ত ভিজা না হয়—সেগুন গাছ পুতিলে এরূপ জমিতে অনেক উপকার দর্শে। আজ কাল কলিকাতায় বা অন্যত্র সেগুনের কত আদর বাড়িয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু এদেশে সচরাচর উহার চাষ দেখা যায় না। বীজ হইতে প্রথমে সেগুনের চারা প্রস্তুত করিয়া হাপোরে রাখিতে হয়। ৪।৫ বৎসর অন্তর ইহার রলা কাটা যাইতে পারে, ইহাতে ঘরের খুঁটি ও অন্যান্য কাজ চলে, এবং এই হিসাবে দাম কম নহে।

৪। যদি জমি নীরস ও অত্যন্ত অনুর্ব্বর হয় তাহা হইলে তাহাতে বাবলা গাছ রোপণ করাই শ্রেয়ঃ। প্রথমতঃ তৃণাদি তুলিয়া ফেলিয়া জমি পরিষ্কার করিলে ভাল, নতুবা মাঝে মাঝে গর্ত্ত কাটিয়া বর্ষাকালে ভারি বৃষ্টির পর গোবরের ঠুনির মধ্য বীজ পুতিয়া দাও। কাঁটা গাছ গো মেষাদিতে নষ্ট করিবে না সুতরাং অনায়াসে বর্দ্ধিত হয়। বাবলার ছালে এক প্রকার রং প্রস্তুত হয়। বাবলার কাঠে লাঙ্গলের মুড়া প্রস্তুত করে, এবং গাড়ীর চাকা প্রভৃতি অনেক ব্যবহারে আইসে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এলুমিনিয়াম্।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে একটি অভিনব ধাতুর গুণ, ব্যবহার ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ধাতুটি যে একটি অভিনব ব্যবসায়ের উৎকৃষ্ট উপাদান তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

আজ কাল কলিকাতার বাজারে, দুই এক দোকানে, ঈষৎ নীলাভ অথচ শ্বেত বর্ণের এক প্রকার নূতন ধাতুনির্ম্মিত গেলাস, রেকাব, প্রভৃতি কয়েক প্রকার সামান্য সামান্য বাসনের আমদানী দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বাসনগুলি যে ধাতুতে গঠিত তাহাকে এলুমিনিয়াম্ বলে। উহা একটি অমিশ্র ধাতু। উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অতি কম বলিয়া উহা প্রায় সকল ধাতু অপেক্ষা হাল্‌কা। উহা জল অপেক্ষা ২ ৳ গুণ মাত্র ভারি, সুতরাং উহা যে অত্যন্ত হাল্‌কা ধাতু তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। এতাধিক হাল্‌কা বিবেচনায় উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেহ যেন সন্দিহান না হয়েন। উহার আর একটি গুণ এই যে অম্লতার সংস্পর্শে উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

এলুমিনিয়াম্ ধাতু দ্বারা আমাদের দেশের গৃহস্থলী সংক্রান্ত ব্যবহারোপযোগী বহুবিধ সুন্দর সুন্দর বাসন প্রস্তুত হইতে পারে, এবং সেই সকল বাসন বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্গদেশে এলুমিনিয়াম্ ধাতুর কারখানা দেখা যায় না। যদি কোন উদ্যোগী ব্যক্তি, আবশ্যকীয় মূলধন সংগ্রহ পূর্ব্বক যন্ত্রের সাহায্যে, বাঙ্গলা দেশীয় গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী এলুমিনিয়ামের বাসন প্রস্তুত করতঃ ব্যবসায় আরম্ভ করেন তাহা হইলে তিনি যে প্রভূত লাভবান হইতে পারেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী বাসন ব্যতীত উহা দ্বারা এমন অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে যাহা মিউনিসিপ্যালিটি, ডাক্তারখানা ও সৈনিকদলের মধ্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে। এলুমিনিয়াম্ ধাতুর মূল্য এতকম যে গরীব লোকেও তন্নির্ম্মিত বাসন সহজে ক্রয় করিতে পারে।

মান্দ্রাজ নগরে এলুমিনিয়াম্ ধাতুদ্বারা বাসন প্রস্তুতের একটি কারখানা আছে। উক্ত কারখানা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথমে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মান্দ্রাজ শিল্প বিদ্যালয়ের একাংশরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। পরে উহা ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম্ কোম্পানীর হস্তে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কোম্পানী অল্প সময়ের মধ্যেই কারবারের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। মান্দ্রাজে ক্রমেই এলুমিনিয়াম্ গঠিত বাসনের আদর বাড়িতেছে।

এজন্য বৎসর বৎসর অধিকতর মালের কাট্‌তি হইতেছে।

নিম্নের তালিকা দৃষ্টে উপলব্ধি হইবে যে ১৮৯৮ সাল হইতে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত উক্ত কারখানার এলুমিনিয়াম্ ধাতু নির্ম্মিত বাসনের কাট্‌তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে হারে উহার কাট্‌তি বাড়িতেছে তাহাতে সহজেই অনুমান হয় যে অল্পকাল মধ্যেই উহা একটি প্রধান ব্যবসায় মধ্যে গণ্য হইবে।

সাল	মালের কাট্‌তি	আমদানী ধাতুর পরিমাণ।
১৮৯৮। এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর ৯ মাসে—	৩০৭৭২৸৵৫	১৪১২৫ পাউণ্ড
১৮৯৯।	৯১৮১৮৸৩	৪১৭২৩ ঐ
১৯০০।	১৫০১২৯।৶৪	৭৯৭৫৩ ঐ
১৯০১।	১৭৯৭৪০৸৯	১১৯২৩৭ ঐ
১৯০২।	২০১৩৬৪৷৶১	৮১৫১০ ঐ
১৯০৩। জানুয়ারি হইতে— সেপ্টের পর্য্যন্ত— ৯ মাসে—	১৬৪২৮৮৷৵৫	৯৪১২২ ঐ

এক্ষণে ১৮৯৮ সালের নয় মাসের ধাতু আমদানী ও মালকাট্‌তির সহিত ১৯০৩ সালের নয় মাসের আমদানী ও কাট্‌তির তুলনায় দেখা যাইতেছে যে গত সাড়ে পাঁচ বৎসরের মধ্যে উহা প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত হিসাবানুসারে দেখা যায় যে কয়েক বৎসরের মধ্যে একমাত্র মান্দ্রাজ শিল্প বিদ্যালয় হইতেই প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় হইয়াছে এবং বিয়াল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ডেরও অধিক মূল্যের এলুমিনিয়াম্ ইংলণ্ড হইতে মান্দ্রাজে আনীত হইয়াছে।

ক্রমশঃ মালের কাট্‌তি বেশী হইতেছে বলিয়া যে এলুমিনিয়াম্ ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। মূল্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক কয়েক বৎসরেরর মধ্যে উহার মূল্য প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমিয়া গিয়াছে। কোন ধাতুর মূল্যের ন্যূনতার সহিত তন্নির্ম্মিত দ্রব্যেরও মূল্য যে কম হয় ইহা স্বতঃসিদ্ধ, এবং দ্রব্যের মূল্য যত কমিবে তাহার কাট্‌তিও তত বাড়িবে ইহা নিশ্চয়। সুতরাং ভবিষ্যতে এলুমিনিয়াম্ নির্ম্মিত বাসনের বহুল কাট্‌তি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এক পোয়া ওজনের এলুমিনিয়াম্ দ্বারা একটি পরিমাণ গেলাস প্রস্তুত করিতে ধাতুর মূল্য ও মজুরি সহ ।৶০ আনার বেশী পড়ে না। উক্তরূপ একটি গেলাসের বর্ত্তমান বাজার দর ৸৶০ কম নহে।

বাঙ্গলা দেশে একটি কারখানা খুলিয়া যদি এলুমিনিয়ামের বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করান যায় তাহা হইলে বর্ত্তমানে উক্ত ধাতু নির্ম্মিত যে সমস্ত বাসন বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ বাসন প্রস্তুত করাইয়া প্রচলিত দরের অর্দ্ধেক মূল্যে বিক্রয় করিলেও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে।

অধুনা এলুমিনিয়াম্ নির্ম্মিত যে সমস্ত দ্রব্য বাজারে দেখা যায় তাহার সংখ্যা অল্প হইলেও তাহা নিভাজ ধাতু দ্বারা প্রস্তুত। লৌহ, তাম্র, রঙ্গ, দস্তা, প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর ধাতুর সহিত উক্ত ধাতু মিশ্রিত করিলে নানাবিধ মিশ্র ধাতু তৈয়ারি হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা মানব সমাজের আবশ্যকীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

কাচ।

২

অনেক পদার্থ উত্তাপে গলিয়া গিয়া শীতল হইলে কাচের ন্যায় স্বচ্ছ আকার ধারণ করে। সোহাগা, অনেক প্রকার ফটকিরি (alums) ও কয়েক প্রকার ধাতুর অম্ল (Oxides) ঐ প্রকারে কাচের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থে পরিণত হয়। ইহাদের মধ্যে Microcosmic salt নামক পদার্থ (Hydric ammonic sodic Phosphate) অন্যতম। ইহাদের সাহায্যে রাসায়নিকগণ যৌগিক পদার্থে ধাতুর উপস্থিতি পরীক্ষা করেন। ধাতুর বিভিন্নতায় উক্ত প্রকার কাচের ন্যায় পদার্থের বর্ণের বিভিন্নতা ঘটে। ইহার নাম শুষ্ক উপায়ে পরীক্ষা (Dry test).

কাচ দুই যৌগিক পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থ বিশেষ। পটাশ বা সোডার সহিত সিলিকন এবং ক্যালসিয়ম বা সীসের সহিত সিলিকন এই দুই সিলিকন যুক্ত পদার্থই কাচের প্রধান উপাদান। উপাদানের বিভিন্নতায় কাচের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। উপাদানের বিশুদ্ধতার উপর কাচের উৎকর্ষতা অপেক্ষা করে। উপাদান যেরূপ বিশুদ্ধ হইবে কাচও সেইরূপ উত্তম হইবে। আবার উত্তাপের তারতম্যে কাচের গুণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কাচকে যদি হঠাৎ শীতল করা যায় তাহা হইলে কাচ এক আশ্চর্য্য গুণ প্রাপ্ত হয়। সহসা শীতলীকৃত কাচে হাতুড়ির ঘা মারিলে ভাঙ্গিবেনা, কিন্তু যদি কোন পদার্থ দ্বারা সামান্য আঁচড় দেওয়া যায় তাহা হইলে উহা সহস্র খণ্ডে ভগ্ন হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। Ruperts' Drops নামক কাচে এই গুণ সমধিক পরিলক্ষিত হয়। Ruperts' Drop দেখিতে ঠিক দীর্ঘ লম্বা যুক্ত ঠকারের ন্যায়। কাচ গলাইয়া ফোঁটা ফেলার ন্যায় শীতল জলে ফেলিলেই উহা প্রস্তুত হয়। ইহার মোটা দিকে যতই গুরুতর আঘাত করা যাউক না কেন সূক্ষ্ম লাঙ্গুলাকার অংশে যদি সামান্য আঁচড় দেওয়া যায় তাহা হইলে উহা সামান্য শব্দ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া গিয়া সমুদায় চূর্ণমূর্ত্তি ধারণ করে।

কাচ সহসা শীতল হইলে কাচ মধ্যে অণু সকল সম্যক্ গঠিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং উহা একরূপ সাম্যাবস্থায় থাকে। এই প্রকারে দানার ন্যায় না বাঁধায় অভ্যন্তর ভাগে এক প্রকার শক্তি সঞ্চিত থাকে। আবার কাচের অপরিচালকতা গুণ সমধিক প্রবল। ধাতুময় পদার্থের এক অংশ উত্তপ্ত করিলে শীঘ্রই তাপ পরিচালিত হইয়া অপর অংশ উত্তপ্ত হয়, কাচে সেরূপ হয় না। কাচনির্ম্মিত পদার্থের একস্থল হয়ত উত্তাপে গলিয়া যাইবে কিন্তু অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী অংশে হয়ত আদৌ উত্তাপ পৌঁছিবেনা। সেইজন্য গলিত কাচ যখন সহসা শীতলীকৃত হয় তখন উপরের অংশ শীতলতা সংস্পর্শে প্রথমে কঠিনীভূত হয় এবং অভ্যন্তরভাগ তৎপরে কঠিন হইতে থাকে। সকলেই অবগত আছেন যে, উত্তপ্ত পদার্থ শীতল হইলে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত অর্থাৎ স্বল্পায়তন হইয়া থাকে; সুতরাং যখন পশ্চাৎ কঠিনীভূত উক্ত কাচের অভ্যন্তর ভাগ কুঞ্চিত হইতে প্রয়াস পায়, তখন উপরের পূর্ব্ব কঠিনীভূত অংশ অভ্যন্তর ভাগের আকুঞ্চনে বাধা দিয়া থাকে। তজ্জন্য উক্ত কাচের অণুসকল অস্থায়ী সাম্যাবস্থায় (unstable equilibrium) থাকে। যদি কোন সামান্য কারণে (আঁচড় ইত্যাদির দ্বারা) উক্ত অস্থায়ী সাম্যাবস্থার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটে তাহা হইলে আকর্ষণমূলক অভ্যন্তর সঞ্চিত শক্তি (Potential Energy) সমুদায়কে শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যয়িত হয়।

অনেক সময়ে বায়ু সংযোগে শীতলীকৃত কাচেও উক্তগুণ পরিলক্ষিত হয়। ঐ প্রকার কাচ অনেক সময়ে তাপের সহসা বৃদ্ধি বা হ্রাসে ফাটিয়া যায়। বোধ হয় অনেকে দেখিয়াছেন সামান্য মূল্যের মোটা কাচের গ্লাসে অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ ঢালিলে ফাটিয়া বা তলা খসিয়া যায়। আবার বরফ খণ্ড দিলেও ঐরূপ হয়।

কাচকে ক্রমশঃ শীতল করিলে উহাতে ক্রমে ক্রমে দানার ন্যায় বাঁধিতে থাকে। কাচাম্লক (Hydroflouric Acid) দ্বারা দ্রব করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে কাচের দানার আকার দেখা যাইতে পারে। কাচ দানা বাধিলে আর ওরূপ টান থাকে না। তাপমান যন্ত্র প্রস্তুত করিবার সময় উত্তাপ দ্বারা অভ্যন্তরভাগে পারদ পূরিতে হয়। তৎপরে ফুটন বিন্দু ও শূন্যবিন্দু নির্দ্ধারিত করিয়া ডিগ্রি বিভাগ করিতে হয়। পারদ পূরিবার অব্যবহিত পরেই ডিগ্রি বিভাগ করিলে তাহা প্রায় ঠিক হয় না। কেননা উহার পর দানা বাঁধিতে থাকিলে আয়তনের বিভিন্নতা ঘটে। তজ্জন্য বিশুদ্ধ তাপমান যন্ত্রের নল প্রথমে প্রস্তুত করিয়া কিছু কাল রাখিয়া দিতে হয়; তৎপরে পারদ পূরিবার পরেও কিছু কাল রাখিয়া দিয়া তবে ডিগ্রি-বিভাগ করিয়া লইতে হয়।

আবার কোন কোন কাচ উত্তাপে কিঞ্চিৎ গলিয়া যখন নরম হয় তখন যদি আপনা আপনি শীতল হইতে থাকে, তাহা কাচ ফুটিয়া গিয়া এক প্রকার শ্বেতবর্ণ দানাদার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে ও স্বচ্ছতা একেবারেই বিলুপ্ত হয়। এ প্রকার পরিবর্ত্তনের ইংরাজী নাম Divitrification. ক্যালসিয়ম

যুক্ত কাচে সিলিকনের (বালুকার) ভাগ অধিক থাকিলেই এরূপ হয়। কোন কোন কাচে এ প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। অনেকেই বোধ হয় দেখিয়াছেন আমাদের দেশের কারিকরেরা ভাঙ্গা কাচ খণ্ড একটা দীর্ঘাকার নলের এক প্রান্তে লাগাইয়া চুলীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া কাষ্ঠের উত্তাপে নরম করে; সেই তাল হইতে অপর এক ব্যক্তি আবশ্যক মত খানিকটা আর একটা ফাঁপা নলের প্রান্তদেশে লাগাইয়া ফুঁ দিয়া ছাঁচের সাহায্যে ফুঁকাশিশি, ল্যাম্প, ফানস ইত্যাদি প্রস্তুত করে। উহা অত্যস্বচ্ছ। কাচকে জিপসম্ (Gypsum) বা বালুকার অভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া যদি উত্তাপ দেওয়া যায় তাহা হইলে কাচ চিনাবাসনের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অস্বচ্ছ আকারে পরিণত হয়। ইহাকে Renmers Porcelain বলে।

কাচ নির্ম্মিত দ্রব্যকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে ক্রমশঃ শীতল করিয়া লইতে হয়। ক্রমশঃ শীতল কাচ তাপ ও শীতলতা অধিক সহ্য করিতে পারে। এক প্রকার চুল্লীদ্বারা কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য কারখানায় ক্রমশীতলীকৃত হয়। এই প্রকারে ক্রমশঃ শীতল করার নাম Annealing আমাদিগের দেশের কারিকরেরা দোতলাচুলী প্রস্তুত করিয়া থাকে; নীচে অগ্নি জ্বলে ও উপর তলায় সদ্য প্রস্তুত কাচ দ্রব্য উত্তাপে রক্ষিত হয়। এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিবৃতি পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে Dela Bastic নামক বিখ্যাত কাচ তত্ত্ববিৎ এক প্রকার নূতন প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। প্রথমতঃ তৈল বা প্যারাফিন কে ৩০০ ডিগ্রি তাপেরাখা হয়, তদনন্তর কাচদ্রব্য তাতাইয়া লাল করিয়া তন্মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ করিলে কাচ তাপের সহসা পরিবর্ত্তন অবাধে সহ্য করে। এরূপ কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায় না, কিন্তু হীরকদ্বারা কাটিতে গেলে কাটা যায় না, চূর্ণ হইয়া যায়। ইহার নাম Tougeined glass এরূপ কাচে পূর্ব্বোল্লিখিত Ruperts Drops এর গুণ কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। অনেক সময়ে এরূপ কাচে নির্ম্মিত দ্রব্য বিনা কারণে আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া শতখণ্ড হইয়া যায়। তজ্জন্য এরূপ কাচের প্রচলন আজি কালি প্রায় নাই।

কাচ অতি কঠিন পদার্থ। হীরক ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ দ্বারা কাচের উপর দাগ পাড়িতে পারাযায় না। কাচ কাটিতে হইলে প্রথমে হীরকের ধার দ্বারা একটী আঁচড়দিতে হয়, তৎপরে সামান্য চাপ দিলেই দাগেদাগে ভাঙ্গিয়া যায় কাচ যেরূপ কঠিন আবার সেইরূপ ভঙ্গ প্রবণ।

কাচকে রঙ্গিন করিতে পারাযায়। কোন কোন কাচের সমুদায় ভাগই রঙ্গিন, আবার কোন কোন রঙ্গিন কাচের কেবল একদিক রং করা। রঙ্গিন করিতে হইলে কাচে পূর্ব্বাহ্ণেই রং মিশাইয়া লইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। কাচের রং কেবল কতকগুলি ধাতুর অম্লজানযুক্ত লবণ (Oxides) cuprous oxides কিম্বা purple of casius মিশাইলে লাল; Inanganie Dioxide এ ভায়োলেট; কোবল্ট Oxide এ নীল; cupric Oxide chromic oxide কিম্বা Ferrie oxide এ হরিৎ; Antimonic oxide এ পীত ইত্যাদি। কাচের মধ্যদিয়া আলোক রশ্মি অবাধে গমন করিতে পারে। উত্তাপ রশ্মিরও কিয়দংশ কাচের মধ্য দিয়া যাইতে পারে। কাচ অতি অপরচালক। তাপ ও তড়িৎ কাচের দ্বারা পরিচালিত হয় না। তজ্জন্য অনেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রে কাচ ব্যবহৃত হয়। অধিক পরিমাণে সীস যুক্ত কাচ দ্বারা (Lense) প্রস্তুত হয়। এ প্রকার কাচের দ্বারা অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি আলোকমূলক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাচের মধ্য দিয়া আলোক যাইলে উহা বিশ্লেষিত হইয়া থাকে। ঝাড়ের কলম দ্বারা বিশ্লেষিত বর্ণাবলী অনেকেই দেখিয়াছেন।

অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ ইত্যাদির জন্য কাচ প্রস্তুত করিতে গেলে অতীব সাবধানতার আবশ্যক। উপাদানের তারতম্যে সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অনেক সময় যদি উপাদান সমান ভাগে মিশ্রিত না হয় তাহা হইলে কোন কোন পদার্থ কাচে অধিক পরিমাণে থাকিয়া গিয়া ঘোলাপড়ার ন্যায় মাঝে মাঝে অস্বচ্ছ দাগ বিশিষ্ট হয়। আবার ভিতরে যদি বায়ু প্রবেশ করে বা কঠিনীভুত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে

বুদ্‌বুদ রূপে বহির্গত হইয়া যায় তাহা হইলে আর উহা ব্যবহারোপযোগী হয় না।

উদ্ভিদের পরিরক্ষণার্থ অনেক সময় কাচের আবরণ আবশ্যক হয়। শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদাদির রক্ষার্থ কাচই অতীব উপযোগী। সৌরকরে তিন প্রকার রশ্মি আছে। আলোক, তাপ ও রাসায়নিক রশ্মি। এই তিন প্রকার রশ্মিই কাচের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু উপাদান ও বর্ণের তারতম্যে উক্ত তিন প্রকার রশ্মি প্রবেশেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কোন কাচ অধিক আলোক রশ্মির গমনে সহায়তা করে, কোন কাচ অধিক পরিমাণ তাপ রশ্মিকে ভিতর দিয়া যাইতে দেয়, আবার কোন কোন কাচ রাসায়নিক রশ্মির গমনে পথ দিয়া অপর রশ্মিদ্বয়ের প্রবেশে অল্পবিস্তর বাধা দিয়া থাকে। উদ্ভিদগণও অবস্থা বিশেষে এই তিন রশ্মিই আবশ্যকমত পাইলে অত্যধিক পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হইবার কালে অধিক পরিমাণে অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অম্লজান বাষ্প যোগে বীজাভ্যন্তরস্থ শ্বেতসারময় পদার্থ শর্করায় পরিণত হয়। এই সময়ে উদ্ভিদের রাসায়নিক রশ্মির সমধিক প্রয়োজন ঘটে। অঙ্গারক ক্লরোফিল নামক পত্র সহ হরিৎ পদার্থ সহযোগে বিশ্লেষিত করিয়া অঙ্গার দ্বারা কাষ্ঠ নির্ম্মাণ কালে আলোক রশ্মির এবং পুষ্পোদ্গম বা ফল প্রসব কালে তাপ রশ্মির ও রাসায়নিক রশ্মির প্রয়োজন হয়। কাচ কোবাল্ট দ্বারা নীল বর্ণে রঞ্জিত হইলে উহার মধ্য দিয়া রাসায়নিক রশ্মি অবাধে প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু আলোক ও তাপ রশ্মি সেরূপ পারে না। রৌপ্য দ্বারা হরিদ্রা বর্ণ রঞ্জিত কাচের ভিতর দিয়া কেবল আলোক রশ্মি অবাধে যাইতে পারে; আবার স্বর্ণ বা তাম্র সংযুক্ত লবণ দ্বারা রঞ্জিত রক্তবর্ণ কাচের অভ্যন্তর দিয়া তাপরশ্মি বহুল পরিমাণে গিয়া থাকে। সুতরাং উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম কালে নীল, কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইলে হরিদ্রা এবং পুষ্পোদ্গম কালে রক্তবর্ণ কাচাবরণই উদ্ভিদের উপযোগী।

ইংলণ্ডের কিউ নামক স্থানের উদ্ভিদোদ্যান প্রস্তুত কালে উদ্যানাধ্যক্ষগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে ম্যাঙ্গনিজ অক্সাইড (Manganese Oxide) কাচ হইতে একেবারে নিরাকৃত করিয়া দিয়া কপার অক্সাইড় সামান্য পরিমাণে দিয়া যে হরিৎবর্ণ কাচ প্রস্তুত হয় উহাই উদ্ভিদের পক্ষে সর্ব্ব সময়ে উপযোগী হইয়া থাকে। কিউর (Kew) রাজকীয় উদ্ভিদোদ্যানের জন্য ঐ প্রকার কাচ আবশ্যক হইলে বর্ম্মিংহামের চানস্ব্রাদার নামক কোম্পানি প্রস্তুত করিয়া সরবরাহ করিয়াছিল।

অনেক পদার্থের নিকট কাচ দুর্দ্ধর্ষ। কোন পদার্থ কাচের বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। তজ্জন্য কাচই তরল পদার্থের সচরাচর সুলভ আধার হইয়া থাকে। হাইড্রোফ্লোরিক এসিড কেবল কাচের এক বিষম শত্রু। হাইড্রোফ্লোরিক এসিড সংস্পর্শে কাচ গলিয়া যায়। এই জন্য কাচের উপর চিহ্নাদি করিতে হইলে প্রথমে কাচ নির্ম্মিত দ্রব্যকে উত্তমরূপে মোম দ্বারা আবৃত করিতে হয় এবং তৎপরে সূচীর ন্যায় সূক্ষ্ম অগ্র ভাগ দ্বারা যে প্রকার চিহ্ন করিতে হইবে সেই প্রকার মোমের উপর চিহ্নিত করিয়া হাইড্রোফ্লোরিক এসিডে ডুবাইতে হয়। চিহ্নিত স্থান সকল হইতে মোম উঠিয়া যাওয়ায় ঐ সকল স্থান আক্রান্ত ও ক্ষয়িত হয়। তৎপর জাপান ইঙ্ক ইত্যাদির দ্বারা স্বেচ্ছামত রঞ্জিত হয়। হাইড্রোফ্লোরিক এসিড কাচের মধ্যে যে সিলিকা থাকে তাহার সহিত রাসায়নিক সংযোগে Silicic fluoride ও জলে পরিণত হয়।

যে কাচ শীঘ্র গলিয়া যায় না ও অতি কঠিন সেই কাচই উৎকৃষ্ট। সে প্রকার কাচের উপর জল বায়ু বা অন্যান্য রাসায়নিক কার্য্যকর পদার্থ বড় একটা প্রভুত্ব করিতে পারেনা। যে সকল কাচে ক্ষারের ভাগ অধিক থাকে সেই সকল কাচ বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করে বলিয়া শীঘ্রই মলিন ও চাকচিক্য বিহীন হইয়া যায়। অনেক প্রকার কাচ উত্তপ্ত জল, অম্ল বা ক্ষারের দ্বারা অল্পাধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। যে কাচে বোতল প্রস্তুত হয় উহা অতি অপকৃষ্ট কাচ, এই জন্য সময়ে সময়ে মদ্যস্থিত 'টার্টার' নামক পদার্থ বিশেষ দ্বারা বোতলের কাচ আক্রান্ত হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ রাসায়নিক গায়টন মরভিউ বলেন যে, যে কাচ ফটকিরি, সাধারণ লবণ, গন্ধক দ্রাবক অথবা ক্ষারময় দ্রব্যদ্বারা আক্রান্ত হয় তাহা অতি অপকৃষ্ট শ্রেণীর কাচ। এরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা কাচের উৎকর্ষতা পরীক্ষিত হইতে পারে।

কাচ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন কিন্তু পুরু কাচ পার্শ্ব হইতে দেখিলে সবুজ বর্ণের দেখায়। ইহার কারণ এই যে আলোক রশ্মির প্রতি স্তর দিয়া প্রবেশ কালে বিশ্লিষ্ট বর্ণমালার সবুজ ভিন্ন অন্য বর্ণ শোষিত হয় এবং সবুজ বর্ণই প্রতিফলিত হয়। জলও বর্ণবিহীন কিন্তু গভীর হইলেও এই কারণে নীলমূর্ত্তি ধারণ করে। আলোক রশ্মি বায়ু ভেদ করিয়া কাচের মধ্যে প্রবেশ কালে বা কাচ হইতে বহির্গত হইবার কালে প্রায়ই উপাদান ভেদে অল্পবিস্তর ঈষৎ বক্র পথে গমন করিয়া থাকে। এই প্রকারে আলোক রশ্মির বক্রতার ইংরাজী নাম Refraction। যে কাচের ঘনত্ব যত অধিক সে কাচে আলোক রশ্মি তত অধিক বক্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য আলোক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণোপযোগী কাচে সীস মিশ্রিত করা হয়। ক্রিষ্টাল গ্লাস ফ্লিন্ট গ্লাসে এই গুণ অধিক পরিমাণে আছে। সীসও এই সকল কাচের এক প্রধান উপাদান। অনেকে দেখিয়াছেন যে ঝাড়ের কলমের মধ্যদিয়া কোন বস্তু দেখিলে তাহা অতি উচ্চে দেখায়। রশ্মির বক্রতা প্রাপ্তিই ইহার কারণ। আবার কলমের কাচমধ্য দিয়া সূর্য্য রশ্মি গমন করিলে উহা সাতটী বর্ণমালায় বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। ইহার ইংরাজী নাম Dispersion। যে কাচে এ প্রকার না ঘটে তাহাই অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্রে ব্যবহরণীয়। সেই জন্য লেন্স প্রস্তুত কালে যাহাতে আলোক রশ্মি অধিক পরিমাণে বিশ্লিষ্ট না হয় তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। এরূপ কাচকে ইংরাজিতে Achromatic কাচ কহে।

শীতলাবস্থায় কাচ সাধারণতঃ কঠিন, ভঙ্গপ্রবণ ও স্থিতিস্থাপক গুণযুক্ত। ঘা দিলে শব্দ হয় ও ভাঙ্গে। প্রায় সোজাসুজি ভাঙ্গেনা, চারিদিকে ফাটিয়া যায়। কাচ মসৃণ ও চিক্কণ। উত্তাপে যখন গলিয়া যায় তখন মৃত্তিকার ন্যায় ছাঁচে ঢালিয়া স্বেচ্ছামত গঠিত হইতে পারে। গলিত কাচ আটাল ও তাহা টানিয়া রেশমের ন্যায় সূক্ষ্ম সূত্র পর্য্যন্ত করিতে পারা যায়।

কাচকে একেবারে অধিক উত্তাপ দিলে, কাচ ফাটিয়া যায়। অপরিচালকতাই ইহার কারণ। যে স্থল উত্তাপ প্রাপ্ত হয় সেই স্থলের আয়তন তৎক্ষণাৎ বর্দ্ধিত হইতে চেষ্টা করে কিন্তু পরবর্ত্তী স্তরে তখনও অপরিচালকতার জন্য উত্তাপ প্রবেশ না করায় উপবিভাগস্থ তপ্ত স্থল বিস্ফারণে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ফাটিয়া যায়। এই জন্য তাপ দিতে গেলে কাচকে এক এক বার শিখায় ধরিয়া আবার সরাইয়া লইয়া যাইতে হয়। যতক্ষণ সমুদায় ভাগ না উত্তপ্ত হয় ততক্ষণ সঞ্চালিত করিয়া তৎপরে শিখায় ধরিলে আর ফাটিবার সম্ভাবনা থাকেনা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সিলিকন (বালুকা) কাচের এক প্রধান উপাদান। সিলিকা (SiO_2) প্রচণ্ড উত্তাপেও গলিত হয় না, কিন্তু উহার সহিত পটাশ বা সোডা মিশিলে অথবা পটাশ বা সোডার সহিত চূণ বা লিথার্জ্জ (Plumbic Oxide) মিশিলে অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে গলিয়া গিয়া থাকে। অম্লের (acid) সহিত ক্ষার বা ধাতব পদার্থের (bases) সমবায়ে যেরূপ লবণ (salt) প্রস্তুত হয় কাচও সেইরূপ একপ্রকার যৌগিক লবণের মিশ্র। সিলিকা এক প্রকার শুষ্ক অম্ল (Anhydrous acid) গলনোত্তাপে ইহার সহিত ক্ষার বা ধাতব পদার্থ মিশ্রণেই কাচের উৎপত্তি হয়। সুতরাং কাচকে সিলিকা সম্ভূত ধাতব লবণ বিশেষ বলা যাইতে পারে। তজ্জন্য অম্ল ও ক্ষারের যে অনুপাতে মিশিলে লবণ উৎপন্ন হয় কাচেও সে অনুপাতের ব্যত্যয় হয় না। কিন্তু সে অনুপাত মত ভাগ মিলাইয়া কাচ প্রস্তুত অতীব দুরূহ। কেননা যদি পূর্ব্বাহ্নেই জানা যাইতে পারিত যে, গলন বিন্দুতে নির্দ্ধারিত পরিমাণ সিলিকা কত পরিমিত ক্ষারের সহিত রাসায়নিক সংযোগে মিলিতে সক্ষম, তাহা হইলে ভাগ ঠিক সমান করিয়া উপাদান মিশাইয়া লইলেই চলিত। কিন্তু কার্য্যতঃ সেরূপ ঘটিয়া উঠে না। ইহার কারণ এই যে, উত্তাপের তারতম্যে, গলনোন্মুখ সিলিকার ক্ষারগ্রহণশক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে এবং ক্ষারের তারতম্যে

কাচের গুণের ও তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং কার্য্যতঃ বিদ্যার দৌড় এই স্থানেই বন্ধ করিয়া হাতে কলমে না শিখিলে আর উপায়ান্তর নাই। এই খানেই Practiceএর (সাধনের) সহিত বিবাদে Theory (সূত্রপ্রবচন) পরাস্ত। যথা—, সিলিকা, পটাশ ও চুণে রাসায়নিক সংযোগের অনুপাতানুসারে দেখা গেল যে ৭১.৪৯ পরিমাণ সিলিকা ১৪.৬৭ পরিমিত পটাশ ও ৮০৮৪ পরিমিত চুণের সহিত মিশিতে সক্ষম। সুতরাং ৯৫ ভাগ পরিমিত কাচ প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত ভাগানুযায়ী সিলিকা, চুণ ও পটাশ আবশ্যক। কিন্তু কার্য্যতঃ এ প্রকার সঠিক ভাগ মিশ্রণ অসম্ভব না হইলেও অতি দুরূহ। উপাদান এরূপ ভাগের যত কাছাকাছি যাইবে কাচও তত উত্তম হইবে। কিন্তু দ্রব্যাদির বিশুদ্ধতা কোথায়? আবার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উত্তাপের তারতম্যে সিলিকার তাপ গ্রহণ শক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। তাপ যত কম হইবে তত অল্প পরিমাণ সিলিকা মিশিবে ও ক্ষারের ভাগ তত অধিক পরিমাণে লাগিবে। যে স্থলে ক্ষার অধিক থাকে, সেই স্থলে উত্তাপ অধিক দিলে, ক্ষারের কিয়দংশ স্বাধীন ভাবে বহির্গত হইয়া আধারের উপাদানের সহিত মিশিতে যাইবে অথবা বাষ্পাকারে উদ্গত হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত তাপের অনুযায়ী স্থায়ী কাচ প্রস্তুত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ হইবে। সুতরাং এক উপাদানে উত্তাপের ভিন্নতায় কাচেরও প্রকার ভেদ হইবে। অতএব কাচ নির্ম্মাণ চুল্লীর উত্তাপের উপরই সমধিক নির্ভর করে। তৃতীয়তঃ যদি উত্তাপ কিঞ্চিৎ অল্প হয়, তাহা হইলে হয়ত উপাদানের কিয়দংশ অল্প অনুপাতে মিশিয়া গিয়া অপর এক যৌগিক পদার্থ উৎপাদিত করে এবং অবশিষ্ট উত্তম কাচের সহিত মিশিয়া গিয়া একেবারে স্বচ্ছতার হানি করিয়া দিয়া সমুদায়ই নষ্ট করিয়া দেয়। এ প্রকারে প্রায় Supersilicate বা Sub silicate উৎপন্ন হইয়া মিশ্রিত হয়। ইহার মধ্যে শেষোক্তটী অপেক্ষাকৃত শীঘ্র গলিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত Renmer's Porcelain ইহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। অধিক উত্তাপে ক্ষারের কিয়দংশ বাষ্পীভূত হইয়া উদ্গত হইয়া যাইলে যদি সিলিকার ভাগ অধিক থাকিয়া যায় তাহা হইলেও এইরূপ হইয়া থাকে।

কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৩ হইতে ৩.৬ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ক্রিষ্টাল ও ফ্লিন্ট গ্লাসেরই ঘনত্ব অধিক, প্রায় ৩ হইতে ৩.৬ পর্য্যন্ত।

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ বি, এল্।

জমির সার।

২

"হাড়জান প্রধান সার;"—হাড়জান প্রধান সারের মধ্যে হাড়ের গুঁড়া, হাড়ের ভস্ম, হাড়ের কয়লা, সুপার ফস্ফেট্ অব্ লাইম্ (Super Phosphate of lime) এবং সোয়ালো পক্ষীর সার প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

হাড়ের গুঁড়া অতি অনিশ্চিত সার। সকল জমীতে ইহা সমান পরিমাণে ফসল উৎপাদন করিতে পারে না। ডাক্তার ভেলকারের মতে যে জমীতে হাড়ের গুঁড়া সার রূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার মৃত্তিকার কিয়দংশ প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল মৃত্তিকাতে অঙ্গারক পদার্থ অথবা কার্ব্বণিক এসিডের ভাগ কম আছে তাহাতে হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে আশানুরূপ ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ এই যে মৃত্তিকাতে কার্ব্বণিক এসিডের অভাবে ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট না গলিয়া জমাট বাঁধিয়া যায় তাহাতে বৃক্ষের ক্ষতি হয়। গবর্ণমেণ্টের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে কয়েক স্থানে হাড়ের গুঁড়া ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সকল স্থলেই উহার সারবত্তা অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয় নাই। হাড়ের গুঁড়াতে শতকরা ৩ ভাগ হইতে ৪ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৪৫—৫০ ভাগ ফস্ফেট অব লাইম বিদ্যমান আছে। হাড়ের গুঁড়া গবর্ণমেণ্টের কানপুর, নাগপুর, পুনা প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রে অনেকবার পরীক্ষিত হইয়াছে। যে সমস্ত উদ্ভিদের মূল ভক্ষণ করা যায় তাহাদের পক্ষেই হাড়ের গুঁড়া উপকারী, তদ্ভিন্ন দাইল জাতীয় উদ্ভিদ কিম্বা ইক্ষু, যব, গম, ধান্য প্রভৃতি হাড়ের গুঁড়ার দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হয় না। বিঘা প্রতি ২॥০ মণ হিসাবে হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার হয়। উহা ব্যবহার করিতে হইলে ফসল বুনিবার ২।৩ মাস পূর্ব্বে প্রয়োগ করিতে হয়।

ধানের জন্য মাঘ ফাল্গুন মাসে এবং হৈমন্তিক ফসলের জন্য আষাঢ় মাসে হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করা উচিত।

হাড়ের ভস্মে নাইট্রোজেন প্রভৃতি পদার্থ কিছুই থাকে না। কেবল কতকগুলি অঙ্গারক পদার্থ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সারের হিসাবে ইহা হাড়ের গুঁড়া অপেক্ষাও অনেক নিকৃষ্ট সার।

হাড়ের কয়লা আমাদের দেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। ইহা সম্পূর্ণরূপ দগ্ধ হয় না বলিয়া ইহাতেও অঙ্গারক পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে থাকিয়া যায়।

সুপার ফসফেট্ অব্ লাইম—হাড়ের গুঁড়া সল্‌ফিউরিক্ এসিডের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উক্ত পদার্থ প্রস্তুত করা যায়। ১০ সের সুপার ফসফেট প্রস্তুত করিতে হইলে ৭ সের হাড়ের গুড়া এবং ৩ সের সল্‌ফিউরিক এসিড আবশ্যক। উহাকে জলের সহিত মিশাইতে পারা যায়। এইজন্য ইহা উত্তম সার বলিয়া পরিগণিত। ধান্য ইক্ষু আলু প্রভৃতির চাষে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ইহা বিঘা প্রতি ২॥০ মণ অথবা ৩ মণ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। সুপার ফসফেট অব্ লাইম উত্তম সার হইলেও ইহা সাধারণ কৃষকদের পক্ষে সুবিধা-জনক নহে। কারণ উহাতে বিস্তর ব্যয় হয় এবং হাড়ের গুঁড়াও সহজে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ হাড়ের সার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে ঐ সমস্ত সার প্রয়োগে তাদৃশ ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ পরিমিত অপর সারে (খৈল প্রভৃতিতে) উহা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়।

"সোয়ালো" পক্ষী।

ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা ইক্ষু প্রভৃতি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, বিশেষতঃ ইক্ষুতে প্রয়োগ করিলে উই লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। এক মনের মূল্য প্রায় ৯॥০ টাকা সুতরাং আমাদের দেশস্থ কৃষকের পক্ষে সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত।

ক্ষারজান প্রধান সার।

কাঠের ছাই—এই ছাই অতি উত্তম তেজস্কর সার। আমাদের দেশের কৃষকগণ ছাইএর ব্যবহার অনেকদিন হইতে জানিয়াছে। তাহারা অনেক স্থলে ছাই ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ছাই সারে ক্ষারজানের ভাগ অধিক পরিমাণে আছে। মৃত্তিকাতে ইহা প্রয়োগ করিলে কৈশিকাকর্ষণ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যে গোবর পোড়ান প্রথা নিন্দনীয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গোবর পোড়াইলে যে ছাই হয় তাহা কাঠের ছাই এর সঙ্গে তুলনা করিলে অল্প তেজস্কর। আবার কাঠের ছাই অসিক্ত অবস্থায় যেরূপ তেজস্কর সিক্ত অবস্থায় সেরূপ নহে। সুতরাং ছাই অসিক্ত অবস্থায় ব্যবহার করাই ভাল। আমাদের দেশে কচু ও ওল প্রভৃতি গাছের নিচে ছাই দেওয়া হয় এবং উহাতে তাহাদের পরিপুষ্টি সাধন হয়। তামাক ধান্য প্রভৃতির চাষে ছাই ব্যবহার করা ভাল। ওল, কুমড়া, বেগুণ ইত্যাদির চাষে ছাই ব্যবহার করিলে দুইটি উপকার পাওয়া যায়, (১) গাছের পোকা নষ্ট হয়, (২) গাছ উত্তমরূপ ফলিয়া থাকে। আমেরিকার কোন কৃষিতত্ত্ববিৎ নিম্নলিখিত পরিমাণে ছাই ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

১। বাঁধা কপি এবং ফুলকপিতে বিঘা প্রতি ১০ মণ ভাদ্র মাসে মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়

২। ভুট্টা যব ... ... ৩ মণ

গাছ পুতিবার আগে ছাই মাটির সহিত মিশাইতে হয় এবং বীজ ফেলিলে প্রত্যেক বীজের উপর কিছু কিছু করিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়।

৩। শশা, কুমড়া, লাউ, ফুটি ও তরমুজ ইত্যাদির বীজ পুতিবার পূর্ব্বে, প্রত্যেক বীজের উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণ ছাই দেওয়া উচিত।

৪। গম ... ২।৪ মণ। মাটির সহিত চষিয়া দিতে হয়।

৫। পেয়াজ .. ... ৭ হইতে ১০ মণ।

ছাইএর ব্যবহার অনেকেই জানেন সুতরাং তদ্বিষয় এস্থলে বিশদরূপে বর্ণনা না করিলেও চলিবে। ছাইএর বিষয় এই মাত্র জানা থাকিল যে, যে সমস্ত গাছের কন্দ অথবা মূল খাওয়া যায় তাহাদের পক্ষে ছাই অতি উত্তম সার। নারিকেল গাছ, সুপারি গাছ রোপণ করিবার সময় তাহার গোড়ায় তুষের ছাই দেওয়া ভাল।

তামাকের খাড়ি।

তামাকের খাড়ি পোড়াইলে যে ছাই হয় তাহা তামাক এবং আলুর চাষে বিশেষ উপকারী।

প্রধানতঃ যে সমস্ত সার কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয় প্রায় তৎসমুদয়ই উল্লেখ করা হইয়াছে। বিভিন্ন সার সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য এই পুস্তকে তাহাও বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতির সহিত নূতন নূতন সারেরও আমদানি হইতেছে এবং অনেক নূতন প্রকার সার প্রয়োগ করাও হইতেছে, কিন্তু এস্থলে তৎসমুদয় উল্লেখযোগ্য না হইলেও একটির বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইহার ইংরাজী নাম "গ্রিন ম্যানিয়োরিং" (Green Manuring) ইহার অর্থে এই বুঝায় যে সার করিবার জন্য কোন একটী বিশেষ ফসলকে চাষ করা যায়, পরে ফলিবার সময় হইলে গাছগুলিকে একবারেই মাটির সহিত চষিয়া দেওয়া হয়। এই অভিপ্রায়ে ধনচা, শোন অরহর প্রভৃতির চাষ করাই ভাল। ইহাতে দুটী সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম এইরূপ গাছ মাটির সহিত চষিয়া দিলে তৎপরেই যে ফসল উৎপাদিত হয় তাহা একবারেই পোষণোপযোগী সার প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ মৃত্তিকাও ভাল হয়।

মটরজাতীয় এমন কতকগুলি উদ্ভিদ্ আছে যাহারা বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজান আকর্ষণ করিতে পারে। আবার ঐ জাতীয় কতকগুলি উদ্ভিদের শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহাদিগকে "গ্রিন্ ম্যানিয়োরিং"এর জন্য ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। তাহার কারণ প্রথমতঃ ইহারা উপরি ভাগে মৃত্তিকা হইতে আহার্য্য গ্রহণ না করিয়া নিম্নস্তর হইতে গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের সোরাজান গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকায় ইহারা জমীতে অধিক পরিমাণে সোরাজান সংযুক্ত করিয়া দেয়। সুতরাং খেসারী, অরহর, রম্ভা কলাই প্রভৃতির গাছ "গ্রিণ ম্যানিয়োরিং" রূপে ব্যবহার করিলে তৎপরবর্ত্তী ফসল সমধিক তেজে বাড়িয়া উঠে। লোহারডগা জেলায় শাউন নামক এক প্রকার গাছ উক্ত অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয়। খেসারি, অরহর প্রভৃতি আমাদের দেশে মূল্যবান শস্য বলিয়া অনেকেই সাররূপে ব্যবহার করিতে আপত্তি করিতে পারেন। এরূপ স্থলে তাঁহারা উক্ত উদ্ভিদ্ সমূহ গৃহপালিত গরু ছাগল প্রভৃতিকে খাওয়াইতে পারেন। এবং উহাদের মল ও মূত্র যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারেন। এইরূপে দুইটী অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। (১) জন্তুগুলি পুষ্টিকর আহার পায় (২) উহাদের মল মূত্রজনিত সার বৃক্ষের পক্ষে সমধিক হিতকর হয়। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশে "গ্রিণ ম্যানিয়োরিং"এর জন্য আরও একটী সহজ উপায় আছে। আমাদের দেশে ছোট ছোট খাল এবং নদী অসংখ্য লতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ থাকে। ঐ সমস্ত বৃক্ষাদি গ্রিণ ম্যানিয়োররূপে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। কিন্তু সকল সময় গ্রিণ ম্যানিয়োরিং তাদৃশ উপকার দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতি বৎসর গ্রিণ ম্যানিয়োর করা উচিত নয়।

পূর্ব্বোক্ত সার ভিন্ন আমাদের দেশে আর এক প্রকার সার দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১। বোদমাটি।

আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, লিচু, লেবু, কার্পাস প্রভৃতিতে ইহা সাররূপে ব্যবহৃত হয়। এই মাটি প্রয়োগ করিলে গাছে পোকা লাগিবার সম্ভাবনা আছে এজন্য ইহার সহিত কিঞ্চিৎ তুঁতে মিশ্রিত করা ভাল।

২। ভীটে-মাটি।

গ্রামের আবর্জ্জনার সহিত মিশ্রিত করিলে ইহা ইক্ষু, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতির পক্ষে হিতকর সার বলিয়া পরিগণিত হয়।

৩। পলিমাটি।

তামাক, আলু, কপি নারিকেল, গুবাক প্রভৃতির পক্ষে পলি মাটি উপকারী।

৪। পোড়ামাটি।

পোড়ামাটি কখন কখন সাররূপে ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডের কোনও কোনও প্রদেশে কাদামারা ক্ষেত্রে পোড়ামাটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ যে

সমস্ত জমী তাদৃশ উর্ব্বরা নহে এরূপ জমীতে পোড়ামাটি ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

সার সম্বন্ধে যাহা কিছু অল্প স্থানের মধ্যে বলা যাইতে পারে তৎসমস্তই বিবৃত হইল। আমাদের জন্য বিদেশ হইতে সার আনয়ন করা অনাবশ্যক। যে সমস্ত দেশীয় সার রহিয়াছে তাহাতেই যথেষ্টরূপ কার্য্য চলিতে পারে। ভারতবর্ষে মোট আবাদী * জমীর পরিমাণ ৬৬০০০০০০০ বিঘা, তন্মধ্যে ৫৪৬০০০০০ বিঘা জমী খাল, নদী, পুকুর হইতে অল্প বিস্তর সার প্রাপ্ত হয় এবং বাকী জমী সহজে ভালরূপ সার প্রাপ্ত হয় না। এরূপস্থলে যাহাতে গোবর মনুষ্যের মলমূত্র ও আবর্জ্জনা প্রভৃতি রীতিমত সংস্থিত হইতে পারে তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিত। উক্ত সার সমূহে ব্যয় কম পড়ে। এবং জমীও বিলক্ষণ উর্ব্বরা হয়। সুতরাং দেশস্থ মলমূত্র প্রভৃতি যাহাতে নষ্ট না হয় এবং যাহাতে ঐ সমস্ত সংস্থিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মটর জাতীয় কতকগুলি গাছ জমীতে সোরাজানের মাত্রা বর্দ্ধিত করিতে পারে। উক্ত জাতীয় কোনও কোনও গাছ কি মাত্র সোরাজান সংগ্রহ করে এবং উহাদের দ্বারা কোন্ কোন ফসলের উপকার হয় তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখা বিধেয়। অনেক গাছের পাতা যেমন, ভুট্টা, ইক্ষু, অরহর প্রভৃতি আমরা পোড়াইয়া ফেলি। তাহাও বেশ সারবান পদার্থ। ঐ সকল উত্তমরূপে সংস্থান করা উচিত এবং জ্বালানি কাষ্ঠের অধিক পরিমাণে সংস্থান করিয়া ঘুটে প্রভৃতি কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ। আমরা নিম্নে বিভিন্ন প্রকার সারে কোন্ কোন উপাদান কি পরিমাণে রহিয়াছে তাহার একটী তালিকা দিলাম।

সারের নাম	জল	সোরাজান	ক্ষারজান	ফস্ফরিক এসিড দ্রবণীয়	ফস্ফরিক এসিড অদ্রবণীয়	মোট
হাড়ের ছাই	৭.০০	...	...	...	...	৩৪ ৮৯
„ কয়লা	৪.৬০	...	...	...	...	২৮.২৮
„ গুঁড়া	৭.৪৭	৪.১২	...	৮.২৮	১৫.২২	২৩.৫০
ক্ষারজান সংযুক্ত সার						
কার্পাসের ভুষি	৭.৩৩	...	১৩৮০	...	...	৮.৫০
সোরা	১.৯৩	১৩.০৯	৪৫.১৯	...	...	...
ভস্ম (অসিক্ত)	১২.০০	...	৫.৫০	...	...	১.৮৫
„ (সিক্ত)	...	...	১.১০	..	...	১.৪০
সোরাজান সংযুক্ত সার						
রেড়ীর খৈল	৯.৯৮	৫.৫৬	১.১২	...	...	২.১৬
কার্পাসের খৈল	৬ ৮০	৬.৬৬	১.৬২	...	...	১.৪৫
শুষ্ক রক্ত	১২.৫০	১০.৫২	...	...	..	১.৯১
শুষ্ক মাছ	১২.৭৫	৭.২৫	০.৪৫	৩.০৫	৫.২০	৮.২৫
পাঁক	১৩.২০	৬.৮২	...	৫.০২	৬.২৩	১১.২৫
তামাকের খাড়ি	১০.৬১	২.২৯	৬.৪৪	...	...	০.৬০
পশম	৯.২৭	৫.৬৪	১.৩০	...	...	৩.২৯
ক্ষুর, সিং ইত্যাদি	১০.১৭	১৩.২৫	...	...	...	১.৮৩

শ্রীহরিদাস মিত্র।

* Agricultural Ledger No. 8 of 1897 p 37.

উদ্ভিদ্ জাতি।

• মূল।

বৃক্ষের অঙ্কুরের উৎপাদন পুষ্টি ও বর্দ্ধন নিমিত্ত চিনি চর্ব্বি ও ষ্টার্চ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রীদ্বারা বীজটী পূর্ণ থাকে। অঙ্কুরগুলি শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে, জল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় পদার্থের দ্বারা বীজের আভ্যন্তরিক সামগ্রী সকল খাদ্যে পরিণত করিয়া বর্দ্ধিত হয়। যখন বীজের অঙ্কুর উদ্গত হয় তখন তাহাকে যেমন করিয়াই হউক ভূমি ও বায়ু হইতে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিতে হয়। এই সকল অঙ্কুরের মধ্যস্থিত কোষগুলি খাদ্য সামগ্রী নিজ প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম।

যে সকল বীজের মধ্যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় তাহার এক অংশ মাটীর দিকে বাড়িতে থাকে, অন্য অংশ উপর দিকে উঠিয়া যায়। এই স্বল্প পরিমাণ মূল উপরদিকে বর্দ্ধিত কাণ্ড ও পত্রের আহার্য্য আহরণে যথেষ্ট নয়, এই জন্য উপরদিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধির সহিত মূলেরও বৃদ্ধি ও পুষ্টি হইতে থাকে এবং প্রধান মূলের পার্শ্ব দেশ হইতে শাখা প্রশাখা নির্গত হইতে থাকে। অনেকদিন ধরিয়া যে সকল বৃক্ষ বাঁচে সেই সকল বৃক্ষের মূল এইরূপে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত দেখা যায়। কখনও কখনও প্রধান মূল শীঘ্রই মরিয়া যায় এবং তাহার শেষ হইতে কতকগুলি শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হইয়া প্রধান মূলের কার্য্য করিয়া থাকে; ইহাদিগকে গৌণ মূল বলা যায় এবং পুনরায় এইরূপ কতকগুলি শাখা প্রশাখা প্রধান মূল হইতে না উঠিয়া কাণ্ডের শাখার বা পত্রের গোড়া হইতে উঠিতে দেখা যায়। এই সকল মূলকে বিক্ষিপ্ত মূল বলা যাইতে পারে। এই বিক্ষিপ্ত মূলগুলি উৎপন্ন হইবার বিশেষ স্থল আছে। ইহাদিগকে পত্রের উৎপত্তি স্থানের কোণ হইতেই উঠিতে দেখা যায়। দুইটী পাতার গাঁটের মধ্যে যে স্থানটুকু থাকে সেই টুকু স্থানের আহার্য্য প্রদানই ইহার কার্য্য, এই জন্য পশ্চাৎ বা অগ্রেকার কাণ্ডাংশ মরিয়া গেলে যে অংশে এই বিক্ষিপ্ত মূল বর্ত্তমান তাহার বিনাশ হয় না। এই শ্রেণীর মূল অনেক অর্কিড ও অন্তর্ভৌম কাণ্ড আদা বা হলুদে দেখা যায়।

প্রধানতঃ মূলের দুইটী কার্য্য দেখা যায়। প্রথম, আহার্য্য শোষণ ও তাহা প্রয়োজনীয় স্থানে বহন এবং দ্বিতীয়, বৃক্ষের ভারবহন। সাধারণতঃ এই দুইটী কার্য্য একই মূলের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। Tecoma radicans নামক বৃক্ষ ও আরও দুএকটী বৃক্ষে দুইটী প্রক্রিয়ার নিমিত্ত দুইপ্রকার মূল দেখা যায়। প্রথম কার্য্যের জন্য মূলগুলি ভূমিমধ্যে থাকে, দ্বিতীয় কার্য্যের জন্য মূল গুলি মাটীর উপরে কেবল মাত্র লতাকে ধারণ করিয়া থাকে। এই ভূমধ্যস্থিত মূলের উপরিভাগটী কাটিয়া দিলে সেই অংশটী আর বাঁচিতে পারে না।

কতকগুলি ওষধি বৃক্ষের মূলের দ্বারা আর একটী কার্য্য হইয়া থাকে। যে সকল বৃক্ষ প্রথম বৎসরে কেবল মাত্র খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং পর বৎসরে ফলিত হয়, সেই সকল বৃক্ষের মূল গুলি, বৃক্ষের দ্বিতীয় বৎসরের জন্য আহার শোষণ করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখে। এই সকল খাদ্য পাছে বাহিরের উত্তাপে বা শীতাধিক্যে নষ্ট হইয়া যায় এই জন্য সেই মূল গুলির উপর কাণ্ডেরও খানিকটা অংশ সঞ্চয়ের আধার রূপে পরিণত হইয়া মাটীর অনেকটা নীচে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কলা গাছের "এঁটে" ইহার দৃষ্টান্তস্থল। মূলের কার্য্য করিবার ক্ষমতার বিভিন্নতা হেতু, মাটীর স্তরের বিভিন্নতা হেতু, এবং শীতোষ্ণতার বিভিন্নতা জন্য মূল নানা প্রকার আকার ধারণ করে। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে এই সকল আকার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ মূল যে আধারের মধ্যে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় তদনুসারে তাহার শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। তাহা চারি প্রকার—ভূমিজ, জলজ, বায়ুজ ও পরগাছজ। প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ পুষ্পিত বৃক্ষের মূল ভূমিজ। এই সকল মূলের প্রান্তভাগ একটী আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। এই আবরণের নীচেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ দেখা যায়। এই সকল মূল প্রায়ই বৃক্ষের প্রধান মূল ও তাহার শাখা প্রশাখা থাকে। এই মূলের ক্ষুদ্র কেশ গুলিই শোষণ কার্য্যে প্রধান সহায়।

জলজ মূল গুলি প্রায়ই ভাসমান উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হয়, এই সকল উদ্ভিদে প্রধান মূল থাকে না,

তাহার পরিবর্ত্তে অনেকগুলি শাখা বাহির হইয়া একটী গুচ্ছ বাঁধিয়া যায়। পুকুরের পানার মূল দেখিলেই এই বিষয় বেশ ধারণা হইবে। এই সকল মূল গুলি প্রায় পরস্পরের সহিত জড়াইয়া থাকে। এই মূলের প্রান্তভাগ কোন আবরণে আচ্ছাদিত থাকে না। ইহা জলের দ্বারাই বেষ্টিত হইয়া থাকে। যদ্যপি জল কমিয়া যায় এবং এই পানা গুলি কর্দ্দমের সহিত পৃষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলেও এই মূল কর্দ্দমের ভিতর প্রবেশ করে না, উপরে পড়িয়া থাকে। কতক গুলি গাছ জলে ভাসে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রধান মূল কর্দ্দমের মধ্যে প্রোথিত হইয়া থাকে। কল্মীশাক প্রভৃতির মূল এই জাতীয়। প্রধান মূল ব্যতীত কতক গুলি বিক্ষিপ্ত মূল ভাসমান কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়, এবং সে গুলি ভাসার কার্য্যে সহায়তা করে। কল্মীদলকে উপড়াইয়া দিলেও যদি জলের মধ্যে রাখা যায় তাহা হইলে তাহা বিনষ্ট হয় না। প্রধান মূল মরিয়া গেলে পর লতাটী জলের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং অবশেষে যখন কর্দ্দমের সহিত সংলিপ্ত হয় তখন বিক্ষিপ্ত মূল গুলি কর্দ্দমে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধান মূলের কার্য্য করে; তখন আবার এই কল্মীর পর্য্যাপ্তভাবে বৃদ্ধি হইতে থাকে। কখনও কখনও ভূমিজ মূল, জলজ মূলে পরিণত হইয়া থাকে। Willow, Elm জাতীয় বৃক্ষ জলের ধারে জন্মাইলে দেখা যায় যে জলের মধ্যে পর্য্যাপ্ত মূল ভাসিতেছে। কখনও কখনও এই সকল বৃক্ষ নদীর দুর্ব্বল স্রোতের উপর পর্য্যাপ্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং নদীর স্রোত বন্ধ করিয়া দিতে পারে। আমাদের দেশে বাঁকড়া বা উলুগড় ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

বায়ুজ মূল উর্দ্ধোত্থিত কাণ্ডের চতুর্দ্দিক হইতে নির্গত হইয়া থাকে। অর্কিড জাতীয় বৃক্ষে এই মূল পর্য্যাপ্তভাবে দেখা যায়। যে কোন পদার্থের উপর এই অর্কিড বৃক্ষ জন্মায় তাহার চতুষ্পার্শ্ব এই মূল জালে আবৃত হইয়া যায়। কোন কোন অর্কিড জাতিতে এই মূল দুই চারিটা করিয়া ঝুলিতে থাকে। ইহারা পত্রের পার্শ্বে বা কাণ্ডের ইতঃস্ততঃ উৎপন্ন হয়। এই সকল মূল বায়ু হইতে বাষ্পকে জলে পরিণত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন। এই বায়ু ও জল হইতেই ইহারা খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কখনও কখনও এই সকল মূলে কেশরাজ বর্দ্ধিত হাওয়ায় ইহাকে মখমলের ন্যায় দেখায়। আর এক প্রকার বায়ুজ মূল আছে যদিও তাহারা বায়ুর অভ্যন্তর দিয়া বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া আইসে কিন্তু তাহারা উপরোক্ত মূলের ন্যায় বাষ্পকে জলে পরিণত করিতে সমর্থ নয়, এই জন্য তাহাদের ভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হইতে হয়। যে সকল লতাবৃক্ষের নিম্নদেশ মরিয়া গিয়া ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় সেই সকল লতার এই প্রকার মূল প্রধান মূলের কার্য্য করে। তখন আর তাহাকে বায়ুজ না বলিয়া ভূমিজ বলা যাইতে পারে। অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষের ঝুরিও এই শ্রেণীর মূল। বাস্তবিক বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে গেলে, এই বিভাগ বেশ স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া বোধ হয়; কারণ সকল প্রকার বায়ুজ মূলই মৃত্তিকার সংস্পর্শে ভূমিজ হইয়া পড়ে।

পরগাছা বৃক্ষের মূল ক্রমশঃ যে বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই বৃক্ষের আভ্যন্তরিক শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী হরণ করিয়া লয়। আমাদের দেশে আমগাছে যে সকল পরগাছা দেখা যায় তাহা দেখিতে অনেকটা আমডালের ন্যায়। তাহার মূল আম্র শাখায় প্রবিষ্ট হইয়া একটা গাঁট তৈয়ারী করে। এই জাতীয় পরগাছার পত্র ও ফুল দেখা যায়। কানচটা বলিয়া আর একরূপ পরগাছা আমগাছে দেখা যায়, তাহা বৃক্ষের আকারবিহীন সেওলার ন্যায় গাছের ছালে লাগিয়া থাকে। ইহাও এক জাতীয় পুষ্পহীন পরগাছা।

যে সকল মূলের কার্য্য কাণ্ড-ধারণ তাহা দুই প্রকার, প্রথম—ভার বহন, দ্বিতীয়—লতা-বিশেষকে উপরে উঠিবার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করণ। আটকাইবার জন্য যে সকল মূল কাণ্ডের পার্শ্বদেশ হইতে নির্গত হয় তাহা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া এরূপ ভাবে অন্য কোন পদার্থকে কামড়াইয়া থাকে যে লতাটীকে টানিয়া ছিঁড়িতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। পিপুললতা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কল্মী তার ভাসমান মূলগুলরও জলের উপর কামড়াইয়া ধরিবার ক্ষমতা আছে। এইজন্য নাম জন্য বাতাসে তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। এই সকল ক্ষুদ্র মূলের শাখা

প্রশাখা মাটী বা আধার পদার্থ এরূপ ভাবে কামড়াইয়া ধরে যে কতকটা খাদ্যে মৃত্তিকা বরং উঠিয়া আসিবে কিন্তু মূল ছিন্ন হইবে না।

ভার-বহ মূল কাণ্ডকে খাড়া হইয়া থাকিবার ক্ষমতা দেয়। এই সকল মূল কাণ্ড হইতে ক্রমশ নিম্ন দেশে বৃদ্ধি পায় এবং পরের কাণ্ডের ন্যায় নিম্নে তাহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া থাকে আমরা সাধারণতঃ তাহার শাখা প্রশাখা অনেক দেখিতে পাই না কিন্তু সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে, যে, একটী আমগাছের উপর ডালপালা গুলি যতটা পরিমাণ বায়ুমণ্ডল বেষ্টন করিয়া থাকে নিম্নে তাহার মূলও ঠিক ততটা পরিমাণ মাটী বেষ্টন করিয়া আছে। এই সকল মূলের প্রথম শাখা প্রশাখা গুলি অত্যন্ত কঠিন ও মাটীর উপরেও বাহির হইয়া থাকে। কৃষ্ণচূড়া বা অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল দেখিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। এই সকল বহিরাগত মূলের দ্বারা বৃক্ষের কোটর প্রস্তুত হয়।

বটবৃক্ষে এবং কখনও কখনও অশ্বত্থ বৃক্ষের ডাল হইতে যে ঝুরি নামে তাহা ভারবহনের কার্য্য করিয়া থাকে। এই বৃক্ষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া মোটা মোটা ডাল উৎপন্ন করে। সেই সকল শাখার ভার না বহন করিলে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে এই জন্য তাহার বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে ঝুরি নামিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া থাকে। ক্রমে এই মূল আহার্য্য শোষণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং কালে ইহাকে একটী নূতন গুড়ি বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভারবহনের এবং পর্য্যাপ্ত আহার পাইবার উপায় আছে বলিয়া বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং সুবৃহৎ হইয়া পড়ে। শুনা যায় যে পাঁচ সহস্র সেনা এক সময় একমাত্র বটবৃক্ষের তলে আশ্রয় পাইয়াছিল! সিংহলে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে শত শত ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে! একটী বট বৃক্ষে তিনশত বড় বড় গুঁড়ি এবং তিন সহস্র ক্ষুদ্র গুঁড়ি গণনা করা হইয়াছে!

বৃক্ষের বয়সের পরিবর্ত্তনের সহিত মূলের আকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যে সকল বৃক্ষ এক বৎসরের হইয়া থাকে তাহাদের মূল বিশেষ লম্বা হয় না ও আহার সঞ্চয় করে না। এইজন্য ধান বা আঁকের মূল অনেক ক্ষুদ্র ও বহুধা বিভক্ত। ইহারা কেবল এক বৎসর কালের জন্য খাদ্য শোষণ ও কাণ্ডের ভার-বহন কার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত। ওল, মানকচু প্রথম বৎসরে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয় তৃতীয় বৎসরে ফল ও পুষ্পে শোভিত হয়, এই নিমিত্ত প্রথম বৎসরে এই গাছের মূল, বৃদ্ধির জন্য পর্য্যাপ্ত আহার্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই জন্য প্রথম বৎসরের বৃক্ষ সরল ও শাঁসযুক্ত, দ্বিতীয় বৎসরে তাহার আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন হেতু কঠিন ও ছিবড়া যুক্ত। এইজন্য মূলার ফুল হইয়া গেলে আমরা আর তাহা ব্যবহার করিনা। তাহাকে সাধারণতঃ "শিকড়ে" বলা যায়।

আহার্য্য শোষণ ও কাণ্ডের ভারবহন ব্যতীত মূল বৃক্ষের জন্য আরও অনেক কার্য্য করে। লতানে বা গড়ানে লতার ডাঁটা হইতে যে মূল নির্গত হইয়া থাকে তাহা কখনও কখনও ডাঁটাকে জোর করিয়া একদিকে টানিয়া লইয়া থাকে। Strawberry লতা হইতে যে মাঝে মাঝে মূল নির্গত হয় তাহা ডাঁটাকে প্রায় ⅙ ইঞ্চি পরিমাণ টানিয়া লইতে পারে। এই টানিয়া লইবার কারণ এই সকল মূলের আভ্যন্তরিক কোষ সমূদয়ের জল শুষ্ক হইয়া গেলে কোষগুলি কুঞ্চিত হইয়া যায়। তাহাতেই মূলের পরিমাণ একটু ক্ষুদ্র হইয়া আইসে এবং কাণ্ডে টান পড়ে।

মূলের সাহায্যে অনেক সময় বৃক্ষ স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। টগর বা গোলাপ প্রভৃতি বৃক্ষকে স্থানান্তরিত করিতে হইলে তাহার বীজ সংগ্রহ ব্যতীত ডালের খানিকটা অংশ কাটিয়া লইয়া ভিজা মাটিতে পুতিয়া দেওয়া হয় এবং ক্রমে কর্ত্তিত ডাঁটার অগ্রভাগ হইতে দুএকটী বিক্ষিপ্ত মূল জন্মগ্রহণ করিয়া শোষণ কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে এই মূল প্রধান মূলে পর্য্যবসিত হইয়া কাণ্ডের আধার স্বরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ নূতন বৃক্ষোৎপত্তিকে সচরাচর ডাল-কলম বাঁধা বলে।

সাধারণতঃ মূলের একটী আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখা যায়। এই ক্ষমতা দেখিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন বলিয়াছেন যে মূলের অগ্রভাগটীকে

পারে। কারণ তাহারা হিসাব করিয়া ক্রমশঃ জলের দিকে বর্দ্ধিত হইতে সক্ষম হয়। মূলের অগ্রভাগ গুলি মাটীর নিম্নে খাড়া নামিয়া না গিয়া চক্রাকারে নামিতে থাকে ইহাতে মূলস্থিত কেশগুলি মাটির অনেক অংশের সহিত স্পৃষ্ট হইতে পারে এবং তাহাতে শোষণ কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়। যে দিকে জলের বর্ত্তমানতার সম্ভাবনা, মূলের অগ্রভাগ গুলি সেই দিকেই ধাবিত হয়। মাঝে কোন প্রস্তর বা ইট পড়িলে তাহার সহিত সংগ্রাম না করিয়া তাহার পার্শ্বদেশ দিয়া ঘুরিয়া চলিয়া যায়। এই কারণে মূলের সাধারণতঃ অনেক আঁক বাঁক দেখা যায় পার্ব্বত্যদেশে মূলের খিলান পর্য্যন্ত দেখা গিয়া থাকে।

মূলের নিম্নদিকে পরিক্রমণ, উদ্ভিদ জীবনের একটী আশ্চর্য্য ঘটনা। ইহার প্রধান কারণ মাটির নিম্নেই অধিক জল পাওয়া যায় বলিয়া। মূল প্রধানতঃ প্রান্তদেশস্থ কোষসমূহের বিভাগের দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, জলের সংস্পর্শে এই সকল বিভাগের বিকাশ বিশেষ স্ফূর্ত্তি পায়। এই নিমিত্ত অধিক জলের দিকেই মূল অগ্রসর হয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণও অনেকটা মূলকে নিম্নদিকে টানিয়া লইয়া যায়। মূলকেশ গুলিও নিম্নদিকে বর্দ্ধিত ও সংলগ্ন থাকায় মূলগুলিকে উপর দিকে বাড়িতে দেয় না এইজন্য তাহা ক্রম ই নিম্নদিকে নামিতে থাকে।

এক্ষণে আলোচনা করা যাউক উদ্ভিদ্ জাতি কি করিয়া মূলদ্বারা খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। সকলেই অবগত আছেন যে উদ্ভিদ্ জাতির খাদ্য বায়ু ও মাটী হইতে লব্ধ। যে সকল খাদ্য সামগ্রী মাটী হইতে লব্ধ তাহাই মূলদ্বারা গৃহীত হয়। মূল সেই সকল খাদ্যদ্রব্য শোষণ করিয়া বৃক্ষের নানা স্থানে প্রেরণ করে অথবা ভবিষ্যতের জন্য নানা স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখে। উদ্ভিদের খাদ্যের এই বিশেষত্ব, যে তাহারা এক একটী অযৌগিক পদার্থ গ্রহণ করিয়া শরীরে নানা অঙ্গের মধ্যে তাহাকে যৌগিকে পরিণত করিয়া লইতে পারে। যেমন বৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গদ্বারা অঙ্গার, উদজান ও অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করিয়া শরীরের মধ্যে চিনি উৎপন্ন করিয়া লয় কিন্তু যদ্যপি উদ্ভিদের মূলে চিনি মিশ্রিত জল সেক করা যায় তাহারা চিনি বাদ দিয়া কেবল মাত্র জল টুকু শোষণ করিয়া লয়। কেবল ইহাই নয়, উদ্ভিদের মূলের আর একটী আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, তাহা এই যে, প্রত্যেক মূল সেই বৃক্ষের উপযোগী আহার গ্রহণ করিতে সক্ষম। যে বৃক্ষে একটী বিশেষ পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন সেই বৃক্ষের মূলও সেই পদার্থটী শোষণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা কুশল, এবং যে স্থানে সেই পাদার্থ পাওয়া যায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া অন্যান্য পদার্থের মধ্যদিয়া উহা সেই পদার্থের নিকট গিয়া উপস্থিত হইবে। মূলের এই ক্ষমতাকে বাছিয়া লইবার ক্ষমতা কহে (Selecting power)। এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গাছের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সার নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সার সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা 'কমলায়' অনেক হইয়াছে। অতএব সে বিষয়ে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

আমরা এইবার মূলের খাদ্য শোষণ প্রণালী বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে যে মূল-কেশের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে তাহারাই এই শোষণ কার্য্যের প্রধান অঙ্গ। প্রথমতঃ এই সকল কেশ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল মাটীর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যতটা সম্ভব ততটা মাটীর সহিত সংলিপ্ত হইয়া যায়। অনন্তর তাহাদের গা হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়। সেই রসের উৎপত্তি কোথায় ও তাহা কি পদার্থ তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। এই রস কখনও জলীয় আকার হয় কখনও বা বাষ্পীয় আকার হইয়া থাকে। ইহা কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সময়েই নির্গত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা মাটীর মধ্যস্থিত ধাতুপদার্থ-গুলি জলে গুলিয়া যায় ও শোষণ-ক্রিয়ার বিশেষ সুবিধা হয়। অনেকে এই রসের সহিত প্রাণীর পাকস্থলী হইতে নির্গত রসের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, কারণ উভয়ের কার্য্য একই প্রকার। যে সকল পদার্থ এই রস দ্বারা দ্রবীভূত হয় না তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বৃক্ষের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় মূলও নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে। অন্যান্য জীবের ন্যায় দ্ব্যম্লজান অঙ্গার (CO_2) প্রশ্বাসে নির্গত হইয়া থাকে। মূল হইতেও এই পদার্থ নির্গত হয় এবং

ভূমধ্যস্থিত জলের সহিত মিশিয়া কার্ব্বনিক এসিড প্রস্তুত হয়। এই এসিডের দ্বারা মাটীর মধ্যস্থ সাবধান ও অন্যান্য কঠিন পদার্থ সকল দ্রবীভূত হইয়া যায় ও বৃক্ষের দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

অতঃপর এই ধাতুজ-পদার্থ সম্মিশ্রিত জল কি করিয়া মূলের আভ্যন্তরিক কোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে তাহা দেখা যাউক। ইহা নৈসর্গিক নিয়ম অন্তর্বাহ প্রণালীর (osmosis) উপর স্থাপিত। যদ্যপি জল এবং মদের ন্যায় দুইটী বিভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট পদার্থ গ্রহণ করিয়া একখানি চামড়ার পরদার দ্বারা ব্যবধান করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, যে পদার্থটীর আপেক্ষিক গুরুত্ব অন্যাপেক্ষা অল্প তাহা পরদার মধ্যদিয়া অন্যটীর সহিত বিশেষ করিয়া মিলিত হইবে। অর্থাৎ অধিক পরিমাণ জল পরদা ভেদকরিয়া মদের সহিত সংমিশ্রিত হইবে এবং অল্প পরিমাণ মদও জলের সহিত মিশিয়া যাইবে। এই নিয়ম ঠিক এই ভাবে উদ্ভিদ্ কোষেও প্রচলিত।

মূলে প্রত্যেক কোষের আবরণ উপরিলিখিত পরদার কাজ করিয়া থাকে। কোষ মধ্যে প্রটোপ্লাজম Protoplasm) দ্বারা প্রস্তুত চিনি ষ্টার্চ প্রভৃতি অন্যান্য ঘন পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহিরের ধাতু মিশ্রিত জল অপেক্ষা অধিক, এই নিমিত্ত বহিরেকার জল কোষচর্ম্ম ভেদ করিয়া কোষমধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে ভূমির রস কোষের মধ্যদিয়া বৃক্ষের নানা বর্দ্ধিষ্ণু প্রদেশে প্রবাহিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের রস গ্রহণ ও উর্দ্ধে প্রেরণ যদ্যপিও এইরূপ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে সমাহিত হয় তথাপি কোষের মধ্যস্থিত সজীব প্রথম প্রাণ এই কার্য্যে কিঞ্চিৎ হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। যেমন জল একটী কোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় অমনি কোষটী ফুলিয়া উঠে। এই ফোলার জন্য সজীব প্রটোপ্লাসম্ একটু উত্তেজিত হইয়া কোঁকড়াইয়া যায়। এই বিষয়ে ইহার সহিত উচ্চপ্রাণীর মাংসপেশীর কুঞ্চনের সহিত সাদৃশ্য আছে। প্রোটোপ্লাসমের এই কুঞ্চনহেতু তাহার অভ্যন্তরিস্থিত জল নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া সাধারণ জল স্রোতের সহিত সম্মিলিত হয়।

প্রটোপ্লাসমের এই কুঞ্চন ও বিস্ফারণ একই সময়ের ব্যবধানে সমাহিত হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারা উর্দ্ধোগত জলস্রোত একটা ঠেলা পাইয়া থাকে। ইহাকে মূলচাপ (Root pressure) কহে। বসন্তের প্রারম্ভে যদ্যপি একটা দ্রাক্ষার ডাল কাটা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে কর্ত্তিত স্থান হইতে প্রভূত পরিমাণে রস নির্গত হইতেছে। এই রস নির্গমণ মূল-চাপের ফল। কেবল দ্রাক্ষা কেন, অন্যান্য অনেক বৃক্ষে এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক গুল্মে এই মূলচাপ, কাণ্ড না কর্ত্তন করিয়াও দেখা যায়। অনেক প্রকার ঘাস জাতীয় গুল্মে প্রাতঃকালে পাতার প্রান্ত হইতে দুচারি ফোঁটা জলের বহির্নিক্রমণ চাপাধিক্যের ফল। এই চাপ কিরূপ জোরে জলকে উর্দ্ধে প্রেরিত করিতে সমর্থ তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে, এবং সংক্ষেপে ধারণা করাইবার জন্য ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, একটা মাঝারি আকারের সেওড়া বৃক্ষের মূল ইহার কাণ্ডের ন্যায় মোটা একটি নলের মধ্যস্থিত জলকে ষোল হাত উর্দ্ধে প্রেরণ করিতে সক্ষম।

মূলচাপ বৎসরের সকল সময়েই দেখা যায় না। কিন্তু তথাচ রস শোষণ কার্য্যের বিরাম নাই। জ্যৈষ্ঠের সময় একটা দ্রাক্ষা ডাল কাটিলে তাহা হইতে আর রস বাহির হয় না। ইহার কারণ গরমে অত্যধিক রস শুষ্ক হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যায় বলিয়া। বসন্তের প্রারম্ভে রস বাষ্পাকারে পরিণত হয় বটে, কিন্তু গাছের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রস সঞ্চিত থাকে, সেই গুলির সংযোগের জন্য জলস্রোতের বিরাম থাকে না। যদ্যপিও এই মূল-চাপের পরিমাণ অনেক, কিন্তু ইহার সকল সময় সমান তেজ থাকে না। প্রদোষে ইহার তেজ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প থাকে এবং ক্রমশই ইহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। মধ্যাহ্ন কাল ও তাহার কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত ইহা বাড়িতে থাকে তারপর কমিতে আরম্ভ হয়। সন্ধ্যার সময় আর একটু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে কিন্তু রাত্রে ক্রমশঃ পতন হয়। এই হ্রাসের কারণ আজ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। অনেকে মনে করেন বৃক্ষের চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থের কোন পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ, কিন্তু ইহাকে বৃক্ষের অন্তর্দ্দৈহিক কোন বিশেষত্ব বলিয়া মনে হয়।

মূলের উপকারিতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। বৃক্ষের খাদ্য নির্ব্বাচন ক্ষমতার উল্লেখ করা গিয়াছে, এই ক্ষমতার দ্বারা বৃক্ষ বিশেষ বিশেষ পদার্থ গ্রহণে সক্ষম হয়। এই সকল পদার্থ কোষের মধ্যে নীত হয়, তথায় সজীব প্রটোপ্লাজমের প্রভাবে সেই সকল পদার্থ পরস্পরে মিলিত হইয়া নানারূপ যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। এই সকল যৌগিক পদার্থ উপাদানের বিভিন্নতা হেতু বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। এই সকল যৌগিক পদার্থ হয় দানার আকারে নতুবা জলীয় আকারে মূল-কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। কখনও কখনও দেখা যায় যে উদ্ভিদ্ যে সকল নূতন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে তাহা উদ্ভিদের কোন কাজেই আসে না, তাহা কেবল অন্যান্য প্রাণীর উপকারের নিমিত্তই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই সকল দানার স্বাদ কখনও তিক্ত, কষায়, বা কটু; এই নিমিত্ত মূল চর্ব্বণ করিলে এইরূপ বিভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। কোনরূপ তিক্তাদি ঔষধ প্রস্তুতের প্রয়োজন হইলে এই মূলকে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে অন্তর্নিহিত এই দানাদার বা জলীয় যৌগিক পদার্থগুলি নিষ্কাষিত হইয়া হইয়া আসে এবং তাহাতে অন্য প্রাণীশরীরের অনেক উপাকার সাধিত হইতে পারে। আমাদের দেশে অনেকাংশ কবিরাজি ঔষধ মূলের পাচন মাত্র। বেলেডোনা, একোনাইট্ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় এলোপাথি ঔষধও মূল হইতে পাচন করিয়া সংগ্রহ করা হয় এবং তাহা হইতে অন্যান্য ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। শালগাম বা বিটপালমের 'গোড়া', গুল্মের বৃদ্ধিও পুষ্টির নিমিত্ত অনেক পরিমাণে চিনি প্রস্তুত করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখে। তাহা হইতে আমরা অনায়াসেই চিনি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই। এইরূপ এরারুট মূল হইতে ষ্টার্চ বা এরারুট সংগ্রহ হইয়া থাকে। পালম, ডেঙ্গো বা নোটে শাকের মূলের মিষ্টতার অল্পাধিক্যের কারণ তন্মধ্যে সঞ্চিত চিনির অল্পাধিক্য। অতএব যে সকল সামান্য পদার্থ হইতে চিনি উৎপন্ন হয় সেই সকল পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা সার এই সকল গাছের তলায় দিলে ইহার মিষ্টতার বৃদ্ধি পাইবে।

দেখা গেল যে উদ্ভিদ জাতর মূল কিরূপ বিভিন্ন উপায়ে ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সমস্ত উদ্ভিদ্ জীবনের ও সমস্ত প্রাণী জীবনের কত উপকার সংসাধিত করিতেছে। প্রাণীদিগের উপকার দুই প্রকারে সমাধিত হয়। প্রথম, খাদ্যাদি দ্রব্য হাতাহাতি প্রাপ্তি; দ্বিতীয়তঃ প্রাণী শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সকল যৌগিক পদার্থের প্রয়োজন তাহার পূর্ব্ব হইতে সৃষ্টিও সঞ্চয়।

শ্রীবিরিঞ্চিমোহন কর।

কৃষি ও কৃষক।

কৃষিকার্য্য বড়ই লাভজনক, একথা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কত কষ্টে, কত পরিশ্রমে যে কৃষিকার্য্যে লাভ করিতে পারা যায় তাহা কৃষক ব্যতীত কেহই অবগত নহে। কৃষিকার্য্যে রীতিমত লাভ করিতে হইলে প্রকৃত কৃষক হইতে হইবে। রৌদ্র, শিশির, বর্ষার জল, মাঠের কাদা প্রভৃতিকে ভয় করিলে প্রকৃত কৃষক কখনই হইতে পারা যায় না। আর প্রকৃত কৃষক না হইলে কৃষিকার্য্যে লাভবান হইতে আশা করা ঘোরতর বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিজের চক্ষে না দেখিলে বাণিজ্য ব্যবসায়ের কার্য্য চলিতে পারে, শিল্প কার্য্য সম্পন্ন হওয়াও বড় অসম্ভব নহে, কিন্তু কৃষিকার্য্যের প্রত্যেক অঙ্গ অর্থাৎ জমিতে চাষ দেওয়া হইতে শস্য কর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহে লইয়া আসা পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যক্ষ না করিলে চলিবে না। এই নিমিত্ত একটা চলতি কথা আছে—

"আপনার চক্ষে সুবর্ণ ফলে বেটার পক্ষে রূপো,
আর যত দেখ সব গাপা আর গুপো।"

অর্থাৎ কৃষিকার্য্য যদি আপনার চক্ষের উপর সম্পন্ন হয় তবে, তাহা হইতে সুবর্ণ উৎপত্তি হইতে পারে, কৃষিকার্য্যের ভার পুত্রের প্রতি অর্পণ করিলে তাহাতে ততটা প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু অপরের হস্তে অর্থাৎ কর্ম্মচারীর হস্তে কৃষিকার্য্যের ভার অর্পণ করিলে তাহাতে "গাপা আর গুপো" প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ কোন ফলই পাওয়া যায় না।

কৃষিকার্য্য অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয় লোকে বলে "লাভ লোকসান জেনে চাষ করেনা সোণার বেণে।"

আমি পূর্ব্বে প্রবন্ধেই বলিয়াছি যে বিনা-পরিশ্রমে এক পয়সাও উপার্জ্জন করিতে পারা যায় না। সুতরাং যে কোন কার্য্যই হউক যেরূপ পরিশ্রম করা যায় তাহার ফল তদনুরূপ হইয়া থাকে। মান্দ্রাজে গিয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়াই আইস, আর বিলাতী বিদ্যালয়ে বোটানি শিক্ষা সমাপ্তির পর বৃহৎ উপাধির দ্বারা ভূষিত হইয়া [illegible] উচ্চ বেতনের "গোলামি" ভিন্ন বিনা পরিশ্রমে, অধিক উপার্জ্জন কিছুতেই সম্পন্ন হইবে না। কৃষি কার্য্যে প্রচুর উপার্জ্জন করিতে গেলে শরীরটীকে এরূপ করা চাই যে তাহা প্রচুর ঠাণ্ডা লাগিলে বা সমস্তদিন রৌদ্রে রাখিলেও একটুও খারাপ হবেনা, মাটির সঙ্গে মাটি করিতে হইবে কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-কার্য্যের উপযোগী শরীরও প্রস্তুত করিতে হইবে। যেরূপ কোন ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে জমি প্রস্তুত করিতে হয়, উপযুক্ত ফসলের উপযোগী সার দিতে হয়, সেইরূপ যে স্থানে গিয়া চাষ করিতে হইবে সেই স্থানের জলবায়ুতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ ঘটিতে না পারে এরূপ ভাবে শরীর প্রস্তুত করিতে না পারিলে চাষ করিতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা।

যে ব্যক্তি রাত্রিদিন জুতা, ষ্টকিং কোট প্রভৃতি আঁটিয়া থাকেন একটু মাত্র ঠাণ্ডা বাতাসে খালি-গায়ে থাকিলে অসুস্থ হইয়া পড়েন যদি তিনি চাষ করিতে যান তবে, তাহার উপার্জ্জনের পরিবর্ত্তে প্রাণ লইয়াই টানাটানি পড়িয়া যায়। এই নিমিত্ত একথা বলিলে বোধহয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় না যে, বাল্যকাল হইতে রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ব্যতীত কৃষিকার্য্যে লাভ করা বা উপযুক্ত কৃষক কখনই হইতে পারা যায় না। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা আত্মসংযম বা selfcontrol শিক্ষারই নামান্তর মাত্র। প্রকৃতির বিকৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক, অর্থাৎ সার প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বিধান করিতে না পারিলে যেরূপ চাষ করিতে পারা যায় না, সেইরূপ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে শরীরকে বিজয়ী করিতে না পারিলে কৃষিকার্য্য করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। বক্তৃতায় অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, বুদ্ধি কৌশলে সাধিত হয় না জগতে হয়ত এমন কার্য্যই নাই, কিন্তু নিজের শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োগ ব্যতীত কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতেই পারে না 'জন. জামাই, ভাগ্না তিন নয় আপনা।" অর্থাৎ জন কখনই আপনার ন্যায় কার্য্য করিবে না একথা মনে রাখিয়া লোকজনের সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিতে হয়। আপনি ষোল আনা পরিশ্রম করিলে তবে লোক জনের নিকট হইতে চৌদ্দ আনা কার্য্য আদায় করিতে পারা যায়, এ কথা যিনি না জানিয়া

যাইবেন তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইতে হইবে।

"লক্ষ টাকা উপার্জ্জন" প্রবন্ধেই বলিয়াছি কাহারও অনুষ্ঠিত কার্য্যফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইতে গেলে ঠকিতে হয়, কৃষি কার্য্যে সেই কথাটী সেরূপ খাটে, এমন আর কোন কার্য্যেই খাটেনা। কৃষিকার্য্য দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন এমন ব্যক্তি এদেশে অনেক আছেন, কিন্তু কত পরিশ্রম, কত কষ্ট করিয়া তাঁহাকে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে, যদি কেহ তাহা শুনিয়া এবং সেইরূপ পরিশ্রম ও কষ্টে অভ্যস্ত হইয়া কৃষিকার্য্যে অগ্রসর হন, তবে তিনিও প্রচুর লাভ করিতে পারিবেন, নতুবা অমুক পারিয়াছে আমি পারিবনা কেন, এরূপ মনে করিয়া যিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন তিনিই ঠকিবেন, পরন্তু তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক বল এবং অর্থ নষ্ট হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। অতএব কৃষিকার্য্যে লাভবান হইতে হইলে অগ্রে আপনাকে কার্য্যকুশল কৃষক হইতে হইবে।

এদেশে কৃষক হইবার পক্ষে সাধারণতঃ কয়টী অন্তরায় পরিদৃষ্ট হয়। ১ম। পূর্ব্বে এদেশে লোকে যেরূপ পরিশ্রমী ছিল, অর্থাৎ যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিত বিলাসিতা বৃদ্ধির সহিত তাহারা আর সেরূপ পরিশ্রম করিতে পারে না। এই নিমিত্ত আমাদের সমাজে অলসতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, লোকে চেয়ারে বসিয়া ১৪।১৫ ঘণ্টা অকাতরে কলম পিশিতে পারে, কিন্তু চারি মাইল পথ চলিতে গেলে তাহার চক্ষুঃস্থির হইয়া যায় অথবা ৩।৪ ঘণ্টা ব্যাপী কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হয়। অথচ ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে লোকে অবলীলা ক্রমে ৩০।৩২ মাইল পথ চলিতে পারিত এবং ১০।১২ ঘণ্টা কোন রূপ শারীরিক পরিশ্রমে ভয় করিত না।

২য়। এদেশে ক্রমেই আরামপ্রিয়তা বৃদ্ধি হইতেছে। চাকুরী প্রিয়তাই আরাম প্রিয়তার বিকাশ। এই গ্রীষ্মকালে আফিসে টানা পাথার নীচে সুখে হাওয়া খাইতে খাইতে কার্য্য করার কথা চিন্তা করিলে লোকে [illegible] দোকানদারের নিকট ছুটাছুটি [illegible] ? ব্যবসায় করিতে গেলে মাল ক্রয় বিক্রয়োপলক্ষে পরিশ্রম, গাহকের বাটীতে ছুটাছুটী প্রভৃতি পরিশ্রম জনিত ব্যাপার এবং পরিশেষে লাভ লোকসান আছে সুতরাং কে বল ইচ্ছা পূর্ব্বক ওরূপ কষ্টে প্রবৃত্ত হয়? এই সকল কারণেই এদেশ বাসীর চাকুরী প্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। লোকের বিনা পরিশ্রমে প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্তির অভিলাষ আরাম প্রিয়তার আতিশয্য ব্যতীত কিছুই নাই।

বলা বাহুল্য, আরাম প্রিয়তার অপর নাম অলসতা। এই সর্ব্বনাশকারী অলসতার প্রাবল্যে আমাদিগের মধ্যে পরিশ্রমীর আদর নাই। এমন কি অনেকে অত্যন্ত অধিক দরিদ্র পরিশ্রমীকে পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ট জীব বলিয়া বিবেচনা করেন না। পরন্তু প্রতারণা প্রভৃতির সাহায্যে বিনা পরিশ্রমে যাহারা প্রচুর সম্পত্তি লাভে সক্ষম হন তাঁহারাই বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

৩য়। এদেশের লোকে অত্যন্ত অধিক কল্পনা প্রিয় এবং আত্ম বুদ্ধি প্রধান বা selfsufficient. এদেশের লোকে ঘরে বসিয়া কল্পনা করিতে যেরূপ দক্ষ, কার্য্যক্ষেত্রে সেরূপ দক্ষতা কিছু মাত্র প্রকাশিত হয় না। নিজে করিবনা, লোককে পরামর্শ দিয়া কার্য্যে নাবাইয়া দিব, আর সেই সঙ্গে নিজেও কিছু লাভ করিব, বোধ হয় এদেশের অধিকাংশ লোকে অন্ততঃ যাহারা শিক্ষিতাভিমানী তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এরূপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আর আমি যাহা বুঝি, অপরে তাহা কোনরূপেই বুঝিতে সক্ষম নহে এইরূপ বিবেচনা করেন না বোধ হয় এরূপ ব্যক্তি সমাজে আছেন কি না সন্দেহ। বলা বাহুল্য ইহা চিত্তদৌর্ব্বল্যের অথবা নির্ব্বুদ্ধিতা একটা প্রধান লক্ষণ। আমাদের দেশে একটা যে প্রবাদ ছিল "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ" এই আত্মবুদ্ধিপ্রধান্য দোষেই তাহা ক্রমে লোপ পাইতেছে, এবং এই কারণ আমাদের মধ্যে আর ৫ জনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া কোন একটা কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

কৃষক হইতে গেলে উল্লিখিত তিনটি দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীতমত পরিশ্রম আরাম প্রিয়তা বা বিলাসিতা একেবারে পরিত্যাগ এবং মাৎসর্য্য বিহীন হইতে হইবে। লোকজনের সহিত পরামর্শ না করিয়া কৃষি কার্য্য করিতে গেলে লাভবান

হওয়া দূরের কথা অবাধ্য লোকজনের দ্বারা বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব চাষ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ অগ্রে জমিকে কর্ষণাদির দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অগ্রে আপনাকে উপযুক্ত কৃষক করিতে হইবে।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

মহুয়া।

বেহার অঞ্চলে একটী বিশেষ উপকারী বৃক্ষ দেখা যায় তাহাকে বেহার বাসীরা মহুয়া বা মাওয়া কহে। সংস্কৃত ভাষায় এই বৃক্ষকে মধুক বা মধুদ্রুম কহে। এই বৃক্ষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাড়িলে আমাদের দেশের আমগাছের ন্যায় দেখায়। মাথাটা ঝোপের ন্যায়। পাতা গুলি ডিম্বাকৃতি, ডগাটী একটু ছুচাল। এই বৃক্ষের মূল গুলি গুঁড়ি হইতে খাড়া নীচু দিকে নামিয়া যায় কিন্তু বেশী মাটীর মধ্যে প্রবেশ করেনা। গাছের গুঁড়ি অনেক মোটা হয় বটে কিন্তু বেশী লম্বা হয় না, প্রায়ই ৫ ৬ হাতের পরেই ঝোপের ন্যায় ডাল পালা নির্গত হইয়া থাকে। গাছের ছাল যথেষ্ট কঠিন এবং একটু লাল আভা বিশিষ্ট। গাছে একটা চোপ বসাইলে ছাল হইতে গঁদের ন্যায় আটা নির্গত হইয়া থাকে। ফুল গুলির আকার অতি সুন্দর কিন্তু অন্যান্য বৃক্ষের ফুলের ন্যায় নহে, দেখিতে কাঁচা জাম ফলের ন্যায়; এই নিমিত্ত হটাৎ দেখিলে ফুলকে ফল বলিয়া ভ্রম হয়। ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভেই বৃক্ষ হইতে সমস্ত পাতা ঝরিয়া যায়। এবং চৈত্রের প্রারম্ভেই প্রত্যেক ছোট ছোট ডাল হইতে ৪০।৫০টী করিয়া পাতা নির্গত হইয়া ঝোপ করিয়া ফেলে এবং তাহা হইতে পুষ্পোদ্গম হয়। ফুলগুলি পুষ্ট হইবার পরই, বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া যাইতে আরম্ভ করে। প্রাই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব যাহা ঝরিবার সমস্ত ঝরিয়া যায় এবং তাহার পর সে গুলিকে জড় করিয়া কিছু দিনের জন্য রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। এই শুষ্ক ফুল গুলি গন্ধে ও আস্বাদনে অনেকটা আঙ্গুর ফলের ন্যায়।

ফুলগুলি থোকা থোকা ভাবে ছোট ছোট বোঁটা হইতে ফুটিয়া থাকে। বোঁটাগুলি প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা হয় এবং মাটীর দিকে ঝুঁকিয়া থাকে এই জন্য পাপড়ী গুলি অতি শীঘ্রই খসিয়া যায়। মহুয়া ফল গুলি দেখিতে দুই প্রকার। এক প্রকার ছোট ছোট সুপারির মত, আর এক প্রকার একটু অপেক্ষাকৃত বড় এবং ছুঁচাল। বৈশাখের মাঝে এই ফল সকল পাকিয়া থাকে এবং ক্রমাগত অনেক দিন ধরিয়া পড়িতে থাকে। প্রায়ই জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে সমস্ত ফল ঝরিয়া যায়। ফলের বাহ্যাকার অপেক্ষাকৃত নরম সে জন্য

ভূমিতে পড়িলেই ফাটিয়া যায় এবং বীজগুলি বাহির হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে যে রূপ উল্লিখিত হইয়াছে সেইরূপে মহুয়া ফুলের পাপড়ি গুলি সংগ্রহ করা হয়। বেহার প্রদেশবাসীগণ এই পাপড়ী কাঁচা খাইয়া থাকে এবং কখনও কখনও তরকারি প্রস্তুত করিয়া খায়। ভাতের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাইলে ইহা দ্বারা শরীরের পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই গুলি গাঁজাইয়া লইলে একপ্রকার খাটি মদ পাওয়া যায়। এই মদ ঐ প্রদেশে অত্যন্ত সস্তা। এক পয়সায় এক পাঁচি সের (৬০ ভরি) মদ পাওয়া যায়। এই মদ এত খাঁটী যে এক পয়সার মদ পান করিলেই একজন লোক মাতাল হইয়া পড়ে। এই জন্য ফুলের পাপড়া পণ্যদ্রব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এবং পাটনা প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে অনেক পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

ফল হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা দেখিতে ঘৃতের ন্যায় এবং অনেক সস্তা বলিয়া ইহা ঘৃতের সহিত ভেজাল দেওয়া হয়। ফল হইতে এই পদার্থ নির্গত হইলে প্রথমতঃ তৈলের ন্যায় দেখায়, তারপর শীঘ্রই তাহা জমিয়া যায়। কিছুদিন ধরিয়া এইরূপে রাখিয়া দিলে ইহার স্বাদ তিক্ত হয় এবং অনেকটা টকের গন্ধ হয়, এই জন্য তখন ইহা ব্যবহারোপযোগী হয় না। তখন এই তৈলকে শোধন করিয়া লইতে হয়, তাহাতে ইহার কদর্য্য স্বাদ ও গন্ধ দূর হয়। এই তৈলও অনেক পরিমাণে পাটনা প্রভৃতি স্থান সমূহ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

ফল হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে পর যে শাঁসটুকু থাকে তাহা লোকে খায়। ফুল হইতে যে মদ প্রস্তুত করা হয় তাহাকে আরও জ্বাল দিলে গুড়ে পরিণত হয়। এই গুড় আমাদের খেজুর গুড় অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু ইহার দানা অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া দরে বিক্রয় হয় না। মহুয়ার তৈল পোড়াইলে ধোঁয়া বা বদ্ গন্ধ বাহির হয় না এই নিমিত্ত ইহা অনেক সময় বাতি ও সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বেশ ঘন হইয়া থাকে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বলে, কিন্তু আলোক খুব উজ্জ্বল হয় না। নিম্নলিখিত প্রণালীতে তৈল বাহির করা হয়। ফল গুলিকে প্রথমে থেঁতলাইয়া ফেলিয়া একটা থলের মধ্যে পুরিয়া অনেক চাপ দিতে হয় তাহাতে ক্রমে সমস্ত তৈল নিষ্কাষিত হইয়া আইসে। এই তৈল আতরের সহিত মিশ্রিত করিয়া কেশ-তৈল রূপে পশ্চিম-দেশবাসী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কেশ তৈলকে তাহারা 'ফুলোয়া' কহে।

শুষ্ক ফুলগুলিকে জলে পচিতে দিলে তাহা গাঁজিয়া গিয়া যে মদ প্রস্তুত হয় তাহা শোধন করিয়া ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় শোধন উপায়ে ১ হন্দর মহুয়া ফুল হইতে ৬ গ্যালন প্রুফস্পৃট পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক বৃক্ষে প্রায় ৭।৮ মণ ফুল ফুটিয়া থাকে, অতএব তাহা হইতে এক মণ খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে।

শুষ্ক ফুলগুলি গৃহপালিত পশ্বাদি ভক্ষণ করিতে বড় ভালবাসে ও তাহাতে তাহারা বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। আরও এই ফুল খাইলে তাহাদের weevil আক্রমণের ভয় থাকেনা। পেঁচা, কাঠবিড়াল, শিয়াল প্রভৃতি জন্তুরা মহুয়া খাইয়া থাকে, কিন্তু অনেক পরিমাণে খাইলে তাহারা ক্ষেপিয়া গিয়া থাকে।

ফল হইতে তৈল প্রস্তুত করিতে গেলে প্রথমে ফলগুলিকে একটু চাপ দিয়া ঘষিয়া ফেলিলে উপরের খোলাটা ফাটিয়া যায় এবং শাঁসকে চটকাইয়া চাপ সংযোগে তৈল নিংড়াইয়া বাহির করা হয়। মধ্য প্রদেশে এই শাঁস গুঁড়াইয়া সিদ্ধ করা হয় এবং অনন্তর পাত পুরু কাপড়ে জড়াইয়া তাহার উপরে চাপ দিয়া তৈল বাহির করা হয়। বাঙ্গালার পশ্চিম প্রদেশে এই তৈল ঘৃতের পরিবর্ত্তে ও জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাবান প্রস্তুতের জন্য নারিকেল তৈলের ন্যায় ইহা সমানে ব্যবহৃত হয় এবং এইজন্য বিলাতে ২৫ পাউণ্ড করিয়া টন বিক্রয় হয়।

এই তৈলের আর একটী বিশেষ গুণ এই, যে, ইহাদ্বারা অনেক প্রকার চর্ম্ম রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। তৈল বাহির করিয়া লইলে যে অবশিষ্টাংশ ফলের মধ্যে থাকে তাহা অনেক সময়ে মাথাঘষার ন্যায় মস্তক ধুইবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অন্যান্য দেশেও পণ্য দ্রব্যের ন্যায় চালান হয়। গাছের আটাও অনেক ঔষধ স্বরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মহুয়া হইতে নিম্ন লিখিত প্রকারে মদ চোলাই

করা হয়। খেজুরের 'বান শালের' ন্যায় সুগভীর দুইটা উনান প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর 'হাঁড়া' বসান হয়। এই হাঁড়া গুলিতে শুষ্ক ফুলের পাপড়ী জ্বাল দেওয়া হয়। এই হাঁড়ার উপর আর একটা হাঁড়া চাপা দিয়া সংযোগের স্থান গুলি কাদা দিয়া লেপিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বাতাস প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। উপরিস্থিত হাঁড়াটীর উপরে একটী ফুটা করিয়া একটী চোঙ্গের সহিত আট-কাইয়া দিয়া চোঙের অপর প্রান্তটী আর একটী ধাতু পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। এই ধাতু পাত্রটী একটী জলাধারের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। জলাধারের জল পুনঃ পুনঃ বদলাইয়া দিবার বন্দবস্ত থাকে। বানের মুখ দিয়া জ্বাল দিলে পর মহুয়ার সত্বটুকু বায়ু আকারে ধাতু পাত্রে নীত হয় এবং তথায় ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে শীতল হইয়া তরলাকারে পরিণত হয়।

পূর্ব্বে চাতরার অন্তর্গতঃ রামগড়ে এইরূপ প্রক্রিয়ার মদ চোয়ান হইত। কিন্তু এই উপায়ের অনেক অসুবিধা আছে। তাহা ক্রমে ক্রমে দূর করিবার প্রয়াস হইতেছে। আজকাল প্রায়ই ইংরাজী উপায়ে শোধন কার্য্য চলিতেছে। কৌশল যদিও একই প্রকার তবে পদার্থের বিশেষত্ব আছে। এই নিয়মে প্রায়ই ধাতু পাত্রের হাঁড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আতর, চন্দন-তৈল প্রভৃতি অন্যান্য সুগন্ধ পদার্থের চোয়ান প্রক্রিয়া প্রায়ই একই প্রকার।

গাছের ছাল হইতে যে গঁদের ন্যায় আটা নির্গত হইয়া থাকে আপাততঃ তাহার কোন সদ্ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু যদ্যপি ইহার কোন সদ্ব্যবহার আবিষ্কার করা হয় তাহা হইলে ইহা অনেক পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গাছের গুঁড়ি বেশ সরল নহে। যেটুকু সরল তাহা দ্বারা কোন কাজ আদায় হয় না। কিন্তু এই গুঁড়ির একটা বিশেষত্ব এই যে কড়ি বা অন্যান্য ঘরের কাজে ব্যবহার করিলে ইহাতে উই ধরিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু সময়ে সময়ে ১৪।১৫ হাত লম্বা কড়িও দেখা যায়। এই কাঠ যেরূপ শক্ত তাহাতে বোধ হয় ইহা জাহাজ বা নৌকা নির্ম্মাণে অত্যন্ত উপযোগী হইতে পারে। তাহা হইলে ইহা অনেক পরিমাণে জন্মান যাইতে পারে এবং অনায়াসে নদীর উপর ভাসাইয়া লইয়া কলিকাতায় সহজেই আনা যাইতে পারে।

যে সকল অনুর্ব্বরা জমীতে অন্য কোন গাছ জন্মায় না প্রায়ই সেই সকল জমীতে এবং পাথর ও কাঁকরপূর্ণ জমীতে ইহা বেশ জন্মায়। যেখানে ইহা জন্মায় তাহার চতুর্দ্দিকের সমস্ত ঝোপ ও জঙ্গল মরিয়া যায়। উর্ব্বরা জমীতে ইহা পর্য্যাপ্তভাবে জন্মাইয়া থাকে। ইহার বেশী জলের প্রয়োজন হয় না, এই জন্য অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় বেশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব পশ্চিমে উষ্ণপ্রধান দেশেও প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ইহা অবলীলাক্রমে জন্মাইয়া থাকে।

ইহার এত উপকারিতা ও ইহার জন্মাইবার জন্য এত জমি পতিত থাকা সত্ত্বেও ইহার প্রকৃত চাষ কোথাও দেখা যায় না। কটক, , রোটা প্রভৃতি স্থলে এই সকল গাছ বড় বড় দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মহুয়া গাছ ছোট খুব কমই দেখা যায়। কবে হইতে যে একটা বিশেষ বৃক্ষ ছোট হইতে বড় হইয়া ফুল ফল দিতেছে তাহার ইতিহাস প্রদানে অতি অল্প লোকেই সক্ষম। ইহার জন্য জমিদার ও রাজা দায়ী, কারণ তাঁহারা ইহা ছোট লোকের খাদ্য বলিয়া ইহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেও অবমাননা বোধ করেন। পশ্চিম ও বেহার প্রদেশে যদ্যপি এই বৃক্ষের চাষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে করা যায় তাহা হইলে তাহার উপসত্ব হইতে যে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হতভাগ্য দেশবাসীদিগের কোনও উপকার হয় না তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু সে দেশের লোকেরা যে কারণেই হউক হাজার উপকার লাভ হইবার প্রত্যাশা থাকিলেও কিছুতেই মহুয়ার চাষ করিতে চায় না।

চাষ করিতে হইলে বর্ষার মাঝামাঝি সময়ে বীজ পুতিয়া দিতে হইবে। এক স্থানে চারা প্রস্তুত করিয়া অন্য স্থানে নাড়িয়া পুতিলে অথবা গোড়া হইতে ২০।২৫ হাত অন্তর এক একটী বীজ পুতিলেই চলিবে। এইরূপ শুনা যায় যে সাত বৎসরের মধ্যে ইহার ফুল ও ফল উৎপন্ন হয়। দশ বৎসরের পর প্রায় অর্দ্ধেক ফসল পাওয়া যায় এবং কুড়ি বৎসরের পর ইহার সম্পূর্ণ বৃদ্ধি হয়। প্রায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত ইহা পর্য্যাপ্ত ফসল উৎপাদন করে।

একটী জোয়াল মহুয়া গাছ যে পরিমাণ ফুল উৎপন্ন করে তাহা শুকাইয়া লইলে চারি মণ ওজন হয় এবং বাজারে প্রায় দুই টাকায় বিক্রয় হয়।

প্রত্যেক বৃক্ষে দুই মণ বীজ জন্মাইয়া থাকে। তাহাতে যে তৈল পাওয়া যাইতে পারে তাহাও পাকা ১৬ সের এবং তাহা বাজারে দুইটাকা বিক্রয় হয়। চাতরা অঞ্চলের গাছ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফুল ও ভাল তৈল পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রদেশে কুড়ি বৎসরের মধ্যে একটী গাছ হইতে ইহার অর্দ্ধেক ফসল পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য ইহার চাষও পাট করিলে যেখানেই হউক না কেন ইহা অপেক্ষা অনেক ফসল বাড়িতে পারে। তাহা হইলে ইহার দ্বারা জমিদারেরও একটা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে এবং প্রজারাও অন্নাভাবে মরিবার পূর্ব্বে একটা উপায় করিতে পারে এবং সেই সঙ্গে অনেক অনুর্ব্বরা ও খারাপ জমিরও আবাদ হইয়া যায়। মনে করুন প্রত্যেক গাছ ২৫ হাত অন্তর করিয়া বসান গেলে এক বিঘাতে আটটী গাছ অনায়াসেই পোতা গেল। প্রত্যেক গাছ হইতে বাৎসরিক আট আনা আয় হইলে তাহা হইলে বৎসরে এক বিঘা জমী হইতে চারি টাকা আয় হইল। তাহার অর্দ্ধেকও যদি জমিদার পাইতে পারে তাহাতে তাহার অন্যান্য উৎকৃষ্ট জমির ধানের ন্যায় অনুর্ব্বরা জমি হইতে আয় হইতে পারে। এবং প্রজাও কেবলমাত্র বীজ পোতার কষ্ট ব্যতীত অন্য কোন কায়িক পরিশ্রম না করিয়া ঘরে বসিয়া প্রত্যেক বিঘা হইতে দুই টাকা পাইতে সক্ষম হয়। অবশ্য বীজ পোতার পর দশ বৎসরের জন্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, যে বৎসরে প্রচণ্ড উত্তাপ হেতু অন্যান্য ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে, এই ফসলের কোন মাত্র ক্ষতি হইবে না অতএব ইহাতে তাহাদের কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে।

শ্রীবিরিঞ্চিমোহন কর।

অভ্র।

আমাদের দেশের অভ্র, ব্যবসায়ের একটি উত্তম উপাদান। উপযুক্ত পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে যদি উহার ব্যবসা করা যায় তাহা হইলে প্রভূত লাভ হইবার সম্ভাবনা। অভ্রের ব্যবসায় ব্যয় সাপেক্ষ, অর্থাৎ অধিক মূলধন ব্যতীত উহার ব্যবসায় করা সম্ভবপর নহে। অনেকে অল্প অল্প মূলধনে অভ্রের ব্যবসায় করেন এবং মূলধনের অনুযায়ী লাভ পাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু ন্যূন কল্পে পঁচিশ হাজার টাকা হইলে একটু ভাল রকম কারবার হয়। পঁচিশ হাজার টাকা অপেক্ষা যত বেশী মূলধন ফেলা যায় তত কারবার ভাল হয় ও লাভ বেশী হয়।

অভ্র যে একটী খনিজ পদার্থ তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। পৃথিবীর যে সকল স্থান হইতে উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে তন্মধ্যে বঙ্গদেশই সর্ব্ব প্রধান। কারণ বঙ্গের অভ্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুতরাং অধিক মূল্যবান। উহা সাধারণতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশের ভূগর্ভে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বঙ্গদেশের যে সকল স্থানে উহার আকর আছে সে সকল স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে আচ্ছন্ন এবং গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তথায় অধিবাসীর সংখ্যা অতি কম।

ইংরাজি ১৯০১ সালে বঙ্গদেশের নানা স্থানের আকর সকল হইতে প্রায় পঁচিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার অভ্র উত্তোলিত হইয়া বিক্রীত হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে প্রায় দেড় শত ক্রোশ পশ্চিম প্রান্তে কোদাড়মা নামে একটি ক্ষুদ্র নগর আছে, অধুনা ঐ নগর অভ্র-উৎপাদিকা ভূমির কেন্দ্র স্থল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নওয়াদাষ্টেশন হইতে কয়েক ক্রোশ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলে অভ্র উৎপাদিকা ভূমির উত্তর সীমানায় উপস্থিত হওয়া যায়। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য সম্প্রতি ই, আই, ই রেলওয়ের একটী শাখা পথ প্রস্তুত হইতেছে. উক্ত পথ অভ্র ভূমিকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হইবে। এই রেল-পথ সমাধা হইলে অভ্র রপ্তানির বিশেষ সুবিধা হইবে এবং প্রেরণের ব্যয়ও অনেক কম হইবে।

যে ভূমির অভ্যন্তরে অভ্রের আকর আছে তাহার উপরিভাগ দেখিয়া এবং সেই স্থানের মৃত্তিকাদি রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিদ-পণ্ডিত-গণ তাহার নিম্নদেশে অভ্রের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারেন। দেশীয় খননকারিগণ অন্য উপায়ে অভ্র-খনির অনুসন্ধান করিয়া থাকে

অত্যন্ত বারিবর্ষণ হইলে উপরের আল্‌গা মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যায় এবং মৃণ্ময় প্রস্তরের শিরা সকল বাহির হইয়া পড়ে। সেই সময়ে খননকারিগণ উক্ত শিরা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখে যে তাহাতে "রেতি" আছে কি না। প্রস্তরের শিরা ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে যদি "রেতি" দেখা যায় তাহা হইলে তাহারা অনুমান করে যে নিম্নে অভ্রের খনি আছে। স্থানীয় লোকেরা উক্ত শিরার অভ্যন্তরস্থ অভ্রকাংশকে "রেতি" বলে।

যে স্থানের নিম্ন দেশে অভ্রের আকর থাকা বিবেচিত হয়, খননকারিগণ সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক অভ্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। খনির গর্ত্ত ঠিক সোজা করে না, বক্রভাবে নানা দিকে সুড়ঙ্গ করিতে থাকে। এইরূপে তাহারা প্রায় দেড় শত হস্ত মৃত্তিকার নিম্নে চলিয়া যায়। কখন কখন পাঁচ ছয় শত হস্তের নিচেও অভ্রের গতি হইয়া থাকে। আকর খনন কালে তাহার মধ্যে জল উঠিয়া থাকে। ঐ জল ক্রমে উঠাইয়া ফেলা হয়। রাত্রিকালে খনির কার্য্য বন্ধ হইয়া থাকে। রাত্রিতে আকর মধ্যে যে জল জমে, তাহা প্রাতে ছেঁচিয়া ফেলা হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পার্ব্বত্য প্রদেশে সাধারণতঃ অভ্রের খনি পাওয়া যায়; সুতরাং ইহা সহজে অনুমিত হইবে যে অভ্র ভূগর্ভস্থ প্রস্তরের অভ্যন্তরে থাকে। সেই সমস্ত প্রস্তর ভগ্ন করিয়া উহা বাহির করিতে হয়। প্রস্তর ভগ্ন করিবার জন্য নানারূপ মুদ্গর ও এক প্রকার দেশীয় বারুদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কঠিন প্রস্তর ভগ্ন করিবার জন্য বিলাতী ডায়নামাইট সময়ে সময়ে ব্যবহার করা হয়। আকর মধ্যে অভ্র সাধারণতঃ লম্বাভাবে থাকে। অভ্রের এক সীমা ধরিয়া ক্রমে মাল উঠাইয়া যাইতে হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়। কারণ এরূপ বোধ হয় যে সে খনিতে অভ্র শেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শেষ হয় নাই, হয়ত নিকটেই অভ্র আছে, যে দিকে তাহার গতি হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া অপর দিকে খনন করিলে এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। এইরূপে অনেক ঘটনা হইয়াছে যে কোন স্থানে এক জন মহাজন বহু অর্থ ব্যয়ে ও বহু মৃত্তিকা খনন করিয়াও অভ্র পায় নাই, কিন্তু সেই স্থানে অপর এক জন মহাজন সামান্য ব্যয়ে ও অল্প মৃত্তিকা খনন করিয়া বহু মূল্যের অভ্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

লাল, কাল, শাদা, প্রভৃতি নানা বর্ণের অভ্র আকর মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল অভ্রের ছোট ছোট চাঁই আকর মধ্যে লম্বা ভাবে অবস্থিত থাকে। কোন কোন স্থানে কখন কখন খুব বড় বড় চাঁইও পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল চাঁই কঠিন প্রস্তরে আবৃত থাকায় ডায়নামাইট দ্বারা প্রস্তর ভাঙ্গিয়া উঠাইতে হয় এজন্য সাধারণতঃ বেশী বড় আকারের চাঁই উঠাইতে পারা যায় না। ৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া ও ৬ ইঞ্চ পুরু চাঁই পাওয়া যায় না সাধারণতঃ ইহার অপেক্ষা ছোট চাঁইই পাওয়া গিয়া থাকে। খনি হইতে যে অভ্র উত্থিত হয় তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খনির মুখেই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, কারণ অভ্রের যে অংশ মৃত্তিকা ও প্রস্তরের সংস্পর্শে থাকে তাহা একরূপ অব্যবহার্য্য সুতরাং সেই অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশিষ্ট অভ্র পুস্তকের আকৃতিতে কাটিয়া কারখানায় প্রেরিত হয়। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে অভ্রের বহু সংখ্যক পরদা একত্র সংযুক্ত থাকে, পরদা গুলি অত্যন্ত পাতলা, উহাদিগকে পুস্তকের পাতার ন্যায় এক এক খানি করিয়া উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে। এই জন্যই অভ্র খণ্ড গুলিকে "বহি" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

উল্লিখিত অভ্রের বহিগুলি কারখানায় প্রেরিত হইলে তথায় তাহার বাছনি হইয়া থাকে। অভ্রের দাগী অংশকে বহি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয় এবং নির্দাগি অংশকে সাধারণতঃ সাত শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেরূপ ভাবে বিভক্ত করা হয় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বিশেষ শ্রেণী—যে	সমস্ত	খণ্ড	৩৫	বর্গ	ইঞ্চের	উপরে।		
প্রথম	,,	,,	,,	,,	২৪	,,	,,	,,
দ্বিতীয়	,,	,,	,,	,,	১৬	,,	,,	,,
তৃতীয়	,,	,,	,,	,,	১০	,,	,,	,,
চতুর্থ	,,	,,	,,	,,	৬	,,	,,	,,
পঞ্চম	,,	,,	,,	,,	৪	,,	,,	,,
ষষ্ঠ	,,	,,	,,	,,	২	,,	,,	,,

উপরের লিখিত শ্রেণী গুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। প্রথম ভাগকে "সরেস" ও দ্বিতীয় ভাগকে "নিরেস" বলা যায়।

মাল নিরেস মাল অপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

কারখানায় বাছনী হইবার পরে শ্রেণী অনুসারে মাল বাক্সবন্দি হয়। প্রত্যেক বাক্সে প্রায় এক মণ দশ সের মাল থাকে। বাক্স গুলি কলিকাতায় প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন মহা নগরে প্রেরিত হইয়া থাকে। এবং তথায় নিলামে সেই সকল মাল বিক্রীত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীর নানা স্থানে নানা রূপ বং বিশিষ্ট অভ্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সমস্ত অভ্র যে যে কার্য্যে ব্যবহৃত হয় তাহার একটী সামান্য তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। তড়িৎ-সঞ্চালনী শক্তি না থাকায় সর্ব্ব প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রের যে যে স্থানে তাড়িত সঞ্চালনের অনাবশ্যক সেই সেই স্থানে উহা বিশেষ সুবিধার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ কার্য্যে দাগী ও নির্দ্দাগী উভয় বিধ অভ্র সমভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। কাচের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে অভ্র ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই সমস্ত অভ্র-খণ্ড নির্দ্দাগী হওয়া উচিত। অতিরিক্ত উত্তাপে কাচ ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা কিন্তু অভ্র ফাটে না, কারণ উহা নিরতিশয় উত্তাপসহ।

৩। বাষ্পীয় যন্ত্রের যে প্রকোষ্ঠে ফুটন্ত জল সংরক্ষিত হইয়া উত্তাপ দ্বারা বাষ্প উৎপাদন করা হয় সেই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বদেশ অনেক সময়ে অভ্রকদ্বারা মণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়, কারণ তাহা হইলে তাপের অপচয় হয় না।

৪। বাষ্পীয় যন্ত্রের যে সকল স্থান সহজে ঘুরিবার জন্য সম্যক পিচ্ছিল রাখা আবশ্যক হয়, সে সকল স্থানে প্রায়শঃ অভ্রচূর্ণ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

৫। অভ্রক দ্বারা আমাদিগের দেশে খাশ-গেলাস, ডাকের সাজ ও নানা প্রকার খেলনা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দিন দিন অভ্রের ব্যবহার যেরূপ হারে বাড়িতেছে তাহাতে অনুমান হয় যে অচিরকাল মধ্যে অভ্রক একটা প্রধান ব্যবসায়ের দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অভ্রককে গালাইয়া পুনরায় ইচ্ছানুরূপ আকৃতিতে জমানর জন্য কয়েক বৎসর হইতে বহুতর চেষ্টা হইতেছে। যদি উক্ত চেষ্টা ফলবতী হয় তাহা হইলে অভ্র-ব্যবসায়ে একটি নবযুগের আবির্ভাব হইবে।

লণ্ডন নগরে একটি কারখানা খোলা হইয়াছে, তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্র-খণ্ড একরূপ আঠা-দ্বারা জুড়িয়া ও কলে চাপ দিয়া বড় আকৃতির অভ্র-পাত প্রস্তুত করা হইতেছে এবং তাহাদ্বারা অনেক কার্য্য হইতেছে।

অভ্র বিলাতে খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে লণ্ডন নগরে যে মূল্যে অভ্রক বিক্রয় হইতেছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।—

বিশেষ শ্রেণীর প্রতি পাউণ্ডের (অর্দ্ধ সেরের) মূল্য ৭৷৷•

প্রথম	,,	,,	,,	,,	,,	৫৷•
দ্বিতীয়	,,	,,	,,	,,	,,	৩৸০
তৃতীয়	,,	,,	,,	,,	,,	২৷৷৶০
চতুর্থ	,,	,,	,,	,,	,,	১৷৷•
পঞ্চম	,,	,,	,,	,,	,,	৷৷•
ষষ্ঠ	,,	,,	,,	,,	,,	৷৶০

দাগী মাল উল্লিখিত মূল্যের অর্দ্ধেকে বিক্রীত হইয়া থাকে।

কোদাডমা বা তাহার সন্নিকটস্থ স্থানে যে সমস্ত অভ্রকের খনি আছে তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। তথাকার দেশীয় খনি গুলির লাভাংশও ইউরোপীয় বণিকগণ প্রকারান্তরে উপভোগ করিয়া থাকেন। কারণ দেশীয় ব্যবসায়িগণ মাল উঠাইয়া তাঁহাদিগকে বিক্রয় করে। তাঁহারা সেই মাল বিলাতে পাঠাইয়া যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অনেক ধনী আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা এরূপ ব্যবসায়ে মনোযোগী হয়েন না; তাই আজ রত্নময়ী ভারতভূমির অধিবাসিগণ দীনহীন কাঙ্গালী।

আমাদের দেশের ধনীগণ যদি একটু উদ্যোগী হইয়া চেষ্টা করেন তাহা হইলে এই ব্যবসায়ে প্রভূত লাভ করিতে পারেন। এই খনির কার্য্যের জন্য অধিক দূরে যাইতে হয় না, অথচ লাভ যথেষ্ট।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

কবিরাজ

শ্রীবিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন

মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

৫নং কুমারটুলি—কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে পুরাতন জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ছর্দ্দি (বমন), অপস্মার, মূর্চ্ছা, উন্মাদ বাতব্যাধি, বাতরক্ত, আমবাত, শূল, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, প্রমেহ, শোথ, উদর, অম্লপিত্ত, চক্ষুরোগ, শিররোগ, স্ত্রীলোকের বিবিধ রোগ ও বালরোগের আয়ুর্ব্বেদোক্ত নানাবিধ কাষ্ঠৌষধ, ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মোদক, দ্রাবক, ধাতুভস্ম, মকরধ্বজ ও মৃগনাভি প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মফস্বলের অধিবাসিগণ রোগের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানাইলে ভ্যালুপেবল ডাকে ঔষধ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

আমাদের ঔষধালয় ভারতবর্ষস্থ কৃতবিদ্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে—এমন কি আসিয়াখণ্ড উল্লঙ্ঘন করিয়া সাগর-পারস্থ সুদূর ইংলণ্ডবাসিগণের মধ্যেও কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ নিম্নে কয়েকখানি পত্রের মর্ম্মানুবাদ প্রকটিত করা হইল। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজের পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম না। কারণ সে সব পত্র (কন্‌ফিডেনসিয়েল) গোপনীয় বলিয়া গণ্য।

৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পত্রের সংক্ষিপ্তানুবাদ,—

"আমার বন্ধু কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেনকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। তিনি উচ্চদরের সংস্কৃতাভিজ্ঞ এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন। আজকাল ইংরেজীমতে ডাক্তার হইয়া কবিরাজ-সম্প্রদায়কে কতকটা পশ্চাৎপদ করিয়াছে বলিতে হইবে, কিন্তু এদেশে যতদিন পণ্ডিত বিজয়রত্নের ন্যায় জ্ঞানবান, বহুদর্শী ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন কবিরাজ থাকিবেন, ততদিন হিন্দুচিকিৎসার গৌরব অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিতি করিবে।"

উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর

কে, জি, গুপ্ত স্কোয়ার।

"বিবিধ রোগের চিকিৎসায়, বিশেষতঃ যাপ্য রোগ সমূহের চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর উপযোগিতা ক্রমেই উপলব্ধি হইতেছে। এ সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেন মহাশয় যতদূর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং তিনি রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে যতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন, এরূপ উন্নতিশীল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক অতীব বিরল।"

গঙ্গাপ্রসাদ

আদি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

কুমারটুলী, কলিকাতা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়।

জগদ্বিখ্যাত কবিরাজ ৺ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় অন্যূন পঞ্চাশৎ বৎসর. চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যেরূপ বহুদর্শিতা লাভকরেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এত দীর্ঘকাল চিকিৎসা ব্যবসার অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তিনি কয়েকটী অভিনব চিকিৎসা-তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন। এবং যাহার প্রভাবে তিনি লক্ষ লক্ষ রোগীকে কৃতান্ত-কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সকল তত্ত্ব ও তৎপ্রসূত অমোঘ ঔষধাবলি তিনি তদীয় প্রিয়তম সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেন সরস্বতী মহাশয়কে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং তৎকর্তৃক ঔষধগুলি উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া জন সাধারণে প্রচারিত হইবে জানিয়া গোপনে সেই কয়েকটী ঔষধের প্রস্তুত ও ব্যবহার বিষয়ে কেবল তাঁহাকেই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং তদীয় আবিষ্কৃত দুর্লভ রত্নস্বরূপ ঔষধাবলি যাহাতে দরিদ্র ভারতবাসী অনায়াসে ক্রয় করিতে সমর্থ হন এই অভিপ্রায়েই সুলভ করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা উক্ত স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের সম্মানার্থ পশ্চাৎ লিখিত কয়েকটী মহৌষধ উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া সাধারণের উপকারার্থে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিতেছি এবং উক্ত মহৌষধগুলি স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের নামালঙ্কৃত করিয়া তদীয় স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ প্রকাশ করিতেছি। এতাবৎ সেই সমস্ত মহৌষধ প্রস্তুত করিয়া যে সকল রোগীকে ব্যবহার করিতে দিতেছি তাঁহারা সকলেই যেন দৈবশক্তি প্রভাবে অতি সত্বর সম্যক্ আরোগ্যলাভ করিতেছেন। আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে ঐ সকল ঔষধ বিনা মূল্যেই সর্ব্বসাধারণেকে বিতরণ করি। পরন্ত আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত ঔষধ সকল প্রস্তুত করিতে আমাদিগকে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। সুতরাং একেবারে বিনামূল্যে বিতরণ করা নিতান্ত অসম্ভব। তথাপি আমরা ঔষধগুলির বহুল প্রচার ও সাধারণের সুবিধার্থে কেবল ঔষধ প্রস্তুতের ব্যয় গ্রহণ করতঃ মূল্য ধার্য্য করিলাম। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে প্রথিতনামা কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত এই সমস্ত অব্যর্থ মহৌষধগুলি জনসাধারণে ব্যবহার করিয়া ইহার অচিন্তনীয় উপকারিতা দর্শন করুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গঙ্গা প্রসাদ ঘৃত।

অথবা

একমাত্র ধাতুপোষক মহৌষধ।

ক্ষীণ মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূরীকরণ ও নিস্তেজ মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তিসাধন পক্ষে ইহা একটী বীর্য্যবান মহৌষধ।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালীমতে যত প্রকার ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে এই প্রসিদ্ধ ভৈষজ্য উপাদানে প্রস্তুত গঙ্গাপ্রসাদ ঘৃতটী আধুনিক উন্নত আবিষ্কারের শুভময় পূর্ণ বিকাশ। মানসিক দৌর্ব্বল্য দূরীকরণের ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। অতিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর দেশে বাস জন্য ব্যাধি, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা, যৌবন-কালসুলভ অবৈধ কার্য্য হইতে যত প্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে তৎসমুদয় রোগ বিনাশে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র সদৃশ। নিম্নলিখিত রোগ ও তাহার আনুসঙ্গিক উপসর্গ সমূহ বিদূরিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়, যথা ;—স্নায়বিক ও ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, জীবনীশক্তি-রাহিত্য, দৈহিক ও মানসিক অবসন্নতা, মাংসপেশী সমূহের শিথিলতা, জীবিতকালের বিবিধ কর্ত্তব্য কার্য্যানুশীলনে ও সুখ উপভোগে অসমর্থতা, স্মৃতি-শক্তি হীনতা, মস্তিষ্ক ক্ষীণতা প্রভৃতি এবং যাবতীয় ক্ষয়করী পীড়ার একটী শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ ঔষধ। ইহা ভগ্ন-উদ্যমে উৎসাহ, বল এবং নব-জীবন প্রদান করিয়া থাকে। গঙ্গাপ্রসাদ ঘৃত

দোষ শূন্য। শিশু হইতে প্রাপ্তবয়স্ক সকলে নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারে। ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দুর্ব্বলকে সবল করে।

পরিমাণ—প্রাপ্ত বয়স্ক ॥০ অর্দ্ধতোলা।
অপ্রাপ্ত ঐ ।০ সিকি তোলা।

প্রয়োগ ব্যবস্থা।

প্রতিদিন প্রাতে একবার অল্প পরিমাণে দুগ্ধের মধ্যে পরিমাণানুরূপ ঘৃত নিক্ষেপ করতঃ অল্প মিছরি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

পথ্য—ভাত, রুটি, তাজা মাংস ও জীবন্ত মৎসের ঝোল প্রভৃতি। সাধারণতঃ আশুজীর্ণকর দ্রব্যই পথ্য।

নিষিদ্ধ—অম্ল, অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন এবং সর্ব্বপ্রকার অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যই নিষেধ।

মূল্য—একমাসের উপযোগী—৪৲ চারি টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

গঙ্গাপ্রসাদ তৈল।

বাতরোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

এই সুপরীক্ষিত তৈলটী আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে গেঁটে বাত, চলতি বাত, রস বাত, শোথ, পতন জনিত বাত, পাদগণ্ডির, কোমরের বাত, ঐকাঙ্গিন বাত, ফিক বেদনা, সন্ধিস্থল ফুলা, হৃদপিণ্ডের বেদনা প্রভৃতি যে কারণে যে প্রকার বাত বেদনা হউক না কেন এই তৈল মালিসে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। অনেক শয্যাগত বাতগ্রস্থ রোগীকে, এই তৈল ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

মালিসের ব্যবস্থা—এই তৈল অল্প পরিমাণে হস্তে লইয়া অনুলোম দিলে আস্তে আস্তে মালিস করিবে। মালিসকারির তৈল সিক্ত হস্ত মাঝে মাঝে অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া লওয়া উচিত। এইরূপে প্রাতে ও বৈকালে দুইবার মালিস প্রয়োজন।

পথ্য—রুটি, তরিতরকারী, দুগ্ধ প্রভৃতি। নিষিদ্ধ—অম্ল, দধি, কলায়ের ডাইল প্রভৃতি। সাবধান—কোন প্রকার ঠাণ্ডা না লাগে। মূল্য ৪ আউন্স শিশি ৪৲ চারি টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

গঙ্গাপ্রসাদ সালসা।

অথবা

দূষিত শোণিত সংশোধক।

এই সালসাটী দূষিত রক্ত পরিষ্কার এবং বলাধানের পক্ষে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা উপদংশ পারদ জনিত সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ, সর্ব্বপ্রকার বাত, শ্লেষ্মা, সর্দ্দি, শ্বাস, কাশ, গণ্ডমালা, দদ্রু, বিস্ফোটক, উরুস্তম্ভ, ব্রণ প্রভৃতি ও দূষিত রক্ত হইতে উৎপন্ন যাবতীয় রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে। ইহা সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং দুর্ব্বলকে বলশালী করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গার্হস্থ্য আশ্রমবাসীর পারিবারিক অবশ্যম্ভাবী ব্যাধি সমূহের একটী নিয়ত প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহা ধীশক্তি সম্পন্ন ভিষকগণ কর্ত্তৃক দূষিত শোণিতের বিশুদ্ধি করণে উপযুক্ত ভেষজ বলিয়া অনুমোদিত। অত্যাশ্চর্য্য আরোগ্যকরী ক্ষমতা বিদ্যমান থাকাতে ইহা আবিষ্ক্রিয়ার সময় হইতে অদ্যাপি সমভাবে অব্যর্থ ঋষিবাক্য সদৃশ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহা শরীরের বলাধানও পরিবর্ত্তন সাধন করে। ম্রিয়মাণ যুবকের স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধন ও হীনবীর্য্য নিস্তেজ বৃদ্ধকে বীর্য্যমান ও সবল করিতে ইহার তুল্য সালসা ইতি পূর্ব্বে আবিষ্কার হয় নাই। ইহা সুবিশাল ভারতবর্ষের প্রতি জনপদ, নগর, গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীবাসী সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি ও সুখ সচ্ছন্দতা প্রদান করিয়াছে।

ব্যবস্থা। প্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে ১ দাগ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে অর্দ্ধ দাগ; দিবসে দুইবার সেবনীয়। অর্থাৎ প্রাতে ও বৈকালে।

পথ্য—রুটি ভাত, মাখম, ঘৃত, মাংস, মৎস্যের ঝোল এবং অন্যান্য বলকারক খাদ্যই সুপথ্য।

মূল্য—১৫ দিনের উপযোগী একটী আট আউন্স শিশির মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কমলা

[চৈত্র, ১৩১০] [১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

নানা প্রসঙ্গ।

রেড়ী হইতে কেবল তৈল হয় না। ইহা হইতে আবার গ্যাস হইতেছে। পুনা নগরে তথাকার College of Science-এর ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ও শিক্ষা বিভাগের ডাইরেকটর ডাক্তার থিওডোর কুক রেড়ী হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন।

* * * *

আহম্মদাবাদের প্রজাবন্ধু পত্র বলেন যে এদেশের শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে এক একটী আদর্শ শিল্পাগার সংস্থাপন করা আবশ্যক। এই সকল শিল্পাগারে (museum) সকল প্রদেশের শিল্প রক্ষিত হইবে এবং তাহা কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে, কিরূপে পাওয়া যায়, কিরূপ মূল্য ইত্যাদি লেখা থাকিবে। এইরূপ করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্পজাত সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন এবং তাহাতে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারিবে।

* * *

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণাংশে কোদায়ার নদী প্রবাহিত; আসামবর পাহাড়ে ইহা উৎপন্ন এবং পাচিপাড়ার নিকট একটী সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া নিম্নে প্রবাহিত। এই গিরি-সঙ্কটের এধার ওধার ইটের পাকা দেওয়ালের বাঁধ গাঁথিয়া ঐ নদীর স্রোত বন্ধ করিয়া একটী বিস্তীর্ণ হ্রদে পরিণত করিবার কল্পনা হইয়াছে। এই বাঁধ উপরিভাগে ১,৫০০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া হইবে এবং নদীগর্ভ হইতে ৯৪ ফুট উচ্চ হইবে। হ্রদের পরিমাণ ৭ বর্গ মাইল হইবে। নদী এখন যে ভাবে প্রবাহিত তাহাতে ক্ষেত্রে জলসিঞ্চনের পক্ষে তাহার বিশেষ উপকারিতা নাই, কিন্তু এইরূপ হ্রদে পরিণত হইলে প্রায় দুই লক্ষ বিঘা ভূমির কৃষিকার্য্যোপযোগী জলের সরবরাহ হইবে। পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে এই বাঁধটি কিরূপ বিরাট ব্যাপার। ইহার ব্যয় বাট লক্ষ টাকা এষ্টিমেট হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ নিজে এই কার্য্যে বিশেষ যত্ন দেখাইতেছেন।

* * *

চিকাগো নগরের মহা প্রদর্শনীর অনুকরণে এখন ঐ প্রণালীর প্রদর্শনী খুলিবার চেষ্টা অন্যান্য স্থানেও হইতেছে। ১৯০০ সালে ফ্রান্সের পারিস নগরে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহা নাকি চিকাগোর অপেক্ষাও ভাল হইয়াছিল। আবার

এবৎসর আমেরিকার সেণ্টলুই নগরে যে প্রদর্শনী খুলিয়াছে, তাহা পারিসের প্রদর্শনীর গৌরব ঢাকিয়া দিয়াছে। এই দর্শনী ক্ষেত্র প্রায় ৩৭২০ বিঘা জমির উপর সংস্থাপিত। পৃথিবীর প্রায় সকল রাজ্য হইতেই দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত রাজ্য আপনাদের দেশের সামগ্রী দেখাইবার জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং আপনাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি জন্য কোন প্রতিনিধি পাঠান নাই জানি না। আমাদিগের দেশের কোন লোকও যে এ প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছেন বা যাইবেন এরূপ শুনি নাই। গবর্ণমেণ্ট এক জন প্রতিনিধি পাঠাইলে বোধ হয় ভাল হইত। মার্কিণ দেশে ভারতবর্ষের শিল্পাদির কাটতি কিরূপ হইতে পারে, তিনি তাহার সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন। এ প্রদর্শনী অনেক দিন খোলা থাকিবে, অতএব দেশের কোন ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন ধনী যদি এই প্রদর্শনী দেখিতে যান, তাহা হইলে তিনি দেশের কতকটা উপকার সাধন করিতে পারেন।

* * *

মহীশূরের একজন ইংরাজ কার্ফিকর এদেশের কৃষি সম্বন্ধে বোম্বাইগেজেট পত্রে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন এদেশে গোমহিষাদির খাদ্যের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়, ইহা এদেশের কৃষির অবনতির একটী কারণ; যাহাতে ইহাদিগের খাদ্যের উন্নতি হয় তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের বৎসরে প্রায় গোমহিষাদির আহারীয়ের বিশেষ অভাব হইয়া থাকে, সে সময়ে কোন কোন গুল্ম খাওয়াইয়া তাহাদিগকে পালন করিবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। এদেশে গোময় জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উল্লিখিত লেখক বলেন যে ইহাতে জমীর যে পরিমাণ সারের আবশ্যক তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে। অতএব গ্রামে গ্রামে জ্বালানি কাঠের জন্য কতকটা জঙ্গল রাখা উচিত এবং গোময় কেবল সারের জন্য রাখা আবশ্যক। তিনি স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও আদর্শ ফলের বাগান সংস্থাপন করিতে বলেন এবং সেই সঙ্গে এক একটী কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। এদেশে অনেক সময়ে পোকা ধরাতে শস্যহানি হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে পঙ্গপালে শস্য নষ্ট করে। এইরূপ শস্য হানি কিরূপে নিবারিত হইতে পারে এই সকল বিদ্যালয়ে সে বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হইবে। কথা সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সহায়তা ব্যতীত এ সকল উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

* * *

বোম্বাই নগরের কে, বি ওয়াগলের নাম আমাদিগের পাঠকগণ অবগত আছেন। ইনি বিলাত হইতে কাচ তৈয়ার করিতে শিখিয়া আসিয়াছেন আমরা বলিয়াছি। সম্প্রতি তিনি বোম্বাইয়ের একটী ক্লবে বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি লক্ষ টাকা মূল ধনে একটী সোডা ওয়াটারের বোতল তৈয়ার করিবার কারখানা খুলিবেন। ভরতবর্ষে প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূল্যের সোডাওয়াটারের বোতল আমদানী হয়, ইহাতে তিনি বিবেচনা করেন এই কারবার খুলিলে বেশ লাভ হইবে। এ দেশে বাজারে একটা সোডাওয়াটারের বোতল প্রায় দুই আনা কি দশ পয়সায় বিক্রয় হয়, কিন্তু মিঃ ওয়াগলে বলিতেছেন যে এদেশে উহা তৈয়ার করিতে দুই তিন পয়সার অধিক খরচা পড়ে না। এই বোতল তৈয়ার করিতেও সুনিপুণ কারিকরের প্রয়োজন হয় না; এ কারণে তিনি এই কারখানা সংস্থাপনে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছেন।

* * *

আমাদিগের দেশের অনেকেরই ধারণা যে মিথ্যা পথ অবলম্বন না করিলে ব্যবসায়ে উন্নতি হয় না। এই সংস্কারই আমাদিগের ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতির অন্তরায়। ইংরাজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতি ব্যবসায়ে যে উন্নতি করিয়াছেন সত্যপ্রিয়তাই তাহার প্রধান কারণ, এবিষয় ইংরাজ সকলের অগ্রণী। অনেকে দেখিয়াছেন কলিকাতায় এক এক জন সাহেব সওদাগরের আপিসে বিশ ত্রিশটা করিয়া যৌথ কারবার (Joint Stock Company) আছে। এই সকল যৌথ কারবারের অংশীদারগণ কারবারের কিছুই দেখেন না, এজেণ্টের হস্তে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু অংশীদারের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এজেণ্টগণ ঐ সকল কারবার নিজের মত করিয়া পরিচালনা করেন। এই জন্যই আমাদের স্বদেশবাসীগণ ইংরাজ এজেণ্টের পরিচালিত যৌথ কারবারে অংশ ক্রয় করিতে কখন সঙ্কুচিত হন না, কিন্তু আমাদিগের নিজের পরিচালিত কারবারে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ইংরাজের পরিচালিত কারবারে তাঁহারা ক্ষতি সহ্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু স্বজাতির পরিচালিত কারবারে তাহা করিতে প্রস্তুত নহেন। লোকের এইরূপ করিবার কারণ আর কিছুই নহে, তাহাদিগের ধারণা যে এদেশের লোক ব্যবসায় বাণিজ্যে সত্যপথ অবলম্বন করে না।

* * *

অসত্য পথে কিরূপ ক্ষতি হয় তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি। এদেশ হইতে বিলাতে ও অন্যান্য দেশে যে চামড়া রপ্তানি হয় তাহা ওজন দরে বিক্রয় হয়। এজন্য চামড়াওয়ালারা চামড়াকে ওজনে ভারী করিবার মানসে চামড়ার উপরে লোহার চুর লেপিয়া দেয়। এই চামড়া যখন বিলাতে যায়, সেখানে উহা ওজন দরে বিক্রয় হয় না, টুকরা দরে বিক্রয় হয়। এই সকল লোহাচুর মাখান চামড়া যখন বিলাতে পৌছায় তখন উহাতে লোহার জঙ্গ ধরিয়া উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে, সুতরাং খরিদদারের মধ্যে মার্কিন ও অন্যান্য দেশের চামড়া যেমন উচ্চ দরে বিক্রয় হয় ভারতের চামড়া সেরূপ দরে বিক্রয় হয় না। এমনকি হাটে যখন এদেশের চামড়া বিক্রয় হয় তখন অনেক খরিদদার চলিয়া যান। ইহাতে এদেশের চামড়ার কারবারের বড় ক্ষতি হইতেছে। ভাল চামড়া হইলেও ভারতের চামড়ার নাম শুনিলেই লোকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাই বলিতেছি সত্য পথ পরিত্যাগ করিলে ব্যবসায়ে ক্ষতি বই লাভের সম্ভাবনা নাই। সত্যই সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। উহাই জাতীয় উন্নতির মূল।

* * *

কলা আমাদের দেশের একটা বিশেষ আবাদ। পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থের এক একটী কলা বাগান হইতে সংসার চলিয়া

যায়। ইহার কিছুই ফেলা যায় না, মূল হইতে ফল পর্য্যন্ত সমস্তই কাজে লাগে। কিন্তু চেষ্টা করিলে এই কলাগাছের ব্যবসায়ের আরও উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু আমরা নূতন কিছুই করিতে চাহি না। এদেশে যখন নূতন কাগজের কল সংস্থাপিত হইয়াছিল তখন কলওয়ালারা কলার বাসনায় কাগজ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কলের প্রয়োজন মত বাসনা সরবরাহ হইল না বলিয়া তাঁহারা এখন ঘাস দ্বারা কাগজ করিতেছেন। এই বাসনার কারবার ফালাও করিয়া করিতে পারিলে বেশ লাভ হয়। তাহার পর মার্কিণ প্রভৃতি যে সকল দেশে কলা জন্মায়, সেখানে কলার ময়দা তৈয়ার হইতেছে। এই ময়দা কিরূপে তৈয়ার করিতে হয় তাহা বহুদিন আমরা একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম। ইহা অতি সহজ। কলা সুপক্ক হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ যখন পুরুষ্ট হইয়াছে অথচ বেশ শক্ত আছে তখন উহার ছাল ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। যখন উহা বেশ শুকাইবে তখন উহাকে জাঁতায় পিশিলে বেশ ময়দা বাহির হইবে। ইহা সুজির মত দুধের সহিত পাক করিলে খাইতে উপাদেয় হয়। মার্কিণ দেশে ইহার খুব চলন হইয়াছে। সম্প্রতি তথায় আবার কলা হইতে কাফি তৈয়ার হইতেছে।

* * *

গরুই বাঙ্গালার একটী প্রধান সহায় সম্পত্তি। এই গো জাতির অবনতি নানা কারণে ঘটিতেছে। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রেই, বিশেষতঃ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে গোচারণ স্থান ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। খোঁয়াড়ের ইজারাদার দিগের দৌরাত্মো এখন আর পল্লীগ্রামের লোক গরু চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিতে পারে না। সাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কলিকাতার কতকগুলি ধনী মাড়োয়ারী ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের কাচড়াপাড়া ষ্টেশনের সন্নিকটে শ্রীকৃষ্ণ গোশালা নাম দিয়া একটী গোচারণ স্থান সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা তথায় ১২০০ টাকা বার্ষিক খাজনায় ১৫০০ বিঘা জমী জমা লইয়াছেন। শেঠ ভজন লাল লোহিয়া এতদুদ্দেশ্যে ২৪০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং অন্যান্য ধনী মাড়োয়ারীরাও অর্থ সাহায্য করিতেছেন। এই গোশালা গোয়ালা দিগকে গোচারণ জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমী প্রদান করিবেন। গৃহস্থ লোকেরা মাসিক এক টাকা দিয়া তথায় গরু রাখিতে পারিবেন এবং গরু প্রসব হইলে বাছুর সহিত গরু ফিরাইয়া পাইবেন। যাহাতে গোজাতির উন্নতি হয় সে জন্য এখানে উৎকৃষ্ট জাতীয় ষাঁড়ও রাখা হইবে। মাড়োয়ারীদিগের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি দেশের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ চারণ স্থান সংস্থাপনের চেষ্টা হইবে।

* * *

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এদেশের অধিকাংশ গৃহস্থের গৃহিণীরা চরকায় সূতা কাটিতেন এবং তদ্দ্বারা পরিবারস্থ সকলের বস্ত্র প্রস্তুত হইত। আমরা বালককালে পল্লীগ্রামের অনেক বৃদ্ধাকে চরকায় সূতা কাটিতে দেখিয়াছি। কিন্তু এই চরকা এখনকার যুবকদিগের এক প্রকার অবিদিত। ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রসাদে দেশ হইতে চরকা কাটা উঠিয়া গিয়াছে বটে, তথাপি চরকার অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। এখন চরকা রমণীর হস্তস্পর্শ সুখ পরিত্যাগ করিয়া কলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কোন দেশে কত চরকা এবং কত তাঁত কলে চলিতেছে, সম্প্রতি তাহার একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

	চরকা।	তাঁত।
গ্রেটব্রিটন	৪৯,১২৭,১০৭	৭১৯,৩৮৯
ইউনাইটেটষ্টেটস্ উত্তর	১৪,৫০০,৩০০	৩৩৫,০০০
ঐ দক্ষিণ	৬,৭১৪,০০০	১৫৩,০০০
জর্ম্মণি	৮,৪৩৪,০০০	২১২,০০০
ফ্রান্স	৬,১৫০,০০০	১০৬,০০০
রুসিয়া	৬,০০০,০০০	১৪৬,০০০
ভারতবর্ষ	৫,০০০,০০০	৪৩,০০০
অষ্ট্রিয়া	৩,২৫০,০০০	১১০,০০০
স্পেন	২,৬১৪,০০০	৬৮,০০০
ইতালী	২,৪৩৫,০০০	১১০,০০০
সুইজারল্যাণ্ড	১,৫৫৮,০০০	১৫,৫০০

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে ভারত সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। উচ্চে উঠিতে হইলে বহু চেষ্টা ও বহু যত্নের প্রয়োজন।

* * *

বিগত ১৯০২।৩ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে নিম্ন লিখিত পরিমাণ গম ও ময়দা রপ্তানি হইয়াছে :—

		গম		ময়দা	
কলিকাতা হইতে		১০,৫২,৯৭৮	হন্দর	৬০,৮৫৯	হন্দর
বোম্বাই	,,	৩৯০,৭৪৮	,,	৫৫৩,০২৪	,,
করাচী	,,	৮,৮৪৮,২৩৪	,,	৯৩,১৮৬	,,
মান্দ্রাজ	,,	৮১	,,	৩	,,
ব্রহ্মদেশ	,,	১০৯	,,	৩	,,

এই সমস্ত গম ও ময়দা নিম্নলিখিত দেশে নিম্নলিখিত পরিমাণ রপ্তানি হইয়াছে :—

গম		হাজার হন্দর			হাজার হন্দর
ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে		৬৬৮৩	অন্যান্য দেশে গম		১৯
			পূর্ব্ব আফ্রিকা ময়দা		৮৮
বেলজিয়মে	,,	৮৭৮	মিসর	,,	৭
ফ্রান্স	,,	২৩	মরীচদ্বীপ	,,	১১২
মিসর	,,	২৩৪৬	পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা	,,	৮
এডেন	,,	১৭			
আরব	,,	১৭০	এডেন	,,	১৫০
হংকং	,,	১৯	আরব	,,	১৩৬
পারস্য	,,	৯৩	সিংহল	,,	১১৪
তুরস্ক	,,	১৮	পারস্য	,,	৮২
অষ্ট্রেলিয়া	,,	২৫	অন্যান্য দেশে	,,	১৯

* * *

নকল নীল আসল নীলকে কিরূপ পরাস্ত করিয়াছে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রকাশ করিলাম :—

	আবাদ একর	ফসল হন্দর	রপ্তানি হন্দর
১৮৯৯ সালে	১০,২৬,৯০০	১,১১,৮৯০	১,১১,৪২০
১৯০০ ,,	৯৯০,৩৭৫	১,৪,৮০২৯	১,০২,৪৯১
১৯০১ ,,	৮০০,৬৯৭	১,২১,৪৭৫	৮৯,৭৫০

এই সঙ্গে আবার নীলের দামও কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং নীলকরকে নূতন ক্ষেত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

* * *

কেহ কেহ বলেন নীলের চিরদিন এ দুর্দ্দশা থাকিবেনা, আসলকে নকল কোণঠেসা করিয়া রাখিতে পারিবে না। সম্প্রতি বিলাতের ব্রাডফোর্ড নগরে জে, এফ, স্মিথ সাহেব এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি আসল অপেক্ষা নকল নীল গুণে কত হীন তাহা বিশেষ রূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে সম্প্রতি বিলাতী দুই দল মহাজনের মধ্যে নকল নীল ও আসল নীল সম্বন্ধে বাজি হইয়াছিল। ইহাতে প্রকাশ হয় যে আসল নীলে শতকরা ৬০ ভাগ খাঁটী রং ও নকল নীলের পুরা মাত্রা রং দিয়া দুইটা জিনিষ রঞ্জিত হয়। তাহাতে আসলের রং যেমন খোলতাই গাঢ় ও পাকা হইয়াছে নকলে তেমন হয় নাই। এই ঘটনায় অনেকে দুইটী নীলেরই বিশেষ পরীক্ষা করিতেছেন এবং নকল নীল সস্তা হইলেও যে মালে খারাপ সেটা বুঝিতেছেন। নীলকরদিগের পক্ষে ইহা সুসংবাদ।

* * *

বিদেশ হইতে যে পরিমাণ চিনি ভারতে আমদানী হয় আমরা যদি সেই পরিমাণ চিনি এদেশে উৎপন্ন করিয়া কাটাইতে পারি, তাহা হইলে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত লাভ হয়, অপরদিকে দেশের ধন রক্ষাওহয়। উন্নত প্রণালীতে এই চিনির কারবার করিতে পারিলে কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহা আমরা দেখাইতেছি। নীলের কারবার মন্দা হওয়াতে, নীলের স্থানে ইক্ষু রোপণ করিবার জন্য বিলাতে Indian Development Limited নামে একটী যৌথ কোম্পানি স্থাপিত হয়। প্রায় চারি বৎসর হইল এই কোম্পানির প্রতিনিধিরা বিহারে আসিয়া ইক্ষুর আবাদ করেন। ইহাঁদিগের সদর কাছারী মজঃফরপুরে। এই আবাদে আক মাড়িবার ও চিনী তৈয়ার করিবার নূতন রকম কল সকল আমদানী হইয়াছে। ১৯০১ সালে ইহাঁরা যে চিনি তৈয়ার করেন তাহা বিদেশী চিনির মত ঠিক না হওয়ায় তাঁহারা তাহার বিক্রয় বন্ধ করেন। পর বৎসরে ভাল চিনি তৈয়ার করিয়া পূর্ব্ব বৎসরের চিনির সহিত মিশাইলেন, তাহাতে দেখিলেন রং সম্বন্ধে কোন ইতর বিশেষ হইল না। তাহার পর ঐ চিনি লইয়া দেশের নানা স্থানে লোক পাঠাইলেন। এখানে দুমণ, সেখানে চারিমণ, এইরূপ করিয়া নানা স্থানের বাজারে মাল দিলেন। খরিদদারেরা চিনি পসন্দ করিয়াছে, গতবৎসরে কোম্পানি যথেষ্ট চিনি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমন কি গতবৎসরে সকল খরিদদারকে মাল যোগাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কোম্পানির অধ্যক্ষেরা বলিতেছেন এখন প্রচুর পরিমাণে চিনি তৈয়ার করিতে পারিলে তাঁহারা বিদেশী চিনিকে দেশ হইতে বিদায় করিতে পারেন। আমাদের দেশের ধনীরা কি এই কারবারে মন দিতে পারেন না।

মহুয়া সম্বন্ধে গতবারের কমলাতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকেই বিহার অঞ্চলে ও সাঁওতাল পরগণায় মহুয়ার গাছ দেখিয়াছেন। তথাকার অধিবাসীরা এই মহুয়ার ফুল খায় ও তাহা হইতে গোপনে মদ চোলাই করে। এজন্য যে পরিমাণ মহুয়া জন্মায় তাহার তত রপ্তানি হয় না। বরদার গাইকবাড় তাঁহার রাজ্যের কতকগুলি ফসল বিলাতে পাঠাইয়াছেন, উদ্দেশ্য দেশের ব্যবসার বিস্তার। তিনি সেই সঙ্গে মহুয়াও পাঠাইয়াছেন। বিলাতের লোকেরা বলিতেছেন ইহা গো মহিষাদির পক্ষে বড় প্রয়োজনীয় খাদ্য। অনেক দিন পূর্ব্বে একবার ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে উহা গো মহিষাদির খাদ্যের ও চোলাই করিবার উপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত উহা কেহ বিলাতে রপ্তানি করিতে উদ্যোগী হন নাই।

* * *

১৪ বৎসর পূর্ব্বে সিবিলিয়ান লকার্ড একখানি বিলাতী মাসিক পত্রে লিখিয়াছিলেন:—"India would benefit greatly if Mahua flowers met with a demand in England. The vast forests of Mahua trees which now yield little profit to their owners, would soon become a source of wealth, and the collection of the Corollas would give work to thousands of poor people." অর্থাৎ বিলাতে যদি মহুয়ার কাটতি হয় তাহা হইলে ভারতের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। মহুয়ার যে সকল বিস্তীর্ণ জঙ্গল আছে বর্ত্তমানে তাহাতে তাহার মালিকের কিছুই লাভ হয় না, কিন্তু বিলাতে কাটতি হইলে উহা একটা ধনাগমের বিশেষ উপায় হইবে এবং অনেক দরিদ্র লোক মহুয়ার ফুল কুড়াইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে।

* * *

অতি অল্প মূলধনে এই মহুয়ার কারবার চলিতে পারে। যাঁহারা অল্প টাকায় কারবার করিতে চাহেন তাঁহারা এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে পারেন।

* * *

এদেশের শ্রমশিল্পের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে চারিজন ব্যক্তিকে স্থায়ী সভ্যরূপে নিযুক্ত করেন। তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশ করিলাম:—

Lieut-col. I Clibborn C.I.E., I.C.S., President.
C. A Radice I.C.S.
R. E. Enthoren I.C.S.
Rev. Toss Westcott M.A.
} Members.

* * *

এই স্থায়ী কমিটীর সহিত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী ভদ্রলোককে স্থানীয় সভ্যরূপে নিযুক্ত করা হয়। কমিটি তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন করেন। বোম্বাই মান্দ্রাজ উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে কতকগুলি দেশীয় ভদ্রলোককে স্থানীয় কমিটীর

সভারূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্গদেশে ও ব্রহ্মদেশে আমরা ইহার অন্যথা দেখিলাম। ব্রহ্মদেশের কথা জানি না, কিন্তু এই বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর মধ্যে কমিটীর সভ্য হইবার উপযুক্ত একজন ভদ্রলোকও কি গবর্ণমেণ্ট খুঁজিয়া পাইলেন না, অথবা তাহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই? এদেশে শ্রমজীবীদের কোন পঞ্চায়েৎ (guild) আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহা কিরূপ ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার জন্য কমিটি রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। রাজা প্যারীমোহন একজন প্রসিদ্ধ জমিদার এবং এদেশীয়গণ পরিচালিত একটী রেলওয়ের ডিরেক্টর। তাঁহাকে এই কমিটীর সভ্য নিযুক্ত করিলে যে কমিটী বিশেষরূপে উপকৃত হইতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * *

এই কমিটীর সর্ব্বসমেত দশটী অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতায় দুই দিন, আলাহাবাদে একদিন, লাহোরে দুইদিন, নাগপুরে একদিন, বোম্বাইয়ে দুইদিন, মাদ্রাজে একদিন ও রেঙ্গুণে একদিন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা প্রায় ২৬টী স্থানে শ্রম-শিল্প বিদ্যালয়, রেলওয়ে কারখানা এবং অন্যান্য কারখানা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের অনুসন্ধানে প্রকাশ যে শ্রমশিল্প ও অন্যবিধ ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ১২৩টী বিদ্যালয় আছে; তন্মধ্যে বঙ্গদেশে ২৮টি, উত্তর পশ্চিমে ১৩টী, পঞ্জাবে ১৫টী, মধ্য প্রদেশ ২০টী, বোম্বাইয়ে ২৮টী, ও মাদ্রাজে ১৯টী। এই সকল বিদ্যালয়ের কতকগুলিতে আমিন ও সব-ওভারসিয়ার প্রভৃতি কার্য্যে প্রবেশের জন্য জরীপাদিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, আর কতকগুলিতে সূত্রধরের কার্য্য, কামারের কার্য্য, গালিচা বয়ন, বস্ত্রাদি বয়ন, কাঁসা পিতল ঢালাই ও গড়ন ব্যবসা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

রিয়ার (RHEA) আঁশ।

রিয়া গাছের নাম অনেকেই শুনিয়াছে। এই গাছ ঠিক পাট বা শোনের গাছের মত এবং পাট ও শোনের মত ইহা হইতেও আঁশ বাহির হয় ও সেই আঁশে সূতা প্রস্তুত হয়। রিয়াতে যে সূতা প্রস্তুত হয় তাহার রং ঠিক রেসমের মত। পাটেরও রং অনেকটা রেসমের মত বটে, কিন্তু পাটের সূতা তাদৃশ শক্ত নহে এবং তত অধিক দিনও উহা টিকেনা। রুশিয়াতে এক রকম শোন উৎপন্ন হয় তাহাতে যে দড়ী প্রস্তুত হয় তাহা খুব শক্ত ও টেকসই, কিন্তু রিয়ার সূতা এই রুশিয়ার শোন অপেক্ষা দ্বিগুণ শক্ত ও টেকসই। বহুকাল হইতে চীন দেশে, মালয় উপদ্বীপে, সুমাত্রা যাভা প্রভৃতি স্থানে এই রিয়া গাছ আছে এবং তথাকার লোকেরা ইহার সূত্র হইতে দড়ী, মাছ ধরিবার জাল প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া থাকে। কেহ কেহ ইহা হইতে রেশমী কাপড়ের ন্যায় কাপড়ও বুনিয়া থাকে। এই রিয়ার আঁশ ও সূতা ঐ সকল দেশ হইতে বহু পরিমাণে ইংলণ্ডে ও অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশে চালান হইয়া থাকে এবং তথায় উহা বেশ দরে বিক্রয় হয়।

এই রিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে জঙ্গলের ন্যায় জন্মিয়া থাকে। আসাম, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ, কাংড়াপাহাড় ইত্যাদি অনেক স্থানে ইহা বিনা চেষ্টায় ও বিনা আবাদে জন্মিয়া থাকে। রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে ইহাকে কাংখুড়া গাছ বলে। কেহ কেহ বলেন এই কাংখুড়া ঠিক রিয়া নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই কাংখুড়ার আঁশ হইতে সূতা তৈয়ার করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ কাংখুড়া গাছ রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। উত্তর আসামে ব্রহ্মপুত্র নদকূলে এই গাছ যথেষ্ট জন্মায়, নিম্ন আসামেও এ গাছ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উত্তর আসামে উহা যত প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে তত নহে। গবর্ণমেণ্ট চীন প্রভৃতি দেশের গাছের সহিত এদেশজাত রিয়া গাছ মিলাইয়া দেখিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে চীনের গাছে ও এখানকার গাছে প্রভেদ বড় কিছুই নাই, তবে দেশভেদে যে কিছু পার্থক্য ঘটিবার সম্ভাবনা কেবল তাহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। চীনের গাছ এদেশের মাটীতে জন্মিতে পারে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তথা হইতে ঐ গাছ ও উহার বীজ আনাইয়া কলিকাতা, সাহারণপুর প্রভৃতি স্থানের বোটানিকাল গার্ডেনে রোপন ও বপন করিয়াছিলেন কিন্তু এই পরীক্ষার ফল আশাজনক হয় নাই। তথাপি গবর্ণমেণ্ট ভগ্নোদ্যম হন নাই, যাহাতে শোন ও পাটের মত এদেশে রিয়ারও চাষ হয় সে জন্য তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে এ দেশে কেহ কেহ ইহার আবাদ করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের সকল স্থানের মাটী ও জলবায়ু রিয়ার পক্ষে অনুকূল নহে। এ গাছ নরম ও সহে না, গরমও সহে না। অতিবৃষ্টি বা প্লাবনে ইহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, আবার প্রচণ্ড সূর্য্য

তেজেও উহা শুকাইয়া যায়। আসামের ন্যায় মিঠা আব হাওয়াতে ইহা ভালরূপ জন্মাইয়া থাকে। এইজন্য আসাম অঞ্চলেই ইহার চাষের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত ভারতের নানা স্থানে উহার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে আসামে যে বন রিয়া জন্মাইত তাহা হইতে সূত্র বাহির করিয়া তথাকার ডোম ও মৎস্যজীবী প্রভৃতি ইতর জাতিরা আপনাদিগের ব্যবহারের জন্য দড়ী করিত, জাল বুনিত, ইহা ব্যতীত উহা আর কোন ব্যবহারে লাগিত না। গবর্ণমেণ্ট যখন এই রিয়ার চাষে মনোযোগী হইলেন, তখন আসাম অঞ্চলের চা-কর সাহেবেরাও ইহার আবাদে মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ অল্প পরিশ্রমে চা উৎপন্ন করিয়া লাভ করেন, রিয়ার চাষে তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হয় দেখিয়া তাঁহারা নাকি কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহাতে রিয়ার আবাদ ভালরূপ হয়, সে জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি ১৮৬৯ সালে লর্ড মেয়ার শাসন কালে গবর্ণমেণ্ট প্রচার করেন যে, যে কেহ রিয়ার সূতা বাহির করিবার জন্য ভাল কল আবিষ্কার করিতে পারিবেন তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কার দিবেন। এই উদ্দেশে তাঁহারা পাঁচহাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। তদনুসারে ১৮৭২ সালে এই সূতা বাহির করিবার কলের একটা প্রদর্শনী হয়। কিন্তু কোন কলই সন্তোষজনক না হওয়াতে কেহই পুরস্কার পান নাই। তাহার পর আবার ১৮৭৯ সালে একটা প্রদর্শনী হয়। এবারে কেহ কেহ পুরস্কার পাইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কাহারও কলে সন্তোষজনক ফল লাভ হয় নাই। এই কলের গোলযোগেই রিয়ার ব্যবসায়ের প্রসার হইবে বলিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে আশা হইয়াছিল, তাহা হইল না। গবর্ণমেণ্টের এত উদ্যোগ কেন সফল হইল না তাহা বলিতেছি।

যে সময়ে রিয়ার ছাল ছাড়াইবার ও আঁস বাহির করিবার জন্য এদেশে নব আবিষ্কৃত কল সকল আমদানী হইতে লাগিল, সে সময়ে দেশে রীতিমত কল চালাইবার উপযোগী রিয়া আদৌ উৎপন্ন হয় নাই; এজন্য যাঁহারা কল আনাইয়াছিলেন তাঁহাদের ব্যয় অধিক হইতে লাগিল, সুতরাং কারবারে লোকসান পড়িল। ইহাতে অপর সাধারণে বুঝিল যে রিয়ার ব্যবসায় তাদৃশ লাভজনক নহে, কাজেই প্রথমে যেমন লোকে আগ্রহের সহিত ইহার আবাদে অগ্রসর হইয়াছিল তাহার অন্যথা ঘটিল। এই কারণেই এক্ষণে এই রিয়ার আবাদের দিকে আর কাহাকেও তাদৃশ মনোযোগী দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রিয়ার আবাদ অ-লাভজনক নহে। একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এ সম্বন্ধে Indian Agriculturist পত্রে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা পাঠকদিগকে বিদিত করিতেছি। ইহা পাঠ করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তিনি যে প্রণালীতে রিয়া প্রস্তুত করিতে বলেন, সে রূপ করিলে ইহাতে ক্ষতি না হইয়া বরং যথেষ্ট লাভ হইবে। এই লেখকের নাম রাজা বর্ম্মা, ইনি এক্ষণে বিলাতে শিল্প কার্য্যে শিক্ষালাভ করিতেছেন। তাঁহার ঠিকানা No 3 Northumberland Avenue, London. যাঁহারা এই রিয়ার ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে পত্র লিখিলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন চীনের রিয়া বিলাতের বাজারে যেমন দরে বিক্রয় হয় ভারতের রিয়া তেমন দরে বিক্রয় হয় না। রাজা বর্ম্মা মহাশয় বলেন একথা ঠিক নহে। তিনি বলেন চীনের রিয়া যে প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া বিলাতের বাজারে প্রেরিত হয়, ভারতে যদি সেই প্রণালীতে রিয়া তৈয়ার হয় তাহা হইলে উহাও ঠিক সেইরূপ দরে বিক্রয় হইতে পারিবে। কি চীন কি পশ্চিম আফ্রিকা, কি আরজেণ্টাইন বা মালয় উপদ্বীপ সর্ব্বত্রই হস্তদ্বারা রিয়ার আঁস বাহির করা হইয়া থাকে, কুত্রাপি কলের সাহায্য লওয়া হয় না। এই হাতে ছাড়ান রিয়ার আঁস, ভারতের কলে ছাড়ান রিয়ার আঁস অপেক্ষা দেখিতেও ভাল এবং উহাতে ভাল সূতাও বাহির হয়; রাজা বর্ম্মা মহাশয় তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এই জন্য তিনি বলেন ভারতের রিয়া আবাদীরা যদি এ বিষয়ে তাহাদিগের প্রতিবাসী চীনদিগের অনুকরণ করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন।

চীনেরা রিয়ার গাছ কাটিয়া তাহার পাতা গুলি ছিঁড়িয়া ফেলে ও গাছের গায়ে যে ছোট ডাল গুলি হয় তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহার পর উহার ছালটী ছাড়াইয়া ফেলে। ছাল ছাড়ান হইলেই ডাঁটার গায়ে চিক্কন সূত্রময় আর একটী আবরণ বাহির হয়। উহাই রিয়ার আঁশ। ছাল ছাড়ান হইলে, গাছগুলি লইয়া ছোট ছোট আটী বাঁধা হয় এবং সেই গুলিকে একটী ফাঁকা জায়গায় রাখা হয়। সে জায়গাটী এরূপ হওয়া চাই, যেন ঐ আটী গুলি সমান রূপে রৌদ্র ও শিশির পায়। কিছুদিন এইরূপে রাখিলে পর আঁশ গুলিকে সহজেই ডাঁটা বা পাকাটী হইতে ছাড়াইতে পারা যায়। এই আঁশ অতিশয় চটচটে ও আঠা-যুক্ত, আঁশ হইতে ঐ আঠা বাহির করা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব যখন এই আঁসগুলি ছাড়ান হইবে, তখন উহাকে খুব জোরে নিংড়াইতে হইবে। এই নিংড়ান কাজটা কিছু কষ্টকর, উহাতে অঙ্গুলিতে বড় আঘাত লাগে। এজন্য দরজীরা সেলাই করিবার সময় যেমন আংস্তা (Thimble) আঙ্গুলে দেয়, সেইরূপ আংস্তা পরিয়া নিংড়াইতে হইবে। ইহার পরে গরম জল করিয়া তাহাতে আঁসগুলি কাচিতে বা ধুইতে হইবে এবং বাঁশ বা দড়ীর আনলায় ঝুলাইয়া শুকাইতে হইবে। রিয়া গাছ কাঁচা থাকিতে থাকিতে যদি এইরূপ প্রণালীতে আঁস বাহির করা হয় এবং আঠা আঁসেতে শুকাইয়া না যায় এবং তাহার দাগ না লাগে, তাহা হইলে উহার রং ঠিক রেসমের মত চিক্কন থাকে এবং দেখিতে বেশ থাকে সুতরাং উহা ভাল দরে বিক্রয় হয়। রিয়ার আঠা লাগিয়া থাকিলে আঁস শক্ত ও চটচটে হয় তাহা হইলে উহা তেমন ভাল দরেও বিক্রয় হয় না। এই আঁস হইতে যে আঠা বাহির হয় তাহাও নষ্ট হয় না, উহাও বিক্রয় হইয়া থাকে।

রাজা বর্ম্মা মহাশয় রিয়ার আঁস বাহির করিবার যে প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন তাহা সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য। আমাদিগের মনে হয় গবর্ণমেণ্ট যদি আঁস ছাড়াইবার কল আবিষ্কার জন্য অর্থব্যয় না করিয়া প্রথম রিয়ার আবাদ যাহাতে হয় তাহার জন্য দেশের লোককে উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং উল্লিখিত প্রথায় আঁশ বাহির করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতেন তাহা হইলে এতদিন এই রিয়ার চাষের বেশ উন্নতি হইত। কিন্তু এখনও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। রাজা বর্ম্মা মহাশয় বলেন যে বিলাতের যে সকল কলওয়ালা রিয়া ব্যবহার করিতেছেন, ভারতবর্ষ হইতে সেইরূপ হাতে বাহির করা আঁস লইতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। No 17 Southampton Row London, এই ঠিকানায় Bunbeg Mills নামে একটী কল আছে। তাঁহারা অনেক রিয়া লইয়া থাকেন। যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া এ বিষয়ে বন্দোবস্ত করিতে পারেন। শুনিতেছি আসামের কোন কোন চা-কর সাহেবের সহিত এ বিষয়ে তাঁহাদিগের পত্র লেখালেখী চলিতেছে। আমাদিগের ইচ্ছা যে আমাদিগের দেশবাসীগণ এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া দেখেন। আজকাল পাট অপেক্ষাও রিয়ার যথেষ্ট আদর, কেননা উহা রেশম বা পশম উভয়ের সহিত অনেক পরিমাণে মিশ খায়। উহাতে রুমাল ছাতির কাপড়, আরও অনেক রকম কাপড় তৈয়ার হইতেছে। রিয়ার সূত্রে প্রস্তুত করা কাপড় রেশমের মত দেখিতে অথচ তাহা অপেক্ষা সস্তা; আবার কার্পাসসূত্রের বস্ত্র অপেক্ষা উহা টেকসই; এই কারণেই ইহার আদর বাড়িতেছে। উপরি উল্লিখিত কল ব্যতীত বিলাতে আরও অনেক কলে রিয়া সূত্রে বস্ত্র বয়ন হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই চীনের ও সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের রিয়াতে কাজ হইতেছে। এক টন রিয়া প্রায় ৮০০ টাকায় বিক্রয় হয়, কিন্তু বিলাতে পৌঁছিলে উহার ৭০০ টাকার অধিক পড়তা হয় না; সুতরাং রাজা বর্ম্মা মহাশয় যেরূপ বলিতেছেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

ফলের ব্যবসা।

এ দেশের নানা স্থানে নানাবিধ সুস্বাদু ফল জন্মিয়া থাকে। ভারতের আম, আতা, আনারস নওরঙ্গী, কমলা, লিচু, নাসপাতী, সেউ, তরমুজ, খরমুজা প্রভৃতির আস্বাদে য়ুরোপীয়দিগের রসনা-

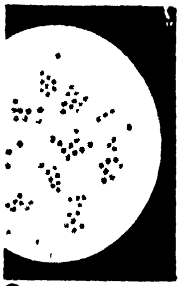
তেও রস নির্গত হয়। আমাদিগের মনে আছে স্যার রোপার লেথব্রিজ যখন হুগলী কালেজের অধ্যাপক ছিলেন, তখন তিনি আনারস খাইয়া এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি আনারসের পরিবর্ত্তে উহার "নানারস" করিয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস যদি কোন ধনী ভারতের এই সকল ফল য়ুরোপে রপ্তানি করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি লাভবান হইতে পারেন।

কিরূপে এ দেশের তাজা ফল বিদেশে পাঠান যাইতে পারে একটু অনুসন্ধান ও চেষ্টা করিলে তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। পঞ্জাব প্রদেশে ও কাশ্মীর উপত্যকায় প্রচুর সেউ বা Apple জন্মায়। কিন্তু রেলওয়ে ছিল না বলিয়া পূর্ব্বে এই ফল আমাদিগের বাঙ্গালা দেশে কেহ দেখিতে পাইত না। অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই "আপেল" মার্কিন দেশ হইতে বরফের জাহাজে এদেশে আমদানী হইত। কলে বরফ তৈয়ার আরম্ভ হওয়াতে মার্কিন হইতে বরফের জাহাজ আসা বন্ধ হয়, সেই অবধি আর আমেরিকার তাজা আপেল এদেশে আসে না। অষ্ট্রেলিয়ার তাজা আঙ্গুর কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজারে বিক্রয় হয় ইহা বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। এই বাজারে রাশি রাশি সিঙ্গাপুরের আনারস ও চীনের পানিফল কেশুর দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বিদেশ হইতে এইরূপ তাজা ফল এদেশে আমদানী হইতে পারে, তবে এদেশের ফল কেনই বা বিদেশে রপ্তানি করিতে পারা না যাইবে।

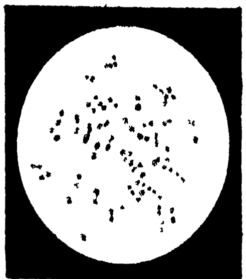
আমাদিগের স্মরণ হইতেছে বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত জামসেটজী টাটা সাহেব একবার এ দেশের আম ও কমলা লেবু য়ুরোপে রপ্তানি করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কতদূর কি করিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি। অনেকের ধারণা এদেশের ফলাদি বিদেশে রপ্তানি হইলে দেশের লোক খাইতে পাইবে না। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সংস্কার। কাবুল হইতে এদেশে এবং অন্য দেশে যে এত মেওয়া চালান হয়, তাহাতে কি কাবুলের লোক মেওয়া খাইতে পায় না? মেওয়া কি সেখানে মহার্ঘ্য? যাঁহারা কাবুলে বা পঞ্জাবে গিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেখানে আঙ্গুর, বেদানা, পেস্তা বা কিসমিস কিরূপ সুলভ। শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতার বাজারে যেরূপ কমলা লেবু কলিকাতায় আইসে তাহাতে মনে হয় বুঝি সে দেশে আর কমলা লেবু নাই, সত্যই কি তাই? যে সামগ্রীর কাটতি যত বৃদ্ধি হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহা উৎপাদন করিবার চেষ্টা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। প্রয়োজনানুরূপ সকল দ্রব্যেরই সরবরাহ হইয়া থাকে, ইহা একটী স্বাভাবিক নিয়ম। কাটতির অভাবে লোকে অনেক সামগ্রী ফেলিয়া ছড়াইয়া খাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেটা সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধাজনক হইলেও সাধারণের পক্ষে লাভজনক নহে। যে দেশে কোন সামগ্রীরই অপচয় হয় না সেই দেশেই লক্ষ্মী বিরাজ করেন। য়ুরোপ ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল।

ব্যাকটিরিয়া বা উদ্ভিদণু।

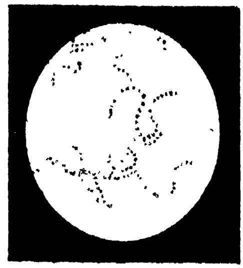
চিত্র নং ১



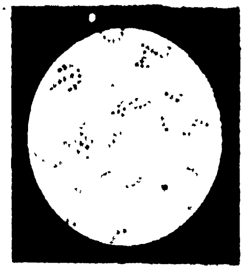
চিত্র নং ২



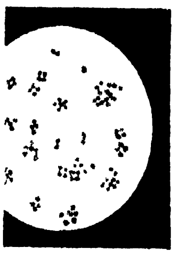
চিত্র নং ৩



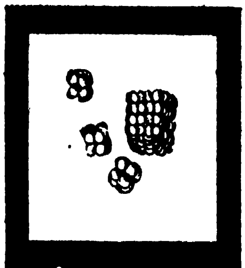
চিত্র নং ৪



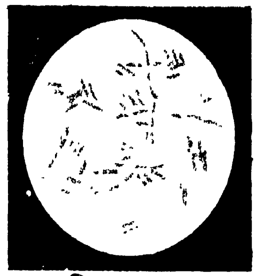
চিত্র নং ৫



চিত্র নং ৬



চিত্র নং ৭



চিত্র নং ৮



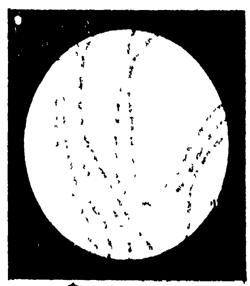
চিত্র নং ৯



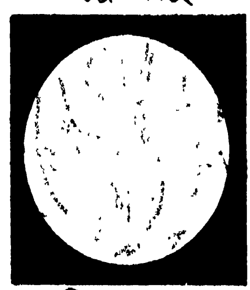
চিত্র নং ১০



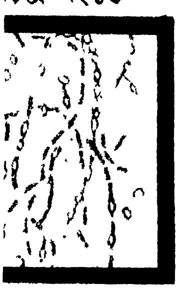
চিত্র নং ১১



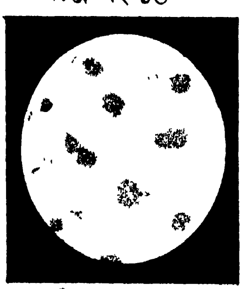
চিত্র নং ১২



চিত্র নং ১৩



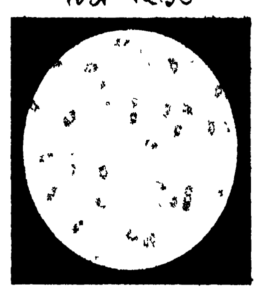
চিত্র নং ১৪



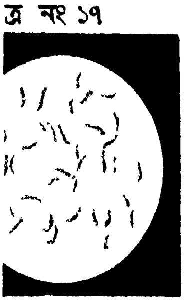
চিত্র নং ১৫



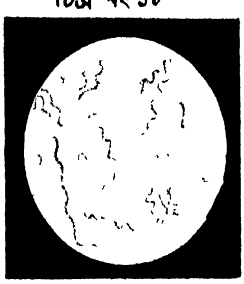
চিত্র নং ১৬



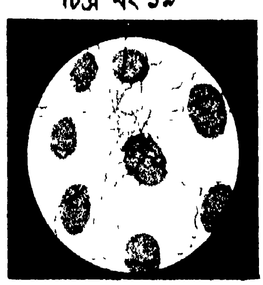
চিত্র নং ১৭



চিত্র নং ১৮



চিত্র নং ১৯



চিত্র নং ২০



"ব্যাকটিরিয়া" BACTERIA বা "উদ্ভিদণু"।

এই পত্রের সম্মুখে বিভিন্ন জাতীয় ব্যাকটিরিয়ার কয়েকটি চিত্র দেওয়া গেল, কোন্‌টি কি তাহার পরিচয় এস্থলে দেওয়া যাইতেছে :—

মাইক্রোকক্কাই শ্রেণী।

চিত্র নং ১ ... পূযের মাইক্রোকক্কাই।
২।৩ ... ... ষ্ট্রেপটোকক্কাই।
৪ স্যাতুড় জ্বর (Puerperal fever)।
৫ মাইক্রোকক্কাই বিভক্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে।
৬ ... ... সারসিনি।

বেসিলাই শ্রেণী।

চিত্র নং ৭ ... ... টাইফএড জ্বর।
৮ টাইফএড বেসিলাই—ফ্লাজিলা যুক্ত।
৯ ... সবুজবর্ণ পূযের বেসিলাই।
১০ ... প্রোটিয়াশ ভালগেরিস্।
১১ ... ... এন্থ্রাক্স।
১২।১৩ ... ... ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি।
১৪ ... ... ক্ষয়কাশ ব্যাধি।
১৫ ... ... কুষ্ঠ ব্যাধি।
১৬ ... ... প্লেগ ব্যাধি।
১৭,১৮ ... ... ওলাউঠা ব্যাধি।
১৯ ... Relapsing fever।
২০ ... ... নিউমোনিয়া জ্বর।

জীবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে নিম্ন স্তরস্থ জীব সকল "অবস্থা" ও "অভাবের" বশবর্ত্তী হইয়া যুগযুগান্তরে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান উচ্চশ্রেণী জীবে পরিণত হইয়াছে, এবং কালে যে আরও উন্নতি লাভ করিয়া অন্য কোন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা সম্ভাবিত বলিয়া বোধ করা যাইতে পারে। মহামতি ডারউইন সাহেব জীবগণের এই ক্রমোন্নতি বিকাশ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া আধুনিক বিজ্ঞান জগতে জীবতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। যদিও আমরা এই বিষয় শিক্ষার জন্য পাশ্চাত্য জগতের নিকট ঋণী, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রাদি স্থির চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরাতন হিন্দু শাস্ত্রেও এই কথা অন্য ভাবে বিবৃত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে "আত্মা" কর্ম্মফল অনুসারে বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ইহ সংসারে যাতায়াত করে, এবং

কর্ম্মফল ভাল হইলে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া পরমাত্মায় মিলিত হয়—আত্মা দেহিরূপে এই সংসারে অবস্থান করে এবং "কর্ম্মফল" অবস্থা ও অভাবের বশবর্ত্তী। অতএব হিন্দুশাস্ত্রলিখিত মত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত মত, উভয়ের মধ্যে যে এক সামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার আমাদের দৃষ্টি শক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া জীবতত্ত্ব আলোচনা বিষয়ে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। জগতে পরিদৃশ্যমান বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব ব্যতীত অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আমরা অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী দেখিতে পাই—ইহারা যে কি প্রকারে জীবন লীলা অতিবাহিত করিতেছে, জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু দ্বারা ইহ সংসারের যে কি উপকার বা অপকার সাধন করিতেছে—তদালোচনা বিষয়ে আমরা কতক পরিমাণে সক্ষম হইয়াছি।

উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী ও উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ্ এতদুভয়ের পার্থক্য কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না, কিন্তু যতই আমরা উহাদিগের নিম্ন স্তরে আসিয়া উপস্থিত হই এবং তাহাদের পার্থক্যের বিষয়গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখি ততই আমরা তাহাদের পার্থক্যের অভাব অনুভব করিতে থাকি এবং অবশেষে আমরা এটী প্রাণী কি উদ্ভিদ, বা উদ্ভিদ কি প্রাণী এই বিষম সমস্যায় পতিত হই। পূর্ব্বোল্লিখিত অণুবীক্ষণীয় জীবধর্ম্মসম্পন্ন ক্ষুদ্রাণু সকল প্রাণী জগতের অন্তর্গত, কি উদ্ভিদ জগতের অন্তর্গত—ইহা লইয়া পণ্ডিতগণ মধ্যে অনেক বাকৃবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এই প্রস্তাবে এতদুভয়ের মীমাংসা আমাদের আলোচ্য বিষয় না হইলেও ইহাদের পার্থক্য সম্বন্ধে দুই একটী প্রধান লক্ষণ উল্লেখ করা এস্থলে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

সাধারণতঃ প্রাণীজগতে আহারীয় দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া দেহাভ্যন্তরে নীত হয়, তথায় পরিপাক কার্য্য সাধিত হইয়া জীবনোপযোগী রসে পরিণত হইয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে এবং অবশিষ্ট অনাবশ্যকীয় আবর্জ্জনা দেহাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উদ্ভিদ্ জগতে এইরূপ কোন প্রক্রিয়া হইতে দেখা যায় না, তাহাদের "সেল" বা কোষ গুলি বহিস্থ আবরণ মধ্য দিয়া অন্তর্ব্বাহ বা "অস্‌মোসিস্" ক্রিয়া বলে আহারীয় সামগ্রী শোষণ করিতে সক্ষম হয়—এইরূপে তাহারা জীবন রক্ষা করিয়া থাকে, অধিকন্তু ইহারা এমোনিয়া লবণ হইতে "নাইট্রোজেন" নামক পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া আপনাদের দেহের পুষ্টিসাধনোপযোগী পদার্থ লইতে সক্ষম হয়; কিন্তু প্রাণী জগতে "সেল" বা কোষ গুলি এই রূপে বিশ্লেষণ কার্য্য করিতে পারে না, তাহারা এই সকল লবণ অবিকৃত রূপে আপনাদের দেহাভ্যন্তরে লইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ এইরূপে প্রাণী ও উদ্ভিদগণের বিভিন্ন কার্য্যকারিতা দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, যে উল্লিখিত জীবধর্ম্মসম্পন্ন ক্ষুদ্রাণু সকল উদ্ভিদ্ জগতের অতীব নিম্নস্তর শ্রেণীভুক্ত। নিম্নস্তর উদ্ভিদশ্রেণী আবার "এল্‌জি" (Algæ) ও "ফঙ্গাই" (Fungi) শ্রেণীতে বিভক্ত। অন্যান্য গুণ ধর্ম্ম ও "ক্লোরোফিল" (Chlorohpyl) নামক সবুজ বর্ণ পদার্থ যে সকল নিম্নস্তর উদ্ভিদে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে "এল্‌জি" কহে, এবং "ক্লোরোফিল" পদার্থ যে সকল নিম্নস্তর উদ্ভিদে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহাদিগকে "ফঙ্গাই" বলে। শেষোক্ত লক্ষণ হেতু পণ্ডিতগণ এই প্রস্তাবের আলোচ্য জীবাণুগণকে "ফঙ্গাই" শ্রেণী ভুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

জড় পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যেরূপ পরমাণু-নামে অভিহিত, জৈব পদার্থনিচয়ের ক্ষুদ্রতম অংশ সেইরূপ "Cell" বা কোষ নামে অভিহিত। একটী বৃক্ষ পত্রকে ক্রমান্বয়ে টুকরা টুকরা করিয়া কর্ত্তন কর, তৎপরে ঐ সকল টুকরাকে পেষণ করিয়া যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্রায়তন কর, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাইবে যে ইহার সর্ব্বক্ষুদ্রাংশটুকুও কতক গুলি মণ্ডলাকার "সেল" Cell বা কোষ দ্বারা সংগঠিত। এই "সেল"এর গঠন ডিম্বের ন্যায়, এজন্য তাহাদিগকে কোষ নামে অভিহিত করা সঙ্গত। প্রত্যেক কোষ জীবধর্ম্মাক্রান্ত। এই সকল "সেল" ও তন্মধ্যস্থ আঠাবৎ তরল পদার্থ (যাহাকে "প্রোটোপ্লাজম" Protoplasm কহে) দেহি মাত্রের গঠনের প্রধান প্রথম উপাদান, অর্থাৎ এই সকল "সেল" নানা প্রকারে স্বাভাবিক নিয়মে সংগঠিত হইয়া, উদ্ভিদ্ জগতেই বল, আর প্রাণী জগতেই বল, সকল প্রকার পদার্থের উৎপাদন

করিয়াছে; অর্থাৎ সকল প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জীবদেহ অসংখ্য Cell বা কোষের সমষ্টি মাত্র। অবস্থা ও অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ সমস্ত "সেল" নানা গুণ ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে—এই হেতু আমরা "সেল" সমূহের কার্য্য সকল এত বিভিন্ন ভাবাপন্ন দেখিতে পাই। একই "সেল" হইতে উৎপন্ন মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাহ্য জ্ঞান প্রতিফলিত হইয়া থাকে; আমরা চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতেছি, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতেছি, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ অনুভব করিতেছি; এমন কি অন্ত্র নিচয়ের "সেল" দ্বারা আমরা বিভিন্ন আহারীয় দ্রব্য হইতে আমাদের দৈহিক উপাদান সকল পৃথক করিয়া সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছি।

উচ্চশ্রেণীর প্রাণীজগতে বা উদ্ভিদজগতে "সেল" সকল পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া কার্য্য করে; কিন্তু নিম্নস্তর শ্রেণীতে উহারা প্রত্যেকেই সকল প্রকার কার্য্য সমাধান করিয়া থাকে।

জীবদেহের উপাদানীভূত Cell বা কোষ ব্যতীত জগতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব বর্ত্তমান আছে। ইতি পূর্ব্বে যে সকল ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবের কথা বলিয়াছি, তাহারা এক একটি "সেল" এবং তাহারা প্রত্যেকেই আপন আপন জীবনের সকল কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে; এক "সেলে" জীবন যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী সকল ধর্ম্মই নিহিত আছে। এই সকল আণুবীক্ষনিক "সেল"কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Bacteria ব্যাকটিরিয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বিগত বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা এই সকল ব্যাকটিরিয়াগণের ক্রিয়া কলাপ বিশদরূপে আলোচনা করিয়া ইহ জগতের অনেক দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য বিষয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কি কারণে রোগশূন্য আনন্দময় শান্তিরাজ্যে ভীষণ প্রাণী-সংহারক মহামারী হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া প্রবল বাত্যাপ্রচালিত জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া প্রাণীজগতকে একেবারে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, কি কারণেই বা আমাদের বহু কষ্ট ও পরিশ্রমলব্ধ আহার্য্য সকল পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত ও অব্যবহার্য্য হইয়া যায়, কি কারণেই বা উর্ব্বরা শ্যামলা শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা অনুর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত হয়, এই সকল বিষয় উপলব্ধি করিতে তাঁহারা কতক পরিমাণে সমর্থ হইয়াছেন; এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সকলের প্রতিবিধান করিতে পারা যায় তাহাও কতক পরিমাণে জ্ঞাত হইয়া তন্নিবারণে সফল-প্রযত্ন হইয়াছেন। অসীম অধ্যবসায় ও বহুল অনুসন্ধানের পর পণ্ডিতগণ ইহা স্থির করিয়াছেন যে কতকগুলি "রোগ" ও "ব্যাকটিরিয়া" কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সংগ্রথিত—প্লেগ, ওলাউঠা ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠব্যাধি, ডিপথিরিয়া, টাইফএড জ্বর, ধনুষ্টঙ্কার, ও অন্যান্য রোগ সমূহের ব্যাকটিরিয়াগণই কারণ (চিত্র দেখুন)। অতএব পাঠক এক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্যাকটিরিয়াগণদ্বারা জগতের কি ভয়ানক অপরিশোধনীয় অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে ও হইতেছে; বৎসর বৎসর যে কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিলে দেহ অবসন্ন ও হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। বঙ্গদেশে কয়েক বৎসরের ওলাউঠা রোগের মৃত্যুতালিকা দেখিলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।—

			মৃত্যুসংখ্যা।
১৮৯৫ সালে	...	...	১৭৭০৮৭
১৮৯৬ ...	...	...	২২৬৮২৪
১৮৯৭ ...	...	...	১৯৬২৪৭
১৮৯৮ ...	...	..	৬৫০২০
১৮৯৯ ...	..	...	১০৭৬৭৮
১৯০০ ...	...	...	৩৪৫৮৭৮
১৯০১ ...	...	...	১১০৭৫৩
১৯০২ ...	...	...	১৫০৯৭১

পরম করুণাময় জগৎপিতা জগদীশ্বর কোন্ উদ্দেশে এই সকল ক্ষুদ্রাণু-ক্ষুদ্র ব্যাকটিরিয়ানিচয়ে এরূপ প্রবল শক্তি নিহিত করিয়াছেন, কেনই বা তাহাদিগকে চক্ষুরন্তরালে রাখিয়া প্রাণীনাশকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত। হতাশ মনুষ্য তাই হতাশ ভাবে বলিয়া থাকে "তন্তবতু যদ্ বিধের্মনষি স্থিতম্"।

পরীক্ষা দ্বারা যতদুর জানা গিয়াছে তাহাতে অল্প সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া এই রূপ প্রাণী সংহার কার্য্যে নিয়োজিত বলিয়া উপলব্ধি হয়, কিন্তু অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া নিরীহ; কারণ তাহাদের দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট সাধন হইতে দেখা যায় না, বরং

ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে বহুতর সহায়তা করিয়া থাকে। এই সকল ব্যাকটিরিয়াগণের আকৃতি ও প্রকৃতির বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া তৎপরে তাহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় বিবৃত করিলে উহা সহজে বোধগম্য হইবে।

দুগ্ধ বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য যদি আমরা দিবারাত্রকাল অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিই এবং তৎপরে তাহা হইতে একবিন্দু লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করি, তাহা হইলে সেই বিন্দুমাত্র দ্রব্যে, কত যে লক্ষ লক্ষ জীব ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাই তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহাদের মধ্যে কেহ বা দেখিতে (১) ক্ষুদ্র গোলাকৃতি (Micrococci), কেহ বা ডিম্বাকৃতি (২), কেহ বা দণ্ডাকৃতি, (Bacilli) কেহ বা (৩) সূত্রবৎ বা সূক্ষ্ম গুল্মতন্তুবৎ (Spirilli)। প্রধানতঃ এই কয় প্রকারের ব্যাকটিরিয়া আমরা দেখিতে পাই (চিত্র দেখুন)। মাইক্রোককাইগণ আকারে দেখিতে একই প্রকার হইলেও ইহারা নানা প্রকার গুণ ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ এক প্রকার মাইক্রোককাই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কারণ, অন্য এক প্রকার মাইক্রোককাই হাম, মিলমিলার কারণ ইত্যাদি। ব্যাসিলাই সম্বন্ধেও এইরূপ। অর্থাৎ গুণ ধর্ম্মানুসারে মাইক্রোককাই ও ব্যাসিলাইগণ মধ্যে অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহারা প্রত্যেকে এক একটী "সেল"। মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম্ একটী সূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। গোলাকৃতি ব্যাকটিরিয়াগণ (micrococci) এত ক্ষুদ্র যে তাহাদের পঁচিশ সহস্র একত্র সারি সারি সাজাইলে এক ইঞ্চি মাত্র স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হয়। "বেসিলাইগণ" দৈর্ঘ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনবিশিষ্ট হইলেও প্রস্থে উহারা মাইক্রোককাইগণের সমতুল্য। ইহারা সহজেই মেজেণ্টা কিম্বা অন্যান্য তজ্জাতীয় সবুজ বেগুন এনিলিন্ রং দ্বারা রঞ্জিত হয়; তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা তাহাদের গঠনাদি বিশদ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে রঞ্জিত করিলে তাহাদের মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম্ স্বতন্ত্র ভাবে রঞ্জিত হয়—কোন স্থান গভীর ভাবে, কোন স্থান বা পাতলা রূপে রঞ্জিত হয়। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে রং এর এরূপ বিভিন্নতার কারণ এখনও কিছু স্থিরীকৃত হয় নাই।

ব্যাকটিরিয়াগণের মধ্যে কতকগুলি অতীব গতিশীল, আর কতকগুলি একেবারে গতিশক্তিহীন। অধিকাংশ গতিশীল ব্যাকটিরিয়াগণের দেহের শেষ ভাগে এক বা অধিক সংখ্যক সূক্ষ্ম সূত্র বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদিগকে ফ্লাজিলা Flagella কহে (চিত্র ৮)। এই সকল ফ্লাজিলার সাহায্যেই ব্যাকটিরিয়াগণ গমনাগমন করিতে পারে। আর কতকগুলি ব্যাকটিরিয়া আপনাদের দেহের আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা গতিবিধি করিয়া থাকে, ইহাদের গমনাগমন কার্য্য, হস্ত পদ বিশিষ্ট জন্তুদিগের ন্যায় নহে। ইহারা শুষ্ক স্থানে একেবারে গতিশক্তি হীন হইয়া গমনাগমন করিতে অক্ষম হয়, জল কিম্বা অন্য তরল পদার্থ মধ্যেই ইহারা গমনাগমন করিতে সক্ষম হয়। গতিশীল ব্যাকটিরিয়াগণের গমনাগমন ব্যাপার দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়—কেহ বা চরকীর ন্যায় দ্রুতবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে, কেহ বা তাড়িতবেগে দৃষ্টি স্থানের এক পার্শ্ব হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে অপর পার্শ্বে যাইতেছে এবং প্রত্যাগমন করিতেছে। কেহ বা মদগদভাবে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। এইরূপে তাহারা যেন মহানন্দে বিচরণ করিয়া ইহ সংসারে আপনাদের প্রবল প্রতাপের পরিচয় দিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছে।

ব্যাকটিরিয়াগণের দেহ বিভক্ত হইয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। প্রথমে একটী ব্যাকটিরিয়া দ্বিখণ্ড হইয়া দুইটী উৎপন্ন হয়, তৎপরে সেই দুইটী হইতে বিভাগ হইয়া চারিটী উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক ব্যাকটিরিয়া স্বতঃ দ্বিখণ্ড হইয়া ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উপযুক্ত আহার প্রাপ্ত হইলে এবং উত্তাপের নাতিহ্রস্বতা ও নাতিশয্য থাকিলে উহারা অল্পদিন মধ্যে লক্ষ লক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। পুরাণে লিখিত আছে মহামায়া অসুর দমনে প্রবৃত্ত হইয়া রক্তবীজগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সেই সকল রক্তবীজগণের এক এক বিন্দু রক্ত পাতে সহস্র সহস্র রক্তবীজ সেনানী উৎপন্ন হইয়া মহামায়াকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। এই সকল ব্যাকটিরিয়াগণের প্রকৃতিও কতক পরিমাণে সেইরূপ। কোন্ (Cohn) সাহেব

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে একটী মাত্র ব্যাকটিরিয়া হইতে দিবসত্রয় মাত্র সময়ে ৪৭৭২০০০,০০০,০০০,০০০, সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া উৎপন্ন হইতে পারে! সৌভাগ্য বশতঃ নানা কারণে এইরূপ অদ্ভুত সংখ্যা বৃদ্ধি সংঘটিত হইতে পায় না—নতুবা রোগোৎপাদনকারী ব্যাকটিরিয়াগণের হস্ত হইতে আমাদিগের পরিত্রাণের কোনও উপায় থাকিত না। খাদ্যের অপ্রতুলতা, বায়বীয় অক্সিজেন গ্যাসের প্রচুর্য্য, স্বীয় দেহোৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থের আধিক্য -এই তিন প্রধান কারণই তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় হইয়া থাকে। এমন কি এতদবস্থায় পতিত হইয়া সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কতকগুলি ব্যাকটিরিয়া এতদবস্থায় পতিত হইলে তাহাদের আভ্যন্তরীণ প্রোটোপ্লাজম''অংশের পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে; ক্রমে ক্রমে উহা ধূলিবৎ হইতে থাকে এবং তন্মধ্যে উজ্জ্বল, গোলাকার ডিম্ব পরিলক্ষিত হয়। এই সকল গোলাকার বস্তুকে "স্পোর" (Spore) বলে। এই সকল "স্পোর" কে ব্যাকটিরিয়াগণের বীজ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। গর্ভাবস্থা হইলে উদর যেরূপ স্ফীত হয়, এতদবস্থায় ব্যাকটীরিয়াগণকে দেখিলেও ঐ রূপ বোধ হইয়া থাকে। সমস্ত দেহ হইতে স্পোর স্থানটী অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনবিশিষ্ট হয়। সচরাচর এই সকল "স্পোর" ব্যাকটীরিয়াগণের মধ্যস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কখনও কখনও তাহারা প্রান্তভাগে অবস্থান করে (চিত্র ১২ ও ১৩)। কখনও বা তাহারা ব্যাকটিরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে। বায়ু দ্বারা নীত হইয়া ইহারা নানা স্থানে চালিত হইতে পারে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে এই সকল "স্পোর" হইতে ব্যাকটিরিয়া উৎপন্ন হইয়া আপন আপন বংশ পরম্পরা রক্ষা করিয়া থাকে। অনুপযুক্ত অবস্থায় পতিত হইয়া ব্যাকটিরিয়াগণ মরিয়া যায়, কিন্তু তাহাদের স্পোরগুলি জীবিত থাকে। সকল ব্যাকটিরিয়া এইরূপ "স্পোর" উৎপাদন করিয়া বংশ পরম্পরা রক্ষা করিতে পারেনা; তাহারা অন্য উপায়ে আপনাদের বংশ পরম্পরা রক্ষা করিয়া থাকে। ইহাদের স্বীয় শরীরের কতক অংশ বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া "স্পোরের" ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিধানোৎপন্ন "স্পোরকে" "এণ্ডোস্পোর" (Endospore) এবং শেষোক্ত বিধানোৎপন্ন "স্পোর"কে "আরথ্রোস্পোর" (Arthrospore) বলা হইয়া থাকে।

শেষোক্ত বিধানোৎপন্ন "আরথ্রোস্পোর" গুলি উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে তদীয় বংশগত ব্যাকটিরিয়া উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই সকল ব্যাকটিরিয়া ও তজ্জাত "আরথ্রোস্পোর" অনুপযুক্ত অবস্থায় পতিত হইলে উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহারা অধিকক্ষণ বেশী উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, এমন কি ৬০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ইহারা মরিয়া যায়।

রাসায়নিক পদার্থ দ্বারাও ইহারা সহজে বিনষ্ট হয়। কিন্তু "এণ্ডোস্পোরসম্পন্ন" ব্যাকটিরিয়াগণের বিনাশ সাধন এরূপ সহজ নহে; কারণ "স্পোর" গুলি ১০৫°, ১১০°, কখনও বা ১৩০°, সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীপর্য্যন্ত শুষ্ক উত্তাপ (dry heat) সহ্য করিতে পারে। অতএব ইহা দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশে সূর্য্য প্রখর করজাল বিস্তার করিয়াও এই সকল "স্পোর" সম্পন্ন ব্যাকটিরিয়াগণকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম নহেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে শুষ্ক তাপ (dry heat) অপেক্ষা বাষ্পীয় তাপ (moist heat) স্পোরসম্পন্ন ব্যাকটিরিয়ার বিনষ্ট সাধনে অধিকতর উপযোগী। এই সকল "স্পোর' অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মধ্যে ১১৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বাষ্পীয় উত্তাপে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাষ্পীয় উত্তাপ দ্বারা স্পোরগুলির আবরণমধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম্ স্ফীত হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা বহিস্থ আবরণ ছিন্ন হইয়া মধ্যস্থ জীবধর্ম্ম সম্পন্ন প্রোটোপ্লাজমের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে। শুষ্কতাপ মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজমকে স্ফীত করিতে পারেনা, সেই হেতু মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজম্ বিনষ্টহয় না—এই কারণ বশতঃ শুষ্ক তাপের আধিক্য হইলেও স্পোরগুলি নষ্ট হয় না। "স্পোর" সম্বন্ধে এই মূল সত্য অবধারণ করিয়া আধুনিক "অটক্লাভ" নামে একপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা এণ্ডোস্পোর সম্পন্ন ব্যাকটিরিয়া কিম্বা আরথ্রোস্পোর সম্পন্ন ব্যাকটিরিয়া সহজেই বিনষ্ট করিতে পারা যাইতেছে। একটী কাচনলে (টেষ্ট টিউবে) দুগ্ধ কিম্বা অন্য

খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া যদি উহার মুখ কার্পাস তুলাদ্বারা বন্ধ করিয়া "অটক্লাভ" মধ্যে ১১৫° ডিগ্রী উত্তাপে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তন্মধ্যস্থ দুগ্ধ ও অন্য খাদ্যদ্রব্য ব্যাকটিরিয়া পরিমুক্ত (sterile) হইয়া থাকে।

ব্যাকটিরিয়াগণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে; পৃথিবী-পৃষ্ঠে এমন স্থান নাই যেখানে ব্যাকটিরিয়া নাই। বায়ু, জল, মৃত্তিকা—সর্ব্বত্রই তাহারা বিদ্যমান: তন্মধ্যে মৃত্তিকা ও জল এই দুই স্থানে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেহের উপরি-ভাগে, মুখগহ্বরে, অন্ত্র নিচয়ে লক্ষ লক্ষ ব্যাকটিরিয়া বিচরণ করিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে এই সকল ব্যাকটিরিয়াগণের রোগোৎপাদিকা শক্তি নাই— বরং ইহাদের কতকগুলিদ্বারা আমরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হই। ইহাদের কতকগুলি "এলবুমেন" জাতীয় দ্রব্য আমাদের দেহাভ্যন্তরে নীত হইলে তাহাদিগকে দেহের পরিপুষ্টি সাধনোপযোগী "পেপটোন" পদার্থে পরিণত করে—জিলেটিন দ্রব্যকে জলীয় অবস্থায় এবং কতকগুলি যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের মূল পদার্থে পরিণত করে।

ব্যাকটিরিয়াগণ স্বচ্ছ বর্ণহীন; কিন্তু কতকগুলি ব্যাকটিরিয়া উপযুক্ত আলোক প্রাপ্ত হইলে নানা প্রকার রং উৎপন্ন করে,—সবুজ হরিদ্রা, গোলাপী, লাল, নীল এই কয়েক প্রকার রংই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। পরিশ্রুত সুরা (এলকোহল) দ্বারা এই রং ব্যাকটিরিয়া হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। এই সকল রং যাহাতে আমাদের কার্য্যোপযোগী হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টাও হইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি টেষ্টটিউবের মুখ তুলা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে তন্মধ্যে ব্যাকৃটিরিয়া প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না; অতএব "অটক্লাভ" দ্বারা ব্যাকৃটিরিয়া পরিমুক্ত পদার্থকে যদি এরূপে আবৃত রাখা যায় তাহা হইলে তাহা আর নষ্ট হইয়া যায় না। এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা সহজে আমাদের আহার্য্য দ্রব্য ও সহজপচ্যমান দ্রব্যাদি অনেক দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া রাখিতে পারি। ব্যবসায় ও বাণিজ্যে যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারিলে আমাদের অনেক সুবিধা ও ধনাগম হইতে পারে।

কতকগুলি ব্যাকৃটিরিয়া শর্করা হইতে উৎসেচন বা গাঁজন (ferment) ক্রিয়াদ্বারা নানা প্রকার অম্লরসাত্মক "এসিড" উৎপন্ন করে। কতকগুলি খাদ্য দ্রব্যে পতিত হইয়া এমোনিয়া, সালফিরেটেড হাইড্রোজেন, স্কেটল ইত্যাদি দুর্গন্ধবিশিষ্ট গ্যাস সমূহ এবং এক প্রকার বিষধর্ম্ম পদার্থ উৎপন্ন করে। পচা মৎস্য ও অন্যান্য পচা দ্রব্য খাইলে যে পীড়া উপস্থিত হয়, ব্যাকৃটিরিয়া সমুদ্ভূত এই বিষধর্ম্মসম্পন্ন পদার্থই তাহার কারণ। অন্য কতকগুলি অন্যান্য প্রকারের গ্যাসও উৎপন্ন করিয়া থাকে।

কতকগুলি ব্যাকটিরিয়া আলোক প্রদানে সমর্থ। আপাততঃ ছয় প্রকারের এরূপ ব্যাকৃটিরিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন সমুদ্রে এবং কোন কোন নদীমুখে পরিষ্কার অন্ধকার রাত্রে দাঁড় বহিয়া যাইলে দাঁড়ের অগ্রভাগে উজ্জল আলোক দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ আলোক কতক গুলি ব্যাকৃটিরিয়া দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল ব্যাকৃটিরিয়াগণকে ফোটো ব্যাকটীরিয়া বলে। উত্তর সমুদ্রে এবং বল্টিক সমুদ্রে এইরূপ ব্যাকৃটীরিয়া সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যাকৃটীরিয়াগণের কতকগুলি অক্সিজেন গ্যাস ব্যতীত জীবন ধারণকরিতে সক্ষম, কিন্তু অধিকাংশই অক্সিজেন ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না। আহারীয় দ্রব্যে পতিত হইয়া কিম্বা জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া তাহারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তদনুসঙ্গে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ওলাউঠা, প্লেগ, ডিপথিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার ও অন্যান্য রোগোৎপাদনকারী ব্যাকটিরিয়াগণও বিষধর্ম্মসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করিয়া থাকে, এবং উহা শরীর মধ্যে চালিত হইয়া হৃৎপিণ্ড শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া ও স্নায়ুমণ্ডলীকে অবসন্ন করিয়া রোগাক্রান্ত জীব সকলকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দত্ত।

গিল্টিকরা।

সোণালি।

গিল্টি বা মলম্বা করা অর্থাৎ দ্রব্যবিশেষকে স্বর্ণ বা অন্য ধাতুতে আবৃত করিয়া সেই ধাতুবৎ প্রতীয়মাণ করা দুই প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে, প্রথম, সহজ সংযোগ (Mechanical means), দ্বিতীয় রাসায়নিক সংযোগ, (Chemical means)।

যে কোন দ্রব্যের উপর যে কোন উপায়ে স্বর্ণপাত বা স্বর্ণরেণু লাগাইয়া দেওয়ার নামই সহজ সংযোগ। যখন কোন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন ধাতুকে স্বর্ণ রঞ্জিত করা যায়, তখন সেই স্বর্ণ সংযোগ প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক সংযোগ বলে।

সহজ সংযোগ বহুপ্রকার উপায়ে নিষ্পন্ন হইতে পারে। নিম্নে সেই সমুদায়ের ক্রমে বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

অয়েল গিল্ডিং—সহজ সংযোগ প্রক্রিয়া মধ্যে এই প্রক্রিয়া প্রধান। ফরাসী দেশে এই প্রক্রিয়া প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথমতঃ সফেদ রং (white lead) শুষ্ককারক মসিনার তৈলে অল্প পরিমাণ তারপিণ তৈলের সহিত মর্দ্দিত করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা জমি করিতে হইবে। তৎপরে (Calcined ceruse) (এক প্রকার সফেদ) দ্বারা উত্তমরূপে কাঁচা মসিনার তৈলে মর্দ্দিত করিয়া তার্পিণে গুলিয়া পূর্ব্ব প্রস্তুত জমি শুকাইয়া গেলে তাহাতে তিন চারি বার লাগাইবে। প্রথম প্রদত্ত বর্ণ না শুখাইলে দ্বিতীয় বার আর লাগাইবে না। তৈলের রঙের তুলি (Oil color brush) কোন পাত্রে ধুইলে তাহার তলায় যে ঘন পদার্থ পতিত হয় সেই আটাযুক্ত পদার্থ, (রংটা কৃষ্ণবর্ণ না হয়) পরিষ্কার করিয়া ঐ দ্বিবিধ প্রকারে প্রস্তুত জমির উপর লাগাইয়া দিয়া তাহা অল্প কাঁচা থাকিতে তাহার উপর সোণালি বসাইয়া দিতে হইবে। সোণালি সমান করিয়া তুলার গোলক দ্বারা চাপিয়া চাপিয়া বসাইয়া দিতে হইবে; যেখানে হাত না যায় সেখানে সরু শলাকার অগ্রভাগে তুলা দিয়া তাহাদ্বারা চাপিয়া দিতে হইবে।

এইরূপ গিল্টিকরা দ্রব্যে বার্ণিস্ লাগান যাইতে পারে। কিন্তু যদি ঐ দ্রব্য অনাবৃত স্থানে রাখিবার জন্য হয় তাহা হইলে তাহাতে বার্ণিস্ লাগাইবে না, কারণ তাহা হইলে ঐ বর্ণ শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। গৃহাদিমধ্যে আবৃত স্থানে যে সকল দ্রব্য থাকিবে তাহা বার্ণিস্ করাই ভাল। বার্ণিস্ করিতে হইলে প্রথমতঃ একবার উহাতে স্পিরিট্ বার্ণিস্ মাখাইতে হইবে; তৎপরে সেফিং ডিস্ (chafing dish এক-প্রকার আগুনের কটাহ) দ্বারা উহা অল্প উত্তপ্ত করিবে। কটাহ শীঘ্র শীঘ্র সরাইয়া লইবে, কোন একস্থানে স্থির করিয়া রাখিবে না; তাহা হইলে দাগ লাগিবার সম্ভাবনা। সর্ব্বশেষে অইল বার্ণিস্ লাগাইলেই কার্য্য শেষ হইল।

পারিস প্রচলিত আর একপ্রকার প্রকরণ উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ যে দ্রব্যে গিল্টি করিতে হইবে তাহার উপর নিম্নলিখিত রূপ জমি করা হয়। সফেদ রং (white lead) তদর্দ্ধেক ওজনে ইয়োলো ওকর (yellow ochre) এবং অল্প পরিমাণ লিথার্জ (oxide of lead) প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া মসিনার তৈলে মর্দ্দিত করিয়া তারপিণ দ্বারা পাতলা করিতে হয়। ইহাই কথিত দ্রব্যে মাখাইয়া প্রথম জমি করিতে হয়।

প্রথম জমি শুষ্ক হইলে তাহার উপর আরও ১০।১২ বার ঘন করিয়া রং দিতে হইবে। ঐ ঘন রং ক্যালসিণ্ড হোয়াইট লেড (calcined white lead) বা মাসিকট (massicot) কাঁচা মসিনার তৈল ও তারপিণে মিশাইয়া প্রস্তুত করিলেও চলে। এই রং রৌদ্রের তাপে শুকাইতে পারা যায়।

প্রকারান্তর—জমি প্রস্তুত করিতে হইলে উহা প্রথমতঃ ঝামাপ্রস্তর (pumice stone) ও জল তৎপরে ঝামা প্রস্তরের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ পশমী কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে পালিস্ করিবে। যেন কাচের ন্যায় মসৃণ হয়।

তৎপরে উষ্ট্রলোমের (ক্যামেল হেয়ার) তুলি দিয়া চারি পাঁচ বার (প্রয়োজন হইলে আরও দেওয়া যায়) পরিষ্কার ও পাতলা লাক্ষা বার্ণিস (lac varnish) মাখাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ উত্তাপ দেওয়া প্রয়োজন।

এই বার্ণিস শুষ্ক হইলে উহা উত্তম রূপে পালিস করিলে উহা দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তৎপরে কোন উষ্ণ স্থানে লইয়া যাইবে ; যেখানে কোনরূপ ধূলির সংশ্রব নাই, সেইখানে ইহাতে স্বর্ণ-বর্ণ (gold colour) খুব পাতলা করিয়া লাগাইবে এবং অর্দ্ধ শুষ্কাবস্থায় তাহাতে স্বর্ণ-পাত বা স্বর্ণ-রেণু লাগাইবে।

প্রথম প্রক্রিয়ায় যে অইল্ কলারের কথা বলা-গিয়াছে তাহা সুপ্রাপ্য না হইলে নিম্ন প্রকারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইয়োলোওকার ফোটান মসিনার তৈলে মর্দ্দিত করিয়া তাহাতে আবশ্যক মত তার্পিণ দিয়া লইলেই চলে। এই উভয় প্রকারের নামই গোল্ডকলার বা অইল গোল্ড সাইজ্ (size)। ইহা যত পুরাতন হইবে ততই ভাল হইবে, সংলগ্ন স্বর্ণ উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তাহাতে স্পিরিট বার্ণিস দিবে ; উহা শুকাইলে তাহাতে দুই তিন বার কোপাল বার্ণিস বা অইল বার্ণিস লাগাইবে।

সর্ব্বশেষে পশমী কাপড়ে ট্রিপলিস (একপ্রকার বেলিয়া পাথর) গুঁড়া মাখাইয়া তদ্দ্বারা গিল্টি করা স্থান পালিস করতঃ হস্তে অল্প অলিভ অয়েল মাখাইয়া হস্তের দ্বারা আস্তে আস্তে মাজিয়া লইবে ; তাহা হইলেই গিল্টি উজ্জ্বল হইবে।

এইরূপে কাষ্ঠ, প্লাষ্টার প্রভৃতি নির্ম্মিত দ্রব্য উত্তমরূপে গিল্টি করা হয়।

সচরাচর হোয়াইট লেড মসিনার তৈলে মর্দ্দিত করিয়া তদ্দ্বারা জমি করিয়া তাহার উপর অইল গোল্ড সাইজ্ মাখাইয়া সোণালি বসাইয়া কোন মসৃণ বস্তুদ্বারা মাজিলে বেশ সোণালি রং প্রস্তুত হয়।

নিমজ্জন প্রণালী। ইস্পাত, তাঁবা বা রৌপ্য নির্ম্মিত পদার্থের উপর সোণালি করিতে হইলে সেই গুলিকে গোল্ডক্লোরাইডের (gold chloride) মধ্যে ডুবাইয়া লইলেই চলিবে। ইহার বিশেষ বিবরণ এই—সোণালি জল প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ ৮০ বার আনা ওজনের খাটী সোণাকে ক্লোরাইডে পরিণত করিতে হইবে, তাহাকে তিন পোয়া জলে গুলিয়া আধ সের সোডা বাইকার্ব্ব মিশাইয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া ফুটাইতে হইবে। যে পদার্থের উপর সোণালি করিতে হইবে তাহা বিশেষরূপে পরিষ্কৃত করিয়া এই ঈষদুষ্ণ জলে দুই চার সেকেণ্ড হইতে এক মিনিট পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতে হইবে; তাহা হইলেই তাহা সোণালি হইয়া যাইবে।

তাম্র পদার্থ সোণালি করিবার জন্য আর একটী বিশেষ উপায় আছে। প্রথমতঃ নাইট্রিক এসিডে পারা গুলিয়া জল ঢালিয়া তাম্র পদার্থকে একবার ডুবাইয়া লইতে হইবে, তাহার পর তাহা উপরোক্ত সোণালি-জলে পুনরায় ডুবাইতে হইবে। এই উপায়ে তাম্র পদার্থে এরূপ উৎকৃষ্ট সোনালি প্রস্তুত হয় যে খাঁটী এসিড ঢালিয়া দিলেও তামার উপরের সোণালী নষ্ট হয় না।

ধাতু পদার্থের উপর দুইবার সোণালী লাগাইলও কখনও কখনও তাহাতে ভাল রং খোলে না, সেইজন্য সময়ে সময়ে তাহাকে রং করিতে হয়। রং করিলে পর সেই পদার্থকে সোণা অপেক্ষা উজ্জ্বল দেখায়।

প্রথমে তুঁতে ১ ভাগ এবং নিশাদল ৪ ভাগ লইয়া খলে ভাল করিয়া গুঁড়াইতে হইবে, অনন্তর French Verdigris ২ গ্রেণ লইয়া বেশ করিয়া মিশাইতে হইবে। ১ ঔন্স এসেটিক এসিড দিয়া বেশ করিয়া মাড়িয়া লইলে একটা ঈষৎ সবুজ বর্ণের মণ্ড প্রস্তুত হইবে। যাহাতে রং লাগাইতে হইবে, তাহা এই মণ্ডে ভাল করিয়া মিশাইয়া একখণ্ড পরিষ্কার শাদা কাগজের উপর রাখিয়া ধুম বিহীন আলোকের উপর যতক্ষণ না ইহা কাল বর্ণে পরিণত হয় ততক্ষণ তাতাইবে। একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহা গন্ধক দ্রাবকে (Sulphuric acid) ডুবাইতে হইবে। তাহাতে রঙের পদার্থ গুলি গলিয়া যাইবে এবং সোণার একটা উজ্জ্বল বর্ণ ফুটিয়া বাহির হইবে। অনন্তর জলে পোটাস্ কার্ব্বনেট্ মিশাইয়া তাতাইয়া লইয়া সেই জলে পদার্থটী ধুইয়া ফেলিবে। এবং মাঝে মাঝে গরম সাবান জল ব্যবহার করিতে হইবে।

কখনও কখনও দেখা যায় যে এইরূপ নিমজ্জন প্রণালীতে ভুল হেতু ঠিক সোণার উজ্জ্বল বর্ণ না ফুটিয়া অনেকটা কাল বর্ণ হয় ও স্থানে স্থানে রং লাগিয়া যাইতে পারে (patching)। ইহার প্রতিকার করিতে গেলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—

সোরা, জিঙ্ক সালফেট, হীরাকস ও ফটকিরি

এই পদার্থ গুলি সমান ওজনে গ্রহণ করিয়া একটী চিনামাটির পাত্রে রাখিয়া ফুটাইতে হইবে। গলিয়া যাইলে ইহা ব্যবহারের উপযোগী হইবে। পদার্থ গুলির উপর এই মিশ্রটী ক্রুষে করিয়া লাগাইয়া কাঠের আগুণে তাতাইতে দিতে হইবে এবং যখন সেই পদার্থের উপর আঙ্গুল ঠেকাইলে একটা হিস্ শব্দ হইবে তখন তাহা আগুন হইতে লইয়া তৎক্ষণাৎ গন্ধক দ্রাবকের Sulphuric acid মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এসিডে সমস্ত লবণ ধুইয়া যাইলে সোণার প্রকৃত রং ফুটিয়া বাহির হইবে। ফিলম্ পাতলা থাকিলে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়, তাহা হইলে সমস্ত সোণা উঠিয়া যাইতে পারে।

পুস্তকের মলাটে, চামড়ার উপর বা কাপড়ের উপর সোণা লাগাইতে হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গম ম্যাষ্টিকের সূক্ষ্ম চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর স্বর্ণপাত রাখিয়া ধাতু নির্ম্মিত ছাপ (যাহা ঐ স্থানে মারিতে হইবে) অগ্নিতে উত্তমরূপে গরম করিয়া উহার উপর চাপিলেই উত্তম ছাপ উঠিবে।

পুস্তকের পাতার ধারে সোণা লাগাইতে হইলে, ধার উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া পুস্তকগুলি উত্তমরূপে প্যাঁচ কলে কসিয়া স্পিরিটে দ্রবীভূত আইসিংগ্লাস (Isinglass) মাখাইবে ও কাঁচা থাকিতে থাকিতে তাহার উপর পাত বসাইয়া দুইঘণ্টা কাল ধরিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পুস্তক খুলিয়া লইবে।

ফরাসী দেশীয় কারীগরেরা আইসিংগ্লাসের পরিবর্ত্তে আর্ম্মেনিয়ান বোল (Armenian bole) ৪ ভাগ, মিছরীর গুঁড়া এক ভাগ এবং প্রয়োজন মত ডিম্বের শ্বেতাংশ মিশ্রিত দ্রব ব্যবহার করেন। ইহা ব্যবহার করিতে হইলে পাতলা গঁদ অগ্রে লাগাইয়া তাহার উপর এই দ্রব পাতলা করিয়া লাগাইতে হয়। জমি উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে একখানা ভিজা ন্যাকড়ার দ্বারা ঐ স্থান মুছিয়াই তাহার উপর সোণার পাত দিয়া পশমগুচ্ছ দ্বারা চাপিয়া দিতে হয় ও একটু পরেই বেশ করিয়া মাজিয়া দিতে হয়।

সাইনবোর্ডে স্বর্ণাক্ষরে লিখিতে হইলে প্রথমতঃ অক্ষর গুলি পীতবর্ণে লিখিয়া তাহার উপর অইল গোল্ড সাইজ লাগাইয়া সোণার পাত বসাইলেই চলিবে। কাঠের অক্ষর উচ্চ করিয়া তাহার উপর সোণা লাগাইতে হইলে প্রথম প্রক্রিয়ার ন্যায় গিল্টি করিলে অতি উত্তম হয়। ইহাতে বার্ণিস দেওয়া উচিত নহে, কারণ বার্ণিস রৌদ্রে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

আরও কয়েক প্রকার গিল্টি প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে।

১। কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত দ্রব্য সিরিষ মাখাইয়া শুষ্ক করিবে, তদনন্তর খড়ির গুড়া, স্প্যানিস হোয়াইট বা প্লাষ্টার অব পারিস চূর্ণ করিয়া সিরিষ অথবা আইসিংগ্লাস দ্বারা মণ্ডবৎ করতঃ তাহাতে মাখাইবে। এইরূপ তিন চারিবার মাখানর পর জমি হইলে উহা সিরিষ কাগজ দিয়া মসৃণ করতঃ অইল গোল্ড সাইজ (size) দিয়া তদুপরি স্বর্ণপাত বসাইবে। উহা আগেট (agate) বা অন্য কোন মসৃণ পদার্থের দ্বারা পালিস করিলে সুন্দর গিল্টি হইবে।

২। ওয়ারম্ উড—(worm wood) ও রসুন জলে সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পরে তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণ লবণ ও ভিনিগার মিশাইবে, এই মিশ্র দ্রবে সিরিষ গলাইয়া উষ্ণ অবস্থাতেই যে কাষ্ঠের উপর গিল্টি করিতে হইবে তাহার গায়ে মাখাইবে। প্রস্তর বা প্লাষ্টার দ্রব্যে গিল্টি করিতে হইলে লবণ দিবে না। তৎপরে সাইজের দ্বারা স্প্যানিস্ হোয়াইট ৮।১০ বার উত্তমরূপে মাখাইবে। তৎপরেও কোন স্থানে ছিদ্রাদি দৃষ্ট হইলে তাহার স্থানে সিরিষ মিশ্রিত সাদা রং দিবে। অনন্তর জমি খুব ঠাণ্ডা জল ও ঝামা পাথর দিয়া খুব পালিস করিবে এবং যদি কোন স্থান উচু নীচু বোধ হয় আবশ্যক হইলে আবার শ্বেতবর্ণ লাগাইবে; পরে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তাহার দ্বারা সমস্ত অংশ উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিবে। অনন্তর উত্তমরূপে মসৃণ করিয়া সাইজ মিশ্রিত ইয়োলো ওকর লাগাইবে। তৎপরে—

আর্ম্মেণিয়ান বোল—	১ পাউণ্ড
ব্লড্ ষ্টোন—	২ ঔন্স
গ্যালেনা—	আবশ্যকমত

পৃথক পৃথক ভাবে জলে মাড়িয়া অল্প পরিমাণ অলিভ অয়েলের সহিত মিশাইবে। ইহা মেষের চামড়ায় সিরিষের সহিত মিশ্রিত করিয়া কোমল ভাবে উহার উপর লাগাইবে। ঐ স্থান উত্তমরূপে

শুষ্ক হইলে বরফখণ্ড দ্বারা ঐ স্থান ভিজাইয়া তাহার উপর স্বর্ণপাত বসাইয়া দিবে; তৎপরে ব্লড্ ষ্টোন দ্বারা বার্ণিস করিতে হইবে। যদি কোন স্থানে স্বর্ণ না লাগিয়া থাকে তবে তুলি করিয়া সেই স্থান ভিজাইয়া আবার পাত দিবে। তদনন্তর নিম্নলিখিত দ্রব কোমল ভাবে অল্প পরিমাণে মাখাইবে,

এনোট—	২ আউন্স
গ্যাম্বোজ—	১ ,,
ভর্ম্মিলিয়ন—	১ ,,
ড্রেগনস ব্লড্—	অর্দ্ধ ,,
সল্ট অব্ টার্টার—	২ ,,
জাফ্রান—	১৮ গ্রেণ
জল—	২ পাঁইট

মৃদু উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া রেশমী কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

৩। জাপানীরা গিল্টি করিতে হইলে দ্রব্যটী উত্তমরূপ মসৃণ করিয়া তাহার উপর অয়েল গোল্ড সাইজ তার্পিণের সহিত মাখাইয়া তাহাতে স্বর্ণ চূর্ণ মাখাইয়া ওয়াশ লেদার দ্বারা পালিস করত স্পিরিট মাখাইয়া ঈষৎ উত্তপ্ত করে। তাহাতে সুন্দর সোণালি বর্ণ প্রস্তুত হয়।

বায়ু *

এখানি ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক পুস্তক। বৈজ্ঞানিক হইলেও ইহাতে বিজ্ঞানের আড়ম্বর নাই। সরল কথায় বায়ু সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল বিষয় গুলি আছে। যাঁহারা বিজ্ঞানের কোন ধার ধারেন না এরূপ পাঠকেরও এ পুস্তক খানি বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না, অথচ তাঁহারা জ্ঞাতব্য তত্ত্বগুলি জানিতে পারিবেন।

বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক যে কয়জন স্বল্পসংখ্যক লেখক আছেন চুণীবাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। বায়ু সম্বন্ধে তাঁহার এই বিশদ প্রবন্ধটি বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রভূত উপকার সাধন করিবে, এবং তজ্জন্য তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

গ্রন্থকার বিনয় সহকারে বলিয়াছেন—"প্রবন্ধে কোন নূতন বিষয়ের অবতারণা নাই। তত্ত্বগুলি সবই পুরাতন—নূতন কেবল তাহাদিগের পরিচ্ছদ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষার পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলে যে সৌষ্ঠবসম্পন্ন ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার ন্যায় অনুপযুক্ত লোকের হস্তে সজ্জার ভার অর্পিত হওয়াতে তত্ত্বগুলির প্রকৃত আকৃতি বোধ হয় অনেক স্থলেই বিকৃত হইয়াছে।" আমরা বলি চুণী বাবুর ন্যায় উপযুক্ত লোকের হস্তে সজ্জার ভার অর্পিত হওয়াতে তত্ত্বগুলি অবিকৃত ত আছেই, অধিকন্তু সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে।

বায়ু মানুষের প্রাণ। শুধু মানুষের বলি কেন, জীব মাত্রেরই প্রাণ। এই বায়ু কিরূপ অবস্থায় প্রাণীগণের অনুকূল, কিরূপ অবস্থায় প্রতিকূল হয় এই পুস্তকে তাহা অল্পে অথচ বিশদরূপে বিবৃত আছে। পুস্তকখানি ৪ অংশে বিভক্ত। "প্রথম ভাগে বায়ুর উপাদান (Composition) এবং রাসায়নিক ও ভৌতিক ধর্ম্মের বিষয় (Chemical and Physical Properties) বিবৃত হইয়াছে। যে যে কারণে বায়ু সর্ব্বদা দূষিত হইতেছে এবং বায়ুর সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ কি, তাহা দ্বিতীয় ভাগে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। বায়ুস্থিত ধূলিকণা দ্বারা রোগের বিস্তৃতি তৃতীয় ভাগে আলোচিত হইয়াছে। কিরূপে বায়ুর বিশুদ্ধি রক্ষা হয় এবং দূষিত বায়ু কি উপায়েই বা পুনরায় শ্বাসগ্রহণোপযোগী হইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা চতুর্থভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে"।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সকল কথা বিবৃত করা সম্ভব নহে। তথাপি নমুনা স্বরূপ আমরা নিম্নে একটি স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বাস্তবিক সমস্ত গ্রন্থখানি উদ্ধৃত করিয়া দিবার প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য। আমরা বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকেই সমস্ত গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি। তাহাতে তাঁহাদের ঐহিক মঙ্গল যথেষ্ট হইবে।

---

* গবর্ণমেণ্টের অন্যতর রাসায়নিক পরীক্ষক এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন-বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক চুণীলাল বসু M. B., F.C.S. প্রণীত—মূল্য ।০ আনা।

"শ্বাসক্রিয়া

শ্বাস ক্রিয়া যে সকল প্রাকৃতিক কারণে বায়ু সর্ব্বদা দূষিত হইতেছে, তন্মধ্যে জীবগণের শ্বাস-ক্রিয়া সর্ব্ব প্রধান। কিরূপে শ্বাস-ক্রিয়া দ্বারা বায়ু দূষিত হয় তাহা বুঝিতে হইলে শ্বাস-ক্রিয়া সম্বন্ধে কতক গুলি মূলতত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। যে বায়ু আমরা নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করি তাহা নাসিকার মধ্যদিয়া কণ্ঠনালী বাহিয়া আমাদিগের ফুস্ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করে এবং তন্মধ্যে সঞ্চালিত রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। আমাদিগের বক্ষোগহ্বরের দুই পার্শ্বে দুইটি ফুস্ফুস্ অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন একখানি স্পঞ্জ (Sponge) অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুপূর্ণ ছিদ্র সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ আমাদিগের ফুস্ফুস্ বায়ুপূর্ণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কোষের সমষ্টি মাত্র। এই সকল বায়ু-কোষ (Air cells) এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা কত সূক্ষ্ম তাহা একটি কথা বলিলেই বোধগম্য হইবে। আমাদিগের বক্ষোগহ্বরে যে দুইটি ফুস্ফুস্ আছে তন্মধ্যে ৭,২৫,০০০০০০ বায়ু-কোষ বিদ্যমান আছে। এক একটি বায়ুকোষ অতি সূক্ষ্ম আবরণে আচ্ছাদিত। আমরা যখন নিশ্বাস গ্রহণ করি তখন বাহিরের বায়ু এই সকল বায়ু-কোষ মধ্যে প্রবেশ করে এবং উহারা স্ফীত হইয়া উঠে। প্রশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় বক্ষঃ প্রাচীরের চাপে বায়ুকোষ সকল সঙ্কুচিত হয়, এবং তন্মধ্যস্থ অধিকাংশ বায়ু প্রশ্বাস রূপে নির্গত হইয়া যায়। এই সকল বায়ুকোষ অতি সূক্ষ্ম রক্তবাহিকা কৈশিক শিরাপুঞ্জ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। অত এব দেখা যাইতেছে যে নিশ্বাস গৃহীত বায়ু ও ফুস্ফুস্ স্থিত রক্ত এতদুভয়ের মধ্যে বায়ুকোষের ও কৈশিক শিরার দুইখানি অতি সূক্ষ্ম আবরণ মাত্র ব্যবধান থাকে। বায়ুস্থিত অক্সিজেন্ এই আবরণ দ্বয়ের মধ্যে দিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। অক্সিজেন্ মিশ্রিত রক্ত ফুস্ফুস্ হইতে প্রথমতঃ হৃৎপিণ্ডে গমন করে, তথা হইতে সমস্ত শরীরে ধমনী (Arteries) দ্বারা পরিচালিত হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে আমাদিগের শরীর মধ্যে নিরন্তর মৃদু দহন-ক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে এবং ইহার ফল স্বরূপ কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড বাষ্প, জলবাষ্প, ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ শরীর মধ্যে সর্ব্বদা উৎপন্ন হইতেছে। নিশ্বাস গৃহীত অক্সিজেন বাষ্প রক্তের সহিত শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হইলে পেশী, স্নায়ু, মেদ, অস্থি প্রভৃতি শারীরিক উপাদান সমূহ এবং রক্তের সহিত সঞ্চালিত খাদ্য-সামগ্রী ঐ অক্সিজেন বাষ্প শোষণ করিয়া লয় এবং উক্ত অক্সিজেন দ্বারাই উহাদিগের মৃদুদহন ক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। এবম্প্রকারে রক্ত হইতে অক্সিজেনের অংশ অপসারিত হইলে দহনক্রিয়া-জনিত কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড প্রভৃতি দূষিত পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে আগমণ করে এবং তথা হইতে ফুস্ফুস মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া প্রশ্বাসের সহিত শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপে শ্বাস ক্রিয়া দ্বারা আমাদিগের শরীরস্থ রক্ত অনবরত শোধিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বাহিরের বায়ুর প্রতি ১০,০০০ ভাগে ৪ ভাগ কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড বাষ্প বিদ্যমান থাকে। এই বায়ুই আমরা নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে বায়ু আমরা প্রশ্বাস রূপে পরিত্যাগ করি, তাহার প্রতি ১০,০০০ ভাগে ৩০০ হইতে ৪০০ ভাগ কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড বাষ্প বিদ্যমান থাকে; অতএব প্রতিনিশ্বাস আমরা বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুতে স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় শতভাগ অধিক কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড বাষ্প যোগ করিয়া দিতেছি *। আমরা এক মিনিটে প্রায় ১৮ বার নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি, সুতরাং প্রতি ঘণ্টায় ১,০৮০ বার এবং প্রতিদিবসে ২৬,০০০ বার শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকি। যদি প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি নিশ্বাসে স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা শত ভাগ অধিক কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড বায়ু মধ্যে পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে সংখ্যাতীত মানব ও অপর জীবগণের শ্বাস-ক্রিয়া দ্বারা বায়ু-মণ্ডল নিয়ত কি পরিমাণে দূষিত হইতেছে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে"।

---

* মোটামুটি হিসাব করিলে প্রশ্বাস ত্যক্ত বায়ুতে স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ৫ ভাগ অক্সিজেন্ কম এবং ৫ ভাগ কার্ব্বনিক য়্যাসিড বাষ্প অধিক থাকে।

শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রায় শতকরা ৯০ জন লোকের উপজীবিকা কৃষি, আর বাকী শতকরা ১০ জন লোক শিল্পাদি বিবিধ ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। দেশের শিল্পাদির কিরূপ অবনতি ঘটিয়াছে ইহাতে তাহা বিশেষ রূপে বুঝা যাইতেছে। প্রাচীন আর্য্যেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থানুসারে কৃষক চাষ করিত, মালী ফুল ফলের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিত, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তন্তুবায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বয়ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, কর্ম্মকার লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত, স্বর্ণকার অলঙ্কারাদি গড়িত, চর্ম্মকার বিনামা প্রভৃতি চামড়ার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এইরূপ যাহার জন্য যে ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সে তাহারই অনুসরণ করিত। ইহাতে ব্যবসায়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত, কেহ কাহারও নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র অধিকার করিত না; সুতরাং সকলে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সমাজের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলেও কোন একটী বিশেষ ব্যবসায়ে এরূপ লোকাধিক্য হয় নাই যে সেই ব্যবসায়াবলম্বী লোকদিগের জীবিকা অর্জ্জনের পথ সংকীর্ণ হইয়াছে। দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতানুসারে লোকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিত, সুতরাং সামাজিক সামঞ্জস্য রক্ষা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন ঘটিত না।

মুসলমান শাসন সময়েও এই রূপ ব্যবসায় সামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিল। তাহার প্রমাণ এই যে সকল সম্প্রদায়ের লোকই, কি কৃষক কি শিল্পী—স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কোন বিশেষ ব্যবসা অধিক সংখ্যক লোক অবলম্বন করাতে, সেই সম্প্রদায়ের লোকের অন্নকষ্ট ঘটিয়াছে ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু গত একশত দেড়শত বৎসরের ইংরাজ শাসনে এদেশে সম্পূর্ণরূপ ব্যবসায়বিপ্লব ঘটিয়াছে। ইংরাজ ব্যবসাদারের জাতি। তাঁহারা পৃথিবীর সকল স্থানে স্বদেশের ব্যবসায় বিস্তার দ্বারা উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন; সুতরাং যখন ভারতের রাজদণ্ড তাঁহাদের হস্তগত হইল, তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশীয় বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সুবিধা পাইলেন। মুসলমান শাসন সময়ে এদেশে তাঁহাদের বাণিজ্য বিস্তারের পথে যে সকল বিঘ্ন ছিল, তাঁহারা স্বয়ং ভারতের রাজমুকুট লাভ করিয়া একে একে সেই সকল বিঘ্ন বাধা দূর করিয়া দিলেন, তাহার ফল হইল এদেশীয় ব্যবসাদারদিগের অবনতি। যে ঢাকা মসলিন য়ুরোপীয়েরা আদর করিয়া লইয়া যাইতেন, ম্যাঞ্চেষ্টার ও গ্লাসগোর কলের নির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্রে তাহার ব্যবসায় মাটী করিয়া দিল। এইরূপে ক্রমে রেসমের কারবার, পশমের কারবার, মৃন্ময় পাত্রের কারবার, লোহার জিনিসের কারবার, এমন কি খাবার লবণটুকুর কারবার পর্য্যন্ত ইংরাজ ও তাঁহাদিগের জ্ঞাতিবন্ধুগণ একে একে গ্রাস করিয়াছেন। এই জন্যই দেশের শতকরা ৯০ জন লোককে ভারত-মাতার কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া আহারীয় সংগ্রহ করিতে হইতেছে, এই জন্যই দেশে অন্নাভাব ও তজ্জন্য হাহাকার ধ্বনি, এবং এই জন্যই দুর্ভিক্ষ মহামারীতে দিন দিন দেশের লোক ক্ষয় হইতেছে।

দেশের এই অবস্থা সম্বন্ধে বহুদিন হইতে আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু স্বজাতীয় স্বসম্প্রদায় ব্যবসায়ীদিগের মুখের দিকে তাকাইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের বাণিজ্য নীতির কোন পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ স্বচক্ষে দেশের এই দুরবস্থা দেখিতেছেন। প্রজা নিঃস্ব ও নির্ব্বংশ হইতেছে তাহাও বুঝিতেছেন, প্রজা না থাকিলে কাহাকে লইয়া রাজ্য করিবেন তাহাও বুঝিতেছেন, কাজেই তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া প্রজা রক্ষার জন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কি উপায়ে এ দেশের লোকদিগকে শিল্পকার্য্যে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এবং এদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির কাটতি হইতে পারে তদ্বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য গবর্মেণ্ট একটী "কনফারেন্স" বা সভা সংগঠন করেন। এই সভা এবিষয়ে তদন্ত করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগের নিজ মন্তব্য সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইহা একটী শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করি। যদিও গবর্ণমেণ্ট অতিশয় বিলম্বে একার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন

তথাপি তাঁহারা যে এ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া লোক রক্ষার উপায় বিধানে মনোযোগী হইয়াছেন সে জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উল্লিখিত "কনফারেন্স" প্রধানতঃ শিল্পাদি শিক্ষার ব্যবস্থাতেই মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন, তবে কোন কোন সভ্য কি উপায়ে শিল্প জাত দ্রব্যাদির কাটতি হইতে পারে সে বিষয়ে আপনাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ মীমংসা করেন নাই। এদেশজাত শিল্প সামগ্রীর কাটতির অভাবেই যে শিল্পীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং শিল্পী বা কারিগর তৈয়ার করাই এখন প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। যাহাতে লোকে চাষ ছাড়িয়া বা মসীজীবীর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কারিগরি শিখিতে অগ্রসর হয় তাহার ব্যবস্থাই এখনকার প্রয়োজন; কনফারেন্সের সভ্যেরাও সেই প্রয়োজনের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে শিল্প শিক্ষা বিষয়ে যে বিশেষ সহায়তা হইবে ইহা আমরা মনে করি না।

এদেশের নানা স্থানে ইতিপূর্ব্বে শ্রম শিল্পাদি শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়দ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল বিদ্যালয় দ্বারা সুফল লাভ করা যাইতে পারে, "কনফারেন্সের" সভ্যদিগকে গবর্ণমেণ্ট তাহাই তদন্ত করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁরা এক রকমে এই সকল শিল্পবিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ করিতেই পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে এরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপন দ্বারা কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, তাহার পরিবর্ত্তে যে সকল স্থানে কল কারখানা আছে, সেই সকল স্থানের কারখানাওয়ালাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তথায় বালকদিগকে শিক্ষার্থ পাঠাইলেই চলিবে; আর এখন যে সকল শিল্প বিদ্যালয় আছে, সেগুলিতে টাকা খরচ না করিয়া, উহাকে কারখানায় পরিণত করা হউক এবং তথায় যে সকল দ্রব্যজাত প্রস্তুত হইবে, তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ চালান হউক।

এই নীতি অনুসারে চলিলে যে দেশে শিল্প শিক্ষার কোন উন্নতি হইবে না তাহা এক প্রকার স্থির কথা। এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে কয়টা স্থানে কলকারখানা আছে যে তথায় যাইয়া লোকে রীতিমত আপনাদিগের প্রবৃত্তি অনুসারে শিল্পবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিতে পারিবে? যে যে স্থানে এরূপ কল কারখানা আছে একজনের অঙ্গুলিতে তাহা গণনা করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত এখন যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে কেবল যন্ত্র চালনা করিয়া শিল্প শিখিলে চলিবেনা, তদ্দ্বারা কোন উন্নতি হইবে না। শিল্পাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার এখন বিশেষ প্রয়োজন, সেরূপ শিক্ষা ত কল কারখানায় হইবে না। সুখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত নহেন। শিল্প শিক্ষার জন্য যে বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহাতে তাহারই উন্নতি হয় তাঁহারা তাহারই ব্যবস্থা করিবেন। তবে স্থানবিশেষে ব্যবস্থার ইতর বিশেষ ঘটিবে। যে সকল স্থানে কল কারখানা আছে, সেখানে তদুপযোগী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবেন অর্থাৎ সেখানকার ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কল কারখানাতেও শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইবে, অন্যত্র স্থানীয় কারিগরদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বা অন্যবিধ উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

কনফারেন্সের রিপোর্ট ও গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদিগের ধারণা হইল এই যে তাঁহারা যেন নিম্নশ্রেণীর কারিগর তৈয়ার করিবার জন্যই ইচ্ছুক। য়ুরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যেরূপ উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত কারিগর আছে, এমন কি মধ্য শ্রেণীর কারিগর আছে সেরূপ শ্রেণীর শিক্ষিত কারিগর তৈয়ার করিতে তাঁহাদিগের ইচ্ছা নাই বলিয়া আমাদিগের বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট নিজেই বলিতেছেন :—

"There are signs that an era is approaching of a considerable expansion in the industrial employment of native capital; and this prospect may justly be taken into account as offering a probable opening for more highly trained men."

অথচ যাহাদিগকে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবেন তাহাদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"The education given in the primary school should be so ordered as not to fit the pupil for clerical employment. No English should be taught, and the reading should be limited to the vernacular."

এরূপ অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর কারিগর তৈয়ার হইবার সম্ভাবনা কোথায়? এদিকে তাঁহারা এই সকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান জন্য বিলাত হইতে ওস্তাদ কারিগর আনয়ন করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেছেন, অথচ দেশীয়দিগকে যে শিক্ষা দিবেন তাহাতে তাহাদের কেহ কস্মিন কালে ওস্তাদ হইতে পারিবেন তাহা আমাদিগের বোধ হয় না। গবর্ণমেন্ট নিম্নশ্রেণীর একদল কারিগর প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করুন তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর Experts বা ওস্তাদ কারিগর তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা না করিলে শিল্প বিদ্যায় দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবেনা।

এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের একজন কর্ম্মচারী, পবলিক-ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের রেলওয়ে বিভাগে নিযুক্ত য়েট্স সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখা কর্তৃপক্ষের উচিত। তিনি বলিয়াছেন :

"He preferred boys being given a general education and did not think that it would lead to conceit on the part of the boys. - - - He would like to see them educated although in some cases it disinclined them to do manual labour, but on the whole they were better fitted to do their work."

ইয়েট্স্ সাহেবের এই কথা গুলি সকলেই স্বীকার করিবেন। অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিত লোকে যে ভাল কাজ করিবে ইহাত সর্ব্ববাদী-সম্মত। একবার কোন একটী স্কুলের ছাত্রকে সুন্দররূপ পাথা টানিতে দেখিয়া আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান পাদরী ড্যাল সাহেব বলিয়াছিলেন "Education makes a good punkha puller" বাস্তবিক তাহাই। এই জন্যই আমরা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করি যে শিক্ষিত লোক যাহাতে কারিগরী শিখিতে পারে তাঁহারা তাহার একটা ব্যবস্থা করুন। তাহা না করিলে প্রকৃত পক্ষে এদেশীয় শিল্পের উন্নতি হইবে না ও দেশের বর্ত্তমান জীবন সংগ্রাম তিরোহিত হইবে না।

শ্রম-শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কনফারেন্সের সভ্যগণ যে অভিমত প্রদান করিয়াছেন, উপরে আমরা কেবল তাহার আভাস মাত্র প্রদান করিলাম। সত্য বটে তাহাতে আমাদিগের আশা করিবার কিছুই নাই, কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই কমিটী নিযুক্ত করিয়া যে দেশের কতকটা উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশের শিল্পের অবস্থা কিরূপ, এবং তাহার শিক্ষার কিরূপ উপায় আছে; কোথায় কোন্ কোন্ শিল্প সামগ্রী উৎপন্ন হয়, কোন স্থানের শিল্পের বিশেষ অবনতি হইয়াছে, ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব কনফারেন্সের রিপোর্টে অবগত হওয়া যায়। সেই সমস্ত কথা একটী বা দুইটী প্রবন্ধে প্রকাশ করা অসম্ভব তবে যতদূর সম্ভব আমরা ক্রমশঃ তাহার পরিচয় প্রদান করিতে ক্রটি করিব না। তবে যাঁহারা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত Report on Industrial Education পাঠ করিবেন। এই রিপোর্ট দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ৪॥০ টাকা। ইহা কলিকাতার Superintendent Government Printing আফিসে পাওয়া যায়।

দেশীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতির উপায়।

দেশের শিল্পাদির অবস্থা সম্বন্ধে কনফারেন্সের সভ্য সি, এ, র‍্যাডিচি সাহেব একটী সুন্দর নক্সা (Chart) প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে কোথায় কোন সামগ্রীর ব্যবসায়ে কত লোক নিযুক্ত আছে ও সেই সেই সামগ্রী কি পরিমাণ ও কত কত মূল্যের

উৎপন্ন হয় ; কি পরিমাণই বা রপ্তানি হয় এবং কি কারণে তাহার অবনতি হইতেছে, ইত্যাদি অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমরা পাঠক দিগের অবগতির জন্য নক্সা হইতে ও রিপোর্টের অন্য স্থান হইতে কয়েকটী শিল্পের অবস্থা এ স্থলে প্রকাশ করিলাম।

কার্পাস ও বস্ত্র।

উল্লিখিত নক্সার প্রথমেই কার্পাস ও বস্ত্র শিল্পের অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উভয়-বিধ ব্যবসায়ে সমগ্র ভারতে প্রায় ৫৭,০০,০০০ লোক নিযুক্ত। ইহার মধ্যে বিবার প্রদেশে ৬০,০০০ : আসামে ৬০,০০০ ; মধ্যদেশে ৩,৮০,০০০ ; ব্রহ্মে ২,৫০,০০০ ; বোম্বাইযে ৫,৩০,০০০ ; পঞ্জাবে ১০,২০,০০০ ; মান্দ্রাজে ১২,২০,০০০ : উত্তরপশ্চিমে ১,২৪০,০০০ ; বাঙ্গালায় ১০,২০,০০০ লোক নিযুক্ত। এই হিসাবটা ১৯০১ সালের বুঝিতে হইবে। ঐ সালে এদেশ হইতে ১৪,৪৩,০০০ টাকা মূল্যের কার্পাস রপ্তানি হয়, ও ৯,৩২,০০,০০০ মূলের কার্পাসসূত্র রপ্তানি হয় আর ১,৫৫, ০০০০০ টাকা মূল্যের বস্ত্রাদি রপ্তানি হয়। এদিকে বিদেশ হইতে ২০,০০,০০০ টাকার কার্পাস আমদানী হয় ও ২,৬৫,০০,০০০ টাকার সূতা আমদানী হয় এবং ৩,৩৩,০০,০০০ টাকার বস্ত্রাদি আমদানি হয়। সূত্রাদির কল সম্বন্ধে প্রকাশ যে দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত ভারতে ১২৫টা সূতা ও কাপড়ের কলের স্থানে ১৯০টা কল হইয়াছে, সুতরাং এই সকল কলের শ্রমজীবীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। দশবৎসর পূর্ব্বে এই সকল কলে ১৫৬০০০ জন মজুর কাজ করিত, এখন উহাদের সংখ্যা ২৯১০০০ দাঁড়াইয়াছে। রাডিচি সাহেব বলেন যে দশ বৎসর কালে প্রায় ৮২০০০ লোক দেশী তাঁত ছাড়িয়া কলে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ৭৪০,০০০ লোক ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছে। বস্ত্রশিল্পের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এতদ্দ্বারা তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। যে ভারত বস্ত্রশিল্পের জন্য চির প্রসিদ্ধ, যেখান হইতে ১,৫৫,০০,০০০ টাকা মূল্যের বস্ত্র বিদেশে চালান হইয়াছে আর বিদেশ হইতে ৩০,৩৩,০০,০০০ টাকার কাপড় ভারতে আসিয়াছে! তবে ভারতের তাঁতিকুল কেনই না বৈষ্ণব কুলে আশ্রয় লইবে।

চামড়া।

কার্পাসের পর চামড়ার ব্যবসার অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা গেল এদেশ হইতে কাঁচা চামড়া ও পাকা চামড়া প্রভৃতি অনেক প্রকারের চামড়া রপ্তানি হয় বটে, কিন্তু পাকা চামড়ায় তৈয়ারী জিনিস অতি অল্প পরিমাণ মাত্র রপ্তানি হইয়া থাকে। রাডিচি সাহেব বলেন যে কাঁচা চামড়াকে পরিষ্কৃত চর্ম্ম নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপযোগী করিতে হইলে সুদক্ষ রাসায়নিকের প্রয়োজন। কিন্তু ভারত-বর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে অল্পই উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকে। যত দিন তাহা না হইতেছে তত দিন এদেশের চামড়ার ব্যবসায় উচ্চশ্রেণীর রাসায়নিকদিগের নিকট হইতে যে সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না *। পরিষ্কৃত চামড়া প্রস্তুত করিতে পারিলে এদেশ হইতে এখন যে পরিমাণ চামড়ার রপ্তানি হইতেছে তাহার দ্বিগুণ হওয়া সম্ভব। এখন এদেশ হইতে বৎসর প্রায় সাড়ে এগার কোটি টাকা মূল্যের চামড়া রপ্তানি হয়, পরিষ্কৃত চামড়া প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিলে নুনাধিক আঠার কোটি টাকা মূল্যের চামড়া রপ্তানি হওয়া সম্ভব। সুখের বিষয় এ সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যবাসীরা কতকটা উন্নতি করিয়াছেন।

এই চামড়ার ব্যবসায়ের কিরূপে উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে রাডিচি সাহেব স্বতন্ত্র স্থানে সে বিষয়ে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে গো মহিষাদির মৃত্যু যত অধিক পরিমাণে ঘটে, এই কারবারের ততই প্রসার হইয়া থাকে : আর অনাবৃষ্টির জন্য যখন কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হয়, তখন প্রায়ই চামড়ার কারখানায় বিশেষ রূপে মজুরের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, শস্যহানি ঘটিলে গোমহিষাদি

* The process whereby hides are converted into leather require the constant attention of expert chemists, the Indian University give but small encouragement to chemical research, unless this defect be remedied there is little hope that the leather industry of India will receive that assistance from highly trained scientific experts which it so urgently needs (Report Part 1 Page 32).

আহারাভাবে অধিক পরিমাণে মরিয়া যায় সুতরাং সেই সময়ে চামড়ার কারখানার মরসুম পড়িয়া যায়। এদেশ হইতে কেবল মাত্র কাঁচা চামড়া সাত কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি হইয়া থাকে, এবং হরিতকী, খদির প্রভৃতি পাকা চামড়া তৈয়ার করিবার মসলা অর্দ্ধ কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি হইয়া থাকে। অতএব যখন চামড়া, মসলা এবং মজুর, এ সকলেরই সুবিধা এদেশে আছে, তখন এখান হইতে পাকা চামড়া তৈয়ার করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিলে নিশ্চয়ই যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। সচরাচর এই পরিষ্কৃত চামড়া তৈয়ার করার কার্য্যে প্রায় ২৩০,০০০ লোক মজুরী করিয়া থাকে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ সময়ে এই কারবারে যে অধিক সংখ্যক লোক মজুরী করিতে আসে তাহাদিগকে যদি বরাবর এই কার্য্যে নিযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে এই কারবারের বিস্তর প্রসার হইতে পারে। মাদ্রাজবাসীরা এই বিষয়ে বেশ অগ্রসর হইয়াছেন। ১৯০১ সালের পরমিটের হিসাবে প্রকাশ যে ঐ বৎসরে কলিকাতা ও করাচী হইতে আদৌ পরিষ্কৃত চামড়া রপ্তানি হয় নাই, কিন্তু বোম্বাই হইতে এইরূপ চামড়া এক কোটি টাকার রপ্তানি হইয়াছিল, আর মাদ্রাজ হইতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি হয়। এই পরিষ্কৃত চামড়া কিরূপে তৈয়ার করা যাইতে পারে, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য রার্ডিচ সাহেব একটী পরীক্ষাগার সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মাদ্রাজে যে প্রণালীতে চামড়া তৈয়ার হয়, এবং অন্যবিধ প্রণালীর পরীক্ষা করিয়া যেটী ভাল বলিয়া স্থির হইবে সেই প্রণালী এই পরীক্ষাগারে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

মাটির বাসন।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ১৫৪০,০০০ লোক মাটীর বাসন তৈয়ার করিয়া থাকে তথাপি বিদেশ হইতে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকার মৃন্ময় বাসন প্রতি বৎসর আমদানী হয়। উৎকৃষ্ট রকমের চিনার বাসন এ দেশে প্রস্তুত হয় না বলিয়াই এত টাকা এদেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যায়। এ দেশে যে ভাল বাসন তৈয়ার হয় না তাহার কারণ কারিগরদিগের যন্ত্রাদি ভাল নহে. এই কারণে এক এক জন কারিগরের পক্ষে যে পরিমাণ বাসন তৈয়ারি করা সম্ভব সে তাহা তৈয়ার করিয়া উঠিতে পারে না। তদ্ব্যতীত তাহাদিগের ভাল মাটী বাছিয়া লইবার অভিজ্ঞতা না থাকাতে জিনিষও ভাল হয় না। ইহার উপর বাসন পোড়াইবার ভাল চুল্লী কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; এজন্য একদিকে জ্বালানী কাষ্ঠ অপব্যয় হয়, অপর দিকে পোড়াইবার সময় অনেক বাসন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, এই সকল কারণে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। বাসন চিক্কন করিবার প্রণালীও এদেশে কেহই অবগত নহে; ইহাও এই ব্যবসায়ের প্রসারের একটী অন্তরায়। যে মাটীতে ভাল চিনার বাসন তৈয়ার হয় এদেশে তাহার কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। কেবল উহা প্রস্তুত করিবার জ্ঞানেরই অপ্রতুল। যাহাতে এত চিনের বাসন প্রস্তুত করিবার উচ্চতর প্রণালী এদেশে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে সে জন্য দিল্লীতে একটী কারখানা সংস্থাপন করিবার জন্য কনফারেন্সের সভ্যগণ পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। দিল্লীতে এইরূপ কারখানা সংস্থাপন করিলে অনেক প্রকার সুবিধা হইতে পারিবে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে যত কুম্ভকার আছে, তাহার অর্দ্ধেক লোক প্রায় পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমবাসী। (২) এতদঞ্চলে যে রূপ সূক্ষ্ম কারুকার্যের মৃন্ময় পাত্র প্রস্তুত হয় সেরূপ আর কোথাও হয় না। এই কারুকার্য্যের জন্যই পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমের বাসন বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। (৩) তথায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। হিন্দুরা মাটীর বাসন ব্যবহার করেনা, সুতরাং ঐ প্রদেশে অধিক বাসন কাটতি হইতে পারিবে ও কাটাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারিবে। তাহার পর একটা প্রধান সুবিধা এই যে দিল্লীর সন্নিকটে উৎকৃষ্ট চিনা বাসন তৈয়ার করিবার মাটী পাওয়া যাইবে, আর সেখানে ভাল ভাল কারিগরও আছে। এই সকল কারণে দিল্লীতে কারখানা স্থাপন করাই কনফারেন্স শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন; তবে বঙ্গদেশেও যে বহুসংখ্যক কুম্ভকার আছে এবং পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা যেরূপ অধিক, তাহাতে এ অঞ্চলে এই উন্নত প্রণালীর শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে তাঁহারা একথাও বলিয়াছেন। চিনা বাসন তৈয়ার করিতে শিখিবার জন্য এইরূপ একটী কারখানা সংস্থাপন করিতে

দশ হাজার টাকা মূলধনের আবশ্যক। তদ্ব্যতীত কারখানা চালাইবার জন্ম বৎসরে ·· হাজার টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে।

তৈল

সরিষা, তিসি, রেড়ী প্রভৃতি তৈল বীজ এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৈল প্রস্তুত করিবার জন্যই এই সকল বীজ ভূরি পরিমাণে য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশ হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া তাহা যদি বিদেশে রপ্তানি করা যায়, তাহা হইলে কত লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া জীবীকা অর্জ্জন করিতে পারে। রেড়ীর তৈল এদেশ হইতে কতক পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে; তাহার কারণ এই, নির্ম্মল (refined) রেড়ীর তৈল প্রস্তুত করিতে ভালরূপ রৌদ্রের প্রয়োজন। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে ভাল রৌদ্রের অভাব, সেখানে এদেশ হইতেই রেড়ীর তৈল চালান হইয়া থাকে। কিন্তু সরিষা কি তিসির তৈল অল্পই চালান হইয়া থাকে। এদেশে তৈল প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দিতে পারিলে কেবল যে একটা ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহা নহে, ইহাতে কৃষিকার্য্যেরও সুবিধা হইবে। কেননা বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে যে খইল হইবে তাহাতে যেমন ভূমিতে সার দিবার অধিক সুবিধা হইবে তেমনই গো মহিষাদির খাদ্য সরবরাহ হইবে। এইরূপ খাদ্য যত সুলভ হইবে, দুগ্ধাদিও তত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে। এইরূপ বিবিধ কারণে রাডিচি সাহেব কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এদেশে তৈল প্রস্তুত বিষয়ে মনোযোগী হইতে পরামর্শ দিয়াছেন।

চিনি।

এদেশে চিনির কারবারের কিরূপ অবনতি হইয়াছে তাহা অনেকে অবগত নহেন। পূর্ব্বে একমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই সর্ব্বত্র চিনি রপ্তানি হইত। ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও চিনির ব্যবসা বেশ চলিত কিন্তু গত ১০।১৫ বৎসর য়ুরোপীয় চিনির আমদানী আরম্ভ হওয়া অবধি এদেশ হইতে চিনি রপ্তানি এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তা বিদেশে না যাউক; দেশে যে চিনি কাটতি হয় তাহাও যদি দেশ হইতে সরবরাহ হয়, তাহা হইলেও এ কারবার ভাল রূপ চলিতে পারে। রাডিচি সাহেব যে নক্সা তৈয়ার করিয়াছেন তাহাতে আমরা দেখিলাম যে বিদেশ হইতে প্রায় ৫৮৫,০০,০০০ টাকা মূল্যের চিনি এদেশে আসিয়াছে আর এদেশ হইতে কেবলমাত্র ২০০,০০০ টাকার চিনি চালান হইয়াছে। অতএব দেশেই চিনির কাটতি করিবার যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। কার্পাসসূত্র, রেসম, পশম, চামড়া প্রভৃতি রং করিবার উদ্ভিজ্জ এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, এই জন্য পূর্ব্বে এদেশে রংরেজের কার্য্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এদেশের নীল হরিদ্রা কুসুম ফুল মঞ্জিষ্ঠা হরিতকী প্রভৃতিতে যেমন পাকা রং হয় এখনকার খনিজ রংএ (mineral dies) তেমন হয়না। অথচ এখন এই খনিজ রং এবং কারবার খুব চলিতেছে এবং এদেশের রং ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। ১৯০২ সালে জর্ম্মানি ও বেলজিয়ম হইতে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকার এই কাচা রং আমদানি হইয়াছে। কনফারেন্সের সভ্যেরা বলিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা উদ্ভিজ্জ হইতে উৎপন্ন দেশী রং যাহাতে পুনঃ প্রচলিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। এ বিষয়ে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে সত্বর মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত Institute for Scientific Research সংস্থাপিত হইবার অপেক্ষা না করিয়া বর্ত্তমান সময়ে যে সকল রাসায়নিক পরীক্ষাগার (Chemical laboratory) আছে তাহাতেই এবিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিতে তাঁহারা বলিয়াছেন।

রেসম।

রেসমও ভারতের একটী পুরাতন পণ্য; কিন্তু এই রেসমের ব্যবসা এখন এক প্রকার নষ্টপ্রায়। ১৯০১ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৬৬,০০,০০০ টাকা মূল্যের রেসম ও ১১,০০,০০০ টাকা মূল্যের রেসমী বস্ত্রাদি বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যদিকে বিদেশ হইতে ৮১,০০,০০০ টাকার রেসম ও ১৪৮,০০,০০০ মূল্যের রেসমী বস্ত্রাদি আমদানি হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা রেসম ব্যবসায়ের আর কতদূর অবনতি হইতে পারে? নানা কারণে এই অবনতি ঘটিয়াছে। গুটী পোকা হইতে

আরম্ভ করিয়া রেসম প্রস্তুত করিবার সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে দোষ ঘটীয়াছে, সেই জন্যই এই অবনতি। বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব, মধ্য দেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত কোথাও ভাল রেসম তৈয়ার হয় না। কয়েক বৎসর হইতে এই রেসম ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন জন্য গবর্ণমেণ্ট কতকটা উদ্যোগী হইয়াছেন। বাঙ্গালায় রামপুর বোয়ালিয়াতে রেসম তৈয়ারী শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু রেসম বয়ন শিখাইবার জন্য কোথাও কোন বিদ্যালয় নাই। কনফারেন্স এই বয়ন বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন মধ্য প্রদেশে গুটীপোকা পালন বিষয়ে শিক্ষাদান বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। গুটীর দোষে এখানে রেসম বয়ন কার্য্যে বড় বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে রেসমী বস্ত্র বয়ন শিখাইবার জন্য একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে এ বিষয়ে পরীক্ষাদি করিয়া বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় সে জন্য একটী পরীক্ষাগার সংস্থাপন একান্ত প্রয়োজন। এজন্য কনফারেন্স বলেন যে বোম্বাইয়ে সেই পরীক্ষাগার সংস্থাপিত করিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। বোম্বাইয়ে যেরূপ কল কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাতে এই পরীক্ষাগারের জন্য তথায় অনেক সুনিপুণ কারিগরের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু ইহার জন্য যে ব্যয় হইবে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে যে সম্মত হইবেন এমন বোধ হয় না। তাঁহারা বলেন, এই পরীক্ষাগার সংস্থাপন করিতে দুই লক্ষ টাকা মূল ধনের প্রয়োজন তদ্ব্যতীত বৎসরে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

কাগজ।

কলে কাগজ প্রস্তুত আরম্ভ হওয়াতে আমাদের দেশের কাগজীদের ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এই সকল কলে বহুসংখ্যক শ্রমজীবী নিযুক্ত হইয়া জীবীকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে। এদেশে যে কয়টী কাগজের কল আছে তাহার সকলগুলিই প্রায় বিলাতী মূল ধনে সংস্থাপিত হইয়াছে, তবে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে Upper India Couper Mill প্রভৃতি দুই একটী কল এদেশীয় লোকদিগের দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। এখনও এদেশে যে পরিমাণ বিলাতী কাগজ আমদানী হয় তাহাতে কাগজ তৈয়ার করিবার জন্য বিস্তর কল চলিতে পারে। বার্ডিচি সাহেবের নক্সায় দেখিলাম যে বৎসরে প্রায় ৬০,০০,০০০ টাকার কাগজ এদেশে আমদানী হয়। উত্তর পশ্চিম বাসীদিগের ন্যায় বঙ্গদেশবাসীগণ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে তাহারা যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন।

কাচ

এদেশে কাচের কারখানার সংস্থাপন করিতে পারিলে যে বিশেষ লাভ হইতে পারে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এ বিষয়ে সময়ে সময়ে চেষ্টাও হইয়াছে কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। বিদেশ হইতে এদেশে বৎসরে প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকার কাচ আমদানী হয় অতএব এদেশে কাচের কারখানার যে যথেষ্ট স্থান আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কি জন্য এদেশে কাচের কারখানায় সুফল লাভ হয় নাই, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে "কমলার" পাঠকগণকে বিদিত করিয়াছি। কনফারেন্স আরও দুই একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী অপরিষ্কার ক্ষার ব্যবহার, আর একটী এদেশে বিলাতী কাচ নির্ম্মিত সামগ্রী যেমন সস্তায় প্রস্তুত হয় এখানে সে প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয় নাই। এই দোষ সংশোধন করিবার যে চেষ্টা হয় তাহা নাই নহে, তবে দৈব ঘটনাতে তাহার সাফল্য হয় নাই। উত্তর পশ্চিমের আলাহাবাদ, মৈনপুরী, এটাওয়া প্রভৃতি স্থানে কাচের কারখানা আছে এবং সেই সকল স্থান হইতে অনেক কাচের জিনিষ ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হয়। প্রায় ৬৫,৫০০ জন লোক এই কারবারে নিযুক্ত আছে। ইহাতে কনফারেন্স মনে করেন যে ঐ অঞ্চলে কাচ তৈয়ার করিবার একটী পরীক্ষাগার সংস্থাপন করা যাইতে পারে। মিষ্টার ওয়াগলে নামে একজন বোম্বাইবাসী ভদ্র লোক বিলাতে গিয়া কাচ তৈয়ার করিতে শিখিয়া আসিয়াছেন। কনফারেন্সের মতে তাঁহাকে এই পরীক্ষাগারের কার্য্যভার প্রদান করিলে ফল লাভ হইতে পারে। এজন্য দশ

হাজার টাকা মূলধনের প্রয়োজন এবং তদ্ব্যতীত উহাতে বৎসরে প্রায় ২২ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

আমরা সংক্ষেপে কনফারেন্সের রিপোর্ট হইতে কয়েকটী ব্যবসায়ের অবস্থা ও কিরূপে তাহার উন্নতি হইতে পারে ইত্যাদি কথা প্রকাশ করিকরিলাম। কিন্তু ঐ রিপোর্টে আরও অনেক ব্যবসায়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে যাহার উন্নতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী না হইলে অবশ্য বিশেষ উন্নতির আশা নাই; তথাপি সাধারণ লোকে চেষ্টা করিলে কতক কতক ব্যবসায়ের যে উন্নতি করিতে পারেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই জন্য আমাদিগের ইচ্ছা দেশের যে সকল শিক্ষিত লোকের ব্যবসায় বাণিজ্যে অনুরাগ আছে, তাঁহারা কনফারেন্সের এই রিপোর্ট খানি পাঠ করেন। ইহাতে ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং এতাবৎ গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কি করিয়াছেন তাহাও বিবৃত আছে। আমরা সময়ে সময়ে এই রিপোর্ট হইতে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

যে ভারত এক দিন জগতের শিরোভূষণ ছিল, যে ভারতের সন্তানগণ বাণিজ্য বিষয়ে এতদূর পরদর্শী ছিলেন, যে তাঁহারা দুরন্ত সাগরবক্ষে বড় বড় পোতযোগে দূরদেশে বাণিজ্যার্থে যাতায়াত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, এমন কি লোহিত সাগরে গমন করিয়া, ইটালীয়, পর্তুগীজ জাতি দিগের সহিত সর্ব্বদা বাণিজ্য চালাইতেন সেই ভারতের এখনকার অবস্থা দেখিলে মনে আক্ষেপের আর সীমা থাকে না। ভারত সন্তানগন কি জাতীয় অধীনতার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তিরও স্বাধীনতা হারাইয়াছে? তাহারা কি আপনাদিগের জাতীয় অবস্থার হীনতা এখনও বুঝিতে পারিতেছে না? পূর্ব্বকালে ভারতসন্তানেরা এরূপ নিপুণতা সহকারে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেন, যে এখন ভারতের শিল্প-নিপুণতাকে The Oriental boast বলে। অদ্যাপিও যখন কোন শিল্পপ্রদর্শনবিষয়িনী সভা হয় (Art Exhibition), ভারতের শিল্প প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে। ঢাকার মলমল, জামদানী কাপড়, কাশ্মীরের শাল দোশালা, বেনারসের জরির কাপড়, মান্দ্রাজের জরির বা রেশমের পাড়ওয়ালা কাপড়, বহরমপুরের রেশমি কাপড়, খাগড়াই কাঁসার বাসন, কটকের রূপার বাসন, দিল্লির নানা রঙ্গের মিনা করা গহনা প্রভৃতি দ্রব্যাদি অতুলনীয়। যদিও বিদেশীয় নানা স্থান হইতে হরেক প্রকার দ্রব্যাদি এখন আমদানি হইতেছে তথাপি ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যাদির সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না।

ভারতবাসীদিগের উদ্যম, অধ্যবসায় একেবারেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল পরাধীন চাকুরীর দিকে সকলেরই লক্ষ্য। যদিও এতদ্দেশীয় প্রায় অনেকেই এক্ষণে রাজপুরুষদিগের সহবাসে ও সহায়তায় বিলক্ষণ বিদ্যালাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন ও সুখভোগ করিতেছেন, কিন্তু তাহারা বাণিজ্য কার্য্যে এরূপ পরাঙ্মুখ, ও তাহার প্রতিকূলাচরণে এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প, যে তাহারা প্রাণান্তেও দেশান্তরে গমন ও নিজ নিজ অবস্থা উন্নত করিতে কোন প্রকারেই ইচ্ছুক নহেন। দাসত্বই মানব জীবনের সার কর্ম্ম এইটী নিশ্চয় জানিয়াছেন। নানা দেশ ভ্রমণ ও নানাজাতীয় লোকের সহিত ব্যবহার দ্বারা প্রণয় বন্ধন ও তাহাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি জ্ঞাত না হইলে বিলক্ষণ জ্ঞান ও দুরদর্শিতা লাভ হয় না। ভিন্ন জাতীয় লোক সমূহ নানা দেশ হইতে বিবিধ দ্রব্য আহরণ করিতেছে ও এতদ্দেশোৎপন্ন দ্রব্যাদি অন্যান্য দেশে লইয়া যাইতেছে। এই প্রকারে ব্যবসায় দ্বারা অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহারা অতুল ধন লাভ করিতেছে! এই দেশের লোকেরা গৃহে বসিয়া যাহা প্রাপ্ত হন তাহাই ভাল, এরূপ না ভাবিয়া যদি সকল প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে এ দেশের শ্রী অন্যরূপ হইত। এদেশবাসীর নিশ্চেষ্টতা দাসত্ব অনুসরণের পরিণাম। এখন পরাধীন চাকুরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রায় সকলেই আপন আপন জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া বাল্যকাল হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিসে পরিণত বয়সে একটী চাকুরী পাইবেন, এই দিকেই মতিকে চালিত করিয়া তাঁহারা এমন অকর্ম্মণ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন এবং অন্যান্য

জাতি হইতে এতদূর অধোগতি লাভ করিয়াছেন যে, নিরূপিত ৩০।৪০ ত্রিশ চল্লিশ টাকা মাসিক বেতন হইলেই নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন। এই জন্যই দেশীয় শিল্প বাণিজ্যাদির এরূপ হীন অবস্থা। এখনও অল্প চেষ্টা করিলে আমাদিগের পূর্ব্বেকার শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সহজে করিতে পারা যায়। পুরাতন কারিগর সকল এখনও স্থানে স্থানে আছে, তাহারা নিরুৎসাহে ও কষ্টে কাল যাপন করিতেছে। কথঞ্চিৎ উৎসাহ যদ্যপি তাহারা পায়, তাহা হইলে তাহারা ব্যবসায়ে পুনরুত্থান করিয়া আবার আমাদিগের ভারতকে চেতনাবস্থায় আনিতে পারে। এইরূপ নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট ভাবে যদি আমরা চাকুরির অনুবর্ত্তী হইয়া জীবন অতিবাহন করিবার এখনও চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদিগের অবস্থা ক্রমে ক্রমে আরও শোচনীয় হইয়া উঠিবে। কারণ আমাদিগের এরূপ অবস্থায় আচার, বল, বীর্য্য, উদ্যম, সাহস, কর্ম্ম-পটুতা, অধ্যবসায়, ও মনের স্বাধীনতা একেবারেই লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং আমাদিগকে পশুবৎ কাল যাপন করিতে হইবে। পরে যদি কখন নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া আমাদিগের মনে স্বাধীন ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে উপায় উদ্ভাবন করিবার জ্ঞান বুদ্ধির অভাবে বিফল মনোরথের দাবানলে পুড়িয়া হাহাকার করিতে হইবে। এখনও সময় আছে, দেশের অবস্থা ও নিজ নিজ হীনতা দেখিয়াও কি মনে ঘৃণা হয় না, কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যুবকবৃন্দের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছাত্রদিগের এদিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, কারণ ভারতের ভাবী উন্নতি বা অবনতি তাঁহাদিগেরই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠে তাঁহারা অবগত হইয়াছেন যে বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য বিনা কোন প্রকারেই দেশীয় আর্থিক ও মানসিক উপায় নাই। তখন কি প্রকারে স্বদেশের ও আপনাদিগের উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে, যত্ন সহকারে এ বিষয়ের উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। "সম্পদ (মূলধন) অভাবে বাণিজ্যে নিযুক্ত হওয়া প্রাজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে" এই এক প্রাচীন অবনতিউৎপাদক কথা বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে নিরুৎসাহ হওয়া কেবল অনভিজ্ঞতার পরিচয়। সকল প্রকার ব্যবসাই কি অপরিমিত মূলধন না হইলে চলে না? "ব্যবসায়" কথাটি শ্রবণ মাত্র বোধ হয়, যেন একটী বৃহৎ ব্যবসায় বহুল পরিমাণে ধনের সাপেক্ষ; যদি এই কথাটীর এই অর্থ ধরিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে কোন কালে কোন জাতি বা কোন দেশ উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে না। ব্যবসায় যেমন বড় তেমনি ছোটও আছে। অনেক দেশে দেখা যায় সেখানকার লোকেরা স্বল্প মূলধন লইয়া ছোট ছোট কারবারে নিযুক্ত থাকিয়া কেমন উন্নতি লাভ করতঃ স্বাধীনভাবে ও সুখ সচ্ছন্দতার সহিত কাল যাপন করিতেছে। যদি কোন সূত্রে তাহাদিগকে পরবশ হইবার জন্য অথবা ব্যবসায় ছাড়িবার জন্য কোন প্রস্তাব করা হয় তাহারা তৎক্ষণাৎ বিরক্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া এরূপ ভাবে প্রত্যুত্তর করে যে, সহজেই তাহাদিগের মনের স্বাধীন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাণিজ্য সর্ব্বতোভাবে দেশের উন্নতির একটী বিশেষ সোপান, এবং মনুষ্যবর্গের সুখ সচ্ছন্দতার ও পরস্পর মিলনের একটী প্রধান উপাদান। এ বিষয়ে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। অতএব যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ পরিমাণে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে জাতীয় ও দেশীয় উন্নতি করণের কোন চিন্তা থাকিবে না। কারণ যেমন তাঁহারা পাঠে মন দিয়া অবাধে বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছেন, সেইরূপ বাণিজ্যেও অবাধে পটু হইয়া উঠিবেন, চাকুরির জন্য লালায়িত হইতে হইবে না, ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত জাপান দেশীয় লোক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

শ্রীলশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬ ও ৩৬ নং ফৌজদারী-বালাখানা, কলিকাতা।

অশ্বগন্ধা রসায়ন।

অকাল বার্দ্ধক্যের মহৌষধ।

কালের কুটিল মাহাত্ম্যে—নিজের কপাল দোষে, কর্ম্মবশে, জলবায়ুর দূষিত রসে—লোকে কত কষ্ট পায়। সুখের সংসার শোকের কাল-কারাগার। অকাল বার্দ্ধক্য অকাল মৃত্যুর প্রভাব কিসে নিবৃত্তি পায়?

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

ভগ্নদেহে, মগ্ন প্রাণে নূতন সুঠাম; লাবণ্য জড়িত, পীযূষ-পূরিত শোভাময় নবীন গঠন, আশা,— উল্লাস,— আনন্দের যৌবন-জোয়ার। কতদিন পরে আবার কত দিন পরে আঁধার ঘরে বাসন্তী পূর্ণিমা রজত ধারে আনন্দ মকরন্দের সৌরভ সাবে, চারিধারে সুধা ঢালিবে, শূন্য পিঞ্জর কাকলীরবে আবার মর্ম্মরিত হইবে।

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

জ্বরে—অনাচারে—অত্যাচারে—আহার বিহারের দোষে বারে বারে কত কষ্ট সহিলে; আজি প্রমেহ, কালি ধাতুদৌর্ব্বল্য, পরশ্ব শ্বাসকাস;—বারমাস দুঃখ কষ্ট—যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কত বাজে ঔষধ ব্যবহার করিলে। কিন্তু কি ফল হইল? যাতনা দ্বিগুণ বাড়িল আঁধার ঘোরতর হইল। এইবার—

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

দেখিবে ইহার মোহিনী শক্তি। ইহা ইন্দ্রজাল নহে, ভোজবাজী নহে। ঋষিবর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ জীবনীয় ঔষধ অশ্বগন্ধার বীর্য্য হইতে বিশুদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত

অশ্বগন্ধা রসায়ন।

ইহা স্বাস্থ্য-সংস্থাপক, রক্ত-সংশোধক, শুক্রজনক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও আগ্নেয়। সেইজন্য ইহা শুক্রতারল্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য শোণিতবিকার ও ক্ষুধামান্দ্যের মহৌষধ। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তির পরিচয় পাইবে। তরলশুক্র আবার গাঢ় ও ওজস্বী হইবে, ক্ষীণ পেশী ও স্নায়ুতন্ত্র যৌবনের উদ্দাম তেজে আবার দৃঢ় ও কঠিন, সবল ও কর্ম্মঠ হইবে, নিষ্ক্রিয় যন্ত্র ও ইন্দ্রিয় সকল আবার সত্বর কার্য্য তৎপর হইয়া সংসার সুখময় করিয়া তুলিবে একবার—

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

ইহা ছাত্রদিগের মহোপকারী; কারণ ইহা মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং অধিক অধ্যয়ন জনিত কষ্ট ও দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া দেয়।

অশ্বগন্ধা রসায়ন—স্ত্রীদিগের রজঃ ও জরায়ু-দুষ্টি, মৃতবৎসাদোষ ও প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া শরীর ও জরায়ু সুস্থ ও সবল করে।

মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা।

মাঃ ভিঃ পিঃ ১৷৷৵০ দেড় টাকা এক আনা।

৩ শিশির মূল্য ৩৷৵০ তিন টাকা বার আনা

১২ শিশির মূল্য ১৫৲ টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অপরের কথা কি বলিব।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন যাহা বলিয়াছেন, একবার দেখ, তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন

শ্রীযুক্তবাবু আদ্যনাথ বসু এল, এম্, এস,

ডাক্তার মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"মহাশয়ের আবিষ্কৃত "অশ্বগন্ধারসায়ন" নানাস্থানে ব্যবহার করাইয়া যেরূপ আশাতীত ফল পাইয়াছি, তাহাতে আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইহা "শারীরিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।" অধিকন্তু ইহা দ্বারা প্রমেহের এবং মূত্রকৃচ্ছ্রেরও বিশেষ উপকার হয়।"

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন, চিকিৎসক।

১৪৬ নং ফৌজদারী-বালাখানা, কলিকাতা।

চীনের বাদাম।

চীনের-বাদামের গাছ অনেক দিন ধরিয়া ভারতবর্ষে আছে বটে, কিন্তু সকলেই ইহার আদিম উৎপত্তি স্থান দক্ষিণ আমেরিকায় বলিয়া স্থির করেন। তথা হইতে ইহা ইংলণ্ডে ১৭১২ খৃঃ অব্দে আনীত হইয়াছিল। কবে এবং কাহার দ্বারা ইহা ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল তাহা জানা নাই। কেহ কেহ বলেন ইহা খুব সম্ভবতঃ চীনদেশের মধ্য দিয়া ৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে নীত হয়। এক্ষণে অনেক পরিমাণে দক্ষিণ ভারতবর্ষে এবং উত্তর ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের কোন কোন অংশে ইহার আবাদ হয়। এই অঞ্চল হইতে প্রথমে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে তৈল প্রস্তুত করিয়া রপ্তানি করা হইয়াছিল এবং তাহার পর হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন ও রপ্তানি হইতেছে। এই তৈলের অভ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে অলিভ তৈলের ব্যবসায়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহা আফ্রিকা হইতে আমাদের দেশে আসিয়াছে। অনেকে ইহা ভারতবর্ষের জিনিষ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। সার জর্জ বার্ডউড ইহার একটী সংস্কৃত নামও দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কোন পুরাতন ভৈষজ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আরকটে ইহাকে মানিলা কড়াই বলে, এই জন্য মনে হয় ইহা আমেরিকা হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া আমাদের দেশে আসিয়াছে; আর কেহ বলেন যে ইহাকে মনালী কড়াই অর্থাৎ 'বালি-কড়াই' কহে। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে 'চীনে বাদাম' বা বিলাতী মুগ কহে। আমাদের দেশের জিনিষ হইলে খুব সম্ভব আমাদের একটা নিজেদের নাম থাকিত। যাহা হউক মানিলা হইতেই হউক আর চীনদেশ হইতেই হউক, উহা কোন উপায়ে ভারতের কল্যাণ জন্য ভারতবর্ষে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার উপর আমাদের সুবিচার করা হয় না।

চিনে বাদামের গাছ বনে জন্মায় না। যথেষ্ট যত্নের সহিত ইহার চাষ করিতে হয়। ইহা ক্ষুদ্র লতা বিশেষ। এক হস্তের উপর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না, লতাইয়া যায়। ইহার পাতা গুলি যুগ্ম-ভাবে একটী ডালে অনেক সংখ্যায় জন্মায় এবং পাতার উল্টাপিঠ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরম কেশে পরিপূর্ণ। ২টী কিম্বা তিনটী ফুল প্রত্যেক পাতার কোণ হইতে একটী একটী করিয়া ফুটিতে থাকে। কালিক্স বা ফুলের বাহিরের সবুজবর্ণ পাপড়ী প্রথমে যোড়া হইয়া থাকে, পরে ঠোঁট গুলি দুভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। পুষ্প-পাপড়ী অপরাজিতা বা কড়াইশুঁটী ফলের মত দেখিতে এবং অতি উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট। চীনের বাদামের ফল সকলেই দেখিয়াছেন। ইহা প্রায়ই কনিষ্ঠ অঙ্গুল অপেক্ষা অধিক বড় হয় না। ইহার গায়ে শিরার দাগ আছে। ইহা তুঁতুলের সুটীর মত। প্রত্যেক বীজের পর একটী গাইট আছে। বীজ গুলি সংখ্যায় ১ হইতে ৪টী পর্য্যন্ত দেখা যায়, এবং দেখিতে বেশ মসৃণ। ফলগুলি কি করিয়া মাটীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করে তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। প্রথমে যখন পুষ্প হইতে ফলের উদ্ভব হয় তখন ফুলের পাপড়ী গুলি ঝরিয়া যায়। ফলটী যে ক্ষুদ্র বোটায় থাকে তাহা ক্রমে বাড়িতে থাকে ও শক্ত হয় এবং ক্রমাগত বাকিয়া বাকিয়া নীচু দিকে নামিতে থাকে। অপক্ক ফলটী এইরূপে শীঘ্রই মাটীর মধ্যে নীত হয় এবং মাটীর ভিতরে তাহার ও অভ্যন্তরস্থ বীজের পরিপক্কতা লাভ হয়। কখনও কখনও দেখা যায় যে লাল পিপীলিকা ইহাদ্বারা আকর্ষিত হইয়া ফলের নিকট গমনাগমন করে। তাহাদের গমনাগমনে মাটী অনেকটা কোমল হইয়া ফলের তন্মধ্যে প্রবেশের সহায়তা করে। পিপীলিকা ফলের কোন অনিষ্ট করে না, তথাপি কেন যে তাহা কর্ত্তৃক আকর্ষিত হয় ইহা বড় গূঢ় রহস্য।

সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে প্রতি বৎসর ৩৩৬০০০ বিঘা জমিতে চীনে বাদামের চাষ হয়। বম্বে প্রদেশে মাদ্রাজ অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক জমিতে ইহার চাষ হয়। ইহার চাষ করিতে গেলে হাল্কা বালি-জমি, প্রচুর পরিমাণে জল ও গরম বাতাসের প্রয়োজন। ইহার চাষে প্রভূত লাভ হইয়া থাকে এবং ইহার কাট্‌তিও প্রচুর। ফ্রান্সে প্রত্যেক বৎসরে ১ লক্ষ টন এই বাদামের রপ্তানি হয়; তন্মধ্যে

ভারতবর্ষ হইতে কেবল মাত্র ৭ সহস্র টন পাঠান হয়, বাকি আফ্রিকা হইতে যায়। পণ্ডিচারি হইতেই ইহার প্রভূত রপ্তানি হয় এবং তথায় ইহার যথেষ্ট চাষও হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় ইহার এত অভাব থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে ইহা প্রভূত পরিমাণে উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টা হয় না। ইহার চাষে কোন নূতনত্ব নাই এবং চাষ করিবার কিছু বাধা বিপত্তিও নাই।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই আবশ্যকীয় গাছের চাষের কথা বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিব। প্রথমে মাদ্রাজ প্রদেশের কথা ধরা যাউক। তথায় ইহা লাল বালি-মাটীতে এবং চূর্ণ পূর্ণ জমিতে বেশ জন্মায়। কিন্তু লাল বালি জমিতে বীজগুলি তত সুন্দর পুষ্ট হয় না। মাঝামাঝি নাবাল জমিতে ইহা খুব ভাল জন্মায়। যে স্থানে জলের কোন অভাব হইবে না সেই স্থানেই উহার চাষের প্রয়োজন। ইহার চাষের একটী বিশেষ সুবিধা এই যে জমি খুব উর্ব্বরা না হইলেও সার দিয়া চাষ করিলেই যথেষ্ট ফসল হইয়া থাকে। যদিও উর্ব্বরা জমিতে দুই চারিবার উপর্য্যুপরি ইহার ফসল হইতে পারে কিন্তু মাঝে মাঝে জমির বিশ্রাম আবশ্যক। সেই সময়ে জমিতে অন্য কোন ফসল বুনিয়া লওয়া যায়। ক্রমাগত এক জমিতে ঐ ফসল বুনিলে বীজে তৈলের অংশ কম পড়িয়া যায়।

এই চাষে যথেষ্ট সার দিতে হয়। কারণ প্রত্যেক ফসলে ইহা অনেক সার খাইয়া ফেলে। মাদ্রাজ প্রদেশে প্রধানতঃ পুকুরের পাঁক ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রত্যেক বিঘায় ১৫।১৬ হইতে ৩০।৩৫ গাড়ি ফেলিতে হয়। দক্ষিণ আরকটে যে পাঁক ব্যবহৃত হয় তাহাতে অনেক পরিমাণে চূণ মিশ্রিত থাকে। বেলে জমি হইলে তাহাতে ঐ ছাই-সার দিলে অনেক উপকার হয়। বিঘা প্রতি ১০ গাড়ি ছাই আবশ্যক।

জমি অনুসারে লাঙ্গল চালাইতে হইবে। ভাল জমিতে অল্প চাষ দিলে চলিবে। যথায় জল ছেঁচিবার সুবিধা নাই তথায় শ্রাবণের শেষে আবাদ করিতে হইবে। অন্যত্র ভাদ্রমাস হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত বীজ বপন করিলেও চলে। বীজ সংগ্রহের সময় বিশেষ সতর্ক হওয়া চাই কারণ সকল জমি হইতে ভাল বীজ পাওয়া যায় না। বুনিবার ৪।৫ দিন আগে ফল হইতে উপরের খোলা ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে। শ্রাবণের কালে প্রত্যেক বিঘায় ১৪ চৌদ্দ সের বীজ বুনিলেই চলিবে, কিন্তু পরে বুনিতে হইলে ইহার দেড়া প্রয়োজন।

বীজ বেশ ঘন ঘন করিয়া বুনিতে হইবে। বীজ বপনের কিছুদিন পরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্কুরের উদ্গম হইবে। এই সকল অঙ্কুর খাইতে এত সুমিষ্ট যে এই সময়ে কাক প্রভৃতি পক্ষী হইতে এই সকল অঙ্কুরকে বাচাইবার জন্য বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক।

জমিতে দুইবার খুরপা করিয়া 'নিড়াইয়া' দিলেই চলিবে; এবং জল ছেঁচিবার সুবিধা থাকিলে সপ্তাহে দুইটী ছেঁচ দিতে হইবে। গাছের বৃদ্ধির সময় তাহাকে পোকার হাত হইতে রক্ষা করা বড়ই প্রয়োজন।

'ভারপুচি, কম্প্রপুচি (mudu) মতুপুচি' এই তিন রকম কীটই প্রধানতঃ দেখা যায়। শিয়াল হইতে এই ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। ইন্দুর, কাঠবিড়াল, শূকর প্রভৃতি জন্তুও ইহার যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া থাকে। এইজন্য ফসলের বৃদ্ধির সময় ক্ষেতে যথেষ্ট পর্য্যবেক্ষণ করা প্রযোজন।

বুনিবার পর ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত ফসল উঠিয়া যায়। প্রথম ফসল বুননের চারিমাস পরে, দ্বিতীয় ফসল আর একমাস পরে এবং শেষ ফসল ষষ্ঠ মাসে পাওয়া যায়। প্রথম ফসলের বীজ অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ ও শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়। রাত্রিকালেই বিশেষ এই ফসল উপড়ান হয় কারণ তাহাতে পাতাগুলি নষ্ট হয় না। পাতায় যথেষ্ট গরুর খাদ্য হইয়া থাকে। যেখানে জমিতে প্রচুর জল পড়ে না সেখানে লাঙ্গলে চষিয়া ফসল উপড়াইতে হয়। গড়ে প্রত্যেক বিঘা জমি হইতে ওজনে ৯।১০ মণ বাদাম পাওয়া যায়। যে জমি বিশেষ শক্ত সেখানে স্ত্রীলোকেরা খুরপা করিয়া ফসল তুলিতে নিযুক্ত হয়। প্রতি বিঘার পেছু ১২ হইতে ২৫ জন লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে। যে জমিতে জলসেক হয় তথায় ১০০ বুসেল ফসল উৎপন্ন হয়।

সহজেই অনুমিত হইবে যে এই বাদামের চাষে অল্প পরিশ্রম ও অর্থের বিনিময়ে প্রভূত লাভ

অনায়াসেই সম্ভব। সেইজন্য যে জমিতে ইহার চাষ হয় তাহাতে অন্যান্য জমি অপেক্ষা অধিক খাজনা দিতে হয়।

প্রত্যেক একার (৩ বিঘা) জমিতে পরিশ্রম ও ব্যয় হিসাব করিলে ২১।০ টাকা পড়ে এবং তাহা হইতে লাভ খরচা বাদে ১৪৫। কিন্তু জলের সেক জন্য ১২।১৩ টাকা অধিক খরচ করিতে পারিলে খরচ বাদ ৩২ টাকা লাভ হয়। অনেক সময়ে চাষারা খরিদ্দার গণের নিকট হইতে ফসল তুলিবার আগে ভরসা করিয়া শতকরা ৩০ টাকা হিসাবে দাদন লইতে ভীত হয় না, কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে মাটীর মধ্যে তাহাদের অনেক অর্থ পোতা রহিয়াছে। ফসল হয় শুঁটী আকারে অথবা খোষা বাদ দেওয়া বীজগুলি ওজন দরে বিক্রয় হয়। বাজারে ১২।১৩ মণ বীজ ১৯।২২ টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু এই দর ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। এমন কি ৩২ টাকায় ১২ মণ জিনিষ ক্রীত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশে মাদ্রাজ অপেক্ষা দ্বিগুণ জমিতে চীনে বাদামের চাষ হয়। যে ফসল উৎপন্ন হয় প্রায় দেশের লোকেরাই তাহা খাইয়া ফেলে। এই প্রদেশে এই চাষের পর সেই জমিতে ইক্ষু, পরে লঙ্কা এবং কখনও কখনও আলু পেয়াজ প্রভৃতি ফসল বোনা হয়। এই প্রদেশে বাদামের জমির উপর ভেড়া ও ছাগল চরাণ হয়; তাহাদের মলমূত্রে ভাল সার হইয়া থাকে। ইহার অভাবে যথেষ্ট গোবর ফেলা হয় এবং ভাল করিয়া লাঙ্গল দিয়া চষিয়া জমি গুঁড়া করিয়া দিতে হয়।

আধ মণ বীজে তিন বিঘা জমি চাষ হয়। এবং ফসলে সময়ে সময়ে ৩।৪ বার জল সেক করিতে হয়। ফল পাকিলে আলু তোলার ন্যায় ইহা তুলিতে হয়।

উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ও যত্ন লইলে বিঘা পিছু ২০০শত মণ ফল পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য উৎকৃষ্ট জমিতেই এরূপ পাওয়া যায়। ফসল হইতে খোলা না খুলিয়াই বিক্রয় করা হয় এবং সময়ে সময়ে টাকায় ১৫।২০ সের বিক্রয় হয়।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইহার চাষ বড়ই অল্প এবং বাগানের ফল হিসাবেই বেশী চাষ হইয়া থাকে; ৪।৫ মণ ফল পাওয়া যায়। প্রায়ই ফল খাইবার ব্যবহারে আইসে। কেবল মির্জাপুরে ইহা হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হয়।

পঞ্জাবে ও মধ্য প্রদেশে ইহার চাষ বড় কম; শেষোক্ত প্রদেশের জমি কিন্তু ইহার চাষের উপযোগী এবং প্রয়োজন মত তথায় যথেষ্ট চাষ হইতে পারে। পঞ্জাবে বৎসরে ৮৯৪ মণ তৈল আমদানি হইয়া থাকে এবং মধ্য প্রদেশেও রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশী হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশে বিশেষ ধনী লোকের বাগান বাগিচায় কেবল ইহার চাষ দেখা যায়। কলিকাতায় প্রতি বৎসরে চীনে বাদামের খাঁকতি ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং সরিষার তৈলে ভেজাল জন্য এবং অন্যান্য কাজের নিমত্ত বাদামে তৈলের আমদানিও কম নয়।

খোসাহীন বীজের ½ হইতে অর্দ্ধেকাংশ তৈলে পরিপূর্ণ। তৈলের ঈষৎ সবুজ ও হরিদ্রা মিশ্রিত বর্ণ এবং একরূপ বিশেষ গন্ধ ও আস্বাদন, কিন্তু যদি শোধন করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে গন্ধ ও বর্ণ থাকে না। তখন বেশ উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দেখায়।

এই তৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব .৯১৬। ইহা হয় বীজগুলিকে চাপ দিয়া কিম্বা চাপ দিবার পূর্ব্বে বীজগুলিকে একটু গরম করিয়া পরে চাপদিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। না তাতাইয়া লইলে যদিও তৈল অল্প পাওয়া যায় বটে কিন্তু ইহাই উৎকৃষ্ট জিনিষ হয়। তখন ইহা বর্ণ-শূন্য ও মিষ্ট গন্ধ বিশিষ্ট অনেকটা অলিভ তৈলের ন্যায়। এই তৈল অনেক ক্ষণ হাওয়ায় রাখিলে আস্তে আস্তে টকিয়া যায়। এই তৈল কিছুতেই শুষ্ক হইয়া যায় না এবং ৭০ ডিগ্রীতে ইহা জমিয়া যায়। যদিও ইউরোপে ও ভারতবর্ষে অনেক স্থলে ইহা জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু আলোক বড় ক্ষীণ হয়। ইহা প্রধানতঃ সাবান প্রস্তুত প্রণালীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সরিষার বা নারিকেল তৈলে ভেজাল মিশাইতে, কল কারখানায় বা মেশিনে দিতে এই তৈল অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। উত্তমরূপে শোধন করিলে ইহা ঔষধও খাইবার জন্য অলিভ তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লাল বালি-জমির বীজে অধিক পরিমাণে তৈল

থাকে। বীজ অধিক পুরাতন হইয়া গেলে তৈল কমিয়া যায়। যে জমিতে জলসেচন করা হয় না সেই জমির বীজে অধিক তৈল থাকে। তানজোর প্রদেশে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাহাই অধিক তৈল সম্পন্ন।

যদিও বাঙ্গলা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে এই বাদামের চাষ হয় না তবে এখানেও বাদাম হইতে তৈল নিষ্কাষণের জন্য কল আছে। কলিকাতায় বৎসরে ১০০০০ মণ এই বাদাম তৈল খরচ হইয়া থাকে। ইহা অনেক মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারীদিগের দ্বারা ঘৃতের পরিবর্ত্তে বা ঘৃতের সহিত ভেজালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য তৈলের সহিত মিশাইয়া দিবার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

তৈল নিষ্কাষণের পর যে খোল পড়িয়া থাকে তাহা উৎকৃষ্ট সার এবং পালিত পশুদিগের খাদ্যরূপে প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে। কলের খোল ঘানি হইতে প্রাপ্ত খোলের ন্যায় উচ্চ মূল্য নহে, কারণ তাহাতে অতি অল্পই তৈল পড়িয়া থাকে। প্রতি বৎসর যে পরিমাণ ফল (৭০০০ টন) ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়া যায় যদ্যপি তাহা তৈলাকারে রপ্তানি হইত তাহা হইলে অনেক খোল বাকি থাকিয়া অনেক কাজে লাগিতে পারিত।

এই তৈল পণ্ডিচারীর নিকট নানা স্থানে সাবান রং করিবার জন্য যথেষ্ট ব্যবহার হয় এবং চামড়া প্রস্তুত করিবার জন্যও ব্যবহার হয়।

ভারতবর্ষে বাদাম তৈল অলিভ তৈলের স্থান অধিকার করিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে বৎসরে ৭৫০ মণ তৈল ঔষধ হিসাবে বিক্রয় হয়। কাঁচা বাদাম খাইতে বেশ সুমিষ্ট এবং স্ত্রীলোক-দিগকে খাইতে দিলে তাহাদের স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অপক্ক ফল পরিপক্ক ফল অপেক্ষা শীঘ্র জীর্ণ হয় কারণ ইহাতে অল্প তৈল আছে।

রন্ধন কার্য্যের জন্যও এই তৈল প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই তৈলে কিছু ভাজিয়া খাইলে তাহার একটা সুমিষ্ট গন্ধ ও আস্বাদন হয় এবং জীর্ণ হইতেও অনেক সময় লাগে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দক্ষিণ ভারতে ও বাঙ্গলাদেশে ইহা ঘৃত এবং সরিষা ও নারিকেল তৈলে ভেজাল এবং ঘৃতের পরিবর্ত্তে অনেক ব্যবহার করা হয়।

বাদাম ফল গুলি খাইলে অজীর্ণ হয়। কিন্তু তথাপি সহরের রাস্তায় চীনার বাদাম ভাজা হাঁকিলে ছেলেদের বুঝাইয়া তুষ্ট করিয়া রাখা প্রায় অসম্ভব। অবশ্য ইহা পেট ভরার জন্য খাওয়া নয় ইহা সখের খাওয়া। ইহা অন্যান্য উপায়ে মালপোর ন্যায় প্রস্তুত হইয়া ধনি ও গরীবের ঘরে নানা রকম পদার্থের সহিত প্রত্যহ ব্যবহৃত হইতেছে।

ফলগুলি বেশ টাট্‌কা ও অপক্ক অবস্থায় তুলিয়া ঘৃত বা তৈল লবণ ও মসলার সহিত সিদ্ধ করিলে অতি সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবার প্রস্তুত হয়। চাট্‌নি প্রস্তুতের জন্য পাকা বাদাম প্রায়ই ব্যবহার হয়। নারিকেলের গুঁড়ার সহিত এই বাদামের পাতা তরকারী রাঁধিয়া অনেক লোকে সুস্বাদু বলিয়া আহার করে।

গাছের কাণ্ড ও পাতা খাইতে পাইলে গো মহিষাদি পশু বেশ সুস্থ ও সবল হয়। এবং কি শুষ্ক কি নধর অবস্থায় অতি আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। ডাঁটাগুলি ভিজিয়া গেলে তাহা ব্যবহার করা যায় না। বাদামের খোসা গুলিতে খোল গুড় মাখাইয়া দিলে পশ্বাদি আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। ইহার খোলও পশ্বাদির আদরের খাদ্য। এই খোল খাইলে পশ্বাদি অধিক পরিমাণে জল খাইয়া থাকে। খাইতে দিবার পূর্ব্বে ইহাকে সিদ্ধ করিয়া দিতে হয় না। কিন্তু যদিও এই খোল খাইলে পশুগুলি বেশ মোটা হয় কিন্তু কেহ কেহ বলেন ইহাতে তাহাদের দুই এক প্রকার ব্যারাম জন্মিতে পারে। তন্মধ্যে রাত্রান্ধতা উদরী, অলসতা, হাঁপানি, প্রভৃতি রোগ জন্মে। কিন্তু ঔষধ গ্রহণে এই সকল রোগ আরাম হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন এই খোল খাওয়াইলে গরুর দুধের ও দোষ হয় কিন্তু ইহাও সন্দেহ জনক।

এই খোল ধান, আক বা কলার খেতে উৎকৃষ্ট সার বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সারে জমির উর্ব্বরতা বাড়ে বটে কিন্তু ফসলে একটু দোষ জন্মে। এই খোলের দ্বারা সার দেওয়া জমি হইতে উৎপন্ন চাউল রাঁধিয়া অল্পক্ষণ রাখিয়া দিলেই তাহা টকিয়া যায় এবং খাইতে বিস্বাদ হয় ও অজীর্ণতা আনয়ন করে কিন্তু যে সকল জমিতে এই খোলের চাষ দেওয়া হয় যদ্যপি যে সকল জমিতে পর্য্যাপ্ত জল না থাকে

তাহা হইলে সেই জমির ফসলে এই সকল রোগ জন্মিবে, নচেৎ নহে। গাছের কাটী ও ফলের খোলাগুলি সার হইবে বলিয়া মাঠে ফেলিয়া রাখা হয় এবং জলে পচিয়া যায়। যে সকল পশ্বাদি এই খাদ্য গ্রহণ করে তাহাদের বিষ্ঠায় অতি উত্তম সার হয়।"

ফলের খোলাগুলি কামারের হাপরে আগুন জ্বালাইবার জন্য ভাল দরে বিক্রয় হয়। ইহার আগুন অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

এই খোসাগুলির দ্বারা আর এক কাজ হইয়া থাকে। যেখানে পর বৎসরের জন্য বীজ জমাইয়া রাখা হয় তাহার চতুষ্পার্শ্বে এই খোলা ছড়াইয়া রাখা হয় তাহাতে উই ধরিবার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীবিরিঞ্চিমোহন কর

রেশম।

গরদ।

(১)

রেশম কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আমাদিগের দেশের সকলেই জানেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে ভাল করিয়া বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই। বঙ্গ দেশের রেশম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—গরদ, তসর, মুগা, এণ্ডি ইত্যাদি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গরদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বস্ত্র ব্যবসায়িদিগের পক্ষে গরদ একটি প্রধান পণ্য দ্রব্য। ইহা বঙ্গ দেশের অন্তর্গত মুর্শীদাবাদ, রাজসাহী, মালদহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় প্রস্তত হইয়া থাকে।

প্রজাপতি জাতীয় একরূপ পতঙ্গ আছে যাহার অণ্ড হইতে একরূপ কীট জন্মে যাহা সাধারণতঃ "পলু" নামে পরিচিত। উক্ত পলুই রেশমের প্রধান উপাদান। পলুর শ্রেণীবিভাগ আছে। কোন শ্রেণীর পলু হইতে গরদ, কোন শ্রেণীর পলু হইতে তসর, কোন শ্রেণীর পলু হইতে মুগা, এবং কোন শ্রেণীর পলু হইতে এণ্ডি প্রস্তত হইয়া থাকে। এই সকল শ্রেণীর পলুর আহারোপযোগী নানাবিধ উদ্ভিদ আছে। যে শ্রেণীর পলু হইতে গরদ প্রস্তত হয় তাহার আহার্য্য এক প্রকার গুল্ম; ইহার নাম তুত গাছ। গরদ সম্বন্ধে সবিশেষ বলিবার পূর্ব্বে, গরদ উৎপাদনকারী পলুদিগের প্রধান খাদ্য তুত গাছের আবাদ বিষয়ে দুই চারি কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি।

বণিকদিগের পক্ষে গরদ যেমন একটি মূল্যবান পণ্য, চাষিদিগের পক্ষে তুতের আবাদ সেইরূপ একটি মূল্যবান চাষ। মুরশীদাবাদ প্রভৃতি জেলার চাষারা তুত গাছকে "তুতপাত" বা "পাতী" বলে, এইরূপ বলিবার অর্থ আর কিছুই নহে কেবল পাতাগুলি বহুল পরিমাণে পলুতে খায় বলিয়াই "পাতী" বলা হইয়া থাকে এবং উহার চাষকে পাতীর চাষ বলা যায়।

তুত পাতের ভাল মন্দ অনুসারে পলুর দৈহিক অবস্থা ভাল মন্দ হয় এবং তদনুসারে গরদও ভাল মন্দ হইয়া থাকে অর্থাৎ পলু সকল যদি ভাল পাতী ভক্ষণ করিতে পায় তাহা হইলে তাহারা ভাল রেশম উৎপাদন করিয়া থাকে।

যে সমস্ত চাষারা ভাল "পাতী" উৎপন্ন করিতে পারে তাহাদিগের পাতী অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের অধিক লাভ হয় কিন্তু তুত আবাদ করিতে চাষাদিগের যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে যে ভাল পরিশ্রমী চাষী এক একার অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অধিক তিন বিঘা জমি আবাদ করিয়া প্রতি বৎসর খরচ বাদে প্রায় ৩০০ টাকা লাভ করিতে পারে। এক জন ভাল চাষা সম্বৎসরে প্রায় ২০ বিঘা তুতজমির আবাদ করিতে পারে।

তুত গাছ নিম্ন ভূমিতে হয় না। উহার আবাদ করিতে হইলে "ডাঙ্গা" জমির আবশ্যক। চাষারা উচ্চ ভূমিকে "ডাঙ্গা জমি" বলে। যে সকল ডাঙ্গা জমিতে তুত জন্মায় তাহার বার্ষিক কর, জমির অবস্থা অনুসারে ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

যে জমিতে তুত জন্মে তাহার ভিতরে কিম্বা তাহার সন্নিকটে বট, অশ্বত্থ, আম্র, কাঁঠাল, তাল, তেঁতুল প্রভৃতি বড় বড় গাছ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ আওতায় তুত গাছ ভাল হয় না, তুতের জমিতে উত্তমরূপ রৌদ্র, আলোক বায়ু প্রভৃতি লাগা নিতান্ত আবশ্যক

চাষাগণ প্রথমে বর্ষার প্রারম্ভে ডাঙ্গা জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া অথবা লাঙ্গল দিয়া চষিয়া থাকে, পরে সেই জমিকে ঠিক সমতল ক্ষেত্র করে, জমি সমান করা হইলে খইল, পাঁক প্রভৃতি নানারূপ সার জমির উপরে ছড়াইয়া দেয়। বর্ষার জলে গলিয়া ঐ সমস্ত সার ভূমির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, বর্ষার সুরু হইতে আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত চাষারা উক্ত জমিতে লাঙ্গল দ্বারা পুনঃ পুনঃ চাষ দিতে থাকে। ভূমি এইরূপে কর্ষিত হইলে ক্রমেই তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। ভূমির অবস্থা দেখিয়া চাষারা যখন বুঝিতে পারে যে তাহাদিগের কর্ষিত ভূমি তুত গাছ উৎপাদনের উপযোগী হইয়াছে তখন তাহারা উক্ত ভূমিকে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করে, অর্থাৎ তাহাতে ঘাস কি অপর কোন গাছ উৎপন্ন হইতে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা নিড়ানীর দ্বারা উঠাইয়া ফেলে।

উক্তরূপে ভূমি রক্ষা করিয়া কার্ত্তিক কিম্বা অগ্রহায়ণ মাসে চাষারা তাহাতে তুত-গাছ রোপণ করে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে চাষারা পুরাতন জমির তুতের গাছ কাটিয়া এক স্থানে গাদা করিয়া রাখে। ঐ গাদাস্থিত তুতের ডাল হইতে একরূপ কুঁড়ি উদ্গম হয়। সেই কুঁড়ি ডাল সহ লইয়া ভূমিতে রোপণ করিলে তুত-গাছ জন্মিয়া থাকে।

সারি দিয়া এক ফুট অন্তর চাষারা কুঁড়ি সহ তুতের ডাল রোপণ করিয়া থাকে। সেই রোপিত তুত ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। তুতের গাছ যেমন বাড়িতে থাকে তাহারাও তেমনি জমিতে সর্ব্বদা চাষ দিয়া ভূমি পরিষ্কার রাখে। ক্রমে গাছগুলি বড় হইয়া ঝাড় বাঁধিতে থাকে। ঝাড়গুলি প্রায় ৩ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ভূমিতে একবার তুত-গাছ উৎপন্ন হইলে তাহার চাষ বহু দিন চলিতে থাকে, কারণ চাষারা আবশ্যক মত তুত গাছ কাস্তিয়া দ্বারা গোড়া হইতে কাটিয়া লয় এবং তাহা ওজন দরে বিক্রয় করিয়া থাকে। ভূমিতে তুত-গাছের যে গোড়া থাকে তাহা হইতে পুনরায় তুত-গাছের উদ্গম হয়। গাছ কাটিয়া লইয়া জমিতে পুনরায় সার দিয়া জমি চাষ করিয়া থাকে।

শিউলি ফলের ক্ষুদ্র চারাগাছের ছোট ছোট পাতাগুলি দেখিতে যেমন, তুত-পাতা দেখিতে ঠিক সেইরূপ। গোরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পত্রভোজী পশুগণ তুত-পাতা ভক্ষণ করে না।

তুত-গাছে সময়ে সময়ে একরূপ রোগ হয়। সেইরূপ রোগগ্রস্ত তুত-পাতা ভক্ষণ করিলে পলু মরিয়া যায়। তাহাতে গরদ উৎপাদনকারী ব্যবসায়িদিগের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। পাতী ক্রেতাগণ উহা ক্রয় করিবার সময়ে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লয়। যাহাতে রোগগ্রস্ত তুত-গাছ না হয়, তৎপক্ষে তাহারা বিলক্ষণ যত্ন করিয়া থাকে। যদি কোন গতিকে গাছ রোগগ্রস্ত হয় তাহা হইলে চাষাগণ তাহা এক কালে ভূমি হইতে উঠাইয়া ফেলে এবং নূতন গাছ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

কেবল চাষারা যে তুত-গাছের আবাদ করিয়া থাকে তাহা যেন কেহ মনে না করেন। ব্যবসায়ের উদ্দেশে অনেক ভদ্র লোকেও বেতনভোগী চাষার দ্বারা তুতের আবাদ করিয়া থাকেন। অবশ্য স্বহস্তে কর্ষণকারী চাষাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের লাভ কম হয়। কিন্তু কম হইলেও কেরাণীগিরী অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল। কারণ একজন ভদ্র লোক যদি একটু পরিশ্রম করিয়া তুতের আবাদে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে তিনি ন্যূন কল্পে বৎসরে বার শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। তুত গাছের আবাদের জন্য অধিক মূলধনের আবশ্যক হয় না, ৩০০ টাকা মূলধন লইয়া চাষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হয় বৎসরে হাজার কি বার শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

মৃত্তিকা।

পার্থিব সকল বস্তুরই ইতিহাস রহিয়াছে। যে দ্রব্য যতই সামান্য হউক না কেন তাহার এক স্থানে আরম্ভ এবং অপর স্থানে শেষ দেখা যায়। যে মৃত্তিকার উপর দিয়া আমিরা সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকি এবং যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত সামান্য বলিয়া বোধ হয় বাস্তবিক তাহাও সামান্য নহে। তাহা প্রস্তুত হইতে কোটি কোটি বৎসর লাগিয়াছে। পৃথিবীর আদিম অবস্থা হইতে আরব্ধ হইয়া অনেক পরিবর্ত্তনের পর এই মৃত্তিকা প্রস্তুত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন পৃথিবী আদিমাবস্থায় একটী বৃহৎ উত্তপ্ত পিণ্ডাকার পদার্থ মাত্র ছিল। কালক্রমে ঐ উত্তপ্ত পিণ্ড তাপ বিকিরণ পূর্ব্বক শীতল এবং ঘনীভূত হইয়া প্রস্তর সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবীর আভ্যন্তরভাগ এখনও অত্যুষ্ণ পদার্থ সমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সময়ে সময়ে আগ্নেয় ভূধরের গহ্বর হইতে যে ধূম, ভস্মরাশি, ও ধাতু নিঃস্রব উদ্‌গীরিত হয়, তাহাই উক্ত পদার্থ সমূহ ভূগর্ভস্থ বাষ্পের প্রসারিণী শক্তিদ্বারা পৃথিবীর কোন কোন স্থানে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, কোথাও বা অবক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একবার যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহাই যে চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে তাহা নহে। জগতে জল, বায়ু ও আভ্যন্তরিক তাপ প্রভাবে নিরন্তর ভূপঞ্জরের অশেষ প্রকারে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। যে স্থান এক সময়ে পর্ব্বতময় ছিল তাহা এখন সমভূমিতে পরিণত, যে স্থান পূর্ব্বে গভীর সমুদ্র ছিল তথায় বর্ত্তমানকালে অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজ করিতেছে। হিমালয় পর্ব্বতের নিম্নতর শৃঙ্গস্থিত অর্ণবচর প্রাণীসমূহের কঙ্কাল দেখিয়া অনুমান করা যায় যে ঐ স্থানে এক সময়ে সমুদ্র তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। সাহারা নামক বিস্তীর্ণ মরুভূমি এক সময়ে সমুদ্র গর্ভে অবস্থিত ছিল। সাহারার স্থানে স্থানে অর্ণবচর জীবকঙ্কাল দ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ ঐরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সমস্ত দ্রব্য এখন যে অবস্থায় আছে পূর্ব্বকালে সেই সমস্ত দ্রব্য ঠিক সেই অবস্থায় ছিল না। পৃথিবীর আদিমাবস্থায় মৃত্তিকা বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না। উক্ত প্রস্তর সমূহ ক্রমশঃ মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। কি প্রকারে মৃত্তিকা প্রস্তুত হইল এক্ষণে তাহাই বর্ণন করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ভূপৃষ্ঠে অসংখ্য শৈলরাজি অবস্থিত ছিল। বৃষ্টির জল পর্ব্বত শ্রেণীর উপর পতিত হইয়া উহার গহ্বরে অথবা ফাটালে জমিয়া থাকিত, জল যখন বরফে পরিণত হয় তখন উহার আয়তন অনেক গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ পর্ব্বত গহ্বরস্থিত জল বরফ হইবার সময় বর্দ্ধিত আয়তন হইয়া পর্ব্বতের গাত্র বিদীর্ণ অথবা বিখণ্ডিত করিয়া দিত। যুগযুগান্তরকাল ব্যাপিয়া এইরূপ হওয়ায় প্রস্তর খণ্ড সকল জীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ ধূলিকণায় পরিণত হইতে থাকে. প্রধানতঃ জল বায়ু এবং উত্তাপের প্রভাবে প্রস্তরখণ্ড হইতে মৃত্তিকা উৎপাদিত হয়। বরফের দ্বারা পর্ব্বতের যে সমস্ত অংশ ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হইয়াছিল তাহাদের উপর ক্রমাগত বৃষ্টি পতিত হইয়া ক্ষুদ্র খণ্ডগুলিকে আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করে। আবার পর্ব্বতের উপরিস্থিত জলস্রোত নিম্নে প্রবাহিত হইবার সময় ক্ষুদ্র প্রস্তরকণাগুলিকে স্থানান্তরে অপসৃত করে। এই প্রকার উপায়ে প্রথম স্তর জমী উৎপাদিত হয়। তাহার পর বৎসরানুক্রমে একই প্রণালীতে পুনরায় প্রস্তর ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, এবং উক্ত প্রস্তরখণ্ডসমূহ ধূলিতে পরিণত হইয়া জমীর আয়তন বৃদ্ধি করে। তৎপরে ঐ মৃত্তিকা অথবা ক্ষুদ্র প্রস্তরকণাগুলির উপর উদ্ভিদ্ জন্মাতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ আর্দ্র প্রাচীরের গাত্রে সবুজবর্ণ অতি ক্ষুদ্র জাতীয় উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র উদ্ভিদকেই আদিম উদ্ভিদ বলা যায়। উহাদের পরিপুষ্টির জন্য বিশেষ সার আবশ্যক হয় না। উহারা পোষণোপযোগী দ্রব্য বায়ুমণ্ডল হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। উক্ত জাতীয় উদ্ভিদ প্রস্তর সমূহের উপর জন্মিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাদের বীজ এত লঘু যে তাহা বায়ু সহকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও দূরদেশে নীত হইয়া থাকে। সুতরাং এই জাতীয় উদ্ভিদগুলি অল্পকাল মধ্যেই অনাবৃত প্রস্তরখণ্ডসমূহকে অধিকৃত করিয়া ফেলে। এইরূপে কত উদ্ভিদ জন্মিয়া আবার মরিয়া যায়। তাহাদের উপর আবার নূতন

গ্রহণ করে। মৃত্তিকা উহাদের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা সার প্রাপ্ত হইতে থাকে। এবং মৃত্তিকা এইরূপে ক্রমশঃ সারযুক্ত হইয়া উচ্চ জাতীয় উদ্ভিদের পোষণোপযোগী হয়।

মৃত্তিকাকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) স্থানীয় মৃত্তিকা (Sedentary indigenous), (২) স্থানান্তরিত মৃত্তিকা (Erratic). যে সকল মৃত্তিকা যেখানে প্রস্তুত হয় যদি সেই স্থানেই অবস্থিত থাকে অর্থাৎ যে প্রস্তরের বিশ্লেষণ দ্বারা মৃত্তিকা প্রস্তুত হইয়াছে যদি মৃত্তিকা সেই স্তরের উপরেই রহিয়া যায় তবে তাহাকে স্থানীয় মৃত্তিকা বলে। (২) নদী অথবা স্রোতের জল যে সকল ধূলিকণা বা কর্দ্দম ভাসাইয়া লইয়া গিয়া নদীর মোহানায় বা নিম্নস্থানে সঞ্চিত করিয়া স্তর উৎপাদন করে তাহাকে স্থানান্তরিত মৃত্তিকা বলে। এক গ্লাস নদীর ঘোলা জল যদি রাখিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার নিম্নে কণাগুলি জমিয়া গিয়াছে। গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদনদী বৎসরে বৎসরে এই প্রকার অনেক মণ মৃত্তিকা সমুদ্রে লইয়া যায়। এক্ষণে প্রতীয়মান হইবে যে, যে সমস্ত মৃত্তিকা স্রোত প্রভাবে একস্থান হইতে স্থানান্তরে সন্নিবেশিত হয় তাহাকে স্থানান্তরিত মৃত্তিকা কহে। বঙ্গদেশে অধিকাংশ মৃত্তিকা প্রায় স্থানান্তরিত মৃত্তিকা (Alluvial soil.) মৃত্তিকাকে সাধারণতঃ উপরোক্ত দুইটি মূল বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

এক্ষণে মৃত্তিকার উপাদান সমূহ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। মৃত্তিকায় দুই শ্রেণীর উপাদান দেখা যায়—অঙ্গারক, ও অনঙ্গারক। প্রাণী এবং বৃক্ষ সমূহের ধ্বংসাবশেষকেই প্রধাণতঃ মৃত্তিকার অঙ্গারক অংশ বলে। তদ্ভিন্ন মৃত্তিকার অপর সমস্ত অংশ অনঙ্গারক। অনেক মৃত্তিকাতে অনঙ্গারক অংশ অপেক্ষা অঙ্গারক অংশ কম দেখা যায়। মৃত্তিকায় সাধারণতঃ কি কি উপাদান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই তালিকায় গবর্ণমেণ্টের শিবপুর কৃষিক্ষেত্রের জমীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল।

১ অদ্রবণীয় সিলিকা ঘটিত পদার্থ এবং বালুকা	৭৩.৫৮	৭ পটাস্ } ৮ সোডা }	.৬৪
২ লৌহ	৬.৩৬	৯ ফস্ফরিক্ এসিড্	.১১
৩ য়্যালুমিনিয়া	৭.৯২	১০ সল্ফিউরিক্ এসিড্	.৩০
৪ ম্যাঙ্গানিজ্	.১১	১১ কার্ব্বনিক্ এসিড্	১.৩৫
৫ চূণ	১.৫২	১২ অঙ্গারক অংশ এবং জল	৬.৭৬
৬ ম্যাগ্নেসিয়া	১.৬১	১৩ নাইট্রোজেন	.০৬৫

এই কয়েকটি পদার্থের মধ্যে পটাস্, ফস্ফরিক এসিড্, চূণ, এবং নাইট্রোজেন্ জমীর প্রধান উপাদান। এবং এই কয়েকটি উপাদানের তারতম্যানুসারে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা অথবা অনুর্ব্বরতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যে মৃত্তিকায় নিম্নলিখিত পরিমাণে উপাদান সমূহ বিদ্যমান থাকে তাহাই উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা বলিয়া পরিগণিত হয়।

বালুকা...শতকরা	৫০ ভাগ	হইতে	৭০ ভাগ	পর্য্যন্ত
মৃত্তিকা...	,,	২০	,,	৩০	,,
চূণ ...	,,	৫	,,	১০	,,
অঙ্গার ...	,,	৫	,,	১০	,,

পলিমাটী এত উর্ব্বরা হইবার কারণ এই যে উহাতে অনেক প্রকার উপাদান মিশ্রিত থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মৃত্তিকা ভিন্ন অপর এক প্রকার মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে অঙ্গারক অংশ অত্যন্ত বেশী অথবা সমস্তই অঙ্গারক। এই প্রকার মৃত্তিকাকে ইংরাজীতে হিউমস্ (Humous) কহিয়া থাকে। বাঙ্গালায় ইহাকে বোদ্মাটি বলে। ফলতঃ এই হিউমসের ন্যূনাধিক্য অনুসারে জমীর অনুর্ব্বরতা ও উর্ব্বরতা নির্দ্ধারিত হয়। হিউমসের স্বয়ং বৃক্ষ পোষণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই বটে কিন্তু ইহা বিশ্লেষিত হইয়া বৃক্ষের কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপাদান্ প্রস্তুত করিয়া দেয়। এই অঙ্গারক পদার্থ থাকিলে জমী উর্ব্বর হয়, তাহা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে যত-বেশী হিউমস্ থাকে জমী ততই ভাল হইবে। অনেকস্থানে এরূপ দৃষ্ট হইয়াছে যে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হিউমস্ থাকায় জমী অনুর্ব্বর হইয়াছে। অধিক অঙ্গারক সারসংযুক্ত জমী (Peaty) অথবা জলা জমী প্রভৃতি ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। কর্ষিত ভূমির অঙ্গারের (Humous) পরিমাণ অনির্দ্দিষ্ট, সাধারণতঃ শতকরা দুইভাগ হইতে ৯ ভাগ পর্য্যন্ত হিউমস্ থাকিতে পারে।

সমস্ত হিউমস্ সংযুক্ত জমীই কালক্রমে বৃক্ষ-পোষণোপযোগী হয়।

আরও কতক উপায়ে মাটি কর্ষণোপযোগী হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা যায় নাই। এস্থলে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। প্রথমতঃ মাটিতে অনেক আণুবীক্ষণিক কীটাণু আছে। উহারা মাটির কণাসমূহ ভাঙ্গিয়া এবং পরিবর্ত্তিত করিয়া মৃত্তিকা কোমল এবং আল্‌গা করিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ কেঁচো এবং অপরাপর পোকা প্রভৃতিও মৃত্তিকার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডারউইন প্রমাণ করিয়াছেন যে এই সমস্ত জীবের দ্বারা উদ্ভিদ্ উৎপাদনের অনেক সহায়তা হয় ইহারা মাটিতে সুড়ঙ্গ করিলে উহার ভিতর দিয়া জল এবং বায়ু অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং এতদ্দ্বারা জমীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে জমী বৃক্ষপোষণোপযোগী হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এই ক্ষুদ্র প্রাণী সমূহের দ্বারা মৃত্তিকার অঙ্গারক এবং অনঙ্গারক উপাদান একত্রিত হইয়া জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। ভিক্টর হেনসান নামক কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে প্রত্যেক একারে (৩ বিঘা) ৫০০০০ পোকা থাকে, অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে অঙ্গারক উপাদান প্রস্তুত করণ এবং মৃত্তিকা কর্ষণোপযোগী করণ পক্ষে এই সমস্ত পোকা যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

মৃত্তিকা-কর্ষণ।

মৃত্তিকাকর্ষণের উপকারিতা মানবগণ যে অনেক-দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। মানব সমাজ বিচারশক্তি দ্বারা অবগত হইয়াছে যে ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত না হইলে ফসল উৎপাদনে সমর্থ হয় না। মৃত্তিকা কর্ষণের দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য দেখা যায়। প্রথম, মৃত্তিকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করণ। তদ্দ্বারা বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল মৃত্তিকার মধ্যে আনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে এবং প্রবেশ করিতে পারিলে তাহারা উদ্ভিদ্‌পোষণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়।

দ্বিতীয়, মৃত্তিকা বিশেষরূপে আলোড়িত ও চূর্ণীকৃত হইলে তাহার ভিতর জল বায়ু এবং উত্তাপ অনায়াসে প্রবেশ করিয়া রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে পারে। এইরূপ জলবায়ু এবং তাপের সাহায্যে মৃত্তিকার মধ্যস্থিত অনেক দ্রব্য বৃক্ষের শরীর পোষকরূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ জল এবং বায়ু দ্বারা মৃত্তিকালীন পদার্থ সমূহ রাসায়নিক সংযোগে পরিবর্ত্তিত হইয়া বৃক্ষের অশেষ উপকার সাধন করে। তৎসম্বন্ধে এই প্রবন্ধের শেষাংশে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইবে। মৃত্তিকা এবং বৃক্ষাদির বিশেষ গুণ বিশদরূপে বুঝিতে পারিলে মৃত্তিকা কর্ষণের উপযোগিতাও হৃদয়ঙ্গম হইবে। যখন কোন কঠিন পদার্থ তরল পদার্থের সহিত সংলগ্ন থাকে তখন কৈশিকা-কর্ষণ দ্বারা তরল পদার্থ কঠিন পদার্থের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। কঠিন পদার্থে কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্র নলদ্বারা এই ব্যাপার সাধিত হয় বলিয়া এই আকর্ষণের নাম কৈশিকাকর্ষণ। এই কৈশিকা-কর্ষণের দুইটী নিয়ম আছে। (১) কৈশিক ছিদ্র বা নল যে তরল পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয় তাহার উক্ত নলকে সিক্ত করিবার শক্তির তারতম্যানুসারে এবং তরল পদার্থের গুণানুসারে নলমধ্যে তরল পদার্থ উত্থিত অথবা পতিত হইয়া থাকে। তরল পদার্থ নলকে সিক্ত করিতে না পারিলে উহা অধিক দূর উত্থিত হইতে পারে না। এবং পারিলে বহিঃস্থ তরল পদার্থের উপরিভাগ হইতে নলমধ্যস্থ তরল পদার্থের উচ্চতা অধিক হইয়া যায়। ২য় উত্তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তরল পদার্থের উত্থান এবং পতন উভয়ই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আর একটী প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে দুইটী বিভিন্ন প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে একটী সচ্ছিদ্র পর্দ্দা (যেমন পার্চমেণ্ট) ব্যবধান দিলে উক্ত পর্দ্দার মধ্যদিয়া এক তরল পদার্থ অন্য তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। তরল পদার্থের এই গুণকে ইংরাজিতে "এণ্ডস্‌মোস্" (Endosmose) অথবা অন্তঃ প্রবাহ বলিয়া থাকে।

এক্ষণে উদ্ভিদের গঠন প্রণালী কিরূপ দেখা উচিত। প্রত্যেক বৃক্ষ অসংখ্য আণুবীক্ষণিক সেল (cell) বা কোষদ্বারা গঠিত। উদ্ভিদের শাখা, ফল, ফুল এবং পাতা প্রভৃতি সমস্ত অংশই এইরূপ কোষের সমষ্টি।

প্রত্যেক কোষ এক একটী প্রায় গোলাকার থলির ন্যায়। কোষের আবরণ অত্যন্ত পাতলা ও সচ্ছিদ্র। উদ্ভিদের জলাকর্ষণী শক্তি বুঝিতে হইলে উহা মনে-রাখা নিতান্ত আবশ্যক। সাধারণতঃ উদ্ভিদের যে মূল দেখা যায় তাহার গাত্রে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর বহু সংখ্যক মূল Root hairs) সংলগ্ন হইয়া থাকে। ঐ সূক্ষ্ম মূলরূপ নলসমূহ দ্বারা উদ্ভিদ্ মৃত্তিকার নিম্নতর স্তর হইতে উর্দ্ধতর স্তরে জলীয় পদার্থ আনয়ন করিতে পারে। আবার উদ্ভিদের পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র মূলগুলি ও কোষসমূহের সমষ্টি। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে উপরোক্ত "এণ্ডস্মোস্ শক্তির প্রভাবে বহিঃস্থ তরল পদার্থ এবং কোষমধ্যস্থিত তরল পদার্থ পরস্পর সংমিশ্রিত হইতে পারে। অপরদিকে কৈশিকাকর্ষণের নিয়মানুসারে উক্ত জলীয পদার্থ অনায়াসে বৃক্ষমধ্যে উত্থিত হয়। এই বহিঃস্থ তরল পদার্থই বৃক্ষের সার; মৃত্তিকার সমস্ত দ্রবণীয় অংশ ঐ জলের সহিত মিশ্রিত থাকে। অদ্রব অবস্থায় বৃক্ষ কোন পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে না। মৃত্তিকামধ্যে এমন কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা সহজে দ্রব হয় না, যেমন ফস্ফেট্ (Phosphate) প্রভৃতি। কিন্তু অধিক পরিমাণে জল পাইলে উহারা দ্রব হইয়া যায়। মৃত্তিকার ভিতর বৃক্ষের মূল যত অধিক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে ততই বৃক্ষ পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

এক্ষণে মৃত্তিকাকর্ষণের উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা যাউক। জল বৃক্ষের একটী প্রধান জীবন ধারণোপায়। একটী বৃক্ষ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহার শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ জল। মৃত্তিকা এরূপভাবে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক যে বৃক্ষ তাহার উপর সতেজে দাঁড়াইতে পারে, অথচ মৃত্তিকা এরূপভাবে আলোড়িত হইবে যে উহার মধ্যে জল অথবা জলীয় বাষ্প অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত যে যে জমীতে ফসল উৎপাদিত হইবে তাহাতে কখনও জলের অভাব না হয়। উত্তাপের পরিমাণ অধিক হইলে জল দুই রকমে মৃত্তিকা হইতে বহির্গত হয়। প্রথম, বৃক্ষমূলদ্বারা শোষিত হইয়া পত্রদ্বারা বহির্গত হয়। দ্বিতীয়, সূর্য্যের প্রখর কিরণে মৃত্তিকার জল বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া জমী হইতে বহির্গত হইয়া যায়। নিড়ানী এবং লাঙ্গল দেওয়ার বিশেষ উপকারিতা এই যে, উপরিভাগস্থ মৃত্তিকা ভগ্ন হইয়া গেলে মৃত্তিকার কৈশিক নলগুলি ভগ্ন অথবা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহাতে উপরিভাগে অপেক্ষাকৃত কম জল উঠে ও ভগ্ন মৃত্তিকায় বায়ু প্রবেশ করিতে থাকে এবং নিম্নস্তর পর্য্যন্ত অধিক উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। কৃষকগণ এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে বৃক্ষ পোষণের জন্য নিম্নস্তর হইতে জল আনয়ন করিতে পারে, অথচ ঐ জলকে সূর্য্যের কিরণদ্বারা অনায়াসে শোষিত হইতে দেয় না। অনাবাদি অকর্ষিত জমীতে অত্যন্ত অল্প জল থাকার কারণ এই যে কৈশিক নলদ্বারা জল মৃত্তিকার নিম্নস্তর হইতে উপরিভাগে উত্থিত হয় এবং উপরে সঞ্চিত হইবামাত্র উত্তাপদ্বারা বাষ্পে পরিণত ও অদৃশ্য হইয়া যায়।

মৃত্তিকার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করায় একটী মহৎ প্রয়োজন সংসাধিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকার মধ্যে সলফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন ও হিউমিক্ এসিড্ (Sulphuretted Hydrogen and Humic Acid) প্রভৃতি এরূপ কতকগুলি পদার্থ আছে যদ্দ্বারা গাছের সমধিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। মাটির ছিদ্রগুলি উন্মুক্ত থাকিলে তদ্দ্বারা অক্সিজেন (Oxygen) প্রবেশ করিয়া ঐ সমস্ত পদার্থকে বৃক্ষের হিতকর করিয়া দেয়। বিশেষতঃ Oxygenএর আর একটী গুণ এই যে তদ্দ্বারা ভূমিতে নাইট্রেট Nitrate প্রস্তুত হয়। এই Nitrate বৃক্ষের জীবন ধারণের প্রধান উপায়। মৃত্তিকার মধ্যে যে সকল অতি ক্ষুদ্র কীটাণু অবস্থিতি করে তাহারা বায়ু ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। এই কীটাণুও Nitrate প্রস্তুত করণের প্রধান কারণ।

মৃত্তিকা কর্ষণের উপকারিতা কি কি?—প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, মৃত্তিকা কর্ষণ না করিয়া তাহার উপর বীজ ছড়াইয়া দিলে সে সমস্ত বীজ হইতে একটীও বৃক্ষ উৎপাদিত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, মৃত্তিকা কর্ষণের উদ্দেশ্য নিম্নস্তরের মৃত্তিকা উপরিভাগে আনয়ন করা। আমাদের দেশের জমি অনুর্ব্বরা হওয়ার কতকগুলি কারণের মধ্যে একটী কারণ সহজে বুঝিতে পারা যায়। কোন মৃত্তিকায় যে

সমস্ত উদ্ভিদ পোষণোপযোগী উপাদান থাকে একবার তাহা হইতে ফসল তুলিয়া লইলে কিয়ৎ-পরিমাণে তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। আর আমাদের দেশে সচরাচর যে সমস্ত ফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে (যেমন ধান্য, গোধূম, তিল, সর্ষপ প্রভৃতি) তাহাদের মূল সাধারণতঃ ছয় ইঞ্চির অধিক মৃত্তিকায় প্রবেশ করে না। সুতরাং চাষ করিতে করিতে উক্ত ৬ ইঞ্চি জমী ক্রমশঃ সারবিহীন হইয়া পড়ে। তখন সার সংযোগ না করিলে অথবা গভীর কর্ষণ দ্বারা নিম্নস্তরের মৃত্তিকা উপরিভাগে আনয়ন না করিলে অধিক ফসল লাভের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক-গণ সেরূপ যথেষ্ঠ পরিমাণে সার সংযোগ অথবা মৃত্তিকা সুচারুরূপে কর্ষণ করে না বা করিতেও জানে না। যে সকল জমীতে ধান্যাদি ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় সে সমস্ত প্রায়ই উর্ব্বরা জমী। কিন্তু অনুর্ব্বরা ভূমি কর্ষণ ও তাহাতে সার সংযোগ করিয়া উর্ব্বরা করিয়া তুলিতে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। এ দেশে গভীরভাবে কর্ষণ করার প্রথা পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে কৃষকেরা দরিদ্রতা ও অনবধানতা বশতঃ ঐ প্রথাই সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিতে পারে না। গভীর মৃত্তিকা কর্ষণ কৃষিকার্য্যের যে একটী প্রধান অঙ্গ তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। কোন কোন কৃষিতত্ত্ববিৎ গভীর কর্ষণে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে মৃত্তিকার নিম্নস্তর উদ্ভিদজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। নিম্নস্তরস্থিত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থগুলি মৃত্তিকার উপরিভাগে আনীত হইলে বৃক্ষাদির বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। উক্ত অমূলক আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে ভারতবর্ষে মৃত্তিকার নিম্নস্তরে প্রধানতঃ দুইটী ক্ষতিকর পদার্থ থাকিতে পারে, ঐ দুইটী লৌহের যৌগিক পদার্থ মাত্র। অর্থাৎ ফেরস্ সল্‌ফাইড্ (Ferrous Sulphide), ও ফেরিক্ অক্সাইড (Ferric Oxide) এতদ্ভিন্ন কতকগুলি অঙ্গারক দ্রাবকও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফেরস্ সলফাইড্ ও ফেরিক্ অক্সাইড্ মৃত্তিকার উপরে আনীত হইলে বায়ুস্থিত অক্সিজেনের (Oxygen) সাহায্যে উহাতে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। এদেশের প্রখর রৌদ্রের তাপে অঙ্গারক দ্রাবকগুলিও পরি-বর্ত্তিত হইয়া যায়। পূর্ব্ব কথিত লৌহ যৌগিক পরিবর্ত্তিত হইলে বৃক্ষের পক্ষে ক্ষতিকর হয় না। সুতরাং গভীর মৃত্তিকা কর্ষণে অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে গভীর মৃত্তিকা কর্ষণে অপকার হইয়া থাকে। আমাদের জল-সিক্ত ধান্য ক্ষেত্র ইহার একটী উদাহরণ স্থল ; ঐরূপ জমীতে অক্সিজেন প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং কোন পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হয় না। এরূপ স্থলে মৃত্তিকাকে প্রথমতঃ শুষ্ক করিবার উপায় উদ্ভাবন করাই কর্ত্তব্য। কৃষকেরা সাধারণতঃ ঐ সমস্ত জমীতে খড়ি নিমক দিয়া থাকে। খড়ি নিমকে প্রধানতঃ দুইটী পদার্থ আছে। সোডিয়াম্ সল্‌ফেট (Sodium Sulphate) ও সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্ (Sodium Chloride) উহাদের দ্বারা তাদৃশ অপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। জলনির্গম প্রণালীর পথ পরিষ্কার করিলে এবং মৃত্তিকা উল্টাইয়া দিলে উপকার হইতে পারে। গভীর কর্ষণ সম্বন্ধে আরও বক্তব্য এই যে, যে সমস্ত ক্ষেত্র সংপ্রতি গভীর কর্ষণ করা হইয়াছে তাহাতে বীজ বপন করা উচিত নহে। আর বৃষ্টি হইবার অনতিপূর্ব্বে অথবা অব্যবহিত পরে গভীর কর্ষণ করা অযৌক্তিক। কারণ তাহাতে ক্ষেত্রের মাটি অত্যন্ত আলগা হইয়া যায়। পুনরায় যদি ঐ জমী বিশেষ জলসিক্ত হয় তবে তাহার মাটি জমাট বাঁধিয়া যাইবে। তখন মৃত্তিকা পুনরায় ভাঙ্গিয়া না দিলে শস্যোৎপাদন-যোগ্য হইবে না। জমীতে শস্য উৎপাদন জন্য যতটুকু জলের আবশ্যক তাহার আধিক্য বা অল্পতা হইলে শস্যের ক্ষতি হইতে পারে। তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলে কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। ফলতঃ মৃত্তিকা কর্ষণ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই উল্লিখিত হইল। কৃষিকার্য্যের জন্য যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে তন্মধ্যে লাঙ্গলই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এই দেশীয় লাঙ্গল লইয়া বর্ত্তমান সময়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিতেছে। অপরাপর যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে তদ্দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। আমাদের দেশে যেরূপ লাঙ্গল বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা সকল সময়ে সুচারুরূপে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয় না। কারণ তাহার ফলা পাতলা ও চেপ্টা তদ্দ্বারা গভীরভাবে ভূমি

কর্ষণ করিয়া মাটি উপরে আনীত হয় না। পক্ষান্তরে আজকাল যে সমস্ত বিলাতী অথবা এতদ্দেশীয় বিভিন্ন প্রকার লাঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এদেশীয় গরু টানিতে সম্যক্ সক্ষম নহে। অধুনাতন ভাল লাঙ্গল প্রচলিত করিতে হইলে বড় গরুর আবশ্যক। যাহারা বলিষ্ঠ গরু রাখিতে পারে তাহাদের ভাল লাঙ্গল ব্যবহার করা আবশ্যক, নতুবা কৃষকদিগকে কেবল কোদালিদ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট "শিবপুর লাঙ্গল" নামে যে প্রকার নূতন লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন উহাতে অনেক সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে গরুর অবস্থা যে পর্য্যন্ত ভাল না হইতেছে ততদিন কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ বা উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

শ্রীহরিদাস মিত্র,
কাশিপুর, কৃষিশালা।

শটী

শটী এক প্রকার কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে বর্ষাকালে পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত মৃত্তিকা নিম্নস্থ কন্দ হইতে বিনা চাষে উৎপন্ন হইয়া হেমন্তের প্রারম্ভে ফুল প্রসব করতঃ সীতাগমে মরিয়া যায়। শটী গাছগুলি দেখিতে অনেকটা বন হলুদের গাছের মতন। আয়ুর্ব্বেদে বহুকাল হইতে ইহার কন্দ ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

"শটী পলাশী ষড্‌গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা।
গন্ধারিকা গন্ধবধূর্ব্বধূঃ পৃথু পলাশিকা॥
ভবেদ্‌গন্ধ পলাশী তু কষায়া গ্রাহিণী লঘুঃ।
তিক্তা তীক্ষ্ণাচ কটুকা সোষ্ণাস্য মলনাশিনী॥
শোষ কাস ব্রণশ্বাস শূলাধ্মান গ্রহাপহা।
নির্গন্ধা গুণতো ন্যূনাক্রিমিকুষ্ঠ বিষাদনী॥"

'পদার্থ তত্ত্ব চিন্তামণিঃ'

শটীর পর্য্যায়—পলাশী, ষড়গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিকা, গন্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ, পৃথু, ও পলাশিকা। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে ইহাকে শটী বলে এবং পশ্চিম প্রদেশে ইহাকে তিখুর বলে॥ উদ্ভিদ তত্ত্বানুসারে ইহার ইংরাজী নাম কারকুমা জেডোরিয়া (curcuma zeodaria).

শটীর গুণ—শীতের প্রারম্ভে যখন গাছগুলি মরিয়া যায় তখন ক্ষেত্র হইতে ঔষধার্থে কন্দ উঠাইয়া লইতে হয়, কারণ ঐ সময় কন্দ গুলির পূর্ণ পুষ্টি সম্পন্ন হয়। ইহাতে কষায়, তিক্ত, ও কটু তিনটি রস আছে। ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, গ্রাহক এবং মুখের মলনাশক। ইহার দ্বারা শোষ, কাস, শ্বাস, শূল, আধ্মান, কুষ্ঠ, ব্রণ এবং ক্রিমি, বিষ ও গ্রহজ পীড়াদি আরোগ্য হয়।

আমরা ভাব প্রকাশেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

"কর্চ্চুরো বেধমুখ্যশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শটী।
কর্চ্চুরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এব চ॥
সুগন্ধিঃ কটুপাকঃ স্যাৎ কুষ্ঠার্শোব্রণকাসনুৎ।
উষ্ণো লঘু হরেচ্ছ্বাসং গুল্মবাতকফক্রিমীন
গলগণ্ডং গণ্ডমালামপচীং মুখ জাড্যহৃৎ॥"

ভাবপ্রকাশে কর্চ্চুর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়ঃ, কল্পকঃ এবং সুগন্ধি এই কয়েকটি মাত্র শটীর পর্য্যায় পাওয়া যায়। রসের মধ্যে কটু ও তিক্ত এই দুইটি মাত্র পাওয়া যায়। দীপন ও রুচিকর এই দুইটি অতিরিক্ত প্রভাব পাওয়া যায়। অর্শ, গুল্ম, বাত, গলগণ্ড, গণ্ডমালাদি কতিপয় অতিরিক্ত রোগে ইহার ব্যবহার পাওয়া যায়।

পুরকালে হিন্দুরা যে ইহার প্রচুর ব্যবহার করিতেন তাহার প্রমাণ আমরা ইহাকে নয়টি সর্ব্বৌষধির মধ্যে একটি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারি।

মুরামাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনী দ্বয়ং।
শটী চম্পক মুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥

মুরামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শটী, চম্পক ও মুথা এই সকল সর্ব্বৌষধি। পূর্ব্ব বঙ্গে ইহাদিগকে সর্ব্বৌষধি মহৌষধি বলে। প্রত্যেক পঞ্জিকাতেই আমরা এই শ্লোকটি দেখিতে পাই। সুতরাং এই দ্রব্যগুলির পূর্ব্বে বহু ব্যবহার ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়॥ স্বর্গীয় মহাত্মা ৺ কানাইলাল দে রায় বাহাদুরের রচিত ইণ্ডিজিনাস ড্রাগস্ অফ্ ইণ্ডিয়া (Indigenous Drugs of India) নামক পুস্তকেও আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা " the rhizome "Sati" is to be regarded as a mild carminative and aromatic stimulant

useful in flatulence and dyspepsia and as a corrector of purgatives; combined with alum in water, it is also applied to bruises."

উক্ত মহাত্মার মতে ইহা মৃদুশূলনাশক এবং তীক্ষোষ্ণ। আধ্মান এবং অজীর্ণ রোগে ইহা উপকারী। রেচক ঔষধের সহিত ইহা সংশোধক রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ফটকিরির জলের সহিত ইহা সামান্য চর্ম্মোদ্গমাদিতে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্ব বঙ্গের লোকেরা ফোড়া পাকাইয়া ফাটাইয়া ফেলিবার জন্য শটীর কন্দ দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ রূপে ব্যবহার করে।

শটীর চাষের আবশ্যক হয় না। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে ইহা আপনা হইতে মৃত্তিকাভেদ করিয়া উত্থিত হয়। এই গাছের জন্য মনুষ্যের চেষ্টা বা যত্ন একেবারেই আবশ্যক হয় না, বরং ইহাকে ইহার ক্ষেত্র হইতে নির্ম্মূল করা কঠিন। যে কোন প্রকারে কন্দসংশ্লিষ্ট একটি সূক্ষ্ম শিকড় থাকিয়া গেলেও পুনরায় বর্ষাকালে তৎস্থানে শটী উৎপন্ন হইবে। পূর্ব্বাঞ্চলে বহু জমি এই শটীর দৌরাত্মে পতিত পড়িয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এতই প্রবল যে আমরা বিনা পরিশ্রমে বিনা অর্থব্যয়ে লভ্য কাঞ্চনও আলস্যে গ্রহণ করি না। প্রতি বৎসর অসংখ্য শটী বৃক্ষ পত্রাদি বিকাশ করতঃ উৎপন্ন হইতেছে এবং আপনা হইতে মরিয়া মৃত্তিকায় মিশিয়া যাইতেছে। আমি ইহার কোনরূপ ব্যবহার কোন স্থানে আছে কি না অনুসন্ধান করিতে করিতে একমাত্র মৈমনসিংহে টিকা প্রস্তুত উপকরণে ইহার ব্যবহারের তথ্য পাইয়াছি। এতদ্ভিন্ন ইহার অন্য কোন প্রকারেরই ব্যবহার এ পর্য্যন্ত নাই। যদি কেহ শটী গাছ দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি ৪ নং গোবিন্দ সরকারের লেন বহুবাজার ডাক্তার এ, সি, মুখার্জ্জির বাসায় গেলে দেখিতে পাইবেন।

হেমন্তাগমে এই শটী গাছে ফুল হয়। এই ফুল ছড়ার ন্যায় বৃহৎ আকারের হয় এবং দেখিতে অতি সুন্দর। লাল, বেগুণী এবং সাদা রঙ্গের পাপড়ীর দ্বারা এই ফুল সজ্জিত। রাত্রিকালে এই ফুলের পাপড়ীর মধ্যে শিশির পড়িয়া জল জমিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের ছেলেরা প্রাতঃকালে বা বর্ষান্তে ঐ ফুল ছুড়িয়া অন্যের কাপড় ভিজাইয়া আমোদ করিয়া থাকে। ফুলের মধ্যস্থ জলটুকু বেশ স্বচ্ছ ও শীতল হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের ডাক্তারেরা ঔষধে ঐ জল ব্যবহার জন্য যে কেন সঞ্চয় করেন না তাহা বলিতে পারি না। আমার মতে পুষ্করিণীর জলাদি ব্যবহার অপেক্ষা ঐ জল সঞ্চয় করিয়া ব্যবহার করা শতগুণে ভাল।

শটীর কন্দ হইতে আমাদিগের দুইটি আবশ্যকীয় জিনিষ প্রস্তুত হয় -১। শটীর পালো ও ২। আবির বা ফাগ।

শটীর পালো।

বহু পুরাকাল হইতে পূর্ব্ববঙ্গে এই পালোর ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ঐ অঞ্চলের লোক সাগু, বার্লীর পরিবর্ত্তে আবাহমানকাল হইতে ইহা রোগিদিগকে খাওয়াইয়া আসিতেছে এবং সুজি, ময়দার পরিবর্ত্তে ইহার দ্বারা জলখাবার ও পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া কুটুম্বাদির সহিত লৌকিকতাদি পালন করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক অনাথা স্ত্রীলোকের ইহা এক প্রকার জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়। তাহারা শীতের শেষে কোদালি ও ঝুড়ি হাতে নানাস্থান হইতে ঐ সকল কন্দ উঠাইয়া প্রথমতঃ স্তূপাকার করে। তৎপর বঁটির দ্বারা ঐ কন্দগুলির বক্কল ছাড়াইয়া রস নিষ্পীড়িত করিয়া লয়। তৎপর এরারুটাদি হইতে যেরূপ পালো বাহির করিয়া লেয় ইহারও তদ্রূপ পালো বাহির করে। কন্দগুলি স্বাভাবিক তিক্ত রস বিশিষ্ট হওয়ায় পালোগুলি ভাল জলে যতক্ষণ তিক্তরসবিমুক্ত না হয় ততক্ষণ ভাল করিয়া পুনঃ পুনঃ ধুইতে হয়। ধোয়া হইলে পালোগুলি ডেলা বাঁধিয়া যায়। ঐ ডেলাগুলি বেশ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া লইলেই ব্যবহারোপযোগী হয়। এই পালোর অনেক গুণ আছে। ইহা বেশ পুষ্টিকর। পূর্ব্ববঙ্গের গরিবেরা শিশুদিগকে আঁতুড় হইতে দুধের পরিবর্ত্তে ইহা জলে ফুটাইয়া সেবন করায়। দুগ্ধসেবী শিশু গুলি যেরূপ হৃষ্ট পুষ্ট হয় তদপেক্ষা বরং শটীসেবী শিশুগুলি বেশী হৃষ্টপুষ্ট হয়। এই শটীর বহুল প্রচলন হেতু পূর্ব্ববঙ্গে ইনফেন্টাইল লিভারের

রোগী কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীরাও শিশুদিগকে দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়ায়। ইহা লঘু, পাচক, বলকারক এবং রুচিকর। সাগু ও বার্লী অপেক্ষা ইহা সুখসেব্য। জরাদি রোগের প্রথমাবস্থা হইতে শটীর পালো পথ্য স্বরূপ ব্যবহার করিলে প্রায়ই শ্লেষ্মাদির সঞ্চয় হইয়া রোগীর বিকার হয় না। ইহার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে ইহা পাতলা করিয়া জ্বাল দিয়া সেবন করিলে বদ্ধ মল নির্গত হইয়া যায় কিন্তু ঘন করিয়া জ্বাল দিয়া সেবন করিলে পুরাতন উদরাময়েও মল সঙ্কুচিত হয়। অন্য কোন পালোতে আমরা এরূপ আশ্চর্য্য গুণ দেখিতে পাই না।

এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকে ইহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না। এই অসামান্য অমূল্য পদার্থ এ যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গের সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এই সর্ব্বোচ্চ গুণ বিশিষ্ট সুপথ্যের ব্যবহার বিস্তার করিবার জন্য ডাক্তার এ, সি, মুখার্জ্জি কলিকাতার গুটিকতক ভদ্রলোককে অংশীদার করিয়া বরিশাল কাশিপুরে "লাইট ফুড ট্রেডিং কোম্পানী" নামক একটি ফার্ম্ম স্থাপন করিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শটীর পালো আমদানী করেন এবং টীনের কৌটায় বার্লী আদির ন্যায় প্যাক করিয়া বাজারে দোকানে দোকানে বিক্রয়ার্থ রাখেন। প্রথম প্রথম এখানকার ডাক্তার কবিরাজেরা অনেকেই ইহার প্রতিকূলাচরণ করেন, কিন্তু এখন ইহার গুণ দেখিয়া অন্যান্য পথ্যাদির পরিবর্ত্তে ইহাই ব্যবহার করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

উপাদান প্রভেদে শটী পালো রোগী ও শিশুদিগের জন্য দ্বিবিধ রকমে প্রস্তুত করা হয়। জলের সহিত এবং দুধের সহিত। সচরাচর পাতলা রকমে পালো জ্বাল দিতে হইলে আধ সের শীতল জল বা দুগ্ধে আবশ্যক মত মিশ্রির গুড়া বা চিনির সহিত এক ভরি আন্দাজ পালো গুলিয়া মাত্র ৩।৪ মিনিট ফুটাইয়া লইতে হয়। বার্লীর ন্যায় জলে জ্বাল দিয়া তৎপরে দুধ ও মিষ্ট মিশাইয়াও পথ্য দেওয়া যায়। ঘন করিতে হইলে ১ ভরি পালো স্থানে ২ ভরি ব্যবহার করিতে হয় এবং ৩।৪ মিনিট স্থলে ৭।৮ মিনিট ফুটাইতে হয়। গরম জলে বা দুধে পালো ছাড়িয়া দিলে জমাট বাঁধিয়া যায় সুতরাং আগে ঠাণ্ডা জল বা দুধে গুলিয়া লইতে হয়।

এই পালো হইতে লাইট ফুড ট্রেডিং কোং বিস্কুট প্রস্তুতের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বাজারে ঐ বিস্কুট এখন কিনিতে পাওয়া যায়। যদিও এখন পর্য্যন্ত বিস্কুটগুলি বিলাতী বিস্কুটের মতন হয় নাই তথাপি উহা দেশী বলিয়া আমাদের মুখে বেশী ভাল লাগা উচিত।

ডাক্তার এ, সি, মুখার্জ্জি হৈ চৈ করা দেশহিতৈষী নন, সুতরাং অনেকে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না, কিন্তু এই শটির পালোর জন্য আমরা তাঁহাকে সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ দি

শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র দে।

জাপানে ও তৎপরে আমেরিকায় গমন করেন। উভয় দেশে দরিদ্র লোকদিগকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা দেখিয়া তিনি এদেশে সেইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় সংস্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। ধর্ম্মপাল মহাশয় বলেন, ভারতের সর্ব্বত্রই দরিদ্র সন্তানদিগকে সকলে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহারা অস্পৃশ্য ও কৃপার অযোগ্য। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ঠিক ইহার বিপরীত। মালী যেমন যত্নের সহিত ফুলগাছের কেয়ারী করে, দরিদ্র সন্তানদিগকে সেইরূপ যত্নের সহিত সেদেশে জীবিকা অর্জ্জনে সহায়তা করা হইয়া থাকে। দরিদ্র সন্তানদিগের প্রতি সাধারণের এইরূপ যত্ন দেখিয়া ধর্ম্মপাল তাঁহাদিগের নিকট এদেশের দরিদ্র বালকদিগের অবস্থা জ্ঞাপন করেন। ধর্ম্মপালের মুখে তাহাদিগের দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া অনেকের হৃদয় দ্রব হয়। কি উপায়ে এই সকল দরিদ্র বালকদিগের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তথাকার লোক সে বিষয়ে তাঁহাকে নানা প্রকার পরামর্শ প্রদান করেন ও সেদেশে উল্লিখিত শ্রেণীর বালকদিগকে শিল্পাদিতে শিক্ষা দিবার যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা যাহাতে তিনি অবাধে পরিদর্শন করিতে পারেন তজ্জন্য সাহায্য করেন। আমেরিকাবাসীগণ ধর্ম্মপালকে কেবল মুখের কথায় সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই, কিন্তু যাহাতে তিনি শীঘ্র এই শুভানুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন সেজন্য আর্থিক সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগের সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। হনলুলুর জনৈক মহিলা এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার হস্তে ১০৬৯৮ টাকা প্রদান করিয়াছেন, এই অর্থ হস্তে লইয়া ধর্ম্মপাল দরিদ্র বালকদিগকে কৃষি ও অন্যবিধ শিল্পকার্য্য শিখাইবার জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

ভারত যেরূপ বিশাল দেশ এবং এ দেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা যেরূপ অধিক তাহাতে এই সামান্য অর্থ দ্বারা [illegible] লোকের উপকার হইবে? কিন্তু এ ভাবনায় [illegible] হন নাই। তিনি মন্ত্রের [illegible] শরীর পতন [illegible] করিয়াছেন। তিনি [illegible] ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিতেছেন। তিনি যে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে যদি [illegible] পারেন তাহাতে এতদ্বারা দেশের একটী মহা উপকার সাধিত হইবে। ব্যবসায়ের [illegible] দিতে গেলে ইহা একটী লাভজনক কারবার। যেমন করিয়াই হউক সাধারণ জনগণকে ভিক্ষাজীবী লোকদিগের ভরণ পোষণ করিতে হয়। অলক্ষিত ভাবে সাধারণে এতদর্থে যে অর্থ প্রদান করেন তাঁহারা তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারেন না। অতএব সাধারণে দরিদ্র লোককে ব্যক্তিগত ভাবে যে সহায়তা করেন, সেই অর্থ যদি এই সকল বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে অল্প কাল মধ্যেই তাঁহারা দরিদ্র লোকদিগের প্রতিপালনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। এই জন্যই ধর্ম্মপাল তাঁহার এই উদ্যোগের নাম দিয়াছেন India Development Company Ld.। ইহার মূলধন বিশলক্ষ টাকা স্থির করিয়াছেন। প্রত্যেক অংশের মূল্য এক টাকা। জাতীয় উন্নতি কল্পে এই কোম্পানির জন্য ভারতের জনসাধারণের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিতেছেন। এক টাকা করিয়া এই কোম্পানির অংশ সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে দরিদ্র প্রতিপালনের ভার হইতে অব্যাহতি লাভ এই কারবারের প্রধান লাভ। এই বিশ লক্ষ টাকা অতি সহজেই উঠিতে পারে। তীর্থ যাত্রীগণ তীর্থ দর্শনে গিয়া যেরূপ অকাতরে দান করিয়া থাকেন তাহাতে দরিদ্রগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য কিছু কিছু অর্থ দান তাঁহাদিগের ভারজনক মনে না হইবারই কথা। আমাদিগের মনে হয় ধর্ম্মপাল মহাশয় ভারতের নানা তীর্থ স্থানে এতদুদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে বোধ হয় সফলকাম হইতে পারিবেন। তিনি যেরূপ উদ্যমের সহিত এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাতে অল্পদিনের মধ্যে যে তিনি [illegible] অর্থ লাভে সক্ষম হইবেন ইহা আমাদিগের বিশ্বাস।

আমরা অবগত হইলাম যে [illegible] পবিত্র স্থানে অর্থ সংগৃহীত হইলে তিনি [illegible] একটী প্রধান শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবেন। কেবল [illegible] এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা [illegible] অর্থ [illegible] তাহাতে কাশীবাসে [illegible] তাঁহার

প্রস্তাবিত [illegible] শিল্পাদি শিক্ষা-ইবার জন্য তিনি ইংলণ্ড হইতে C. H. Viggurs. নামে একজন উপযুক্ত [illegible] করিয়া আনিয়াছেন। কিরূপ উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপাল মহাশয় কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন ইহা হইতে তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইলে তিনি আমেরিকা হইতে আরও অনেকগুলি শিক্ষক আনয়ন করিবেন। এদেশের দরিদ্র বালকদিগের দুরবস্থার কথা শুনিয়া আমেরিকায় অনেক স্ত্রী ও পুরুষ তাহাদিগকে শিক্ষাদানে সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন। এক্ষণে যাহাতে আমরা এতদুদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি সেজন্য সকলের চেষ্টা করা আবশ্যক। যাঁহারা এই উদ্দেশ্যে যে কিছু অর্থ প্রদান করিতে চাহেন তাঁহারা তাহা কলিকাতায় হংকং ও স্যাংহাই ব্যাঙ্কে ধর্ম্মপালের নামে জমা দিতে পারেন। আমেরিকা হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাও ঐ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে।

ধর্ম্মপাল প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে যে মার্কিণ দেশ হইতে শিক্ষক আনয়ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ইহা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। বর্ত্তমান সময়ে শ্রম শিল্পাদি শিক্ষা বিষয়ে মার্কিণ যেরূপ উন্নত জগতের আর কোন দেশ সেরূপ নহে। মার্কিণের এই শ্রেষ্ঠতা ইংলণ্ডও অস্বীকার করিতে পারেন না। এই জন্যই সম্প্রতি আলফ্রেড মোসলী (Alfred Moseley) নামে ইংলণ্ডের এক জন ধনী সওদাগর আমেরিকার শিক্ষা প্রণালী অবগত হইবার জন্য নিজব্যয়ে একটী কমিসন নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব [illegible] প্রভৃতির ন্যায় গণ্যমান্য লোক [illegible] কমিসনের সভ্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। [illegible] আমেরিকায় অবস্থিতি করিয়া এই কমিসন তথাকার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে একখানি সুবৃহৎ রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন এই [illegible] আমরা অসমর্থ। [illegible] পারি যে আমে[illegible]রা চমৎকৃত [illegible] যে দেশের [illegible]লম্বন দ্বারা [illegible], [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] প্রভৃতি [illegible] হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন। এই জন্য মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের সকল প্রকার শিক্ষা [illegible] দ্বার অবারিত। দেড় কোটি বালক বালিকার শিক্ষার জন্য তাঁহারা বৎসরে ৯০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। এই সকল বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদিগকে গালিচা বয়ন, বস্ত্র বয়ন, মূর্ত্তি গঠন, সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতির কার্য্য ও অন্যান্য নানা প্রকার শিল্পবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। গবর্মেণ্টের চেষ্টা ছাড়া দেশের লোকের চেষ্টাও অসাধারণ। এমন কি এক জন মুক্ত নিগ্রোদাস নিজ ব্যয়ে একটী সহরে ১৮০০ বিঘা জমীর উপর একটী শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। এখানে দেড় হাজার ছাত্র নানা অর্থকরী বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। অনাগরিক ধর্ম্মপাল স্বচক্ষে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ইহার কার্য্য দেখিয়াই তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপনে উদ্যোগী হন। এই বিদ্যালয় দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে এক জন নিগ্রো দাস যদি বিশ বৎসর কালের মধ্যে এইরূপ একটী বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে তবে ত্রিংশ শতাব্দীর সভ্যতার উত্তরাধিকারী ভারতবাসী কি সেইরূপ করিতে সমর্থ হইবে না? ধর্ম্মপাল ভারতের অতীত ইতিহাস স্মরণ করাইয়া ভারতবাসীকে জাগ্রত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা।

বঙ্গের এক জন প্রথিতনামা যশস্বী বলিতেন বাঙ্গালা ভারতবর্ষের মস্তক এবং বোম্বাই তাহার হস্ত। বাস্তবিক চিন্তাশীলতায় ও জ্ঞানানুশীলনে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অগ্রণী বটে, কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মশীলতায় বড়ই পশ্চাৎপদ। যে অর্থ চতুর্ব্বর্গ লাভের দ্বিতীয় সোপান বাঙ্গালা তাহাতে এক প্রকার বঞ্চিত; সে বিষয়ে ভারতের হস্তস্বরূপ বোম্বাইদেশ শীর্ষস্থানীয়। বাঙ্গালায় অনেক ধর্ম্মবীর, সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতি সংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছেন বটে, কিন্তু দেশের ধনবৃদ্ধির দ্বারা আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন এরূপ আদর্শপুরুষ এদেশে বড়ই বিরল। বাণিজ্যই দেশের ধন বৃদ্ধির নিদান, সেই বাণিজ্য ব্যাপারে বাঙ্গালী একেবারে উদাসীন। বোম্বাইয়ের সার জামসেদজী জিজিভাই বা জামসেদজী নাসেরোয়ানজী টাটা অথবা গোকুলদাস কল্যাণজী প্রভৃতির ন্যায় মহাজন—যাঁহারা বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া দেশের শত শত লোকের অন্নোপার্জ্জনের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—বাঙ্গালায় আদৌ আবির্ভূত হন নাই। স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, তারক চন্দ্র সরকার ও মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা পুরুষ এবিষয়ে আমাদিগের কথঞ্চিৎ কলঙ্ক দূর করিয়াছেন। এ বিষয়ে দ্বারকা নাথ ঠাকুরই প্রথমে পথ প্রদর্শন করেন। পাশ্চাত্য প্রণালীতে দেশের লোককে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার দৃষ্টান্ত তিনিই সর্ব্বাগ্রে প্রদর্শন করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমে কার ঠাকুর কোম্পানি নামে একটী বৃহৎ সওদাগরী হাউস প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কোম্পানির সহিত একজন সাহেবের নাম সংযুক্ত ছিল বটে, কিন্তু ইহার মূল ধন সমস্তই দ্বারকানাথের নিজের; কয়েকজন সাহেবকে তিনি ইহার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে এক জনকে শুদ্ধ বখরাদার করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই কারবারে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছিল। এই কার ঠাকুর কোম্পানির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক নামে একটী ব্যাঙ্কও সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজা উপাধি পাইয়া ছিলেন, এই ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব করিতেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার প্রথম বয়সে ব্যাঙ্কের কার্য্যে পিতৃব্যের সহায়তা করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর কার ঠাকুর কোম্পানির ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতি হয় এবং সে জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কারবার তুলিয়া দেন। ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক দ্বারকানাথের জীবদ্দশাতেই উঠিয়া যায়। এই ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়াতে কেবল দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই কিন্তু দেশেরও সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। অতঃপর আর কেহ ব্যবসায় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে সাহস করিতেন না এবং যৌথ কারবারে লোকে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। তথাপি দ্বারকানাথ ঠাকুর এইরূপ ব্যবসায়ে প্রথম পথ প্রদর্শক হইয়া পরোক্ষরূপে যে দেশের অনেক উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

আমরা এখন কলিকাতা বন্দরে যে নানা দেশের বাণিজ্য পোত দেখিতেছি, দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। নিয়মিতরূপে বিলাত হইতে এদেশে যাহাতে বাণিজ্য পোত প্রেরিত হয় তিনিই তদ্বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর রামগোপাল ঘোষ এ পথের পথিক হইয়াছিলেন। তাঁহার আর জি ঘোষ কোম্পানিনামক হাউসের খ্যাতি ইংলণ্ড ও মার্কিণদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল। তাঁহার কারবারের এতদূর প্রতিপত্তি হইয়াছিল, যে বিলাতি জাহাজের মালিকেরা বিলাত হইতে একাএক তাঁহার হাউসে জাহাজ প্রেরণ করিতেন। তিনি রেঙ্গুণ সহরে পর্য্যন্ত তাঁহার কারবারের শাখা খুলিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার কারবারেরও তিরোধান হইল। এই দুইজন লোকের পরই স্বর্গীয় মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাণিজ্য কার্য্যে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইনি বাণিজ্যে যেরূপ সফলকাম হইয়াছিলেন বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেহ সেরূপ হন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সত্য বটে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা তাঁহার পিতা প্রাণকৃষ্ণ লাহার কারবারেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন মাত্র, তিনি নিজে সে কারবারের সংস্থাপয়িতা ছিলেন না, তথাপি তাঁহারই একমাত্র উদ্যম ও কার্য্যশীলতায় প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানির যশ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রাণকৃষ্ণ লাহা প্রথমে ইংরাজ সওদাগরদিগের মুচ্ছুদ্দীগিরী করিতেন। সাহেব সওদাগরেরা বিলাত হইতে যে সকল মাল আমদানী করিতেন; তাহার জন্য তিনি তাঁহাদিগকে টাকা সরবরাহ করিতেন এবং সেই সকল মাল বিক্রয় করিয়া দিয়া আপনার টাকা ও তাহার সুদ এবং বিক্রয় করার জন্য কমিসন ইত্যাদি আদায় করিয়া বাকী টাকা সাহেবদিগকে ফেরত দিতেন। প্রাণকৃষ্ণ দেখিলেন তাঁহারই টাকা এবং তিনিই মাল বিক্রয়ের জন্য দায়ী, অথচ সাহেবেরা কেবল পত্র লিখিয়া মাল আনয়ন করেন বলিয়া যথেষ্ট লাভ করেন, তিনি কেবল সামান্য কমিসন মাত্র পান। এই ভাবিয়া প্রাণকৃষ্ণ স্বয়ং নিজ নামে এক হাউস খুলিলেন। এই হাউসে তিনি বিলাতী কাপড়ের আমদানী করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুচ্ছুদ্দীগিরীও চলিতে লাগিল। দুর্গাচরণ লাহা যথাসময়ে পিতার এই কারবার পরিচালনা করিবার ভার পাইলেন এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানির কারবার দিন দিন যেমন উন্নতি করিতে লাগিল তেমনিই সওদাগর সমাজে তাঁহার মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল।

দুর্গাচরণ লাহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। এই ভবিষ্যদ্দৃষ্টিই তাঁহার উন্নতির নিদান। এই জন্যই যে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির অংশ ক্রয় করিয়া অনেকে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন তিনি তাহাতে প্রভূত অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেকেই অবগত আছেন প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব্ব মাতলা নামক স্থানে একটী বন্দর সংস্থাপন করিবার জন্য এক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কোম্পানি স্থির করিয়াছিলেন যে হুগলী নদীতে যেরূপ চড়া পড়ে তাহাতে অল্পকাল পরে এই নদী দিয়া কলিকাতায় বাণিজ্য জাহাজ সকল গতিবিধি করিতে পারিবে না, সুতরাং কলিকাতার বাণিজ্য নষ্ট হইবে। এই জন্য তাঁহারা মাতলায় জাহাজ আসিবার ব্যবস্থা করিয়া এক বন্দর সংস্থাপন করিতে উদ্যোগী হন

এবং রেলওয়ে দ্বারা ঐ বন্দর হইতে কলিকাতায় মালামাল আনয়ন করিবার বন্দোবস্ত করেন। বন্দরের নাম হইল পোর্ট ক্যানিং এবং রেলওয়ের নাম হইল Calcutta & South Eastern Railway. ঐ বন্দরের লোকেরা কলিকাতায় আসিয়া আপনাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবে বলিয়া শিয়ালদহে Canning Market নামে একটী প্রকাণ্ড বাজার সংস্থাপিত হয়। সেই বাজার এক্ষণে ক্যাম্বেল হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। এই বন্দরের প্রতিষ্ঠাতারা বন্দরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লোকের মনে অপূর্ব্ব আশা উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন। এই কোম্পানির অংশীদার হইতে পারিলে কালে প্রভূত অর্থলাভ হইবে মনে করিয়া আগ্রহের সহিত শত শত লোক উহার অংশ ক্রয় করিতে লাগিল। লোকের আগ্রহ যত বাড়িতে লাগিল অংশের মূল্যও দিন দিন তত বাড়িতে লাগিল। এক এক অংশ আদি মূল্যের দ্বিগুণ এমন কি চতুর্গুণ দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। পোর্ট ক্যানিংএর এই অংশের মূল্য যখন অসাধারণ বাড়িয়া উঠিল, দুর্গাচরণ লাহা সেই সময়ে তাঁহার সমস্ত অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন ও তাহাতে বিশেষ লাভবান হইলেন। যাঁহারা দুর্গাচরণ লাহার ন্যায় দূরদর্শী ছিলেন না, তাঁহারা আরও অধিক লাভের আশায় অংশ ধরিয়া রাখিয়া শেষে নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, এমন কি কেহ কেহ একেবারে ভিখারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সওদাগর রায়চাঁদ এই পোর্ট ক্যানিংএর অংশ কিনিয়া রাখিয়াই দেউলিয়া হইয়া পড়েন। রাম-গোপাল ঘোষও যথেষ্ট ক্ষতি গ্রস্ত হন।

অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতার সওদাগর শ্রেণী দুর্গাচরণ লাহার শক্তি সামর্থ বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে সম্মান করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে কলিকাতা চেম্বার অফ কমার্সের একজন গণ্য মান্য সভ্য হইয়া উঠিলেন, সওদাগর মণ্ডলী সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি Bengal Bonded Warehouse Association, Commercial Union Assurance Company প্রভৃতি অনেক যৌথ কারবারের ডাইরেকটর ও অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন এবং

তিনি সর্ব্ব প্রথমে কলিকাতা পোর্ট ট্রষ্ট নামক বন্দর উন্নতি সমিতির কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ের উন্নতির প্রতি তাঁহার এত দৃষ্টি ছিল যে তিনি এতদর্থে তাঁহার ভ্রাতা ৺শ্যামাচরণ লাহাকে বিলাত পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্যামাচরণ বাবু বিলাতে তাঁহাদের নিজের এক জন এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া আসেন, তাহাতে তাঁহাদের বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হয়। শ্যামাচরণের বিলাত যাত্রায় দুর্গাচরণ উদ্যমশীলতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, সেইরূপ নৈতিক সাহসও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ লাহার বিলাত যাত্রার পর সুবর্ণ বণিক সমাজে বিলাত গমনের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে আর কাহাকে সমুদ্র যাত্রার জন্য জাতিচ্যুত হইতে হয় নাই এবং এক্ষণে কায়স্থ সমাজপতিগণ সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। দুর্গাচরণ লাহার আর একটী মহৎ গুণ ছিল এই যে তিনি স্বজাতিবৎসল ছিলেন এবং তাহা নিজ মুখে প্রকাশ না করিয়া কার্য্যদ্বারা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার আপিস কলিকাতায় একটী প্রথম শ্রেণীর কারবার আমরা দেখিয়াছি। অনেক বাঙ্গালী ধনী তাঁহাদিগের জমীদারী পরিদর্শন করিবার জন্য অনেক সময় ইংরাজ কর্ম্মচারী রাখিতে ক্রটি করেন না, কিন্তু দুর্গাচরণ লাহার এতবড় কারবার, যাহার সহিত বিলাতী কারখানাওয়ালাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে একদিনের জন্য তিনি একজনও ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন নাই। পবলিক সার্ভিস কমিসনে সাক্ষ্য দিবার সময় তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী দ্বারা কার্য্য পরিচালন করিতে তিনি কোন অসুবিধা ভোগ করেন না এবং পোরমিটের Appraiser (যাচনদার) প্রভৃতির কার্য্য বাঙ্গালীকে প্রদান করিলে কোন ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, একথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন।

দুর্গাচরণ লাহা স্বীয় ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে মনোযোগী ছিলেন বলিয়া দেশের মঙ্গল কার্য্যে উদাসীন ছিলেন না। দেশের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে

বৃটীশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং একাধিক বার উহার সভাপতি পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। এ কারণে গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও বড়লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থাপক সভায় তিনি এক দিকে তাঁহার অভিজ্ঞতা, অপর দিকে তাঁহার স্বাধীনতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল সদ্গুণের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দেশের সর্ব্বোচ্চ উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৮৪ সালে C. I. E. উপাধি লাভ করেন, তাহার পর ১৮৮৭ সালে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন, পুনরায় চারি বৎসর পরে মহারাজা উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কলিকাতার সরিফ প্রভৃতি অন্যান্য অনেক সম্মানসূচক পদলাভ করিয়াছিলেন। এতদূর উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও তিনি তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা, অমায়িকতা ও আড়ম্বর শূন্যতা প্রভৃতি গুণ হইতে অণুমাত্র ভ্রষ্ট হন নাই। তিনি সকলের সহিত সর্ব্বদা সমানভাবে আলাপ পরিচয় করিতেন এবং সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া সুখী করিতেন।

উচ্চশিক্ষায় উন্নতির দিকে দুর্গাচরণ লাহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। এতদুদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে কয়েকটী বৃত্তি সংস্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার স্বদেশ চুঁচুড়ার কলেজেও কয়েকটী বৃত্তি দিয়াছিলেন এবং তথাকার দরিদ্র লোকদিগের লেখা পড়ার উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি যেমন অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন তেমনই পরের দুঃখ মোচনে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। কিন্তু তিনি দক্ষিণ হস্তে যাহা দান করিতেন তাঁহার বাম হস্তকে তাহা জানিতে দিতেন না। হুগলি ও চুঁচুড়ার অনেক দরিদ্র ভদ্র পরিবার তাঁহার নিয়মিত বৃত্তিভুক্ ছিল। তিনি কলিকাতা ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী ও সুবর্ণ বণিক দাতব্য ভাণ্ডারে ২৫,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন ও মেয়ো হাঁসপাতালে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত আরও অনেক সাধু অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন।

মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা প্রকৃতই বাঙ্গালার Merchant Prince বণিকরাজ ছিলেন। তিনি বাণিজ্য কার্য্যে যে অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যবসাবুদ্ধিহীন বলিয়া বাঙ্গালীর যে চিরকলঙ্ক আছে তাহা তিনি অপনীত করিয়াছেন। তিনি ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ লাভ করিয়া অনেক ভূসম্পত্তি ও জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে যাঁহারা কিছুমাত্র ধনোপার্জ্জন করেন, তাঁহারা জমীদারীতে সেই অর্থ নিয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া দিন যাপন করেন। জমীদারীতে কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা বা মানসিক চিন্তার কারণ নাই বলিয়া অনেকেই এই সহজ পন্থায় ধন সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এক বারও মনে করেন না যে দুই তিন পুরুষ পরেই তাঁহাদিগের সেই জমীদারীরূপ চাকমাংসের শত ভাগ হইবে এবং তাঁহাদিগের বংশধরগণ কালে সাধারণ লোকের শ্রেণীতে মিশিয়া যাইবেন। বাঙ্গালার অনেক জমীদার বংশের ইতিহাস ইহা দিন দিন প্রমাণ করিতেছে। জমীদারীর লাভ নিশ্চিত হইলেও সেই লাভের টাকা সিন্দুকে না জমাইয়া বা কোম্পানির কাগজে সামান্য সুদে না খাটাইয়া যদি ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে প্রভূত অর্থ লাভ হইতে পারে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যে জমীদারী আছে তাহার আয়ে তাঁহার পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র পৌত্র প্রভৃতিরা পায়ের উপর পা দিয়া সুখে দিন কাটাইতে পারেন। কিন্তু এক দিনের তরে তাঁহার হৃদয়ে সে ভাব উদয় হয় নাই। তিনি যেমন জমিদারীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তেমনই ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। পাছে তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অন্যান্য ধনী সন্তানের ন্যায় অলস ভাবে দিন যাপন করিয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করেন এ জন্য সকলকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একটী কারবারে সকলে নিযুক্ত থাকিলে তাহাদিগের মানসিক বৃত্তি পরিচালনার সম্ভাবনা অল্প ভাবিয়া, তিনি এক কারবার হইতে তিনটী

স্বতন্ত্র আফিসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার পৈতৃক সওদাগরী আফিস প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোং ছাড়া অপর দুইটীর নাম—অভয় চরণ লাহা এণ্ড ব্রাদার্স, ও কৃষ্ণদাস লাহা এণ্ড কোং। তাঁহার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রেরা যেমন বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্য্য শেষ করিতেন অমনি তাহাদিগকে এক একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। আমরা মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার দূরদর্শিতার কথা যতই চিন্তা করি, তত্‌ই আশ্চর্য্য হই। কেবল মাত্র ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে ছেলেদের জমীদারী পরিচালনের বুদ্ধি বিকসিত হইবে না, এই জন্য তাঁহাদিগকে যেমন আপিসের সময় আপিসে নিযুক্ত রাখিতেন, তেমনিই আবার প্রাতে তাহাদিগকে বাড়ীতে জমীদারীর কাজ দেখিতে দিতেন। ইহাতে তাঁহার পরিবার মধ্যে যে কি মঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আমাদিগের দেশের অনেক ধনী সন্তানকে যে আমরা দুর্নীতিপরায়ণ দেখিতে পাই। কার্য্যাভাবই তাহার একমাত্র কারণ। জমীদারী বা অন্যান্য বিষয়সম্পত্তি পরিদর্শন কার্য্য পরিবারের এক জন বা দুই জনের দ্বারা সম্পন্ন হয়, অন্যান্য সকলে তাস সতরঞ্জে বা মোসাহেবদিগের সহবাসে দিন যাপন করেন। এই জন্যই "বড় মানুষের ছেলে" কথাটা ঘৃণাসূচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদিগের দেশের ধনীরা মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি আপনাদিগের বংশধরদিগকে সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদিগের জমীদারীর উদ্বৃত্ত আয় দ্বারা যদি সন্তানদিগকে এক একটী ব্যবসায়ে নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা এক দিকে যেমন তাঁহাদিগকে অসৎ সঙ্গ হইতে রক্ষা করিবার উপায় হয়, তেমনই ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে অর্থাভাব ও দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয়।

ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে যে সকল সদ্‌গুণের আবশ্যক, মহারাজা দুর্গাচরণের সে সমস্তই ছিল। তিনি যেমন কার্য্যতৎপর ছিলেন সেইরূপ দৃঢ়নিয়মী ছিলেন। তিনি স্বাধীন, কাহারও প্রভুত্বের অধীন নহেন বলিয়া কখনও যথেচ্ছভাবে সময়ের অপব্যবহার করিতেন না। যে সময়ে যাহা করিবার ঠিক সেই সময়ে তাহা করিতেন। কখনও কোন কার্য্যে পাঁচ মিনিট বিলম্বে উপস্থিত হইতে তাঁহাকে কেহ দেখে নাই। এই জন্য সাহেবেরা তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি যে সময়ে যাহা করিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, যে সময়ে যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কখনও তাহার অণুমাত্রও অন্যথা করিতেন না। তাঁহার সন্তানদিগকেও এই নিয়ম প্রতিপালনে সর্ব্বদা শিক্ষা দিতেন। সততা ও সত্যপরায়ণতা যে সর্ব্ববিধ উন্নতির নিদান, আমাদিগের দেশের লোক সেটা অনেক সময়ে মনে করেন না। বিশেষতঃ বাণিজ্যে সততা অবলম্বন করিলে যে কখনই উন্নতি হয় না, ইহা দেশের ষোল আনা লোকের বিশ্বাস, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই সততা ও সত্যপরায়ণতার দ্বারাই মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা কুবেরতুল্য ধনী হইয়াছিলেন। প্রতারণা প্রবঞ্চনা, কপটতা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি তাঁহার সকল ব্যবহারে খাঁটি ছিলেন। এক দিনের জন্য কেহ বলিতে পারে নাই যে তিনি অসৎ পন্থা অবলম্বন দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন। নিরহঙ্কার ও আড়ম্বরশূন্যতা তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ ছিল। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক দেশের সর্ব্বোচ্চ উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে জন্য কেহ কখন তাঁহার বাহাড়ম্বর দেখে নাই। কি, বেশভূষা, কি লোকের সহিত আলাপ পরিচয়, কোন বিষয়ে কেহ তাঁহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখে নাই। তিনি যখন "দুর্গাচরণ বাবু" ছিলেন তখনও তাঁহার যেমন প্রকৃতি ছিল, আর মহারাজা হইয়াও সেইরূপ। এদেশের অনেক ধনীর সহিত দেখা করিতে হইলে অনেককে তাঁহাদিগের দ্বারবান হইতে দেওয়ান পর্য্যন্ত সকলের উপাসনা করিতে হয়, রাজা না হইয়াও অনেকে অনেক প্রকার রাজকায়দা প্রদর্শন করেন, মহারাজা দুর্গাচরণের সে সকল আদব কায়দা কিছুই ছিল না। দেখা করিতে গিয়া কেহ তাঁহার দেখা পায় নাই, আমরা এরূপ কথা শুনি নাই। তাঁহার এই স্বভাবের জন্য তাঁহার দ্বারবানেরা পর্য্যন্ত আগন্তুক দিগকে সম্মান ও অভ্যর্থনা করিত ইহা আমরা দেখিয়াছি।

কলিকাতায় অনেক ধনীর দ্বারে বসিবার আসন পর্যন্ত পাওয়া যায় না, ইহা আমরা দেখিয়াছি, এজন্যই একথাটা বিশেষ করিয়া বলিতেছি। মহারাজার সন্তানেরাও তাঁহার সেই স্বভাব পাইয়াছেন। তাঁহারাও সাধারণ লোকের ন্যায় বেশভূষা করিয়া থাকেন, এবং "মহারাজকুমার" বলিয়া সাধারণ লোকের সহিত আলাপ পরিচয়ে কুণ্ঠিত নহেন।

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ" এই চিরপ্রচলিত বাক্য মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং নিজ বংশধরদিগকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা-করি তাঁহারাও সেই মন্ত্র সাধনা করিয়া আপনারা সিদ্ধ হইবেন ও সেই সঙ্গে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন। মহারাজা দুর্গাচরণের আদর্শ লইয়া যদি দেশের জমীদারগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে আমাদিগের দেশের দুঃখ দারিদ্র্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়। আমাদিগের দেশের মূলধন জমীদারদিগের হস্তে, সুতরাং তাঁহারা যদি সেই মূলধন দেশের শিল্প বাণিজ্যে নিয়োগ না করেন তাহা হইলে এদেশের আর্থিক উন্নতির আর উপায় নাই। এইরূপে ধননিয়োগ করিলে আর্থিকও পারমার্থিক উভয়ই লাভ হইবে, ইহা স্মরণ রাখিয়া ধনীগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, ইহাই আমাদিগের হৃদয়ের প্রার্থনা।

কলার আঁশের কাপড়।

কিরূপে কলা গাছ হইতে আঁশ বাহির করিয়া সূতা প্রস্তুত করিতে হয় দ্বিতীয় সংখ্যক কমলাতে তদ্বিষয়ে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কদলীসূত্র কিরূপ ব্যবহারে লাগে উল্লিখিত প্রবন্ধে তাহাও বিবৃত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে পারে পাঠকগণ তাহাও অবগত আছেন। ত্রিবঙ্কুর রাজ্যের শিল্প বিদ্যালয়ে কদলীসূত্র হইতে বস্ত্রবয়নের যে পরীক্ষা হইয়াছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া এদেশের শিল্পীগণের কেহ যদি এই নূতন শিল্পে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে হয়ত কিছু কালের মধ্যে একটী নূতন অর্থ অর্জ্জনের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

১৯০২ সালে ত্রিবাঙ্কুরের শিল্প বিদ্যালয়ে একটী বস্ত্রবয়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জের আঁশ বাহির করিয়া এখানে এক বৎসর কাল নানা প্রকার পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষাকালে তথাকার জঙ্গল মহল হইতে কতকগুলি কলাগাছের আঁশ প্রেরিত হয়। এই আঁশ হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে প্রথমে অতি সামান্যরূপ পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল লাভ হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন কলাগাছের আঁশ তথায় লইয়া সূত্র প্রস্তুত করিয়া এক এক টুকরা কাপড় বুনা হয় এবং সেই সকল টুকরা বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। উহা দেখিতেও যেমন সুন্দর হইয়াছিল সেইরূপ ব্যবহারোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। পরীক্ষা এইরূপ সন্তোষজনক হওয়াতে এই কদলীসূত্র বয়নে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হয় এবং বিস্তৃত ভাবে কার্য্য আরম্ভ হয়।

ত্রিবাঙ্কুরে অনেক জাতির কলাগাছ আছে। এই বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ হইতে ২৯ প্রকার গাছের আঁশ লইয়া পরীক্ষা করা হয়। ইহার মধ্যে ১২ রকম গাছ হইতে এরূপ সূক্ষ্ম আঁশ বাহির হয় যে তাহাতে খুব মিহি খাপের কাপড় তৈয়ার হয়, অবশিষ্ট গাছের আঁশ মধ্যে কতক-গুলি মোটা কাপড়ের উপযোগী ও কতকগুলি দড়ী তৈয়ারের উপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রায় সকল আঁশের রং ঠিক রেশমের ন্যায় চিক্কণ এবং উহা পাড়নের* উপযোগী দৃঢ়। যে সকল দেশী রং দিয়া এই আঁশ রঞ্জিত হইয়াছিল তাহা বেশ ধরিয়া ছিল। ক্ষার, সোডা ও সাবান দিয়া এই আঁশ এবং তন্নির্ম্মিত বস্ত্র ধোলাই করা হইয়াছিল, তাহাতে আঁশ যেমন শক্ত সেইরূপ নমনীয় হইয়াছিল।

উল্লিখিত পরীক্ষায় কলাগাছের আঁশের কতক গুলি বিশেষ গুণ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে অন্যান্য গাছের আঁশ অপেক্ষা ইহা বিশেষরূপ বয়নোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহার একটী বিশেষত্ব এই যে ইহার রেশমী বর্ণ কোন

* বস্ত্রের প্রস্থের দিকের যে সূতা তাহাকে পাড়ন পড়েন বলে।

অবস্থায় নষ্ট হয় না। যে কোন রং দিয়া ইহাকে রঞ্জিত কর অথবা ধোলাই বা সিদ্ধ কর, সকল অবস্থাতেই ইহার সেই চিকণতা সমান থাকে।

বস্ত্র বুনিবার সময় দেখিতে হইবে যে আঁশগুলি যেন অসমান না হয়! আঁশ একটা মোটা বা একটা সিহি অথবা এক দিক মোটা এক দিক সরু হইলে কাপড়ের থাপ ভাল হয় না। অতএব পেটো হইতে আঁশ বাহির করিয়া উহা বাছাই করিতে হইবে এবং যাহাতে সমস্ত আঁশগুলি সমান হয় তাহাতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, পরে উহা নাটিলে জড়াইয়া রাখিতে হইবে।

ত্রিবাঙ্কুর শিল্প বিদ্যালয়ে প্রথমে সাধারণ দেশী তাঁতে এই বস্ত্র বয়নের চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহাতে সুবিধা হয় নাই। তাঁতে আঁশ চড়ানর পর এদিক ওদিক একটু চাপ পড়িবামাত্র টানার আঁশ স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাইতে থাকে, কিন্তু পড়েনের সূতার পক্ষে উহা বেশ শক্ত বলিয়া বোধহ ইয়াছিল। বুনিবার পূর্ব্বে একটী পরিষ্কার কাঠের মুগুর দিয়া আঁশগুলি পিটিয়া লওয়া হইয়াছিল, ইহাতে আঁশগুলি বেশ চেপ্টা রকমের হয় ও পিচ্ছিল ও নমনীয় হয়। এরূপ হওয়াতে কাপড়ের থাপ যেমন মিহি তেমনই ঘন হয়।

দেশী তাঁতে আঁশ ছিঁড়িয়া যাওয়াতে অপেক্ষাকৃত উন্নত রকমের তাঁতে উহা বুনিতে আরম্ভ করা হয়। এই তাঁত উক্ত শিল্প বিদ্যালেয় প্রস্তুত করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও টানার আঁশ মাঝে মাঝে ছিঁড়িয়া যায়। তবে পুরাতন তাঁতে যত বেশী ছিঁড়িয়াছিল ইহাতে সেরূপ ছিঁড়ে নাই। পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে পুরাতন ও নূতন উভয় তাঁতে মধ্যে মধ্যে শীতল জল দিয়া টানা ভিজাইলে সূতা ছিঁড়ে না। কেবল তাহাই নহে, যে ঘরে তাঁত বসান হয় সে ঘর যদি ঠাণ্ডা হয় তাহা হইলে উল্লিখিতরূপ টানার আঁশ ছিঁড়ে না. ইহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব কলাগাছের আঁশ দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিতে হইলে ঠাণ্ডা ঘরে তাঁত বসাইবার কথা বিশেষরূপ স্মরণ রাখিতে হইবে।

টানার আঁশ মধ্যে মধ্যে ছিঁড়িয়া যাওয়াতে উহা কার্পাস সূতার সহিত মিশ্রিত করিয়া বয়নের চেষ্টা হয়। টানা কার্পাস সূতায় বুনিতে আরম্ভ করা হয়। এই আঁশে পড়েনের কাজ সন্তোষজনকরূপে সম্পন্ন হয়। উক্ত শিল্প বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক বলেন যে যদিও এই প্রথম পরীক্ষায় টানার আঁশ মধ্যে মধ্যে ছিঁড়িয়াছিল, তথাপি তিনি মনে করেন যে ঐ আঁশ দ্বারা যাহাতে টানা ও পড়েন উভয় বয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহারও উপায় করা যাইতে পারিবে। কার্পাস সূতার টানা ও কলাগাছের আঁশের পড়েনে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বেশ সুন্দর হইয়াছে। জমী ঠিক রেশমের ন্যায় চিক্কণ হইয়াছে, থাপও ভাল হইয়াছে, আর টেকসই বলিয়াও প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে কলার আঁশকে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন পরীক্ষার দ্বারা তাহার সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে। ইহা একটা সখের জিনিষের মত হয় নাই, কিন্তু সাধারণ লোকের নিত্য ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। এই বস্ত্র প্রস্তুত করিতে যে দাম পড়ন হইয়াছে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় বলেন, তাহা সাধারণ কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা অণুমাত্র অধিক হয় নাই বরং সেইরূপ মূল্যে রেশমী কাপড়ের অনুরূপ কাপড় তৈয়ার হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যদিই এরূপ হয় যে ঐ আঁশ একেবারেই টানার সূতার উপযোগী হইবে না, তাহাতেও ক্ষতি নাই। যেরূপ প্রণালীর কাপড়ই তৈয়ার করা হউক না, টানায় যে পরিমাণ সূতা লাগে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ সূতা পড়েনের জন্য প্রয়োজন হয়! এখন এ দেশের বস্ত্র বয়নে যদি কার্পাস সূতার পড়েন না বুনিয়া তাহার জন্য কলাগাছের আঁশ ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। এখন ত কলার পেটো শ্রাদ্ধ ব্যতীত আর কোন কাজেই লাগে না। অতএব যদি উহার আঁশ বাহির করিয়া কাপড়ের পড়েনের সূতারূপে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে সেই পরিমাণ কার্পাস সূতা বাঁচিয়া যাইবে এবং তদ্দ্বারা কলাগাছের আঁশের সংযোগে আরও অধিক পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন হইবে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীদিগের অর্জ্জনের একটা নূতন পন্থা হইবে। এইরূপ কাপড় প্রস্তুত হইলে তাহাতে সাধারণের লাভ বই ক্ষতি নাই। লোকে যে মূল্যে সূতার কাপড় কিনিয়া থাকে সেই মূল্যে

কাপড় পায় তাহা তাহাদিগের পক্ষে নিশ্চয়ই লাভ-জনক, আর যাহারা বস্ত্র বয়ন করে তাহারা যে মূল্যে কার্পাস সূতা পায় তদপেক্ষা কম মূল্যে যদি কলার আঁশ কিনিয়া কার্পাস সূতার ন্যায় উহার ব্যবহার করিতে পারে তাহাদিগের তাহা বিশেষ লাভ বলিতে হইবে। কলাগাছের আঁশ ওজনেও হালকা। ইহা অপেক্ষা কার্পাস সূতা তিনগুণ ভারী। তিন আউন্স কার্পাস সূতায় যে পরিমাণ জমী বুনা যায়, এক আউন্স কলাগাছের আঁশে সেই পরিমাণ কাপড়ের জমী বুনিতে পারা যায়; অথচ এক আউন্স আঁশের দাম দেড় আনা বই নয় আর এক আউন্স কার্পাস সূতার মূল্য সাড়ে চারি আনা। অতএব যে দিক দিয়া দেখা যায় সেই দিক দিয়াই এই আঁশ ব্যবহারে লাভ দেখিতে পাওয়া যায়।

উল্লিখিত পরীক্ষার দ্বারা ত্রিবাঙ্কুরে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা স্থানীয় অধিবাসীদিগের পছন্দসই হইয়াছে। বিশেষতঃ উহা পাগড়ীর কাপড়ের বিশেষ উপযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ উহার চিক্কণতা, দ্বিতীয় কারণ লঘুভারত্ব। ইহাতে পাগড়ী বাঁধিবার আর একটী সুবিধা এই যে উহা ইচ্ছামত যে কোন আকারে ফুলাইয়া বাঁধা যায়, তাহাতে আল্‌গা হইয়া পড়েনা। শিল্প বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় বলেন যে বিশেষ পরীক্ষান্তর যদি এই আঁশ টানা ও পড়েন উভয় রূপ বয়নের উপযোগী বলিয়া স্থির হয় তাহা হইলে দেশীয় বস্ত্রশিল্প একটী নূতন আকার পরিগ্রহ করিবে।

যদিও সকল প্রকার কলাগাছের আঁশ দ্বারা বস্ত্রের টানা বুনন হয় না, কিন্তু মানিলার একরকম কলাগাছের আঁশ দ্বারা সে কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়। এদেশে এজাতীয় কলাগাছের আবাদ হইতে পারে এবং দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে ইহার আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। এই কলাগাছের আঁশ মানিলা হেম্প (Manilla hemp) নামে প্রসিদ্ধ। অতএব আর কোন আঁশদ্বারা টানা বুনন না হয়, তাহা হইলে এই মানিলা হেম্পদ্বারা সে অসুবিধা দূর হইতে পারে। ইহাতে দেখা যাইতেছে ত্রিবাঙ্কুরের রাজপুরুষেরা এই নূতন শিল্পে যেরূপ মনোযোগী হইয়াছেন তাহাতে তদঞ্চলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যেরূপ উদাসীন তাহাতে এই নূতন শিল্প সম্বন্ধে আমাদিগের আশা করিবার কিছুই নাই। কিন্তু কেবল গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলেত চলিবে না। দেশবাসীগণের মধ্যে যাঁহাদিগের হস্তে অর্থ আছে তাঁহারা অল্পে অল্পে এইরূপ শিল্পাদিতে নিযুক্ত হইয়া আপনাদিগের ধনবৃদ্ধি ও সাধারণ লোকের অন্নাভাব দূর করিতে পারেন।

কলাগাছের সূক্ষ্ম আঁশে যেমন সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে সেইরূপ মোটা আঁশে মোটা জিনিস তৈয়ার হয়। পরদার কাপড়, বসিবার আসন, দড়ী ও কাছি কলার আঁশে কিরূপ তৈয়ার হইতে পারে তাহা কমলায় পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই আঁশ যেমন কার্পাসের স্থান অধিকার করিতে পারে, সেইরূপ পাট ও শণের স্থানও অধিকার করিতে সমর্থ। বঙ্গদেশে ইহার যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, পাঠকগণ তাহাও অবগত আছেন। এক্ষণে কেহ ব্যবসাদারী রকমে এই শিল্পের উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়া আর আর সকলের পথ প্রদর্শক হন ইহাই আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা। যদি এই শিল্প সম্বন্ধে কেহ বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করেন ত্রিবাঙ্কুর আর্টস্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন। তাঁহার ঠিকানা ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিভেণ্ড্রাম।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

গিল্টিকরা।

সোণালী।

(২)

রাসায়নিক উপায়ে গিল্টি করিতে হইলে পিত্তল নির্ম্মিত পদার্থই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তাম্র পদার্থ নরম এবং ঘন বর্ণ সংযুক্ত বলিয়া উহাতে গিল্টি তত ভাল হয় না। সচরাচর যে পিত্তল ব্যবহৃত হয় তাহার সহিত সাতগুণ তাম্র মিশাইয়া লইলে গিল্টি করিবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ধাতু প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ ঐ ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যে আমালগাম অব গোল্ড (amalgam of gold) চারিদিকে সমান ভাবে মাখাইয়া উত্তাপদ্বারা ঐ আমালগাম স্থিত পারদ উড়াইয়া দিলে অতি উৎকৃষ্ট গিল্টি হয়। আমালগাম হইতে পারদ উড়াইবার সময় পারদ শিল্পির শরীরে প্রবেশ করিতে পারে, এবং তাহাতে অনিষ্টের সম্ভাবনা, এই জন্য তাহা নিবারণার্থে ফরাসি পণ্ডিত দার্শে (D' Arcet) একপ্রকার চুল্লি প্রস্তুত করিয়াছেন।

গ্রীস দেশে আর একপ্রকার রাসায়নিক গিল্টি প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। করোসিভ্ সব্লিমেট ও নিসাদল সমান অংশে নাইট্রিক এসিডের দ্বারা বিগলিত করিয়া তাহাতে স্বর্ণ সংযোগ করিলে যে দ্রব প্রস্তুত হয় উহা রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যে মাখাইয়া কৃষ্ণ বর্ণ হইলে উহা উত্তপ্ত করিলেই সুন্দর সুবর্ণ বর্ণ হইয়া থাকে। কাচ ও চীনা বাসনে স্বর্ণ চূর্ণ (gold dust), গঁদ ও সোহাগা দ্বারা গুলিয়া তুলি দ্বারা লাগাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে স্বর্ণ বাসনের গাত্রে লগ্ন হয় তারপর পালিস করিলেই উত্তম গিল্টি হয়।

খৃঃ ১৮৩৬ অব্দের জুন মাসে এলকিংটন (Elkington) সাহেব নিম্ন প্রক্রিয়া প্যাটেণ্ট করিয়া লইয়াছেন।

প্রথমতঃ বিশুদ্ধ নাইট্রিক এসিড (Sp. gr. 1·45) ২১ ঔন্স; বিশুদ্ধ মিউরেটিক এসিড (Sp. gr. 1·15) ১৭ ঔন্স; পরিস্রুত জল ১৪ ঔন্স একত্র মিশ্রিত করিলে ৫২ ঔন্স নাইট্রোমিউরাটিক আসিড হইবে তাহাতে ৫ ঔন্স উত্তম স্বর্ণ গলাইয়া লইতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত মিশ্রে স্বর্ণ অগ্নির উত্তাপে গলাইতে হয়। যতক্ষণ তাহা হইতে পীত ও লোহিত বাষ্প উঠা বন্ধ না হয় ততক্ষণ উত্তাপ দিবে। তৎপরে তলার সারাংশ বাদে সমস্ত একটী প্রস্তর বা মৃণ্ময় পাত্রে গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে ৪ গ্যালন জল এবং ২০ পৌণ্ড বিশুদ্ধ Bicarbonate of Potash মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা কাল ফুটাইতে থাকিবে।

তৎপরে ঐ ফুটন্ত দ্রব অগ্নির উপরে রাখিয়াই তাহাতে গিল্টি করিবার দ্রব্য উত্তমরূপ পরিষ্কৃত করিয়া একটী তারে বাঁধিয়া ডুবাইয়া দিতে হয় এবং উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিয়া তুলিয়া লইতে হয় ও পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইলেই চলে।

উপযুক্ত সময় কত তাহা অভ্যাস দ্বারা জানিতে পারা যায়। ইহাতে রং করা চলে।

আর একপ্রকার গিল্টি করিবার প্রক্রিয়া আছে তাহা সাধারণতঃ কোল্ড গিল্ডিং বলে।

প্রথমতঃ

বিশুদ্ধস্বর্ণ	৬০ গ্রেণ
উৎকৃষ্ট তাম্র	১২ "

বিশুদ্ধ নাইট্রিক এসিড অর্দ্ধ ঔন্সের কিঞ্চিদধিক
" মিউরেটিক্ আসিড দেড় ঔন্সের কিঞ্চিদূন
একত্রে মিশাইয়া পরিষ্কার কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র খণ্ডের উপর ঢালিবে, যেন সমস্তই তাহাতে শুষিয়া লয়; উহা শুষ্ক হইলে অগ্নি দিয়া পোড়াইয়া ভস্ম করিবে। এই ভস্মে স্বর্ণ চূর্ণ থাকে।

যখন কোন দ্রব্য গিল্টি করিতে হইবে তখন উহা পরিষ্কার করিয়া, লবণাক্ত জলে কর্ক ভিজাইয়া তদ্দ্বারা ঐ চূর্ণ লইয়া সেই দ্রব্যে ঘষিতে থাকিবে; এই রূপেই ঐ দ্রব্য গিল্টি হইবে। বড় জিনিষ হইলে গিল্টির উপর হিমাটাইট (Hematite) দ্বারা সাবান জলের সহিত পালিস করিতে হয়। সামান্য জিনিষ ইস্পাত দিয়া মাজিয়া লইলেই চলে।

নিম্নলিখিত মিশ্র পুরাতন গিল্টিতে মাখাইলে তাহা উজ্জ্বল হয়।

আনোটা—	১ ঔন্স
সল্ট অব টার্টার—	১ "
খুন খারাপী—	অর্দ্ধ "
পরিস্রুত জল—	তিন পোয়া

ফুটাইয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া বিশ গ্রেণ জাফ্রাণ মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মলিন গিল্টি পুন-

রুজ্জল করণ জন্য উক্ত চূর্ণ ১ ঔন্স এক পাইন্ট উষ্ণ জলে এবং (Pearl ash) পারল এস্ ২ ঔন্স ১৷৷০ পাইন্ট উষ্ণ জলে গুলিয়া একত্র করত উপরিস্থ পরিষ্কার অংশ লইয়া স্পঞ্জদ্বারা মাখাইলেই মলিন গিল্টি পুনরুজ্জ্বল হইবে।

খেলিবার তাসের ধার গুলিতে সোণা দিতে হইলে প্রথমে তাসগুলিকে একসঙ্গে গুছাইতে হইবে এবং ধার গুলিকে সমান করিয়া কাটিতে হইবে, যাহাতে কোনরূপ উচুনীচু না থাকে। অনন্তর তাসগুলিকে প্যাঁচে উত্তম রূপে কসিয়া ক্যামেল হেয়ার ব্রুস্ জলে গুলিয়া তাহাতে ডিমের শ্বেতাংশ ডুবাইয়া বেশ করিয়া ধারে মাখাইবে। ধার গুলি বেশ ভিজিয়া গেলে আস্তে আস্তে তাহার উপর সোণার পাত বসাইবে। দুমিনিট পরে তাহাকে কোন শক্ত পাথর দিয়া উত্তমরূপে ঘষিয়া বার্ণিস করিলে সোণার উজ্জ্বল রং ফুটিয়া পড়িবে।

কাচের উপর সোণা দিয়া খোদাই করিয়া কিছু লিখিতে বা আঁকিতে হইলে এইরূপ প্রক্রিয়ার আবশ্যক। প্রথমে কাচখানিকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে। অনন্তর তাহার উপর খুব পাতলা করিয়া মোম লাগাইয়া সমস্ত কাচ খানি ঢাকিতে হইবে। যাহা লিখিবার বা আঁকিবার প্রয়োজন, একটী ছুচ দিয়া ঐ মোমের উপর এরূপে লিখিতে বা আঁকিতে হইবে যাহাতে সেই অংশের মোম একেবারে উঠিয়া যায়। যদ্যপি হাতে আঁকা অসুবিধা হয় তাহা হইলে প্রথমে একখণ্ড কাগজে আঁকিয়া লইয়া সরু ছুচ দিয়া কাগজের আঁকার দাগে দাগে সরু সরু গর্ত্ত করিবে এবং পরে ইহা মোমাবৃত কাচের উপর রাখিয়া কালির ভূষা বা অন্য কোন কাল গুঁড়া পদার্থ সেই গর্ত্তে গর্ত্তে ছড়াইয়া দিবে। কাগজ তুলিয়া লইলে পর মোমের উপর কাল গুঁড়া লাগিয়া যাইবে। তখন ছুচ দিয়া সেই দাগে দাগে মোম সরাইয়া ফেলিলে চলিবে। অনন্তর একখানি সীসার প্লেটে আধইঞ্চি পরিমাণ হাইড্রোফ্লুয়োরিক এসিড ঢালিয়া কাচের মোমাবৃত দিকটা ঢাকাদিবে। খানিকক্ষণ এইরূপে এসিডের বাষ্পে রাখিয়া কাচটী তুলিয়া লইয়া মোম ধুইয়া ফেলিলে পর দেখা যাইবে যে, যে অংশে দাগ কাটা হইয়াছিল সেই স্থানের কাচ ক্ষইয়া গিয়াছে। যদি মোটা দাগের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে এসিডের বাষ্পে ধরা অপেক্ষা এসিডে মোমাবৃত কাচ ডুবাইয়া লইতে হইবে।

একটী মোটা ক্যামেল তুলি লইয়া দাগ কাটা অংশের উপর ভাল করিয়া আইসিংগ্লাস দ্রব লাগাইতে হইবে এবং ভিজা থাকিতে থাকিতে সোণার পাত সরু সরু করিয়া কাটিয়া সেই খাঁজে খাঁজে চাপিয়া বসাইতে হইবে। সোণা বেশ আঁটিয়া গেলে সরু নরুণ লইয়া কাচের গা হইতে পাত কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। অনন্তর তাহা ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেই চলিবে।

হাইড্রোফ্লুয়োরিক এসিড অত্যন্ত বিষ বটে এবং প্রায় সমস্ত পদার্থই ক্ষয়াইয়া ফেলিতে পারে কিন্তু বাজারে যে এসিড বিক্রয় হয় তাহা বেশী ঘন থাকে না, একটু সাবধানে ব্যাবহার করিতে পারিলে ভয়ের কোন কারণ থাকিবে না।

লৌহময় পদার্থ সোণালি করিতে হইলে প্রথমে সোডা এবং পারা একসঙ্গে মিশাইতে হইবে। এই মিশ্রণ কালে প্রচুর চূণ ফোটার ন্যায় শব্দ হয় এবং অত্যন্ত উত্তাপ হইয়া থাকে। লৌহ পদার্থকে প্রথমে এই মিশ্রিত দ্রবের দ্বারা ক্রমাগত উত্তমরূপে ঘষিতে হইবে। তাহার পর ইহার গায়ে ঘন গোল্ড ক্লোরাইডের দ্রব ঢালিয়া দিবে। পরে উত্তাপ দিলে লৌহের গা হইতে পারা নষ্ট হইয়া গিয়া তাহার স্থানে সোণা আশ্রয় করিয়া লৌহকে সোণালি দেখাইবে।

হস্তিদন্ত নির্ম্মিত পদার্থকে গিল্টি করিতে হইলে প্রথমে হীরাকষ এবং পরে nitro muriate of gold দ্রবে ডুবাইলে পর ইহা সুন্দর উজ্জ্বল সোণার বর্ণপ্রাপ্ত হইবে।

সোণার জলে লিখিতে হইলে প্রথমে কাল কালিতে লিখিতে বা ছাপিতে হয় এবং কালি কাঁচা থাকিতে থাকিতে তাহার উপর সোণার গুঁড়া তুলা দিয়া আস্তে আস্তে মাখাইতে হয়। এই সোণার গুড়া এই রূপে প্রস্তুত করিতে হয়। এক ভাগ সোণা এবং ৭ ভাগ পারা একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া আগুনে তাতাইতে হয়। অত্যন্ত তাপে পারার অংশ উবিয়া যাইলে সোণার গুঁড়া পড়িয়া থাকিবে। অথবা ঐরূপ ভাগে সোণা ও পারদ লইয়া ঘন নাইট্রিক এসিডে ফেলিতে

হয়। এসিডে পারদ গলিয়া গেলে তাহা ছাঁকিয়া লইলে পর অবশিষ্টাংশ আগুনে শুকাইয়া লইয়া পরে গুঁড়াইয়া ফেলিলে সোণার গুঁড়া পাওয়া যাইবে।

সুবর্ণ অলঙ্কার বা অন্য কোন সুবর্ণ পদার্থ অনেক দিন ধূলায় ময়লা পড়িয়া গেলে তাহা পরিস্কার করা এবং রং করা প্রয়োজন হয়। এই রং করিলে খাদযুক্ত সোণা যথার্থ সোণার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। রং করিবার জন্য দুইটী প্রক্রিয়া আছে। একটী দ্রব প্রক্রিয়া, অন্যটী শুষ্ক প্রক্রিয়া। যে সকল পদার্থ সংযোগে প্রথম প্রক্রিয়ার দ্রব প্রস্তুত করা হয় সাধারণতঃ তাহার সুবর্ণের খাদের উপর রাসায়নিক আকর্ষণ প্রভৃত, এই জন্য কোন অলঙ্কার একবার রং করিয়া লইলে পর তাহার ওজন অনেক কমিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, যদ্যপি রং করিবার দ্রব অনেক দিনের পুরাতন হয় তাহা হইলে তাহাতে রং অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও শীঘ্র ফুটিয়া উঠে এবং পদার্থের ওজনও সামান্যই কমিয়া থাকে। নানা পদার্থ সংমিশ্রণে এই দ্রব প্রস্তুত হয়। বার্মিংহামে নিম্নলিখিত উপায়ে দ্রব প্রস্তুত করিয়া অলঙ্কারে রং দেওয়া হয়। একখানি সীসার পাত্রে একটু উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে ১২ আউন্স সোরা ও তাহার অর্দ্ধেক লবণ গুঁড়াইয়া একটা কাটী দিয়া নাড়িতে হয়। তাহার পর ৩ আউন্স হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ১ ঔন্স ফুটন্ত জল ক্রমাগত নাড়িতে হয়। অলঙ্কারটী প্রথমে গরম সোডার জলে পরিষ্কার করিয়া লইয়া এক মিনিট কাল পর্য্যন্ত একটী রূপার কাটী করিয়া এই উত্তপ্ত দ্রবে ডুবাইয়া রাখিতে হয় এবং পরে গরমজলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। আর একটু জল রঙে ঢালিয়া দিতে হয় এবং রঙ ফুটিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় গহনাটী রঙে পূর্ব্ববৎ ডুবাইতে হয়। এইরূপে দুই চারিবার পরিষ্কার করিয়া করাতের গুঁড়ার উপর ফেলিয়া শুকাইতে দিতে হয়।

অনন্তর একখণ্ড পরিষ্কার চামড়ার উপর দ্রব্যটী রাখিয়া কড়া ব্রুস দ্বারা ঘসিয়া লইলে পর উজ্জ্বল রং প্রকাশ পায়।

আমাদের দেশে স্বর্ণকারেরা ফটকিরি ও লবণ অল্প জলে গুলিয়া অলঙ্কারে মাখাইয়া উত্তপ্ত করিয়া এবং মাজিয়া লইয়া পরে ফটকিরি, পাকা তেঁতুলের শাঁস, গন্ধক, ও নিশাদল জলের সহিত একত্রে অগ্নিতে ফোটাইয়া লয়। তাহাতেও উৎকৃষ্ট রং প্রস্তুত হয়।

শুষ্ক-প্রক্রিয়া ব্যবহার করিতে গেলে জলের প্রয়োজন হয় না। প্রথমে ৮ ঔন্স সোরা, ৪ ঔন্স লবণ এবং ৩ ঔন্স ফটকিরি একত্রে গুঁড়াইয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া একখানি উত্তপ্ত সীসার পাত্রে রাখিতে হইবে। মিশ্রিত পদার্থ গুলি ক্রমাগত লোহার শলাকা দিয়া নাড়িতে হইবে। প্রথমে ইহা সবুজবর্ণ তরল পদার্থে পরিণত হইয়া পরে আবার কঠিন হইয়া যায়। আরও উত্তাপ দিলে পর ইহা গলিয়া গিয়া পিঙ্গল বর্ণ হইয়া যাইবে। অলঙ্কারটী পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া রূপার কাটীর সংযোগে ইহাতে ডুবাইয়া দেড় মিনিটকাল ধরিয়া নাড়িতে হইবে এবং পরে aqua fortis মিশ্রিত গরম জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ দুচার বার করিলে পর উজ্জ্বল রং বাহির হইবে। তখন সোডা বা পটাস মিশ্রিত জলে ধুইয়া ফেলিয়া করাতের গুঁড়ার উপর শুকাইতে দিতে হইবে।

শুষ্ক উপায়ে অলঙ্কারকে রং করিবার পূর্ব্বে অতি উত্তমরূপে চক্‌চকে করিতে হয়। কারণ তাহা হইলে ভাল রং ধরিতে পারে। পদার্থ বুঝিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিবার সময় নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। সকল পদার্থের এক সময় হইতে পারে না।

উপরোক্ত রসায়নিক পদার্থ ব্যতীত নিম্নলিখিত পদার্থগুলি ঐরূপ ভাবে রং প্রস্তুত করিতে পারে।

নিশাদল—	৮ ঔন্স
সোরা—	৪ "
সোহাগা—	৪ "

কোন সুবর্ণ পদার্থ অনেকদিন ধরিয়া তুলিয়া রাখিলে তাহাতে যে কলঙ্ক পড়িয়া যায় তাহা তুলিতে হইলে নিম্নলিখিত পদার্থ গুলি গুঁড়াইয়া মিশাইয়া নরম তুলি দ্বারা লাগাইতে হইবে।

সোডা—	২ ঔন্স
ক্লোরাইড অব্ লাইম—	১ ,,
লবণ—	১ ,,
জল—	১৬ ,,

শ্রী বিঃ—

আমেরিকার ধন কুবের।

জন ডিঃ রকফেলার।

সম্প্রতি একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে আমেরিকার কতকগুলি ধনী লোকদিগের—কাহার কত ধন ও কি উপায়ে তাঁহারা ধনবান হইলেন—সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

উক্ত পুস্তকের মতে জন ডিঃ রকফেলার সাহেব পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, মহাপদ্মপতি বলিলে সকলে বুঝিতে না পারেন, এজন্য বলি লক্ষ কোটিপতি বলিলে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই। এই ধন কুবেরের অপূর্ব্ব কাহিনী আজ আমরা কমলার পাঠক ও পাঠিকাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি, পাঠ করিলে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বলিতে গেলে তিনি এক কপর্দ্দক শূন্য ছিলেন, এই অল্পকাল মধ্যে নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়ে, পরিমিতাচারে ও অন্যান্য সদ্‌গুণে এবম্বিধ কল্পনাতীত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন।

এই ধনের দ্বারা কি না সাধিত হইতে পারে? যদি তিনি ইচ্ছা করেন, পৃথিবীর সমস্ত গম এক চেটিয়া করিয়া লইতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির যুদ্ধ অচিরে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। তিনি মনে করিলে আমেরিকার প্রধান ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দিতে পারেন এবং তৎসঙ্গে অসংখ্য লোকের মধ্যে অকস্মাৎ অপার দুর্ভাবনা ও আতঙ্ক উদ্রেক করিয়া অনায়াসে ঘোর প্রমাদ ঘটাইতে পারেন। দেশের অনেক কারখানা ও কারবার এবং শিল্পাদি তাঁহার করতলে; মনে করিলে দর কমাইয়া অথবা বাড়াইয়া দিয়া মহানিষ্ট করিতে পারেন। তাই বলিতেছি তাঁহার অসীম বিত্তের বিপুল পরাক্রম।

দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাঙ্কে কাহার কত টাকা আছে ইহা জানিবার তাঁহার বিশেষ উপায় আছে। তাঁহার আজ্ঞানুসারে ব্যাঙ্ক হইতে কেহ কর্জ্জ লইবেন তাহার সুবিধা নাই, কারণ কাহার জামিন কত সম্পত্তি আছে তিনি সকল পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছেন। "Standard Oil Trust" নামক ব্যবসায়ের তিনি একজন ডিরেক্টর বা পরিচালক। জীবনে তাঁহার ইহাই এক মাত্র কার্য্য। অন্যান্য আমেরিকাবাসিদিগের ন্যায় তিনি সকল ঘটে কোন একটা কার্য্য লইয়া থাকিতে বা আপনাকে ব্যস্ত করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সেই জন্য এক কাজ লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়া তিনি সুখী।

যাঁহার এত আয়, সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, তাঁহার বাৎসরিক ব্যয় ৩০০ পাউণ্ড অথবা ৪৫০০ টাকা অথবা মাসিক ৩৭৫ টাকা মাত্র। এই অসাধারণ ধনী ব্যক্তির অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে নিজের পছন্দ চাল চলন যেমন সামান্য ও নিজের বিষয় বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ, নিজের আত্ম গোপন সাধন করিতে তিনি তেমনই সর্ব্বদা আন্তরিক প্রয়াসী। সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকেন না, ক্লাবে কিম্বা থিয়েটরে তিনি কখনও যাতায়াত করেন না। তাঁহার প্রতিবেশীরা তাঁহাকে চক্ষে কখনও দেখিতে পায় কিনা সন্দেহ। প্রতিদিন তিনি অনেক সময় পাঠে ক্ষেপণ করেন। তাঁহার একমাত্র প্রিয় ক্রীড়া Golf. তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে Golf ক্রীড়াই তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছে। লেকউড নামক স্থানে তিনি একটি নূতন ক্লাব বাটী ও তাহার সংশ্লিষ্ট Golf খেলিবার মতন সমতল ভূমি ক্রয় করিয়াছেন। সেখানে একাকী তিনি Golf খেলিয়া থাকেন। খেলার পরেও একাকী তিনি নির্জ্জনে থাকিতে অতিশয় ভাল বাসেন।

তাঁহার ধর্ম্ম মত যাহাই হউক না কেন, তিনি প্রকৃত বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক। যাঁহারা তাঁহাকে ভালরূপ জানেন তাঁহারা বলেন তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ আন্তরিক। কেহ কেহ বলেন বটে সাধারণকে ভুলাইবার জন্য তিনি ধর্ম্মের ভাণ করিয়া থাকেন কিন্তু একথা অনেকে অমূলক বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। কি উপায়ে তিনি সাধারণের প্রিয় হইবেন অথবা সকলকে আত্মবশে আনিবেন এ রূপ ইচ্ছা তাঁহার আদৌ নাই। দেশ পর্য্যটন ও জল যাত্রা করিতেও তাঁহার কোন সখ দেখা যায় না। তিনি স্বাভাবিক দয়ালু। কিন্তু তাঁহার দান কখনও অযথা অপাত্রে অর্পিত হয় না, বিশেষ সাবধানে ও বিজ্ঞতার সহিত সম্পন্ন হয়। কখনও

তিনি একটি পয়সাও অপব্যয় করেন না। যদি কখনও কেহ কোন স্কুলের কিম্বা কোন দাতব্য ভাণ্ডারের সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন তিনি বলেন তোমরা একটি ডলার সংগ্রহ করিলে আমিও একটি ডলার দিব। যদিও আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতার অপেক্ষা তাঁহার ক্ষমতা অধিক তথাপি রাজ্য সংক্রান্ত কোন বিষয়ে তিনি প্রকাশ্য যোগ রাখেন না। Congressএর দুই House এ তাঁহার প্রতিনিধি আছে, মনে করিলেই কোন বিল পাস করিয়া লইতে পারেন।

Standard oil Trust ব্যবসায়ে তিনি প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উহা গঠিত হয়, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও কার্য্য করিবার শক্তি দ্বারা তিনি উহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই কারবারে কত ব্যক্তি ক্রোরপতি হইয়াছেন তাহা ঠিক নির্ণয় করা দুরূহ, তবে যতদূর জানা সম্ভব নিম্নোদ্ধৃত তালিকা দেখিলে আরও সাত ব্যক্তির বর্ত্তমান ধনের পরিমাণ জানিতে পারিবেন।

William Rockfeller	...	£40,000,000
Henry H. Rogers	...	30,000'000
Henry M Fuller	...	20'000'000
T. D. Archbold	...	10'000'000
Charles Bull	...	5,000,000
Wesley Tellors	...	5,000,000
Daniel O' Boy	...	5,000'000

শেষোক্ত ব্যক্তি একজন আয়র্লণ্ডবাসী। উপরোক্ত তেলের কারখানায় তিনি প্রতিদিন চারি সিলিং বেতনে কার্য্য আরম্ভ করেন। Standard Oil Coর বর্ত্তমান মূল ধনের সমষ্টি ৪০ কোটি পাউণ্ড।

শ্রীললিত মোহন রায়।

উদ্ভিদ্ জাতি।

কাণ্ড।

অঙ্কুরের যে অংশটী আলোক ও বাতাস প্রাপ্ত হইবার জন্য উপর দিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং যাহা হইতে পত্র বা তদনুরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাকেই কাণ্ড বলা যায়। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় যে কাণ্ড বায়ু ও আলোকের প্রত্যাশায় মাটীর উপরে না উঠিয়া মাটীর মধ্যেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন ইহাকে অন্তর্ভৌম কাণ্ড বলা যায়। এই অন্তর্ভৌম কাণ্ডকে অনেক সময় মূল বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। মূল হইতে কাণ্ডকে বিভিন্ন করিতে হইলে কাণ্ডের এই বিশেষত্ব গুলি লক্ষ্য করিতে হইবে। কাণ্ড অঙ্কুরের উর্দ্ধে বর্দ্ধিতাংশ, কিন্তু মূল তাহার অধোভাগের বর্দ্ধিতাংশ। মূলের, কাণ্ডের ন্যায় পত্র নাই, অতএব ইহার পত্রোৎপত্তি স্থান গাঁটও নাই। মূল অন্ধকার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, এইজন্য মূলে সবুজ বর্ণ পদার্থ নাই, কিন্তু অন্তর্ভৌম কাণ্ড ব্যতীত সকল কাণ্ডেই এই পদার্থের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, কারণ ঐ সকল কাণ্ড বায়ু ও আলোক লাভের আশায় মাটীর উপরে বর্দ্ধিত হয়। কাণ্ডের প্রান্তভাগে অঙ্কুর (bud) দেখা যায়, কিন্তু মূলে দেখা যায় না। কাণ্ডের শাখা প্রশাখা নির্গত হইবার একটী নিয়ম ও ক্রম আছে, মূলে তদ্রূপ নাই এবং যেখানে সেখানেই শাখা নির্গত হইয়া থাকে। কাণ্ডের ত্বকে বায়ু প্রবেশ প্রণালী (stomata) দেখা যায়, কিন্তু মূলে তাহা নাই। মূলের প্রান্তভাগ একটী আবরণে ঢাকা, কিন্তু কাণ্ডে তাহা নাই। এই সকল অবস্থান্তর দ্বারাই কাণ্ডকে মূল হইতে বিভিন্ন করিবার উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

কাণ্ডের উপর পত্রোৎপত্তি স্থান গুলিকে গাঁট বলে। সেই সকল গাঁটের মধ্যে অল্প বিস্তর ব্যবধান থাকায় কাণ্ডটি ছোট বা বড় দেখায়। যেমন এক থাই সূতায় যদ্যপি একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গাঁট বাঁধা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে সূতাটী ক্রমে পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট হইয়া আইসে, এবং যতই গাঁটের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহাদের ব্যবধান হ্রাস করা যায় ততই সূত্রটী ছোট হইয়া আইসে এবং অনেক পুরু হইয়া থাকে। এই রূপে অন্তর্ভৌম কাণ্ড গুলি প্রায়ই লম্বা না হইয়া মোচার ন্যায় আকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং গাঁট গুলি উপর্য্যুপরি ঘন ঘন সজ্জিত থাকায় প্রকৃত ডাঁটার গা দেখিতে পাওয়া যায় না।

অন্তর্ভৌম কাণ্ডে যথার্থ পত্রের উৎপত্তি হয় না, তাহার পরিবর্ত্তে সেই স্থানে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি বর্ণহীন এবং পাতলা খোসার ন্যায় আঁইস নির্গত হইয়া থাকে। তাহাদের উৎপত্তিস্থান গুলিকে সাধারণতঃ 'চোখ' বলা যাইতে পারে। এবং এইরূপ কাণ্ডকে সাধারণতঃ গেঁড়ো বলে।

প্রথম জাতীয় অন্তর্ভৌম কাণ্ডকে bulb কহে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, গেঁড়োটী ঠিক খাড়া উপরদিকে বর্দ্ধিত হয়। গেঁড়োর চতুর্দ্দিকের আঁইস গুলি একটু পুরু হয় এবং একটু বড় হইয়া থাকে এবং কখন কখন কাণ্ডকে আবৃত করিয়া রাখে, যেমন রসুন, পেঁয়াজ, ও রজনীগন্ধ গেঁড়োতে দেখা যায়। পদ্মের গেঁড়োর আঁইস গুলি কাটা কাটা ঠিক দেখিতে খেজুর গাছের গুঁড়ির ন্যায়।

ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে এই আঁইসের সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন গাছে দুইটী এবং পদ্ম প্রভৃতিতে অনেক আঁইস দেখা যায়। যখন bulbএ প্রথম বৎসরেই ফুল হয় তখন তাহাকে বাৎসরিক বলে। গেঁড়ো গুলি চারি পাঁচটা আঁইসের দ্বারা ঢাকা থাকে। বাহিরেকার আঁইসটীর উৎপত্তি স্থানে একটী অঙ্কুর দেখা যায়। গেঁড়ো হইতে ডাঁটা বহির্গত হইয়া তাহাতে ফুল হইতে আরম্ভ হয়। ফুল হইবার পর প্রথম গেঁড়োটী শুকাইয়া আইসে এবং ছোট অঙ্কুরটি গেঁড়োর আকার ধারণ করে। এইরূপে এই জাতীয় গাছে পুরাতন গেঁড়োটী মরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই আবার নূতন গেঁড়ো উৎপন্ন হইয়া পুনরায় ডাঁটা ও ফুল উৎপন্ন করিতে পারে। এই জন্য রজনীগন্ধ প্রভৃতি গাছের একটা গেঁড়ো পুতিয়া দিলে কিছু কাল পরে আমরা তাহার ঝাড় দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় প্রকার অন্তর্ভৌম কাণ্ডকে Tuber বলে। যে সকল ডাল পালা তাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের অপেক্ষা ইহা অনেক মোটা হইয়া থাকে। পত্র-আঁইসগুলি এত ফাঁক ফাঁক নির্গত

হইয়া থাকে যে তাহাদিগের মধ্যে খানিকটা অনাবৃত স্থান পড়িয়া থাকে। এই পত্র আঁইস গুলিও অতি ক্ষুদ্র হইয়া থাকে এবং নগণ্য বলিয়া মনে হয়। ইহারা কখনও কখনও সুক্ষ্মভাবে কাণ্ডের ধারে ধারে এড়ো ভাবে লাগিয়া থাকে, কখনও বা একটু ফুলো হইয়া থাকে। Tuber বৃদ্ধ হইয়া গেলে তাহাতে আর পত্র-আঁইস দেখিতে পাওয়া যায় না এবং অধিকাংশই শীঘ্র মরিয়া যায়।

আলু এই জাতীয় অন্তর্ভৌম কাণ্ডের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইহা অতি শীঘ্র শীঘ্র জন্মায়, এবং ছয়মাস পর্য্যন্ত বেশ বাড়িতে থাকে। কিন্তু আলুর চোক হইতে ডেপি বাহির হইতে আরম্ভ হইলেই আলুটী মরিয়া যায়। এই নিমিত্ত আলু ছয় মাসের পর সমস্ত তুলিয়া লইতে হয়।

যে সকল Tuber অনেক বৎসর ধরিয়া বাঁচে তাহাদিগের অর্দ্ধেক মাটির নীচে এবং অর্দ্ধেক মাটির উপরে থাকে। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ইহারা প্রতিবৎসর ভূমি হইতে এবং নিজ কাণ্ড ও পত্র দ্বারা বায়ু হইতে প্রভূত আহার সঞ্চিত করিয়া প্রতিবৎসরই যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অন্তর্ভৌমিক কাণ্ডের পত্র-আঁইসগুলি প্রায়ই সবুজবর্ণহীন হইয়া থাকে। মুতা ইহার দৃষ্টান্তস্থল, কিন্তু ইহাদিগের মাটীর উপরে সবুজ বর্ণ পত্র জন্মিয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার অন্তর্ভৌম কাণ্ডকে Rhizome বলে। ইহার বিশেষত্ব এই, যে, ইহাতে অনেকগুলি গেঁড়ো গায়ে গায়ে একত্রীভূত হইয়া জন্মে এবং এই জন্য ইহাকে মূলের ন্যায় দেখায়। কখনও বা মানকচু জাতির মত খাড়া ভাবে জন্মে কখনও বা আদার এর এড়োভাগে জন্মিয়া থাকে। এড়োভাগে জন্মিলে প্রতি বৎসরেই ইহার আঁইসের কোণ হইতে শাখা প্রশাখা ও মূল নির্গত হইতে থাকে। যখন গাঁটগুলি দূরে দূরে অবস্থিত হয় তখন ইহাকে পড়ানে গাছের ন্যায় দেখায়। গাঁটগুলির ব্যবধান অল্প হইলে কাণ্ডটী অপেক্ষাকৃত মোটা, রসাল এবং খাড়া হইয়া জন্মায়।

সাধারণ কাণ্ডের ন্যায় অন্তর্ভৌম কাণ্ডের দ্বারা উদ্ভিদের একই উপকার সাধিত হয়। কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় ইহাদিগের বায়ু মণ্ডল হইতে খাদ্য সঞ্চয় করিবার জন্য সবুজ পত্র ও ডাঁটার আবশ্যক হয় না বলিয়া অন্তর্ভৌম কাণ্ডে পত্রোদ্গম হয় না, পরন্তু বর্ণহীন সূক্ষ্ম ছোট ছোট আঁইসে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। বাতাস হইতে রক্ষার নিমিত্ত সাধারণ কাণ্ডের কাঠিন্য ইহাদিগের প্রয়োজন হয় না, এই জন্য ইহারা অনেকটা কোমল হইয়া থাকে। রক্ষার নিমিত্ত মোটা ছালের প্রয়োজন হয় না, এই জন্য ইহাদের বাহ্যাবরণ কোন বিশেষ ত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে না।

পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতির পত্র-আঁইস গুলি অনেকটা অন্তর্ভৌম কাণ্ডের রক্ষার কার্য্য করিয়া থাকে। যদিও কাণ্ডকে বায়ু বা আলোকাধিক্য হইতে রক্ষা করিতে হয় না বটে, কিন্তু ইহারা অপেক্ষাকৃত কোমল হওয়াতে, বৃদ্ধিকালে ভূমিস্থ কাঁকর ও প্রস্তরের দ্বারা আহত হইবার হাত হইতে এবং কখনও কখনও মাটীর পোকার কামড় হইতে কাণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকে।

অন্তর্ভৌম কাণ্ডকে বাড়িতে হইলে তাহারা একটু চাড় দিয়া চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকাকে কিঞ্চিৎ সরাইয়া বাড়িবার স্থান করিয়া লয়। এই চাড় নিতান্ত কম নহে। কখনও কখনও দেখা যায় যে এই চাড়ের দ্বারা কাণ্ডের উপরিস্থ জমি ফাটিয়া যায়। এই চাড় দিবার ক্ষমতা উৎপাদনের জন্য যতটা খাদ্য খরচ হয়, তাহা দ্বারা কাণ্ডের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইতে পারে, এই জন্য আমরা আলু প্রভৃতির চাষ কালে গোড়ার মাটী যতদূর সম্ভব ঝুরা ও আল্গা করিয়া রাখি, তাহাতে অধিক চাড়ের প্রয়োজন হয় না। এই নিমিত্ত বেলে জমিতে আলু ভালরূপে ফলিয়া থাকে।

অন্তর্ভৌম কাণ্ডের প্রধান কার্য্য আহার সঞ্চিত করিয়া রাখা। ডাল ও পাতা হইতে যথেষ্ট খাদ্য আহৃত হইয়া অন্তর্ভৌম কাণ্ডে নীত হইয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। যত দিন না অঙ্কুরোদ্গম হয় তত দিন ধরিয়া ইহা ঐ অবস্থাতেই থাকে, কারণ তখন গাছের বৃদ্ধির অভাব হেতু খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। পরে বৃদ্ধির কাল উপস্থিত হইলে এই সকল খাদ্য নানা রূপে বর্দ্ধিত অংশের পোষণের সহায়তা করে।

এইরূপ ভাবে পর্য্যায় ক্রমে কার্য্য ও বিশ্রাম লাভ হয় বলিয়া অন্তর্ভৌম কাণ্ড সম্পন্ন গাছ, বিশেষ

বিশেষ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল দেশে অত্যধিক উষ্ণতা হেতু অথবা বহুদিবস অনাবৃষ্টি হেতু, নরম গাছ গুলি মরিয়া যায় তথায় এই জাতীয় গাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখা যায়। আমাদের দেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই জলাভাবে ইহাদের মাটীর উপরের কাণ্ডাংশ ও পত্র মরিয়া যায়, কেবল মাত্র অন্তর্নিহিত কাণ্ড টুকুই সঞ্চিত খাদ্যের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে। বর্ষারম্ভে মাটী একটু ভিজিয়া উঠিলেই ইহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাড়িতে থাকে, এবং পর বৎসরের জন্য খাদ্য সঞ্চয় আরম্ভ করে। এইরূপ আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ ভাবে বৃদ্ধির একটী নির্দ্দিষ্ট কারণ আছে। ইহারা আকৃতিতে ক্ষুদ্র বলিয়া প্রায়ই ইহাদিগকে কোন বড় বৃক্ষের তলায় পড়িয়া থাকিতে হয়। সেই ছায়ার মধ্য হইতে ইহাকে আলোকের সুবিধা করিয়া লইয়া বাড়িতে হইবে। শীতের প্রারম্ভে বড় বড় বৃক্ষের পত্র পড়িয়া গিয়া সমস্ত অরণ্য ভূমি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, ইহাতে অন্তর্ভৌম কাণ্ডের একটী সুবিধা হয়, যে, শীতের প্রবল পরাক্রম পত্রের আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারে না। এইরূপে সমস্ত শীতকাল তাহারা নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকে। একটু জল পড়িলে পর, অথবা বসন্তের প্রারম্ভে গরম বায়ু বহিলে, ইহারা তাড়াতাড়ি করিয়া পত্র পুষ্প ও ফল উৎপন্ন করিয়া ফেলে। তাড়াতাড়ি করিবার কারণ, পাছে উপরের বৃক্ষ গুলিতে পত্র উঠিয়া আলোকের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগের বাড়িবার উপায় বন্ধ করে। বৃক্ষের পত্রোৎপত্তি হইতে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যেই সমস্ত কার্য্য সারা হইয়া যায়, এবং সেই সময়ে যথেষ্ট খাদ্যও অন্তর্ভৌম কাণ্ডে সঞ্চিত হইয়া যায়।

এইবার আমরা বহির্ভৌম কাণ্ডের বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। উদ্ভিদের আকৃতি ও প্রকৃতি কাণ্ডের উপর নির্ভর করে। কাণ্ডের প্রধান কার্য্য পুষ্পোৎপাদন ও তাহা ধারণ। এই নিমিত্ত কাণ্ড ছোট বড় হইয়া থাকে। যে সকল উদ্ভিদ্ এক বৎসরের মধ্যে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া বীজ ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিয়া মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। ওষধি গুলির কাণ্ড বেশী লম্বা হয় না। এরণ্ড বৃক্ষের কাণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত ওষধি কাণ্ডের আয়তন। অপর বৃক্ষ এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায় না। প্রথম বৎসরের পাতা পড়িয়া গেলে পুনরায় নূতন পত্রোদ্গম হয়। যদ্যপি এই সকল বৃক্ষের কাণ্ড সবুজ বর্ণ ত্বকের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং যদি সেই সকল বৃক্ষ মানুষ অপেক্ষা অধিক উচ্চ হইয়া বাড়িতে না পারে, তখন সেই সকল বৃক্ষকে গুল্ম বলা যায়, যেমন বেল, কামিনী ফুলের গাছ। যখন কাণ্ডের ত্বক্ অত্যন্ত কঠিন ও অসমান এবং বর্ণহীন হইয়া যায় এবং যখন কাণ্ডের বৃদ্ধির কোন পরিমাণ থাকে না তখন তাহাকে উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রানুযায়ী বৃক্ষ বলা যায়। যেমন আম জাম অশ্বত্থাদি বৃক্ষ। মেক্সিকো দেশে একটী বৃক্ষের গুঁড়ির বেড় ৩৪৮ হাত! সাধারণতঃ বৃক্ষের অন্যান্য অংশাপেক্ষা গুঁড়ি অধিক মোটা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাজিল দেশে এক জাতীয় তাল আছে তাহার গুঁড়ি অপেক্ষা উপরকার কাণ্ডাংশ অধিক মোটা। এই বৃক্ষের কাণ্ডকে দেখিতে পিপার ন্যায়। কাণ্ডের যে স্থানে পত্র বা ডাল উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই স্থানে একটী বড় গাঁট হয়, এই নিমিত্ত বেশ সরল গুঁড়ি প্রায়ই পাওয়া যায় না।

গাঁট গুলির ব্যবধান সকল সময় ঠিক সমান থাকে না। কখনও কখনও পর্য্যায় ক্রমে অল্লাধিক ব্যবধান দাঁড়াইয়া যায়। গোলাপ, দারু হরিদ্রা প্রভৃতির কাণ্ডের ইহা বেশ দেখা যায়। কাণ্ড হইতে যে ডাল নির্গত হয় তাহার গাঁটের ব্যবধানও অপেক্ষাকৃত বড় এবং ছোট হইতে পারে।

পত্রবৃক্ষ বৃক্ষের অত বৃহৎ আকার ধারণের কারণ এই, যে, পত্রদিগকে অধিক আলোকে লইয়া যাওয়া চাই, কারণ পত্র হইতে তাহারা অনেক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবে। এবং বহু পত্রকে আলোর দিকে আনিবার জন্য ডালগুলিকে অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইতে হয়। যে বৃক্ষের পত্র গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল হইতে জন্মে তাহারা বেশী ছড়াইয়া পড়িতে পারে না। অন্যান্য বৃক্ষ খুব ছড়াইয়া বাড়িতে পারে। এইরূপ অধিক

আলোক পাইবার জন্য পত্রের উচ্চে অবস্থিতি, কেবলমাত্র উপযুক্ত, কাণ্ড হইতেই সম্ভব। কাণ্ড উপযুক্ত ভার-সহ না হইলে লতাইয়া অন্য ভারসহ বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে। কখনও বা জলের মধ্যে জন্মিয়া জলের সাহায্যে দাঁড়াইয়া থাকে। কখনও বা খোলা মাঠের মধ্যে জন্মিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া বাড়িতে থাকে। এই সকল কারণে উদ্ভিদ জাতির কাণ্ডকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়:— প্রথম—গড়ানে; দ্বিতীয়—ভাসানে, তৃতীয়—লতানে বা জড়ানে, এবং চতুর্থ—দাঁড়ানে। এই প্রত্যেক বিভাগের সুবিস্তৃত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

গড়ানে গাছগুলি প্রায়ই পাথর বা কাঁকর শক্ত শক্ত জমিতে, বায়ু দ্বারা আলোড়িত পর্ব্বতের উচ্চ গুহায় এবং নীচু বালি জমিতে জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে সকল প্রদেশে প্রবল বায়ু বিতাড়িত হইয়া বড় বড় বৃক্ষ ভাল জন্মিতে পারে না, এইরূপ খোলা এবং অনুর্ব্বর জমিতে ইহারা জন্মে। প্রায়ই এই সকল বৃক্ষের পাতা ক্ষুদ্র এবং অবিভক্ত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক বৎসরে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পাতার সংখ্যা অল্প হইলে পাতার গাঁটগুলির ব্যবধান বাড়িয়া যায় এবং পাতাগুলি বিভক্ত হইয়া থাকে। ডাঁটার গায়ে ইসক্রুর মত চক্রাকারে পাতার উদ্গম হয়। লতানে গাছ বৃদ্ধি পাইবার সময় যদি সম্মুখে কোন বাধাদ্বারা প্রতিহত না হয়, তাহা হইলে তাহারা ইতস্ততঃ পালা ছড়াইয়া থাকে এবং সমজাতীয় বৃক্ষ পাশাপাশি জন্মিলে উভয়ের বৃদ্ধি হেতু উভয়ের ডালপালা পরস্পর জড়াইয়া গিয়া জোট বাঁধিয়া যায়।

প্রথমে যখন গড়ানে গাছ জন্মে, তাহা একেবারেই মাটীর উপর গড়াইতে আরম্ভ করে না, কিন্তু কলাংশ খানিকটা অন্য বৃক্ষের অঙ্কুরের ন্যায় উপরদিকে বাড়িতে থাকে। খানিকটা বাড়িতে না বাড়িতেই কাণ্ড মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং মৃত্তিকা স্পর্শ করে, অথবা একেবারেই গোড়া হইতেই সমস্ত কাণ্ড মৃত্তিকায় সংলগ্ন হয়। যে গাছগুলি ঝুঁকিয়া পড়ে তাহাদের ডগাগুলি কিন্তু পুনরায় উপরদিকে বাড়িতে থাকে এই জন্য তাহাদের ∩ এর মত দেখিতে হয়।

বাড়িতে পারে। প্রথম জাতীয় গড়ানে গাছগুলি অনেক দিন ধরিয়া বাঁচে। ইহাদের প্রতি বৎসরে অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং ইতস্ততঃ ডালপালা উৎপন্ন হইয়া ইহারা বেশ বড় হয়। কোন কোন জাতিতে কাণ্ডের প্রথমাংশটী গুঁড়ির ন্যায় সারবান হইয়া যায় এবং willow গাছের ন্যায় কখনও কখনও মোটা হইয়াও থাকে। এই জাতীয় কতকগুলি গাছের পাতা ঝরিয়া যায় আর কতকগুলি সাপের খোস ফেলি মারিয়া যায়।

দ্বিতীয় জাতীয় গড়ানে বৃক্ষে প্রভেদ এই যে, ইহাতে পুরাতন ডাল হইতে নূতন কুঁড়ি নির্গত হইয়া সমস্ত বৎসর পাকাপোক্ত হইয়া থাকে এবং পর বৎসরে, তাহা হইতে শিকড় নির্গত হইয়া নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে পুরাতন বৃক্ষের কাণ্ডটী মরিয়া যায়। এই সকল নূতন গাছগুলি অত্যন্ত রোগা লতার ন্যায় হইয়া থাকে।

এই জাতির এক প্রকার কাণ্ডে ঘন সন্নিবেশিত প্রচুর পত্রোদ্গম হয় এবং এক বৎসরের মধ্যেই তাহা মরিয়া যায়। প্রত্যেক পত্রের কোণে কুঁড়ি থাকে না বটে, কিন্তু কাণ্ডের শেষভাগে কুঁড়ি উদ্গত হইয়া মূল নিক্ষেপ করিয়া থাকে। Periwinkle গাছে কাণ্ড ধনুকাকারে বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাতে এইরূপ কুঁড়ি দেখা যায়। আর এক প্রকার কাণ্ডে পত্রের গাঁটগুলির ব্যবধান কিঞ্চিৎ অধিক এবং যে সকল কুঁড়ি হইতে মূল নির্গত হইয়া নূতন বৃক্ষের সৃষ্টি করে তাহার ব্যবধানও অধিক; এই জাতীয়ের কাণ্ড প্রথমাপেক্ষা সরু এবং এক বৎসরেই মরিয়া যায়। এক বৎসরের মধ্যেই নূতন কাণ্ড হইতে পুনরায় কাণ্ড বহির্গত হইতে পারে এবং কিছুকাল পরে একটী গাছ অনেকটা জমি লইয়া বাড়িতে দেখা যায়।

হিমালয় অঞ্চলে এই জাতীয় এক প্রকার গাছ দেখা যায়। একটী ক্ষুদ্র ডাঁটার উপর সমস্ত পাতাগুলি গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মকালে কতকগুলি পত্রের কোণ হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লম্বা রক্তবর্ণ কাণ্ড নির্গত হইয়া পর্ব্বতের ফাটলের দিকে বাড়িতে থাকে এবং প্রত্যেক কাণ্ডের শেষ ভাগে একটী মাত্র কুঁড়ি হইয়া থাকে। পর বৎসরে কাণ্ডগুলি মরিয়া যায় এবং তাহা হইতে উৎপন্ন

দুই বৎসরের পর প্রথম বৃক্ষের চারি পাশে গোলাকারে সেই জাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়।

তৃতীয় প্রকারে, কাণ্ড ও তাহার সমস্ত ডালপালা প্রথম বৎসরেই মরিয়া যায়। ইহারা হয় বীজ হইতে অথবা অন্তর্ভৌম গেঁড়ো হইতে উৎপন্ন হইয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে। গেঁড়ো হইতে উৎপন্ন হইতে হইলে বৎসরের প্রথমেই সেই স্থান হইতে ডাঁটা নির্গত হইয়া থাকে। ধুঞ্চি, কালিশোলা, শ্বেত পাঁণিমরিচ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ স্থল।

যে সকল বিশেষ কোষ বৃক্ষের ভার বহনে সাহায্য করে, সেই সকল কোষের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এই সকল গড়ানে গাছে প্রয়োজন হয় না। অতএব ইহাদের অনেকটা কায্য কম হইয়া যায় এবং যে সকল খাদ্য সেই কোষগুলি পোষণ করিত, ইহারা সেই খাদ্যের অন্য সদ্ব্যয় করিতে পারে। কিন্তু গড়ানে গাছের একটী বিশেষ অসুবিধা এই যে ইহার অঙ্গে অধিক আলোক লাগিতে পায় না। কেবল মাত্র যে সকল পত্র মাটীর উপরে ছড়াইয়া থাকে সেইগুলি রৌদ্রতাপে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের 'আওতায়' অন্যান্য পত্র বাড়িতে না পারিয়া হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া অপবিপুষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত যদিও পত্রগুলি চক্রাকারে উৎপন্ন হয়, তথাপি কেবল কতকগুলি মাত্র বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং বৃক্ষের পুষ্টি সাধনে সমর্থ হয়।

ভাসমান কাণ্ডে এবং নিমজ্জমান কাণ্ডে কঠিন কাষ্ঠাংশ থাকে না, তাহার পরিবর্ত্তে তাহার মধ্যে বড় বড় ছিদ্রযুক্ত বায়ু-প্রণালী থাকে, তজ্জন্য তাহারা অত্যন্ত লঘু হয় ও সহজে ভাসিতে পারে। যদ্যপি পদ্মের বা হেলা ফুলের ডাঁটা, শিকড়ের উপর হইতে কাটিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা আর জলে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে পারে না, উপরে ভাসিয়া উঠে। কল্মাশাকের ন্যায় কোন কোন জলজ গাছের গোড়া কাটিয়া দিলেও তাহা পুনরায় মাটীতে লিপ্ত হইয়া বাঁচিতে পারে।

পুষ্করিণীতে দুই এক প্রকার ঝাঁঝি দেখা যায়, তাহাদিগকে তুলিয়া দিলে তাহারা মরিয়া যায়। যেমন ভূমির উপর লতানে গাছ অন্য কোন আধার সাহায্যে উপরে উঠিয়া অধিক আলোক লাভের চেষ্টা করে তেমনি পুষ্করিণীর তলায় জন্মিয়া ইহারা জলের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত উপরে উঠিয়া আলোক লাভে যত্নবান হয়। জল ইহাদের ভারবহন কার্য্য করে। কোন কোন গাছ পুষ্করিণীর তলাতেই জন্মে ও বৃদ্ধি পায়, কেবল মাত্র পত্রের ডাঁটাগুলি লম্বা হইয়া উপরে আলোকের জন্য বাড়িতে থাকে, কখনও বা পাতাগুলিই ফিতার ন্যায় অত্যন্ত লম্বা হইয়া যতদূর সম্ভব জলের উপর উঠিতে চেষ্টা করে। কুশনো ঝাঁঝি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আর এক প্রকার গাছ আছে তাহা কোন বিশেষ স্থানে সংলিপ্ত থাকে না, জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। যখন ইহাদের পাতাগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া মরিয়া যায় তখন ইহারা জলের মধ্যে ডুবিয়া যায়। আবার পুনরায় পত্রের উৎপত্তির সহিত ভাসিয়া উঠে। উক্লিপানা, ইন্দ্রানি পানা প্রভৃতি পানা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। পাণিলাজুক গাছের একটি সন্তরণ-যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে; ইহা গাছের কাণ্ডের দ্বারাই প্রস্তুত হয়। পত্রের গ্রন্থির ব্যবধানাংশে ত্বকে একটী বায়ুর আধার স্বরূপ ক্ষুদ্র থলি প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ লাভ করিয়া কিছুতেই গাছকে জলের মধ্যে ডুবিতে দেয় না। তেঁতুল পাতার মত ছোট ছোট পাতাগুলি গাঁট হইতে উঠিয়া জাহাজের মাস্তুলের ন্যায় উর্দ্ধ হইয়া থাকে। যখন পাতাগুলি পাকিয়া পড়িয়া যায় তখন সন্তরণ-যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না বলিয়া তাহা নষ্ট হইয়া যায় তখন অনায়াসে গাছটী জলের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া পুষ্করিণীর তলায় বিশ্রাম লাভ করে।

অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় জলজাত কাণ্ডের কঠিন কাষ্ঠাংশের প্রযোজন হয় না, ভারবহন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বিশেষ কোষের পুষ্টি করিতে হয় না, এবং আহার শরীরের নানা স্থানে পরিচালনের পথও প্রস্তুত করিতে হয় না, অতএব ইহার অনেক পরিমাণ আহারীয় বাঁচিয়া যায়। কিন্তু আর এক বিষয়ে ইহারা ভূমিজ বৃক্ষ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ জলের মধ্যে যথেষ্ট আলোকের অভাবে ইহারা প্রচুর খাদ্য সংগ্রহে অক্ষম। সেই কারণে বাঁচিবার জন্য খাদ্য আহরণের প্রয়োজন এবং কাজে কাজেই জলজ কাণ্ডকে বর্দ্ধিত হইয়া, নানা উপায়ে যতদূর সম্ভব জলের উপরে আসিতে হয়।

শ্রীবিরিঞ্চিমো

আম্র

আম্রের পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। অনেকেই অনুমান করেন ভারতই আমের আদিস্থান এবং ভারতের মধ্যে হিমালয়ের পাদমূলই ইহার আদি জন্মস্থান। তথা হইতে ক্রমে সমগ্র ভারতে, এবং ভারত হইতে পৃথিবীর গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহে আম্র প্রসারিত হইয়াছে। অধুনা বর্ম্মা, শ্যাম, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, সিংহল, নেটাল, কেনারি দ্বীপপুঞ্জ, কুইনজল্যাণ্ড, জামাইকা, ফ্লরিডা প্রভৃতি বহু স্থানে আম দেখিতে পাওয়া যায়। আরবের মস্কাটে ও লণ্ডনের উপকণ্ঠ বিখ্যাত কিউ উদ্যানেও আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন করা হইয়াছে।

আমাদের জাতীয় জীবনের সহিত আম্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্ম্ম আম্রকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। চূত, আম্র, রসাল, সহকার, মাকন্দ, মধুদূত প্রভৃতি বহু সংস্কৃত নামে আম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্বয়ং মনু বলিয়াছেন, আম্রবৃক্ষ প্রজাপতিরই রূপান্তর স্বরূপ। আম্রপল্লব ব্যতীত আমাদের পূজাদি শুভকার্য্যোপলক্ষে মঙ্গল ঘট স্থাপনা হইতে পারে না। চূত মুকুলই বঙ্গে বাগ্‌দেবীর পূজার প্রধান উপকরণ, এবং উহাই মদনদেবের পঞ্চশরের অন্যতম। উহারই দিগন্তব্যাপী সুঘ্রাণে, এবং উহারই কাণে কাণে মধুকর গুঞ্জন আরম্ভ করিলে, বসন্তের আগমন হইয়াছে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি, তাই আম্রের নাম মধুদূত। গৃহত্যাগের পর বুদ্ধদেব আম্র কাননেই সমধিক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এই কারণে বৌদ্ধগণ আম্রবৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন এই যে আদরের মাথা জামাই ষষ্ঠীর সামাজিক আচার আম্রই যে উহার প্রবর্ত্তক ও ভিত্তিস্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক বিল্ব ও তুলসী যেমন আমাদের জাতীয় পত্র, পদ্ম যেমন জাতীয় ফুল, ধান্য যেমন জাতীয় শস্য, গাভী যেমন জাতীয় প্রতিপাল্য জীব, আম্রও ভারতের অতি প্রিয় জাতীয় ফল। কেবল অত্যুচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ ও পঞ্জাবের উত্তরাংশ ব্যতীত ভারতের ফলের জন্ম নয়। অমন নয়নারাম হরিদ্বর্ণ, অমন চিরসুলভ সুশীতল ছায়া, অমন, সুগোল সুপরিচ্ছন্ন পত্রবেষ্ট, বোধ করি ভারতের অন্য কোনও বৃক্ষের নাই।

অনেক শ্রেষ্ঠ দ্রব্যের ন্যায় আমেরও বিলক্ষণ উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে। উৎকৃষ্ট আম্র বাস্তবিকই দেবভোগ্য। কি গন্ধে, কি স্বাদে, তাহার অপেক্ষা উপাদেয় কোনও কিছু মানুষে কল্পনারও ভাবিতে পারে না। তা ছাড়া কেমন সুগোল, কেমন মসৃণ, কেমন সুখস্পর্শ, কেমন হাতভরা। এ সকল বিষয়ে আর কোন ফলেরই আমের সহিত তুলনা হইতে পারে না। পীচ যেন কেমন নীচের ন্যায় রোমশ, কমলা কর্কশ ও উগ্র বর্ণা, আপেল লঘু রসহীন, আঙ্গুর গন্ধহীন, ক্ষুদ্রাবয়ব অতিশয় স্পর্শকাতর, নারিকেল গরিষ্ঠ হইলেও অনধিগম্য ও শূন্যগর্ভ, পনস কণ্টকদুষ্ট ও কষ্টবহ, দাড়িম্ব বীজবহুল ও গন্ধ রহিত। ফলতঃ আম্রই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল।

কিন্তু অপকৃষ্ট আম্র অতি কদর্য্য ও অখাদ্য। খানিকটা শনের নুড়িতে তারপিন তেল ও বাঘা তেঁতুল মাখাইয়া দিলে যাহা হয়, অপকৃষ্ট আম্র তাহারই রূপান্তর। বলা বাহুল্য, আদিম অবস্থায় আম ঐ রকমই ছিল। মানুষে বহুকালব্যাপী চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা আদিম বুনো আম হইতেই আধুনিক আফুজ, পিয়ারপোষা, বোম্বাই, সফেদা, ফজলী ও ন্যাংড়ার উৎপত্তি করিয়াছে। আবার মানুষে আমের উৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিলে এখনকার ঐ সকল উৎকৃষ্ট আমের অধস্তন বংশধরগণ সেই আদিম বন্য আম্রের অবস্থায় নিশ্চয়ই প্রত্যাবৃত্ত হয়। শুধু আম বলিয়া নয়, মানুষের উপভোগ্য ফুল, ফল, শস্য প্রভৃতি যাবতীয় ঔদ্ভিজ্য পদার্থ সম্বন্ধে ঐ একই নিয়ম; এমন কি জীবরাজ্যেও উহার ব্যত্যয় হয় না। সহস্রদল সুশোভিত বিতস্তি পরিমিত গোলাপ ফুল দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই, কিন্তু আদিম অবস্থায় উহার পাঁচটির অধিক প্যাপড়ি ছিল না, আর উহার [illegible]

দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার আকার অঙ্গুলীর এক পর্ব্বের ন্যায়, এবং তাহাতে সুকঠিন বীজ ও চুলের ন্যায় ত্বক ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। আসামীরা উহাকে 'কতীগুটি' বলে। ঐ নামেই উহার কুত্রীত্ব যথেষ্ট সূচিত হইতেছে। সুবৃহৎ ওয়েলার ও অশ্ব সদৃশ ছেকড়া গাড়ীর অশ্বিনী-কুমার দিগের যে আশ্চর্য্য প্রভেদ, তাহারও মূল কারণ ঐ মানুষের উৎকর্ষ বিধায়িনী চেষ্টা ও সাধনা।

আম্রের যথেষ্ট উৎকর্ষবিধান হইয়াছে স্বীকার করিলেও, উৎকর্ষের চরম সীমা উপগত হইয়াছে এরূপ মনে করিবার হেতু নাই। দৃষ্টান্তের স্বরূপ বলিতেছি, সাধারণ 'বোম্বাই' আম সুমিষ্ট বটে, কিন্তু উহার ছাল অতিশয় পুরু এবং গন্ধ অতিশয় মৃদু আর তেমন মনোরম নয়। পক্ষান্তরে সফেদার ছাল অত্যন্ত চিক্কণ এবং পিয়াপোষার গন্ধ অতিশয় মনোমুগ্ধকর। এই তিনের সংযোগে ক্রমোৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে এক উৎকৃষ্টতর অভিনব আমের বিবর্ত্তন হইতে পারে।

বঙ্গদেশের ভূমি ও জল বায়ু আমের বিলক্ষণ উপযোগী; এই কারণে আম যথেষ্ট উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু ফলের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে বাঙ্গালীরা প্রায়ই অমনোযোগী, এই জন্য এক মালদহ বাদ দিলে খাস বাঙ্গালায় কোনও আম্রবিশেষের বিশেষ প্রসিদ্ধি নাই। ইহার ফলে বাঙ্গালার খাঁটি দেশী আম ক্রমে অবনতির পথেই চলিয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি বড় সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে আমের বাগান প্রস্তুত করিলে বিলক্ষণ লাভবান হইবার সম্ভাবনা। বোম্বাই অঞ্চলে এমন কয়েক প্রকারের আম আছে যাহা বাগানেই ৫০, ৬০, শ' দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। যদিই ঠিক তত ভাল না হয়, তবু ৮, ১০, টাকা শ' দরে বিক্রয় হইবার মত আম আমাদের দেশে অনায়াসে জন্মিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে সাধারণ দেশী আম কোন কোন বৎসর ।৵০ আনা শ' দরে বিক্রীত হয়। এই প্রভেদ য... চেষ্টা ... পরিশ্রমের ... নয় ... অধিক ...

বাগান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যে পুণার আম ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সম্ভবতঃ পেশোয়ার ঐ সদনুষ্ঠানই তাহার আদি কারণ। পুণা ছাড়া আজ কাল মান্দ্রাজের সালেম, যুক্ত প্রদেশের সাহারণপুর (দেওবন্দ) ও লক্ষ্ণৌ, বিহারের দারভাঙ্গা ও খাস বাঙ্গালায় মালদহ উৎকৃষ্ট আম্রের জন্য প্রসিদ্ধ। আম্রের উন্নতি প্রয়াসীকে ঐ সকল স্থানে পর্য্যটন করিয়া ভাল চারা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং যে স্থানে যে ভাবে বাগিচার সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় স্বচক্ষে দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। হাতে কলমে শিখিতে পারিলে আরও ভাল হয়। সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না। কেবল মালীর উপর নির্ভর করিলে বিড়ম্বনাই সার হইবে।

এই প্রবন্ধে সাধারণ ভাবে আমের চাষ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

আম সকল রকম মাটীতেই জন্মিতে পারে, এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গ দেশের মাটি সর্ব্বত্রই ইহার উপযোগী। পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে যেখানে শীত গ্রীষ্মের আতিশয্য অধিক, সেখানে বিশেষ যত্ন না করিলে আমের গাছ বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায় না। যেখানে ভূপৃষ্ঠ হইতে চারি পাঁচ হাত নিম্নে কাঁকর ঘুটিং প্রভৃতি খণ্ডাকৃতি বা বিচ্ছিন্ন কঠিন পদার্থ থাকে, আর উপরের মাটি পলি বা দোআঁশ রকমের হয়, আমের পক্ষে সেই স্থানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বর্দ্ধমান জেলার অধিকাংশ স্থানে মাটির নীচে ঘুটিং বা কাঁকর পাওয়া যায়, এই জন্য ঐ অঞ্চলে আম অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেখানে ঘুটিং বা কাঁকর নাই, সেখানে ইট পোড়াইয়া পাঁজার তলা পরিষ্কার না করিয়া উহার উপরে পুষ্করিণী প্রভৃতির মাটি চারি পাঁচ হাত উঁচু করিয়া ভরাট করিয়া আমের বাগান করিতে পারিলে বড় ভাল হয়।

আমাদের দেশে এখনও দীর্ঘাস্ত প্রায়ই আঁটির চারারই বাগিচা করা হয়, কিন্তু উহাতে তাদৃশ সুফলের প্রত্যাশা করা যায় না। যে সকল আম সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাদের আঁটিতে প্রায়ই চারা হয় না, তা ছাড়া ভাল আমের

গিয়াছে যে আট আনা রকম চারার আম আঁটির গাছের অপেক্ষা নিরেশই হয়। আঁটির চারা ফলেও অনেক দেরীতে। বিশেষ বঙ্গদেশে চৈত্র, বৈশাখ মাসে প্রায়ই প্রবল ঝড় হইয়া থাকে; এই জন্য আঁটির চারার বড় গাছ অপেক্ষা কলমের চারার ছোট গাছই ভাল, কারণ ছোট গাছে ঝড় কম লাগে। এই সকল নানা কারণে, কলমের চারাই অধিক লাভজনক।

আঁটির চারা করিতে হইলে আঁটিগুলিকে মাটিতে না পুতিয়া রোয়াকের পাকা মেঝের উপর বা টিনের চাদরের উপর চারি পাঁচ ইঞ্চ পুরু মাটি বা বালি বসাইয়া তাহাতে আধ হাত অন্তর সারিবন্দি করিয়া আঁটি পুতিলে ভাল হয়। অবশ্য যত দিন চারা উঠাইবার মত বড় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা জল দিতে হয়। এইরূপ করিলে চারা তুলিবার সময় শিকড় ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না, এবং কোন্ আঁটিটি কোন্ আমের তাহা ঠিক্ রাখিতে পারা যায়। যে সকল চারা এই মাদাতেই শীর্ণ ও নিস্তেজ বোধ হইবে, তাহাদিগকে বাগানে না পোতাই ভাল। এই জন্য এই প্রণালীতে ভাল চারা বাছিয়া লইবার সুবিধা হয়।

কলম করিতে হইলেও চারার প্রয়োজন হইবে। সে চারাও ভাল আমের আঁটির হওয়া উচিত এবং তাহাও ঐ প্রকারে তৈয়ার করা যাইতে পারে। তার পর চারাকে মাটির গামলায় বা ভাঁড়ে বসাইয়া লইতে হয়; অথবা ভাঁড়ে বা গামলায় প্রথম হইতেই আঁটি পুঁতিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারা যায়। বোম্বাই অঞ্চলে গামলার পরিবর্ত্তে ভাঁড়ই ব্যবহার করে। গাছের ডালের উপর গামলার চেয়ে ভাঁড় বাঁধা অনেকটা সহজ, একটু কাৎ করিয়া বাঁধিলেও তত ক্ষতি হয় না। বলা বাহুল্য যে ভাঁড়ের তলায় বায়ু প্রবেশের নিমিত্ত দুই একটা ছিদ্র করিয়া দেওয়া উচিত। চারা বসাইবার পূর্ব্বে ভাল সার মাটি দিয়া গামলা বা ভাঁড় ভরিতে হয়। অনেকগুলা গামলা বা ভাঁড়কে একটু মাটি খুঁড়িয়া গায়ে গায়ে ঠেকাইয়া এক বৎসরের চারা হইতেই যোড়-কলম করা চলে। সকলেই জানেন কলমের চারার দুইটি অংশ; এক অংশ আঁটি হইতে উৎপন্ন চারার, অপর অংশ গাছের। চারার যে অংশ, তাহাই গামলা বা ভাঁড়ের মাটিতে বসান থাকে। উহারই সঙ্গে বা উপরে, যে গাছের কলম লইতে হইবে, তাহার একটী ক্ষুদ্র শাখার বা পল্লবের সংযোগ করিয়া দিতে হয়। যোড়-কলমের জন্য উভয়েরই সমান মোটা হওয়া আবশ্যক।

প্রথমে চারার উপযুক্ত কলম দেখিয়া তাহার কাছে গামলা বা ভাঁড়টিকে এমনই ভাবে বসাইতে বা বাঁধিতে হইবে যে চারা ও কলমের পল্লবটি যেন গায়ে গায়ে লাগে। তার পর চারার দিক থেকে কলমের, ও কলমের দিক থেকে চারার ছাল, তিন চারি আঙ্গুল আন্দাজ, খুব ধারালো চাকু দিয়া, চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। চারার গায়ের ঐ চাঁচা জায়গাটা আর কলমের গায়ের ঐ চাঁচা জায়গাটা ঠিক্ এক মাপের হওয়া চাই। এখন ঐ দুইটি চাঁচা জায়গা পরস্পর ঠিক মিলাইয়া, কোথাও চুলমাত্রও যেন ফাঁক না থাকে এমনই করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। প্রথমে একবার বাঁধিয়া উহার উপরে মাটী বাঁধিতে হয়। ভাল এঁটেল মাটির সঙ্গে কিঞ্চিৎ গোবর ও শোণের কুটি মিশাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হাতুড়ি দিয়া কুটিলে উত্তম মাটি প্রস্তুত হয়। গাছে বাঁধিবার কয়েক দিবস পূর্ব্বে মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। যোড়ের চারিদিকে উত্তমরূপে মাটি লেপিয়া তাহার উপরে ছোট চট্ বা কলার বাস্না জড়াইয়া উপরে সরু দড়ি দিয়া বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। এই মাটি সর্ব্বদা ভিজা রাখা আবশ্যক, এই জন্য ঠিক যোড়ের উপরে একটা ঝারা বাঁধিয়া দিলে ভাল হয়, নতুবা সর্ব্বদা জলের ছিটা দিতে হয়। মাটির পরিবর্ত্তে সমপরিমাণে তারপিন্ তেল, মোম, চর্ব্বি ও বেরোজা অল্প উত্তাপে গলাইয়া ও উত্তমরূপে ঘুঁটিয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে লাগান যাইতে পারে। ইহাতে সুবিধা এই যে ভিজা রাখিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের

চারি পাঁচ আঙ্গুল নীচে কলমের ডালের এক দিকের একটু ছাল চাঁচিয়া ফেলিতে হয়, আর চারার যে অংশ যোড়ের উপর থাকে, তাহারও ছাল একটু কাটিয়া দিতে হয়। তার পর ক্রমে সপ্তাহে সপ্তাহে উভয়েরই আরও একটু একটু ছাল তুলিয়া দিতে হয়। শেষ ছাল টুকু তুলিয়া ফেলিবার সময় একটু বিশেষ সাবধনতা আবশ্যক। কলম গাছের বদলে চারার নিম্নার্দ্ধের সাহায্যে গামলার মাটি হইতে রস গ্রহণ করিতেছে কি না, এবং পক্ষান্তরে চারার মূলগুলি কলমের পল্লবের পাতার সাহায্যে পরিপুষ্ট হইতেছে কি না,—অর্থাৎ যেটি অচিরাৎ কলমের চারা হইবে তাহার উপরের ও নীচের অংশের সহিত সম্যক্ আদানপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে কি না, বিচক্ষণতার সহিত নির্ণয় করিতে হইবে। কৌতূহলপরবশ হইয়া যোড়ের মাটি খুলিয়া কি হইতেছে দেখিতে গেলে, সকলই পণ্ড হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহার পর হইতে অল্পে অল্পে চারার উপরের অংশটা কাটিয়া ফেলিতে হয়। দুই চারি দিন অপেক্ষা করিয়া, গাছ হইতে কলমের অংশটা একটু একটু কাটিয়া অবশেষে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে হয় এবং গামলা বা ভাঁড়গুলিকে তখন গাছের উপর হইতে নামাইয়া যেখানে হাওয়া লাগিতে পারে অথচ ছাওয়া থাকে, এমন কোনও স্থানে রাখিয়া আবশ্যক অনুসারে মাঝে মাঝে জল দিতে হয়। মাছ পচান সার বা পুকুরের নীচের পচা পাঁক আবশ্যকমত দো-আঁশ মাটির সহিত মিশাইয়া গামলার উপরে বিছাইয়া দিলে খুব উপকার হয়।

এই প্রকারে যে সকল (আঁটির বা কলমের) চারা তৈয়ার হইল, তাহাদিগকে বর্ষা আসিলেই বাগিচায় বসাইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। চারা প্রস্তুত করিতে না সংগ্রহ করিতে যে দুই এক বৎসর সময় লাগিবে তত দিন বাগিচার জমিতে অড়হর, মুগ, ঝিরি কলাই প্রভৃতির চাষ করিলে ভাল হয়। দেশী পাট, করা সম্ভব হইলে মটর, শাঁখআলু, কুমাণি বীন প্রভৃতিও বুনিতে পারা যায়। যদি মোটেই চাষ করিবার উপায় না থাকে, একটা বিশেষ গুণ এই যে, উহাদের মূল দূরদূরে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় ততদূরের জমির উর্ব্বরতা শক্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়।

চারা সংগ্রহ করিবার ও বসাইবার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। ফল যত বিবিধ প্রকারের হয়, লাভ ততই অধিক হইবার সম্ভাবনা। কোন একটি বৃহৎ বাগিচায় অন্ততঃ পঞ্চাশ রকমের আম থাকা আবশ্যক। আর একটি কথা এই যে আম পাকিবার সময়টা যত দীর্ঘ হয় ততই ভাল। বাগানের সমস্ত আম কেবল জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিলে, সে আম বেশী দরে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্য দেখা আবশ্যক যে বৈশাখ হইতে আশ্বিন কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বরাবর আম পাকিতে থাকে। আমাদের দেশী আম সাধারণতঃ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া থাকে। বোম্বায়ের সুবিখ্যাত আম আফ্‌জ বা অল্‌ফন্সো এবং ত্রিহুতের কাউয়া ভোগ, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিয়া থাকে। দারভাঙ্গা অঞ্চলের 'বোম্বাই', গোপালভোগ, সফেদা, শা-পসন্দ, বাঁকা, কিষণভোগ প্রভৃতি কয়েক প্রকার আম জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে পাকে। ত্রিহুতের ভূপালী, করেলা, লাড়ুয়া, খরবুজা, ফজলী, প্রভৃতি আষাঢ় শ্রাবণে পাওয়া যায়। ত্রিহুত ও মালদহের ল্যাংড়া, টেড়াকেলুয়া, ভাড় (ভাদ), মোহন ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক প্রকারের আম শ্রাবণ হইতে আশ্বিন, এমন কি কার্ত্তিক পর্য্যন্তও গাছে থাকে। যে সকল আম ভাড়, মোহনঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় বেশী নাবী তাহাদের উপরে পাৎলা কাপড় বা চুবড়ী বাঁধিয়া দিতে হয়, নতুবা পাখী, কাঠ বিড়ালী, বাদুড়, বোল্‌তা প্রভৃতিতে খাইয়া ক্ষতি করে। এ অবশ্য পরের কথা। আপাততঃ চারা বসাইবার সময় জাঠো বা 'আগামী' ও 'নাবী' বিচার করিয়া বাগানের পূর্ব্ব দিকে জাঠো আমের চারা ও পশ্চিম দিকে নাবী আমের চারা বসান উচিত।

নিকৃষ্ট আমের গাছ বাগানে রাখা দূরে থাকুক বাগানের নিকটে রাখাও বাঞ্ছনীয় নয়। এই জন্য নূতন বাগান প্রশস্ত মাঠের ভিতর স্বতন্ত্র ভাবে প্রস্তুত করা আবশ্যক। নিকৃষ্ট আমের ফুলের

কখনও কখনও উদ্যোগ হইয়া থাকে। আম রাখিবার জন্য জাহাজের খোলে ঠাণ্ডা কামরার বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র আম পাঠাইতে পারা যায়। ঐরূপ বন্দোবস্তে সুদূর জামাইকা দ্বীপ হইতে লণ্ডনে আম প্রেরিত হয়। তথায় প্রত্যেক আম দুই টাকা আড়াই টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

পাকাইয়া বিক্রয় করাই অবশ্য উদ্যানস্বামীর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু নানা কারণে কাঁচা আমও অনেক পড়ে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে চৈত্র বৈশাখ মাসের ঝড়ে বিস্তর কাঁচা আম পড়িয়া যায়।

কিন্তু কাঁচা আমেরও যথেষ্ট ব্যবহারোপযোগিতা আছে। উহার ফালি কাটিয়া শুকাইলে আমশী (আমচুর) প্রস্তুত হয়। কচি আমের আমশী গৃহস্থের অতি আদরের সামগ্রী। কাঁচা আমের চাট্‌নী ও আচার অতিশয় মুখপ্রিয়। পশ্চিম অঞ্চলের প্রত্যেক গৃহস্থ সম্বৎসরের নিমিত্ত আচার প্রস্তুত করিয়া রাখে। য়ুরোপেও চাট্‌নীর যথেষ্ট আদর। আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে কাসুন্দী প্রস্তুত করা পুরাঙ্গনাদিগের একটি প্রীতিপ্রদ উৎসব। শুভ দিন দেখিয়া শঙ্খনিনাদ ও হুলুধ্বনিসহ অতিশয় শুদ্ধাচারে কাসুন্দীর উপকরণ হরিদ্রা ও সর্ষপ ধৌত করা হয়। হরিদ্রা ও সর্ষপ শুকাইবার নিমিত্ত গৃহ প্রাঙ্গণ উত্তমরূপে গোময়-লিপ্ত করা হয়; ঢেঁকি, ধামা, কুলা প্রভৃতি সুগৃহিণীর আদরের সামগ্রী গুলিও ধুইয়া পরিষ্কার করা হয়। হরিদ্রাদি শুষ্ক হইলে অন্য এক শুভ দিনে ঢেঁকিতে কুটিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করা হয়। কোনওরূপে শুদ্ধাচারের কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি হইলেই কাসুন্দী অবিলম্বেই পচিয়া যায়। গৃহস্থের পক্ষে তদপেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল-সূচন আর কিছুই নাই। কাসুন্দী পচিয়াছে দেখিবা মাত্র গৃহকর্ত্রী অতি মাত্র বিচলিত হইয়া দেবতাদের নিকট পূজাদি মানসিক করেন। স্থূল দৃষ্টিতে এ সব কুসংস্কারমূলক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কাসুন্দী অন্তঃপুরের শুদ্ধচারিতার একটি উৎকৃষ্ট পরীক্ষা স্থল। শুদ্ধাচারের অভাব হইলে বহুবিধ রোগের প্রভাব বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা, সুতরাং গৃহস্থের অমঙ্গলের সূচনাই ত বটে; আর ঐ সকল রোগের বীজাণু কাসুন্দীতে বিসর্পিত হওয়ায় কাসুন্দী পচিয়া যায়, এরূপ অনুমান করাও নিতান্ত অসঙ্গত নয়। তত্ত্বান্বেষী নব্যারা অত সহজে ধরা দিতে রাজী নন, তাই কাসুন্দীর উৎসবের ক্রমে তিরোধান হইতেছে।

পাকা আমেরও টাট্‌কা খাওয়া ছাড়া আরও কয়েক প্রকার ব্যবহার আছে। য়ুরোপীয়দিগের ব্যবহারের নিমিত্ত 'জেলি' প্রস্তুত হইয়া থাকে। জেলির আস্বাদ কতকটা আমাদের 'গুড় অম্বলের'ই মত। আর আমাদের পল্লীবাসিনী সুগৃহিণীরা বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমসত্ত্ব প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বৎসরের সার ফল আম ফুরাইয়া গেলে এই আমসত্ত্ব দ্বারা আমরা কিয়ৎপরিমাণে তাহার বিরহ শান্তি করিতে চেষ্টা করি। সযত্নপ্রস্তুত ও সযত্নরক্ষিত আমসত্ত্ব অতি উপাদেয় জিনিস, গৃহস্থের অতি আদরের সামগ্রী। দুধের সহিত উহার সদ্য প্রায় সুপক্ক আমেরই সমান। আমি যতদূর জানি যশোহর জেলার মহেশপুরের মত পরিষ্কার ও সুন্দর দানাযুক্ত আমসত্ত্ব আর কোথাও হয় না। কেবল আমসত্ত্বের নিমিত্ত তথায় চিহ্নিত গাছ থাকে। যে সকল আমের গোলা ঘন ও শুভ্রবর্ণ, আমসত্ত্বের নিমিত্ত তাহাই উৎকৃষ্ট। ঐ প্রকার আম হইতে মহেশপুরে যে আমসত্ত্ব হয় তাহা দেখিতে প্রায় দুধের সরের মত। মহেশপুরের নিকটবর্ত্তী যে সকল গ্রামের সহিত ঐ গ্রামের কন্যা আদানপ্রদান হইয়াছে, সেই সকল গ্রামেও আমসত্ত্বের যথেষ্ট পারিপাট্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলের ভদ্রবংশীয়া দুস্থ বিধবাগণ আমসত্ত্ব বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জনও করিয়া থাকেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

কাচ

৩

জল, ক্ষার, অম্ল, বায়ু ও আলোক কাচকে অল্পাধিক আক্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু যদি প্রস্তুত কালীন উত্তাপ অধিক দেওয়া যায় অথবা উপাদান সকল ঠিক সমান উপাদানে মিশ্রিত হয় তাহা হইলে কাচ অবাধে উপরি উক্ত শত্রু সকলের

আক্রমণ সহ্য করিয়া থাকে। কাচে ক্ষারময় পদার্থের ভাগ অধিক থাকিলে জলে আংশিক দ্রবীভূত হইবার সম্ভাবনা। অধিকক্ষণ ধরিয়া জল ফুটাইলে অনেক কাচপাত্র জলের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ক্রাউন গ্লাসে (Crown glass) ক্ষারের ভাগ অল্প ও সীসা না থাকায় উহা জল ইত্যাদির আক্রমণে বাধা দিয়া থাকে। এজন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাচ নির্ম্মিত পাত্রাদিই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। বায়ু সংযোগে সোডা অপেক্ষা পটাসযুক্ত কাচ অধিকতর আর্দ্রীভূত হইয়া থাকে, কেন না সোডা অপেক্ষা পটাস বায়ুর জলীয়াংশ শীঘ্রতর শোষণ পূর্ব্বক আর্দ্র হইয়া যায়।

আলোক ও বায়ু সংযোগে অনেক রঙ্গিণ কাচ বর্ণবিহীন হইতে আরম্ভ করে। অনেকে বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন ঈষৎ হরিৎ বা নীল বর্ণের কাচ ক্রমশঃ শুভ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকে। বোধ হয় আলোক ও বায়ু সংযোগে উহাদের বর্ণের মূলীভূত লৌহাত্মক লবণ ক্রমশঃ অধিক অম্লীকৃত (Oxidised) হইয়া গিয়া বর্ণ-বিহীন হইতে থাকে। ম্যাঙ্গনিস্ যুক্ত কাচ যত পুরাতন হইতে থাকে ততই বেগুণে রঙ্গের মত হইয়া যায়। সীস সংযুক্ত কাচ বায়ু মিশ্রিত সলফরেটেড্ হাইড্রোজেন (Sulphuretted Hydrogen) নামক বাষ্প সংযোগে ক্রমশঃ মলিন ও অস্বচ্ছ হইতে থাকে ও উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণের এক আবরণ পড়িয়া যায়। সীসা ও গন্ধক সংযুক্ত Lead sulphideর বর্ণ কৃষ্ণ। খড়খড়ি, জানালা, কড়ি ইত্যাদিতে সীসার রঙ্গ দিলে উহা কালক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিতে থাকে, ইহা বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন্। বায়ু মিশ্রিত উক্ত সলফরেটেড্ হাইড্রোজেন সংযোগই ইহার কারণ। কাচে সীসার ভাগ অধিক থাকিলে ঐ প্রকারে সেই জন্যই কৃষ্ণবর্ণ আবরণে কাচ মলিন হয়। অনেক সময় চসমার কাচ (Pebbles) ভাল না হইলে ঐ প্রকারে মলিন হয়। গন্ধক দ্রাবক দ্বারা অনেক কাচ আক্রান্ত হইয়া থাকে। উহাদ্বারা অনেক সময়ে কাচের উৎকর্ষতা পরীক্ষা করিতে পারা যায়। যদি কাচ অপকৃষ্ট শ্রেণীর হয় তাহা হইলে গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) সংযোগে বিবর্ণ ও অনুজ্জ্বল হইয়া যাইবে; তাহা না হইলে কাচ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া জানিতে হইবে।'

কাচ অতি দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। কাচের দ্রব্য ভাঙ্গিয়া নষ্ট না হইলে যুগযুগান্তরেও রূপান্তরিত হয় না। অনেক ধাতুময় দ্রব্যে মরিচা বা কলঙ্ক ধরিয়া বায়ুস্থ অম্লজানের প্রকোপে যেরূপ নষ্ট হইয়া যায় কাচ সেরূপ হয় না। কিন্তু রোমে অতি প্রাচীন কালের কবর মধ্য হইতে যে সকল কাচ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা কালমাহাত্ম্যে এরূপ অদ্ভুত রূপান্তরিত হইয়াছে যে আর সে গুলিকে কাচ বলিয়া সহজে চিনিবার উপায় নাই। দেখিলে বোধ হয় যেন স্তরে স্তরে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক প্রকার শ্বেতবর্ণ ধূলিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাচগুলির উপরিভাগ ধূলিতে পরিণত হইয়াও কেন্দ্রস্থল এখনও অবিকৃত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতি পুরাতন কোন কোন গির্জ্জায় এ প্রকার বিকৃত কাচ দেখা গিয়া থাকে।

কাচ যত ঘন, কঠিন ও উজ্জ্বল হইবে ততই ভাল। এইজন্য সিলিকা ও ক্ষার যুক্ত কাচে একটু চূণ (Lime) মিশাইয়া লইতে হয়। ইহাতে কাচের উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত হয় ও কাচ জল বায়ুর আক্রমণ সহ্য করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চূণের দ্বারা আর এক উপকার সাধিত হয় এই যে, সাজী ক্ষারের (Potassium Carbonate) মধ্যে সংমিশ্রিত সলফেট বা মিউরিয়েট থাকিলে চূণ সে সকল লবণকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া উপাদানের বিশুদ্ধি রক্ষা করে। সোডাযুক্ত কাচে চূণের ভাগ একটু অধিক দিতে হয়। পটাস যুক্ত কাচে চূণ অধিক দিলে খারাপ হইয়া যায়। সোডা যুক্ত কাচ অপেক্ষা পটাস যুক্ত কাচ কঠিনতর ও অধিকতর তাপসহ। এইজন্য দগ্ধ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় (Combustion Analysis) ও অনেক স্থলে পরীক্ষাদির জন্য (Marsh's Test &c) রাসায়নিকগণ পটাস যুক্ত কাচের যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সিলিকার সহিত ক্ষার মিশিলেই কাচের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বালুকা প্রস্তর (Quartz), শ্বেত বালুকা, সাধারণ বালুকা, প্রস্তর চূর্ণ ইত্যাদি হইতে সিলিকা, সাজী-ক্ষার (pearl ash), সোডা ভস্ম (soda ash)

প্রভৃতি হইতে ক্ষার গৃহীত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে সোডা যুক্ত কাচ প্রস্তুত করিবার কালে সোডা কার্ব্বণেটের পরিবর্ত্তে সোডা সল্‌ফেট্‌ ব্যবহৃত হয়। সাধারণ লবণ ও গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) পরস্পর সংযুক্ত হইলে লবণ দ্রাবক (Hydrochloric acid) ও সোডা সল্‌-ফেটের উদ্ভব হয়। এই সোডা সলফেট বিমিশ্র অবস্থায় বাজারে সচরাচর (Salt cake) নামে অভিহিত। বাজারে বিক্রয়ার্থ যে শ্বেতবর্ণ সোডা চূর্ণ (Hydric Sodic Carbonate) প্রস্তুত থাকে তাহা প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা (Leblanc or Ammonia Soda process) উক্ত Salt cake হইতেই প্রস্তুত হয়। কাচের জন্য সল্ট কেক ব্যবহার করিতে হইলে উহার সহিত অঙ্গার মিশাইয়া লইতে হয়। অঙ্গারের জন্য কাঠের কয়লাই সচরাচর ব্যবহার্য্য। ১০০ ভাগ সল্ট কেকে প্রায় ৮ ভাগ কয়লা আবশ্যক। সল্টকেকের সহিত কয়লা মিশাইয়া তাপ দিলে উহার এসিড বা অম্লের ভাগ (Suphurous Anhydride Carbonic acid) বাষ্পীভূত হইয়া গিয়া সোডা কাচে থাকিয়া যায়। গ্লবার্স সল্ট (Glauber's salt) নামক স্বভাব জাত লবণ উক্ত সোডা সলফেট ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেক কারখানায় সোডা সলফেটের পরি-বর্ত্তে উক্ত গ্লবারের লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৮৮ পাউণ্ড বালুকার সহিত ৪৪ পাউণ্ড উ গ্লবারের লবণ ও ৩ পাউণ্ড মিলাইয়া উত্তাপ দিলে ব্যবহারোপযোগী কাচ প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার সহিত কিঞ্চিৎ চূণ মিলাইলে ভাল হয়, কারণ চূণ সংযোগে মিশ্রিত পাদার্থ সহজে দ্রবণীয় হয়। কিন্তু অঙ্গারের ভাগ কম পড়িলে গলিতে বড়ই বিলম্ব হয়। গ্লবারের লবণের সহিত Galena নামক (Sulphide of Lead) সীসা সংযুক্ত খনিজ বিশেষ মিশাইলেও চলে। গ্লবারের লবণ কাচ নির্ম্মাণে উপযোগী বটে, কিন্তু উহা ব্যবহারে এই এক দোষ হয় যে উত্তাপাধিক্যে উহার কিয়দংশ বাষ্পাকারে উদ্গত হইয়া চুল্লীর উপরিস্থ খিলান ও কাচ গালাই করিবার মৃত্তিকা পাত্র গুলিকে আক্রমণ করে। এইজন্য গ্লবারের লবণ, কয়লা, চূণ ও আবশ্যকীয় বালুকার এক চতুর্থাংশ মিশাইয়া অল্প উত্তাপে প্রথমে গলাই-করিতে হয় এবং অবশিষ্ট বালুকা একেবারে না দিয়া ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া দিতে হয় ও উত্তাপ ও তদনুসারে ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে আর চুল্লী নষ্ট হইবার কোন ভয় থাকে না। বালুকা অল্পে অল্পে না দিয়া একেবারে দিলে এই হয় যে, গলিবার কালে চূণ ও বালুকা নিম্নে পড়িয়া গিয়া লবণময় ভাগ ঊর্দ্ধে ভাসিয়া উঠে; সুতরাং প্রস্তুত কাচের সমুদায় ভাগে উপাদানের সমতা থাকে না ও কাচ নষ্ট হইয়া যায়। সোডা সল্‌ফেটের পরিবর্ত্তে পটাস সল্‌ফেট দিলে পটাস যুক্ত কাচ প্রস্তুত হইবে।

সাধারণ লবণ দ্বারাও কাচ প্রস্তুত হইতে পারে। কারন্‌ (Kirn) মহোদয় বলেন সাধারণ লবণ কাচ প্রস্তুতের সুন্দর উপযোগী। তাঁহার মতে

	নং ১	নং ২
কোয়ার্টজ বালুকা—	৬০.০	৫৭.১
ভৃষ্ট (Calcined) পটাস কার্ব্বনেট—	১৭.৮	১৯.১
সাধারণ লবণ—	৮.৯	৯.৫
চূণ—	১৩.৩	১৪.৪

এই পরিমাণে ভাগ মিশাইয়া উত্তাপ দিলে সুন্দর কাচ প্রস্তুত হয়। নং ১ অনুযায়ী ভাগে উপাদান মিশ্রিত হইলে প্রায় ১০ ঘণ্টা কাল উত্তাপের আবশ্যক এবং নং ২ অনুসারে ভাগ মিশাইলে ২৩ ঘণ্টা কাল ব্যাপী উত্তাপের প্রয়োজন।

পটাশের পরিবর্ত্তে গ্লবারের লবণ ব্যবহৃত করিতে হইলে ভাগ নিম্নলিখিত প্রকার হইবে;

গ্লবারের লবণ—	১৯.১
সাধারণ লবণ—	৯.৫
চূণ—	১৪.৩
বালুকা—	৫৭.১
কয়লা—	১.২

ফ্লিণ্ট (Flint) ও অন্যান্য আলোক যন্ত্রাদির জন্য ব্যবহৃত কাচে সীসা মিশ্রিত করিতে হয়। সীসা সংযোগে কাচের ঘনত্ব বর্দ্ধিত হয় ও তজ্জন্য কাচের রশ্মিবিশ্লেষক (Dispersive) ও রশ্মি-রেখার বক্রীকরণ শক্তির (Refractive) সাতিশয় বৃদ্ধি হয়। মেটে সিন্দুর (Red lead) সফেদা, লিথার্জ্জ (Lead Oxide) প্রভৃতি সীসা সংযুক্ত লবণ উক্ত প্রকার কাচে সীসা সংযোগার্থে

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রচণ্ড উত্তাপে বালুকা ও সীসা পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে Silicate of Lead নামক পদার্থের উৎপাদন করে। পূর্ব্বোক্ত pearlash নামক সাজী ক্ষারের সহিত সীমার সংযোগ সুচারু হইয়া থাকে, কিন্তু সোডার সহিত সেরূপ হয় না। বার্থিয়ার (Berthier) নামক রসায়নবেত্তা বিলাতি ক্রিষ্টাল কাচ বিশ্লিষ্ট করিয়া উহাতে নিম্ন লিখিত পদার্থের উপস্থিতি পরীক্ষা করিয়াছেন:—

সিলিসিক এসিড—	৫৯.১৯
সীসভস্ম (Lead oxide)—	২৪.৬৮
পটাস—	১২ ১৩

বোহেমিয়া প্রদেশে আরসির জন্য প্রস্তুত কাচের পাত বা চাদর অতি উৎকৃষ্ট। বোহেমিয়ায় Wallastonite নামক ক্যালসিয়ম ও সিলিকন যুক্ত এক প্রকার খনিজ পদার্থ আকর হইতে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। উহা কাচ নির্ম্মাণে অতি সুন্দর উপযোগী। বোহেমিয়ায় ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া কাচ নির্ম্মাণার্থ উহাই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইয়ুরোপে আরসির কাচ নির্ম্মাণের উপাদান সচরাচর নিম্নলিখিত ভাগে মিশ্রিত হইয়া থাকে।

শ্বেত বালুকা প্রস্তর (Quartz sand)—	৩০০ পউণ্ড
শুষ্ক সোডা কার্ব্বনেট—	১০০„
চুটান (Slaked)—	৪৩„
পুরাতন কাচ খণ্ড (Cullet)—	৩০০ পাউণ্ড

ম্যাঙ্গানিস ইহার সহিত সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত করিলে ভাল হয়।

কাচ প্রস্তুত করিবার উপাদান সমূহের মধ্যে লৌহ বা লৌহসম্ভূত লবণ বিদ্যমান থাকিলে কাচ প্রায়ই ভাল হয় না। কাচ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত অধিকাংশ দ্রব্যেই অল্প বা অধিক পরিমাণে লৌহ বিদ্যমান থাকে। এই জন্য অতি সতর্কতার সহিত লৌহ বিদূরিত করিতে হয়। বোতলাদি প্রস্তুত করিবার কাচে অবিশুদ্ধ দ্রব্যাদি ও লৌহ মিশ্রিত থাকে। তজ্জন্য ইহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাচ। ব্যবহৃত দ্রব্যাদিতে লৌহ থাকিলে কাচের বালুকাও লৌহের সংযোগে লৌহ ও বালুকাযুক্ত Ferrous silicate নামক যৌগিক পদার্থ বিশেষের উদ্ভব হয়। ইহাতে কাচ শুভ্র না হইয়া হরিতাভ বর্ণ পরিগ্রহ করে। উক্ত দোষ নিরাকরণার্থ অম্লকর (Oxidising) কোন পদার্থের আবশ্যক যাহা দ্বারা লৌহ নিম্ন অম্লযুক্ত না হইয়া উচ্চ অম্লযুক্ত হয় অর্থাৎ Ferrus অবস্থা হইতে Ferric অবস্থায় পরিণত হয়। লৌহ Ferric অবস্থায় পরিণত হইলে তন্মিশ্রিত কাচের বর্ণ যৎসামান্য হরিতাভ হয় বটে কিন্তু তাহা সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। ক্যাল্‌সিয়ম যুক্ত কাচে ম্যাঙ্গানিজ পার-অকসাইড (Manganese peroxide), সেঁকো (Arseneous anhydride) বা সোরা (Potassæ or Sodiæ nitrate) অম্লীকরণার্থ ব্যবহৃত হয়। ফ্লিণ্ট বা অন্যান্য সীস যুক্ত কাচে মেটে সিন্দুর (Redlead) প্রায়ই প্রদত্ত হয়, তাহাতে সীসা সংযোগ ও অম্লীকরণ এই উভয় কার্য্যই সংসাধিত হইয়া থাকে। ম্যাঙ্গানিজ পারঅকসাইড মিশাইলে এই হয় যে, উহা দ্বারা কাচের বর্ণ ঈষৎ ভায়লেট হইয়া থাকে। ভায়লেট বর্ণ হরিৎবর্ণের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাত্মক (Complementary); সুতরাং লৌহের উপস্থিতির জন্য হরিৎ ও ম্যাঙ্গনিজের জন্য ভায়লেট এই উভয়বিধ বর্ণের সংমিশ্রণে কাচ শুভ্রমূর্ত্তি ধারণ করে।

কাচ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে উপাদান গুলি বেশ চূর্ণীকৃত করিয়া লইতে হয় ও পুরাতন কাচ খণ্ড উহার সহিত মিশাইতে হয়। ভগ্ন কাচ খণ্ডের নাম Cullet। পুরাতন কাচখণ্ড কাচ প্রস্তুতের এক আবশ্যকীয় উপাদান। তৎপরে প্রচণ্ড অগ্নিশিখায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমুদায় পিণ্ডাকার না হইয়া গলিতে আরম্ভ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখায় ভৃষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম Frilling ইহাদ্বারা জলীয় বাষ্প, কার্ব্বনিক এসিড ও অন্যান্য বাষ্প উদ্গত হইয়া যায়। তাহার পর উক্ত রক্তবর্ণ পিণ্ডাকার গলনোন্মুখ পদার্থ তাপসহনক্ষম বৃহৎ মুচির ন্যায় মৃত্তিকা বিশেষ নির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া উত্তাপ দিতে হয়। কখন কখন অবিরাম ২৬ ঘণ্টা কাল উত্তাপ আবশ্যক হয়। সমুদায় বালুকা এককালীন না মিশাইয়া কিঞ্চিৎ শেষ কালের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে সামান্য বালুকা ছড়াইয়া দিলে তরলীকৃত কাচের মধ্য হইতে বায়ু বা অন্যান্য বাষ্পের বুদ্বুদ থাকিলে তাহা বহির্গত

হইয়া গিয়া কাচ বিশুদ্ধ হয়। যখন বায়ু বা বাষ্পের শেষ বুদ্বুদ উদ্গত হইয়া গিয়া কাচ বেশ সমানভাবে তরল আকার ধারণ করে তখন উত্তাপ ক্রমশঃ কমাইয়া আনিতে হয়। তাহা হইলে ক্রমশঃ আবার ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করিবে। এইরূপে চটচটে (Viscus) হইলেই কাচ কার্য্যোপযোগী হইবে। তখন ফাঁপা লৌহদণ্ড দ্বারা ফুঁ দিয়া, ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করিতে বা চাপ দ্বারা চাদর প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

আমাদের দেশে কাচের কারিকরেরা ভগ্ন কাচ খণ্ড পুনরায় গলাইয়া ফুঁকা শিশি, দোয়াত, ডিপা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এরূপ কাচ যে স্বচ্ছ হইবে না তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উহারা মাটীর উচ্চ কুজাকার চুল্লী প্রস্তুত করে। চুল্লীতে দুইটী থাক থাকে। নিম্নে কাষ্ঠের জাল দিয়া এক লম্বা লৌহদণ্ডের অগ্রভাগে কাচ গলাইয়া থাকে। যখন অর্দ্ধগলিত অবস্থায় বেশ চটচটে হয় তখন পড়িয়া যাইবে না বলিয়া দণ্ডটীকে অনবরত ঘুরাইতে হয়। চুল্লীতলস্থ অপর একটী ছিদ্র দিয়া অন্য এক ব্যক্তি ফাঁপা লৌহদণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা গলিত কাচ পিণ্ড হইতে আবশ্যক মত লইয়া প্রথমে ফুঁ দিয়া ফাঁপায়, তৎপরে হস্ত কৌশলে নাড়িয়া গড়াইয়া বা ছাঁচে ঢালিয়া কঠিন হইবার পূর্ব্বেই ক্ষিপ্রহস্তে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গঠিত করে। প্রস্তুত দ্রব্যটী তখনও উক্ত লৌহদণ্ডে আটকাইয়া থাকে ও উহাকে পৃথক করিবার জন্য উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতেই জোড়ের মুখে কোন শীতল বস্তুর সংস্পর্শ করাইতে হয়, তাহা হইলেই কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া যায়। লৌহ শিক জলে ডুবাইয়া প্রায়ই চারিদিকে বুলাইয়া লওয়া হয়। ঐ প্রকারে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে উহা চুল্লীর দোতালার উপরে রাখা হয়। নিম্নের অগ্নির উত্তাপে উহা অতিশয় উষ্ণ থাকে, সুতরাং পাত্রাদি একেবারে শীতল হইতে পায় না, ক্রমে ক্রমে শীতল হইতে থাকে। চুল্লী নির্ব্বাণের পরও বহুক্ষণ উহা উত্তপ্ত থাকে। ইহাই আমাদের দেশীয় কাচের কারিকরগণের ক্রম-শীতল-কর চুল্লী (Annealing Furnace).

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ, বি, এল।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।

৺রাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

বঙ্গ সমাজে চিন্তা, ভাব ও মত সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। সেই অল্প সংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" উচ্চ স্থান অধিকার করে। যে সময়ে এই গ্রন্থ প্রচারিত হয় তখন সর্ব্বদেশে হিন্দুধর্ম্ম নিকৃষ্ট ও হীনধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। এই গ্রন্থেই সর্ব্ব প্রথমে এই সত্য প্রতিপাদিত হয় যে পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ প্রচারের পর হইতেই এদেশের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। এই গ্রন্থ প্রচারের কয়েক বৎসর পরে থিওসফিষ্ট দলের আবির্ভাব হয়। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা, অধ্যাপক মোক্ষমূলার, তদানীন্তন কালের ভারতের প্রধান সংবাদপত্র "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার" সম্পাদক জেমস্ রুটলেজ সাহেব এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য ও গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় "এডুকেশন গেজেট" সংবাদ পত্রে এই গ্রন্থ সমালোচনা উপলক্ষ লিখিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম্মরূপ তরণী জলমগ্ন হইতেছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাহার কাণ্ডারী হইয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গদর্শনে" এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া বলেন, "রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।" হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি এক্ষণে পৃথিবীর নানাদেশে যে শ্রদ্ধা ভক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, এই বাঙ্গলা গ্রন্থ তাহার অন্যতম কারণ। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয়। এরূপ গৌরবের সামগ্রী বঙ্গের গৃহে গৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র ; ডাকমাশুল ৵০

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু;

৺রাজনারায়ণ বসুর বাটী, বৈদ্যনাথ দেওঘর, এই ঠিকানায় মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

বর্দ্ধমানের আদর্শ কৃষিক্ষেত্র।

বর্দ্ধমান সহরের দক্ষিণপূর্ব্বে পাল্লা নামক গ্রামে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র আছে। এই কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য পরিচালনার্থ যে ব্যয় হয় তাহা বর্দ্ধমান রাজসংসার হইতে প্রদত্ত হয় এবং কার্য্যাদি কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়া বর্দ্ধমানাধিপ উক্ত অঞ্চলের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বাঙ্গালার অন্যান্য ধনী জমীদারগণ বর্দ্ধমান রাজসংসারের এই হিতকর অনুষ্ঠানের অনুকরণ করিলে আমাদিগের দেশের কৃষির উন্নতি সত্বর সাধিত হইতে পারে। যে দেশের লোকের কৃষিই প্রধান উপজীবিকা সে দেশের কৃষির উন্নতিতে দেশের অধিনেতাদিগের বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক। আমাদের দেশের জমীদারগণই প্রকৃত অধিনেতা, সুতরাং এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের দৃষ্টি না থাকিলে দেশ যে দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িবে তাহার আর বিচিত্র কি।

উল্লিখিত কৃষিক্ষেত্রের গত বৎসরের একখানি কার্য্যবিবরণী আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে আমরা অবগত হইলাম যে বঙ্গদেশে ল্যাণ্ড রেকর্ড ও এগ্রিকলচর বিভাগের আসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টর (Asst. Director of Land Records and Agriculture Bengal) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে গতবর্ষে এই কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। ইনি ইংলণ্ডের সিসেষ্টার কৃষিকলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র। সার আসলি ইডেন কৃষিতত্ত্ব শিখাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি দিয়া যে কয়জন ছাত্রকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সকল শিক্ষিত কৃষিবিৎ গণের মধ্যে দুই তিন জন মাত্র দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন; অধিকাংশকেই গবর্ণমেণ্ট কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিয়া অর্থের অপব্যয় করিয়াছেন। যাহা হউক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় দেশের অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের হস্তে কৃষি কার্য্যের উন্নতির ভার প্রদত্ত হইলে যে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা

বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য বিবরণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র খানি বর্দ্ধমানের ইডেন কেনাল নামক খালের উপরই সংস্থাপিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা এই বিশেষ উপকার হইয়াছে যে অনাবৃষ্টি হইলে জলাভাবে ক্ষেত্রের পরীক্ষা কার্য্যে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে না। গত বৎসর এই খাল হইতেই ক্ষেত্রের প্রয়োজন মত জল লইতে হইয়াছিল, তজ্জন্য ৩১৸৴ জলকর প্রদান করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গতবৎসরেও নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয়ের পরীক্ষা হইয়াছিল :—

১। সারের পরীক্ষা।
২। উন্নত প্রণালীর কৃষি যন্ত্রের পরীক্ষা।
৩। কৃষি প্রণালীর পরীক্ষা।
৪। গোময় সংরক্ষণ।
৫। সার ও বীজ বিতরণ।

সারের পরীক্ষা।

ধান, ইক্ষু ও আলুর চাষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সার দেওয়াতে যে ফল হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত রূপে বিবৃত হইয়াছে :—

ধান্যে তিন প্রকার প্রণালীতে সারের পরীক্ষা করা হইয়াছিল। প্রথম গোময়, রেড়ীর খৈল, হাড়ের গুঁড়া ও সোরার সারের পৃথক পৃথক রূপে পরীক্ষা করা হয়। তাহার পর উল্লিখিত কয়েক প্রকার সার জমীতে এরূপ ভাবে প্রয়োগ করা হয় যাহাতে প্রতি তিন বিঘায় ৫০ পাউণ্ড পরিমাণ নাইট্রোজন প্রবেশ করে। আর তৃতীয়তঃ গোময় ও উদ্ভিদ সারের আপেক্ষিক গুণের পরীক্ষা হয়। এই বিভিন্ন পরীক্ষায় নিম্নোক্তরূপ ফল দৃষ্ট হইয়াছিল :—

প্রতি একারে (৩ বিঘা)	ধান		বিচালী	
১০০ মণ গোময় সারে	৩৯৬০	পাউণ্ড	৬১২০	পাঃ
বিনা সারে	১৪১৩	,,	২৬৭৮	,,
৬ মণ রেড়ীর খৈলে	২৮৬৭	,,	৪৬০০	,,
৫০ ,, গোময় সারে	২৮১৩	,,	৪২৬৭	,,
৩ ,, হাড়ের গুঁড়ায়	৩৮০০	,,	৪৬১৩	,,
৬ ,, ঐ	৪০৮০	,,	৫২০০	,,
৩ ,, ঐ ৩০ সের সোরা	৪৬০০	,,	৬০১৩	

উল্লিখিত পরীক্ষায় আর্থিক লাভ বা লোকসান কিরূপ হইয়াছিল তাহা নিম্নস্থ তালিকায় পরিদৃষ্ট হইবে :—

	মূল্য	আবাদের খরচ	ফসলের দাম	লাভ
১০০ মণ গোময় সারের	৫/০	২৯৷৶	১১৬/০	৮১৷৷/
বিনা সারে		২৭৷৷/	৪৪৷৷০	১৪৸৶
৬ মণ রেড়ীর খৈল	১২৲	৩২৷৷/	৮৯৷৴	৪৪৸/
৫০ ,, গোময় সার	২৷৷০	২৭৷৷৶	৮৬৸০	৫৬৷৷/
৩ ,, হাড়ের গুঁড়া	৪৷৷০	২৮৸/	১০৯৷৷/	৭৬৷০
৬ ,, ঐ	৯	২৮৷৷০	১১৮৸০	৮১৷০
৩ ঐ ৩০ সের সোরা	৮৷০	২৮৷/	১৩৭৸/	১০১৷০

ইহাতে দেখা যাইতেছে হাড়ের গুঁড়া ও সোরার মিশ্রণে ফসল অধিক জন্মিয়াছে, সুতরাং লাভও যথেষ্ট হইয়াছে। অথচ এই সারের মূল্য যৎসামান্য বিঘা প্রতি ২৸০ অধিক নয়। ঐ রূপ প্রতি তিন বিঘায় ৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজন সার প্রয়োগেও বিনা সার অপেক্ষা সুফল ফলিয়াছে। উদ্ভিদ সারের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে গোময় সার অপেক্ষা তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। যে জমীতে ধান গাছ রোপণ করিতে হইবে তাহাতে পাট বা শণের বীজ বপণ করিতে হয়। ধান যখন রোপণোপযোগী হইবে সেই সময়ে যে জমীতে পাট বা শোণ বুনিবে সেই জমীতে ঐ গাছ সমেত চাষ দিবে। এমনই ভাবে চাষ দিতে হইবে যে ঐ সমস্ত গাছ জমীর সহিত মিলিয়া যাইবে। তাহার পর যেখানে ধানের বীজ বপণ করা হইয়াছিল সেখান হইতে ধান গাছ উপড়াইয়া ঐ চাষ দেওয়া জমীতে আনিয়া রোপণ* করিতে হইবে। এই আদর্শ ক্ষেত্রে কতক জমীতে পাট গাছ চষিয়া ও কতক জমীতে শণগাছ চষিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। যে জমীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে পাট গাছের সার দেওয়া হইয়াছিল, নূতন শণ গাছের সার দেওয়া জমী অপেক্ষা তাহাতে ভাল ফসল হইয়াছিল বটে, কিন্তু মোটের উপর শণ গাছের সারে ভাল ফল দেখা গিয়াছে। এদেশের কৃষকেরা

* হৈমন্তিক ধান্যই রোপণ করা হয়। কৃষকেরা এই রোপণ কার্য্যকে "রোয়া" বলে যে স্থানে এই ধান্য প্রথমে বপন করা হয় তাহাকে বীজ তলা বলে।

জ্বালানি কাষ্ঠ ক্রয় করিতে অসমর্থ, এই জন্য তাহারা গোময়কে জ্বালানি কাষ্ঠ রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। যত দিন না তাহাদিগের জন্য সুলভ জ্বালানী কাষ্ঠের কোনরূপ বন্দোবস্ত হইবে তত দিন তাহারা জমীতে সম্পূর্ণ রূপে গোময় সার ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহার পর হাড়ের গুঁড়া, খৈল, বা সোরা প্রভৃতিও ব্যয়সাপেক্ষ। এরূপ স্থলে উদ্ভিদসারই এদেশের কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হইতেছে।

আলুর চাষে বিভিন্ন প্রকার সারের যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে আয়ের তুলনায় পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা গত বৎসরে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা গত বৎসরে আলুর বাজার নরম ছিল; কিন্তু ফসলের তুলনায় দেখা গেল যে গত বৎসরের ফল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা কোনরূপ নূ্যন হয় নাই। ইহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কেবল মাত্র রেড়ীর খৈলের সার প্রদানে যেরূপ ফসল হইয়াছে আর কিছুতে সেরূপ হয় নাই; আবার সরিষার খইলের সহিত সোরা মিশাইয়া সার দেওয়াতে যেমন ফসল হইয়াছে, কেবল মাত্র সরিষার খৈল দেওয়াতে সেরূপ হয় নাই। গোময় সারের পরীক্ষায় প্রকাশ যে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে সংরক্ষিত গোময়ে যেমন ফল হইয়াছে, কৃষক দিগের নিজের সারকুড়ার গোময়ে তেমন ফল হয় নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে আদর্শ ক্ষেত্রে যে প্রণালীতে গোময় সংরক্ষিত হইয়াছিল তাহাতে কেবল যে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন ছিল তাহা নহে, কিন্তু সেই নাইট্রোজেন এমন ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল যে উহা জমীতে প্রয়োগ করাতে তাহার প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হইয়াছিল। অতএব এই গোময় সংরক্ষণ বিষয়ে কৃষক দিগকে শিক্ষা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র এপক্ষে কি করিয়াছেন তাঁহাদিগের রিপোর্টে আমরা তাহার কোন পরিচয় পাইলাম না। আলুর চাষে সোরার সার আদৌ উপযোগী নহে, ইহা পরীক্ষাদ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহা ধান, গম, যব, ভূট্টা প্রভৃতি ফসলের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু উদ্ভিদ সার দ্বারা যে সকল আলুর চাষ করা হইয়াছিল তাহার ফল বড় মন্দ হয় নাই। এই চাষে পাট বা শণ গাছের সার না দিয়া ধঞ্চে গাছ ব্যবহৃত হইয়াছিল। জুন মাসের শেষে ধঞ্চে বপন করা হয়, তাহার পর আগষ্ট মাসের শেষে গাছগুলি চারি হাত আন্দাজ বড় হইলে উহাকে চষিয়া দেওয়া হয়। পরে সেই জমীতে আলু বপন করা হইয়াছিল।

কৃষি যন্ত্রের পরীক্ষা।

১৮৯৪।৯৫ সাল হইতে এই আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে দেশী লাঙ্গল ও শিবপুর কালেজের প্রস্তুত লাঙ্গলের পরীক্ষা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষেও সেইরূপ পরীক্ষা হইয়াছিল। শিবপুর কালেজের প্রস্তুত লাঙ্গলের একটী বিশেষ গুণ এই যে, দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা ইহাতে গভীর চাষ হয়, তদ্ব্যতীত ফালের মুখে যে মাটীর চাপগুলি উঠে তাহা আপনি উল্টাইয়া যায়। উভয় লাঙ্গলই দুই শ্রেণীর জমীতে ব্যবহার করা হইয়াছিল। (১) যে জমীতে আদৌ সার দেওয়া হয় নাই (২) যে জমীতে প্রতি বৎসর হাড়ের গুঁড়া ও সোরার সার দেওয়া হয়। দুইপ্রকার জমীতেই পাঁচবার করিয়া লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে নিম্নোক্ত রূপ ফল পাওয়া যায়:—

	প্রতি একারে পাউণ্ড ধান	প্রতি একারে পাউণ্ড বিচালী
দেশী লাঙ্গলে সারবিহীন জমীতে	১০৯৫	২১৫২
ঐ হাড়ের গুঁড়ার সারে	২৮৭১	৪৮৩৫
ঐ সোরা সারে	২৫৩২	৫১০০
শিবপুর লাঙ্গলে সারবিহীন জমীতে	১৪১৩	২৭৯৯
ঐ হাড়ের গুঁড়া সারে	৩১২১	৪২৮৭
ঐ সোরা সারে	২৯০০	৫৯৫০

এ স্থলে ইহা বলা প্রয়োজন হাড়ের গুঁড়ার সার প্রতি বিঘায় এক মণ ও সোরা সার প্রতি বিঘায় ১০ সের করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় ধান চাষের পক্ষে শিবপুর লাঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ সার দেওয়া জমীতে যে গভীর কর্ষণে সুফল লাভ হয় তাহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। দেশের জমীদার ও স্থানীয় বোর্ডের সভ্যগণ এই গভীর কর্ষণের উপযোগিতা বিষয়ে যদি কৃষকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। স্থানীয় বোর্ডে তাঁহাদিগের অধীনস্থ স্থানে দুই এক খানি শিবপুর লাঙ্গল ক্রয় করিয়া কৃষকদিগকে ব্যবহার করিতে দিলে তাহারা ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিবে এবং সুফল দেখিলে ক্রমে সকলে এইরূপ লাঙ্গলে চাষ করিতে অগ্রসর হইবে।

কৃষি প্রণালীর পরীক্ষা।

ধান, পাট, ইক্ষু ও আলু এই চারি প্রকার ফসলে কৃষি প্রণালীর পরীক্ষা হইয়াছিল। প্রথমতঃ ধান্যে ঘন ও পাতলা বীজ বপন এবং ঘন ও পাতলা রোপণের (রোয়ার) পরীক্ষা হয়। কতকগুলি জমীতে বিঘা প্রতি পাঁচ সের ও কতকগুলিতে বিঘা প্রতি দশ সের বীজধান বপন করা হয়। উভয় জমীতেই বিঘা প্রতি ৩৬ মণ গোময় সার দেওয়া হইয়াছিল। যে জমীতে বীজ পাতলাভাবে বপন করা হইয়াছিল তাহাতে প্রতি একারে ৩০৩০ পাউণ্ড ধান ও ৬২৫৪ পাউণ্ড বিচালি উৎপন্ন হইয়াছিল, আর ঘন বপনে ঐরূপ প্রতি একারে ২৯৮৩ পাউণ্ড ধান ও ৬১২৯ পাউণ্ড বিচালী জন্মিয়াছিল।

ঘন ও পাতলা রোপণ সম্বন্ধে এইরূপ পরীক্ষা হয়:—বর্দ্ধমান অঞ্চলে কৃষকেরা সাধারণতঃ যেরূপ রোপণ করে, কতক জমিতে সেইরূপ "রোয়া" হয়, আর কতকগুলি জমীতে আট ইঞ্চ অন্তর "রোয়া" হয়। এই দ্বিবিধ জমীতেই উপরিলিখিত রূপে সার দেওয়া হইয়াছিল। স্থানীয় প্রণালীর রোপণে প্রতি একারে ৩১১৪ পাউণ্ড ধান ও ৬৭২০ পাউণ্ড বিচালী হয়, আর আট ইঞ্চ অন্তর রোপণে প্রতি একারে ৩১৫০ পাউণ্ড ধান ও ৬৯০০ পাউণ্ড বিচালী জন্মিয়াছিল। এই পরীক্ষার ফল সঠিকরূপে নির্ণীত হয় নাই, কেন না বর্দ্ধমান অঞ্চলে সাধারণতঃ নয় ইঞ্চ অন্তর ধান "রোয়া" হয়; অবশ্য কৃষকেরা ঠিক কিছু গজ ধরিয়া রোপণ করে না, সুতরাং এক ইঞ্চের ইতর বিশেষ ঠিক বুঝা যায় না। এই জন্য এ বিষয়ে সাধারণ প্রথার সহিত বিশেষরূপ পার্থক্য রাখিয়া পুনরায় পর বর্ষে পরীক্ষা করা হইবে।

পাটেরও ঘন ও পাতলা বপন পরীক্ষায় পাতলা বপনে সুফল পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি জমীতে প্রতি একারে ॥২॥ সের বীজ ও কতকগুলিতে তাহার অর্দ্ধেক বীজ বপন করা হয়। উভয় জমীতেই ছয় বার লাঙ্গল দেওয়া হয়, দুই বার মই দেওয়া হয় ও একবার নিড়েন দেওয়া হয়। তদ্ব্যতীত উভয় জমীতেই এগার মণ করিয়া হাড়ের গুঁড়ার সার দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফল এরূপ হয়:—

ঘন বুননে প্রতি তিন বিঘায় ১৫৪৫ পাউণ্ড পাট হয়
পাতলা বুননে „ ১৭৪০ „ „

উভয় শ্রেণীর চাষেই সমান ব্যয় হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রতি তিন বিঘায় সারের দাম ১৬৶৩ আবাদের খরচ ৭৷৶৹ মোট ৮৮৷৴ ব্যয় হয়। কিন্তু ঘন বুননে ১৫৪৫ পাউণ্ড পাট ১০৮৶৹ মূল্যে বিক্রয় হয় আর পাতলা বুননে ১৭৪০ পাউণ্ড পাট ১২০৷৹ বিক্রয় হইয়াছিল। মোটের উপর দেখা যাইতেছে পাতলা বুননে ১১৴ বেশী লাভ হইয়াছে।

কোন্ সময়ে পাট গাছ কাটিলে সুবিধা হয় তাহারও পরীক্ষা হইয়াছিল। কতকগুলি জমার পাট গাছ কুঁড়ি ধরিবার আগে কাটা হয়, কতকগুলি কুঁড়ি ধরিলেই কাটা হয়, অন্য কতক গুলি ফুল ফুটিলেই কাটা হয়, কতকগুলি বীজ ধরিলেই কাটা হয়, এবং কতকগুলি বীজ পাকিলে কাটা হয়। কিন্তু ইহার সঠিক ফল নির্ণীত হয় নাই।

কি প্রণালীতে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে ফসলের পরীক্ষা হয় তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম। পল্লীগ্রামে অনেক শিক্ষিত লোকের চাষ বাস আছে, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা আপনাদের জমীতে এইরূপ পরীক্ষা করিতে পারেন এবং কোন বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে এই আদর্শ ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধারকের নিকট অবগত হইতে পারেন।

ইক্ষু সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরীক্ষা হইয়াছিল কিন্তু কতকগুলি ইক্ষুতে উই পোকা ও কতকগুলিতে অন্যবিধ পোকা ধরাতে ইহার ফলাফল নির্দ্ধারিত হয় নাই।

আলুর চাষে দুই প্রকারের পরীক্ষা হইয়াছিল। কতকগুলি আলুর গোটা বীজ বপন করা হয় আর কতকগুলি কাটিয়া বপন করা হয়। প্রথম প্রণালীর পরীক্ষায় প্রতি একারে ১৮০০ পাউণ্ড অখণ্ড বীজ ও ১১৬৭ পাউণ্ড কাটা বীজ বপন করা হইয়াছিল। অখণ্ড বীজ যে জমীতে বপন করা হইয়াছিল তাহাতে প্রতি তিন বিঘায় ১২॥ মণ হিসাবে রেড়ীর খৈলের সার দেওয়া হয়, আর কাটা বীজ যেখানে বপন করা হইয়াছিল তাহাতে প্রতি তিন বিঘায় ৬ মণ ৮ সের করিয়া সোরা সার দেওয়া হইয়াছিল। অখণ্ড বীজে প্রতি তিন বিঘায় ফসল হইয়াছে ১৪৮৮০ পাউণ্ড ও কাটা বীজে হইয়াছে ১৪১৬০। দ্বিতীয় প্রণালীর পরীক্ষাতে প্রতি তিন বিঘায় ১৮০০ পাউণ্ড অখণ্ড বীজ বপন করা হয় ও সেইরূপে

১১৬৪ পাউণ্ড কাটা বীজ বপন করা হয়। প্রথম প্রণালীতে যেরূপ জমীতে সার দেওয়া হইয়াছিল, দ্বিতীয় প্রণালীতেও সেই হিসাবে সার দেওয়া হয়। ইহাতেও অখণ্ড বীজে ফসল হইয়াছে ১৫৭৪৪ এবং কাটা বীজে হইয়াছে ১৩০৪৪ পাউণ্ড। ইহাতে দেখা যাইতেছে দ্বিবিধ প্রণালীর চাষে অখণ্ড বীজেই অধিক ফসল হইয়াছে।

নূতন ফসলের পরীক্ষা।

আলোচ্য বৎসরে ছয় প্রকার ধানের পরীক্ষা হইয়াছিল। বর্দ্ধমান অঞ্চলের বাদসাভোগ ও দাদখানি, বোম্বায়ের সুখাভেল ও কামোদ এবং পঞ্জাবের বাসমতী ও বেগমী ধান ভিন্ন ভিন্ন জমীতে বপন করিয়া কি পরিমাণে ফসল হয় এবং কিরূপ বা লাভ হয় এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের ও বোম্বায়ের ধান জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে "রোয়া" হইয়াছিল, পঞ্জাবের বীজ আসিতে বিলম্ব হওয়াতে উহা অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়, কাজেই তিন সপ্তাহ বিলম্বে উহা রোপণ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু বর্দ্ধমান ও বোম্বাইয়ের ধান পাকিবার অনেক পূর্ব্বে উহা পাকিয়াছিল। এই ধান নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি কাটা হয়, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত উভয় স্থানের ধান্য এক মাস পরে কাটিবার উপযুক্ত হয়। বোম্বাইয়ের বীজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলন হইয়াছিল। প্রতি তিন বিঘায় সুখাভেল ৩১৯৮ পাউণ্ড জন্মিয়াছিল এবং কামোদ ৩২১৩ পাউণ্ড জন্মিয়াছিল। ইহার নিম্নে দাদখানি ও তন্নিম্নে বাদসা ভোগের ফলন হয়। পঞ্জাবের বেগমী প্রতি তিন বিঘায় ১৯৭০ পাউণ্ড ফলিয়াছিল এবং বাসমতী ১৪৭৬ পাউণ্ড জন্মিয়াছিল। পঞ্জাবী বীজ যথাসময়ে বপন ও রোপণ করিলে কিরূপ ফল দাঁড়াইত তাহা বলা যায় না, এজন্য পর বৎসরে উহার পুনঃ পরীক্ষা হইবে।

নয় প্রকার ইক্ষু রোপণ করা হইয়াছিল, কিন্তু পোকা লাগাতে ইহার ফলাফল স্থির হয় নাই। পাঁচ রকম জাতির আলু বপন করা হইয়াছিল। পাটনা, ফরক্কাবাদ, বেথিয়া, কাহালগাঁ ও অম্বালা এই পাঁচ স্থান হইতে পাঁচ প্রকার বীজ আনা হয়। অম্বালার বীজের আকার ঠিক নৈনিতালের মত, উহা প্রতি তিন বিঘায় ১৮০০ পাউণ্ড বপন করা হইয়াছিল, অন্যান্য জাতি আকারে ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতি তিন বিঘায় ৭২০ পাউণ্ড বপন করা হয়। উহার জমীতে রীতিমত ১০ বার লাঙ্গল দেওয়া হয়, ৪ বার মই দেওয়া হয়, এক বার খুঁড়িয়া দেওয়া হয় ও একবার নিড়েন দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত গাছের গোড়ায় দুই বার মাটী দেওয়া হইয়াছিল ১০ বার জল সেচন করা হইয়াছিল। পাটনাই বীজের ফসল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। তিন বিঘাতে ২১,১৫৬ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নীচে অম্বালা বীজ হইতে ২০৪৯৬ পাউণ্ড ফসল হয়, ফরাক্কাবাদী ১৯৬৮০ পাউণ্ড, বেথিয়া ১০১৬৪ পাউণ্ড ও কাহালগাঁ হইতে ৮৮২০ পাউণ্ড ফসল হয়। বলা বাহুল্য সকল জমীতেই প্রতি তিন বিঘায় ১২ মণ ৮ সের হিসাবে রেড়ীর খৈল ও ৬ মণ ৮ সের করিয়া সোরা সার দেওয়া হইয়াছিল। এই সারে প্রতি তিন বিঘায় ১০০ পাউণ্ড করিয়া নাইট্রোজেন পড়িয়াছিল। সমস্ত আলু নবেম্বর মাসে বপন করা হইয়াছিল এবং মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল।

মার্কিণ ও দেশী জাতির অনেক প্রকারের ভুট্টার চাষ হইয়াছিল, কিন্তু শৃগাল ও বন্য শূকরে গাছ নষ্ট করাতে কাঁচা ভুট্টাই বেচিয়া ফেলিতে হইয়া ছিল।

প্রায় ১৫ রকম পাটের বীজ বপন করা হইয়া ছিল। কিন্তু নানা কারণে ইহার ফলাফল স্থির হয় নাই। প্রথম কারণ গাছগুলা বড় হইলে প্রকাশ পাইল যে বীজ ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত মিশ্রিত ছিল, যেহেতু বিভিন্ন জাতির গাছ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে ভিন্ন জাতির গাছগুলিকে তুলিয়া ফেলিতে হয় সুতরাং গাছ এত পাতলা হইয়া পড়ে যে তাহার ফলাফল স্থির করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে পাট উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা পরীক্ষার্থ কলিকাতার পাট ব্যবসায়ীদিগের সভায় পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদিগের রিপোর্ট সমালোচ্য রিপোর্টের সহিত প্রকাশিত না হওয়াতে আমরা সে বিষয়ে কিছুই সাধারণের গোচর করিতে পারিলাম না।

গোময় সংরক্ষণ।

কৃষিক্ষেত্রে যে সকল গরু আছে, তাহাদিগের পরিত্যক্ত গোময় ও মূত্র এবং তাহাদিগের জাবের পরিত্যক্ত অংশ সাবধানে সঞ্চয় করা

হইয়াছিল। এতদুদ্দেশ্যে দুইটী পাকা চৌবাচ্চা প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপরে খড়ের চাল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আলুর চাষে এই সংরক্ষিত গোময়ের সহিত, কৃষকদিগের সংরক্ষিত গোময়ের পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় কৃষিক্ষেত্রের সংরক্ষিত গোময়ে শতকরা ৬৫ ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়, আর কৃষকদিগের বাটীতে সংরক্ষিত গোময়ে শতকরা ৪৬ ভাগ বই নাইট্রোজেন পাওয়া যায় নাই। কৃষিক্ষেত্রের সংরক্ষিত গোময়ে কেবল নাইট্রোজেন অধিক ছিল তাহা নহে, উভয় গোময় হইতে সমান নাইট্রোজেন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলেও কৃষিক্ষেত্রের গোময়ের ফল ভাল হইয়াছিল। আলুর ক্ষেত্রে প্রতি তিন বিঘায় একশত পাউণ্ড নাইট্রোজেন দিবার অভিপ্রায়ে যেখানে কৃষিক্ষেত্রের গোময় ১৯২ মণ দেওয়া হইয়াছিল সেখানে কৃষকের সংরক্ষিত গোময় ২৭২ মণ দেওয়া হয়, তথাপি যে জমীতে কৃষিক্ষেত্রের গোময় সার দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে অধিক ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় অন্য গোময় অপেক্ষা কৃষিক্ষেত্রের গোময়ের নাইট্রোজেন জমী সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ। ইহার একটী কারণ ইহাও হইতে পারে কৃষিক্ষেত্রে গোময়ের সহিত গোমূত্রও সঞ্চিত থাকে কিন্তু কৃষকের গৃহে গোমূত্রের অপচয়ই হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত কৃষকের বাটীতে রৌদ্র বৃষ্টি হইলে গোময়কে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই অবলম্বিত হয় না। এই সমস্ত কারণেই কৃষিক্ষেত্রের গোময় অধিক ফলদায়ক হইয়াছিল। যাঁহারা গোময় সংরক্ষণ করেন এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টির প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রের গোশালাতে রাত্রিকালে যে সমস্ত গোময় ও গোমূত্র পরিত্যক্ত হইত তাহাই সারকুড়াতে সঞ্চয় করা হইয়াছিল। এক বৎসরে প্রত্যেক গরু গড়ে ৬১৭৮ পাউণ্ড গোময় ও ৩১১ পাউণ্ড গোমূত্র পরিত্যাগ করিয়াছিল। বিচালী ঘাস ও খৈল ব্যতীত গরুকে আর কোন আহার দেওয়া হয় নাই।

বীজাদি বিতরণ।

গতবৎসরে প্রায় ৬৫ কাহন রোপণোপযোগী ইক্ষুর বীজ (গাঁট) এই কৃষিক্ষেত্রে হইতে বিতরিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত ২০ মণ নৈনিতাল আলুর বীজ ৬ মণ পাটনাই আলুর বীজ বিতরণ করা হইয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ লাঙ্গল এবং যেরূপ বিচালীর কুটি কাটিবার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাও কতক কতক কৃষক দিগকে প্রদান করা হইয়াছিল।

কৃষিক্ষেত্রের দ্রব্যাদি বিক্রয়ে ও অন্যরূপে ১৭৮৯৷৴১৫ আয় হইয়াছিল আর উহার কার্য্য পরিচালনে ৩৩৮৭ ব্যয় হয়, অর্থাৎ এজন্য বর্দ্ধমান রাজ ভাণ্ডার হইতে ২১৯৭৷৴৫ প্রদান করিতে হইয়াছিল। এজন্য বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহার প্রজাগণের ও সর্ব্ব সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

মোম।

পদ্যপাঠের কবি বালকদিগকে মৌমাছির নিকট পরিশ্রম বিষয়ে উপদেশ লইতে বলিয়াছেন। কিন্তু মৌমাছি কেবল বালকদিগকে পরিশ্রমের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত নহে, কিন্তু তাহার নিজের শ্রমার্জ্জিত ধন মানুষকে প্রদান করিয়া তাহার উদরান্নের সংস্থান করিয়া দেয়। মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করিয়া মৌচাকে তাহা কেমন সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সাধারণতঃ নগরে বা গ্রামে মৌমাছির চাক কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা গ্রামে বা নগরে প্রায় কোন পুরাতন জনমানবের সমাগমশূন্য বাড়ীতে দুই এক খানা চাক বাঁধিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এরূপ অবস্থায় মৌমাছি আবার মানুষের উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিবে কিরূপে? আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই পরিচয় দিব।

লোকালয়ে মৌচাক কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু গভীর অরণ্যে মৌমাছিরা কিরূপ প্রকাণ্ড ও বহুসংখ্যক চাক বাঁধিয়া থাকে তাহা যাঁহারা বন বিভাগের কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন। আমরা যে এত মোম বাতি, মোমের পুতুল, মোম জামা প্রভৃতি দেখিতে পাই তাহা কোথা হইতে হয়? মৌমাছিরা অরণ্য মধ্যে যে সকল চাক বাঁধে, জঙ্গলী লোকে তাহা ভাঙ্গিয়া গলাইয়া মোম করিয়া বিক্রয় করে; তাহা হইতেই এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, নতুবা লোকালয়ের চাক হইতে ঐ সকল প্রস্তুত হওয়া সম্ভবে না।

সুন্দর বন, আসাম, নেপাল, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলে মৌমাছিরা লক্ষ লক্ষ চাক বাঁধে এবং সেই সকল চাক যখন পূর্ণায়তন হয় জঙ্গলীরা তাহা ভাঙ্গিয়া লোকালয়ে লইয়া আইসে এবং তথায় উহা বিক্রয় করে। ঐ সকল অঞ্চলে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা ঐ সকল চাক গলাইয়া মোম বাহির করে, এবং তাহা নগরে বিক্রয় করে।

চাক হইতে প্রথম যে মোম বাহির হয় তাহা বড়ই অপরিষ্কৃত; তদ্ব্যতীত আবার অসাধু ব্যবসায়ীরা উহাতে নানা প্রকার তৈলাক্ত সামগ্রী ও ময়লা মাটী মিশ্রিত করিয়া থাকে। এই জন্য ঐ সকল মোম শোধন করিতে হয়, তাহা না করিলে উহার দ্বারা কোন সামগ্রীই ভালরূপ প্রস্তুত হয় না।

জঙ্গলী লোকের নিকট হইতে যাহারা চাক ক্রয় করিয়া গালাই করে, তাহারা এ কার্য্য মোটামুটী-রূপে করিয়া থাকে। তাহারা প্রথমে মাটীর খুলি (যেরূপ খুলিতে ময়রারা ভিয়ান করে) উনানে চড়াইয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে জল ঢালিয়া দেয় এবং ঐ জলের উপর চাক ছাড়িয়া দেয়। অবশ্য চাক গালাই করিবার পূর্ব্বে উহা বেশ করিয়া পরিষ্কার করিতে হয় অর্থাৎ চাকে যে সকল ময়লা থাকে তাহা ফেলিয়া দিতে হয়। উনানে অগ্নির উত্তাপে চাক ক্রমে গলিয়া যায় এবং উহার যে অংশ খাটী মোম তাহা তরল ভাবে জলের উপর ভাসিতে থাকে। যখন চাক গলিয়া ঠিক তৈলের মত দেখাইতে থাকে তখন উহা আস্তে আস্তে গামলায়, বাঁশের চোঙায় বা অন্যবিধ ছাঁচে ঢালিয়া ফেলে এবং শীতল হইলে উহাতে মোম জমিয়া যায়। তাহার পর ঐ মোমপূর্ণ ছাঁচ পুষ্করিণী বা চৌবাচ্চার জলে ফেলিলে মোমগুলি ছাঁচ হইতে খসিয়া পড়ে। এই সকল মোমের বর্ণ সাধরণতঃ হলদে রকমের হয়, তবে কোন কোন স্থানের মোম ঈষৎ শাদাও দেখা যায়। কোন কোন স্থানে জলের সহিত মোম না গালাইয়া সরিষার তৈলের সহিত উহা গলান হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ তেলা মোম ভাল দরে বিকায় না, কারণ উহা "রিফাইন" করিতে বড় কষ্ট হয়। মোমের ব্যাপারীদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, চাক হইতে প্রথমে যে মোম বাহির হয়, তাহার বর্ণ যে রূপ ফুলের মধু হইতে মোম জন্মায়, তাহার বর্ণানু-রূপ হইয়া থাকে। এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। তবে দেখিয়াছি শ্রীহট্ট অঞ্চলের মোমের রং সাধারণতঃ কমলালেবুর বর্ণের মত হইয়া থাকে। কিন্তু মৌমাছিরা কেবল এক ফুলের মধু ত আর সংগ্রহ করে না, সুতরাং তাহাদিগের এ কথার সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

গ্রাম হইতে গামলা চোঙা ধামা ইত্যাদি ছাঁচের আকারে যে মোম সহরে আমদানী হয়, মোমের কারখানাওয়ালা গণ তাহা পুনরায় গালাই করে, এবং উহার ময়লা মাটী পরিষ্কার করিয়া টালি ইটের আকারে বাঁধিয়া থাকে। ইহাকে থান বাঁধা বলে। এতদ্ব্যতীত কারখানাওয়ালারা ঐ মোমকে "রিফাইন" করে। এই "রিফাইন" মোম সাধারণতঃ ইংলণ্ডের জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর জরদ মোম যাহা গ্রাম হইতে আমদানীর পর এক বার মাত্র গালাই করিয়া "থান" বাঁধা হয়, তাহা সিঙ্গাপুর ও চীন প্রভৃতি দেশে চালান হয়। এইরূপ মোম কলিকাতা সহরে প্রায় মাসে হাজার মণ করিয়া আমদানী হইয়া থাকে।

"রিফাইন" মোমের কাজ বড় অল্পই হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে বিলাতের খরিদ-দারেরা যেরূপ পরিষ্কার "রিফাইন" মোম চাহেন এখানকার কারিকরেরা সেইরূপ তৈয়ার করিবার চেষ্টা করে না, এই জন্য মার্কিণ ও চীন হইতে যে সকল "রিফাইন" মোম ইংলণ্ডে যায়, তাহা খরিদ-দারেরা আদর করিয়া লইয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, শিক্ষিত লোকেরা এই "রিফাইন" মোমের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে এই ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

কি প্রকারে "রিফাইন" মোম প্রস্তুত করিতে হয় আমরা তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। যে প্রণালীতে চাক হইতে মোম বাহির করিতে হয় তাহাও কতকটা সেই প্রণালীতে করা হইয়া থাকে। থান, চোঙ্গা বা যে কোন আকারের মোম "রিফাইন" করিতে হইবে, গালাইবার পূর্ব্বে তাহা কাটারী দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে হয়। তাহার পর উনানের উপর খোলা চড়াইয়া, তাহাতে দুই চারি লোটা জল দিয়া ঐ টুকরা মোম ঢালিয়া দিতে হয়। যখন মোম গলিয়া তেলের মত হইবে তখন উহা জল পূর্ণ চৌবাচ্চায় আস্তে আস্তে ঢালিতে হইবে,

এবং সেই সময়ে এক ব্যক্তি সেই জল ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে। ঐরূপ করিলে গলা মোম টুকরা টুকরা আকারে জলের উপর ভাসিতে থাকিবে। এই টুকরা মোমকে "ফুল" বলে। সমুদায় মোম গলাইয়া এইরূপ "ফুল" তৈয়ার হইলে উহা ঝুড়ি করিয়া কোন খোলা স্থানে রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। এমন স্থানে উহা শুকাইতে হইবে যেখানে ধূলা প্রভৃতি পড়িবার অল্প সম্ভাবনা থাকে। তদ্ব্যতীত যে স্থানে উহা শুকান হইবে তাহা সান বাঁধান হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ ছাদের উপরই উহা শুকান হইয়া থাকে। রৌদ্রে যত শুকাইতে থাকে তত উহা দিন দিন শাদা হইতে থাকে। সপ্তাহ কি এক পক্ষ কাল এইরূপ রৌদ্রে শুকাইতে হয়। পরে উহা পূর্ব্বকথিত রূপে আবার গালাই করিয়া "ফুল" করিতে হয় ও পুনরায় রৌদ্রে শুকাইতে হয়। এই প্রথাকে মোম ধোয়া বলে। সচরাচর "ফুল" দুই "ধোয়ার" পর শুকাইয়া পুনরায় গালাই করিয়া ছাঁচে ঢালা হয়। ছাঁচে মোম জমিয়া গেলে, ছাঁচ গুলি চৌবাচ্চার জলে ফেলিয়া দিতে হয়; অল্প ক্ষণ পরেই মোমগুলি ছাঁচ হইতে খুলিয়া যায়। ঐ সময়ে কারিকরেরা মোমের থানের উপর আপন আপন কারখানার ছাপ মারে। "রিফাইন" মোমের থানগুলি ঠিক লম্বা টালি ইটের মত দেখায়। রৌদ্রে মোম শুকাইবার সময় বড় সাবধান হইতে হয়। উহা ঠিক ধান শুকাইবার মত শুকাইতে হয়, কিন্তু পা দিয়া নাড়িয়া দিলে মোম চটকাইয়া যায় ও ভালরূপ শুকায় না। এই জন্য উহা কাটী করিয়া নাড়িয়া দিলে ভাল হয়। কিন্তু কারিকরেরা তাহা করেনা বলিয়া মোম অনেক সময়ে দুধের মত শাদা হয় না, প্রায়ই গঙ্গাজলী রংএর হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, গালাইবার সময়েও সাবধান হইতে হয়। একটু কাঁচা থাকিলে বা একটু খর জ্বাল হইলে "রিফাইনের" রং ভাল হয় না। মোম গলিয়া ঠিক সরিষার তৈলের মত হইলেই খোলা নামান উচিত এবং সেই সময়ে উহার উত্তাপ কত ডিগ্রি তাহা স্থির করিয়া তদনুসারে গালাই করিলে অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে, সকল মোম সমান উত্তাপে গলে না; সুতরাং ভূয়োদর্শন দ্বারা সে গুলি স্থির করিতে হয়। কেহ কেহ মনে করেন মোমে ভেঁজাল চলে, উহা সম্পূর্ণ ভুল। বিলাতের খরিদদারেরা উহা বিশ্লেষণ পরীক্ষা (analyse) করিয়া লন, সুতরাং ভেঁজাল দিলেই উহা কম দরে বিকায়।

মোমে বাতি, মোমজামা ও পুতুল ব্যতীত আরও অনেক জিনিস প্রস্তুত হয়। পালিসে উহা ব্যবহৃত হয় এবং টোটা (Cartridge) ছুড়িবার বন্দুকের Wads বা চাকী তৈয়ার হয়। এই জন্য গবর্ণমেণ্টের Small Arms and Ammunition ফ্যাক্‌টরীতে উহা যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করা হয় ও য়ুরোপের নানাদেশে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব উপদ্বীপে উহার দ্বারা কাপড়ে পালিস লাগান হয়। পূর্ব্ব উপদ্বীপের বৌদ্ধ ধর্ম্ম মন্দিরে ও রোমান কাথলিক দিগের গির্জ্জায় যথেষ্ট পরিমাণে মোম বাতি ব্যবহার হয়। হিন্দুদিগের ন্যায় ধর্ম্মালয়ে উহারাও চর্ব্বির বাতি আদৌ ব্যবহার করেন না। গবর্ণমেণ্টের মেডিকেল ষ্টোরে মলম তৈয়ার করিবার জন্য প্রচুর মোম খরিদ হইয়া থাকে।

মোম গালাই করিলে খোলার তলায় যে গাদ পড়ে তাহাকে "সুজ" বলে। এই "সুজে" এক প্রকার কাল রংয়ের মোম তৈয়ার হয়, তাহাতে কাঁশারীরা ও স্বর্ণকারেরা ঘটী, বাটী ও গহনা প্রভৃতির ছাঁচ প্রস্তুত করে। ইহাতে দেখা যাইতেছে মোমের কিছুই নষ্ট হয় না।

আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই মোমের কারবার করিবার জন্য লোকে বড় বড় ফুলের বাগান করে এবং যাহাতে তথায় মধু সঞ্চয় করিয়া মৌমাছিরা চাক বাঁধিতে পারে, এরূপ আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকে। এইজন্য ঐ সকল স্থানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা মোমের ব্যবসায় যথেষ্ট উন্নতি লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে যেরূপ প্রখর রৌদ্রের সুবিধা তাহাতে চেষ্টা করিলে এখানে "রিফাইন" মোম যেমন ভাল হয় সেরূপ অন্যত্র হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু কারিকর দিগের অযত্নে এখানকার সে ব্যবসা নষ্ট হইতেছে। শিক্ষিত লোকে ইহাতে মনোযোগী হইলে এই ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে। ইহাতে অধিক মূল ধনেরও প্রয়োজন নাই। পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার টাকা মূল ধনে খুব ফালাও কারবার চলিতে পারে।

আমাদিগের দেশের লোকের সঞ্চয়াভ্যাস বড় কম। পল্লীগ্রামে লোকের বাড়ীতে বা বাগানে

যে সকল মৌচাক হয়, প্রায়ই তাহা ভাঙ্গিয়া প্রয়োজন মত মধুটুকু লইয়া চাকটী ফেলিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময়ে সতর্কতার অভাবে চাক ভাঙ্গাও হয় না। মাছিরা আপনারাই চাক ভাঙ্গিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পল্লীগ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোকে যদি এইরূপ চাক সংগ্রহ করিয়া এবং তাহা পূর্ব্ব কথিত রূপে গালাইয়া মোম তৈয়ার করেন, তাহা হইলে ঘরে বসিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন। চাকের খাঁটী মোম সহরে প্রায় ৪৫৲।৫৲ টাকা করিয়া মণ দরে বিক্রয় হয় এবং সহরের কারখানাওয়ালারা উহা একবার মাত্র গালাই করিয়া প্রায় উহা ৫৫৲ হইতে ৬০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিয়া থাকে। জরদা মোম যে দরে বিক্রয় হয় "রিফাইন" তাহা অপেক্ষা তিন চারি টাকা অধিক দরে বিক্রয় হয়। অতএব দেখা যাইতেছে কেহ যদি চেষ্টা করিয়া মাসে পাঁচ সের মোম তৈয়ার করিতে পারেন, তিনি অন্ততঃ পাঁচ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। মোম ব্যতীত মধুও যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। মধুর গুণানুসারে উহা আট আনা হইতে দুই টাকা সের দামে বিক্রয় হয়।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

কমলা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১]　　　　[১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।

নানা প্রসঙ্গ।

বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত কে, বি, ওয়াগলে বাঙ্গালাতেই কাচের কারখানা স্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বরাখর বা গিবিধিতে এই কারখানা স্থাপিত হইবে। আমরা আশা করি ওয়াগলে মহাশয় তাঁহার উদ্যমে সফলকাম হইবেন।

* * *

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বঙ্গীয় গবর্নমেণ্ট একটি খনি-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার মনন করিয়াছেন। সমাচার সত্য হইলে সুখের বিষয়। বাঙ্গালায় কয়লা ও অন্যবিধ খনির কাজ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, ঈদৃশ অবস্থায় একটি খনি-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলে গবর্ণমেণ্ট দেশের একটি প্রকৃত উপকার সাধন করিবেন।

* * *

মধ্যপ্রদেশে "রুসা" নামে এক প্রকার ঘাস জন্মে। তথায় এই ঘাস চোলাই করিয়া এক প্রকার তৈল বাহির করা হইতেছে। উক্ত অঞ্চলে ও বোম্বাইয়ে এই তৈলের যথেষ্ট কাটতি হইতেছে। নিমার, হোসঙ্গাবাদ, শিওনি প্রভৃতি জেলাতেই এই তৈলের আড়ং। অল্পদিন মধ্যেই মধ্যপ্রদেশে ইহা একটি প্রধান ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইবে। এই তৈল বেশ উচ্চদরে বিক্রয় হইতেছে।

* * *

উড়িষ্যার গড়জাত মহলের আঙ্গুল নামক স্থানে একটি কৃষি শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল। এরূপ প্রদর্শনী তদঞ্চলে এই প্রথম হইল। করদ মহলের অনেকানেক ভূপতি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রদর্শকদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কমিসনর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় এই উপলক্ষে স্থানীয় অধিবাসীদিগকে ঈদৃশ প্রদর্শনীর উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। যাহাতে প্রতি বৎসরে এইরূপ প্রদর্শনী হয় উড়িষ্যাবাসীগণ যেন তাহার জন্য চেষ্টা করেন। বাঙ্গালীর প্রত্যেক জেলাতেই প্রদর্শনী হওয়া আবশ্যক।

* * *

অনেকগুলি কৃষিবিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, এজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন; শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। বিলাতের সিসেষ্টার কৃষি কলেজে যে সকল ছাত্র শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিত্যগোপাল বাবু, শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এই চারিজন দেশের কৃষির উন্নতি কল্পে কতকটা কাজ করিতেছেন। অন্যান্য সকলেই বিষয়ান্তরে নিযুক্ত আছেন।

* * *

সাহারানপুরের কোম্পানির বাগানে মিসর দেশের তুলা চাষের পরীক্ষা হইয়াছিল। পরীক্ষা সন্তোষজনক হইয়াছে। এই তুলার বীজ কায়রো নগরের নিকটস্থ ব্যারেজ নামক স্থানের সরকারী বাগান হইতে আনীত হইয়াছিল। তুলার কোয়া বেশ বড় বড় ও পুরন্ত এবং উহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। তুলার আঁশও বেশ লম্বা ও চিক্কণ। প্রতি বিঘায় কি পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য এবৎসরও ঐ তুলার চাষ হইতেছে। মিসর দেশের বীজে এদেশে তুলার আবাদ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা প্রথমে ইহার আবাদে অগ্রসর হইবেন তাঁহারাই লাভবান্ হইবেন। এবিষয়ে মান্দ্রাজ প্রদেশে যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে।

* * *

ভারত গবর্মেণ্টের সকল বিভাগের কার্য্যের পরামর্শ দিবার জন্য বড় লাটের কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় একজন করিয়া মন্ত্রী আছেন, কিন্তু কৃষি বাণিজ্য বিষয়ে পরামর্শ দিবার কোন মন্ত্রী নাই। যাহাতে এইরূপ একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন, লর্ড কর্জ্জন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আগামী বর্ষে এই বাণিজ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন। আমরা জানিনা এই পদ কাহাকে দেওয়া হইবে। যাঁহার বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি আছে এরূপ লোককে এই পদে নিযুক্ত করা আবশ্যক। কেবল তাহাই নহে, যে লোকের ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি আছে এরূপ

বৈদেশিক দিগের বাণিজ্যের উন্নতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে তাঁহার নিয়োগে দেশের কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না।

* * *

আড়োয়ারে কিছুদিন হইল "কৃষ্ণ মিল" নামে যৌথে একটি কাপড়ের কল সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার মূলধন ৬,০৮,৫০০ টাকা; ইহা ৫০০ টাকা করিয়া ১২১৭ অংশে বিভক্ত। এই কারবারের গত বর্ষের কার্য্য বিবরণে দেখিলাম কলটি বেশ লাভজনক হইয়াছে। ইহা কয়েক বৎসর হইতেই অংশীদারদিগকে ভালরূপ লাভাংশ প্রদান করিতেছে। গত বৎসরে ইহার প্রায় লক্ষাধিক টাকা লাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে অংশীদারদিগকে প্রতি অংশে ৫৫ টাকা হিসাবে ৬৬৯৩৫ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। আর কল সকলের লোকশানি খাতে ১৬,২১৯ টাকা খরচ লিখিত হইয়াছে। বক্রী ১৬,৮৪৬ টাকা গচ্ছিত খাতে জমা রাখা হইয়াছে। এই কোম্পানিটি সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত। মাড়োয়ারী দিগের এইরূপ উন্নতি দেখিয়া কি বাঙ্গালীদিগের চক্ষু ফুটিবে না?

* * *

মধ্যপ্রদেশে কৃষক ও কারিকর দিগকে উৎসাহ প্রদানের বেশ একটি সুব্যবস্থা আছে। যাহারা কৃষি বা শিল্প কার্য্যে কোন প্রকার উন্নতি প্রদর্শন করিতে পারে, তাহাদিগকে সরকার হইতে সনন্দ প্রদান করা হয়। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বাঙ্গালায় কি জন্ম এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন নাই বুঝিতে পারি না। হালিম সেখ বা পরাণ ঘোষ সরকারের একটা "লিখন" পাইলে আপনাকে মহা সম্মানিত মনে করিয়া থাকে, এরূপ সম্মান লাভে সে যে আপনার ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে অধিক যত্নবান হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। আমরা মধ্য প্রদেশের এই ব্যবস্থা বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তন করিতে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে অনুরোধ করি।

* * *

আমরা শুনিলাম কাশিমবাজারের মহারাজের জমীদারী মণ্ডল ঘাটে চীনা বাসন প্রস্তুত করিবার উপযোগী মৃত্তিকা বাহির হইয়াছে। যাহাতে তথায় একটী চীনা বাসনের কারখানা হয় মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নাকি তজ্জন্য উদ্যোগ করিতেছেন। বিদেশ হইতে এদেশে কি পরিমাণ চীনা বাসন আমদানী হইয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বে তাহা আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। যাহাতে বাঙ্গালায় চীনা বাসন প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হয়, শিল্প শিক্ষা সমিতিও সে বিষয়ে গবর্মেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন। বাস্তবিক এদেশে যত কুম্ভকারের বাস, ভারতের কুত্রাপি তেমন নাই। প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ লোক মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। এই সকল কুম্ভকারের জন্ম যদি এই নূতন ব্যবসায় পথ খুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশের একটি বিশেষ উপকার সাধিত হয়। মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী তাঁহার এই উদ্যোগে কৃতকার্য্য হইলে সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

সামগ্রী। ভারতের সকল স্থানেই প্রায় যথেষ্ট সুপারি জন্মিয়া থাকে, তথাপি বিদেশ হইতে আমাদিগকে সুপারি আমদানি করিতে হয়। গতবৎসরে বিদেশ হইতে প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার মণ সুপারি বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছিল; ইহার মূল্য ২৪,১৩,০০০ টাকা। এই টাকাটা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। তবে এদেশ হইতেও কতক পরিমাণ সুপারি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। তাহার পরিমাণ ১ লক্ষ ৫০ হাজার মণ। তাহা হইলেও দুই লক্ষ ৩০ হাজার মণ বিদেশ হইতে আসিয়াছে। এই পরিমাণ সুপারি এদেশে উৎপন্ন করিতে পারিলে কতকটা ধনক্ষয় হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। দেশী সুপারির যেরূপ আদর, জাহাজীর সেরূপ নহে। অতএব এই সুপারির আবাদ বৃদ্ধি করিতে পারিলে লাভেরই সম্ভাবনা।

* * *

আমেরিকার সেণ্ট লুই সহরে যে মহাপ্রদর্শনী হইবার কথা ছিল তাহা গত ৩০এ এপ্রেল তারিখে খুলিয়াছে। প্রদর্শনীটী যুক্ত রাজ্যের রাজধানী ওয়াসিংটন সহরের সহিত তাড়িত যোগে এমনি করিয়া যুক্ত করা হইয়াছে যে সেণ্টলুই হইতে সঙ্কেত করিবামাত্র প্রেসিডেণ্ট রুসবিণ্ট সপারিষদ মন্ত্রণাগৃহ হইতে একটী বোতাম ঘুরাইবামাত্র প্রদর্শনী ক্ষেত্রে কল সকল চলিতে লাগিল, ভিন্ন ভিন্ন গৃহচূড়ে ধ্বজা উড়িল ও প্রস্রবণ ছুটিল, আর সেই সঙ্গে প্রদর্শনীর অধ্যক্ষেরা জয়ধ্বনি করিলেন। এই প্রদর্শনীটী প্রায় ৩৭০০ বিঘা জমীর উপর সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে একটী ঘড়ি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার ব্যাস ১০০ ফিট। ১৮ বিঘা জমীর উপর একটি গোলাপের বাগান করা হইয়াছে, তাহাতে ৫০,০০০ গোলাপ গাছ আছে। একটি প্রস্রবণ আছে তাহা হইতে প্রতি মিনিটে ৯০ হাজার গ্যালন জল পড়িবে। এত বড় কৃত্রিম প্রস্রবণ পৃথিবীতে পূর্ব্বে কখন কেহ নির্ম্মাণ করে নাই। এখানে মল্লক্রীড়া দেখিবার জন্ম একটি রঙ্গস্থল আছে তথায় ২৫ হাজার দর্শক ক্রীড়া দেখিতে পারিবে। আগামি ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকিবে।

* * *

সেণ্টলুইর প্রদর্শনীতে একটি আশ্চর্য্যরূপ কারুকার্য্যের পরদা (Tapestry) প্রদর্শিত হইতেছে। এই পরদাটী দীর্ঘে ২৫ ফুট, প্রস্থে ১২ ফুট; ইহা প্রস্তুত করিতে ১৬ বৎসর লাগিয়াছে। ইহা হস্ত নির্ম্মিত এবং কতকাংশে য়ুরোপে ও কতক আমেরিকায় প্রস্তুত হয়। এই পরদার উপরে সূচিকার্য্যে যুক্তরাজ্যের সমস্ত ইতিহাস চিত্রে লিখিত হইয়াছে। সমস্ত প্রতিকৃতি রেসমে তোলা হইয়াছে। কলম্বসের মার্কিণে অবতরণ ও নেপোলিয়ানের যুক্তরাজ্যকে লুসিয়ানা প্রদেশ প্রত্যর্পণ অতি সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পরদার মূল্য ২০,০০০ পাউণ্ড বা তিন লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ত্রিবাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে অন্যান্য প্রদেশেও এবিষয়ে কতক পরিমাণে চেষ্টা হইতেছে। পুণা নগরের সরকারী কৃষি-বিভাগ ইহার পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। বাঙ্গালায় কলা বাগানের অপ্রতুল নাই, কিন্তু গাছগুলি সর্ব্বত্রই গোজাতির উদরস্থাৎ হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের কোন উদ্যমশীল ধনী কি এই নূতন শিল্পে অর্থনিয়োগ করিয়া দেশে একটি নূতন ব্যবসায়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে পারেন না? ইহাতে ধর্ম্ম ও অর্থ দুই বর্গ লাভেরই সম্ভাবনা আছে। কলা গাছের আঁশ বাহির করিবার জন্য ত্রিবাঙ্কুর শিল্প বিদ্যালয় হইতে একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা শুনিলাম এই যন্ত্রের বেশ কাটতি হইতেছে। দক্ষিণ ভারত ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের লোক উহা ক্রয় করিতেছেন। আমরা এই যন্ত্র সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

* * *

ইণ্ডিয়ান টেকনিকাল আর্ট সিরিজ (Indian Technical Art Series) নামে একখানি পুস্তিকা কলিকাতার সর্ব্বে জেনেরেল আপিস হইতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। দিল্লী দরবারের সংসৃষ্ট যে শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে যে সমস্ত শিল্প সামগ্রী প্রদর্শিত হয় তাহার কতকগুলির প্রতিকৃতি এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমারা দেখিলাম মান্দ্রাজ ব্রহ্মদেশ বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের প্রদর্শিত অনেক শিল্প দ্রব্যের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশের কোন শিল্পেরই চিত্র দেখিতে পাইলাম না। তবে উড়িষ্যাকে যদি বাঙ্গালা বলিয়া গণনা করা যায়, তাহা হইলে তথা হইতে প্রেরিত একটি হস্তীদন্তের কারুকার্য্যের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম বটে। খাস বাঙ্গালা হইতে কি কোন শিল্প সামগ্রী এই প্রদর্শনীতে প্রেরিত হয় নাই? এদেশের শিল্প বিদ্যালয় সমূহের ব্যবহারার্থ এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা দেশীয় শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারা এই পুস্তকে অনেক শিক্ষণীয় সামগ্রী দেখিতে পাইবেন।

* * *

গবর্ণমেণ্ট নাকি দশ টাকা মূল্যের পর্যন্ত কোম্পানির কাগজ বাহির করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। উদ্দেশ্য দেশের লোককে সঞ্চয়াভ্যাস শিক্ষা দেওয়া। ডাকঘরে সেবিংস ব্যাঙ্ক সংস্থাপন দ্বারাও এ উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইতেছে। পল্লীগ্রামের লোকেরা ডাকঘরের মারফতে এইরূপ কোম্পানির কাগজ কিনিতে পারিবেন, সে জন্য কোন প্রকার কমিসন দিতে হইবে না। আর একটা প্রলোভন এই যে যাহারা এইরূপ অল্প টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিবেন তাঁহাদিগকে উহার সুদের উপর ইনকম্ টাক্স দিতে হইবে না। পল্লী গ্রামের লোক অল্প টাকা হাওলাত দিয়া যথেষ্ট সুদ পাইয়া থাকে, আর সে সকল টাকা গ্রামের লোককেই দেওয়া হয়, সুতরাং তাহা মারা যাইবার বড় একটা ভয় থাকে না। এরূপ অবস্থায় লোকে শতকরা [illegible] টাকা [illegible] কোম্পানির কাগজে টাকা [illegible]

কতদূর অগ্রসর হইবে তাহা বলা যায় না। ডাকঘরে সেবিংস ব্যাঙ্ক খোলার ব্যবস্থা হওয়াতে অনেক লোক টাকা জমা রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই টাকার মোট দেখাইয়া লর্ড কর্জন ভারতের সমৃদ্ধি প্রতিপন্ন করিতেছেন। কোম্পানির কাগজের জালটাও কি সেই উদ্দেশ্যে পাতা হইতেছে?

* * *

মান্দ্রাজবাসিগণ কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি মান্দ্রাজের রাণীপেট নগরে তথাকার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। আবার কৃষ্ণা ও চিঙ্গলপট জেলার স্থানীয় সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনের সংসৃষ্ট আর একটী উল্লিখিতরূপ প্রদর্শনী হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম এই প্রদর্শনীতে তথাকার রাজপুরুষেরা বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক সৎপরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। এই রাজপুরুষদিগের বিশেষ উদ্যোগেই প্রদর্শনীর কার্য্য সর্ব্বপ্রকারে সন্তোষজনক হইয়াছিল। মান্দ্রাজের প্রায় প্রতি জেলাতেই এক একটি কৃষি সভা সংস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি স্থানীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল সভার সভ্যগণ কৃষকদিগকে তাহাদিগের কার্য্যের উন্নতি সাধন জন্য সহায়তা করিবেন এবং প্রত্যেক জেলাতে মধ্যে মধ্যে এক একটি প্রদর্শনী করিয়া কৃষকদিগকে উৎসাহিত করা হইবে। যাহারা উন্নতি প্রদর্শন করিবে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। মান্দ্রাজের এই দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার অনুকরণীয়। আমাদিগের দেশের অনেক জেলাতেই এক একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক সভা আছে; এই সকল সভা যদি মান্দ্রাজবাসীদের ন্যায় স্থানীয় কৃষি ও শিল্পাদির প্রতি একটু মনোযোগী হন, তাহা হইলে দেশের অনেকটা কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহারা রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে অনেক সহায়তা লাভ করিতে পারিবেন। যিনি এজন্য উদ্যোগী হইবেন তিনি সাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

* * *

বোম্বাইয়ের আহম্মদ নগরে একটি সুন্দর শিল্প বিদ্যালয় আছে। ইহা তথাকার একটি মিসন স্কুলের অন্তর্গত। মিসন স্কুলে সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা হয়; এই শিল্প বিদ্যালয়ে নানা প্রকার হস্তশিল্পে শিক্ষা প্রদত্ত হয়। বিভাগটী সার দীনশা মাণিকজী পিটিট নিজ ব্যয়ে সংস্থাপন করিয়াছেন। গবর্মেণ্ট ইহাতে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। প্রায় ৩৫০ জন বালক এই বিভাগে সূত্রধরের কার্য্য, গালিচা বয়ন, বাসন প্রস্তুত ও কাঠের উপর নানাপ্রকার খোদাই কার্য্য শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে ১৯ জন শিক্ষক আছেন, ইঁহারা ছাত্রদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। এখানকার প্রস্তুত অনেক সামগ্রী দিল্লী দরবারের শিল্প প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রতিকৃতি বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের অনুকরণে বোম্বাই প্রদেশের অনেক সাধারণ বিদ্যালয়ে শিল্পাদি শিক্ষার [illegible] করা হইয়াছে। যে সকল

বিদ্যালয় এইরূপ শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, বোম্বাই গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে সাহায্য দান করিয়া থাকেন। সাধারণ শিক্ষার কোনরূপ ক্ষতি সাধন না করিয়া শিল্প শিক্ষার সহায়তা করা গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

* * *

এবার বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এ বৎসরও সেই সঙ্গে একটি প্রদর্শনী হইবে। প্রদর্শনীতে কৃষি ও শিল্প সামগ্রীর যথেষ্ট সমাবেশ থাকিবে। এতদুদ্দেশে কয়েকজন কৃতকর্ম্মা লোক লইয়া একটি কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হইয়াছে। এই কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কৃষিবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহারা কৃষকদিগকে দেখাইবার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে নানাবিধ কৃষিযন্ত্র ও শস্যের বীজাদি আনয়ন করিবেন। উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। এ সম্বন্ধে আমাদিগের একটু বক্তব্য আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি এদেশে কি কৃষি বা শিল্প সামগ্রীর প্রদর্শনী, কোথাও কৃষক বা কারিকরগণ প্রায়ই প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, তাহার কারণ প্রবেশিক মূল্য। অনেক স্থলে এই মূল্য এত উচ্চ হারে গৃহীত হয় যে সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ তথায় যাইতে পারে না। সুতরাং কৃষক বা শিল্পীরা এই সকল প্রদর্শনী হইতে কোন উপকার লাভ করিতে পারে না। জাতীয় মহাসমিতির অধ্যক্ষেরা যদি কৃষক ও কারিকরদিগের মঙ্গলার্থ এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারা যাহাতে তথায় অবাধে প্রবেশ লাভ করিতে পারে তাহার যেন ব্যবস্থা করেন।

* * *

ভারতই আমের জন্মস্থান। এদেশ হইতেই অন্যান্য দেশে আম গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, এখানকার মাটী অপেক্ষা বিদেশের কোন কোন স্থানের মাটীতে আমের আবাদ ভাল হইতেছে। ১২৬ বৎসর পূর্ব্বে জামেকা দ্বীপে কেহ আমের নাম জানিত না। ১৭৮২ সালে একখানি ফরাসী জাহাজ মরীচদ্বীপ হইতে হায়টীতে (Hayati) যাইতেছিল। হায়টী তখন ফরাসী অধিকারে ছিল। এই জাহাজে এদেশীয় অনেক শস্যের বীজ ছিল। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল বীজ হায়টীতে বপন করিবার জন্য পাঠাইতেছিলেন, সেই সঙ্গে কতকগুলি আমের চারাও ছিল। ইংরাজদিগের একখানি রণতরী ফরাসীদিগের এই জাহাজ খানি আটক করেন এবং উহাকে জামেকায় লইয়া যান এবং ঐ আম গাছগুলি তথাকার গর্ডন টাউন নামক স্থানে রোপণ করেন। এখানকার মাটীতে এই আমগাছগুলি বিলক্ষণ রূপ পরিপুষ্ট হয়; ক্রমে ক্রমে জামেকার সর্ব্বত্রই এই গাছ জন্মিতেছে। এমন কি খরাতে ও ঠাণ্ডাতে অথবা ফাঁকা বা আওতায় ইহা সমানরূপে বৃদ্ধি পায়; গাছের চারিদিকে জঙ্গল জন্মিলেও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। এই সকল গাছ হইতে কলম করাতে এখন সেখানে অনেক রকম জাতের আম হইয়াছে এবং ভারতের ন্যায় সেই সকল আম ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জামেকায় এত আম জন্মে যে লোকে টক বা পাকে আম ছোঁয় না। এদেশের মত আমের সময় নিম্ন শ্রেণীর লোকে কেবল আম খাইয়াই থাকে। এক এক জন লোক প্রত্যহ তিন চারি কুড়ি করিয়া আম খায়। গরু ও ঘোড়াকেও আম খাইতে দেওয়া হয়। বিলাতের বাজারের অধিকাংশ আম জামেকা হইতে আমদানী হয়। তথায় একটা আম ছয় পেনী হইতে এক শিলিং দরে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশের ল্যাংড়া ফজলী বিলাতে পাঠাইতে পারিলে লাভ হইবার খুব সম্ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গে আমের আবাদেরও উন্নতির প্রয়োজন।

* * *

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। গত বৎসরের জন্য এই কোম্পানী অংশীদারদিগকে শতকরা ১৸৵৹ হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্ব বৎসরেও ঐরূপ হারে লভ্যাংশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই লভ্যাংশ যারপর নাই কম বলিতে হইবে, ইহা প্রায় কোম্পানির কাগজের সুদের অর্দ্ধেক; এজন্য অনেকেই এই কোম্পানির কার্য্যের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। এই কোম্পানি সংস্থাপিত হইবার সময় হইতে আমরা ইহার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছি এবং কি জন্য লোককে যারপর নাই লাভের আশা দিয়া তাঁহারা সে আশা পূর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই সে বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে ইহা অদ্যাবধি লাভজনক কারবারে পরিণত না হইবার কয়েকটি কারণ নির্ণয় করিয়াছি; আমরা তাহা সংক্ষেপে সাধারণকে বিদিত করিতেছি।

* * *

প্রথমে এই রেলওয়েটি দশ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া নির্ম্মাণ করিবার কথা হইয়াছিল ও তদনুসারে উহা রেজিষ্টারী করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ৮,৪৮,৮২১ টাকা বই সংগৃহীত হয় নাই। যদি এই টাকাতেই কোম্পানি উহা নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও যে অংশীদারদিগকে শীঘ্র লাভ দিতে পারিতেন তাহা আমাদের মনে হয় না। কেননা এই অল্প টাকায় রেলওয়ের সমুদায় সরঞ্জাম সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা রেলের প্রথম অবস্থা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে কোম্পানিকে এঞ্জিনের জন্য কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুইখানি কি চারিখানি এঞ্জিনে একটা রেলওয়ে চালান কি সম্ভব? এঞ্জিনের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে তত অধিক পরিমাণ মালামাল বহনে সমর্থ হওয়া যাইবে, তাহা করিতে না পারিলে লাভ হইবে কিরূপে? কিন্তু কোম্পানি উল্লিখিত মূলধন দ্বারা নির্ম্মাণ কার্য্য এবং সরঞ্জামাদি ক্রয় করিতে সমর্থ হন নাই। একার্য্যে তাঁহাদিগের ১০,১৮,৯১১ টাকা ব্যয় হয়, অর্থাৎ মূল ধনাপেক্ষা ১,৭০,০০০ টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে। এই টাকা তাঁহাদিগকে ঋণ করিতে হইয়াছে ও তাহার সুদ দিতে হইয়াছে। তাহা ত কোম্পানির লাভ হইতে দিতে হইয়াছে, অতএব অংশীদারদিগকে লাভ দিবেন কোথা হইতে? এক্ষণ এঞ্জিনাদি খরিদ করিয়া যত মালামাল বহন করিতে পারিতেছেন, তত লাভ হইতেছে, এবং এখনও যে ৮৫,০০০ টাকা ঋণ রহিয়াছে তাহা যখন শোধ হইয়া যাইবে, তখন নিশ্চয়ই ও

লাভ প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। অংশীদারদিগের ইহাও মনে রাখা উচিত যে প্রথমে মগরা পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মহাজনদিগের সুবিধা না হওয়াতে লাইন ত্রিবেণী ঘাট পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইয়াছে; তাহাতেও অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে ও কোম্পানিকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এই সকল কারণে আমাদিগের মনে হয় যে অল্প মূলধন লইয়া কার্য্যারম্ভ করাই কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অন্যায় হইয়াছিল। কোম্পানি যদি ২০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া বসিতেন তাহা হইলে ইহাকে লাভজনক করিতে এত কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু তাঁহারা তাহা সাহস করিয়া করিতে পারেন নাই। যাহা হউক এক্ষণে যে ইহা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে ইহাই সুখের বিষয়। কোম্পানি যদি লাইনকে হস্তান্তর করিতে বাধ্য হইতেন তাহা হইলে যৌথ কারবারের ভবিষ্যৎ বড়ই অমঙ্গলজনক হইত। আমরা ইহার আরও উন্নতি কামনা করি।

* * *

কেহ কেহ হাবড়া-আমতা, আমতা-শেয়াখালা প্রভৃতি লাইনের সহিত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল লাইনের তুলনা করিয়া ইহার ত্রুটি দেখাইয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ তুলনা করেন তাঁহাদিগকে ঐ সকল লাইন কিরূপ সুবিধায় নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। উল্লিখিত কোম্পানি সকল জেলার রাজপথের উপর দিয়া লাইন লইয়া গিয়াছেন, সেজন্য স্বতন্ত্র জমী ক্রয় করিতে হয় নাই; সেপক্ষে তাঁহাদের লাইনের দূরত্বের তুলনায় যথেষ্ট মূলধন লইয়াও বসিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত যতদিন কোম্পানি লাভজনক না হইবে ততদিন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অংশীদারদিগকে টাকার সুদ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; ইহাতে অংশীদারদিগের অপেক্ষা করিবার কোন কারণই না থাকিবার কথা। আমাদিগের দেশের এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা স্বদেশীয়গণের পরিচালিত কার্য্যের ত্রুটি দেখাইবার জন্য সর্ব্বদাই চক্ষু বিস্তারিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিয়া কার্য্য করিতে হয় তাহা একেবারেই দেখেন না। ইহাতে কি জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে? এ বিষয়ে যতদিন না আমরা পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করিতে শিখিব ততদিন শ্রেয় লাভের আশা নাই।

ভারতের খনিজ ধন।

ভারতজননী রত্ন প্রসবিনী। সৃষ্টির আদিকাল হইতে তিনি জগৎবাসীকে নিজ কুক্ষি হইতে রত্ন বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, এপর্য্যন্ত তাহা শেষ হইল না। ভাগ্যদোষে বা কর্ম্মদোষে এক্ষণে তাঁহার সন্তানগণ মাতৃধনের অধিকার হইতে বঞ্চিত, কিন্তু কে বলিতে পারে, সাধনার বলে পুনরায় তাহারা সেই নিজস্ব অধিকার পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইবে না? যাঁহারা মনে করেন ভারতের রত্নভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে, খনিগর্ভে আর মণি মিলে না। যাঁহাদিগের এইরূপ ধারণা, তাঁহাদিগের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য এ সম্বন্ধে ভারত গবর্মেণ্টের বাণিজ্যাদির হিসাব সংরক্ষক মহাশয় (Director General of Statistics) ভারতের খনিজ সম্পত্তির গত (১৮৯৩ হইতে ১৯০২ সাল) দশ বৎসরের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। এই বিবরণ পাঠ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন ভারত-ভাণ্ডার শূন্য হয় নাই। বদ্ধপরিকর হইয়া রত্নোদ্ধারে যত্নবান্ হইলে সকলেই ফল লাভ করিতে পারেন।

লবণ।

সমগ্র ভারতবর্ষে বৎসরে গড়ে প্রায় দশলক্ষ টন* লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯০২ সালে ১০,৯৯,৩৯১ টন উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯০০ সালে সম্বর হ্রদে অতি সামান্যমাত্র লবণ উঠিয়াছিল, কিন্তু পর বৎসরে ইহার কাজ বেশ তেজে চলিয়াছিল, আবার ১৯০২ সালে কিয়ৎ পরিমাণে মন্দা পড়ে। এইরূপ কোন বৎসর কম কোন বৎসর বেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লবণই সমুদ্র জাত। উহা সিন্ধুদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ব্রহ্ম ও এডেনের সমুদ্রোপকূলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এদেশে লিভারপুল, মিডল্‌সবরো, হাম্বর্গ প্রভৃতি দেশ হইতে প্রচুর লবণ আমদানী হইয়া থাকে। ইহাতে দেশের কত টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশেই কত লবণের ভাঁটী ছিল। যদি বোম্বাই মান্দ্রাজে লবণ তৈয়ার হইতে পারে তবে বাঙ্গালায় বা তাহা প্রস্তুত করিতে কেন পারা না যাইবে? অনেক বাঙ্গালী মহাজন এক এক জাহাজ লবণ ক্রয় করিয়া থাকেন। চেষ্টা করিলে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ভাঁটী সংস্থাপন করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা দেশের একটি নষ্ট ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার করিয়া শত শত লোকের জীবিকা অর্জ্জনের পথ উন্মুক্ত করিতে পারেন।

পাথুরে কয়লা।

এই ব্যবসায় প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইজন্য সরকারী হিসাব সংরক্ষক মহাশয় বলিয়াছেন যে, ইহার একটা বাৎসরিক গড়পড়তার দ্বারা

ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। ১৮৯৫ সালে ৩,৫৪০,০০০ টন হইতে ১৯০২ সালে ৭,৪২৪,৫০০টনে পরিণত হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে প্রচুর কয়লার খনি বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু সকল স্থানের কয়লা একরূপ নহে। স্থানভেদে কয়লার গুণের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আপাততঃ বঙ্গদেশের রাণীগঞ্জ, ঝেরিয়া ও গিরিধিতে, নিজাম রাজ্যের সিঙ্গারেণীতে; উত্তর আসামের লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত মাকুম এবং মধ্য প্রদেশে মোহপানী, বারোয়া, ও উমারিয়াতে প্রধান প্রধান কয়লার খনি দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে সমস্ত রেলওয়েতে, উপকূল ও অন্তর্বাণিজ্যে নিযুক্ত ষ্টীমার সমূহে এবং এতদ্ব্যতীত সরকারী ও বেসকারী কল কারখানায় দেশী পাথুরে কয়লাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বৎসরে প্রায় ২৬৭০০০ টন ইংলণ্ড ও জাপান হইতে আমদানী হইয়া থাকে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে ভারতীয় কয়লার ব্যবসাকে ফালাও করিবার এখনও যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র কয়লা চালান করিবার এখনও সুব্যবস্থা হয় নাই। এ সম্বন্ধে যত টুকু হইতেছে সেই পরিমাণে ব্যবসায়েরও প্রসার হইতেছে। বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের কল কারখানাতে বিলাতী ও জাপানী কয়লা ব্যবহৃত হয়। রাণীগঞ্জ বা বারোয়ার কয়লা বোম্বায়ে পৌঁছিতে যে দরে পড়তা হয়, উল্লিখিত বিদেশী কয়লা তদপেক্ষা সুলভে পড়তা হইয়া থাকে। ভারতীয় রেলের ভাড়া অপেক্ষা জাহাজের ভাড়া সুলভ বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকে। যত দিন রেলের কর্তৃপক্ষীয়েরা কয়লার ভাড়া হ্রাসের ব্যবস্থা না করিবেন, তত দিন ভারতের উপকূলবর্ত্তী স্থানে দেশী কয়লা বিক্রয়ের সুবিধা হইবে না। এই কয়লার কারবারে যে সকল টাকা খাটিতেছে তাহা সমস্তই প্রায় বিদেশীয়দিগের। এক্ষণে কোন কোন দেশীয় ধনী এই ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু গবর্মেণ্টের নূতন খনি আইনে তাঁহাদিগের উন্নতির প্রতিবন্ধক ঘটাইতেছে। যাহাতে খনি প্রভৃতির কার্য্যে এ দেশীয় মূলধন নিয়োগে বিঘ্ন উপস্থিত না হয় কর্তৃ-

সুবর্ণ।

সুবর্ণ খনির সংখ্যা বড়ই অল্প। তথাপি ভারত মাতা যে সুবর্ণহীনা নহেন ইহাতেই আমাদিগের আনন্দ। অধিকাংশ সোণা মহিসুর রাজ্যের কোলার প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথায় বৎসরে প্রায় পাঁচ লক্ষ আউন্স সোণা উঠিয়া থাকে। নিজাম রাজ্যেও সুবর্ণ খনি আছে, কিন্তু তথায় অতি অল্পই সোণা উঠিয়া থাকে। ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত নাম মাত্র খনির কার্য্য হইত, এক্ষণে উহার কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বোম্বাই প্রদেশের ধারবার জেলায় ও মধ্যনী রাজ্যের সুবর্ণ খনির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। উল্লিখিত খনি সমূহ হইতে এতাবৎ ৫১৭,৬৩৯ আউন্স সোণা উঠিয়াছে। প্রতি আউন্সের ৬০ টাকা করিয়া মূল্য ধরিলে ইহার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা হইবে। ভারতের অনেক স্থানের, বিশেষতঃ উত্তর ভারতের অনেক নদী কূলস্থ বালুকা হইতে সুবর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেক স্থানের জঙ্গলী লোকে ঐ বালু ধুইয়া সোণা বাহির করে। এই প্রথায় কি পরিমাণে সোণা উৎপন্ন হয় তাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। তবে এরূপ সোণা বাহির করিয়া যে ব্যবসায় চলে না তাহা স্থির হইয়াছে। উল্লিখিত খনিজ সুবর্ণ সমস্তই লণ্ডনে চালান হইয়াছে।

খনিজ তৈল।

"যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে" কথাটা অণুমাত্র অতি রঞ্জিত নহে। ভারত ভূগর্ভে যে তৈল পর্য্যন্ত নিহিত আছে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা কেহ জানিত কি না সন্দেহ। প্রথমে ব্রহ্ম দেশে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে মার্কিণের কেরোসিন তৈলের মত তৈল বাহির হয়, তাহার পর অতি অল্প কাল হইল আসাম প্রদেশেও তৈলের আকর বাহির হইয়াছে। ১৯০২ সালে ব্রহ্মদেশ ও আসামের খনি হইতে ৫৭০ লক্ষ গ্যালন পাওয়া গিয়াছে। উত্তরোত্তর এই তৈল অধিক পরিমাণে উঠিতেছে, কিন্তু মার্কিণ ও রুষের তৈলের ন্যায় উহা পরিষ্কার নহে বলিয়া এ দেশে উহা অধিক বিক্রয় হয় না। উল্লিখিত দেশদ্বয় হইতে প্রায় ৮১০ লক্ষ গ্যালন এ দেশে আমদানী হয়। ১৯০২তে শুধু ব্রহ্মদেশ

আর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ২০,৭০৪,৩৮৯ গ্যালন চালান গিয়াছে। আসাম জাত তৈল সম্বন্ধে সরকারী হিসাবে কোন উল্লেখ দেখিলাম না। মার্কিণ ও রুষদেশে যে প্রণালীতে তৈল পরিষ্কৃত হয়, এ দেশে তাহা অবলম্বন করিলে, বিদেশী তৈলের আমদানী হ্রাস হইতে পারে। কেহ মার্কিণ হইতে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিলে এই খনিজ তৈলের ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

সোরা।

সোরা প্রধানতঃ বিহার প্রদেশেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই কারবারের যথেষ্ট সমৃদ্ধি ছিল। এদেশ হইতে ভূরি পরিমাণে সোরা য়ুরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হইত। এখন আর বারুদের জন্য সোরা ব্যবহার হয় না, এই কারণেই ইহার কাটতি কমিয়া গিয়াছে। সোরার ব্যবসা এদেশী লোকের দ্বারাই বিশেষরূপ পরিচালিত। সরকারী হিসাব সংরক্ষক মহাশয় বলেন যে কি পরিমাণ সোরা উৎপন্ন হয় তাহা সঠিক বলিতে পারা যায় না। বিহার অঞ্চল হইতে তিনি যতদূর অবগত হইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে বাৎসরিক ২৭২,৬০০ হন্দর* পরিমাণ সোরা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা সমস্তই কলিকাতাতে চালান হয় এবং তথায় উহা রিফাইন করিয়া রপ্তানি করা হয়। কলিকাতার পরমিটের হিসাবে প্রকাশ যে গত পাঁচ বৎসরে এখান হইতে বৎসরে গড়ে ৩৬৯,৪৪৪ হন্দর "রিফাইন" সোরা রপ্তানি হইয়াছে। তাহা হইলে খনি হইতে উহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণ অধিক সোরা যে উৎপন্ন হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক ইহাতে এই ব্যবসায়ের অবস্থাটা কতক পরিমাণে বুঝা যাইবে।

লৌহ।

যদিও ভারতের ভূগর্ভে প্রভূত পরিমাণে লৌহ আছে বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু এতাবৎ এই খনি উদ্ধারের বিশেষরূপ চেষ্টা হয় নাই। কেবলমাত্র বাঙ্গালার রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়েকটি খনির কার্য্য অল্পদিন হইতে চলিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে লৌহ উত্তোলনের আয়োজন হইল, কিন্তু কি জানি কেন সে কোম্পানি কার্য্য পরিচালনে সমর্থ হন নাই। তাহার পর অনেক দিন এ বিষয়ে আর কোন উদ্যোগ হয় নাই। সম্প্রতি আবার এইজন্য কতকগুলি ইংরাজ উদ্যোগী হইয়াছেন। রাণীগঞ্জের লোহার খনি সকল প্রায়ই তথাকার কয়লার খনির সন্নিকটে, ইহা একটী বিশেষ সুবিধা। ভারতের অন্যান্য স্থানে যে দুই একটী লোহার খনি আছে, তাহাদের ওরূপ সুবিধা নাই। ১৯০২ সালে সমগ্র ভারতে ৮০,৮৬৯ টন লোহা উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে একা রাণীগঞ্জ অঞ্চল হইতে ৭৬,০৫৬ টন উঠিয়াছিল। এদেশে পেটা লোহা ও ইস্পাত যেরূপ ব্যবহার হয় তাহাতে খনিজ লৌহকে পেটা লোহা ও ইস্পাতে পরিণত করিতে না পারিলে লাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে কার্য্যের জন্য প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন। অনেক স্থানে লোহা গালাইবার উপযোগী কাষ্ঠ বা কয়লা নিকটে পাওয়া যায় না, ইহা ব্যবসায়ের উন্নতির একটী বিশেষ অন্তরায়। পশ্চিম ভারতে এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। মধ্যভারতেও কতকগুলি বহুমূল্য খনিতে এ বিষয়ের পরীক্ষা হইতেছে। এখনও ভারতের নানা স্থানে বহু লৌহ খনি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। ভারতবাসী উদ্যোগী হইলে ভূগর্ভনিহিত ধন আয়ত্ত করিতে পারেন। এজন্য খনিতত্ব শিক্ষাও প্রয়োজন। দুই একজন ভারতবাসী সে শিক্ষালাভও করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহাদিগকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে বিদেশীর সেবা করিতে হইতেছে। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রুদ্র ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপের খনির কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বাঙ্গালা উদ্যোগী হইলে ইহাঁকে লইয়া দুই একটা খনি উদ্ধার করিতে পারিতেন। "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ" এই নীতিই আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

কৃষ্ণ সীস।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে তিনটি কৃষ্ণ সীসের খনি আছে। ১৯০২ সালে তথায় ৪,৫৭৫ টন কৃষ্ণ সীস উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল খনি গর্ভে কি পরিমাণ ধাতু নিহিত আছে তৎসম্বন্ধে কোন তত্ত্ব সংগৃহীত হয়

হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। কৃষ্ণসীস দুই প্রকার আছে। এক রকমকে রাসায়নিকেরা Graphite বলেন, আর এক রকম Plumbago নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের খনি হইতে Graphite বাহির হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের খনি হইতে উল্লিখিত বৎসরে ৯ হন্দর Plumbago পাওয়া গিয়াছে।

বিবিধ ধাতু।

বাণিজ্যোপযোগী পরিমাণে আর কোন ধাতু বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে অভ্র, টিন, ও ম্যাঙ্গানীজ (Manganese) এই তিনটি ধাতু উল্লেখযোগ্য। মাঙ্গানীজ ধাতুটি পূর্ব্বে এ দেশের লোক বোধ হয় জানিত না, কেন না ইহার কোন দেশীয় নাম নাই। কয়েক বৎসর হইতে ইহা এ দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার বর্ণ ধূসর শ্বেত এবং দেখিতে কতকটা ঢালা লোহার মত। ইহা বড় ভঙ্গপ্রবণ। এই ধাতু সম্বন্ধে পৃথিবীতে ভারতের স্থান দ্বিতীয় বা তৃতীয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার সমস্তই ইংলণ্ডে চালান হইয়াছে। এখানে যে ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হইতেছে তাহা এরূপ উচ্চ শ্রেণীর যে ২৫০ ক্রোশ পথ রেলের ভাড়া দিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বাজারে বেশী লাভে বিক্রয় হয়। আপাততঃ মধ্য ভারতেই এই ধাতু পাওয়া গিয়াছে। খরচায় পোষাইবে না বলিয়া নিম্নশ্রেণীর মাঙ্গনীজ তুলিবার বড় যত্ন করা হয় না।

অভ্রের কাজ এদেশে অনেক দিন হইতেই আছে। কিন্তু গত ২০ বৎসর হইতে ইহার ব্যবসায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মার্কিন দেশে ইহা প্রভূত পরিমাণে প্রেরিত হয়। বঙ্গ দেশের গয়া, হাজারিবাগ, গিরিধি ইত্যাদি অঞ্চলে অনেক খনি আছে। নেপালেও অভ্র পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালার অভ্রের মত তাহার "জল" ভাল নহে। সম্প্রতি মান্দ্রাজেও অভ্রের খনি বাহির হইয়াছে। ১৯০২ সালে ১০২১ টন অভ্র রপ্তানি হইয়াছিল, ইহার মূল্য প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা।

ব্রহ্মদেশেই টিনের খনি আছে। চীনারাই ইহা হইতে টিন উত্তোলন করিয়া থাকে। এখানে তাহা এদেশেই ব্যবহৃত হয়। বিদেশে চালান হইবার মত এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই।

সরকারী রিপোর্টে সকল ধাতুরই উল্লেখ দেখা গেল, কিন্তু রৌপ্যের কোন উল্লেখ নাই। এদেশে কি তবে রূপার খনি নাই? তাহা সম্ভব নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে যে দেশে রজত মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং ঔষধাদিতে রজত ব্যবহার হইত, সে দেশে রূপার খনি নাই ইহা বলিতে পারা যায় না। হইতে পারে বর্ত্তমানকালে উহা আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে যে এরূপ খনি বাহির হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এজন্য একটী কোম্পানি হইয়াছিল। কোন্ কোন্ স্থানে ভূগর্ভে যে রূপ আছে এই কোম্পানি পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তবে এক্ষণে রূপা যেরূপ সুলভ, তাহাতে উহা উত্তোলন করিতে যে ব্যয় হয় বোধ হয় তদনুরূপ লাভের আশা না থাকাতেই উহা উত্তোলনের চেষ্টায় তাঁহারা নিরস্ত হইয়া থাকিবেন।

যাহা হউক উপরে খনি সমূহের অবস্থা যেরূপ বিবৃত হইল তাঁহাতে এক প্রকার বুঝা যাইতেছে যে খনির কার্য্য অলাভজনক নহে—প্রত্যুত বিদেশীয়েরা এ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যথেষ্ট অর্থ এদেশ হইতে লইয়া যাইতেছেন। এরূপ অবস্থায় এদেশীয় মূল ধন যাহাতে এই কার্য্যে নিয়োজিত হয় তাহার চেষ্টা করা অর্থশালী দেশহিতৈষীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। জাতীয় ধনবৃদ্ধির পথ যতই উন্মুক্ত হইবে ততই দেশের দারিদ্র্য ও অন্নকষ্ট দূর হইবে।



মহানুভব জেমসেদজী এন্ টাটা

মহানুভব টাটা।

আমরা মহানুভব জামসেদজী নসিরবানজী টাটার পবিত্র নাম লইয়া কমলার কার্য্য আরম্ভ করি এবং ইহার প্রথম সংখ্যাতেই কমলার বরপুত্র এই মহাত্মার জীবন কাহিনী আমরা কথঞ্চিৎ বিবৃত করি। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এত অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার বিয়োগে আমাদিগকে অশ্রুপাত করিতে হইবে। সংসারে যাঁহারা ধর্ম্ম সংস্কার, সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, আমরা সাধারণতঃ তাঁহাদিগকেই দেশহিতৈষী মহাত্মা বলিয়া সম্মান প্রদান করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা সংসারের নিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে দেশের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন সচরাচর তাঁহাদিগের প্রতি সে ভাবে সম্মান প্রদর্শন করি না। তাঁহাদিগকে আমরা সাধারণ লোকের মধ্যে গণনা করিয়া থাকি। কিন্তু এই সকল লোকই প্রকৃত সমাজহিতৈষী। তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রতিদিনের কার্য্যে সমাজের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কর্ম্মময় জীবন হইতে সমাজ যে উপকার লাভ করে সমাজ সংস্কারক বা রাজনৈতিক সংস্কারকের শত বক্তৃতায় তাহা লাভ করিতে পারে না। আমরা বলিতেছি না সমাজ সংস্কারক বা রাজনৈতিক সংস্কারক দিগের প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু কর্ম্মী অজ্ঞাতসারে যে উপকার সাধন করেন তাহাতে তিনি উল্লিখিত সংস্কারকগণ হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন।

জামসেদজী নসিরবানজী টাটা একজন কর্ম্মবীর দেশ হিতৈষী ছিলেন। যখন তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠার্থ ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিতে অগ্রসর হন নাই, অথবা যখন তিনি ভারতীয় শিক্ষিত যুবকদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছানুরূপ বিদ্যা বা ব্যবসায় শিক্ষার্থ নিজব্যয়ে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন নাই, সুতরাং জনসাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত হন নাই, তখনও তিনি তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যদ্বারা পরোক্ষ ভাবে দেশের কল্যাণ সাধন করিতে ছিলেন, তাঁহার জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা

টাটার বংশাবলীর কথা অথবা তাঁহার বাল্য জীবনের কাহিনী আমরা বিস্তারিত রূপে বিবৃত করিব না। সে সকল কথা কমলার প্রথম সংখ্যাতে এক প্রকার বিবৃত হইয়াছে। তবে তিনি যে পারসীক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন একথাটী বলা আমরা আবশ্যক মনে করি। কেন না টাটার উদারতা ও বদান্যতা ব্রাহ্মণোচিত ছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন কোন কোন ব্রাহ্মণেরা বংশানুক্রমে যাজন কার্য্য করিয়া থাকেন, টাটার পূর্ব্বপুরুষগণও সেইরূপ বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই জন্যই বলিতেছি যে টাটা পারসীক দিগের ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল মাত্র অগ্নি দেবতার অর্চনায় যাজন কার্য্যে জীবন যাপন করা তদীয় পিতা নসির-বানজী রতনজী টাটা সমীচীন বিবেচনা করেন নাই। তিনি তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম অন্য পথে নিয়োগ করিতে মনন করিয়া পৈতৃক বাসস্থান নওসরাই হইতে বোম্বাই নগরে গমন করেন এবং তথায় গিয়া প্রথমে সামান্য রকমের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং জামসেদজী টাটাকে পৌরোহিত্য করিবার জন্য আর শিক্ষা লাভ করিতে হয় নাই। বৃদ্ধ টাটা অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থলাভ করিতে লাগিলেন; এমন কি তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী এরূপ সুপ্রসন্ন হইয়াছিল যে, তিনি বোম্বাইয়ে প্রথম আসিয়া যে অগ্নি মন্দিরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তথায় যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, অনেক নবাগত পারসীক তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান হইবার আশায় সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিত।

ব্যবসায় আরম্ভ।

জামসেদজী টাটা ১৮৫২ সালে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে স্বগ্রাম নওসরাই হইতে বোম্বাইয়ে আসিয়া লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসর পরে তিনি এলফিনষ্টোন কলেজে প্রবেশ করেন এবং তথায় চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। কলেজে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া টাটা মহাশয় তাঁহার পিতার সহিত ব্যবসায় পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই বুদ্ধিকে আমরা তাঁহার চরিত্রের প্রভাব দেখিতে পাই। সে সময়ে যাঁহারা কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যয়ন শেষ করিতেন, তাঁহারা এখনকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধিধারীগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না, বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে আমাদিগের দেশের লোকে যদি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহেন ত উকীল হন, অন্যথা ডেপুটী বা মুন্সেফ সদর আলা হইবার চেষ্টা করেন। টাটা মহাশয় যে সময়ে কলেজ হইতে বাহির হইয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার মত শিক্ষিত লোককে গবর্ণমেণ্ট আদর করিয়া উচ্চপদ দিতেন, কিন্তু সে চেষ্টা একেবারেই করেন নাই, রাজপদের সম্মান তাঁহাকে অণুমাত্র প্রলোভিত করিতে পারে নাই। যে বৃত্তি অবলম্বনে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয় তিনি সেই বাণিজ্য বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তাঁহার পিতা বাণিজ্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন বলিয়াই তিনি তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা তাহা অস্বীকার করিনা, কিন্তু আমরা আমাদিগের এই বাঙ্গালাদেশে অনেক সম্ভ্রান্ত ধনীর সন্তানকে রাজপদের সম্মান লাভের জন্য লালায়িত দেখিয়াছি, এমন কি যাঁহাদিগের জমীদারীর কর্ম্মচারীরা ৪।৫ শত টাকা বেতন পাইয়া থাকে এরূপ সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানকেও ৪।৫ শত টাকা বেতনের রাজপদ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু বাণিজ্যে সহস্র বিপদের—সহস্র প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও টাটা রাজপদ লাভের সহজোপায় থাকিতেও বাণিজ্যে নিযুক্ত হইলেন।

টাটার চীন দেশের সহিত কারবার ছিল। জামসেদজী বাণিজ্যে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিয়া চীন দেশে যাত্রা করেন এবং তথাকার কারবারের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া সুবিখ্যাত "টাটা এণ্ড সন্স" নামক হাউস প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন। তিনি চারি বৎসর কাল চীনে অবস্থিতি করিয়া তদঞ্চলের বাণিজ্য ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন ও সেই সঙ্গে নিজ কারবারের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি এই কারবারের এত দূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে অল্প কালের মধ্যে জাপান, হংকং, সাংহাই, প্যারিস ও নিউ ইয়র্ক

প্রভৃতি নগরে "টাটা ও সন্স্" কারবারের শাখা কার্য্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮৬৩ সালে তিনি চীন হইতে বোম্বাইয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং দুই বৎসর পরে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে একটী ভারতবর্ষীয় ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময়ে চঞ্চলা কমলা তাঁহার বংশের উপর অপ্রসন্না হওয়াতে তিনি তাঁহার সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ টাটা প্রভূত পরিমাণে কার্পাসের কারবার করিতেন। মার্কিণ অন্তর্বিদ্রোহের সময় তুলার বাজার অত্যন্ত চড়িয়া উঠে, ইহাতে তিনি অনেক তুলা বাঁধি করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প দিন পরে বাজার একেবারে পড়িয়া যায়, ইহাতেই তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। জামসেদজী যখন শুনিলেন যে তাঁহাদের বোম্বাই আফিস দেউলিয়া হইয়াছে, তিনি তখন ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের আশায় একেবারে নিরাশ হইলেন। কিন্তু এই দারুণ বিপদে তিনি কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি ধীর গভীর ভাবে সেই বিপদকে আলিঙ্গন করিলেন। ঈদৃশ বিপদে অনেক লোক শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, কিন্তু জামসেদজী অটল ভাবে সমস্ত সহ্য করিলেন। তাঁহাদিগের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়ে এই অমাবস্যার অন্ধকার আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘেরিল, কিন্তু প্রকৃত মনস্বীর ন্যায় তিনি তাহা উপেক্ষা করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার বিলাতস্থ অনেক বন্ধু তাঁহার চিত্তস্থৈর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। অগত্যা তিনি ইংলণ্ড হইতে বোম্বাই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তথায় আসিয়া দেখিলেন যে পূর্ব্বসম্পদ প্রতিষ্ঠার জন্য আবার তাঁহাকে নব বলে বলীয়ান হইতে হইবে, সুতরাং নূতন জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। জামসেদজী টাটার এই চরিত্র আমাদিগের দেশবাসীদিগের বিশেষরূপ অনুকরণীয়। নিরাশা কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না; কোন বিষয়ে ব্যর্থমনোরথ হইলে তিনি কখনও হতোদ্যম হইতেন না। বাস্তবিক এইরূপ চিত্তের দৃঢ়তা না থাকিলে কোন কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। জামসেদজী টাটা [illegible]

তিনি পুনরায় নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সময়ে ইংরাজের সহিত আবিসিনিয়ার যুদ্ধ হইতেছিল। এই যুদ্ধে তিনি তাঁহার পিতার সহযোগে রসদাদি সরবরাহের ঠিকা লইলেন। কমলার অপ্রসন্নতায় মুহ্যমান হন নাই বলিয়া, তিনি আবার তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন; আবিসিনিয়া যুদ্ধের ঠিকাদারী করিয়া তিনি বিশেষ লাভবান্ হইলেন এবং সেই অর্থ দ্বারা ভবিষ্যৎ সম্পদের ভিত্তি সংস্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাতেই সফলকাম হইয়াছেন। তখন হইতে তাঁহার হাতের ধূলামুঠা সোণামুঠায় পরিণত হইয়াছিল। যেন সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার শক্তি পরীক্ষার জন্যই তাঁহাকে ছলনা করিয়াই এক বার বিপদে ফেলিয়াছিলেন, অথবা সম্পদের মধুরতা বিশেষরূপে উপভোগ করাইবার জন্য তাঁহাকে বিপদসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি কতকগুলি পতিত জমী আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, ইহাতেও তিনি বেশ লাভবান হইয়াছিলেন এবং তৎপরে তিনি কল কারখানা স্থাপনের জন্য যত্নবান হন। টাটার চরিত্রে বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি একটী কার্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন না; একটীতে যেমন কৃতকার্য্য হইতেন অমনি আবার নূতন কার্য্যক্ষেত্রের দিকে তাঁহার সমস্ত শক্তি পরিচালিত করিতেন। সাধারণ ব্যবসায়ীরা একটী মাত্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া নিরাপদে তাহার ফলভোগ করিতে চাহে, কিন্তু টাটার ন্যায় শক্তিসম্পন্ন লোকে এরূপ ভাবে জীবন যাপন করা আলস্য মনে করেন; এই জন্যই আমরা ব্যবসায়ের নানা ক্ষেত্রে সর্ব্বদা তাঁহাকে বিদ্যমান দেখিতাম।

কল স্থাপন।

তিনি প্রথমে বোম্বাইয়ের চিঞ্চপুগলি নামক স্থানে একটি তেলের কল ক্রয় করিয়া উহাকে কাপড়ের কলে পরিণত করিলেন। এই কলের নাম দিয়াছিলেন "আলেকজাণ্ড্রা মিলস্"। এই কলে বেশ লাভবান হইয়াছিলেন; কিন্তু কি জানি কেন হয় [illegible] তিনি অল্পদিন পরে উহা [illegible]

তাঁহাকে এই কল বিক্রয় করিতে দেখিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি আর কল কারখানায় টাকা খাটাইবেন না। যাঁহারা এইরূপ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা অল্প দিন পরেই তাঁহাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইলেন। এদেশে যাহাতে একটী আদর্শ কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়, টাটার দৃষ্টি সেই দিকে ছিল, সুতরাং চিঞ্চপুগলীর ক্ষুদ্র কলে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি এবিষয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কি প্রণালীতে ইংলণ্ডের লাঙ্কাশায়ারে কাপড়ের কল সকল পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহা দেখিবার জন্য এবং বস্ত্র বয়ন শিল্প সম্বন্ধে অন্যান্য তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; এবং এতদুদ্দেশ্যে ১৮৭২ সালে বিলাত যাত্রা করিলেন। প্রায় বৎসরাবধি ইংলণ্ডে থাকিয়া তথাকার নানা স্থানের কাপড়ের কল সকল পরিদর্শন করেন। কলের সকল প্রকার কার্য্য সম্বন্ধে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করেন এবং তৎপরে এদেশে আসিয়া নাগপুরের বিখ্যাত "এম্প্রেস্ মিল" নামক কাপড়ের কল সংস্থাপিত করেন। এই কল ১৮৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে—যেদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন—সংস্থাপিত হয় এবং সেই জন্যই ইহার "এম্প্রেস মিল" নাম দেওয়া হয়। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রায় চারি বৎসর পরে এই কল সংস্থাপিত হয়। কিন্তু এই চারি বৎসর কাল টাটা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন না। বিলাত হইতে আসিবার কালীন তিনি সুয়েজে নামিয়া প্যালেষ্টাইন দেশ ভ্রমণ করিতে যান; কেবল দেশদর্শন মানসেই তিনি প্যালেষ্টাইনে গমন করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ কাহিনী তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শুনিতেছি সাহিত্যের হিসাবে এই ভ্রমণ কাহিনী একটী উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে, এজন্য টাটার কোন বন্ধু তাহা মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে, তিনি কেবল টাকা, আনা পাইয়ের হিসাবে জীবন অতিপাত করিতেন না; সাহিত্যও তাঁহার হৃদয়ের কতক স্থান অধিকার করিয়াছিল।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি কাপড়ের কল সংস্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। এই কল কোথায় সংস্থাপন করিলে সর্ব্ব প্রকারে সুবিধা হইবে তিনি তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন; কেবল চিন্তা নহে, সেই উদ্দেশ্যে ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিলেন। অবশেষে মধ্য ভারতের নাগপুরই উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি দেখিলেন নাগপুরে শ্রমজীবীদিগের মজুরীর হার যেরূপ অল্প ভারতের কুত্রাপি সেরূপ নহে; কারখানা নির্ম্মাণ করিবার জন্য যে সকল মাল মসলার প্রয়োজন তাহাও তথায় যারপর নাই সুলভ; তদ্ব্যতীত সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা এই যে কাপড়ের কলের জন্য যে তুলার প্রয়োজন তাহা সেখানকার মত আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া তিনি নাগপুরে কল সংস্থাপন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। অনেকে এরূপ একটা দূরবর্ত্তী স্থানে কল সংস্থাপনের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন; কেননা সে সময়ে নাগপুর ভারতের অন্যান্য স্থানের সহিত রেলদ্বারা সংযুক্ত হয় নাই। কিন্তু দূরদর্শী টাটা বুঝিয়াছিলেন যে ঐ স্থানে কল সংস্থাপন করিলে নিশ্চয়ই উহা লাভজনক হইবে সুতরাং তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ১৫ লক্ষ টাকা মূলধন ধার্য্য করিয়া এই কল সংস্থাপনে অগ্রসর হইলেন। যৌথ কারবারের আইন অনুসারে ৫০০ টাকা করিয়া তিন হাজার অংশে এই মূলধন বিভাগ করিয়া কোম্পানি রেজিষ্টারী করা হয়। প্রথমে এই কলে ৩০,০০০ চরকা ও ৪৫০ খানি তাঁত লইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। যাহাতে এই কল ভারতের একটী আদর্শ কল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে টাটা সে জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার সেই কার্য্যে একজন উপযুক্ত সহকারী পাইয়াছিলেন। বোমানজী দাদাভাই নামে একজন উৎসাহী পারসীককে কলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। ইনিও যথেষ্ট পরিশ্রম ও যত্নের দ্বারা দিন দিন এই কারখানার উন্নতি সাধন করিতে থাকেন।

কয়েকটি নূতন ব্যবস্থা।

নাগপুরের শ্রমজীবীদিগের মজুরী সস্তা হইলেও তাহারা কলের কার্য্যে [illegible]

টাটাকে কতকটা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন যে তাহারা বোম্বাইয়ের কলের মজুরদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। এতদ্বারা মহাত্মা টাটা মধ্য ভারতের কি উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা ঐ অঞ্চলের শ্রমজীবীদিগের অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এম্প্রেস মিল সংস্থাপনের পর তথায় আরও কয়েকটী কল সংস্থাপিত হইয়াছে; ঐ সকল কলে সহস্র সহস্র লোক কর্ম্ম করিয়া দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে।

নাগপুরের জলবায়ু কতক পরিমাণে কাপড়ের কলের প্রতিকূল। তথাকার শুষ্ক বায়ুতে সূতার বড় অনিষ্ট হয়। সেই অসুবিধা দূর করণার্থ বায়ু শীতল রাখিবার কলের ব্যবস্থা করিলেন। ইতি পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন কারখানাতেই এরূপ বায়ুশীতলকারী কল ব্যবহৃত হয় নাই। এম্প্রেস মিলের দেখাদেখি এখন অন্যান্য কারখানাতেও এই কল ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহাতে যারপর নাই কাজের সুবিধা হইতেছে।

এম্প্রেস মিল ভারতবর্ষের কাপড়ের কলে এক নবযুগের অবতারণা করিয়াছে। ইহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া অন্যান্য কলওয়ালাদিগের চক্ষু খুলিয়াছে, সুতরাং তাঁহারাও সেই প্রকার কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া লাভবান হইতেছেন। এম্প্রেস মিলের উন্নতির প্রধান কারণ স্বার্থত্যাগ। কথাটা শুনিয়া অনেকে হাসিবেন। নিঃস্বার্থ ভাবে ব্যবসা আবার কিরূপ! কিরূপ তাহা বলিতেছি। অনেক স্থলেই যৌথ কারবারের এজেণ্টগণ কোম্পানির লাভ হউক বা না হউক আপনাদিগের কমিশন লইতে কুণ্ঠিত হন না। এরূপ কমিশন অন্যায় না হইলেও অনেক সময় কারবারের পক্ষে লাভজনক নহে। বোম্বাই অঞ্চলের সমুদয় কাপড়ের কলের নিয়ম যে, যত কাপড় তৈয়ার হইবে এজেণ্টগণ তাহার উপর এক পয়সা করিয়া কমিশন পাইবেন। টাটা এই রীতির অনুসরণ করিলেন না। তিনি কোম্পানির লভ্যাংশের উপর কমিশন বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন, সুতরাং যাহাতে কোম্পানির [illegible] দিকে

কোম্পানিরও উন্নতি হইতে লাগিল। ইহা স্বার্থত্যাগ নহে ত কি? ইহাতে কোম্পানির এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইল যে আঠার বৎসর পরে কারখানার চরকা ও তাঁতের সংখ্যা বাড়াইতে হইল এবং সে জন্য ইমারতও বাড়াইতে হইল। এই উপলক্ষে টাটা স্বমুখে বলিয়াছিলেন যে "আমি অন্য লোক অপেক্ষা আপনাকে দেশহিতৈষী বা সদাশয় বলিয়া পরিচয় দিতেছি না, কিন্তু আমি এ কথা বলিবার অধিকারী যে এই কলের কার্য্য সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ভাবে সম্পন্ন করিতে আমি সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছি এবং অংশীদারদিগের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলিয়া মনে করিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, কারখানার কর্ম্মচারীদিগের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেও ত্রুটি করি নাই, কেননা তাহাদিগের মঙ্গলের উপরই এই কারখানার মঙ্গল সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে।" টাটার এই কথাগুলি মৌখিক নহে, এম্প্রেস মিলের অবস্থা তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। ১৮৭৭ সালে ৩০,০০০ চরকা ও ৪৫০ খানি তাঁত লইয়া কলের কার্য্য আরম্ভ হয়, আর বর্ত্তমান সময়ে তথায় ৬৭,০০০ চরকা ও ১৪০০ খানি তাঁত চলিতেছে। ইহার জন্য অংশীদারদিগকে নিজ হইতে এক কপর্দ্দকও প্রদান করিতে হয় নাই। ১৮৭৭ সালে ১৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া এম্প্রেস মিলের কার্য্য আরম্ভ হয় আর ১৯০৩ সালের শেষে কেবল মাত্র কোম্পানির লাভের টাকা সঞ্চয় করিয়া ৩১,৮৭,৫০০ টাকা মূল ধন বৃদ্ধি করা হইয়াছে; অর্থাৎ ২৬ বৎসরে মূলধন ১৫ লক্ষ হইতে ৪৬,৮৭,৫০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা প্রথমে এই কোম্পানির অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কতদূর লাভবান হইয়াছেন এতদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রত্যেক অংশীদার তাহার অংশানুযায়ী প্রতি অংশে অতিরিক্ত দুই অংশের অধিকারী হইয়াছেন। ইহা বড় সামান্য লাভ নহে। কিন্তু অংশীদারগণ কেবল মাত্র এইরূপ লাভে লাভবান হন নাই, তাঁহারা লভ্যাংশ হইতে নগদ টাকাও যথেষ্ট পাইয়াছেন।" গত ২৬ বৎসরে কোম্পানি অংশীদারদিগকে নগদ টাকায় [illegible] ২৫০ টাকা লাভ বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে যাঁহারা [illegible] ৫০০ টাকা

তাঁহারা অতিরিক্ত অংশ রূপে হাজার৲ টাকা পাইয়াছেন এবং নগদ ৬০৮১ টাকা সুদ পাইয়াছেন। আবার ইহার উপর বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের অংশের মূল ও যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে এম্প্রেস মিলের প্রত্যেক ৫০০ টাকার অংশ ১৫০০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। এখন সকলে অনুমান করিয়া দেখুন টাটার প্রতিষ্ঠিত এই কাপড়ের কল কিরূপ লাভজনক হইয়াছে। টাটা অংশীদার দিগকে যেমন লাভ দিয়াছেন, কর্ম্মচারীদিগকেও সেইরূপ লভ্যাংশ প্রদান করিতে কৃপণতা করেন নাই। তিনি কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগকে নিয়মিত বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদানের জন্য ২৯৩৪৯,০২৭ টাকা জমা রাখিয়াছেন। এই সমস্ত টাকা একুন করিলে দেখা যায় যে ২৬ বৎসরে এই কারবারে ১৮৭,৬২ ৭৭৭ টাকা লাভ হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথম মূল ধনের দ্বাদশ গুণ লাভ দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষে আর কোন যৌথ কারবার এরূপ লাভের হিসাব দিতে পারেন কি না সন্দেহ। সমস্ত লাভ একুন করিলে দেখা যায় যে কোম্পানি আদি মূলধনের উপর শতকরা ৫০ টাকা লাভ করিয়াছেন। আর অন্যূন পাঁচ সহস্র লোক এখানে মজুরী করিয়া আপনাদিগের উদরান্নের সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা মহাত্মা টাটার কার্য্যদক্ষতা, নিঃস্বার্থপরতা ও মহাশয়তা ইত্যাদি গুণ বিশেষভাবে প্রদর্শন করিবার জন্যই এম্প্রেস মিলের লাভালাভের কথা এরূপ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিলাম। সত্য সত্যই মহাত্মা টাটা এই এম্প্রেস মিল প্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশে কাপড়ের কল সম্বন্ধে একটী নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছেন।

এম্প্রেস মিলকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া টাটা অন্যত্র আবার সেইরূপ একটী কাপড়ের কল সংস্থাপন করিবার জন্য মনোযোগী হইলেন। তিনি ফরাসী ভারতের রাজধানী পণ্ডিচারী নগরে একটী কল করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। বৃটীশ অধিকারের কোন পণ্য ফরাসী অধিকারে চালান দিলে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহার উপর উচ্চহারে শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ফরাসী অধিকারভুক্ত প্রদেশের উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এই শুল্কভার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই টাটা পণ্ডিচারীতে কল সংস্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি একটী কোম্পানিও সংগঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে কুর্গে ধরমসী মিল নামক কল সুবিধা মূল্যে পাওয়া গেল বলিয়া পণ্ডিচারীতে কল সংস্থাপনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। কুর্গের ধরমসী মিলই বিখ্যাত "স্বদেশী মিল"। এই স্বদেশী মিল যদিও এম্প্রেস মিলের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কল নহে, তথাপি বোম্বাই অঞ্চলের অনেক কল অপেক্ষা উন্নতিও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে। এতাবৎ এদেশে যত কাপড়ের কল সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার কোনটিতেই সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত না, এম্প্রেস মিল ও তৎপরে স্বদেশী মিল এই সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নে প্রথমে মনোযোগ প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু এই সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নে একটী অন্তরায় উপস্থিত হয়।

তুলার উন্নতি।

টাটা কোন প্রকার বিঘ্ন বিপত্তিতেই ভগ্নোদ্যম হইতেন না। লম্বা আঁশের তুলা ব্যতীত সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয় না ভারতে এখন আর পূর্ব্বেকার ন্যায় লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্ন হয় না। দেশী মিহি কাপড় এখন বিলাতী সূতায় তৈয়ার হয়। ম্যাঞ্চেষ্টার বা গ্লাসগো হইতে যে সকল ধুতি বা উড়ানি আমদানী হয়, তাহাও প্রধানতঃ মিশর দেশ জাত কার্পাসপ্রসূত। এখন এদেশের কলেও যে সরু কাপড় হইতেছে তাহাও মিশরের তুলায় প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু টাটার হৃদয় তাহাতে তৃপ্তি মানিল না। যাহাতে মিসরের মত তুলা ভারতে উৎপন্ন হয় তিনি সে জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। মিসর হইতে কার্পাসবীজ আনিয়া ভারতে যে সকল স্থানে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়, তথায় বপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে রাজপুরুষগণ তাঁহার সহিত একমত হইলেন না। কিন্তু টাটা তাহাতে কিছুমাত্র [illegible] তিনি স্বয়ং মিসরে গিয়া যেখানে যে [illegible] কার্পাসের আবাদ হইয়া থাকে তাহা [illegible] এবং ভারতে

কারণে এই পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইল না। যে সকল স্থানে এই বীজ বপন করা হইয়াছিল, তথায় রীতিমত জল সেচনের ব্যবস্থা না থাকাতে ও বায়ুর স্বাভাবিক শুষ্কতার নিমিত্তই এইরূপ ঘটিয়াছিল। তবে তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে সিন্ধু দেশের ন্যায় সমুদ্রকূলের নিকটবর্ত্তী স্থানে মিসরের বীজ লইয়া আবাদ করিলে লম্বা আঁশের তুলা জন্মিতে পারে। টাটার পরামর্শানুসারে নাগপুরের গবর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্রে এই বীজের যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহা সন্তোষজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। টাটা কি রকম উদ্যমশীল পুরুষ ছিলেন তাঁহার সকল কার্য্যের দ্বারা তাহা বিশেষরূপ প্রমাণিত হইতেছে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে মিসরের তুলা আমদানী করিয়া বস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেইত চলিতে পারে, তবে এদেশে মিশরের মত তুলা উৎপাদনের চেষ্টায় অকারণ এত পরিশ্রম কি জন্য? সূক্ষ্মদর্শী টাটা বুঝিয়াছিলেন যে যতদিন ভারতের কল হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল উৎপন্ন না হইবে ততদিন এই সকল কলের উন্নতি অনিশ্চিত। ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া মিসরের তুলা অধিক পরিমাণে ক্রয় করা, ভারতের নূতন কলওয়ালাদিগের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য কার্য্য। অতএব ঐরূপ জাতির তুলা ভারতে উৎপাদন করিলে এক দিকে যেমন কল সকলের সুবিধা হইবে অন্য দিকে ভারতীয় কৃষকদিগের উপার্জ্জনের একটি নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইবে। এই তুলার আবাদ সম্বন্ধে টাটার পরিশ্রম নিষ্ফল হয় নাই। কৃষিতত্ত্ববিদ্ রাজপুরুষেরা এক্ষণে স্বীকার করিতেছেন যে, অবস্থা বিশেষে মিসরের জাতির তুলা এদেশে জন্মিতে পারে। তাঁহারা বলিতেছেন যে এদেশের জল বায়ুর উপযোগী করিয়া মিসরের বীজ বপন করিলে ততটা ফল লাভের আশা নাই, তবে ঐ বীজকে এদেশীয় বীজের সহিত মিশাইয়া একটা দো-আঁশলা জাত তৈয়ার করিলে অভিলষিত ফল লাভ হইতে পারে। এজন্য টাটা এত দূর চেষ্টা করিয়াছিলেন যে তিনি মহীশূরে দুই তিন হাজার বিঘা জমি লইয়া মিসরের তুলার আবাদ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

মাল কাটতির ব্যবস্থা।

এইরূপ উদ্যোগী পুরুষসিংহই লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকেন। তিনি কেবল দূরদর্শী ছিলেন না, তিনি সর্ব্বদর্শী ছিলেন। সকল দিকে তিনি সমানরূপে দেখিতেন। কাপড়ের কল সংস্থাপিত হইলে যে সকল কাপড় উৎপন্ন হইবে তাহা বিক্রয় করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাও চিন্তা করিয়াছিলেন। বিলাতী কলের কাপড়ে দেশ যেরূপ ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে ভারতের দুই একটা কলের উৎপন্ন সামগ্রী কি লোকের চক্ষে পড়িবে? এই ভাবিয়া যাহাতে তাহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন। যতদিন না লোকে দেশী কলের কাপড় দেখিয়া, দোকানদার দিগের নিকট তাহা চাহিবে, ততদিন দোকানদারেরা সে কাপড় খরিদ করিবে না। অতএব যাহাতে লোকে দেশী কলের কাপড় দেখিতে পায় তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি তাঁহার কলের সংসৃষ্ট কতকগুলি কাপড়ের দোকান ভারতের নানা স্থানে খুলিলেন। সেই সকল দোকানে কেবল তাঁহারই কলজাত কাপড় বিক্রয়ার্থ রাখা হইল, সুতরাং লোকের তাহা দেখিবার সুবিধা হইল এবং ক্রমে ক্রেতারা অন্যান্য দোকানদারের নিকট সেই কাপড় চাহিতে লাগিল কাজেই বস্ত্রব্যবসায়ীরা আর দেশী কলের কাপড় অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। এখন যে প্রায় সকল কাপড়ের দোকানে দেশী মিলের কাপড় দেখা যায় টাটার উল্লিখিত ব্যবস্থাই তাহার মূল কারণ। টাটার আদর্শে অন্য অন্য কলের অধিকারীরাও ঐরূপ ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ভারতের এই নবজাত বস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য টাটা যেরূপ অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন সেরূপ আর কেহ করেন নাই। তিনি ইহার উন্নতির পথে যখনই যে কোন বাধা বিঘ্ন দেখিতেন তখনই তাহা অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেন। ভারতের কলজাত বস্ত্র ও সূত্রাদি প্রধানতঃ চীন ও জাপানে অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ে কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে চীন ও জাপানের [illegible] ম্যাঞ্চেষ্টারের

একচেটীয়া ছিল। কিন্তু বোম্বাই হইতে চীনে বা জাপানে মাল পাঠাইতে হইলে পূর্ব্বে এক মাত্র "পি এণ্ড ও" কোম্পানির জাহাজে পাঠাইতে হইত।

জাহাজ ভাড়ার হারের দ্বন্দ্ব।

এই পি এণ্ড ও কোম্পানি যদিও গবর্ণমেণ্টের ডাক বহন করেন বলিয়া ভারত রাজকোষ হইতে যথেষ্ট অর্থলাভ করিয়া থাকেন তথাপি ইহারা বোম্বাই হইতে চীনে পণ্যাদি লইয়া যাইবার জন্য উচ্চহারে ভাড়া লইতেন। ইহাতে এদেশীয় কল ওয়ালাদিগের পক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতা করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল। অপেক্ষাকৃত স্বল্প ভাড়ায় মাল চালান করিতে না পারিলে চীন ও জাপানে ভারতীয় মালের বিশেষ কাটতি হইবার আশা নাই দেখিয়া টাটা সে জন্য চেষ্টিত হইলেন। তিনি প্রথমে এবিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য পি এণ্ড ও কোম্পানিকে পত্র লিখিলেন। কিন্তু সে সময়ে অন্য কোন প্রতিযোগী জাহাজ কোম্পানি চীনের ব্যবসায়ে নিযুক্ত না থাকাতে পি এণ্ড ওর কর্তৃপক্ষীয়েরা টাটার অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না। তাহার পর যখন অষ্ট্রিয়ান লয়েড্স্ ও রুবাটীনো কোম্পানিরা চীনে জাহাজ পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন, পি এণ্ড ও কোম্পানি তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মঘট করিলেন। তাহাতে তাঁহারা পি এণ্ড ও অপেক্ষা কম ভাড়ায় চীনের মাল বহন করিতে অসম্মত হইলেন। পি এণ্ড ও তাঁহাদিগকে এই প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন যে, চীনের কারবারে এই তিন কোম্পানির যে লাভ হইবে তাহা সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইবেন। এই তিন কোম্পানিই টন প্রতি ১৭ টাকা ভাড়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পুরুষসিংহ টাটা ইয়ুরোপীয় জাহাজ কোম্পানিদিগের এই অসদ্ব্যবহারের প্রতিফল প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি জাপানের প্রধান প্রধান ষ্টীমার কোম্পানিকে বোম্বাই হইতে চীন জাপানে মাল বহন করিবার অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতি টনে ১৩ টাকা করিয়া ভাড়া ধার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন, ইহাতে যদি তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি হয় তাহা টাটা স্বয়ং পূরণ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। জাপানী জাহাজওয়ালারা টাটার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ঐরূপ ভাড়ার হারে মাল বহন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে পি এণ্ড ও কোম্পানি প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত কোম্পানি সহজে পরাভব মানিলেন না, তাঁহারা জাপানী জাহাজওয়ালাদিগের ক্ষতি সাধনের জন্য নিজেদের ভাড়ার হার ক্রমে ক্রমে কমাইতে লাগিলেন, এমন কি এক টাকা দুই টাকা টনে তাঁহারা মাল বহন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু জাপানী মহাজনেরা তাহাতে টলিলেন না। তাঁহারা জাপানী জাহাজওয়ালাদিগকেই মাল দিতে লাগিলেন। ইহাতে পি এণ্ড ওর কর্তৃপক্ষীয়েরা বড়ই চটিলেন। তাঁহারা গোপনে বিলাতে মন্ত্রী সভার সভ্যদিগকে একথা বিদিত করিলেন। শুনা যায় তাৎকালিক প্রধান মন্ত্রী লর্ড রোজবরী বিলাতস্থ জাপানী দূতকে এবিষয় জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, এবিষয়ে একটা মীমাংসা না করিলে ইংলণ্ড জাপানের প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। জাপানের লোকেরা একথা শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহারা রাজসরকার হইতে জাপানী জাহাজ কোম্পানিকে অর্থ সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সময়ে টাটা পি এণ্ড ও কোম্পানির এই অযথা আচরণের প্রতিবাদ করিয়া এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। পি এণ্ড ও কোম্পানি ভারতবাসীর অর্থে পুষ্ট হইয়া ভারতীয় ব্যবসাদারদিগের কিরূপ ক্ষতি সাধনের উদ্যোগী হইয়াছেন, এই পুস্তিকায় তাহা বিশদরূপে বিবৃত করেন ও তাহা বিলাত ও মার্কিণের সওদাগরমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত করেন। এই আন্দোলনে টাটা জয়ী হইয়াছিলেন। অতঃপর পি এণ্ড ও কোম্পানি জাপানী জাহাজ ওয়ালাদিগের সহিত সমান হারে ভাড়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে টাটার প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তিনি জাপানী জাহাজ ওয়ালাদিগের ক্ষতিপূরণ করিবেন বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহাকে এই বিষম ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল।

রেশমের উন্নতি।

টাটা কখনও আপনাকে দেশহিতৈষী বা সংস্কারক বলিয়া পরিচয় দেন নাই, কিন্তু আমরা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই গভীর দেশহিতৈষিতার পরিচয় প্রাপ্ত হই। তিনি ব্যবসায়ের ব্যপদেশে দেশের যে সকল মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা এক প্রকার অতুলনীয়। তিনিই প্রকৃত পক্ষে মহাত্মা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য পাত্র। ভারতের রেশম এক সময়ে জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। সেই রেশম ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার হয়, টাটা সে জন্য কিরূপ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। দুইটা দুইটা কলের কার্য্য পরিদর্শন করিতে ও অন্যান্য ব্যবসায়ে যাঁহার সমস্ত সময় পর্য্যবসিত হয়, রেশমের ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনের চেষ্টাতে নিযুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে কি অসম্ভব ব্যাপার নহে? কিন্তু তিনি কোন কার্য্যই অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন না। টাটা দুই একবার কার্য্যোপলক্ষে মহীশূর ও বাঙ্গালোর গমন করিয়াছিলেন। সেইখানে গিয়া তাঁহার রেশমের চাষের কথা মনে উদয় হয়। টীপু সুলতানের আমলে মহীশূরে সর্ব্ব প্রথম রেশমের আবাদ হয়। তথাকার কেঙ্গরী নামক স্থানে এক জন ফরাসী রেশম-ব্যবসায়ী এক সময়ে ইহার বিস্তর আবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালে গুটীর মধ্যে রোগোৎপত্তি হওয়াতে, ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় সেখানেও ইহার ব্যবসায় এক প্রকার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। টাটা এই নষ্টপ্রায় ব্যবসায়কে পুনরুজ্জীবিত করিতে দৃঢ়ব্রত হইলেন। তিনি দেখিলেন ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে কেবল বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে গুটী পোকা দিগকে পালন করা যায়। কিন্তু মহীশূরের ন্যায় নাতিশীত নাতিউষ্ণ স্থানে বৎসরে অন্যূন ছয় বার গুটী পালন করিয়া রেশম সংগ্রহ করা যাইতে পারে। খ্যাতনামা পাস্তুর অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে গুটীর রোগ নির্দ্ধারণের যে সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে ফ্রান্স ও ইতালীর রেশম ব্যবসায়ের যার পর নাই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। টাটা সেই উপায়ে এ দেশের গুটীর রোগ নির্ণয় করিয়া রেশম চাষের উন্নতি সাধন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালোরে একটী আদর্শ রেশম ক্ষেত্র সংস্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহার এই আদর্শ আবাদের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য জাপান হইতে এক জন উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক আনিলেন ও গুটীর রোগাদি নির্ণয় করিবার জন্য এক জন রেশমতত্ত্ববিৎ জাপানীকে নিযুক্ত করিলেন। এই আদর্শ ক্ষেত্রে স্বদেশী বিদেশী নানা প্রকার তুঁত গাছের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আবাদ করা হইল এবং ফ্রান্স, ইতালী ও জাপান হইতে নানাজাতি গুটীর ডিম্ব আনয়ন করিয়া তাহা ক্ষেত্রে পালন করা হইতে লাগিল। স্থানীয় গুটীর যাহাতে উন্নতি হয় সে পক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করা হইল; বিদেশী ও দেশী গুটীর সংমিশ্রণে নূতন জাতীয় গুটীর সৃষ্টি হইল এবং সেই সকল গুটী হইতে যে রেশম উৎপন্ন হইল তাহাও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাহির করা ও জাপানী কলে জড়ান হইল; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ রেশমের যথেষ্ট কাটতি না হওয়াতে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই পরীক্ষা কার্য্যে টাটা প্রায় ২৫ সহস্র টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি কেবল মাত্র দেশের মঙ্গলোদ্দেশ্যে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ভারতে এইরূপ হিতৈষী কয়জন আছেন?

লৌহ খনি।

টাটার এইরূপ নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার আর একটি পরিচয় দিতেছি। মধ্য প্রদেশে বহুবিধ ধাতুর খনি আছে, তন্মধ্যে তথাকার লৌহ খনির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন লৌহ খনির কার্য্যের জন্য বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য আমদানি করিবার প্রয়োজন, মধ্য প্রদেশে তাহা যেরূপ সুলভে আমদানী হইতে পারে এরূপ অন্যত্র নহে। খনির মৃত্তিকা গলাইয়া লৌহ বাহির করিবার জন্য কাঠের কয়লা ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া, টাটা দেশী পাথুরে কয়লা দ্বারা ঐ কার্য্য করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু রাজপুরুষেরা প্রথমে সে প্রস্তাবে বড় একটা কর্ণপাত করেন নাই। রাজ পুরুষদিগের ঈদৃশ ব্যবহারে টাটা কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইলেন না। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে মধ্য প্রদেশের একজন খনিতত্ত্ববিৎ ইঞ্জিনিয়ার পাথুরে কয়লার দ্বারা লৌহ গলাইবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার

করিয়াছিলেন, এবং তথাকার তাৎকালীন চীফ-কমিসনরও সেই প্রথার অনুমোদন করিয়াছিলেন; তথাপি টাটা যখন এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেন, তখন রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে কোন উৎসাহই পাইলেন না। অতঃপর তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড জর্জ হ্যামিল্টনের নিকট তাঁহার মন্তব্য জ্ঞাপন করেন। ষ্টেট সেক্রেটারী মহাশয় টাটার প্রস্তাবে বিশেষ সাহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য টাটাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন উদ্যোগী বিচক্ষণ দেশহিতৈষীর পক্ষে যে ইহা একটী কর্ত্তব্য কার্য্য, একথা বলিয়া তিনি তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। টাটা বিলাত হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে রাজ-পুরুষেরা অনেকটা তাঁহার অনুকূল হইয়াছেন, ইহাতে তিনি যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। টাটা চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, তিনি যদি মধ্য ভারতের খনির কার্য্যের প্রসার করিতে পারেন, তাহা হইলে কালে তৎপ্রদেশ পৃথিবীর অনেক খনিপ্রধান দেশের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। তিনি হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এই খনির কার্য্যে এক কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করিলে প্রতি-দিন অন্ততঃ ৩০০ টন অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৮১০০ মণ করিয়া ইস্পাত উৎপন্ন হইতে পারে, বরং তদপেক্ষা আরও অধিক উৎপন্ন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত তিনি চন্দা জেলার তাম্রের খনির উদ্ধারেও যত্নশীল হইয়াছিলেন। এই জেলায় অনেক তাম্রের খনি আছে, কিন্তু প্রায় সহস্র বৎসর হইল সে সমস্ত পরিত্যক্তাবস্থায় রহিয়াছে। এই খনির কার্য্যের পরীক্ষায় ও তদ্বিষয়ে তাঁহার উদ্যোগ পরিণতাবস্থায় আনয়ন করিতে তিনি প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। টাটা যাহাতে হস্তার্পণ করিতেন—তাহাতে সফলকাম হউন বা না হউন—তাহা প্রকৃত কৃতকর্ম্মার ন্যায় সম্পন্ন করিতেন। এই লৌহ খনি সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক বিঘ্ন বাধা পাইতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি এবিষয়ে সমস্ত তথ্য অবগত হইবার জন্য এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে সন্তোষজনকরূপে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিবার জন্য আমেরিকা হইতে একজন খনিতত্ত্ববিদ্‌কে নিযুক্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি সমস্ত খনির পরিদর্শন কার্য্য শেষ করিয়াছেন এবং মধ্য প্রদেশের ভূগর্ভে যে লৌহের অক্ষয় ভাণ্ডার নিহিত আছে তিনি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। তদ্ব্যতীত নিকটে লৌহ গলাইবার জন্য কয়লা ও চূণাপাথর প্রভৃতির খনি আছে তাহাও আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে এ বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট লিখিতেছেন। সম্ভবতঃ টাটার বংশধরেরা এই খনি উদ্ধার করিবার অধিকার লাভ করিবেন। কিন্তু যে মহাত্মার বুদ্ধিবলে ও উদ্যোগে ইহার সংসাধনের উপায় হইল তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু মধ্য ভারতের খনি সমূহের সহিত তাঁহার নাম চিরকাল লোকে স্মরণ করিবে।

তাজমহল হোটেল।

টাটা আর একটী বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার পরিসমাপ্তিও তিনি সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। বোম্বাই সহরে একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেল ও সেই সঙ্গে একটি আদর্শ অট্টালিকা নির্ম্মাণে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই হোটেলের নামকরণ করিয়াছিলেন "তাজমহল হোটেল"। প্রসিদ্ধ "তাজমহল" অট্টা-লিকার অনুকরণে এই হোটেলগৃহের শিরোদেশে একটি গম্বুজ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অট্টালিকা এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে যে ইহা বোম্বাই নগরের একটী দর্শনীয় স্থান হইয়াছে। টাটা কেবল ব্যবসায়ের জন্য এই হোটেল সংস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, যাঁহারা এরূপ মনে করিবেন, তাঁহারা টাটার প্রকৃত চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। তিনি তাঁহার ব্যবসায়ের অনুরোধে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি প্রায় য়ুরোপের সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণোপলক্ষে তাঁহাকে অধিকাংশ সময়ে হোটেলেই অবস্থিতি করিতে হইত। ইহাতে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রণালীতে পরিচালিত হোটেল সকলের অবস্থা ও ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং সেই সকল হোটেলের কোথায় কি ত্রুটি আছে তাহাও বুঝিয়াছিলেন। কি প্রণালীতে হোটেল পরিচালিত হইলে, বিদেশী ভ্রমণকারী

গণের সর্ব্ব প্রকার আরাম বিধান করা যাইতে পারে, তিনি ভ্রমণ দ্বারা তাহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি ভারতের দ্বারস্বরূপ বোম্বাই নগরে একটি আদর্শ হোটেল সংস্থাপনে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। এই হোটেলের দৃশ্যও যেমন মনোহর ইহার ব্যবস্থাও সেইরূপ তৃপ্তিকর। ইহা বোম্বাই নগরের যেরূপ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে, তেমনই ভারতের সমুদয় হোটেলের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে। ইহাই টাটার উদ্দেশ্য ছিল। এতদ্দ্বারা বোম্বাইয়ের শোভা বর্দ্ধন করা যেমন তাঁহার একদিকে উদ্দেশ্য ছিল, অপর দিকে যাহাতে ইহার আদর্শে ভারতের অন্যান্য স্থানের হোটেলাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ হোটেলের উন্নতি সাধন করিয়া পান্থগণের আরাম বিধানে যত্নশীল হন, ইহাও তাঁহার অন্যতম অভিপ্রায় ছিল। এই হোটেল কেবল বর্ত্তমান কালের বৈদ্যুতিক আলোকে পরিশোভিত ও বৈদ্যুতিক বীজনে সুখপ্রদ নহে, ইহার নিম্নতল হইতে সর্ব্বোচ্চতলে যাইতে হইলে সিঁড়ী ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয় না। নিম্ন তলস্থ একটি নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে, কলের দ্বারা তাহা যে কোন তলে নীত হয়। এতদ্ব্যতীত খাদ্য সামগ্রী যাহাতে কোনরূপে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য ভাণ্ডার সকল যন্ত্রযোগে সর্ব্বদা শীতল রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই এবং আপাতঃ লাভের দিকেও দৃষ্টি রাখেন নাই। এক মাত্র ভ্রমণকারীদিগের সুখসচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি এতদর্থে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, এই বিচিত্র অট্টালিকার শিখর দেশের শেষ প্রস্তর সন্নিবেশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বহু দূরে বিদেশে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। "যদি ধর্ম্ম নসি স্থিতং"। কেবল তাজমহল হোটেলের মত একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ দ্বারা টাটা বোম্বাইয়ের শোভা সম্পাদনের চেষ্টা করেন নাই। বোম্বাইয়ের সল্‌সেট উপনগরে, ভাড়া দিবার অভিপ্রায়ে অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া সেই অঞ্চলকে শোভান্বিত করিয়াছেন। খার রোড, বাণ্ডোরা প্রভৃতি পল্লীতেও অনেক গুলি অট্টালিকার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

ইমারতসমিতি।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর একটি মহদভিপ্রায় ছিল, যুরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সে বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সে সদভিপ্রায় পূর্ণ করিবার অবসর দিলেন না। ইংলণ্ডের ইমারত সমিতির (Building Socicty) কথা অনেকে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। এই সমিতি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া ভাড়া দিয়া থাকেন এবং সেই সকল গৃহে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, সমিতির নিয়মানুসারে নির্দ্ধারিত কাল ভাড়া প্রদানের পর তাঁহারা সেই সেই গৃহের স্বত্বাধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা একেবারে অর্থ সঞ্চয় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ, এতদ্দ্বারা তাঁহারা সহজে গৃহ লাভ করিতে সমর্থ হন। অথচ সমিতি কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হন না। নির্দ্ধারিত কালের ভাড়াতে তাঁহারা যাহা ব্যয় করিয়াছিলেন সুদ সমেত তাহা আদায় হয়। ইহাতে ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার সাধন হয়। টাটা তাঁহার স্বাভাবিক পরার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়াই মনে মনে এইরূপ অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সুযোগ ঘটিল না। এক্ষণে আমাদিগের দেশের লোকের যেরূপ আর্থিক অসচ্ছলতা, তাহাতে এইরূপ ইমারত সমিতির বিশেষ প্রয়োজন। এবার বিলাত গমনের পূর্ব্বে বোম্বাই উপনগরে একটি সাধারণ পাঠাগার, উদ্যান ও বাজার সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায়ও টাটা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিবিধ।

টাটা বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া যে সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন ও তদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে দেশের ও সাধারণের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহার বিবরণ আমরা যথাসাধ্য বিবৃত করিলাম। ইহা ছাড়া তিনি আরও অনেক প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমরা তাহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমরা শুনিয়াছি, তিনি বোম্বাইয়ের সমুদ্রকূল জমা লইয়া মাছের কারবার করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যে প্রণালীতে মৎস্যাদি টিনে পুরিয়া বিদেশে পাঠান হয়, তিনি তাহার একটা

কারখানা করিয়াছিলেন। গবাদি পশু সমূহের চরিবার জন্য একটি চারণভূমি ও তৎসঙ্গে দুগ্ধ, পণিরাদি প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা খুলিয়াছিলেন। এতদুভয় কারবারের ফল কিরূপ হইয়াছিল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

বিজ্ঞান গবেষণা মন্দির।

আমরা টাটা চরিত্রের যে সমস্ত বিবরণ উপরে বিবৃত করিলাম, তাহাতেই তিনি ভারতে চিরদিন হিতৈষী ও সদাশয় রূপে স্মরণীয় থাকিবেন। কিন্তু কেবল পরোক্ষ ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহার উচ্চ হৃদয় প্রত্যক্ষ ভাবে দেশের জন্য কিছু না করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। যাহাতে ভারতবাসীগণ বিদ্যার্জ্জন করিয়া আপন আপন অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন, সে জন্য তিনি চিরদিনই অন্যের অজ্ঞাতসারে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। অনেক দরিদ্র সন্তান টাটার অর্থে এদেশে ও বিলাতে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া এক্ষণে যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিতেছেন। যাহাতে ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পাদিতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে সে দিকে চিরদিনই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অনেক ছাত্রকে বিলাতে ও মার্কিণে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগের অনেকে দেশে ফিরিয়া বোম্বাই অঞ্চলের কল কারখানায় নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি জাতিধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে এবিষয়ে অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার এই শেষোক্ত অভিপ্রায় দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিবার জন্য, তিনি ভারতে বিজ্ঞান গবেষণা মন্দির স্থাপনের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা প্রদানে অগ্রসর হন। এই কুবেরোপম দানেই তিনি ভারতের আবালবৃদ্ধ সকল শ্রেণীর লোকের নিকটই পরিচিত হইয়াছেন। এই বিজ্ঞান গবেষণা মন্দির সংস্থাপনের উচ্চ উদ্দেশ্যের কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। যাহাতে ভারতের সকল স্থানের শিক্ষিত যুবকগণ, উচ্চশিক্ষা লাভান্তর বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া দেশে কার্য্যকরী বিদ্যার উন্নতি সাধনে সমর্থ হন, ও তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে শিল্পাদির বিস্তারে দেশের দারিদ্র দূরীকরণে সমর্থ হন, টাটা এই উদ্দেশ্যে এই ৩০ লক্ষ টাকা দান করিতে অগ্রসর হন। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে উপাধি বিতরণ উপলক্ষে গবর্ণর লর্ড রে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেই মহাত্মা টাটা এই মহৎ কার্য্য সাধনে প্রণোদিত হন। কি উপায় অবলম্বন দ্বারা এই মহদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা অবধারণ করিবার জন্য টাটা তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত বি, জে, বাদশাকে ইংলণ্ডের অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে অল্প কাল মধ্যে ভারতে একটি আদর্শ বিদ্যামন্দির সংস্থাপিত হইবে ভারতে লোকে আশান্বিত হইলেন এবং টাটাকে কোটি কণ্ঠে সকলে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একমাত্র ভারত গবর্ণমেণ্টের দীর্ঘসূত্রতায় টাটা তাঁহার সেই শুভ ইচ্ছা সম্পূর্ণ দেখিবার সাধ মিটাইতে পাইলেন না। সকলেই অবগত আছেন যাহাতে তাঁহার প্রদত্ত এই ত্রিশ লক্ষ টাকার উপর গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজগণ ঐ কার্য্যে সাহায্য করিয়া উহাকে একটা আদর্শ শিক্ষাগার করিয়া তুলেন এই উদ্দেশ্যে টাটা গবর্ণমেণ্টের হস্তেই ইহার ভার দিয়াছিলেন। তিনি যদি নিজের খ্যাতি ও প্রশংসা লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, তাহা হইলে নিজেই ঐ অর্থে উল্লিখিত গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন। লেডী ডফারিণ ফণ্ড বা ঐরূপ ব্যাপারে অর্থ প্রদান করিয়া কত লোক কত প্রকারে সম্মান লাভ করেন, কিন্তু টাটার ভাগ্যে তাহা দূরে থাকুক তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতেও সমর্থ হইলেন না। মহীসুররাজ বাঙ্গালোরে এই বিজ্ঞান মন্দির সংস্থাপিত হইলে অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, টাটা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন-তাঁহার নিজে যশস্বী হইবার ইচ্ছা কখনই বলবতী ছিল না—গবর্ণমেণ্টও অর্থসাহায্য করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার উইলিয়াম রামজে এদেশে আসিয়া এ সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদানও করিলেন, তথাপি আজি পর্য্যন্ত এই শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল না। টাটা এজন্য যে সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা গবর্মেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থাবিষয়েও এপর্য্যন্ত কিছুমাত্র অগ্রসর হন নাই। এজন্য টাটা অনেকটা মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন এবং কে বলিতে পারে ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কতকটা কারণ নহে? যাহা হউক, শুনিতেছি গবর্মেণ্ট শীঘ্রই এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারা যদি তাহা

না করেন, টাটা বলিয়া গিয়াছেন তাহা হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ঐ অর্থ দ্বারা এদেশীয় যুবকদিগকে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ও অন্যবিধ বৈজ্ঞানিক বা শিল্প কার্য্য শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠাইতে পারিবেন। আমরা আশা করি গবর্মেণ্ট আর এ বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিবেন না। তাঁহাদিগের শৈথিল্য দেখিয়া অনেকে মনে করিতেছেন, এদেশীয়গণ শিল্প বিজ্ঞানে উন্নত প্রণালীর শিক্ষা লাভ করেন, ইহা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নহে। তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ দোষারোপ করিবার সুযোগ কেহ না পায়, সে পক্ষে দৃষ্টি রাখা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। গবর্মেণ্ট যেরূপ সর্ত্তে এই কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি নাই বলিয়াই যেন মনে হয়। যাহা হউক, এ পক্ষে সত্বর একটা সুব্যবস্থা করিয়া, তাঁহারা মহাত্মার এই প্রস্তাবিত কীর্ত্তি রক্ষা করেন ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

রাজনীতি।

টাটা দেশের রাজনৈতিক কার্য্যে সাধারণতঃ বড় একটা যোগ দিতেন না; সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষীয়ের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সদ্ভাব ছিল। কিন্তু যখন গবর্মেণ্টের কোনরূপ নীতিতে দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা দেখিতেন টাটা তখন তাঁহাদিগের সেই কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। যখন তাঁহারা মুদ্রা-আইন বিধিবদ্ধ করিয়া টাকশালে রৌপ্য মুদ্রাঙ্কণ বন্ধ করিয়া দেন, তখন টাটা তাঁহাদিগের সেই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্টের এই নীতিতে বোম্বায়ের কলজাত বস্ত্রশিল্পের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল, এই জন্যই টাটা ইহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ম্যাঞ্চেষ্টারজাত বস্ত্রের সহিত যাহাতে দেশী কলের বস্ত্র প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ না হয়, এজন্য গবর্মেণ্ট যখন দেশী কলজাত বস্ত্রের উপর মাশুল গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, টাটা তখনও তাহার গভীর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

উপসংহার।

যে সকল গুণে মানুষ প্রকৃত দেশহিতৈষী বলিয়া সর্ব্ব সাধারণে আদৃত হয়, টাটা সে সমস্ত গুণেই বিভূষিত ছিলেন। এক্ষণে সেই মহাত্মার বিয়োগে ভারতের যে অশেষ ক্ষতি সাধিত হইল তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীর এদেশে দুর্লভ। তাঁহার হৃদয় এত উচ্চ ছিল যে, জনসাধারণের অর্থশূন্য প্রশংসা লাভের জন্য তিনি কখনও চেষ্টা করেন নাই। আমাদিগের এই স্বল্পায়তন পত্রিকার মধ্যে তাঁহার সমগ্র চরিত্র বিস্তৃতরূপে বিবৃত করা অসম্ভব। তাঁহার সেই মহৎ চরিত্র ভারতের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে নিবদ্ধ থাকিবে। তিনি বিদেশে—সেই সুদূর জর্ম্মাণ রাজ্যের নহিম নগরে—কয়েকজনমাত্র নিকট আত্মীয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় চিরদিন তাঁহার অমরাত্মাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। তিনি অনন্ত কালের জন্য ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিবেন।

টাটা চিরজীবন নিজ চরিত্রে যে ধীরতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, মৃত্যুকালেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি শয্যাপার্শ্বস্থ পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাহাদিগকে কর্ত্তব্য বিষয়ে নানা উপদেশ প্রদান করিয়া, ধীরে ধীরে ভগবানে চিত্ত সমাধান করিয়া অনন্তধামে যাত্রা করিলেন। তাঁহার জন্য স্থান প্রস্তুত করিবার জন্যই যেন তাঁহার সাধ্বী পত্নী অল্পদিন পূর্ব্বেই মহাযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি যখন ইতালীতে ছিলেন তখন ভারত হইতে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু সংবাদ পান, কিন্তু সেজন্য কেহ তাঁহাকে তিলেকের জন্যও বিচলিত দেখে নাই। ঈশ্বর ও পরকালে তাঁহার যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মৃত্যু কালে তিনি তাহার সম্যক্ পরিচয় দিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন!

আমরা এক্ষণে প্রার্থনা করি ভগবান্ তাঁহার বংশধরগণকে সুমতি দিন যাহাতে তাঁহারা তাঁহার মহৎ চরিত্রের অনুকরণ করিয়া, দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন ও তাঁহার প্রারব্ধ অসম্পূর্ণ কর্ম্মগুলি সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় করিতে পারেন।

ভারতবাসীর দুরদৃষ্ট যে তাহাদের এই দারুণ জীবনসংগ্রামের দিনে এরূপ কর্ম্মবীরের তিরোধান হইল। ভগবান্ কি এই অভাগাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না?

তামাক।

ভারতবর্ষের সকল দেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজ অঞ্চলেই তামাক প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুবিখ্যাত লঙ্কা তামাক গোদাবরী এবং কৃষ্ণানদীর মুখস্থিত চড়ায় উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন বোম্বাই এবং ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানেও অল্পবিস্তর পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়। বঙ্গদেশে রঙ্গপুর এবং ত্রিহুত অঞ্চলের তামাক বাণিজ্যের জন্য উৎপাদিত হয়। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও তামাক চাষ হয় বটে, কিন্তু তাহা সচরাচর ব্যবসায়ের জন্য নহে। ঐ সকল তামাক ঘরেই ব্যবহার হয়।

তামাকের জন্য ক্ষেত্রের মাটি উত্তমরূপ গুঁড়া করা, ও জল নির্গম প্রণালীর ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু জমীতে অঙ্গারক অংশ অধিক পরিমাণে থাকিলে ভাল ফসল হয় না। যে সকল জমীর জল শোষণের এবং তাপ গ্রহণের ক্ষমতা উপযুক্ত পরিমাণে আছে, সেই প্রকার জমীতেই তামাকের চাষ করা শ্রেয়ঃ।

তামাকের ছাই হইতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যে সমুদয় পদার্থ পাওয়া যায় তৎসমুদয়ই তামাকের পক্ষে পুষ্টিকর সার। তামাকের সারের মধ্যে পটাশই সর্ব্ব প্রধান। পাতায় পটাসের মাত্রা উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলে পাতা উত্তমরূপ পুড়িয়া যায় এবং ছাই সাদা হয়। পক্ষান্তরে জমীতে পটাসের ভাগ না থাকিলে পাতা ভালরূপ দগ্ধ হয় না এবং ছাইও কাল হইয়া যায়। ফলতঃ যে সকল জমীতে পটাসের অংশ কম থাকে তাহাতে ভাল তামাক উৎপন্ন হয় না। পটাসিয়াম ক্লোরাইড্ (Potassium Chloride) সাররূপে ব্যবহার করিলে কোনও ফল দর্শে না। সচরাচর সল্‌ফেট্, কার্ব্বণেট, নাইট্রেট প্রভৃতি পটাসের যৌগিক ব্যবহারে উত্তম ফল দেখা গিয়াছে। তদ্ভিন্ন তামাক চাষের জন্য চুণ এবং ম্যাগনিসিয়াও প্রয়োজন হইয়া থাকে। দেশীয় কৃষকেরা তামাক চাষের জন্য গোবর সার এবং ভেড়ীর সারও ব্যবহার করে। এবং তদ্ভিন্ন আবর্জ্জনাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবর্জ্জনাতে এমোনিয়া এবং পটাসের অংশ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে বলিয়া তামাকের যথেষ্ট উপকার সাধন করে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে তামাকের চাষ প্রচুর পরিমাণে হয় বলিয়া তদ্দেশীয় চাষের প্রথা বর্ণিত হইল। উক্ত প্রদেশে সকল স্থানে এক সময়ে বীজ বপন করা হয় না। জল বায়ুর তারতম্যানুসারে আষাঢ় মাসের মধ্য হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্য পর্য্যন্ত বীজ বপন করার নির্দ্দিষ্ট সময়। কোন কোন স্থলে পৌষ মাসের মধ্যেও বীজ বপন করিয়া দ্বিতীয় ফসল উৎপাদন করা হয়। ক্ষেত্র উত্তমরূপ কর্ষণ করিয়া সার প্রয়োগ করিতে হয়। তার পর ঐ জমীতে ১ হাত কিম্বা ২ হাত অন্তর জুলি কাটা হয়, এবং ক্ষেত্র সমতল করিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়।

স্বতন্ত্র তলা ফেলিয়া বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হয়। বীজ ৭।৮ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয় এবং ১॥ মাসের মধ্যেই ৫।৬ অঙ্গুল বড় হইয়া উঠে। এই সময়েই কৃষকেরা চারা তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করে।

গাছ বড় হইলে তাহাদের ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, এবং ১০।১২টী পাতা রাখিয়া আর সমস্ত পাতা কাটিয়া ফেলিতে হয়। বীজের জন্য যে কয়েকটী ফুল রাখা আবশ্যক তাহা রাখিয়া অপর ফুলগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়।

গাছ তুলিয়া বসাইবার পর প্রায় দুই মাসের মধ্যে পাতা পাকিতে আরম্ভ করে। দুই একটী পাকিতে আরম্ভ করিলেই সমস্ত পাতা তুলিয়া ফেলিতে হয়। পাতা তোলা হইলে ডাঁটাসার গাছ হইতে সচরাচর দ্বিতীয়বার ফসল লওয়া হয় না। ফসল হইলেও উহা অতি নিকৃষ্ট জাতীয় তামাক হয়। তামাক রৌদ্রে দিয়া অথবা রৌদ্র এবং শিশির খাওয়াইয়া পাতা প্রস্তুত করিতে হয়। তামাকের পাতা শুকাইবার নিয়ম পরে বিবৃত হইল।

এইক্ষণে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বঙ্গদেশে প্রধানতঃ রঙ্গপুর, ত্রিহুত, পুর্ণিয়া, কুচবিহার, দ্বারভাঙ্গা, ২৪ পরগণা, চট্টগ্রাম এবং নদীয়া—এই সমস্ত অঞ্চলেই তামাকের রীতিমত চাষ হয়। সাধারণতঃ কৃষকেরা বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে তামাকের চাষ করে, তাহাতে চাষ এবং সার প্রভৃতি দেওয়ার অনেকটা সুবিধা হয়। বারাসতে পুরাণ নীল ক্ষেত্রে তামাকের চাষ হয়। শ্রাবণ মাসের মধ্য হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্য পর্য্যন্ত

তামাকের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। একমাস পরে চারা তুলিয়া ক্ষেত্রে বসাইতে হয়। এবং পৌষ মাসের মধ্য হইতে চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পাতা তুলিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। রঙ্গপুরের জমি তামাক চাষের পক্ষে উত্তম উপযোগী এবং তামাকও এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।. এই তামাক ব্রহ্মদেশ এবং কলিকাতায় রপ্তানি হইয়া থাকে। অপরাপর তামাকের মধ্যে কুচবিহারের তামাকেরও বেশ সুখ্যাতি আছে। বঙ্গদেশোৎপন্ন উৎকৃষ্ট তামাকের নাম হিঙ্গলী, ইহার মণ ৫৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। তামাক আমাদের দেশে হুঁকায়, পানের সহিত এবং নস্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে চুরুট প্রস্তুত করা হইলে তদপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে। চুরুটের জন্য পাতা প্রস্তুত করিতে হইলে অনেক যত্নের আবশ্যক। তামাক ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য আমরা নিম্ন লিখিত উপদেশগুলি দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিতেছি।

তামাকের পাতা পাকিলে এবং পাতার শিশির শুকাইলে কাটিয়া লইবে। পাতা একটী একটী করিয়া অথবা সমস্ত গাছগুলি একত্রে তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এক একটী করিয়া তুলিলে অবশ্য ভাল পাতা পাওয়া যাইবে। কিন্তু স্তূপ করিয়া রাখিয়া দিলে পাতার গন্ধ বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং ৯ ইঞ্চি পরিমাণ ডাঁটা রাখিয়া গাছগুলি কাটিয়া ফেলিবে। এবং তৎক্ষণাৎ উহা ছায়াতে রাখিয়া দিবে। যে ঘরে তামাক শুকাইতে হইবে তাহাতে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালন হওয়া আবশ্যক। দড়ি টাঙ্গাইয়া তামাক ঝুলাইয়া দিলে এক সপ্তাহের মধ্যেই পাতার রং বদলাইতে আরম্ভ হয় এবং মধ্য শিরা ব্যতীত পাতার অপরাপর অংশ প্রায়ই শুকাইয়া যায়। তামাক শুকাইবার পর তাহাকে ছাড়াইতে হয়। কাজের জন্য যত গুলি পাতার দরকার, শুধু সেইগুলি ছাড়াইবে। এই পাতা প্রাতঃকালে বাহির করিতে হয়; কারণ পাতা ঐ সময় রাত্রির শৈত্য শোষণ করিয়া নরম হইয়া থাকে। সেরূপ না হইলে মেজের জল ঢালিয়া, জলীয় বাষ্প লাগাইয়া অথবা ঘরে জলসিক্ত টাটি দিয়া পাতাগুলিকে নরম করিয়া লইবে। পাতা নরম না হইলে কদাপি ঘরের বাহির করিবে না। উল্লিখিতরূপে পাতা ছাড়াইবার পর গোছাইতে ও আটি বাঁধিতে হইবে। পাতাগুলি বাহির করিয়া চারিভাগে সাজাইতে হয়।—(১) উত্তম বর্ণবিশিষ্ট বড় পাতা। (২) প্রথমের ন্যায় পাত কিন্তু পাতা ছেঁড়া। (৩) নিকৃষ্ট পাতা এবং গাছের নিচের পাতা। (৪) অপর সমস্ত ছেঁড়া মুড় প্রভৃতি পাতা।

চারিজন বিভিন্ন লোক দ্বারা এইরূপে বাছাই কার্য্য করাইলে অতি সুচারুরূপে পাতা বিভাগ হইতে পারে। তামাকের পাতায় উত্তাপ দিবার জন্য পাতার উপরে পাতা চাপা দিয়া রাখিতে হয়। তাহাতে পাতাও বর্ণবিশিষ্ট হয়। এই সময়ে যাহাতে পাতার রং উৎকৃষ্ট হয় তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। পাতা অধিক মূল্যে বিক্রয়ের উপযোগী করিবার কয়েকটী উপায় নিম্নে লিখিত হইল;--(১) পাতা নরম করিবার জন্য পাতাগুলি চিনির জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয় অথবা চিনির জল ছিটাইয়া দিলেও হয়। (২) পাতার দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য জলে অথবা জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। গন্ধ যত অধিক খারাপ হইবে হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ সেইরূপ অধিক পরিমাণে দিতে হয়। কখনও কখনও চিনির জলে জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড মিশাইয়া ঐ জলে পাতা ভিজান কর্ত্তব্য। (৩) পাতা হইতে তৈলের অংশ বাহির করিয়া লইতে হইলে মদে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। পাতা ঈষৎ লাল অথবা পীতবর্ণ করিবার নিমিত্ত গন্ধকের ধূঁয়া অথবা ঐ জাতীয় রং দেওয়া যাইতে পারে। (৪) বিশেষ কোন গন্ধযুক্ত করিতে হইলে, চিনি, লেবু তেল, ক্লোভ, ল্যাভেণ্ডার, লেবু প্রভৃতি অনেকানেক দ্রব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (৫) চুরুট যাহাতে ভালরূপ পোড়ে তজ্জন্য যবক্ষার (Carbonate of Potash), এসিটেট অব্ পটাস্ (Acetate of Potash), এসিটেট অব্ লাইম্ (Acetate of lime) এবং সোরা এই কয়েকটীর মধ্যে কোন একটীকে জলে দ্রব করিয়া সেই জলে তামাক পাতা ভিজাইয়া রাখিতে হয়, অথবা সেই জল পাতায় ছিটাইয়া দিতে হয়।

শ্রীহরিদাস মিত্র, বি, এল।

উদ্ভিদ্ জাতি।

কাণ্ড।

(২)

লতানে গাছ যখন অঙ্কুর হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন তাহাকে খাড়া গাছ হইতে বিভিন্ন করা যায় না। খানিকটা বাড়িয়া গেলে পর তাহাদের গোড়া আর দাঁড়াইতে পারে না, এক দিকে হেলিয়া যায় এবং পার্শ্বস্থিত কোন পদার্থকে অবলম্বন করিয়া থাকে। যদ্যপি মাঠের মধ্যে ইহা জন্মে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে কোন অবলম্বন না থাকে তাহা হইলে ইহা হেলিয়া পড়িয়া মাটি স্পর্শ করে, এবং গড়ানে গাছের ন্যায় মাটির উপর গড়াইতে থাকে ; কিন্তু কোনরূপ আশ্রয় অবলম্বন পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং পার্শ্ব হইতে শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া সেই অবলম্বন সাহায্যে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

কোন অবলম্বনকে ধরিতে গেলে ইহারা নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করে। প্রধানতঃ ইহাদের কাণ্ডে নানা বিভিন্ন আকারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভূত হয়। অথবা ইহাদের কাণ্ড প্রয়োজনানুযায়ী বিকৃত হইয়া যায়। শুঙই (tendril) গাছকে জড়াইয়া উঠিতে প্রধানরূপে সাহায্য করে। ইহা শাখার বা পত্রের বা পত্রের প্রধান শিরার বিকৃত অবস্থা মাত্র। তদ্ভিন্ন কখনও কখনও শাখা ও পত্র নানারূপে গাছকে জড়াইতে সাহায্য করে। গাছের কাণ্ড কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করিতে পারিলে তাহাদের ডগাটী ঘড়ির কাঁটার ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতে থাকে এবং শুঙাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা নিজের অবস্থা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া লয়। নানা প্রকারে লতাইবার ক্ষমতানুসারে লতানে গাছকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম জাতীয় লতানে গাছ প্রথমতঃ খাড়া হইয়া উঠিয়া পরে কোন আশ্রয় পাইলে তাহা অবলম্বন করিয়া যতদূর সম্ভব উঠিয়া যায়। যখন আর উপরে উঠিবার উপায় নাই, তখন তাহা গোড়া হইতে কঠিন হইয়া আইসে এবং তাহার আশে পাশে শাখা প্রশাখা নির্গত হইতে থাকে। এই শাখা প্রশাখাও পূর্ব্ববৎ যতদূর সম্ভব উপরে উঠিয়া পুনরায় নূতন শাখা প্রশাখা উদ্ভূত করে। এইরূপে ক্রমাগত শাখার বৃদ্ধির পর গাছটী জালের ন্যায় বুনান হইয়া যায়। তখন তাহা টানিয়া ছেঁড়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। যদ্যপি এইরূপ লতানে গাছ কোন অবলম্বন না পায় তাহা হইলে তাহা ঐরূপে বাড়িতে থাকে বটে কিন্তু আশ্রয় অভাবে লম্বা হইয়া যাইতে পারে না। এই জাতীয় গাছ আমাদের বেড়ার গাঁয়ে প্রায়ই দেখা যায়।

প্রায়ই দেখা যায় যে, বেড়ার ধারে যে সকল এইরূপ লতানে গাছ জন্মে তাহারা যেন মানুষের উপকারের জন্যই ছোট্ ছোট বাঁকা কাঁটায় পূর্ণ। এই কাঁটা দ্বারা লতাগুলির অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা তাহারা আশ্রয়কে সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে। কেবল সমস্ত ডালে নয়, পাতার বোঁটা পর্য্যন্ত কাঁটায় ভরা থাকে। যাঁহারা সেঁকুল লতা দেখিয়াছেন তাঁহারা এবিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন। প্রায় দেখা যায় যে এই সকল গাছের পাতার ধারগুলিও করাতের দাঁতের ন্যায় কাটা কাটা এবং তাহারা কখনও কখনও এত ছুঁচাল হয় যে হাতে বিঁধিয়া যাইতে পারে। এই সকল কাঁটা লতার অবলম্বন ক্রিয়ায় সাহায্য প্রদান ব্যতীত পশ্বাদি অন্যান্য প্রাণী হইতে গাছ ও গাছের পাতাকে বাঁচাইবার উপায় স্বরূপ হয় এবং কখনও কখনও নানা প্রকার পোকার কামড় হইতে ফুল ও ফলকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি লতানে গাছে প্রথম জাতীয়ের ন্যায় ডাল পালা গুলি বুননের মত পরস্পর জড়াইয়া যায় না। এই জাতীয় লতা প্রথমের ন্যায় বাড়িয়া কোন অবলম্বন পাইলে তাহা আঁকড়াইয়া ধরে না। কেবল তাহার গায়ে ঠেস দিয়া উঠিতে থাকে। ইহারা শিকড় বা শুঁড় চালান প্রভৃতির দ্বারা আশ্রয়দাতার কোন অনিষ্ঠ করে না, কেবল মাত্র শাখা প্রশাখার দ্বারা আশ্রয়কে বেষ্টন করিয়া ফেলে। অনেক সাহেবদের বাটীতে দেখা যায় যে এই জাতীয় লতা কোন প্রকাণ্ড বৃক্ষের গুঁড়ির চতুষ্পার্শ্বে জন্মিয়া সমুদয় কাণ্ডটীকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। আইভি লতাকে এই জাতীয় লতা বলা যাইতে পারে। এই জাতীয় লতা প্রায়ই পাহাড়ের ধারে জন্মে এবং পাহাড়ের গায়ে ঠেস

দিয়া বাড়িতে থাকে। এই জাতীয় লতার গায়ে প্রায় কাঁটা হয় না এবং পাতাগুলি বড় বড় ও কোমল হইয়া থাকে। গাছের গুঁড়ির উপর যে সকল লতা জন্মে প্রায়ই তাহাদিগের শাখাগুলি উপর উপর সজ্জিত থাকায় গাছের বৃদ্ধি হেতু নীচেকার শাখাগুলি পিশিয়া গিয়া মরিয়া যায়।

তৃতীয় জাতীয় লতাকে গাছগুলিকে জড়ানে গাছ বলা যায়। ইহারা পার্শ্বস্থিত অবলম্বন সাহায্যে অনেক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। অরণ্যে ইহারা দাঁড়ানে বৃক্ষের সাহায্যেই ঊর্দ্ধে উঠে, কিন্তু ক্ষেত্রে বা বাগানে আমাদিগকে তাহাদের জন্য কাটি পুতিয়াই হউক বা দড়ি ঝুলাইয়াই হউক একটা অবলম্বন করিয়া দিতে হয়; এবং পরে ছাতে বা মাচায় বা কোন আলোকপূর্ণ স্থানে উঠাইয়া দিলে তাহারা আপনার আহারের সংস্থান করিয়া লয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, অবলম্বন যত সরু হইবে জড়ানে লতা তত শীঘ্র বাড়িতে পারিবে এবং আরও দেখা যায় যে পাশে পাশে মোটা ও সরু দুইটী অবলম্বন থাকিলে লতাটী সরুটীরই আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, লতা অপেক্ষাকৃত মোটা গুঁড়ি বেষ্টন করিয়া উঠিয়াছে, অবশ্য তখন বুঝিতে হইবে যে লতা উঠিবার কালে গুঁড়ি অপেক্ষাকৃত সরু ছিল। যখন অবলম্বন বৃদ্ধি পাইয়া মোটা হইয়া আইসে তখন হতভাগ্য লতা সেই চাড় সহ্য করিতে না পারিয়া ছিঁড়িয়া গিয়া থাকে। কিন্তু যদ্যপি লতা অপেক্ষাকৃত সবল ও বহু পুরাতন হয় তাহা হইলে তাহার গোড়া শক্ত হইয়া যায় এবং আশ্রয়দাতা বৃক্ষের বৃদ্ধি সত্বেও তাহা ছিঁড়িয়া যায় না, বরং যে স্থান দিয়া লতাটী জড়াইয়া যায়, বৃক্ষের সেই স্থানগুলি বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এই জন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, এইরূপ লতা কোন বৃক্ষে আশ্রয় লইলে, লতার বেষ্টন অনুযায়ী বৃক্ষে একটা গভীর খাঁজ পড়িয়া যায় এবং অনেক সময় এইরূপে বৃক্ষের রস চলাচলের পথ রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষের তাদৃশ বৃদ্ধি বা ফল ফুল হয় না; এমন কি কখনও কখনও এইরূপে অনাহারে বৃক্ষকে শুকাইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

যে সকল লতা এক বৎসর কাল বাঁচিয়া থাকে যেমন আমাদের লাউ বা কুমড়া, তাহারা বিশেষ কারণ বশতই মোটা অবলম্বন গ্রহণ করে না।

ইহাদের স্বল্প পরমায়ুর মধ্যে ইহাদিগকে বাড়িতে হইবে, ফুল ও ফল উৎপাদন করিতে হইবে, অথচ তাহাদিকে একটু ঊর্দ্ধে উঠিয়া পত্রের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে মোটা অবলম্বন আশ্রয় করিলে অনেকটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে হইবে এবং ঘুরিবার জন্য ডাঁটাকে যে টুকু বাড়িতে হইবে সেই টুকু বাড়িবার জন্য অনেকটা আহার, সময় এবং ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই অকারণ ক্ষতির হাত হইতে এড়াইবার জন্য ইহারা যথাসম্ভব সরু অবলম্বন আশ্রয় করিয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র উপরে উঠিতে সক্ষম হয়।

জড়ানে লতার গোড়া অন্ততঃ প্রথম গাঁট পর্য্যন্ত ঠিক খাড়া হইয়া উঠে, তাহার পরের অংশগুলি সময়ে হেলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ইহারা ঠিক ঘড়ির কাঁটার ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে উঠে। ঘুরিবার সময়টুকু নিতান্ত অল্প নয়। জগদ্বিখ্যাত প্রফেসার ডারউইন এই ঘুরিবার সময় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গরম হাওয়ায় একটী 'হপ'লতা আলোক হইতে অন্ধকারে আসিতে যে অর্দ্ধবৃত্ত ঘুরিয়া আইসে তাহাতে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট লাগিয়াছে এবং অন্ধকার হইতে আলোকে অপরার্দ্ধবৃত্ত করিতে ১ঘণ্টা ১৩ মিনিট লাগিয়াছে। এইরূপ একটী সীম লতা ১ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে একটী পূর্ণবৃত্ত আঁকিতে পারে।

এইরূপ বৃত্তাকারে পরিবর্ত্তন করার নাম বৃত্তভ্রমণ (circumnutation)। লতার একধারে রৌদ্র বা উত্তাপাধিক্য হেতু সেই দিকে পূর্ণ বৃদ্ধি হয় এবং অপরদিকে তত বাড়িতে পারে না; এই জন্য যে দিক বাড়িতে পারে না সেই দিকে বাঁকিয়া গিয়া লতার ডাঁটাটী বাঁকিয়া যায়। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, যে ডাঁটার এক ধার বৃদ্ধি হইতেছে না, তাহাও বাঁকিয়া গিয়াছে; এই জন্য মনে হয় কেবল মাত্র বাহ্য প্রকৃতির প্রতাপ ব্যতীত কোষের অভ্যন্তরস্থ প্রোটোপ্লাসমের কোনরূপ পরিবর্ত্তনে এইরূপ রূপান্তর হইয়া থাকে।

দেখা যায় যে হপ্ প্রভৃতি কতকগুলি জড়ানে লতা প্রায় পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণদিক দিয়া পশ্চিম ধারে ঘুরিয়া আইসে এই জন্য এইরূপ ঘোরাকে (dextrose) দক্ষিণাবর্ত্তন বলা যায়। স্কার্লেট-

রানার জাতীয় লতা পূর্ব্ব হইতে উত্তরদিক দিয়া পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া আইসে এই কারণ এই ঘোরার নাম বামাবর্ত্তন (sinistrose)। বিভিন্ন প্রকার লতায় এই বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায়, ইহা বাহ্য প্রকৃতির নিয়মাধীন নহে। বাহ্য উত্তাপ, রৌদ্র বা জল ডাঁটার এপিটে বা ওপিটে লাগিয়া এইরূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না। ইহা জাতিগত গুণ। যে লতা যে জাতীয়, তাহার পরিবর্ত্তন সেই দিক দিয়াই হইবে। যদি জোর করিয়া তাহার বিপরীত দিকে দড়ি দিয়া ডাঁটাকে বাঁধিয়া রাখা যায় তথাপিও সে সেই দিকেই ফিরিবে। এইরূপ ডাঁটার একগুঁয়েমি কোষের অন্তস্থিত প্রটোপ্লাস্‌মের কার্য্য। ইহারা পূর্ব্বপুরুষ হইতে যে গুণ টুকু পাইয়া আসিয়াছে সে টুকু ত্যাগ করিতে পারে না। এই জন্যই আমরা একস্থানে দুইটী লতা এক নৈসর্গিক নিয়মাধীনে রাখিয়াও দুই দিকে জড়াইয়া উঠিতে দেখিতে পাই।

কোন লতাকে উপর দিকে উঠিতে হইলে তাহার জন্য একটা খাড়া অবলম্বন প্রয়োজন। যদ্যপি লতাটী অবলম্বন না খুঁজিয়া পায় তাহা হইলে ইহা প্রথমে শূন্যে ঘুরিয়া তাহার অন্বেষণ করে এবং যদি অবলম্বন না পায় তবে লতার মাঝখানটা ভূমিতে লুটিয়া পড়ে এবং ডগাটী পুনরায় ঘাড় উঁচু করিয়া অবলম্বনের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ মাটিতে লুটিয়া পড়ায় ডগাটী অনেকটা দূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিতে পারে এবং যতক্ষণ না অবলম্বন লাভে সমর্থ হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপে বাড়িতে থাকে। অনেকের ধারণা আছে যে লতার সহিত ইহার অবলম্বনের একটা গুপ্ত আকর্ষণ আছে; তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লতাটী আশ্রয়কে ধরিয়া লয়। যদিও সাদা চোখে আমরা সেইরূপ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐরূপ কোন আকর্ষণের অস্তিত্ব নাই। লতাটী হাতড়াইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একটা আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। ইহা সম্পূর্ণ দৈবের কর্ম্ম।

একটা দড়িতে ঢিল বাঁধিয়া সেটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে যদি হঠাৎ কোন খুঁটিতে আটকাইয়া যায় তাহা হইলে ঐরূপ ঢিল বাঁধা দড়িটী খোঁটার গায়ে ইস্‌ক্রুপের মত জড়াইয়া যায়, তেমনি যখন লতার ডগাটী ঘুরিতে ঘুরিতে একটা অবলম্বনের গায়ে ঠেকিয়া যায় অমনি ইহা তাহাকে আকৃষ্ট করে এবং তাহার গায়ে লাগিয়া বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ইহার গায়ে সাপের ন্যায় জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতে থাকে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে লতার কাছে যদি একটা কাটি ঠিক সোজা করিয়া পুতিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে লতাটী ভাল করিয়া জড়াইয়া উঠিতে পারে এবং কাটিটী সামান্য হেলাইয়া দিলেও (৪৫° কোণ হইলেও) লতার উঠিবার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যদ্যপি কাটি এড়ো করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে লতাটী আর তাহাকে জড়ায় না তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায় মাত্র।

একটী লতা একটা অবলম্বনকে জড়াইয়া উঠিলে দেখা যায় যে লতার প্রান্ত ভাগের ফেরগুলি গোড়ার অপেক্ষা অধিক ঘন ঘন এবং অনেকটা এড়ো ভাবে থাকে। কিন্তু যেমন লতাটী বৃদ্ধি পায়, তত ফেরগুলি ফাঁক ফাঁক ও হেলিয়া যায়। কখনও কখনও দেখা যায় যে লতাটী একটা অবলম্বনের চতুর্দ্দিকে সাপের ন্যায় জড়াইয়াছে বটে কিন্তু ডাঁটা নিজে পাক খাইয়াগিয়াছে। ইহাতে আকর্ষণের অধিক জোর হইয়া থাকে। যেমন একগাছা দড়ি পাকাইয়া একটা খুঁটির চারিধারে জড়াইলে ইহা না পাকান দড়ির জড়ান অপেক্ষা অধিক জোরে খোঁটাকে কামড়াইয়া থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় যে সীম বরবটী প্রভৃতি লতাতে ঘন ক্ষুদ্র কেশরাজির দ্বারা ডাঁটাটী পূর্ণ। এই সকল কেশ ডাঁটাকে অবলম্বনের সহিত আটকাইতে সাহায্য করিয়া থাকে।

চতুর্থ জাতীয় লতানে গাছ শোঁয়া দ্বারা অবলম্বন আশ্রয় করিয়া উঠিতে পারে। শোঁয়া গুলি কখনও অতি কোমল কখনও বা ঈষৎ কঠিন হয় এবং দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকিতে পারে। ইহারা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, কোন অবলম্বনের সংস্পর্শে আসিলেই তাহাকে ধরিতে সমর্থ হয়। কোন অবলম্বন ধরিবার পূর্ব্বে ইহা সোজা থাকে, কিন্তু ধরিবার পর বাঁকিয়া যায়। প্রথমে ইহারা বাতাসে ইতস্ততঃ দুলিতে থাকে এবং কোন কঠিন অবলম্বনের সংস্পর্শে আসিলেই ইহাদের বড়শির মত

ঠোঁটটি দ্বারা তাহা আটকাইয়া ধরে এবং অপর অংশগুলি তাহাকে জড়াইয়া ফেলে। দুচার পাক জড়াইয়া বেশ দৃঢ় করিয়া অবলম্বনকে ধরিয়া, পরে ইহা নিজে নিজে ইস্ক্রুর মত জড়াইয়া যায়। তাহাতে লতাটি অবলম্বনের দিকে নীত হয়।

শোঁয়া গুলি প্রায়ই লতার ডগার দিকে প্রত্যেক গাঁটের এক বা উভয় পার্শ্ব হইতে নির্গত হয়। লতার গোড়ার দিকে শুণ্ড প্রায়ই দেখা যায় না। অনেকগুলি শোঁয়ার আবশ্যকতা এই যে যদি কোন কারণে একটা ছিঁড়িয়া যায়, অপরটি লতাকে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। এই কারণে শোঁয়া দ্বারা যে সকল লতা উর্দ্ধে উঠে তাহাদের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। আরও, ইহাদিগের প্রভাবে লতাটী মোটা গুঁড়ি বা দেয়ালের চারিদিক দিয়া না ঘুরিয়া অনায়াসেই উঠিতে সমর্থ হয়। কারণ শোঁয়াগুলি গুঁড়ির বা দেয়ালের সামান্য গাঁট বা ঢিবি পাইলে তাহার চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া একটা অবলম্বন করিয়া লয়। এই কারণে অন্যান্য লতা অপেক্ষা শুণ্ডযুক্ত লতার এই বিশেষত্ব, যে, ইহা অল্প বাড়িয়াই জড়ানে লতার ন্যায় সমান উচ্চে উঠিতে পারে। অতএব একই ফল লাভের জন্য ইহাকে জড়ানে লতাপেক্ষা অল্প খাদ্য খরচ করিতে হয়।

যদিও লতাকে ধারণ ও উর্দ্ধে উঠিতে সাহায্য করণ ব্যতীত সমস্ত শুণ্ডের কার্য্য আর কিছুই নহে তথাপি ইহারা লতার নানা স্থান হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ ইহারা পাতার কোণ হইতে উপত্বণের (Stipules) বিকৃতাবস্থা হইয়া জন্মিতে পারে। কুমুরকি, মুহেশ (Smilax) লতার শোঁয়া এই জাতীয়। কখনও কখনও এই শোঁয়ারও ডাল পালা নির্গত হইতে পারে। সাধারণতঃ শুণ্ড প্রায়ই পত্রের বিকৃতাবস্থা মাত্র। ইহারও আবার প্রকার আছে। হয় ত সমস্ত পত্রটাই বিকৃত হইয়া শোঁয়া হইয়া যাইতে পারে। লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, করলা প্রভৃতিতে ইহা দেখা যায়। অথবা অনেক গুলি পাতার সমষ্টির মধ্যে একটী পাতা বিকৃত হইতে পারে, যেমন কড়াইশুঁটীতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রায় শেষ পাতাটীরই বিকার হয়। কিন্তু পাতার সংখ্যা কমিয়া যাইলে খাদ্যাহরণের উপায়ও কমিয়া যাইবে বলিয়া শোঁয়ার নীচেকার পাতা গুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও পুরু হইয়া অধিক পরিমাণ খাদ্যাহরণে সক্ষম হইয়া থাকে।

কতকগুলি লতার শোঁয়া শাখার বিকৃতাবস্থা মাত্র। তাহারা আবার পুষ্পবাহী শাখার বা পত্রবাহী শাখার অবস্থান্তর হইতে পারে। প্রথমোক্ত শোঁয়া দ্রাক্ষালতায় দেখা যায়। এবং তরমুজ জাতীয় লতায় দ্বিতীয় প্রকার শোঁয়া দেখা যায়। কখনও কখনও ইহা ঠিক পাতার গাঁট হইতে উৎপন্ন না হইয়া একটু উপরে বা নীচে নামিয়া যায়। তখন তাহাকে পাতার বিকৃতাবস্থা বলিয়া ভ্রম হয়।

তন্ত যাহারই বিকৃতাবস্থা হউক না কেন, তাহাদিগের কার্য্য প্রণালী একই প্রকার। ইহাদের ডগাটী একটু বাঁকা এবং সূক্ষ্ম অনুভব শক্তি বিশিষ্ট। এই অনুভব শক্তির দ্বারা ইহা প্রথমে কোন অবলম্বনের দিকে ধাবিত হয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণও এই বিষয়ে অনেকটা সাহায্য করিয়া থাকে। এই দুই কারণে অবলম্বনের সহিত শোঁয়াটী জড়াইয়া যায় এবং শোঁয়ার গোড়াকার অংশটুকুও আপনাআপনি ইস্ক্রুর মত জড়াইয়া যায়; তাহাতে শোঁয়ার পরিমাণ ছোট হইয়া আইসে এবং অনায়াসেই লতার কাণ্ডকে অবলম্বনের দিকে টানিয়া লইতে সক্ষম হয়।

কখনও কখনও শোঁয়ার পরিবর্ত্তে পত্রের মধ্যশিরা ক্রমাগত বাড়িয়া শোঁয়ার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। ঐ সকল লতায় আর অন্য শোঁয়া হয় না। পত্রই অন্যান্য কার্য্যের উপর লতার অবলম্বন কার্য্যে সহায়তা করে।

পঞ্চম প্রকার লতানে গাছ, বিক্ষিপ্ত মূল দ্বারা অপর বৃক্ষের ত্বকে বা দেয়ালের ফাটালে আটকাইয়া, উপরে উঠিয়া থাকে। তাহাদিগের দুই প্রকার মূল দেখা যায়। প্রথম প্রকার কেবল মাত্র গাছকে অন্য অবলম্বন সাহায্যে উপরে তুলিয়া থাকে, এবং দ্বিতীয় প্রকার কেবল মাত্র গাছের খাদ্যাহরণে তৎপর হইয়া থাকে। এই দুইটী কার্য্য এক প্রকার মূল দ্বারা সম্ভব হয় না। কিন্তু দুই এক প্রকার গাছে, যে মূল গাছকে উপরে তুলিয়া থাকে, তাহা খাদ্য পূর্ণ স্থান খুঁজিয়া পাইলে তাহা হইতে খাদ্যাহরণে পটু হইয়া থাকে।

মূলদ্বারা যে গাছ উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে তাহা

শোঁয়াসম্পন্ন গাছের সহিত এই বিষয়ে সমকক্ষ, যে, উভয় পক্ষেরই অবলম্বন কে আকর্ষণ করিবার অঙ্গ, মূল বা শোঁয়া, অন্ধকার খুঁজিয়া বেড়ায় এবং উভয়েরই বাহিরেকার কোষগুলি হইতে এক প্রকার চট্‌চটে আটা নির্গত হইয়া অবলম্বনের সহিত কঠিন ভাবে আটকাইয়া যায়। মূলের অন্ধকার অন্বেষণের এই ফল হয় যে, লতাকে আলোকে রাখিয়া ইহা গাছের বা কোন দেয়ালের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফাটালের ভিতর প্রবেশ করিয়া অতি দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইতে পারে। ইহা এত দৃঢ় ভাবে বদ্ধ হয় যে, জোর করিয়া লতাটীকে টানিলে মূলের গোড়ার অংশ ছিঁড়িয়া আসিবে কিন্তু মূলটী সমস্ত বাহির হইয়া আসিবে না।

মূল গুলি কখনও কখনও ভুঁই ডুমুরের মত একটী একটী ফেঁকড়ী হইয়া, অথবা শাখা প্রশাখার দ্বারা ঝাড় বাঁধিয়া থাকে। হিমালয় প্রদেশে এক প্রকার লতা আছে তাহা আশ্রিত বৃক্ষের সমুদয় কাণ্ডটী মূল দ্বারা আঁকড়াইয়া থাকে, এবং লতার বৃদ্ধির সহিত মূলও বাড়িতে থাকে; মানুষের হাতের ন্যায় উহা মোটা হইতেও দেখা গিয়াছে। এই সকল মূল যদিও বৃক্ষের খাদ্য শোষণ করে না কিন্তু উহারা এত জোরে আঁকড়াইয়া থাকে যে বৃক্ষের বৃদ্ধির সময় প্রচুর খাদ্য গমনাগমনের পথ বদ্ধ হওয়ায় বৃক্ষ মরিয়া যায়।

দাঁড়ানে কাণ্ড সাধারণ বৃক্ষে দেখা যায়। বৃক্ষ বলিলে আমরা দাঁড়ানে গাছ বুঝিয়া থাকি। গাছের উচ্চতা হিসাবে বৃক্ষকে বিভক্ত করা যায়। যে সকল গাছের কাণ্ড কাষ্ঠে পরিণত হয় না—অর্থাৎ যে গাছ হইতে কাষ্ঠ বাহির হয় না—এবং যাহা আজীবন একটা কোমল সবুজবর্ণ ত্বকে আচ্ছাদিত থাকে, তাহাকে আমরা সাধারণতঃ গুল্ম বলিয়া থাকি। গুল্মগুলি সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অধিক উচ্চ হয় না। কামিনী, ক্রোটন প্রভৃতিকে গুল্ম বলা যায়। গুল্মের আবার ভাগ হইয়া থাকে, তাহাকে আমরা সাধারণতঃ ঝোপ বা ঝাড় বলি। যে সকল গুল্ম অতিশয় ছোট, যাহা এক বা দুই হস্ত অপেক্ষা অধিক উর্দ্ধে উঠে না তাহাই ঝোপ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, যেমন নটে শাক প্রভৃতি।

বৃক্ষের প্রকৃতিই এই যে, বয়সের সহিত তাহার আকার বৃদ্ধি পাইবে এবং কাণ্ডের বাহ্যাবরণ ক্রমশই কাষ্ঠবৎ হইয়া আসিবে। বৃক্ষের উচ্চতা অবশ্য বৃক্ষ বিশেষের জাতীয় স্বভাব এবং তাহার চারিদিকের বাহ্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

আমরা প্রায়ই দেখিতেপাই যে, আম বা অশ্বত্থ বৃক্ষ যদিও ঝাউ বা দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় অত উচ্চ হয় না, কিন্তু তাহাদের পরিধি ঝাউ বা দেবদারু অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার একটী মূল কারণ এই যে, যে সকল বৃক্ষের পাতা অপেক্ষাকৃত বড় এবং পুরু তাহারা প্রায়ই ছড়াইয়া পড়ে, কারণ উপরের ডালপালা গুলি বৃদ্ধি পাইয়া ঝোপ প্রস্তুত করিলে তাহার মধ্য দিয়া আলোক প্রবেশ করিয়া নিম্নস্থ পাতা গুলিতে লাগিতে পারে না। এই জন্য নিম্নস্থ পাতাগুলিতে আলোক লাগাইবার জন্য ডাল গুলিকে বাড়িয়া গিয়া উপরিস্থ ডাল পালার পরিধি ছাড়াইয়া যাইতে হয় এবং কাজে কাজেই বৃক্ষটী পরিধিতে বাড়িয়া যায়। কিন্তু ঝাউ বা দেবদারু বৃক্ষের পাতা অপেক্ষাকৃত সরু ও ছোট সুতরাং তাহাদের মধ্য দিয়া অনায়াসেই আলোক আসিয়া নীচেকার পাতা গুলিতে লাগিয়া তাহাদিগকে পুষ্ট করিতে পারে।

শাখা প্রশাখার বৃদ্ধির সহিত বৃক্ষের ভার বৃদ্ধি হয় বলিয়া কাণ্ডকেও সেই ভারবহনের উপযোগী বলিষ্ঠ হইতে হয়। প্রতিবৎসর মজ্জার চতুস্পার্শে এক এক থাক কাষ্ঠাংশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহার থাক এরূপ সুসজ্জিত এবং নিয়মবদ্ধ যে এই থাক গণিয়া বৃক্ষের বয়সের মীমাংসা করা যাইতে পারে। একটী বাবলার গুঁড়িকে কাটিয়া ফেলিলে এই থাক স্পষ্ট দেখা যায়। বৃক্ষের বৃদ্ধির সহিত কাণ্ডের ত্বকেরও বিকৃতি হইয়া থাকে। সবুজ বর্ণ ত্বক্ খসিয়া বা ফাটিয়া গিয়া শুকাইয়া যায়। তাহার নিম্ন স্তরের বর্দ্ধিতাংশ একটী কর্কের থাক প্রস্তুত করিয়া ফেলে এবং তাহাদ্বারা সমস্ত কাণ্ডটী আবৃত হইয়া যায়। এই কর্কের থাকের মধ্য দিয়া বায়ু বা জল প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া বৃক্ষের আভ্যন্তরিক কোমলতর অংশ গুলি বাহ্য প্রকৃতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই কর্ক অতিশয় কঠিন এই জন্য দুশ্ছেদ্য। কর্কের থাক হইতে যে সকল শুষ্ক বা অর্দ্ধমৃত থাক উপরে লাগিয়া থাকে তাহাই সাধরণতঃ 'ছাল' বলিয়া অভিহিত হয়।

এই ছাল বৃক্ষ বিশেষে নানা প্রকার হইয়া থাকে। কোন গুলি মাঝে মাঝে ফাটিয়া চটিয়া যায়। বাদাম গাছে এইরূপ ছাল দেখা যায়। কতক গুলি পাতলা ছাল খোসার মত মাঝে মাঝে উঠিয়া যায় এবং পরে তাহার স্থানে নূতন ছাল নির্ম্মিত হয়। পেয়ারা, চালৃদা, গাছে এই জাতীয় ছাল অনেক দেখা যায়। দ্রাক্ষা গাছের ছাল সূতার ন্যায় খসিয়া আইসে। অশ্বত্থ বা বটগাছে কাণ্ডের বৃদ্ধির সহিত ছাল গুলি ইতস্ততঃ নানা ভাবে ফাটিয়া যায় কিন্তু ছাল খসিয়া আইসে না। এই সকল ফাটার মধ্যে প্রায় পরগাছা আশ্রয় করিয়া থাকে। আমগাছে 'কাণচটা' ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বৃক্ষের উচ্চতার বিভিন্নতার কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। একটী বৃক্ষ উচ্চে কত হইবে তাহা বলা যায় না। তবে বিভিন্ন প্রকার জীবের ন্যায় বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষও নানা প্রকার উচ্চতাবিশিষ্ট ও অল্লাধিক বৎসর জীবিত থাকে। অরটোভা প্রদেশের ড্রাগন বৃক্ষের বয়স ছয় সহস্র বৎসর বলিয়া কথিত আছে। ওক গাছ দুই সহস্র বৎসর বাঁচিতে পারে। আমাদের দেশে শাল অশ্বত্থ ও বট অনেক কাল ধরিয়া বাঁচিতে পারে।

একটী পিপারমেণ্ট গাছ ৪০০ শত হস্ত উচ্চ হইতে পারে। আরিজোনা প্রদেশে মনুস্য গাছ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তথায় একটী মনুস্য গাছ আছে তাহার উচ্চতা ১৫৪ হস্ত। আমাদের নারিকেল গাছ ৯৬ ও তাল ৯০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে।

শ্রীবিরিঞ্চিমোহন কর।

পুরাতন অক্ষর বিক্রয়।

কার্পাসের পরীক্ষা

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যেরূপ উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন হইত এখন আর সেরূপ হয় না। এদেশের কার্পাসই জগতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। ইতিহাসে দেখা যায় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আরবেরা এদেশ হইতে কার্পাস লইয়া গ্রীসদেশে বিক্রয় করিতেন। দাক্ষিণাত্যের ব্রোচ নামক স্থানের কার্পাস সে সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন এদেশে কার্পাস জন্মিত, সেইরূপ কার্পাসসূত্র ও বস্ত্রাদিও প্রস্তুত হইত। ঢাকার মসলিন গ্রীসদেশে "গঙ্গীতিকী" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উহা অনুগাঙ্গ প্রদেশ জাত বলিয়াই গ্রীকেরা উহাকে ঐ নামে অভিহিত করিয়াছিল। এদেশ জাত কার্পাস বীজ হইতেই চীন, জাপান ও ফর্ম্মোজা দ্বীপে কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সকল দেশে নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে কার্পাস গাছ কেহ দেখে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কার্পাস বস্ত্র বয়ন প্রথম আরম্ভ হয়। যে আমেরিকার তুলা এক্ষণে য়ুরোপীয় বস্ত্রশিল্পীদিগের প্রধান ভরসা স্থল সেই আমেরিকায় ১৬২১ খৃষ্টাব্দে কার্পাসের চাষ আরম্ভ হয়। লেভেণ্ট দ্বীপ হইতে আসিয়ার কার্পাস বীজ লইয়া গিয়া মার্কিণেরা বপন করেন। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভারতই জগতের সমুদয় কার্পাসের জননী। কিন্তু ভারতের সভ্যতা যেমন ইদানীং হীন দশাপন্ন হইয়াছে, তেমনই ভারতের কৃষি শিল্পেরও হীনদশা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু যদিও প্রায় সহস্র বৎসর হইল ভারতের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এক শতাব্দী পূর্ব্বেও এখানকার শিল্পাদি অক্ষুণ্ণভাবে আপনার গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ৫০ বৎসর কালে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য নীতি ভারতীয় শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে। অধিক দিন নয় ১৮৫১ সালে ঢাকার কোন তন্তুবায় আধ সের কার্পাসে ১২৫ ক্রোশ দীর্ঘ এক থান মসলিন প্রস্তুত করিয়াছিল। কথাটা উপন্যাস নহে। বর্ত্তমান ভারত সম্রাটের পিতৃদেব প্রিন্স আলবর্ট প্রবর্ত্তিত লণ্ডনের প্রথম প্রদর্শনীতে এই মসলিন প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীর তালিকাতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

অনেকেই অবগত আছেন এই প্রদর্শনীই জগতের সমস্ত প্রদর্শনীর জননী। যাহা হউক ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশের তুলা হইতে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইত। কিন্তু এখন আর সেরূপ হয় না, ইহাই ভারতের বস্ত্র শিল্পের অবনতির প্রধান কারণ—অন্যতম কারণ বাষ্পীয় শক্তির প্রচলন।

বাষ্পীয় শক্তির প্রয়োগে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। ভারতের নানা স্থানে যে সকল সূতা ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায় ১৮ কোটি টাকা খাটিতেছে এবং সাড়ে তিন লক্ষ লোক জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু একমাত্র কার্পাসের উন্নতির উপর এই সকল কলের উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। এদেশের কলজাত বস্ত্র যে ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের কাপড় অপেক্ষা সুলভে বিক্রয় হয় না, তাহার কারণ উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলার অভাব। সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য যেমন ম্যাঞ্চেষ্টারকে মার্কিণ ও মিসরের তুলার উপর নির্ভর করিতে হয়, এদেশের কল সমূহকেও সেইরূপ ভদ্দেশীয় তুলার উপর নির্ভর করিতে হয়। পূর্ব্বে এদেশে যেমন সূক্ষ্ম সূত্রের উপযোগী তুলা জন্মিত, এখন যদি সেইরূপ দেশী তুলা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে এদেশের কল সমূহকে তত্তটা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। যতদিন এদেশে লম্বা আঁশযুক্ত সূক্ষ্ম কার্পাস উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন এদেশের কাপড়ের কল সমূহের স্থায়িত্বের আশা করা যায় না। এই জন্যই স্বর্গীয় জামসেটজী টাটা এদেশে মিসর দেশের বীজ হইতে তুলা উৎপন্ন করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার মত উদ্যোগী পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই, অন্যথা এবিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইত।

সুখের বিষয় আমেরিকার একচেটে তুলার ব্যবসায়ে লাঙ্কাসায়ারের তন্তুবায়গণ অসুবিধা ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কতকগুলি মার্কিণ মহাজন এবার তুলা বাঁধি করিয়াছিলেন বলিয়া, উহা কিরূপ অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এজন্য লাঙ্কাসায়ারের অনেক কল বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তথাকার মজুরদিগকে বেকার বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। সেজন্য আমাদের এদেশেও কাপড় যারপর নাই দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল। মার্কিণ মহাজনেরা মধ্যে মধ্যে এইরূপ তুলা বাঁধি করিয়া অন্যায়রূপ বাজার চড়াইয়া দিয়া ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়া থাকেন। এরূপ বাণিজ্যনীতি সাধুসম্মত নহে। কিন্তু তাহাদিগকে ধর্ম্মের কাহিনী শুনান যখন সম্ভব নহে, তখন ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়গণ অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যাহাতে বৃটীশ সাম্রাজ্যের নানাস্থানে উৎকৃষ্টরূপ তুলার আবাদ হয়, সেজন্য তাঁহারা গবমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহারা অনেক দিন হইতেই সে চেষ্টা করিতেছেন, তবে মার্কিণ বণিকদিগের বর্ত্তমান ব্যবহারে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের আগ্রহ ও উদ্যোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যখন ভারতের কার্পাস হইতেই পৃথিবীর সকল দেশে কার্পাসের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যখন এদেশে এক সময়ে উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা উৎপন্ন হইত, তখন চেষ্টা করিলে সেইরূপ তুলা পুনরায় কেনই বা না উৎপন্ন হইবে, অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এ কথা বলিতেছেন। ইহাতেই এদেশের কার্পাসের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা দেখা যাইতেছে। British Cotton-growing Association এজন্য কিরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন গত সংখ্যক কমলায় আমরা তাহার আভাস দিয়াছিলাম। তাঁহারা ইহার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের প্ররোচনায় গবর্মেণ্ট এপক্ষে কতদূর কি করিয়াছেন বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই পরিচয় দিব।

উল্লিখিত সভার উদ্যোগে প্রায় গত তিন বৎসর কাল মধ্যপ্রদেশে লম্বা আঁশের তুলার আবাদ হইতেছে। অবশ্য এক্ষণে কেবল পরীক্ষার্থই এই আবাদ হইতেছে সুতরাং অতি অল্প পরিমাণ জমীতেই বিভিন্ন জাতীয় বীজ বপন করা হইয়াছে। যাহাই হউক এই তিন বৎসরে যে পরিমাণ ফল লাভ হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত সভা আশান্বিত হইয়াছেন। এদেশের জল বায়ুতে লম্বা আঁশের তুলা জন্মিতে পারে না বলিয়া বিলাতী তন্তুবায়দিগের ধারণা ছিল, তাহা অপনীত হইয়াছে। এমনকি তাঁহারা এখন বলিতেছেন যে এদেশ জাত

লম্বা আঁশের তুলা মিশর ও মার্কিণের তুলার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপ আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রণালীতে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

১। বিভিন্ন জাতীয় উৎকৃষ্ট তুলার বীজ নির্ব্বাচন করিয়া তাহা ক্রয় করা এবং তাহা রোপণ করিয়া তাহার উন্নতির চেষ্টা করা।

২। বঙ্গদেশ, আসাম, ব্রহ্মদেশ ও অন্য স্থানের নীলকর ও চাকর প্রভৃতি দিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, তাঁহাদিগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বীজ সকলের পরীক্ষা করা ও প্রত্যেক জাতের বীজ তিন বিঘা হইতে পনর বিঘা জমীতে বপন করিয়া, কোথায় কোনটি ভালরূপ জন্মিল তাহা নির্দ্ধারণ করা।

৩। যেখানে যে জাতীয় বীজের ফল সন্তোষ জনক বলিয়া স্থির হইবে, তথায় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে কতকগুলি ক্ষেত্রে তাহার আবাদ করা। ১৫ হইতে ৬০ বিঘা আন্দাজ জমীতে এইরূপ আবাদ করিয়া, নিকটস্থ কৃষকদিগকে এই আবাদের প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা।

প্রথমতঃ এদেশীয় যত প্রকার জাতের বীজ আছে তাঁহারা তাহারই পরীক্ষা করিতে মনন করিয়াছেন। যেহেতু মধ্য প্রদেশের পরীক্ষাতে বিদেশী বীজ অপেক্ষা এদেশী বীজের ফলই সন্তোষজনক হইয়াছে। তাহার পর এদেশীয় বীজোৎপন্ন গাছের সহিত বিদেশীয় বীজোৎপন্ন গাছের মিলনে নূতনবিধ জাতের সৃষ্টিতে মনোযোগ দিবেন, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় জাতেরও চাষ চলিতে থাকিবে। এই সভার চেষ্টাতে এদেশের প্রাচীন এক জাতের কার্পাস বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার উন্নতি বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইবেন। অন্যান্য জাতীয় কার্পাসের যেমন প্রতি বৎসর বীজ বপন করিতে হয় এবং ফসল উঠিলেই গাছ নষ্ট হইয়া যায়, এ কার্পাস সে জাতীয় নহে। ইহার গাছ একবার তৈয়ার হইলে অনেক বৎসর তাহা হইতে ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার তুলা যেমন সূক্ষ্ম তেমনই আঁশও লম্বা। অনেকে বিবেচনা করেন এই তুলার সূতাতেই পূর্ব্বেকার ঢাকা মসলিন প্রস্তুত হইত। ইহার চাষ বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে, এবং অন্যান্য কার্পাসের মত আবাদে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। কি জন্য এতাবৎ এ জাতীয় গাছের বিষয় সাধারণে কিছু মাত্র অবগত ছিল না, বলা যায় না। অতি অল্প দিবস হইল সরকারী কৃষি বিভাগ ইহার বিষয় অবগত হইয়াছেন এবং ইহার তুলা বিলাতী তন্তুবায়দিগের মনোমত হওয়াতে তাঁহারা উহার আবাদে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের জল, বায়ু ও মৃত্তিকার অবস্থা বিভিন্ন প্রকার। তদ্ব্যতীত স্থান ভেদে বৃষ্টিপাতেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে, এইজন্য উল্লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্র সকল বিভিন্ন জেলায় ও বিভিন্ন প্রদেশে সংস্থাপন করা হইবে। তবে উচ্চ বঙ্গের ত্রিহুত, পূর্ণিয়া, চম্পারণ এবং নিম্ন বঙ্গের নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই আবাদে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হইবে। বাঙ্গালার ন্যায় নিম্ন আসামের গৌহাটি ও দক্ষিণ শ্রীহট্টও এ আবাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া স্থির হইয়াছে। বিশেষতঃ এই কয়েক জেলাতে চা-কর ও নীলকরদিগের সহিত এই আবাদের বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার সুবিধা হইবে। যাহাতে সাধারণ কৃষকেরা কার্পাস চাষে মনোযোগী হয়, উল্লিখিত পরীক্ষা ক্ষেত্র সকল হইতে তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে বাঙ্গালার কোন সুবিধাজনক স্থানে একটি বীজক্ষেত্র সংস্থাপিত হইবে। এই ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন জাতীয় বীজের পরীক্ষা হইবে এবং তথা হইতে চা-কর ও নীলকর ও সাধারণ কৃষকদিগকে বীজ বিতরণ করা হইবে।

কেবলমাত্র পরীক্ষার জন্য উল্লিখিতরূপ ব্যবস্থা। তদ্ব্যতীত যে সকল বীজের ফল সঠিকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আগামী বৎসরে তাহার বিস্তৃতভাবে আবাদ করা হইবে। আমরা অবগত হইলাম, প্রথম বৎসরেই অন্ততঃ নয় হাজার বিঘা জমী আবাদ করা হইবে। বীজের সংকুলান হইলে, প্রায় ১৫ হাজার বিঘা আবাদ করিতে উল্লিখিত সভার অভিপ্রায় আছে। প্রথম বৎসরে এই আবাদের ফল যদি আশানুরূপ হয়, তাহা হইলে পরবৎসরে তিন চারি লক্ষ বিঘা ভূমিতে বিস্তৃতভাবে আবাদ করা হইবে। উল্লিখিত সভা স্বয়ং যে এই সমস্ত আবাদ করিবেন তাহা নহে। তাঁহারা কতক চা-কর বা নীলকরদিগের সহিত ভাগে করিবেন অথবা নীলকরগণ যে প্রথায় রাইয়ত দিগকে

নীল বুনিতে দেন, সেই প্রণালীতে উক্ত সভা তাহাদিগকে কার্পাস বুনিতে দিবেন। তাঁহারা কৃষকদিগকে বীজ, কৃষিযন্ত্র ও টাকা দাদন দিবেন। কৃষকেরা নির্দ্ধারিত মূল্যে সভাকে কার্পাস দিবে। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এই আবাদে কৃষকেরা বিঘা করা অন্ততঃ পাঁচ টাকা হইতে সাত টাকা লাভ পাইবে।

British Cotton Growing Association কার্পাস চাষের যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা ফলবতী হইলে, এদেশে কার্পাসের যেমন উন্নতি হইবে তেমনি উহার আবাদও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে কেবলমাত্র লাঙ্কাসায়ারের তন্তুবায় গণের উপকারার্থ এই চেষ্টা হইতেছে, সুতরাং ভারতীয় কলের সত্বাধিকারীগণ শীঘ্র ইহার ফলভোগী হইতে পাইবেন না। ম্যাঞ্চেষ্টারের যে পরিমাণ প্রয়োজন, উল্লিখিত সভা সেই পরিমাণ কার্পাস উৎপন্ন করিবার জন্যই চেষ্টা করিবেন। অতএব আমাদিগের মনে হয় যে, এদেশীয় কলের প্রয়োজন পূরণ জন্য এদেশীয়গণের ঐরূপ চেষ্টা করা উচিত। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশের কলের সত্বাধিকারীগণ সম্মিলিত হইয়া এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে অনেকটা উপকার হইতে পারে। তদ্ব্যতীত আজ কাল এদেশের ভদ্রলোকেরাও ক্রমে ক্রমে শিল্প ও কৃষির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যদি কার্পাসের আবাদে অগ্রসর হন, আমাদের বোধ হয় কালে তাঁহারা তদ্দ্বারা বিশেষ লাভবান হইতে পারিবেনা। এ বিষয়ে তাঁহারা উল্লিখিত সভা হইতেও বিশেষ সহায়তা লাভ করিতে পারেন। ভদ্রলোকেরা যদি এই আবাদে মনোযোগী হন, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সাধারণ কৃষকেরাও ঐরূপ আবাদে মনোযোগ দিবে ও তাহা হইলে দেশে ক্রমে ক্রমে তুলার আবাদ বিস্তারিত হইবে। অবশ্য কোন প্রকার প্রচলিত লাভজনক আবাদের পরিবর্তে, এই আবাদ করাতে কোন ফল নাই। আমাদিগের দেশে অনাবাদী প্রচুর জমী পতিত আছে, সেই সকল জমীকে আবাদে পরিণত করিতে না পারিলে দেশের ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অবশ্য একেবারে ঐকার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, অল্পে অল্পে অগ্রসর হইলে কালে সুফল ফলিতে পারে। এ বিষয়ে যাঁহারা প্রথম সুযোগ অবলম্বন করিবেন নিশ্চয়ই তাঁহারা লাভবান হইবেন।

British Cotton Growing Association যেমন কার্পাসের নানাবিধ পরীক্ষা করিয়াছেন, সেইরূপ বঙ্গীয় গবমেণ্টও কৃষি বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল মলিসন সাহেবের তত্বাবধানে বিহার অঞ্চলে উহার পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহারও ফল মন্দ হয় নাই। মলিসন সাহেব চারি প্রকার বীজ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। (১) মিসরের বীজ (২) পিরুভিয়ার বীজ ও (৩) মার্কিণের দুই প্রকার বীজ। এই পরীক্ষায় তিনি স্থির করিয়াছেন যে, মিসরের বীজ যদি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে জল সেচন করিয়া বপন করা যায়, তাহা বেশ লাভজনক হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আষাঢ় শ্রাবণের বৃষ্টির জল অপেক্ষা করিয়া যদি নাবি বপন করা হয়, তাহা ভাল জন্মিবে না এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের বপন করা বীজের ফসলের মত ভাল ফসল হইবে না। উহা পৌষ মাঘ মাসের হিমে নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। মিসরের নূতন আমদানী বীজে যে তুলা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার আঁশ বেশ লম্বা ও সূক্ষ্ম হইয়াছিল, কিন্তু পোকা লাগিয়াছিল বলিয়া উহার রং কতক পরিমাণে দাবা হইয়াছিল। পিরুভীয় বীজ বিহারের উপযোগী নহে বলিয়া স্থির হইয়াছে। মার্কিণের যে দুই প্রকার বীজের পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার এক প্রকারকে এদেশের জল বায়ুর উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছিল, আর এক প্রকার নূতন আমদানী এই উভয়েরই তুলা মিসর ও পিরুভীর তুলার পূর্ব্বে পরিপক্ক হইয়াছিল। মলিসন সাহেব বলেন যে আমেরিকার দুই তিন প্রকার বীজ যাহা এদেশের জল বায়ুর উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং আমাদের দেশীয় ব্রোচের বীজ, এই দুইই বিহার অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। উহাদিগের ফল খুব আশাজনক বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছে। বিহার অঞ্চলে সচরাচর ভুট্টা বা অরহরের সঙ্গে কার্পাস বপন করা হইয়া থাকে কি দেশী কি বিদেশী, সকল বীজ সম্বন্ধেই মলিসন সাহেব এই প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। উচ্চ শ্রেণীর কার্পাস ভুট্টার সহিত চাষ করা যাইতে পারে, কিন্তু অর-

হরের সহিত উহা দিতে পারা যায় না, যেহেতু অরহর গাছ যেরূপ লম্বা হয় ও উহার শাখা যেরূপ বিস্তৃত হয়, তাহাতে ভাল জাতীয় তুলা নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ভুট্টার সহিত কার্পাস বপন করিলে উহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সারি বাঁধিয়া বপন করা উচিত। দুই সারি ভুট্টা, তাহার পর এক সারি কার্পাস এইরূপ ভাবে বপন করিতে তিনি পরামর্শ দেন। উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস গাছ পরস্পর ১৫।২১ ইঞ্চি দূরে বসান প্রয়োজন। আর ভুট্টার গাছ তুলিয়া ফেলা হইলেই একবার জমীটা চষিয়া দিতে হইবে।

কার্পাসের এই সকল পরীক্ষা দেখিয়া আমাদিগের মনে হয় ইহার ভবিষ্যৎ আশাজনক। এইজন্যই আমরা আমাদিগের দেশবাসীদিগকে ইহার আবাদে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। বিশেষতঃ এদেশে উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস উৎপন্ন না হইলে যখন এদেশীয় কল সকলের উন্নতির আশা নাই, তখন কার্পাস আবাদে মনোযোগ প্রদান করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদিগের বর্ত্তমান ছোট লাট বাহাদুরের ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আছে। তাঁহারই বিশেষ আদেশে মলিসন সাহেব উল্লিখিত রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন এবং আগামী বৎসরে বিশেষরূপ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন।

অল্প মূল ধনে ব্যবসায়।

পেঁপের চাষ।

এই সুজলা সুফলা ভারতে করুণাময় জগদীশ্বর কিছুরই অভাব রাখেন নাই। কেবল আমাদের দোষে আমাদের অভাব। ভারতের নানারূপ ফল ফুল কতরূপে সকল ঋতুতে জনসমাজের হিত সাধন ও অভাব পূরণ করিয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রত্যেক ঋতুতেই এক এক নূতন ফলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভারতে যত প্রকার সুমিষ্ট শ্রেষ্ঠ ফল আছে, আম্র তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। পেঁপেকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ভারতের সেই সুদূর দিল্লীপ্রদেশ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ সন্নিকটস্থ সিংহল জনপদ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই পেঁপে গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বৎসরের সকল সময়েই এই বৃক্ষ ফল প্রসব করে বটে, কিন্তু নিদাঘের প্রখর রবিকর সন্তপ্ত তৃষাতুর রসনায় এই ফলের আস্বাদন কত প্রাণমনোস্নিগ্ধকর তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। গ্রীষ্মকালে পেঁপে কিছু বেশী সুমিষ্ট হয়। উষ্ণার্দ্র (Hot and moist) আবহাওয়ায় ইহার ফল বেশ সুপক্ক ও সুস্বাদু হয়; তবে শুষ্কোষ্ণ (Hot and dry) স্থানে তত সুবিধাজনক চাষ হয় না। আমাদিগের বঙ্গদেশে ইহার চাষ খুব লাভজনক ও সুবিধাজনক।

আমেরিকার মেক্সিকো উপসাগরস্থ দ্বীপ সমূহে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও ব্রাজিল জনপদের কতকাংশে ইহার আদি জন্মস্থান বলিয়া নির্ণীত হয়; কারণ ইহার সংস্কৃতে কোন নাম নাই ও মার্কিণ মহাদেশ আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভারতে ইহার কোন নাম, পরিচয় বা অস্তিত্ব কিছুই ছিল না। মার্কিণ ভাষায় ('Papay') পেপায় হইতে ভারতীয় সকল নামই হইয়াছে—ইহাই অনেকের ধারণা। পর্ত্তুগাল দেশীয়েরা যখন এদেশে প্রথম বাণিজ্যার্থ যাতায়াত করেন তখনই বোধহয় পেঁপে এই দেশে আসে। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মদেশে ইহা যে নামে অভিহিত হয় (Thimbawati)—'থিম্বোয়াথি'—তাহাতে এই ফল যে সুবিস্তীর্ণ অর্ণববিহারী পোত সমূহের দ্বারা তীরে আনীত হইয়াছে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমেরিকা আবিষ্কার কালে যে এই ফলবৃক্ষ এদেশে আসিয়াছে তাহার কারণ ১৬২৬ খৃঃ অব্দে ভারত হইতে ইউরোপস্থ ইটালীর অন্তর্গত নেপল্‌স নগরে এই ফলের বীজ প্রেরিত হয়।

পেঁপে গাছে প্রায়ই ডালপালা থাকে না। ইহা উচ্চে ৫।৬ হাত হইতে ১০।১২ হাত পর্য্যন্ত হয়। বৃক্ষের নিম্নভাগে প্রায়ই পাতা থাকে না; উপরে ডাঁটা, পাতা, ফল ও ফুলে বৃক্ষ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। ভাল করিয়া চাষ করিলে, ১০।১২ মাসের মধ্যে ইহা ফল দান করে। চাষ না করিলেও আপনা আপনি এই গাছে পরিমাণে ফল হয়। ইহার গাত্রে আঘাত প্রদান করিলে রজনের মত একপ্রকার আটা নির্গত হয়। ইহার মূল হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম আঁস (Fibre) পাওয়া যাইতে পারে। ইহার গাত্র ও ফল হইতে যে এক প্রকার শ্বেত, দুগ্ধের মত

রস নির্গম হইয়া থাকে, তাহাতে লোক সাধারণের বহুল উপকার সাধিত হয়। সেই জন্ত লোকে আমাদের দেশে কাঁচা পেঁপে ভাতে দিয়া ও অন্তান্ত ব্যঞ্জনে দিয়া আহার করে। শ্বেত আটায় নানাবিধ ঔষধ হইতে পারে। কাঁচা পেঁপে অর্শরোগের ঔষধ। শ্বেত আটায় কৃমিকীট নষ্ট হইয়া থাকে। এক চামচ শ্বেত রস, এক চামচ মধু উভয়কে খুব উত্তমরূপে মিশাইয়া, চারি বা পাঁচ চামচে গরম জল একটু একটু করিয়া দিয়া দুইঘণ্টা অন্তর, (Castor oil) খাঁটি রেড়ির তৈল, (Limejuice) লেবুর রস বা (Vinegar) ভিনিগার সঙ্গে সেবন করিলে দুই দিনের মধ্যে সমস্ত কীট নষ্ট হইয়া যায়। পেঁপের ভিতরে যে গোলমরিচের মত বীচি আছে তাহাতেও পোকা নষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যে রমণীগণের এইরূপ বিশ্বাস যে, এই পেঁপের বীজ আহার করিলে গর্ভবতীর গর্ভস্রাব হইয়া যায়। তলপেটে বৃক্ষের আটা বা বীজ বাটিয়া লেপন করিলেও ঐরূপ হানি সম্ভবে। ভারতের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের লিখিত বিবরণী পাঠে এই সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়। বৈদ্যকুল পেঁপেকে উদ্ভিজ্জ পেপ্‌সিন বা VegetablePepsin নামে অভিহিত করেন। পেঁপে ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া Alcohol এ ফেলিয়া দিলে নিম্নে যে পরিমাণ বস্তু থিতাইয়া পড়ে, তাহাকে শুষ্ক করিয়া গুঁড়াইয়া লইলে ব্যবহারোপযোগী পেপসিন হইয়াথাকে। অনেক সুবিখ্যাত ডাক্তার বলেন যে, প্রাণিজ পেপ্‌সিন্ হইতে এ পেপসিন অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; কারণ পাকস্থলীস্থিত দ্রব্য পরিপাক করিতে আর কোন রকম দ্রাবক ও ক্ষার পদার্থের (Acid or alkali) প্রয়োজন হয় না। অজীর্ণরোগের ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। পেঁপের পেপ্‌সিন অপেক্ষা স্বল্পায়াস লভ্য উৎকৃষ্ট পেপ্‌সিন আর নাই। ইহার শ্বেতরসে প্লীহার আয়তন বৃদ্ধি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ছোট চামচের একচামচ পাউডার ও সেই পরিমাণে চিনি দিয়া তিনবার প্রত্যহ আহার করিলে একেবারে সারিয়া যায়। কাঁচা পেঁপে একটা থেঁতো করিয়া সমস্ত রাত্রি হিমে ফেলিয়া রাখিয়া লবণ দিয়া সকালে সেবন করিলে প্লীহা আরাম হইতে দেখা গিয়াছে। এই শ্বেত রসের আর এক প্রধান গুণ এই যে, মাংস সিদ্ধের সময় কয়েক ফোঁটা রস দিলে মাংস শীঘ্র গলিয়া যায়। কাঁচা পেঁপে মাংসে ফেলিয়া দিলেও কতকটা একরূপ কার্য্য করে। যদি মাংস কাটিয়া পেঁপের পাতায় ঢাকিয়া রাখা যায় তাহা হইলে মাংস খুব সহজে সিদ্ধ হয়; অনেকের বিশ্বাস এমন কি মাংস কাটিয়া পেঁপে গাছে ঝুলাইয়া রাখিলে তাহা শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া যায়। সুবিখ্যাত চিকিৎসক সর্জ্জন মেজর আর, এল, দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে বলিয়াছেন, "Since I have used it in dyspepsia with great benefit, I had a plantation of nearly two hundred trees in the grounds of Bankura jail. The raw fruit was scraped longitudially and the milk juice collected. This I consider the best preparation for internal use; one or two grains with sugar or milk after meals should be given to adults. A few drops of juice added to tongh meat render it quite tender and fit for emmediate cooking.) ইহার ভাবার্থ এই:—আমি "অজীর্ণ পীড়ায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়া, বাঁকুড়া জেলখানায় প্রায় ২০০ শত পেঁপে গাছের চাষ করাইয়াছিলাম।

কাঁচা পেঁপে লম্বা লম্বা ফালা করিয়া কাটিলে তাহা হইতে শ্বেত রস সঞ্চিত হয়, এই শ্বেত রস হইতে যে গুঁড়া প্রস্তুত হয় সেই গুঁড়া যদি আহারের পর দুগ্ধ কিম্বা চিনি দিয়া সেবন করা যায় তাহা হইলে সমস্ত অজীর্ণ দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। রন্ধন কালে মাংসে কয়েক ফোঁটা মাত্র এই রস দিলে মাংস সহজে সিদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে ভারতের খ্যাত নামা অনেক চিকিৎসকের মতামত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, তবে বাহুল্য ভয়ে ও স্থানাভাবে তাহা হইতে বিরত থাকিলাম। এতদ্ব্যতীত ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিভিন্ন মত থাকিলেও, উপকারিতা বিষয়ে সকলেরই একরূপ মত দেখা যায়। আবার পেঁপের রসের ও বীজের যে ভয়ানক অগুণ আছে (যেমন গর্ভবতীর গর্ভস্রাব করণে সমর্থ) এ বিষয়ে অনেক ইংরাজ চিকিৎসকেরও একমত দেখা যায় "The unripe fruit is often resorted to by

natives to induce criminal abortion."—Major J Houtson, (Travancore Surgeon G. C. Ray, Birbhum.Says—* * * Hence the use of unripe fruit amongst the natives for piles, and enlarged liver and spleen. •

পেঁপের পাতারও এক মহদ্ গুণ এই যে, ইহা সেঁকিয়া (গরম জল কিম্বা আগুনের তাপে) কোন ব্যাথায় লাগাইলে বেদনা আরাম হয়। "The leaves are used externally for nervous pains. The leaf may be either dipped in hot water or warmed over fire and applied to the painful part."—Surgeon Major W. Nolan M.D., *Bombay.*

পেঁপের ফল পাকিলে খাইতে মিষ্ট, নির্দ্দোষ ও স্বাস্থ্যকর। পেঁপের আচার তৈয়ারী হইতে পারে। পেঁপের মোহনভোগ ও মোরব্বায় অনেকে রসনা রঞ্জন করিয়া থাকিবেন। কাঁচা পেঁপে খোলা ছাড়াইয়া, সিদ্ধ করিয়া, কুচি কুচি করিয়া তাহাতে সরিষার তৈল, লঙ্কা ও লবণ যথানিয়মে মাখাইলে ভাল আচার হয়। আফ্রিকায় নিগ্রোরা পেঁপের পাতার ছাই সাবানের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরাও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।

এই পেঁপে গাছ আমাদিগের কত উপকারী তাহা আমরা কয়জন জানি। ইহা আমাদিগের আঁস্তাকুড়ে সচরাচর জন্মিতে দেখা যায়। পল্লীগ্রামে কত পেঁপে, গাছে সুপক্ক হইয়া বায়সাদি পক্ষীকূলের উদর তৃপ্তি করে কেহ তাহা লক্ষ্য করে না। দুঃখের বিষয় আমাদিগের দেশে এ সব বিষয় কেহ দৃকপাত করেন না। সাহেবেরা আমাদের পেঁপের স্বরূপ গুণ বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন, এখন আমরা একথায় অবিশ্বাস করিব না। আমাদের বঙ্গদেশে স্থানের অভাব নাই, পেঁপের বীজের অভাব নাই, লোকেরও অভাব নাই, অভাব কেবল যত্নের ও শিক্ষার। পেঁপের চাষ কত লাভজনক, নিম্নে তাহার বিবরণী দেওয়া গেল। উচ্চ দোঁয়াস মাটি পেঁপে গাছের উপযুক্ত। পটাশ জাতীয় সার, যথা সোরা, ছাই, ও গোবর উক্ত জমীতে দিলে, পেঁপেগাছের তেজ হইয়া থাকে। ৬।৭ হাত অন্তর গাছ পুতিলে এক বিঘা জমীতে প্রায় দেড়শত গাছ পোতা হইতে পারে। ১০ বিঘা জমীতে ১৫০০ গাছে, বৎসরে প্রতি গাছে ।/০ পাঁচ আনা লাভ ধরিলে ৫০০৲ টাকা হওয়া সম্ভব। তবে সহরের নিকট না হইলে এরূপ লাভ হয় না। সহরের নিকটে চাষ না হইলেও পেঁপে হইতে পেপসিন, কৃমির ঔষধ, আচার, মোরব্বা, আঁশ fibre এবং কাপড় কাচিবার ক্ষার প্রস্তুত করিতে পারিলে, বিশেষ লাভ হওয়া বিচিত্র নহে। একজন গৃহস্থের দশ বিঘা পেঁপে, দশ বিঘা কলা, দশ বিঘা কাগজী ও পাতিলেবু ও দশ বিঘা নারিকেল গাছের চাষ থাকিলে প্রতি মাসে ৮০৲ হইতে ১০০৲ একশত টাকা আয় হওয়া বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে উদ্যম এবং স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে উন্নতি করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা আবশ্যক।

শ্রীভুপেন্দ্রকুমার দত্ত।

গন্ধ দ্রব্য।

প্রাচ্য জগতে পুরাকালে বিলাসিতার জন্য গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করণ একটী প্রধান শিল্প বলিয়া পরিগণিত ছিল। সুগন্ধি তৈল কেশে এবং শ্মশ্রুতে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত, শরীরের অন্যান্য স্থানে সুগন্ধ দ্রব্য লিপ্ত করিবার নিমিত্ত, স্নানের জন্য সুগন্ধ জলের নিমিত্ত এবং ধনী পুরুষদিগের বাসগৃহের চতুর্দ্দিকে সুগন্ধীভূত বায়ু সঞ্চালন নিমিত্ত অতি পূর্ব্বকাল হইতেই সুগন্ধ দ্রব্যের প্রচুর ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আইন-ই-আকবরীতে এইরূপ উক্ত আছে, যে, সম্রাট্ আকবর সুগন্ধ দ্রব্য অতিশয় ভাল বাসিতেন। রাজ দরবার সদা সর্ব্বদাই চন্দনাদি নানাবিধ পদার্থে সুগন্ধীকৃত থাকিত। স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রদীপে সুগন্ধ তৈল জ্বলিতে থাকিত এবং সুগন্ধযুক্ত পুষ্পমাল্য দ্বারা সভা সর্ব্বদিকে বেষ্টিত থাকিত।

ভারতবর্ষে গন্ধদ্রব্য আতর বা সার নামেই প্রস্তুত ও বিক্রীত হইয়া থাকে এবং ইউরোপে এসেন্স নামেই চলিয়া থাকে। আমাদের দেশে সমস্ত গন্ধ পদার্থের মূলে প্রায়ই তিলের তৈল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখনও কখনও চন্দন তৈলও তাহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপে ও ভারতবর্ষে একই উপায়ে সুগন্ধ তৈল পুষ্পপাপড়ী হইতে প্রস্তুত করা হয়।

যে পুষ্পের তৈল প্রস্তুত করিতে হইবে, প্রথমতঃ সেই পুষ্পের পাপড়ি সংগ্রহ করিয়া পরিষ্কার পাথরের মেজের উপর আধ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু করিয়া সাজাইতে হইবে। তাহার উপর পরিষ্কৃত তিল সিকি ইঞ্চি পরিমাণ পুরু করিয়া বিছাইতে হইবে এবং তাহার উপর পুনরায় আধ ইঞ্চি পুষ্পপাপড়ি সাজাইতে হইবে। এইরূপ আট কিম্বা দশ থাক পাপড়ি ও তিল উপর্য্যুপরি সাজান প্রয়োজন। সমস্ত রাত্রি ইহা এইরূপে রাখিতে হইবে এবং পরদিন প্রাতে সমস্ত পাপড়ি সরাইয়া ফেলিয়া কেবলমাত্র তিলগুলি সারাদিন রৌদ্রে শুকান প্রয়োজন। সন্ধ্যাকালে পুনরায় টাট্‌কা পাপড়ি ও ঐ সকল তিল পূর্ব্বমত উপর্য্যুপরি সাজাইতে হইবে। এবং পরদিন প্রাতে দল গুলি ফেলিয়া দিতে হইবে। ঐইরূপে দশ দিন ধরিয়া এই প্রক্রিয়া সাধিত হইলে, এই সকল তিল গুলি খোলের মধ্যে পুরিতে হইবে। এক বৎসর ধরিয়া এইরূপে তিল সংগ্রহ করিলেও তাহার সুগন্ধ নষ্ট হয় না।

এইরূপে অনেক পরিমাণে তীলের বীজ জমিলে পর তাহাকে ঘানিগাছে পিশিয়া তৈল নিষ্কাষিত করিয়া লওয়া হয়, এবং পরে তৈলকে শোধন করিয়া লইয়া চামড়ার বোতলে (কুপিতে) পুরিয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হয়।

গোলাপের আতরই প্রধানতঃ ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহা ছাড়া অন্যান্য পুষ্প-সার, সুগন্ধ তৈল এবং অনেক কঠিন পদার্থও গন্ধদ্রব্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমস্ত গন্ধ দ্রব্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ইহা প্রাণী অথবা উদ্ভিদ্ হইতে সমুদ্ভূত; দ্বিতীয়তঃ ইহা কেবল মাত্র প্রাণী অথবা উদ্ভিদ অঙ্গজাত নানা পদার্থের সহিত নানা রাসায়নিক পদার্থের বিভিন্ন পরিমাণে সংযোগে প্রাপ্ত। প্রথম জাতীয় গন্ধদ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি কেবল মাত্র প্রাণী অঙ্গজাত, যেমন কস্তুরী। কতকগুলি উদ্ভিদ্ জাতির নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সার—যেমন পুষ্প-সার বা ত্বক-সার বা মূল-সার। আবার কতকগুলি গন্ধদ্রব্য উদ্ভিদ্ হইতেই সম্যক্ উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহা উদ্ভিদের আভ্যন্তরিক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সম্ভূত, যেমন নানা প্রকার Balsam বা রস, কর্পূর প্রভৃতি। দ্বিতীয় জাতীয় গন্ধ দ্রব্যই আজকাল আমরা অনেক পরিমাণে চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই। ইহার প্রকারও অনেক। একটী বিলাতী দোকানে এক লক্ষ প্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত থাকে। ইহা কেবল মাত্র নানা পদার্থ নানা পরিমাণে লইয়া প্রস্তুত। বিলাতী এসেন্স, বোকে, স্পিরিট বা ও (eux) এই জাতীয় গন্ধ দ্রব্য।

উদ্ভিদ্ হইতে গন্দদ্রব্য নানা প্রক্রিয়ানুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুষ্প হইতে enfleurage ও maceration উপায়ে, মূল হইতে trituritíon উপায়ে এবং বীজ হইতে distillation উপায়ে গন্ধ যুক্ত সার পাওয়া যায়।

যখন কোন গন্ধযুক্ত পদার্থের গন্ধ অনেক কাল স্থায়ী হইবে বলিয়া বোধ হয়, তখন চাপ সংযোগে তাহার সার নিষ্কাষণ করা যায়। যেমন লেবু হইতে

সার নিষ্কাষণ জন্য এইরূপ চাপের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ লেবুর খোলা অথবা যে অংশে গন্ধযুক্ত পদার্থ আছে, তাহা একখণ্ড কাপড়ে বাঁধিয়া খুব জোরে চাপ দিতে হইবে। চাপ সংযোগের দ্বারাই সারাংশ বাহির হইয়া পড়িবে। চাপ দিবার জন্য প্রেস টিংচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার পরিবর্ত্তে যে কোন চাপ দিবার যন্ত্র ব্যবহার করিলেই চলে।

Distillation (চোয়ান)—আতর প্রস্তুত প্রণালী। গাছের প্রথমে গন্ধযুক্ত পদার্থকে একটী বড় লৌহ, তামা বা কাঁচের হাঁড়ার মধ্যে রাখিয়া তাহাতে জল দিতে হইবে। এই হাঁড়ার মুখে একটী ডুমাকৃতি ঢাকনা চাপা দিতে হইবে। এই ঢাকনার ভিতর দিয়া একটী সরু নল হাঁড়ার মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে এবং নলের অপর প্রান্তটী ইস্ক্রুপের প্যাঁচের ন্যায় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া একটী শীতল জলাধারের ভিতর দিয়া চলাইয়া দিয়া একটী পরিষ্কৃত পাত্রের উপর রাখিবে। হাঁড়ার মধ্যে বাতাস প্রবেশের পথ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। পরে হাঁড়ার তলায় জ্বাল দিয়া তাহার মধ্যস্থিত জলকে ফুটাইতে হইবে। বাষ্প নির্গত হইয়া সরু নলের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং নলের মাঝে শীতল জলের প্রভাবে তাহা পুনরায় তরলাকারে পরিণত হইয়া শেষ আধারে নীত হইবে। মধ্য জলাধারের জল মাঝে মাঝে বদলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন, কারণ ইহা নলস্থিত বাষ্পের দ্বারা উষ্ণ হইয়া যাইলে আর তাহা বাষ্পকে তরলাকারে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না। শেষ পাত্রে এইরূপে জল জমিলে পর তাহা কিছুক্ষণ রাখিয়া একটী সেপারেটীং ফানেল দিয়া বা তুলা দিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে জলাংশ ও গন্ধযুক্ত সারাংশ, পৃথক করিয়া ফেলিতে হইবে। পূর্ব্বে কখনও কখনও জলের পরিবর্ত্তে স্পিরিট ব্যবহৃত হইত কিন্তু তাহাতে এই দোষ হয় যে অল্প জ্বালে স্পিরিট ফুটিয়া উঠিত এবং এই নিমিত্ত অনেক পরিমাণে গন্ধসার নষ্ট হইয়া যাইত। সার পৃথক হইয়া যাইলে তাহা স্পিরিটে মিশ্রিত করিলেই চলিতে পারে।

Maceration (ভিজান)—পমেটম প্রস্তুত প্রণালী। কিয়ৎ পরিমাণে পরিষ্কৃত চর্ব্বি, চীনামাটি বা অন্য কোন পাত্রে রাখিতে হইবে। অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লইয়া ইহার উপর সুগন্ধ পুষ্পের পাপড়ি ছড়াইয়া দিয়া ২।৩ দিন রাখিতে হইবে। পুষ্প-সারের উপর চর্ব্বির বিশেষ আকর্ষণ থাকায়, তাহা পাপড়ি হইতে সার পদার্থ গ্রহণ করিয়া সুগন্ধযুক্ত হইয়া উঠে। পাপড়ি গুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিয়া, পুনরায় টাট্‌কা পাপড়ি তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপ ১০।১২ বার করিলে অথবা ইচ্ছানুরূপ সুগন্ধযুক্ত হইলে পমেটম প্রস্তুত হইয়া গেল। ফ্রান্সে এইরূপে ৬ হইতে ২৪ বার পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া সাধিত হয়।

সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত প্রক্রিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। কেবল মাত্র চর্ব্বির পরিবর্ত্তে তৈল ব্যবহার করিলেই হইবে।

Enfleurage (পুষ্প সহযোগ করণ)—এই উপায়টীই পুষ্প হইতে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা ফ্রান্সেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা উপরিলিখিত প্রক্রিয়ার ন্যায়, কেবল ইহাতে অগ্নির উত্তাপ লাগাইতে হয় না, তাহার কারণ অনেক পুষ্পের সুগন্ধ অগ্নির উত্তাপে নষ্ট হইয়া বা কমিয়া যাইতে পারে। একটী বড় কাঁচের থালায় সিকি ইঞ্চি পরিমিত পরিষ্কৃত চর্ব্বি রাখিয়া তাহার উপর পাপড়ি নিক্ষেপ করিয়া ৭২ ঘণ্টা রাখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে ইহা ক্রমে ক্রমে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

সক্ করিয়া গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে বাজার হইতে কোন পুষ্প-সার ক্রয় করিয়া তাহা পরিষ্কৃত স্পিরিটে গুলিয়া লইলেই চলিতে পারে।

আমাদের দেশজ উদ্ভিদ সমূহ হইতে কি উপায়ে কি রূপ সুগন্ধ দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, আমরা তাহার বিবরণ ক্রমশঃ দিতে চেষ্টা করিব। গোলাপ পুষ্পই গন্ধ পদার্থের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে, এইজন্য আতর প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে বিবৃত করা হইল।

আতর।

গোলাপের পাপড়ি হইতে সৌগন্ধ সংগ্রহ করিয়া আতর প্রস্তুত করা যায়। গোলাপ ফুলের বোঁটা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া কুণ্ড বা বাহিরেকার সবুজ পাপড়ি শুদ্ধ সমস্ত ফুলটীকে এক খানি কড়ার উপর জাল দিতে হয়। আধ মণ ফুলের পাপড়িকে

ত্রিশ সের জলে ফেলিতে হইবে। অনন্তর হাত দিয়া দলগুলিকে বেশ করিয়া জলের সহিত মিশাইতে হইবে এবং কড়ার নীচে জ্বাল দিতে হইবে। যখন কড়ার জল গরম হইতে আরম্ভ হইয়া ধূম উঠিতে থাকে তখন কড়ার মুখে একখানা সরা বা কোন ঢাকনা চাপা দিতে হয়। ঢাকনার মুখে একটা নল লাগান চাই। ঢাকনার ধারে ধারে যে ফাঁক থাকে তাহা কাদা, পুটিং বা অন্য কোন পদার্থের দ্বারা লেপিয়া দিয়া বন্ধ করিয়াদিতে হইবে। নলের মুখে আর একটা পাত্র থাকা চাই। কড়ার নীচে যে জ্বাল দিতে হইবে তাহার আঁচ কম বা বেশী না হইয়া মাঝামাঝি হওয়া চাই। যখন নল দিয়া জল বাহির হইয়া আসিতে চাহিবে, এবং কড়াটী অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিবে তখন আঁচ কমাইয়া লইতে হইবে। বাহিরেকার পাত্রটী একটা ঠাণ্ডা জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে রাখা চাই; তাহা হইলে নলের মধ্য দিয়া সমাগত বাষ্প পুনরায় জলে পরিণত হইতে পারিবে। জল ফুটিতে আরম্ভ হইলে বাষ্পের সহিত গরম জলও নলের মধ্য দিয়া অন্য পাত্রে আসিয়া জমিতে থাকে। প্রায় ৪।৫ ঘণ্টার পর ১৫সের জল নল দিয়া বাহিরে আসিয়া থাকে। এই গোলাপের জল পুনরায় আধ মণ ফুলের পাপড়ির সহিত মিশাইয়া লইতে হইবে এবং উল্লিখিত উপায়ে ৮।১০ সের জল সংগ্রহ করিতে হইবে।

যদ্যপি গোলাপ ফুলগুলি বেশী সুগন্ধ হয় এবং জল আহরণের প্রক্রিয়া সুসাধিত হয় তাহা হইলে এই জলে গোলাপের অত্যন্ত সুবাস থাকিবে। অনন্তর এই জল মাটির পাত্রেই হউক বা টিনের পাত্রে হউক একরাত্রের জন্য বাহিরের হাওয়ায় রাখিতে হইবে। সকাল বেলায় আতর অংশটুকুকে জলের উপরে সরের ন্যায় ভাসিতে দেখা যাইবে। এই আতরকে অতি সন্তর্পণে ও যত্নের সহিত তুলা বা অন্য পদার্থের দ্বারা জড় করিয়া ছোট ছোট শিশিতে পুরিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে কতকটা পরিমাণ আতর সংগৃহীত হইলে পর তাহা হইতে জল ও অন্যান্য অপরিষ্কার পদার্থ ছাঁকিয়া বাদ দিতে হইবে। ঐরূপ করিতে হইলে একটু ঠাণ্ডায় রাখিয়া দিলেই আতর জমিয়া যাইবে এবং জলীয় পদার্থ টুকু কাটিয়া যাইবে। কিন্তু আতরের সহিত অন্যান্য কঠিন পদার্থ সংমিশ্রিত থাকিলে আতরকে একটু গরম করিলেই ইহা তরল হইয়া আসিবে এবং তখন কঠিন পদার্থগুলি ছাঁকিয়া বাদ দিয়া লইলেই চলিবে। এই পদার্থগুলিও প্রায় আতরের সহিত সম সুগন্ধসম্পন্ন. এই জন্য এইগুলি না ফেলিয়া দিয়া পুনরায় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া টাটকা পাপড়ির সহিত জ্বাল দেওয়া চলে।

এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারাই খাঁটী আতর প্রস্তুত হয়। কিন্তু আমাদের দেশীয় গোলাপে সুগন্ধের ভাগ কম থাকাতে এবং আতরের খাঁকতি হওয়াতে অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য ফুলের সহিত ভেজাল দেওয়া হয়। কখনও কখনও কড়ায় সিদ্ধ করিবার সময় ফুলের সহিত এক হইতে পাঁচ তোলা পরিমিত চন্দনের ছাল ভেজাল দেওয়া হয়। চন্দন কাষ্ঠের মধ্যে যে সুগন্ধ আছে তাহাও এইরূপে ভেজাল দিলে গোলাপের সহিত মিশিয়া যায় কিন্তু এই ফাঁকি শীঘ্রই ধরা পড়িয়া যায়। যদি এই ভেজাল আতর কিছুক্ষণ ঠাণ্ডায় রাখা যায় তাহা হইলে চন্দনের সার গোলাপের সারের ন্যায় জমিয়া যাইবে না; আরও, আতরের সহিত একটা চন্দনের গন্ধ টের পাওয়া যায়। কোন উপায়েই এই চন্দনের গন্ধ ঢাকিতে পারা যায় না।

কাশ্মীর প্রদেশে আতরের সহিত চন্দনের ভেজাল দেওয়া হয় না। ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা এক প্রকার সুগন্ধ সম্পন্ন ঘাস ভেজাল দেয়। তাহাতে আতরের গন্ধের কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু তাহার বর্ণ সবুজ হইয়া যায়। এই আতর খাঁটী গোলাপের আতরের ন্যায় অল্প ঠাণ্ডায় জমিয়া যায় না। অন্যরূপ ভেজাল মিশ্রিত করিলে বেশ স্পষ্ট ধরা পড়ে। সংগৃহীত আতরের পরিমাণ কেবল যে প্রক্রিয়ার নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, ইহা অনেকটা ফুলের সুগন্ধের উপর এবং ঋতুর উপরও নির্ভর করে। ইউরোপে বিখ্যাত রাসায়নিক টাকেমিয়াস (Tachemiers) ৫০ সের পাপড়ি হইতে কেবল মাত্র আধ আউন্স আতর পাইয়া ছিলেন। প্রত্যুত তিনি কেবল মাত্র রঞ্জিত পাপড়ি ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রক্রিয়া সুসাধিত হইলে ৫০ সের

পাপড়ি হইতে ৫ মাষা পরিমাণ আতর সংগৃহীত হইতে পারে।

একখানি ৩৩ বিঘা গোলাপের বাগান হইতে ৫৪ মণ ২৩ সের ফুল সংগ্রহ করিয়া ১৬ তোলা খাঁটি আতর পাওয়া গিয়া ছিল। দেশ বিশেষে, ফুলের সুগন্ধ বিশেষে, আতরের রং নানা প্রকার হইতে পারে বটে কিন্তু রঙের সহিত আতরের ভাল মন্দ কিছুরই সম্ভাবনা নাই। সেই বাগানের সেই ঋতুতে কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন দিনে গোলাপ সংগ্রহ করিয়া উজ্জ্বল সবুজ, হরিদ্রা এবং রাঙ্গাবর্ণ আতর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ফুলের বাহিরের সবুজ আবরণগুলির দ্বারা আতরের কোন ক্ষতি হয় না এবং ইহাদ্বারা তাহার বর্ণও পরিবর্ত্তন হয় না, বরঞ্চ ইহা হইতেও আতর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

শ্রীবিরিঞ্চি মোহন কর।

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি

বা

যৌথ মহাজন সমিতি।

ভারতের কৃষকদিগের মত দরিদ্র আর কোনও দেশে নাই। ইহারা চিরজীবন পরের জন্যই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিয়া থাকে। আপনি পেটে না খাইয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবারদিগকে অর্দ্ধাশনে রাখিয়া, ইহারা পরের উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে। যে অবধি ভারতে বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হইয়াছে সেই সময় হইতেই তাহাদিগের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ক্রমে তাহারা এইরূপে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে। হিন্দু রাজাদিগের শাসন কালে তাহাদিগের এরূপ দুরবস্থা ছিল না। তাহার কারণ সে সময়ে বর্ত্তমান কালের ন্যায় ভূ রাজস্ব গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না। কৃষক যাহা উৎপন্ন করিত রাজা তাহার ষষ্ঠ ভাগ রাজকর স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। অবশিষ্টাংশ লইয়া তাহারা পরমানন্দে আপনার সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারিত। মুসলমান শাসন সময়েও অনেকটা এই ব্যবস্থা অনুসৃত হইত। কিন্তু সভ্য ইংরাজের সভ্যনীতি অনুসারে প্রতি বৎসর উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ নির্দ্ধারিত করিয়া রাজকর আদায় করা সমস্যার বিষয়। তাহার উপর শস্য লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করাও এক বিষম বিপদ। সুতরাং ইংরাজ রাজনৈতিকেরা রাজভাগের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া ভূমির পরিমাণানুসারে অর্থ গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থায় প্রজা অজন্মা সুজন্মায়, শুকা হাজায় সরকারকে সমান খাজানা সরবরাহ করিতে বাধ্য হইল। তাহার উপর শস্যের মূল্য যেমন যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, প্রজার করের মাত্রাও তেমনি বাড়িতে লাগিল। এই খানেই সে অব্যাহতি পাইল না। দেশের রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ, সরকারী পূর্ত্ত কার্য্যের ব্যয়, ডাক ঘরের ব্যয়, ইত্যাদির জন্যও তাহার ভূমির পরিমাণানুসারে বা ভূরাজস্বের হার অনুসারে রোডসেস, পবলিক ওয়ার্কসসেস, ডাক বেতনাদি তাহার স্কন্ধের উপর চাপিল। এসকলও দুর্বৎসরে বা মন্বন্তরে তাহাকে

সমান ভাবে সরবরাহ করিতে হইল। যদি উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ বা পঞ্চমাংশের মূল্য হইতে প্রজা ইহা দিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার ক্লেশের কারণ থাকিত না। কিন্তু তাহা নহে, এ সকল কর প্রদান করিতে অনেক স্থলে প্রজাকে তাহার অর্দ্ধেক শস্য বিক্রয় করিতে হয়, আর অজন্মার সময় মহাজন করিতে হয়। মহাজন করিলে সুদ দিতে হয়, তাহাও ঐ শস্য বেচিয়া দিতে হয়। এইরূপে তাহার মুখের অন্ন অপরকে দিয়া সে কাল কাটাইতেছে। ঋণ একবার ঘাড়ে চাপিলে আর তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দায়। এই জন্যই ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভ হইতে এদেশের কৃষকগণ অল্পে অল্পে ঋণগ্রস্ত হইয়া এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, এখন তাহাদিগের উদ্ধারের আর উপায় নাই।

যে দেশের অধিকাংশ লোকের এইরূপ দুরবস্থা সে দেশের উন্নতির আশা কোথায়? কেবল তাহাই নহে, রাজারই বা মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? এই জন্যই প্রাজ্ঞ ইংরাজ রাজনৈতিকগণ অনেক দিন হইতে প্রজাকে কিরূপে ঋণদায় হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব ও ভাবী বড়লাট লর্ড কার্জ্জন একটি সুব্যবস্থার সূত্রপাত করিয়াছেন। ইহাতে প্রজার অবস্থা কতদূর ভাল হইবে তাহা এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত না হইলে বুঝা যাইবে না। তবে যখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এতদ্দ্বারা মঙ্গলের আশা করিতেছেন তখন আমরাও সাধারণের মনে নিরাশার সঞ্চার করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যে এই ব্যবস্থায় রোগের উপসর্গ প্রশমিত হইলেও উহার মূল কারণ নষ্ট হইবে না। ইহাতে কতকাংশ প্রজা অল্প সুদে ঋণ পাইয়া মহাজনের গ্রাস হইতে কতকটা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও হইতে পারিবে, কিন্তু তাহার দারিদ্র্য দূর হইবে না। যতদিন প্রজা অযথা ভূ-রাজস্ব ভারে ও তদানুসঙ্গিক করভারে প্রপীড়িত হইবে, ততদিন তাহার অবস্থার উন্নতি হইবে না। মহাজনের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্যইত গবর্মেণ্ট তকাবী দাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যবস্থায় কত প্রজা আপনার অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে? অবশ্য তকাবী দাদন গ্রহণের অনেক অসুবিধার জন্যই অল্প সুদে টাকা পাইলেও প্রজারা তদ্দ্বারা উপকার লাভের চেষ্টা করে না। নূতন ব্যবস্থাতেও সেইরূপ কতকগুলি অসুবিধা আছে; তাহাতে আমাদিগের আশঙ্কা হয় রাজপুরুষেরা যে অভিপ্রায়ে এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অল্প। এক্ষণে এই ব্যবস্থাটি কি তাহা আমরা বলিতেছি।

পল্লীগ্রামের কৃষক বা অন্যান্য শ্রমজীবিরা যাহাতে মহাজনের নিকট ঋণ না করিয়া, পরস্পর যোট বাঁধিয়া একটা মূলধন সংগ্রহ করিয়া, তাহা হইতে আপনাদের প্রয়োজনমত অল্প সুদে ঋণ লইতে পারে, গবর্মেণ্ট সেইজন্য একটি আইন করিয়া দিয়াছেন। গত মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সকল সদস্যের সম্মতিতে এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই আইনের নাম Co-operative Credit Societies' Act. এই আইন অনুসারে রাজপুরুষদিগের সম্মতি লইয়া যে কোন পল্লীগ্রামে বা সহরঘেঁষা পল্লীগ্রামে দশ জন বা ততোধিক লোকে একত্র চাঁদা করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রাম্য ব্যাংক সংস্থাপন করিতে পারিবে। সেই ব্যাংক হইতে তাহাদিগের মধ্যে যে কেহ আপনার প্রয়োজন মত অল্পসুদে টাকা ঋণ লইতে পারিবে। যাঁহারা উত্তমর্ণ কেবল তাহারাই অধমর্ণ হইতে পারিবেন, অন্য কেহ এই সমবায় সমিতিতে ঋণ গ্রহণে সমর্থ হইবে না। এইরূপ সমিতির আবার দুইটী শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। অজ পল্লীগ্রামে যে সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার অংশাদার গণের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ কৃষিজীবী লোক হওয়া চাই। আর সহরঘেঁষা পল্লীগ্রামে পাঁচ ভাগের চারিভাগ কৃষিজীবী ভিন্ন অন্য ব্যবসায়ী লোকের অংশীদার হওয়া প্রয়োজন। এই সকল সমিতিতে কোন অংশীদার হাজার টাকার অধিক অংশ রাখিতে পারিবেন না। অংশীদার দিগের চাঁদায় যে মূলধনের সৃষ্টি হইবে, ঋণ দিবার জন্য তাহার অধিক টাকার প্রয়োজন হইলে, সরকারী তহবীল হইতে সাহায্য করা হইবে। কিন্তু সকল অংশীদারে জড়াইয়া যত টাকা মূলধন সংগ্রহ করিবেন, গবর্মেণ্ট তাহার অধিক টাকা দিবেন না এবং

কুত্রাপি তাঁহারা দুই হাজার টাকার অধিক সাহায্য দান করিবেন না। বলা বাহুল্য এই টাকার জন্য গবর্মেণ্টকে সুদ দিতে হইবে এবং যথা সময়ে তাঁহাদিগের সে টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। পল্লীগ্রাম সমিতির প্রত্যেক অংশীদার অপরের ঋণের জন্য দায়ী থাকিবেন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে যে কোন অংশীদারের নিকট হইতে তাহা আদায় করিতে পারা যাইবে। কিন্তু সহরঘেঁষা পল্লীগ্রাম সমিতির অংশীদারগণ আপনাদিগের অংশের পরিমাণানুসারে অপরের ঋণের জন্য দায়ী থাকিবেন; অর্থাৎ যাঁহার যেমন অংশ তাঁহার নিকট হইতে সেই হিসাবে অসমর্থ ঋণীর ঋণ আদায় করা হইবে। অংশীদার দিগের সংগৃহীত মূলধন ও গবর্মেণ্টের প্রদত্ত টাকার উপরও যদি টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সমিতির সভ্যেরা অংশীদার ভিন্ন অন্যের নিকট হইতেও ঋণ লইতে পারিবেন। পল্লীগ্রাম সমিতির অংশীদারেরা লভ্যাংশ পাইবেন না। সমিতি টাকা খাটাইয়া যাহা লাভ করিবেন তাহা স্বতন্ত্র হিসাবে গচ্ছিত থাকিবে। যখন দেখা যাইবে এই গচ্ছিত টাকা সমিতির দেনার সমান হইয়াছে এবং যখন তাঁহারা কমহারে সুদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন, তখন বার্ষিক লভ্যাংশের চারিভাগের তিনভাগ অংশীদারগণ বণ্টন করিয়া লইতে পারিবেন। সহরঘেঁষা পল্লিগ্রামের সমিতিতে লভ্যাংশের সিকি অংশ গচ্ছিত রাখিতে হইবে, অবশিষ্ট অংশীদারগণ বণ্টন করিয়া লইতে পারিবেন। এই সমিতি রেজিষ্টারী করিবার জন্য গবর্মেণ্ট কোন ফি লইবেন না; অংশীদার দিগের অন্য কোন দেনার জন্য এই সমিতির মূলধনের অংশ ক্রোক হইবে না; সমিতির লভ্যাংশের জন্য ইন্‌কম্‌ট্যাক্স দিতে হইবে না এবং যৌথ কারবারের আইন এই সকল সমিতি সম্বন্ধে খাটিবে না। আইনে এইরূপ অনেক সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আমরা সংক্ষেপে 'কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী বা যৌথ মহাজন সমিতির আইনের মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে এতদ্দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইবে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। যদিও কৃষিজীবী ভিন্ন অন্য লোকেও এই সকল সমিতির অংশীদার হইতে পারিবে, কিন্তু প্রধানতঃ কৃষিজীবিদিগেরই জন্য ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আইনে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে পল্লীগ্রাম সমিতির পাঁচভাগের চারিভাগ অংশীদার কৃষিজীবী হওয়া প্রয়োজন। এক্ষণে এই সম্প্রদায়ের লোকের অবস্থা কিরূপ তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। আমরা জানি কোন কোন স্থলে এমন কৃষিজীবী আছে যাহারা একেবারেই ঋণগ্রস্ত নহে, এই সকল লোক মনে করিলে আপনাদিগের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা সমিতির অংশ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের ইহাতে কোনরূপ স্বার্থ নাই, কেননা তাঁহাদিগের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন নাই। লাভের আশা থাকিলেও তাঁহারা কিছু অংশ এইরূপ সমিতির কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাও সুদূরপরাহত। সুতরাং এশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্তির আশা নাই। আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা আবাদের সময়ে ঋণ করে আবার আবাদ উঠিলেই তাহা পরিশোধ করে, মহাজন দিগের নিকট ইহাদিগের মাথা বিকায় নাই; সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেরা এই নূতন ঋণ দান সমিতির অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু প্রধানতঃ যে সম্প্রদায়ের জন্য এই সকল সমিতির সৃষ্টি হইবে ইহা তাহাদিগের উপকারে আসিবে কিরূপে? প্রথমতঃ অংশ গ্রহণ করিবার উপযোগী মূল ধন ইহাদিগের ঘরে আদৌ নাই। যদি কেহ কম সুদে টাকা পাইবার লোভে স্ত্রী বা কন্যার দুই এক খানা অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া অংশ গ্রহণ করে, তাহারই বা ঋণ দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় কোথায়? সে পূর্ব্বে মহাজনের নিকট হইতে যে ঋণ করিয়াছে তাহা পরিশোধ হইবার উপায় কি? সে ত মহাজনের ঋণ শোধ করিবার জন্য সমিতির নিকট হইতে ঋণ পাইবে না? আইনে ত সে ঋণের জন্য টাকা দিবার ব্যবস্থা নাই। সুতরাং তাহার মহাজনের ঋণ বজায় থাকিলে, তাহাকে তাহার নিকটই ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা সে তাহার ভিটা মাটী উৎসন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকের এই সমিতির দ্বারা কোন উপকার সাধিত হইবে না—অথচ ইহাদিগেরই

সংখ্যা অধিক। পূর্ব্বে এক বার এইরূপ ব্যবস্থার উদ্যোগ করিয়া রাজপুরুষেরা নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে "The Bank could not hope to succeed unless it could start in a field where the agricultural classes are unencumbered with debt or were enabled to liquidate their existing debts on reasonable terms." অর্থাৎ যেখানে কৃষিজীবিরা অঋণী নহে অথবা যেখানে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থায় তাহাদিগের বর্ত্তমান ঋণ শোধ করিবার ব্যবস্থা করা না যাইবে, তথায় এরূপ ব্যাংক কার্য্যকর হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদিগের বোধ হয় যদি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী হইতে পূর্ব্ব ঋণ শোধ করিবার জন্য ঋণ দিবার ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে তাহা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকিত এবং তাহার প্রতিষ্ঠারও সার্থকতা হইত। আইনে ব্যবস্থা আছে যে সমিতি অংশীদার ব্যতীত অন্য লোকের নিকট হইতে টাকা ঋণ লইতে পারিবেন, কিন্তু অংশীদার ভিন্ন আর কাহারও নিকট হইতে টাকা গচ্ছিত লইতে পারিবেন না। যখন অন্য লোকের নিকট হইতে ঋণ লইতে পারা যায় তখন গচ্ছিত লইবার ক্ষতি কি আমরা বুঝিলাম না। কর্তৃপক্ষ বোধ হয় কেবল সমিতির সভ্যদিগকে সঞ্চয়াভ্যাস শিক্ষা দিবার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু অন্য লোককে সে শিক্ষা দিলে ক্ষতি কি? সভ্য ব্যতীত অন্য লোকের টাকা গচ্ছিত লইলে সমিতির ভাণ্ডারে এরূপ টাকা জমিতে পারে যাহাতে ঋণ লইবার আবশ্যক না হইতে পারে। কিন্তু কেবল সভ্যদিগের টাকা গচ্ছিত লইলে সে সম্ভাবনা নাই। মধ্য হইতে যে সরিষায় ভূত ছাড়াইবার ব্যবস্থা হইল তাহাতেই ভূত রহিয়া গেল। তাঁহারা কৃষিজীবিদিগকে মহাজনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যে সমিতি স্থাপন করিলেন, সেই সমিতিরই মহাজনের করায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা রহিল।

আমাদিগের বোধ হয় সার উইলিয়ম ও-য়েডারবর্ণ যেরূপ প্রণালীতে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেইরূপ ব্যবস্থা করিলে, অথবা লর্ড ক্রোমার মিসরের কৃষকদিগের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার অনুকরণে গ্রাম্য ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিলে কৃষককুলের প্রকৃত উপকার হইত। মিসরে যে প্রণালীতে কৃষকদিগকে ঋণ দেওয়া হয় আমরা তাহা এস্থলে বিবৃত করিতেছিঃ—

মিসরের ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কৃষকদিগকে শতকরা নয় টাকা সুদে টাকা দেন। যাহাতে কৃষকেরা সহজে ব্যাংকের নিকট কর্জ্জ পায় তাহার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ব্যাঙ্কের নিযুক্ত লোক আছে, ইহারা কৃষকগণের ও ব্যাংকের দালালরূপে কার্য্য করেন। এই সকল দালালেরা তাহাদিগের কার্য্যের জন্য শতকরা একটাকা কমিসন পান। ব্যাংক যে টাকা এই কার্য্যে নিয়োগ করেন মিসরের গবমেণ্ট তজ্জন্য ব্যাঙ্ককে ৩ টাকা সুদ দিবার জন্য দায়ী থাকেন। তদ্ব্যতীত তাঁহারা ভূ-রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদিগের নিকট হইতে ব্যাংকের টাকা আদায় করিয়া দেন। ইহাতে ব্যাংকের নিখরচায় টাকা আদায় হয় এবং কৃষকদিগেরও সুবিধা হয়। ১৯০০ সালে মিসরের ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক ৫০২৩ জন কৃষককে ২৮,১২৩ পাউণ্ড ঋণ দিয়াছিলেন; ইহার সমস্ত টাকাই বর্ষ শেষে আদায় হইয়াছিল। তাহার পর ১৯০১ সালে প্রায় ১৫০০০ লোক ৪,০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ লয়। এক বৎসরের মধ্যে কার্য্যের কত উন্নতি হইয়াছে! ১৯০৩ সালের শেষে ৭৮৯১১ জন লোকে ২১,৮৬,৭৩৬ পাউণ্ড ঋণ লইয়াছে। এইরূপে উত্তরোত্তর ইহার কার্য্যের প্রসার হইতেছে। লর্ড ক্রোমার বলেন যে, এই কার্য্য যেরূপ সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে, তাহাতে তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস গবমেণ্টকে অনুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। এদেশেও কোন ব্যাঙ্কের দ্বারা এইরূপ ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিলে গবমেণ্ট কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না—পক্ষান্তরে সকল শ্রেণীর কৃষি ও শ্রমজীবিদিগের উপকার সাধন করিতে পারিতেন। এদেশের কৃষকেরা ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কখনও ইনসলভেণ্ট আদালতের আশ্রয় লয় না বা তামাদি করিয়া উত্তমর্ণকে ফাঁকি দেয় না। যাহারা পিতৃ-পিতামহাদির কৃত ঋণ অকাতরে শোধ করে, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ঋণ লইয়া যে তাহারা কোনরূপ প্রতারণা করিবে ইহা অসম্ভব। যাহা হউক, এত কালের পর গবমেণ্ট যে কৃষকদিগের

উপকারের জন্য এত টুকু করিতেও অগ্রসর হইয়াছেন এজন্য আমরা তাঁহাদিকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

আমরা আশা করি আমাদিগের পল্লী গ্রাম সমূহের শিক্ষিত লোকেরা এইরূপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী স্থাপনের জন্য যত্নবান হইবেন। পল্লীগ্রামের ভদ্রলোকেরাও প্রায় কৃষিজীবী; সুতরাং তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়া এইরূপ সমিতি সংস্থাপনের সহায়তা করিতে পারেন। এতদ্বারা তাঁহারা কতক পরিমাণে দেশের নিরন্ন কৃষকদিগকে ঋণদায় হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

কবিরাজ

শ্রীবিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন

মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

৫নং কুমারটুলি—কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে পুরাতন জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ছর্দ্দি (বমন), অপস্মার, মূর্চ্ছা, উন্মাদ বাতব্যাধি, বাতরক্ত, আমবাত, শূল, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, প্রমেহ, শোথ, উদর, অম্লপিত্ত, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, স্ত্রীলোকের বিবিধ রোগ ও বালরোগের আয়ুর্ব্বেদোক্ত নানাবিধ কাষ্ঠৌষধ, ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মোদক, দ্রাবক, ধাতুভস্ম, মকরধ্বজ ও মৃগনাভি প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মফস্বলের অধিবাসিগণ রোগের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানাইলে ভ্যালুপেবল ডাকে ঔষধ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

আমাদের ঔষধালয় ভারতবর্ষস্থ কৃতবিদ্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে—এমন কি আসিয়াখণ্ড উল্লঙ্ঘন করিয়া সাগর-পারস্থ সুদূর ইংলণ্ডবাসিগণের মধ্যেও কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ নিম্নে কয়েকখানি পত্রের মর্ম্মানুবাদ প্রকটিত করা হইল। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজের পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম না। কারণ সে সব পত্র (কন্‌ফিডেনসিয়েল) গোপনীয় বলিয়া গণ্য।

৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পত্রের সংক্ষিপ্তানুবাদ,—

"আমার বন্ধু কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেনকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। তিনি উচ্চদরের সংস্কৃতাভিজ্ঞ এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন। আজকাল ইংরেজীমতে ডাক্তার হইয়া কবিরাজ-সম্প্রদায়কে কতকটা পশ্চাৎপদ করিয়াছে বলিতে হইবে, কিন্তু এদেশে যতদিন পণ্ডিত বিজয়রত্নের ন্যায় জ্ঞানবান, বহুদর্শী ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন কবিরাজ থাকিবেন, ততদিন হিন্দুচিকিৎসার গৌরব অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিতি করিবে।"

উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর

কে, জি, গুপ্ত স্কোয়ার।

"বিবিধ রোগের চিকিৎসায়, বিশেষতঃ যাপ্য রোগ সমূহের চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর উপযোগিতা ক্রমেই উপলব্ধি হইতেছে। এ সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেন মহাশয় যতদূর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং তিনি রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে যতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন, এরূপ উন্নতিশীল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক অতীব বিরল।"

কমলা

আষাঢ় ১৩১১] [১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।

নানা প্রসঙ্গ

সেণ্ট লুইর প্রদর্শনীর জন্য পাঁচ কোটি ডলার অর্থাৎ পনর কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

* * *

বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের খাসমহল সমূহে কৃষি কার্য্যের উন্নতি কল্পে এ বৎসর পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

* * *

মান্দ্রাজের কলাশিল্প প্রদর্শনীতে কলিকাতার শ্রীযুক্ত যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় "গঙ্গাবক্ষে চন্দ্রোদয়" চিত্র প্রদর্শন করিয়া একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইয়াছেন।

* * *

আগামী বর্ষে লণ্ডন নগরে একটি প্রদর্শনী হইবে। বৃটিশ উপনিবেশ সমূহ ও ভারতের শিল্প বাণিজ্য সামগ্রী ইহাতে প্রদর্শিত হইবে। ১৯০৫ সালের ১লা মে তারিখে প্রদর্শনী খুলিবার কথা আছে। গ্রেট বৃটনের অধীনস্থ রাজ্য সমূহের বাণিজ্য বিষয়ক, সামর্থ্য পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই এই প্রদর্শনী সূচিত হইয়াছে।

* * *

কোচিনের রাজা তাঁহার একজন প্রজাকে চিত্রবিদ্যা জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছেন। এজন্য বাম্বুরের স্বনামখ্যাত চিত্রকর রাজা রবি বর্ম্মা রাম পাথুরাল নামক এক জন মান্দ্রাজী যুবককে মনোনীত করিয়াছেন। রাম পাথুরাল এক জন কৃতবিদ্য যুবা। তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছাত্র।

* * *

কুমারী অন্তরীপে এক প্রকার লাল রংয়ের বালি বাহির হইয়াছে। মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ ইংরাজ সওদাগর প্যারি কোম্পানি ঐ বালি বিলাতে রপ্তানি করিতেছেন। বিলাতে উহা পালিসের কাজে ব্যবহার হইতেছে। ৪০ টাকা করিয়া টন দরে উহা বিক্রয় হইতেছে। য়ুরোপীয়েরাই মাটিকে সোণায় পরিণত করিতে জানেন।

* * *

গত বৎসর বঙ্গদেশে ১১৪,৮৬,৫০০ বিঘা জমীতে সরিষা, তিসি প্রভৃতি তিলি শস্যের আবাদ হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা ৫,১৫,৪০০ বিঘা অধিক আবাদ হইয়াছিল। নদীয়া, বগুড়া, ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, পাবনা, গয়া, ভাগলপুর মালদহ, সাঁওতাল পরগণা, আঙ্গুল, হাজারিবাগ, রাঁচি ও পালামৌ এই কয় জেলায় এই চাষের উন্নতি হইয়াছে।

* * *

মান্দ্রাজের গুটি জেলায় তথাকার কৃষি সভার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে একটি কৃষি প্রদর্শনী হইবে। এই প্রদর্শনীতে একটি জলোদ্ধরণ যন্ত্র ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্র প্রদর্শিত হইবে। সৈদাপেথের কৃষি কালেজ আব কাটিবার যন্ত্র, শস্য কাটিবার যন্ত্র ও আরও দুই একটি নূতন যন্ত্র তথায় প্রদর্শনার্থ পাঠাইবেন। মান্দ্রাজবাসীগণ দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। বঙ্গ দেশের জেলায় জেলায় এইরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে কি আমাদের দেশবাসীগণ উদ্যোগী হইবেন না?

* * *

বর্দ্ধমানের প্রাদেশিক সমিতিতে এ বৎসর এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল যে যাহাতে দেশের লোক সাধ্যমত দেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য প্রত্যেক জেলায় এক একটি সভা স্থাপনেরও প্রস্তাব হইয়াছিল। এই সকল সভা এদেশজাত সামগ্রীসকলের প্রতি স্থানীয় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণে যত্ন করিবেন ও সেই সঙ্গে স্থানীয় শিল্পাদির কথা সাধারণে প্রকাশ করিবেন। ইহাতে স্থানীয় শিল্প সামগ্রী সকল অন্য স্থানে বিক্রয় হইবার সুবিধা হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত সভা স্থানীয় অভাবাদির বিষয়ও প্রকাশ করিবেন। সমিতির এই প্রস্তাব যে প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কি চেষ্টা হইতেছে তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমিতি একটি সব কমিটি নিযুক্ত করিলে কতকটা কাজের আশা করা যাইত, তাহা না করিয়া শুধু একটা প্রস্তাবে কি ফল হইবে?

* * *

আজ কাল ইংলণ্ডে প্রভূত পরিমাণে কদলী আমদানী হইতেছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে এক লক্ষ, দেড় লক্ষ কাঁদি নানা স্থান হইতে চালান হইয়া আসে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ ক্যানারিজ ও কোষ্টারিকা হইতেই আমদানী হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ২০ হাজার হইতে ৪০ হাজার কাঁদির অধিক আমদানী হইত না। কিন্তু যেমন আমদানী বাড়িতেছে সঙ্গে সঙ্গে কাটতি ও বাড়িতেছে অথচ মূল্য কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে জ্যামেকা দ্বীপে ঝড় হওয়াতে তথাকার সমস্ত কলার বাগান নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আবার তাহা চায়েন হইয়া উঠিয়াছে। বিলাতে কদলীর যথেষ্ট আদর দেখিয়া তথাকার লোক ইহার আবাদে যত্নবান হইয়াছে। আমাদের দেশ হইতে চাঁপা ও মর্ত্তমান চালান দিতে পারিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। আজ কাল ফল পাঠাইবার জন্য জাহাজে বায়ু শীতল রাখিবার যে এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে, (Refrigrigerating machine) তাহাতে ফল পচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতি অল্প ধনেই এই ব্যবসায় চালান যাইতে পারে; কেবল একটু উদ্যোগের প্রয়োজন। বিলাতে পাঠাইতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, আবশ্যক হইলে আমরা তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারি।

* * *

ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টের খনি বিভাগ শ্বেতাঙ্গদিগের একাধিকৃত। অনেক বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া দুই জন বাঙ্গালী এই বিভাগের উচ্চপদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু মহাশয় সর্ব্ব প্রথম। বাঙ্গালীকে এই বিভাগের উচ্চপদ প্রদানের প্রতিকূলে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, সে সমস্তই যে অকিঞ্চিৎকর, বসু মহাশয় বিশ বৎসর কাল উক্ত বিভাগে কার্য্য করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী না হইলে বোধ হয় উক্ত বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিতে পারিতেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত বিভাগের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে এই উপলক্ষে ইংলিসম্যান প্রভৃতি পত্রিকা তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং পত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন "During his long and official career his knowledge and achievement did much to dispel the old mistaken belief that natives of India are unqualified for original research and investigation in the domain of the Field Geologist." অর্থাৎ ভূতত্ত্ব বিষয়ের মৌলিক অনুসন্ধানে ভারতবাসীরা অশক্ত বলিয়া যে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল, দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার ধীশক্তি ও কার্য্যদক্ষতার দ্বারা তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়াছেন।

* * *

ইংলিসম্যান বলিয়াছেন যে ভারতের ভূগর্ভে কোথায় কি নিহিত আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার লোকের বড়ই অভাব ছিল। যাঁহারা খনির কার্য্যে টাকা খাটাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এজন্য বিলাত হইতে কোন খনিতত্ত্ববিদকে আনয়ন করিতে হয়, ইহাতে যথেষ্ট ব্যয় হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু মহাশয় রাজকার্য্য হইতে অবসর লওয়াতে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইল। এখন আর বিলাত হইতে লোক আনিবার প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার দ্বারা সে কার্য্য সন্তোষজনকরূপে সম্পাদিত হইবে। বসু মহাশয় আসাম প্রদেশস্থ খনি সমূহের অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে এবং সে জন্য য়ুরোপীয় ধনীরা তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। সম্প্রতি ময়ূরভঞ্জের উন্নতিশীল মহারাজ বসু মহাশয়কে তাঁহার রাজ্যের খনির অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা আশা করি বসু মহাশয়ের সহায়তায় আমাদিগের দেশীয় ধনীগন খনির কার্য্যে টাকা নিয়োগ করিতে অগ্রসর হইবেন।

* * *

এই উপলক্ষে আমরা শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাহার নামোল্লেখ করিয়া সাধারণকে অবগত করিতেছি, যে ইনিও এদেশে খনিতত্ত্বে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য সরকার হইতে বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট ইহাঁকে খনি বিভাগে চাকরি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি সরকারী কার্য্যে বদ্ধ থাকিতে চাহেন না বলিয়া তাহা লইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। খনির অধিকারীরা অথবা যাঁহারা খনির কার্য্য করিতে ইচ্ছুক এরূপ ব্যক্তিগণ ইহাঁর নিকট হইতেও পরামর্শ লাভ করিতে পারেন।

* * *

যে অবধি এদেশে য়ুরোপ হইতে বীটের চিনি আমদানী আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে এদেশের চিনির ব্যবসায়ীদিগের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। এদেশে য়ুরোপীয় চিনির প্রচলন করিবার জন্য জর্ম্মাণী অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে রাজকোষ হইতে চিনির ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য করা হইত। এজন্যই য়ুরোপীয় চিনি দেশী চিনি অপেক্ষা সস্তাদরে বিক্রয় হইত। এইরূপ অন্যায় প্রতিযোগিতায় দেশী কারবার নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ১৯০২ সালে ভারত গবর্মেণ্ট বৈদেশিক চিনির উপর শুল্ক গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থায় এদেশীয় চিনির ব্যবসায় একটু মাথা তুলিয়াছিল। কিন্তু আবার সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

* * *

য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের ব্রসেলে এক মহাসভা হয়, তাহাতে জর্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া জ্ঞাপন করেন যে তথাকার রাজভাণ্ডার হইতে চিনির ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য দান বন্ধ করিয়াছেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করেন নাই। রাজভাণ্ডার হইতে অর্থ দান বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাকার রেলওয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও জাহাজের মালিকেরা চিনির ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, যে সকল জাহাজে চিনি প্রেরিত হয়, সুয়েজ খালে সে সকল জাহাজের মাশুল কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ নানা কৌশলে রাজকীয় সাহায্য

যত্নের ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং ঐ সকল চিনি বিলক্ষণ সস্তা দরে বিক্রয় হইতেছে। প্রায় ছয় কোটি টাকা মূল্যের এইরূপ চিনি এদেশে আমদানী হয়। দেশের কত টাকা ক্ষতি হইতেছে ইহাতে তাহা উপলব্ধ হইবে। যাহাতে দেশী চিনীর ব্যবসা নষ্ট না হয় তাহার গবমেণ্টের তাহার সদ্ব্যবস্থা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। আজকাল সাহেবেরা এদেশে ইক্ষুর আবাদ করিতেছেন, এজন্য তাঁহারা চেষ্টিত হইলে ফল লাভের সম্ভাবনা।

* * *

মাদ্রাজের গোদাবরী জেলায় আকের আবাদে বড় ক্ষতি হইতেছে। আলুর ন্যায় আকেও রোগ দেখা দিয়াছে। এজন্য গবমেণ্ট তথাকার কোম্পানিবাগানের তত্ত্বাবধারককে উহার কারণানুসন্ধান ও প্রতিকারের চেষ্টা করিতে আদেশ করেন। তিনি নানা প্রকার পরীক্ষার দ্বারা এই চাষের উন্নতি সম্বন্ধে কয়েকটি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আমরা বিবেচনা করি বাঙ্গালার কৃষকেরাও এই উপায় অবলম্বন করিয়া ইক্ষুর উন্নতি সাধন করিতে পারেন। কৃষকেরা সাধারণতঃ আকের আবাদে অতিরিক্ত জল দিয়া থাকে, ইহা আবদের পক্ষে বড় অনিষ্টকর। আকে জলের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ধানের মত অধিক জলের আবশ্যক নাই। অতএব জল সেচন করিয়া যাহাতে ক্ষেত্র হইতে সে জল বাহির হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতবার জল দিবে ততবারই নালা কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিবে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উচ্চ ও নামাল ভূমির আক। প্রথমোক্ত শুষ্ক ভূমিতে যেমন আক ভাল জন্মে নামাল ভূমিতে সেরূপ জন্মে না। ধান ক্ষেতের নিকট আকের আবাদ করা ভাল নহে। বীজ রোপণ করিবার সময় বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। যে বীজে বা গাঁটে একটু লাল দাগ আছে তাহা কদাচ রোপণ করিবেনা। লাল দাগ থাকলেই বুঝিতে হইবে যে উহা রুগ্ন। রুগ্ন বীজ হইতে ভাল ফসলের আশা করা যায় না। এক স্থানে অনেকগুলি গাঁট রোপণ করা উচিত নহে। এক যায়গায় দুইটি গাঁটের অধিক পুঁতিবে না এবং বীজগুলি অন্তরে অন্তরে বসাইবে; এরূপ করিলে গাছকে জড়াইয়া বাঁধিবার আবশ্যক হইবে না, উহা আপনি খাড়া হইয়া উঠিবে। জমীতে গভীর রূপে চাষ দিতে হইবে ও রীতিমত সার দিতে হইবে। পূর্ব্ববারের আকের শুষ্ক পাতা প্রভৃতির সহিত লাঙ্গল দিতে পারিলে ভাল হয়। যে জুলির ভিতরে বীজ রোপণ করিবে সে গুলি যেন পরস্পর তিন চারি ফিট অন্তরে কাটা হয়। গাঁটগুলি রোপণ করিয়া এবং তাহা আলগা মাটি দিয়া ঢাকিয়া তাহার পর জল সেচন করাই ভাল; তাহা না পারিলে রোপণ করিবার পূর্ব্বেই জল দিবে, কিন্তু জল সেচনের অধিক দিন পরে রোপণ করা একেবারেই কর্ত্তব্য নহে। জমী নিড়াইবার সময় সাবধান হইতে হইবে যেন গাছগুলি কোনরূপে মাড়াইয়া ফেলা না হয়।

* * *

মাদ্রাজ শিল্পবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল আলফ্রেড চ্যাটারটন সাহেব ভারতবাসীর একজন পরম মিত্র। ইনি এদেশের কৃষি শিল্পাদির জন্য যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজের শিল্প বিদ্যালয়ের দিন দিন উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মাদ্রাজের শিল্প বিদ্যালয়ে কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়ের মত কেবল কলাশিল্পের শিক্ষা প্রদান করা হয় না। তথায় শ্রমশিল্পের বিশেষ অনুশীলন হইয়া থাকে। এই শিল্প বিদ্যালয় আলুমিনমের বাসনাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আবার তথায় চামড়া তৈয়ারী করণ (Leather tanning) বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হইয়াছে। এদেশ হইতে যে পরিমাণ কাঁচা চামড়া য়ুরোপ ও মার্কিনে রপ্তানি হয়, তাহার অর্দ্ধেকও যদি তৈয়ারী অবস্থায় প্রেরণ করা যায় তাহা হইলে দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হয়—সহস্র সহস্র লোক অন্নকষ্ট হইতে রক্ষা পায়। আমাদিগের বোধ হয় একটু চেষ্টা করিলে এদেশে পরিষ্কৃত চামড়া প্রস্তুত করিবার কারখানা সংস্থাপিত হইতে পারে। যে সকল মসলা দিয়া চামড়া তৈয়ার করা হয় তাহার সমস্তই এদেশে পাওয়া যায়, কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে শিক্ষার প্রয়োজন। চ্যাটারটন সাহেবের কল্যাণে দক্ষিণ ভারতে সে অভাব পূরণ হইতে চলিল। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

* * *

পরিষ্কৃত চামড়া প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রোলাণ্ড নগেন্দ্রলাল চন্দ্র একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় এই ব্যবসায়ের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, যে সকল স্থানে এই ব্যবসায় পরিচালিত হয় তাহার বিবরণ, চামড়া পরিষ্কার করিবার প্রণালী ও তাহার মসলাদির কথা ও যন্ত্রাদির চিত্র ও ব্যবসায়ের উন্নতির উপায় প্রভৃতি নানা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নানা প্রকার বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও এই ব্যবসায় একেবারে নষ্ট হয় নাই; সুতরাং একটু চেষ্টা করিলে যে ইহার উন্নতি সাধিত হইতে পারে সন্দেহ নাই। চন্দ্র মহাশয় দেশের লোককে সে বিষয়ে চেষ্টাবান্ হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই ব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে প্রধান অন্তরায় জাত্যভিমান। শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সে অভিমান পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। কিছুদিন পূর্ব্বে আগ্রায় ষ্টুয়ার্ট ট্যানারী নামে একটি চামড়ার কারখানা স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা একজন পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ। ইনি স্বহস্তে কারখানায় চামড়া তৈয়ার করিতে শিখিয়াছিলেন। তাহাতে অপমান বোধ করেন নাই। এই ব্রাহ্মণসন্তানের দৃষ্টান্ত শিক্ষিত যুবকদিগের অনুকরণীয়। শিক্ষিত যুবকদিগকে শ্রমশিল্পে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদিগকে বিলাত পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদিগের বোধ হয় ইহার আনুসঙ্গিক জাত্যভিমান পরিত্যাগ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান প্রয়োজন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এ জীবনসংগ্রামের দিনে অবলম্বন করিয়া থাকিলে জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। চন্দ্র মহাশয়ের পুস্তিকা খানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহা বাঙ্গালাতে প্রকাশিত হইলে অনেকের উপকার হইত। আমরা সময়ান্তরে ইহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

* * *

ভারতবর্ষ হইতে মার্কিণে প্রায় বৎসরে ৯ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার পণ্য প্রেরিত হয়, আর মার্কিণ হইতে ভারতে কিঞ্চিদূন ৮ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি আমদানী হইয়া থাকে। ইহাতে মার্কিণকে ভারতে অনেক টাকা পাঠাইতে হয়। আমদানী বাদে রপ্তানির জন্য মার্কিণ যত টাকা এদেশে পাঠান তাহা তদ্দেশের এক প্রকার ক্ষতি, কেন না দেশের ধন বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। যাহাতে এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় মার্কিণেরা তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেছেন। কলিকাতায় মার্কিণের যে কন্সাল জেনেরেল বা প্রতিনিধি আছেন তিনি নিজ সাধারণতন্ত্রের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে মার্কিণের সমস্ত শিল্পজাতসামগ্রী যাহাতে এদেশীয় ব্যবসায়ীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এজন্য কলিকাতায় একটি প্রদর্শনী গৃহ সংস্থাপিত করা হউক। এই গৃহে এদেশের লোকের উপযোগী সমস্ত শিল্প সামগ্রীর নমুনা থাকিবে ও তথায় উপযুক্ত কর্ম্মচারী সকল সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিবে।' তাঁহারা ঐ সকল নমুনা দেখাইয়া এদেশের ব্যবসায়ীদিগকে মার্কিণজাত দ্রব্য সকল বিক্রয় করিবেন। এদেশীয় লোকের দৃষ্টি যতই মার্কিণজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, ততই সেই সকল সামগ্রী অধিক বিক্রয় হইবে।

* * *

ইংরাজ, জর্ম্মণ, ফরাসী, মার্কিণ, জাপানী, এমনকি সুইডিসেরা পর্য্যন্ত এইরূপে ভারতের অর্থ লইয়া যাইতেছেন, আর আমরা হাঁ করিয়া বসিয়া আছি। বিদেশীয় দিগের ভারতের অর্থ লুণ্ঠনের এই সকল চেষ্টা দেখিয়াও কি আমাদিগের চৈতন্য হইবে না? আজ কাল আমাদের দেশের কল কারখানা হইতে আমাদিগের ব্যবহারোপযোগী অনেক সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু অনেকে তাহা জানেন না। যাহাতে নিত্যব্যবহার্য্য দেশীয় শিল্প সামগ্রীর প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। দেশীয় কারখানা সমূহের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সম্মিলিত হইয়া এবিষয়ে চেষ্টা করা আবশ্যক। পাশ্চাত্য জাতি যেরূপে দেশ দেশান্তরে আপনাদের ব্যবসায় বিস্তৃত করেন, আমাদিগের তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজন।

* * *

সবে মাত্র ৩৫ বৎসর জাপান সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। দেশে বিবিধ প্রকার বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার জন্য এই ৩৫ বৎসরে জাপান যাহা করিয়াছেন, তাহাতে সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য দেশ সমূহকে পরাস্ত হইতে হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষা সম্বন্ধে জর্ম্মণী য়ুরোপের অগ্রণী। এই জর্ম্মণীর বর্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৮৯১।২ সালে রাজকোষ হইতে ১৬৮,৭৮০ পাউণ্ড মাত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, আর জাপানের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তথাকার রাজভাণ্ডার ১৫৫,৬০০ পাউণ্ড প্রদান করিয়াছেন। ইহা জাপানের পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। বিবিধ শিল্প শিক্ষার জন্য জাপানে ৬০টী বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ৩৭টীতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সাতটিতে শ্রমশিল্প ও ১৬টীতে বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদত্ত হয়। ইহা ব্যতীত তথায় ১৬টী Apprentice School আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা হাতে হাতিয়ারে কাজ করে। অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার জন্য জাপানের ব্যবস্থা অনুকরণীয়।

* * *

রংপুরে একটি কৃষিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ছোট লাট বাহাদুর তথায় গিয়াছিলেন এবং এই কৃষি সভা স্থাপনের কথা শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহাতে প্রত্যেক জেলায় কৃষির উন্নতিকল্পে এইরূপ সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ছোট লাট সাহেবের ইহা বিশেষ ইচ্ছা। তিনি এ জন্য কলিকাতাতে একটী সভা স্থাপন করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সভা মফঃস্বলস্থ কৃষি সভা সমূহের কেন্দ্র স্বরূপ হইবে। কৃষি বা অন্যবিধ ব্যবসায়ে যাঁহারা কৃতকর্ম্মা ও তদ্বিষয়ে যাঁহারা পরামর্শ দানে সমর্থ, ছোট লাট সাহেব তাঁহার প্রস্তাবিত সভায় সেই সকল লোকের সহায়তা প্রার্থনা করেন। সার এণ্ড্রু ফ্রেজার যে এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন তাঁহার কথায় আমরা তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছি। আমরা মফঃস্বলের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অনুরোধ করি যে তাঁহারা স্থানীয় কৃষি কার্য্যের উন্নতির জন্য এক একটি সভা স্থাপন করুন। আজ কাল কৃষি বিষয়ে যে সকল পরীক্ষা হইতেছে তাঁহারা তাহা কৃষকদিগকে বিদিত করিবার চেষ্টা করুন। এ কার্য্যে উদ্যোগী হইলে তাঁহারা গবর্মেণ্টের নিকট হইতেও সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। দেশের এই অন্নকষ্টের দিনে কৃষির উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা এই কার্য্যে সহায়তা করিবেন তাঁহারা দেশবাসীগণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

* * *

স্বামী রামতীর্থ নামে এক জন হিন্দু পরিব্রাজক আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাহাতে এদেশীয়গণ মার্কিণ দেশে গিয়া কার্য্যকারী শিল্পকার্য্যে শিক্ষা লাভ করিতে পারে তিনি তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। মার্কিণের অরিগণ নামক স্থানে Society for the Emancipation of India নামে একটি সভা আছে। যাহাতে স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন দ্বারা ভারতবাসীগণ আত্মনির্ভরশীল হয়, সভার ইহাই উদ্দেশ্য। স্বামী রামতীর্থের পরামর্শানুসারে এই সভা জি, মুখোপাধ্যায় নামে একটি যুবাকে শ্রমশিল্প শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। মহেশ চরণ নামক এক জন পঞ্জাবী যুবা শীঘ্রই এই সভার ব্যয়ে শিক্ষার্থ আমেরিকায় যাত্রা করিবেন। মহেশ চরণ আপাততঃ শিল্প শিক্ষা করিতেছেন। এই অরিগণ সোসাইটির সম্পাদক এদেশের কোন এক জন ভদ্র লোককে লিখিয়াছেন:—"You may rest assured that we will do all we can to carry on the work for the regeneration of Ancient India on social, industrial and economic lines" অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক উন্নতি সাধনের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বিদেশীয়গণ আমাদিগের মঙ্গল সাধন জন্য এরূপ চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়াও কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব?

* * *

দামোদর সিং ও খোদাবক্স নামে দুই জন পঞ্জাবী যুবক

ও চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী এক জন বাঙ্গালী জাপানে শিল্প শিক্ষা করিয়া আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। উচ্চতর শিল্প শিক্ষার জন্যই তাঁহারা তথায় গিয়াছেন। আমেরিকায় যাঁহারা শিক্ষার্থ গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য আমরা প্রকাশ করিতেছি যে তথায় শিক্ষার ব্যয়, বাড়ী ভাড়া ও আহারাদির ব্যয় ইত্যাদিতে মাসে প্রায় ৬০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২০০ টাকা ব্যয় হয়। জাপানে যাহা ব্যয় হয় ইহা তাহার ত্রিগুণ। কিন্তু মার্কিণে একটা সুবিধা আছে এই যে ছাত্রেরা কায করিয়া মাসে প্রায় ৩০ ডলার বা ১০০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় বাড়ী হইতে ১০০ টাকা পাঠাইলেই চলিতে পারে। জাপানে যাইতে হইলে তথাকার ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন হয়, মার্কিণে যাইতে হইলে আর সেজন্য কষ্ট পাইতে হয় না।

তার্পিণ ধুনা ও রজন।

এক জন সুক্ষদর্শী পণ্ডিত এক বার বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ পৃথিবীর সংক্ষিপ্তসার। কথাটা কল্পনা নহে, বাস্তবিকই কি প্রাকৃতিক অবস্থায়, কি অন্য কোন বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীতে যাহা আছে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষে তাহার সমস্তই বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবাসী যদি উদ্যমশাল হইতেন অথবা তাঁহাদিগের উদ্যমশীলতা কোনরূপ প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা প্রতিহত না হইত, তাহা হইলে কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য তাঁহাদিগকে অন্য কোন দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। মানুষের ক্ষুধা নিবারণ বা লজ্জা নিবারণের জন্য যাহা অত্যাবশক বিধাতা ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে তাহার সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবাসী এ বিষয়ে কেবল আপনাদিগের অভাব মোচন করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য জাতির অভাব পূরণ করিয়া আসিয়াছেন। ভারত বাসীকে পশু চর্ম্মের দ্বারা আপনার নগ্নতা আবরণ করিতে কেহ দেখে নাই। কিন্তু কেবল মাত্র অবস্থাবিপর্য্যয়ে আজি সেই ভারতবাসীকে বস্ত্রের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। ভারতে কার্পাসের অভাব নাই, কারিকরেরও অভাব নাই কিন্তু এমনই যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে যে দেশের কার্পাস বিদেশে যাইতেছে, কারিকর হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। রাজনৈতিক কারণে যে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু উদ্যমশীলতার অভাবও যে ইহার অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। একটু উদ্যমশীল হইলে যে আমাদিগকে সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যে পরিমাণে আমরা উদ্যমশীল সেই পরিমাণে আমরা স্বাধীন। আমাদিগের প্রকৃত অধীনতা বিদেশীয় শাসনে নহে, কিন্তু আমাদিগের অভাব মোচনের অসামর্থ্যই আমাদিগকে অন্যের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা বস্ত্রের জন্য ম্যানচেষ্টারের অধীন, লোহার জিনিসের জন্য বর্ম্মিংহাম ও সেফিল্ডের অধীন, কেরোসিন তেলের জন্য মার্কিণ ও রুষের অধীন, এমন কি আজ কাল দেশলাইয়ের জন্য সুইডেন ও জাপানের অধীন। এই অধীনতা দূর করিবার আমাদিগের সামর্থ আছে, এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপাদান ভারতে যথেষ্ট আছে, কেবল একটু উদ্যমের প্রয়োজন। এই উদ্যমের অভাবেই আমরা দিন দিন অন্নহীন ও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি।

বিদেশ হইতে কত বার্ণিস, পালিস এদেশে আসিতেছে, আমরা তাহা ক্রয় করিয়া আমাদিগের গৃহ সামগ্রী সকল চকচকে করিতেছি, কিন্তু তাহার উপাদান যে লাক্ষা তাহা এই ভারতবর্ষের অরণ্যে কতকগুলি কীটে উৎপন্ন করিয়া থাকে। জর্ম্মাণি ও বেলজিয়ম হইতে বৎসরে ৭৫ লক্ষ টাকার কৃত্রিম রং এদেশে আমদানী হয়, কিন্তু যখন এই কৃত্রিম কাঁচা রংএর চলন ছিল না, তখন একমাত্র লাক্ষা হইতেই কত পাকা রং তৈয়ার হইত। ভারতের অরণ্যে কত জাতীয় বৃক্ষ আছে যাহার ফল ও নির্য্যাস বিদেশীয়েরা লইয়া গিয়া পুনরায় তাহা রূপান্তরিত করিয়া ভারতে আনিতেছেন ও আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া ধনবান্ হইতেছেন।

অদ্য আমরা এই অরণ্যজাত একটী সামগ্রীর বিষয় বিবৃত করিব। সে সামগ্রী আর কিছুই নহে —তার্পিণ। সকলেই জানেন ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে এদেশে তার্পিণ আমদানী হইয়া থাকে। এদেশে যে উহা উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন; কিন্তু বাস্তবিক তার্পিণ

অনায়াসে এদেশে প্রস্তুত হইতে পারে। হিমালয় প্রদেশে অরণ্যে এক প্রকার দেবদারু গাছ আছে, তাহার নির্য্যাস হইতে ধুনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদেরা এই সকল দেবদারুকে Pinus longifolia বলেন। এই সকল দেবদারু গাছে ছিদ্র করিলে এক প্রকার তৈলবৎ রস নির্গত হইয়া থাকে। এই সমস্ত রস একত্রিত করিয়া তামার ডেকচিতে চোলাই করিলে এক প্রকার জলবৎ পদার্থ বাহির হয়, উহাকে Essential oil spirit of Turpentine বলে। আর তামার ডেকচিতে যে খাঁকরির মত পদার্থ জমিয়া যায়, তাহাই ধুনা ও রজনে পরিণত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত দেবদারু গাছের নির্য্যাস ডেকচিতে চড়াইয়া আগুনের উত্তাপ দিতে হয়। এই তাপ ২১২ হইতে ৩১৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিলে নির্য্যাস তরল হয়। তারপর উহা ডেকচির তলদেশ সংলগ্ন একটী নলের দ্বারা বাহির হয় ও নলের মুখে যে একটী ছাঁকনি থাকে তাহাতে ঝরিয়া পড়ে। ঐ জলবৎ Essential oil এ যে কিছু ময়লা মাটী থাকে ছাঁকনিতে তাহা পরিস্কৃত হইয়া নিম্নস্থিত গামলায় পড়ে। তৎপরে উহা লোহার বা কাঠের বালতি বা পিপায় পুরিয়া বিক্রয়ার্থ চালান দেওয়া হয়।

চোলাই করিবার সময় যে উত্তাপ প্রদত্ত হয় তাহার ইতর বিশেষে Essential oilএর বর্ণের ও গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, গাছের বয়স অনুসারেও উহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই Essential oil সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত নিম্নশ্রেণীর বার্ণিস ও গালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক হইয়া থাকে। লাক্ষা বা লা হইতে যে চাঁচ গালা (Shellac) বা চাবড়া গালা (Button Lac) প্রস্তুত হয় তাহাতে রজন মিশ্রিত করিতে হয়। অনেক ঔষধাদিতেও রজনের দরকার হয়। ইহার কিছুই নষ্ট হয় না।

Essential oil spirit of Turpentine এবং ধুনা ও রজন করিতে হইলে যেমন দেবদারু গাছের নির্য্যাসকে চোলাই করিতে হয় তার্পিণের জন্য সে সকল কিছুই আবশ্যক হয় না। গাছ হইতে যে (oleo-resin) রজন সংযুক্ত তৈলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয়, তাহাই বস্ত্রাদির দ্বারা ছাঁকিয়া, তার্পিণ বাহির করা হইয়া থাকে। যে দেবদারু গাছ হইতে এই নির্য্যাস বাহির হয়, তাহা একজাতীয় নহে; এবং এই গাছের ইতর বিশেষে তার্পিণ বা Essential Oil এর ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। প্রত্যেক গাছ হইতে বৎসরে তিন সের হইতে চারি সের করিয়া তার্পিণ বাহির হয় এবং একাদিক্রমে ৪০ বৎসর কাল তাহা হইতে ঐরূপ নির্য্যাস বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ প্রতিবৎসর ছিদ্র করিয়া রস বাহির করিলে গাছ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, উহা চিরিয়া ভাল তক্তা পাইবার আশা আদৌ থাকে না। অবশ্য যাঁহারা তার্পিণের জন্য গাছ ইজারা লইবেন তাঁহাদিগের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। কোথাও কোথাও গাছ ছিদ্র করিয়া নির্য্যাস বাহির করিতে হয় না। য়ুরোপের আল্পস পর্ব্বতে এক প্রকার দেবদারু গাছ আছে, তাহার ছালের এক এক স্থানে রস জমিয়া থাকে, জঙ্গলী লোকে ঐ গাছে উঠিয়া সেই স্থান নিংড়াইতে থাকে ও তাহা হইতে রস গড়াইয়া পড়ে। ঐ রস ধরিবার জন্য নিম্নে চোঙ্গার মত পাত্র রাখিয়া দেওয়া হয়।

এক্ষণে কাংড়া অঞ্চলের জঙ্গলে গবর্মেণ্ট তার্পিণ তৈয়ার করিতেছেন। ইহাতে কিরূপ লাভ হইতেছে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকদিগকে বিদিত করিয়াছি। সাধারণ লোকে এই ব্যবসায়ে অগ্রসর হইলে যে গবর্মেণ্ট উহা ছাড়িয়া দিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের কয়জন ব্যক্তি এ বিষয় অবগত আছেন? বিলাত হইতে যে তার্পিণ এদেশে আসে তাহার অনুরূপ প্রস্তুত করিতে না পারিলেও কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কেননা উহা হইতে যে ধুনা বা রজন উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতেই লাভের সম্ভাবনা। এদেশে প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে প্রায় ৫০,০০০ হন্দর ধুনা এদেশে আমদানী হইয়া থাকে, অথচ আমাদিগের অরণ্যস্থ বৃক্ষ সমূহে কত যে ধুনা সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার নির্ণয় নাই। কেবলমাত্র উদ্যমশীলতার অভাবে আমরা এই সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত রহিয়াছি।

উদ্যমশীল মাড়োয়ারীরা আসাম প্রদেশের জঙ্গলে গিয়া রবার বাহির করিয়া আনিয়া কত অর্থ লাভ করিতেছেন। যে অরণ্যে এই সকল রবার গাছ আছে

তাহা বড়ই দুর্গম, কিন্তু মাড়োয়ারীরা নিঃসঙ্কোচে তথায় প্রবেশ করিতেছেন। আসামের রবর মহল মাড়োয়ারীদিগের একচেটিয়া বলিলেই হয়। মাড়োয়ারীদিগের এই উদ্যমশীলতা দেখিয়া আমরা কি নিশ্চেষ্ট থাকিব? তাৰ্পিণের বিষয় যেমন বলিলাম সেইরূপ আরও অনেক জিনিস আমাদিগের অরণ্যে আছে যাহার ব্যবসায় নিযুক্ত হইলে প্রভূত অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে। আমরা ক্রমশঃ সেই সকল সামগ্রীর উল্লেখ করিব।

অগুরু।

অগুরু কি, হিন্দু মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। চন্দনের ন্যায় ইহাও দেবার্চ্চনার একটি উপকরণ। কোথাও কোথাও ইহা কৃষ্ণ-চন্দন বলিয়া আখ্যাত হয়। প্রাচ্য দেশ সমূহে যে সমস্ত গন্ধদ্রব্য বিশেষ আদরণীয় অগুরু তাহার মধ্যে একটি। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই মহামূল্য সুগন্ধি নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রণালীতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কেবল যে হিন্দুরাই ইহা ব্যবহার করেন তাহা নহে, মুসলমান ও য়িহুদীদিগের মধ্যেও ইহার যথেষ্ট প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে যে Lign aloe নামক সুগন্ধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অগুরু ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পুরাকালে আসিয়া খণ্ডের অনেক নৃপতির মৃতদেহ অগুরু চর্চ্চিত করিয়া সংরক্ষিত হইত। অগুরু যে কেবল দেব পূজায় ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, ইহা বিশেষ বিশেষ রোগের ঔষধেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চীন দেশে বহুকাল হইতে উহা ধূনার মত জ্বালাইয়া দেবমন্দির ও গৃহাদি সুগন্ধান্বিত করা হয়। আরবীয়েরা ইহার এত সমাদর করিতেন যে ইহা কোন্ দেশে পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ যে ইহার জন্মস্থান তাহা আরব ভ্রমণকারিরা প্রথমে আসিয়ার অন্যান্য জাতির নিকট প্রকাশ করেন। এক সময়ে ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে অগুরু মধ্য আসিয়ায় ও পারস্যে প্রেরিত হইত এবং তথা হইতে আরবীয়েরা উহা সংগ্রহ করিতেন। আরবীয়েরা অগুরুকে অগর বলেন।

এই অগুরু কাষ্ঠের ব্যবসা যে নিতান্ত অল্প নহে, তাহা অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন। কি পারস্য আরবে, কি চীন জাপানে, কি অন্যত্র, সর্ব্বত্র ইহা ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত হয়। আসামের জঙ্গল মধ্যে সহস্র সহস্র অগুরুবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তথা হইতেই উহা কলিকাতায় আমদানী হয়। কলিকাতাতেই উহা বাছাই করিয়া তুরস্ক, আরব ও পারস্য দেশের মহাজন দিগকে বিক্রয় করা হয়। ব্রহ্মদেশে মারগুইয়ের সন্নিকটস্থ দ্বীপসমূহে অগুরুর গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় উহা "অক্যান" নামে অভিহিত হয়। চীন ও শ্যাম দেশে এই বৃক্ষের অগুরুই রপ্তানি হইয়া থাকে।

শ্রীহট্টের দক্ষিণ-পূর্ব্বে যে সকল পাহাড় আছে তাহারই জঙ্গলে অগুরুর প্রধান আলয়। তদ্ব্যতীত গারো মিকির ও নাগা পর্ব্বতেও উহা দেখিতে পাওয়া যায়। গাছ গুলি খুব বড় বড় হয়। ইহা উর্দ্ধে প্রায় ৬০ হইতে ১০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং বেড়ে প্রায় ৫ হইতে ৮ ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অগুরু গাছের কোন মূল্য নাই বলিলেই হয়। কেন না যাহাকে অগুরু বলে তাহা সকল গাছে থাকে না। প্রাকৃতিক বিশেষ অবস্থাতে এই গাছের কাণ্ড ও শাখা এক প্রকার পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয় ও সেই সময়ে উহার অভ্যন্তরে এক প্রকার ঘোরাল তৈলবৎ রস জন্মে, সেই রস ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর আকার ধারণ করে—উহাই অগুরু। গাছের যে অংশ উল্লিখিতরূপ রসপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া সংগ্রহ করা হয় এবং পরে রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়। গাছের কোন্ অংশ অগুরুপূর্ণ হইয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য কেহ স্থির করিতে পারে না। অনেক সময়ে হয়ত দেখা যায়, দশটা গাছের মধ্যে একটাতে অগুরু আছে, তাহাও হয়ত যথেষ্ট নহে; আবার এরূপ ঘটে, যে একটা গাছেই তিন শত টাকা মূল্যের অগুরু বিশিষ্ট কাঠ পাওয়া যায়। এইরূপ গাছে এক ঘা কুঠার মারিলেই বুঝা যায় তাহাতে অগুরু আছে কি না।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে যাহারা জঙ্গল হইতে এই কাঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে তাহাদিগকে "অগর কমলা" বলে। ব্রহ্মদেশে যাহারা এই কাজ করে তাহাদিগকে "সিলাং" বলে। তাহারা

ঠিক আমাদের দেশের বেদিয়াদিগের মত—কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহাদিগের ঘর বাড়ী নাই। "কমলারা" অনেক লোক একত্রিত হইয়া কাষ্ঠ সংগ্রহার্থ বনে প্রবেশ করে। এই সকল অরণ্য লোকালয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এজন্য তাহারা তিন চারি মাস কিম্বা ততোধিক কালের উপযোগী খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাত্রা করে। বিশ ত্রিশ জন লোক মিলিয়া নৌকা করিয়া এই বনযাত্রা করে। ব্রহ্ম দেশের সিলাংরা তাহাদিগের এই ব্যবসার বিষয় কাহাকেও জানিতে দেয় না। কোন্ বনে এই সকল বৃক্ষ আছে, বা কিরূপ গাছে অগুরু নিহিত থাকে, ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা এক প্রকার মৌন হইয়া থাকে। এই জন্য এই ব্যবসায়ের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য।

অগুরু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে গবমেণ্টের জঙ্গল মহল হইতে অনুমতি লইতে হয়। যেখানে এই সকল বৃক্ষচ্ছেদন করিলে জঙ্গলের কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, সেই সকল স্থানেই এই কাষ্ঠ ছেদনের অনুমতি দেওয়া হয়। এই ব্যবসায় হইতে জঙ্গল মহলের আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৯৪।৯৫ সালে আসামের জঙ্গল মহলে অগুরু কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য ৭৩৯৲ টাকা সেলামী পাওয়া গিয়াছিল, আর ১৯০১।০২ সালে সেই সেলামী ৪৪৩৪৲ টাকায় উঠিয়াছে। ব্রহ্মদেশে বৎসরে প্রায় ১০০০ বিশ (Viss) পরিমাণ অগুরু কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়া থাকে। তথায় ইহার মূল্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে প্রতি বিশ অগুরু কাষ্ঠ ৫৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইত। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে উহার দর ৫০৲ টাকা হইয়াছিল, এখন প্রতি বিশ প্রায় ৬০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

কথিত আছে মুসলমান শাসন সময়ে আসামের কোন রাজা অগুরু কাষ্ঠের দ্বারা রাজকর প্রদান করিতেন। মুসলমান সম্রাট্ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা অগুরুর বড় আদর করিতেন। আকবর বাদসাহ সুগন্ধ দ্রব্যের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। আতর গোলাপ প্রভৃতি খোসবো তিনি যেমন চিনিতেন এই ভারতবর্ষে অন্য কেহ তেমন পারিতেন না। তিনি রাজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য সুগন্ধি অপেক্ষা অগুরুর অধিক আদর করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে চীন দেশে যথেষ্ট পরিমাণে অগুরু ব্যবহৃত হয়। তথায় উহা ধূপের মত জ্বালান হয়। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হইতে এক রকম কৃষ্ণ বর্ণের ধূপ আমদানী হয়, অগুরু উহার একটি প্রধান উপকরণ। তুলসীর মালার মত অগুরু কাঠেরও মালা তৈয়ার হয়; রোমান কাথলিকেরা ইহাতে ক্রশ (Crucifix) ও জপমালা (Rosary) তৈয়ার করেন। নিকৃষ্ট শ্রেণীর অগুরু কাষ্ঠ হইতে এক প্রকার আতর প্রস্তুত হয়, তাহা অটো ডি রোজের মত দুর্ম্মূল্য।

যাঁহারা অগুরু কাষ্ঠ বা তাহা হইতে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতার যাদুঘরের Economic বিভাগে যাইলে সেই সমুদয় দেখিতে পাইবেন।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

বস্ত্রশিল্প রক্ষার সদুপায়।

পাশ্চাত্য দেশের কৃষক বা কারিকর হইতে ভারতবর্ষের কৃষক কারিকরের অবস্থা যে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ইহা সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যবসায়াবলম্বীর যে একটু নিজস্ব আছে, য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। য়ুরোপে যাঁহারা কৃষি বা অন্যবিধ শিল্পকার্য্যে অর্থ নিয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণতঃ ধনী। তাঁহারা লোক রাখিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করেন, কল কারখানা পরিচালনা করেন। সুতরাং সেই সকল কৃষকের বা কারখানার কারিকরের, কৃষিক্ষেত্র বা কারখানার সহিত একটা চিরন্তন সম্বন্ধ নাই; তাহারা কোন ধনীর বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র। কিন্তু এদেশের প্রত্যেক কৃষক আপনার পৈতৃক ভূমি চাষ করে, তন্তুবায় আপনার নিজস্ব তাঁতে বস্ত্র বয়ন করে, কর্ম্মকার বা কাংস্যকার আপনার সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীন কারখানায় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। তাহারা স্ব স্ব ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহার ব্যবসায় যতই ক্ষুদ্র হউক বা তাহার আয় যতই সামান্য হউক, তাহার সেই স্বপরিচালিত কার্য্যে এমন একটু গৌরব আছে, যাহা পাশ্চাত্য দেশের কোটি কোটি মুদ্রায় প্রতিষ্ঠিত কৃষিক্ষেত্রের কৃষকদিগের বা কারখানার কারিকরদিগের নাই। য়ুরোপে মানুষ কার্য্যের দাস, ভারতে মানুষ কার্য্যের প্রভু। মানুষের এই প্রভুত্বভাব যত সজীব থাকে, মনুষ্যত্ব তত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই ভারতের এত দুর্দ্দিনেও এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের যেরূপ মনুষ্যত্বের ভাব পরিস্ফুট দেখা যায় য়ুরোপে তেমন নহে। ভারতবাসীর এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব—কার্য্যের উপর প্রভুত্ব—যাহাতে বিদ্যমান থাকে সমাজহিতৈষীমাত্রেরই সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে এদেশে য়ুরোপীয় প্রণালীতে কল কারখানা স্থাপনের আবশ্যক হইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না; তাহা না করিলে দেশের যে অজস্র ধনক্ষয় হইতেছে তাহার প্রতিরোধ করা যাইবে না। কিন্তু ভারতবাসীর চিরন্তন কুটীরজাত শিল্পকে নষ্ট

করিয়া এই সকল বৃহৎ ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে পরামর্শ দিই না, প্রত্যুত যাহাতে এই কুটীরজাত শিল্পসমূহ সংরক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে আমরা দেশহিতৈষীদিগকে পরামর্শ দিই। এই সকল কুটীরজাত শিল্পের তিরোধান হইলে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব নষ্ট হইবে। অতএব তাহা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে।

য়ুরোপীয় কল কারখানা ভারতের সকল শিল্পই—বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্প নষ্টপ্রায় করিয়াছে। এখনও যে ইহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই, ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপ্রিয়তাই তাহার একমাত্র কারণ। খাইতে না পাইলেও এক জন কারিকর আপনার পৈতৃক ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্যের অধীনে চাকুরি করিতে সম্মত হয় না। এই জন্যই সকল প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করিয়া ভারতের তাঁতি পৈতৃক তাঁত বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু দিন দিন প্রতিযোগিতা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আর তাহা বজায় না থাকিবারই উপক্রম হইয়াছে। তাহারা এত দিন মহাজন করিয়াও আপনাদিগের পৈতৃক ব্যবসা ও সেই সঙ্গে দেশের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু উত্তরোত্তর ঋণগ্রস্ত হইয়া তাহারা ক্রমে এরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে যে আর যুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই জন্যই দেখা যায়, যখনই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখনই সর্ব্ব প্রথমে তন্তুবায় সম্প্রদায়ই বিশেষ রূপে নিপীড়িত হইয়া থাকে। সাইলকরূপী মহাজনদিগের হস্ত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলে, ইহারা যে আপনাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশে ইহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র তাঁতিকুলকে রক্ষা করিবার জন্য যদি সেইরূপ ব্যবস্থা অনুসৃত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে হস্তপরিচালিত তাঁতের যে সকল উন্নতি হইতেছে তদ্দ্বারা তাহারা আপনাদিগের ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

১৮৯৯ সালের ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় বোম্বাই প্রদেশের সোলাপুর জেলার তাঁতিগণ যার পর নাই কষ্ট ভোগ করে। কেবল সোলাপুর নহে, সর্ব্বত্রই তাঁতিদিগের উৎকট অন্ন ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সোলাপুরে কলেক্টর সাহেব দয়া পরবশ হইয়া তাহাদিগের কষ্ট দূর করিবার জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থার সূত্রপাত করেন। যাহাতে তাঁতিরা তাহাদিগের ব্যবসা চালাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় সে জন্য তিনি দুর্ভিক্ষ ফণ্ড হইতে তাহাদিগকে টাকা দাদন দিবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থায় তন্তুবায়গণ দুর্ভিক্ষ ক্লেশ হইতে অনেক পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কলেক্টর সাহেব তাঁহার ব্যবস্থার এই সুফল দেখিয়া স্থানীয় তন্তুবায়দিগের সাহায্যার্থ একটী স্থায়ী ফণ্ডের সৃষ্টি করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি সম্পূর্ণরূপ ব্যবসাদারী প্রণালীতে তন্তুবায়দিগকে টাকা দাদন দিবার জন্য একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার নাম হইয়াছে Weavers' Relief Scheme and Industrial Bank. এতদ্দ্বারা সুদখোর মহাজনদিগের হস্ত হইতে তাঁতিদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁতিরা তাহাদিগের ব্যবসা চালাইবার জন্য এই সমিতির নিকট হইতে অল্প সুদে ঋণ পাইবে। এই ঋণ দিবার জন্য দুই প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (১) সুবিধাজনক সর্ত্তে বস্ত্র বয়নের উপকরণ অর্থাৎ সূতা, রং ইত্যাদি ঋণ দেওয়া হয়। যে কোন বিশ্বাসী তাঁতি, সমিতির নিকট হইতে ধারে একমাস মুদ্দতে সূতা ক্রয় করিতে পারিবেন, সমিতি সে জন্য সূতার নগদ বাজার দর অপেক্ষা বাণ্ডিল করা এক আনা অধিক লইবেন। (২) তৈয়ারী মাল বন্ধক রাখিয়া নগদ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। অনেক সময় এমন ঘটে যে তাঁতিদিগের মাল তৈয়ারী হইলেই তাহা তদ্দণ্ডে বিক্রয় হয় না। মাল বিক্রয়ের জন্য মরসুমের অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু যতদিন মাল অবিক্রীত থাকে, ততদিন তাঁতিকে ঋণ করিয়া সংসার চালাইতে হয়। মহাজনেরা যেরূপ সুদের হারে ঋণ দেয়, তাহাতে মরসুমের সময় মাল বিক্রয় করিয়াও অনেক সময় ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ হয় না। তা ছাড়া অধিকাংশ স্থলে এরূপ ঘটে যে মহাজনেরাই মালের ক্রেতা। সুতরাং কারীকর বিক্রেতার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে। সেরূপ স্থলে তাঁতিরা মালের যে দর পায় তাহাতে লাভ করা দূরে থাকুক অনেক সময়ে মজুরী পর্য্যন্ত পোষায়

না। এই জন্য সমিতি ব্যবস্থা করিয়াছেন যে যখন মাল বিক্রয়ের মরসুম উপস্থিত হইবে, তখন তাঁতিরা সমিতির নিকট হইতে আপনাদিগের মাল লইয়া আপনারা তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে পারিবে। বিবেচনা করুন তিন টাকা মূল্যের এক জোড়া কাপড় অসময়ে বিক্রয় করিতে যাইলে হয়ত দুই টাকার অধিক পাওয়া যায় না, এরূপ অবস্থায় তাঁতি সেই কাপড় সমিতির নিকট বাঁধা রাখিলে দুই টাকা ঋণ পাইবে, এবং মরসুম আসিলে সেই কাপড় বাজারে তিন টাকায় বিক্রয় করিয়া, সমিতিকে সুদে আসলে দুই টাকা এক আনা পরিশোধ করিয়া বাকী পনের আনা ঘরে লইয়া যাইতে পারিবে।

এই ব্যবস্থায় সোলাপুর অঞ্চলের তাঁতিগণের এরূপ সুবিধা হইয়াছে যে তাহারা উক্ত সমিতির নিকট হইতে এক এক সময়ে ৭।৮ হাজার টাকা দাদন লইতেছে। উপরি লিখিত নিয়মে ঋণ দান ব্যতীত সমিতি আর একটি সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক সময় মাল মসলা ক্রয় করিবার জন্য, বা লোক জনের মজুরী পরিশোধ করিবার জন্য তাঁতিদিগকে ঋণ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় সমিতি জামিন লইয়া ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ ঋণ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে তজ্জন্য বার্ষিক শতকরা তিন টাকা হারে সুদ দিতে হইবে এবং মাস মাস ১২ কিস্তিতে সমস্ত টাকা শোধ করিতে হইবে। ইহাতে দেখা যাইতেছে সমিতি যেমন সুদের সামান্য মাত্র হার ধার্য্য করিয়াছেন, সেইরূপ আসল পরিশোধেরও যারপরনাই সুবিধাজনক নিয়ম করিয়াছেন। এই সুবিধাজনক ব্যবস্থাতে তথাকার তাঁতিরা অল্প দিনের মধ্যে আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ যে প্রায় ২৫ জন তাঁতি তাহাদিগের পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিয়াছে এবং মহাজনের নিকট যে সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক ছিল তাহা উদ্ধার করিয়াছে।

সোলাপুরের তন্তুবায়রক্ষিণী সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া এবং তাহার ফল দেখিয়া আমাদিগের মনে হইতেছে, ভারতের অন্যান্য স্থানের তন্তুবায়গণের উপকারার্থ যদি সর্ব্বত্র এইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাঁতিকুল আর বৈষ্ণবকুলের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয় না। বিলাতী মালের আমদানীতে এদেশের তাঁতিরা যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে এরূপ আর কোন সম্প্রদায় হয় নাই। শিল্পশিক্ষা সংক্রান্ত সমিতির রিপোর্টে * প্রকাশ যে দশ বৎসর কাল মধ্যে এদেশে প্রায় ৮২ হাজার তাঁতী তাঁত ছাড়িয়া কলে মজুরীর জন্য প্রবেশ করিয়াছে আর আর ৭,৪০,০০০ জন ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর কি দুর্দ্দশা হইতে পারে? এই জন্যই যখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখনই এই সম্প্রদায়ের কষ্টের পরিসীমা থাকে না।

সোলাপুরের কালেক্টর তথাকার তন্তুবায়দিগের সাহায্যার্থ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমাদিগের স্মরণ হইতেছে একবার দুর্ভিক্ষের সময় বাঙ্গালার কোন একটি জেলাতে সেইরূপে তাঁতিদিগকে সাহায্য করা হইয়াছিল। তাঁতিদিগকে টাকা দাদন দিয়া দুর্ভিক্ষ কমিটি তাহাদিগের মাল বাজার দরে কিনিয়া লইতেন। ইহাতে দুর্ভিক্ষ কমিটিকে কাপড় বিক্রয়ের জন্য কতকটা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক ইহাতে বুঝা যাইতেছে যেখানে তাঁতিদিগকে কাপড় তৈয়ার করিবার জন্য এইরূপ দাদন দেওয়া হইয়াছে সেইখানেই তাহারা যথানিয়মে ঋণ পরিশোধ করিয়াছে। এই জন্য আমাদিগের মনে হইতেছে যে দেশের স্থানে স্থানে তাঁতিদিগকে ঋণ দিবার জন্য স্বতন্ত্র বা যৌথে যদি মূলধন নিয়োগ করা যায় তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এই একটি লাভজনক ব্যাপার পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা চক্ষের উপর দেখিতেছি পল্লীগ্রামের কোন মহাজন দাদন দিয়া কখনও বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই বরং যথেষ্ট লাভবান হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় মহাজনদিগের অপেক্ষা অল্প সুদে টাকা ঋণ দিবার জন্য এক একটি যৌথ পল্লী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। এই সকল ব্যাঙ্ক নগদ টাকা ঋণ দেওয়া ব্যতীত বস্ত্র বয়নোপযোগী সূতা প্রভৃতিও বিক্রয় করিবার বা দাদন দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগের দেশের লোক নিরাপদে বার্ষিক সাড়ে

* কমলা ১ম ভাগ পঞ্চম সংখ্যা (চৈত্র ১৩১০) "দেশীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—সং।

তিন টাকা সুদে টাকা খাটাইতে পারিলেই সংস্থষ্ট, একটু দায়িত্ব লইয়া অধিক লাভজনক কার্য্যে অগ্রসর হইতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন।

ইংরাজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতি ব্যবসায়ে এত উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন টাকার সুবিধাই তাহার মূল কারণ। এদেশে যে বড় বড় চা-র বাগান বা নীল কুঠি দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ যেন মনে না করেন যে সেই সমস্ত তাহার মালিকদিগের নিজ টাকায় পরিচালিত হয়। মনে করুন একজন ধনী ৫০, ৬০ বা ৭০ হাজার টাকা দিয়া একটা চা-বাগান ক্রয় করিলেন। ইহাতেই তাঁহার মূলধন নিঃশেষিত হইল। তাহার পর যখন চাষ করিয়া চা তৈয়ার করিবার সময় হইল তখন তিনি কোথায় টাকা পান? বৎসরের শেষে তাঁহার বাগানে যত চা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা কোন ব্যাঙ্কে বা এজেন্টের নিকট বাঁধা রাখিয়া তিনি মাসে মাসে টাকা দাদন লইয়া থাকেন। তাহার পর মরসুমের সময় যেমন যেমন চা বিক্রয় হইতে লাগিল অমনি টাকা শোধ করিতে লাগিলেন। অনেক সময় এরূপও ঘটে যে চা-কর যে এজেন্টের নিকট ঋণ লইতেছেন তাঁহারও টাকার যথেষ্ট টান, তিনিও সেই চা-করের বন্ধকীপত্র কোন ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়া কম সুদে টাকা লন ও চা-করের নিকট তদপেক্ষা অধিক সুদ লইয়া লাভ করেন। এই সকল বন্ধক দেওয়া লওয়াতে উকিল মোক্তার বা আদালতের সাহায্য অল্পই লইতে হয়। ব্যাঙ্কের এক প্রকার Letters of Hypothecation ফরম আছে তাহাতে সহী করিয়া দিলেই অনায়াসে টাকা পাওয়া যায়। সকল সওদাগরগণ সর্ব্বদা এইরূপ ঋণ লইতেছেন। এই জন্য অতি অল্প মূলধন লইয়া এক এক জন ইংরাজ লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করিতে পারেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা নিজেরা যেমন লাভবান হন অন্যদিকে ব্যাঙ্ক সকলও তেমনই লাভ করিয়া থাকে। তন্তুবায়দিগের সাহায্যার্থ এইরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপনা করিতে পারিলে একদিকে দেশের একটী প্রধান শিল্প যেমন রক্ষা করা হইবে, তেমনি ব্যক্তিগত লাভও হইবে। যিনি এইরূপ ব্যবসায়ের প্রথম পথপ্রদর্শক হইবেন তিনি ব্যবসায়ের ব্যপদেশে দেশের একটী বিশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন।

এলুমিনিয়ম্*।

আজ কাল সকল দেশেই এলুমিনিয়ম্ ধাতু বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশের বাজারেও এলুমিনিয়ম্ নির্ম্মিত নানা প্রকার তৈজসপত্র বিক্রীত হইতেছে এবং ইহার কাটতিও ক্রমশঃ অধিক হইতেছে। খুব সম্ভব কালে এই ধাতুই আমাদের দেশের পিতল কাঁসার স্থান অধিকার করিবে; সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

এলুমিনিয়ম টিনের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধাতু এবং ইহার ব্যবহার পিতল কাঁসা অপেক্ষা নানা বিষয়ে সুবিধাজনক। পিতল কাঁসার জিনিসে তেঁতুল প্রভৃতি কোন প্রকার অম্লাক্ত জিনিস লাগিলে তৎক্ষণাৎ উহা বিবর্ণ হইয়া যায়, এবং ঐ বিকৃত বর্ণযুক্ত পাত্রে আহারাদি করা অত্যন্ত বিপদ্‌জনক, এমন কি উহাতে লোকের মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে; কিন্তু এলুমিনিয়ম্ পাত্রে ঐরূপ দোষ কিছুতেই হয় না। অধিকন্তু এলুমিনিয়ম্ পাত্র পিতল কাঁসার পাত্র অপেক্ষা অনেক হাল্‌কা, সুতরাং এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়ার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা। এলুমিনিয়মের আর একটী গুণ এই যে ইহা শীঘ্র ভাঙ্গে না। ইহাতে আঘাত লাগিলে সেই স্থান কেবল একটু টোল খায় মাত্র। সুতরাং পাত্রটীকে সহজেই মেরামত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এলুমিনিয়ম সকল দেশে এবং সকল স্থানেই পাওয়া যায়। সাধারণ মৃত্তিকাও এলুমিনিয়মের রূপান্তর মাত্র; মৃত্তিকাতে উহা বালুকা (Silica) এবং জলের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকে। মাটীর রাসায়নিক নাম Hydrated silicate of aluminium. বালুকা (Silica) এবং কোনও কোনও ক্ষারের সহিত সংযুক্ত হইয়া ফেলস্পার (felspar) নামক খনিজ দ্রব্যের সহিত এলুমিনিয়ম যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। সাধারণ ফট্‌কিরিতেও ইহা বর্ত্তমান আছে। কিন্তু silica সংযুক্ত এলুমিনিয়মকে এলুমিনিয়মের আকর (ore) বলা যাইতে

* কমলা ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা (ফাল্গুন) এলুমিনিয়াম্ প্রবন্ধ দেখুন—সং।

পারে না, কারণ উহা হইতে ব্যবহারোপযোগী ধাতু পৃথক করা যায় না। লৌহের আকরের সহিত অধিক পরিমাণে গন্ধক থাকিলে যেমন উহা হইতে প্রস্তুত লৌহ অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ হয়, silica সংযুক্ত এলুমিনিয়ম-আকর হইতে এলুমিনিয়ম বাহির করিলেও উহা তদ্রূপ ভঙ্গপ্রবণ হইয়া থাকে। Silicaর সহিত সংযুক্ত নহে এলুমিনিয়মের সংমিশ্র এরূপ খনিজ দ্রব্যও যথেষ্ট আছে। ইহার মধ্যে corundum প্রধান। ইহার রাসায়নিক নাম Sesquioxide of Aluminium) Al_2O_3). পদ্মরাগ (চুণি), মরকত (পান্না), নীলা প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরগুলি এই Corundum ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল রং ও "জলের" পার্থক্য মাত্র। Corundum যখন অত্যন্ত অবিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন উহার নাম Emery. Corundum এবং তজ্জাতীয় খনিজ দ্রব্যগুলি অত্যন্ত কঠিন। কাঠিন্যে ইহার স্থান কেবল হীরকের নিম্নে। সুতরাং নানা জাতীয় প্রস্তর ঘষিয়া পালিশ করিতেই Emery যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এলুমিনিয়ম প্রস্তুত জন্য ইহা কখনও ব্যবহার হয় না। বলিতে গেলে এলুমিনিয়ম ধাতুর একমাত্র আকর বক্সাইট (Bauxite) নামক খনিজ দ্রব্য; ইহার রাসায়নিক নাম Hydrated oxide of Aluminium (Al_2O_3 H_2O). বক্সাইটে অনেক সময়েই সামান্য পরিমাণে লৌহ (iron oxide) সংযুক্ত থাকে। সামান্য লৌহে বক্সাইটের গুণের কোন তারতম্য হয় না। বিশুদ্ধ বক্সাইট সম্পূর্ণরূপে সিলিকা বর্জ্জিত, কিন্তু সাধারণ বক্সাইটে সর্ব্বসময়েই কিঞ্চিৎ পরিমাণে silica দেখিতে পাওয়া যায়। যে আকরে শতকরা ১ভাগ বালুকা কণা (silica) থাকে সে আকর অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শতকরা ২ভাগ বালুকা বিশিষ্ট bauxite দ্বারাও কাজ চলিতে পারে, কিন্তু বালুকার পরিমাণ তদপেক্ষা অধিক হইলে আর উহার দ্বারা কাজ চলিতে পারে না। অবশ্য বালুকার ভাগ যত কম হইবে আকরও তত অধিক মূল্যবান্ হইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ এলুমিনিয়মই এই bauxite নামক আকর হইতে নিষ্কাশিত হইয়া থাকে।

আজকাল কলিকাতার বড় বড় রাস্তা মেরামত করিবার সময় বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন যে প্রথমে কঠিন প্রস্তর দিয়া পরে তাহার উপর লাল বর্ণের এক প্রকার মাটি দেওয়া হয়। উহা ল্যাটিরাইট (Laterite) নামক এক প্রকার প্রস্তর। ঐ ল্যাটিরাইটে অধিক পরিমাণে লৌহ (Ferric oxide) মিশ্রিত আছে বলিয়াই উহার বর্ণ লাল। ঐ প্রকার ল্যাটিরাইট রাণীগঞ্জ, খড়্গপুর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী বোধ হয় ঐ অঞ্চল হইতেই উহা আনাইয়া থাকেন। বক্সাইট ও ল্যাটিরাইট জাতীয় এক প্রকার প্রস্তর। বক্সাইটের বর্ণ কখনও শ্বেতাভ, কখনও ঈষৎ লাল, কখনও বা ঈষৎ পীত, আবার কখনও বা ঈষৎ সবুজবর্ণ। সামান্য বর্ণপার্থক্যে আকরের গুণের কোনও ব্যত্যয় হয় না, তবে অবশ্য অধিক রঙ্গিন হইলে কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

আকর হইতে ধাতু বাহির করিবার নানা প্রকার প্রক্রিয়া আছে। তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অধুনা এই প্রক্রিয়া অনুসারেই প্রায় সর্ব্বত্রই এলুমিনিয়ম বাহির করা হইয়া থাকে। যেরূপভাবে সোণা রূপার গিল্টি হইয়া থাকে, ইহাও সেই প্রকারে অঙ্গার (Carbon) সংযুক্ত "মুচিতে" (Crucible) পৃথকীকৃত হইয়া থাকে। কষ্টিক সোডা (Caustic Soda) এলুমিনিয়ম বাহির করিবার একটী প্রধান উপাদান। ইহা প্রস্তুত করাও তত ব্যয়সাধ্য নহে। সমুদ্র-জল হইতে Caustic soda অল্প খরচে তৈয়ারি হইতে পারে এবং উপরিউক্ত বৈদ্যুতিক বলের কতকাংশ আমরা সহজেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি।

ভারতবর্ষে এই কার্য্য এই পর্য্যন্ত কেহই আরম্ভ করেন নাই; সুতরাং এখানকার ব্যবহার্য্য সমস্ত এলুমিনিয়মই বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে এলুমিনিয়মের অত্যুৎকৃষ্ট আকর আছে তাহাও এ পর্য্যন্ত খুব কম লোকই জানেন। তবে ইহা নিশ্চিত যে এ বিষয় বহুদিন গোপনে থাকিবে না এবং ইউরোপীয়েরা খনির কার্য্যে যেরূপ তৎপর তাহাতে তাঁহারা ইহার অনুসন্ধান পাইলে যে, সেই মুহূর্ত্তেই এই লাভজনক কার্য্যে

প্রবৃত্ত হইবেন তাহার কোনও সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ভারতবর্ষের মধ্যে মধ্যভারত, হাইদ্রাবাদ এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত অনেক স্থানে এলুমিনিয়মের অত্যুৎকৃষ্ট আকর আছে।

এই কার্য্যে খুব বেশী মূলধনের আবশ্যক করে না। আমাদের দেশের তিন চারি জন ধনী একত্র হইলে অনায়াসে একার্য্য চলিতে পারে। অবশ্য এমন লোকও আমাদের দেশে যথেষ্ট আছেন যাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিজেই একার্য্য অতি উত্তমরূপে চালাইতে পারেন। স্থানবিশেষে সুবিধা হইলে নদীর স্রোতের সাহায্যে অল্প খরচায় তাড়িত বল উৎপন্ন করিতে পারা যায়। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে মহীশুর রাজ্যের কোলার স্বর্ণ খনির সমস্ত কার্য্যই প্রায় ১০০ মাইল দূরবর্ত্তী কাবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে উৎপন্ন তাড়িতপ্রবাহ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে যে স্থানে এলুমিনিয়মের আকর আছে সেই স্থানে তাড়িতবল উৎপাদনের সাহায্য করিতে পারে এমন যথেষ্ট নদী আছে। নদীর সাহায্য লওয়া অসুবিধা বিবেচিত হইলে অন্য উপায়ে অনায়াসে তাড়িত উৎপন্ন হইতে পারে। আজকাল কলিকাতার ট্রাম গাড়ির জন্য যে প্রকারে বিদ্যুৎ প্রস্তুত হইতেছে সেই উপায়ে অনায়াসেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইতে পারে।

এলুমিনিয়ম্ কার্য্যের আর একটী সুবিধা এই যে খনি হইতে আকর উঠাইতে খুব বেশী খরচ বা বহুমূল্য কল কবজার দরকার হয় না। বক্সাইট প্রায় সর্ব্বত্রই পৃথিবীর উপরিভাগে সাধারণ মাটীর ন্যায় বহুদূর বিস্তৃত হইয়া অবস্থিতি করে। সুতরাং বহুনিম্ন হইতে আকর উত্তোলনের ব্যয় ইহাতে বহন করিতে হয় না। সেইজন্যই এলুমিনিয়মের জন্য জমি বন্দোবস্ত করিতে হইলে বহু বিস্তৃত স্থান বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়। সুবিধা বিবেচিত হইলে বিশ পঁচিশ অথবা তদপেক্ষাও বেশী বর্গমাইল স্থানও বন্দোবস্ত করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে গভর্ণমেণ্ট হইতে কএকটী যুবক খনিবিদ্যা শিক্ষার জন্য সম্প্রতি বিলাতে প্রেরিত হইয়াছেন, আজকাল আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা সভাও যুবকদিগকে নানা জাতীয় অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে কোন ইউরোপীয় কোম্পানিই উপরিউক্ত শিক্ষিত ভারতীয় যুবকবৃন্দকে আপনাদের খনির কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। এক্ষণে আমাদের স্বদেশীয় লোকে যদি এই সব লাভজনক কার্য্যে নিজ নিজ মূলধন নিয়োজিত করিতে উৎযোগী না হন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বা আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইবে। বাস্তবিক ইউরোপীয় কোম্পানিরা যেরূপ ভবে নানা স্থান খনির কার্য্যের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছেন তাহাতে আর পঁচিশ বৎসর পরে আমাদের ইচ্ছা হইলেও আর উৎকৃষ্ট স্থান পাওয়া যাইবে না, তখন আমাদিগের কুলিগিরিই সার হইবে।

আমি উপরিউক্ত লাভজনক বিষয়ে আমাদের স্বদেশীয় ধনীবৃন্দের এবং Indian Scientific and Industrial Education Committeeর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। যদি কেহ এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে এ বিষয়ে সমস্ত সংবাদ আমরা দিতে পারিব।

শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা, এম,এ।

জল সিঞ্চন যন্ত্র।

বঙ্গদেশে শস্যক্ষেত্রে জল নির্গম এবং প্রবেশের জন্য প্রধানতঃ কয়েকটি উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে।

ডোঙ্গা—সচরাচর তাল গাছের গুঁড়ি কাটিয়া তাহার অন্তর্নিহিত অসার পদার্থগুলি বাহির করিয়া ফেলিলেই ডোঙ্গা নির্ম্মিত হয়। নিম্নস্থিত জল উচ্চতর ভূমিতে তুলিবার নিমিত্ত এই ডোঙ্গা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুইটি লোক এই উপায়ে অনায়াসে জল তুলিতে পারে। জলের পরিমাণ কম থাকিলে ডোঙ্গায় তাদৃশ সুবিধা হয় না। যে স্থানে সচরাচর তাল গাছ পাওয়া যায় না তথাকার লোকে কাঠের ডোঙ্গা ব্যবহার করিয়া থাকে। হাবড়া পোলের ধারে লোহার ডোঙ্গা প্রস্তুত হইয়া বিক্রিত হয়।

লাঠা—একটী বাঁশের একদিকে কোন প্রকার ভারি বস্তু বাঁধিয়া অপর দিকে জল তুলিবার জন্য বালতি, ঝুড়ি, অথবা কোন প্রকার পাত্র বাঁধিয়া দিতে হয়। জলাশয়ের তীরে একটী উক্ত মাচান বাঁধিয়া এই লাঠার প্রয়োগ করা হয়। একজন লোক দ্বারা এই লাঠার কার্য্য চলিতে পারে। উক্ত বাঁশ সংযুক্ত বালতি জলে ডুবাইয়া দিলে বাঁশের অপর পার্শ্বে ভার থাকায় বালতি আপনা হইতেই উঠিয়া পড়ে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এই প্রথাতেই গভীর কূপ হইতে জল তোলা হয়।

মসক—উপরিউক্ত লাঠার ন্যায় মসকে অর্থাৎ চামড়ার থলি দ্বারা জল তোলা হয়। কখন কখন দুইটি কাষ্ঠখণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া উহাদের (দুইটি কাঠের মাথার) উপরে একটী দৃঢ় কাষ্ঠ সংলগ্ন করা হয়, ঐ কাঠের মধ্যস্থিত একটী লৌহ, পিত্তলের অথবা বাঁশের চাকার ভিতর দিয়া দড়ি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। উক্ত দড়ির একদিকে চামড়ার থলি সংযুক্ত থাকে, অপরদিকে এক জোড়া বলদ জুড়িয়া তাড়াইতে হয়; তাহাতে ঐ জলপূর্ণ থলি ক্রমশঃ জল হইতে উপরে উঠিতে থাকে। সচরাচর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই প্রথায় জল উত্তোলিত হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত তিনটী প্রথাই প্রধান। অনেকে সুবিধার জন্য ঐ তিন প্রকার প্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের কৃষি বিস্তারের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। এবং ইউরোপীয় প্রণালী এদেশে প্রচলিত করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে। অতএব এক্ষণে জল সংগ্রহ সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন বৈদেশিক উপায়ের বর্ণনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"এবসিনিয়ান টিউবওয়েল" নামক একটী যন্ত্র অনেক ইংরাজকে ব্যবহার করিতে দেখা যায় এবং আমাদের দেশেও ইহা অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে। সরকারী কৃষি বিভাগের শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ কলের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"ইহা কয়েকটি লোহার চোঙ্গা দ্বারা গঠিত। এই চোঙ্গাগুলি একটীর পর আর একটী ঠিক সরলভাবে প্রোথিত হয়। প্রথম চোঙ্গাটীর মুখ সরু এবং ইস্পাতে নির্ম্মিত। এই চোঙ্গাটীর গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র দ্বারা জল চুয়াইয়া চোঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করে। চোঙ্গাগুলি একটীর পর আর একটী সরল ভাবে নাড়িবার জন্য উপরে একটী কপিকল খাটাইয়া ঐ কপিকল হইতে একটী ভারি লোহখণ্ড অনবরত ফেলিতে হয়। এইরূপে ৩০।৪০ ফুট চোঙ্গা ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই পুতিতে পারা যায়"। উপরে একটি কল সংযুক্ত ইহার নাম "উইণ্ডমিল" বা হাওয়ার জাঁতা। এই যন্ত্রের উপরিভাগে একখানি কাঠের পাখা বায়ুবেগে ঘুরিতে থাকে এই পাখা যেমন ঘুরিতে থাকে অমনি একটি লোহার শিক উপর নীচে চলিতে থাকে। ঐ লোহার শিকের সহিত আর একটী শিক কবজা দ্বারা আটকান থাকে। এই দ্বিতীয় শিকটি পিচকারির ন্যায় জলে পোতা চোঙ্গার মধ্যে খেলিতে থাকে। এইরূপ খেলিতে খেলিতে চোঙ্গার মধ্য হইতে জল উপরে উঠিতে থাকে। যে মুখ হইতে জল উঠিয়া পড়িতে থাকে সেই মুখের সম্মুখে একটী পাকা চৌবাচ্ছা বা নালী গাঁথিয়া রাখিলে সর্ব্বদাই এই চৌবাচ্ছা বা নালী অতি সুন্দর পরিষ্কার জল দ্বারা পূর্ণ থাকিবে। "অনেক স্থলে বিশেষতঃ যে সকল স্থানে নদী অথবা জলাশয়ের অভাব এবং যেখানে অবাধে বায়ু

প্রবাহিত হয় তথায় উক্ত যন্ত্র ব্যবহার করিলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে।"

সম্প্রতি মান্দ্রাজে আর এক প্রকার নূতন জল-উত্তোলন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম "বুল গান ওয়াটার লিফট"। ইহা অনেকটা লাঠার মত। ইহাতে দুইটি জল উত্তোলন পাত্র সংযুক্ত থাকে। যন্ত্রটি এরূপ ভাবে সজ্জিত যে এক যোড়া বলদ উহাকে টানিয়া চলিলে দুইটি পাত্র পরে পরে উত্থিত হয়। ইহাতে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। যন্ত্রের মূল্য ৮০ টাকা। এদেশীয় জমীদারগণ উক্ত যন্ত্র ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত "আবিসিনিয়ান্ টিউব ও মিল" কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া জমিতে বসাইতে প্রায় ৭০০্।৮০০্ টাকা ব্যয় পড়িবার সম্ভাবনা।

উপরে যে সমস্ত যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হইল তন্মধ্যে শেষোক্ত দুইটি আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকের পক্ষে সুবিধাজনক না হইলেও যাঁহারা অধিক জমি চাষ করিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে। সাধারণের কৃষকের পক্ষে সিউনি উৎকৃষ্ট যন্ত্র।

এদেশের কৃষকেরা জল পাইলেই সন্তুষ্ট হয়। তাহার কারণ এই যে আমাদের দেশে অধিকাংশ আহারোপযোগী উদ্ভিদ ঘাস জাতীয়। ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের সংরক্ষণে জল বিশেষ আবশ্যক। বন্যার জল উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারক। আজ কাল আমাদের দেশে কাটাখাল প্রভৃতি হওয়ায় কৃষকদের বন্যার জল পাইবার আশা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য বর্ত্তমান সময়ে কোন নূতন উদ্ভাবিত নিয়মে জল সেচন করা আবশ্যক। অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টির জন্য আমাদের দেশের ফসল অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। অতএব অনাবৃষ্টি জনিত ক্ষতি নিবারণের জন্য পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলির মধ্যে কোন একটী উপায় অবলম্বন করা উচিত।

শ্রীহরিদাস মিত্র, বি এল,
কাশিপুর, কুষ্টিয়া।

ব্যাকটিরিয়া বা উদ্ভিদণু।

২

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা "ব্যাকটিরিয়া" কাহাকে বলে—ইহজগতে তাহারা কোন স্থান অধিকার করে, তাহাদের আকৃতি কিরূপ, এবং প্রকৃতিই বা কি এই সকল বিষয় কতক পরিমাণে অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তাহাদের বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, তাহারা কি উপাদানে নির্ম্মিত তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্যাকটিরিয়াগণ প্রত্যেকে এক একটী কোষ বা "সেল"। এই "সেল" পূর্ণাবস্থায় একটী আবরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই কোষাবরণ বা "সেল মেমব্রেণ" (Cell membrane) মধ্যস্থ আঠাবৎ প্রটোপ্লাজমের উপাদানীভূত অংশ বা উহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে এখনও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; তবে অধিকাংশ পণ্ডিত শেষোক্ত মতেরই পোষকতা করিয়া থাকেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা এই আবরণকে প্রটোপ্লাজমের বহিষ্কৃত রসসম্ভূত পদার্থ (Secretion) বলেন; কেহ বা ইহাকে প্রটোপ্ল্যাজমের রাসায়নিক পদার্থের প্রক্রিয়াগত তলানি বা অধঃক্ষিপ্ত পদার্থ (Precipitate) বলেন। এই আবরণ দেখিতে স্বচ্ছ ও বর্ণহীন এবং নবজাত সেলসমূহে ইহা সমঘনতাপূর্ণ (Homogeneous)। ইহা স্থিতিস্থাপক এবং নমনীয় (Flexible)। যদিও এই আবরণ মধ্যে কোনও ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাচ ইহা যে ছিদ্রবিশিষ্ট (Porus) তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ এই আবরণ মধ্য দিয়া অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ ক্রিয়া সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই আবরণ "সেলুলোজ" নামক পদার্থে সংগঠিত। রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে "সেলুলোজ" ষ্টার্চ (এরারুট) ও শর্করাজাতীয়, কিন্তু বাহ্যিক বা প্রাকৃত গুণ (Physical) সম্বন্ধে উহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। "সেলুলোজ" শীতল বা উষ্ণ জলে অদ্রবণীয়, পরিস্রুত সুরা ও ইথারে অদ্রবণীয়, ক্ষার জলেও ইহার কোনও অবস্থান্তর হয় না; কেবল উগ্র সালফিউরিক এসিড দ্বারা ইহা গলিয়া যায়। ইহার রাসায়নিক উপাদান $(C_6H_{10}O_5)n$ (কার্ব্বন ৬ ভাগ, হাইড্রোজেন ১০ ভাগ ও অক্সিজেন ৫ ভাগ) বা ইহাদিগের কোন গুণনীয়ক।

প্রটোপ্লাজম্।

সেল সমূহের জীবনীশক্তি এই "প্রটোপ্লাজম" মধ্যে নিহিত। ইহার রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে পরীক্ষা দ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পদার্থ ইহাতে বর্ত্তমান আছে—

(১) প্রোটিড্ (Proteid) ইহার উপাদান কার্ব্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন ও অল্প পরিমাণ গন্ধক ও ফস্ফরস। (২) কার্ব্বোহাইড্রেট (Carbo-hydrate) ইহা শর্করা ও ষ্টার্চজাতীয় এবং তৈল ও চর্ব্বী জাতীয় দ্রব্য। (৩) জল। (৪) অল্প পরিমাণ ধাতবদ্রব্য।

উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীগণের বা উদ্ভিদ্গণের "সেল" মধ্যস্থ প্রটোপ্লাজম মধ্যে "নিউক্লিয়স" ও তন্মধ্যে আবার "নিউক্লিওলাস যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল ব্যাকটিরিয়া "সেল" সমূহে সেইরূপ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে ব্যাকটিরিয়াগণকে এনিলিন রং দ্বারা রঞ্জিত করিলে মধ্যস্থ প্রটোপ্লাজম্ যখন সমভাবে রঞ্জিত না হইয়া কোথাও ঘন কোথাও পাতলা ভাবে রঞ্জিত হয় তখন ব্যাকটিরিয়া নিচয়েও "নিউক্লিয়স" ও "নিউক্লিওলাস" থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কারণ উচ্চশ্রেণীর প্রাণিগণের সেল সমূহের বৃদ্ধি ও বিভাগকল্পে এই "সেল" মধ্যস্থ "নিউক্লিস" ও "নিউক্লিওলাস্" প্রথম ও প্রধান কার্য্যকারী।

প্রটোপ্লাজমের গঠন সম্বন্ধে (Ultimate structure) পণ্ডিতগণকে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

১। ইহা অতিশয় সূক্ষ্ম ও সদা পরিবর্ত্তনশীল জাল সমষ্টি; মধ্যস্থ স্থান সকল জল ও অন্যান্য পদার্থে পরিপূর্ণ।

২। মাইসিলি, আইসোটেগমেটা ইত্যাদি জীবাণু দ্বারা সংগঠিত। এই মাইসিলি ও তদ্রূপ জীবাণুকে পূর্ব্বে জীবনীশক্তির প্রধান অংশ বলিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের ধারণা ছিল।

৩। ইহা একটী মিশ্রপদার্থসম্ভূত। অর্থাৎ ইহার জলীয় অংশে অন্যান্য পদার্থ সকল অদ্রবণ

অবস্থায় সংস্থাপিত। ইহাই আধুনিক মত।

যদিও আমরা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রটোপ্লাজমের উপাদানীভূত পদার্থনিচয়ের অংশ সকল অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি, যদিও আমরা এই সকল পদার্থ সমূহের পরস্পর সংগঠন সম্বন্ধ-তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, তথাপি কি কারণে ইহাতে যে জীবনীশক্তি লক্ষিত হয়, তদ্বিষয় অবধারণ করা আমাদের জ্ঞানের অতীত রহিয়াছে। কালেও যে ইহার সমস্যা অবধারিত হইবে তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ যে সকল পদার্থ আমরা স্থূলদৃষ্টিতে জীবনী-শক্তিবিহীন জড়পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি যখন তাহাতে জীবনীশক্তির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয় যখন এই মহতী শিক্ষা আমাদিগকে প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তখন স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে পরমাণু ও জীবনীশক্তি এই উভয়ই অপৃথকভাবে পরস্পরে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। একের অস্তিত্বে অপরের অস্তিত্ব এবং অপরের অস্তিত্বে একের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে।

জড়জগতে রাসায়নিক অণুসমষ্টি যেরূপ অনন্তকাল ব্যাপিয়া অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় থাকিতে পারে—প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌জগতে কোনও বস্তুকে এই রূপ অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিতে দেখা যায় না। ইহাদের উপাদানীভূত সেল মধ্যস্থ প্রটোপ্লাজম্ সমূহে প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে; "অক্‌সিজেন" সাহায্যে তাহাদের মিশ্র পদার্থ সকল অবিমিশ্র পদার্থে পরিণত হইতেছে এবং তন্মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। এইরূপে "সেল" সমূহে ক্রমান্বয়ে ক্ষয় বিধান হইতেছে। আহার্য্য বস্তুদ্বারা এই অবিরাম ক্ষয় স্রোত প্রতি-পূরিত ও সমানীকৃত হইতেছে। আহার্য্য দ্রব্যের আধিক্য হইলে সেল মধ্যস্থ প্রটোপ্লাজমখণ্ডের বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তৎসঙ্গে সেলসমূহের আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় না, কতক পরিমাণ আয়তন বৃদ্ধ হইলেই সেলসমূহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে আহার্য্য দ্রব্যের উপর ব্যাকটিরিয়াগণের সংখ্যাবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্যাক-টিরিয়াগণ স্বতঃ দ্বিখণ্ডিত হইয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। এইরূপে নবজাত ব্যাকটিরিয়াগণ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া মাতৃস্থানীয় ব্যাকটিরিয়াগণের ন্যায় সকল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। উচ্চশ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌জগতে জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু শব্দ স্বাভাবিক অবস্থায় যেরূপ প্রয়োজ্য — ব্যাকটিরিয়া সমূহে জন্ম ও বৃদ্ধি শব্দ সেইরূপ প্রয়োজ্য হইলেও মৃত্যু শব্দ সেরূপ প্রয়োজ্য নহে। অর্থাৎ এই সকল ব্যাকটিরিয়া বিঘ্ন প্রাপ্ত না হইলে অনন্তকাল অবিশ্রান্ত জীবন লীলা অতিবাহিত করিতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্যাকটিরিয়া সমূহের অকাল মৃত্যু নানা কারণে সংঘটিত হইয়া থাকে।

রাসায়নিক উপাদান (Composition)

অধ্যাপক নেনকি (Nencki) মহোদয় পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে ব্যাকটিরিয়াগণের পূর্ণাবস্থায় শতকরা ৮৩.৪৩ ভাগ জলীয় অংশ—বাকী ১৬.৫৭ ভাগ এলবুমিন, চর্ব্বি ও অন্যান্য পদার্থে পূর্ণ। এক শত ভাগ শুষ্ক ব্যাকটিরিয়াতে

এলবুমেন জাতীয় দ্রব্য	৮৪.২০	এলবুমেন জাতীয় দ্রব্যে জলীয় অংশ বাদে শতকরা অংশে	
Fat (চর্ব্বি)	৬.০৪	কার্ব্বণ C	৫২.৩২
Ash (ধাতব)	৪.৭২	হাইড্রোজেন H.	৭.৫৫
অন্যান্য পদার্থ	৫.০৪	নাইট্রোজেন N.	১৪.৭৫

অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্যাকটিরিয়া সেল সমূহে জলীয় ভাগ $\frac{4}{5}$ অংশ পরিমাণে বর্ত্তমান এবং প্রায় $\frac{1}{5}$ অংশ এলবুমিনয়েড পদার্থ, চর্ব্বি ও ধাতব পদার্থে পূর্ণ; এবং সুরা ও ইথার দ্বারা পৃথক করা যাইতে পারে এরূপ পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। কোনও ব্যাকটিরিয়া "সেলে" দ্রাক্ষাশর্করা (grape sugar) পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কতকগুলিতে Bacillus Butyricus বেসিলাস বিউটারিকাস্ ষ্টার্চ সদৃশ পদার্থ পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে আমাদের খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় দ্রব্য যদি দিবারাত্র কাল অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিই, তাহা হইলে সেই সকল দ্রব্যে নানা প্রকারের অসংখ্য ব্যাকটিরিয়া দেখিতে পাই। কি প্রকারে এই সকল জীবাণু উৎপন্ন হইল তাহারা কি ঐ সকল খাদ্য দ্রব্যে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল, অথবা হঠাৎ উহাতে বহির্বায়ু হইতে নিপতিত হইল, বা কোনও দৈবশক্তি প্রভাবে তথায় স্বতঃ উৎপন্ন হইল—এই সকল

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে স্বতঃ উদয় হইয়া থাকে। এই বিষয়ে পণ্ডিতগণ মধ্যে বহু তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। যে বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়া এই বিশাল ব্যাকটিরিয়া-বিজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়াছে, যাহার ফল স্বরূপ আজ আমরা রোগ সমূহের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ এবং আরও অশেষবিধ বিষয় জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইয়াছি, সেই সকল প্রশ্ন হইতে যে যে পদ্ধতিতে ক্রমে ক্রমে এই বিজ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, আমরা যথাসাধ্য তাহা বিবৃত করিব। তাহাতে বুঝা যাইবে, যে এই এক প্রশ্নের সদুত্তর আশায় কতকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কত অধ্যবসায় ও কত চিন্তাশীলতা আবশ্যক হইয়াছে এবং কত বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। প্রকৃতির গুহ্য রহস্য ভেদ করা এবং তন্মধ্য হইতে মূলসূত্র আহরণ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার।

জীবোৎপত্তি সম্বন্ধে মত।

পুরাকালে (৬১০ খৃঃ পূঃ) এনাকসিমেণ্ডার (Anaximander) নামক জনৈক গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত আর্দ্রতা হইতে জীব সকল উৎপন্ন হয় এই মত প্রকাশ করেন। ইহার ১৬০ বৎসর পরে (অর্থাৎ ৪৫০ খৃঃ পূঃ) এগ্রিমেণ্টাম্ নিবাসী এমপিডোক্লিস্ (Empedocles) জীব স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে এই মত প্রচারিত করেন। অধ্যাপক 'এরিষ্টটল' (Aristotle) (৩৮৪ খৃঃ পূঃ) যদিও এমপিডোক্লিসের মত সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেন নাই তথাপি পচনশীল জৈব পদার্থে ও উদ্ভিদপদার্থে এবং মৃত্তিকায় জীব সকল স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা বিশ্বাস করিতেন। ইহার তিন শতাব্দী পরে আমরা দেখিতে পাই অভিড (Ovid) এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এবং কবি ভার্জিল (Virgil) তাঁহার পুস্তকে মক্ষিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রত্যেক বিকাশক্রম বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

মধ্যকালেও নানারূপমত প্রচলিত ছিল—কার্ডান সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস যে জল হইতে মৎস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভেন হেলমন (Van Helmont) ইন্দুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এমন কি কারচার সাহেব ([illegible]) [illegible] খণ্ড হইতে জল সংসর্গে জীব উৎপন্ন হইতে তিনি দেখিয়াছেন। এইরূপ নানা প্রকার অদ্ভুত মত প্রকাশ যদিও আমাদের বিবেচনায় হাস্যজনক বলিয়া বোধ হয়, তথাচ তৎকালে এই সকল মত অভ্রান্ত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিয়াছিল। অতঃপর হলণ্ডদেশীয় ডেলভ নগরবাসী লিওয়েনহুক (Leeuwenhoek) মহোদয়ের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার সময় হইতে (১৬৮৪ খৃঃ অঃ) ডাক্তার নিডহাম (Needham) সাহেবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত (১৭৬৮ খৃঃ অঃ) এই বিষয় তুষাগ্নির ন্যায় বিধূমিত হইলেও কখন প্রজ্জ্বলিত হয় নাই; অর্থাৎ এই বিষয় লইয়া কোন ঘোরতর আন্দোলন হয় নাই। পণ্ডিতগণ মধ্যে কেহ বা এই মতের পক্ষপাতী, কেহ বা ইহার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই দুইটী মতের প্রবর্ত্তনা আমরা দেখিতে পাই—একটী "জীব স্বতঃ উৎপন্ন হয়" অপরটী "জীব, জীব হইতে উৎপন্ন হয়"। পরবর্ত্তী কালে এই দুই মতের অভ্রান্ততা প্রতিপাদন উদ্দেশে পণ্ডিতগণ মধ্যে মহা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ নিডহাম সাহেবই প্রথম মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী এবং ইহার অভ্রান্ততা প্রমাণ জন্য তিনি প্রথমে একখণ্ড মাংস লইয়া উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ (Infusion) একটী ফ্লাস্ক মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ২৪ ঘণ্টা পরে তিনি দেখিয়াছিলেন যে সেই ক্বাথে অসংখ্য জীব উৎপন্ন হইয়াছে। বোতলের মুখ অবরুদ্ধ থাকায় বহিস্থ জীব বোতল মধ্যে নিপতিত হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপ বারংবার পরীক্ষা করিয়া যখন তিনি একই প্রকার ফল লাভ করিয়াছিলেন-অর্থাৎ বোতল মধ্যস্থ "ক্বাথে" তিনি অসংখ্য জীব উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন—তখন তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে "জীব স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে" এবং পণ্ডিতগণ আগ্রহের সহিত তাঁহার এই মত অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা সত্য তাহা চির কালই সত্য, যাহা ভ্রান্ত তাহা আপাতঃ সত্য প্রমাণিত হইলেও কালে তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেই হইবে। পণ্ডিতগণ যে মতকে আজ অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন সুইজারলণ্ড নিবাসী বনেট (Bonnet)

সাহেব তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ডাঃ নিডহামের পরীক্ষাপ্রণালী যে দোষশূন্য হয় নাই তদ্বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রতিবাদ এই যে ডাঃ নিডহাম তাঁহার মাংস খণ্ড জলে অত্যল্প কাল মাত্র সিদ্ধ করিয়া ছিলেন—তজ্জন্য বনেট সাহেব অনুমান করিলেন যে হয়ত এত অল্পকাল উত্তপ্ত হওয়ায় কাথের সমস্ত জীবাণু বিনষ্ট হয় নাই—অতএব "কাথ (Infusion) প্রস্তুত কালে অধিকতর উত্তাপ প্রয়োগ আবশ্যক ছিল; তাহা নিডহাম সাহেব করেন নাই। দ্বিতীয় প্রতিবাদ এই যে, হয়ত বোতলের বা ফ্লাস্কের মুখ সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয় নাই; তজ্জন্য বহিস্থ বায়ু ও তৎ সঙ্গে জীবাণু সকল বোতল বা ফ্লাস্ক মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; কিম্বা যদিও বোতলমুখ সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু বোতল মধ্যস্থ বায়ুতে হয়ত জীবাণু সকল বর্ত্তমান ছিল; এই দুই কারণ হেতু কাথে জীবাণু সকল উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে আবেএল স্পালেনজেনি (Abbe L. Spallanzani) বনেট সাহেবের মত অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে এক ঘণ্টাকাল মাংসখণ্ডকে জলে ফুটাইয়া কাথ প্রস্তুত করিলেন এবং তৎপরে বোতল মধ্যে রাখিয়া দিয়া বোতল মুখ বন্ধ করত দেখিলেন যে যথা সময়ে জীবাণু সকল উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বারে পূর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যায় অনেক কম হইয়াছে। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে এক ঘণ্টাকাল উত্তপ্ত করায় "কাথ" মধ্যস্থ জীবাণু সকল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু বোতল ঠাণ্ডা হইবার সময় বহিস্থ বায়ু ও তৎসঙ্গে জীবাণু সকল বোতল মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া—"কাথে" উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব, তিনি পুনরায় অন্যরূপ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বারে তিনি বোতলে মাংস খণ্ড ও জল দিয়া তাহা ফুটাইতে লাগিলেন এবং একঘণ্টা কাল এইরূপে ফুটিলে যখন বোতলমুখ দিয়া বাষ্প নির্গত হইতে লাগিল তৎকালে ঐ মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ করিলেন যে তন্মধ্য দিয়া কোনরূপে জল কি বায়ু প্রবেশ লাভ করিতে না পারে। এই বারে তিনি দেখিলেন যে বোতল মধ্যস্থ 'কাথে" কোন জীবাণু পরিলক্ষিত হইল না—যদিও স্পেলানজেনি এই পরীক্ষায় সফলমনোরথ হইয়াছিলেন—এবং যদিও তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে জীব স্বতঃ উৎপন্ন হইতে পারে না—তথাপি নিডহামের মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ তাহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত দুই আপত্তি উত্থাপন করিলেন। প্রথম বোতল বা ফ্লাস্ক মধ্যস্থ বায়ু সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়—উত্তাপপ্রয়োগহেতু বোতল মধ্যস্থ বায়ুর বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল; এই দুই কারণ হেতু বোতল মধ্যস্থ কাথে জীবাণু উৎপন্ন হইতে পারে নাই। অতএব নিডহাম সাহেবের মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ স্পেলানজেনীর পরীক্ষা প্রণালী দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম হওয়ায় তৎকৃত পরীক্ষাও ঠিক প্রণালী মত হয় নাই এবং তজ্জন্য তাঁহার সিদ্ধান্তও ভ্রমশূন্য বলা যাইতে পারে না, ইহা সকলকে বুঝাইয়া ছিলেন। কি প্রকারে ইহার সুমীমাংসা হইবে তদ্বিষয় চিন্তার কারণ হইল।

শতাধিক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল তথাপি এই বিষয়ের কোনও সুমীমাংসা হইল না। অতঃপর ১৮৩৬ খৃঃ অঃ ফ্রাঞ্জ স্কুল্‌জ সাহেব (Franz Schulze) ইহার মীমাংসায় নিরত থাকিয়া প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে বায়ুর অপ্রতুলতা বা পরিবর্ত্তন হেতু স্পেলানজেনীর পরীক্ষা প্রণালীতে বোতল মধ্যস্থ "কাথের" অবিকৃত অবস্থা সংঘটিত হয় নাই। তিনি নিম্নলিখিত প্রকারে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমে একটী বোতলে পরিস্রুত জল রাখিয়া তাহাতে জৈব ও উদ্ভিদ পদার্থ মিশ্রিত করিয়া বোতলের মুখে দুইটী ছিদ্র বিশিষ্ট কাক দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ঐ ছিদ্র মধ্যে দুইটী কাঁচের বক্র নল সংলগ্ন করিয়া দিয়া ঐ বোতলে উত্তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন। মধ্যস্থ জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পাকারে দুই নলমুখ দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। কতক্ষণ এইরূপে বাষ্প নির্গমন হইলে তিনি একটী নলমুখে উগ্র সালফিউরিকএসিডপুরিত একটী বোতল (wash bottle) এবং অপর নলমুখে কষ্টিকপটাসদ্রাবণ পুরিত একটী বোতল (wash bottle) সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। ফুটন্ত জল তাপে বোতল মধ্যস্থ এবং তৎ সংলগ্ন নল মধ্যে যে সকল জীবাণু ছিল তাহা সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং বহিস্থ বায়ু হইতেও বোতল মধ্যস্থ "কাথ" সালফিউরিক এসিড পুরিত বোতল ও

কষ্টিক পটাস দ্রাবণ পূরিত বোতল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল; অতএব বহিস্থ বায়ু হইতে জীবাণু সকল কাথ মধ্যে নিপতিত হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, অথচ বোতল শীতল হইবার কালীন বহিস্থ বায়ু সলফিউরিক এসিড মধ্য দিয়া বোতলে নীত হইবার পথ উন্মুক্ত রহিল। এই রূপ বন্দোবস্ত করিয়া তিনি তাঁহার যন্ত্রনিচয় তাঁহার গবাক্ষে আলোক, উত্তাপ ও বায়ুসংস্পর্শে রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ সঙ্গে একটী অনাবৃত পাত্র ঐরূপ জৈব ও উদ্ভিদ পদার্থ পরিস্রুত জলে ফুটাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। বোতলমধ্যস্থ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য প্রত্যহ তিনি ৩।৪ বার পটাস দ্রাবণ পূরিত বোতল সংযুক্ত বহির্নল দ্বারা বায়ু টানিয়া লইতেন। এইরূপ করায় বহিস্থ বায়ু সলফিউরিক এসিড মধ্য দিয়া বুদবুদ আকারে বোতল মধ্যে নীত হইত। সালফিউরিক এসিড দিবার উদ্দেশ্য এই যে বহিস্থ বায়ুস্থিত জৈব ও উদ্ভিদ জীবাণু সকল সলফিউরিক এসিডে পতিত হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অথচ বায়ুর কোনও রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। এইরূপে তিনি ২৮শে মে তারিখ হইতে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাঁহার বোতল রাখিয়া দিয়াছিলেন এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কোনও রূপ জীবাণু বোতল মধ্যে উৎপন্ন হইতে দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার অনাবৃত বোতলে বহু সংখ্যক জীবাণু উৎপন্ন হইয়াছিল—এবং যখন তিনি তাহার বোতল হইতে সলফিউরিক এসিড পূরিত বোতল সমুহ বিযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন তখন ঐ বোতলে জীবাণু সকল উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছিল। প্রতিপক্ষীয়েরা এই পরীক্ষা প্রণালীরও দোষ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে হয় ত সলফিউরিক এসিড কোনও রূপে বোতল মধ্যে নীত হইয়া থাকিবে সেই কারণে জীবাণু সকল বোতল মধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে নাই। এই হেতুবাদ যে অমূলক তাহা ১৮৩৯ খৃঃ অঃ সোয়ান সাহেব (Schwann) পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত করিয়াছিলেন। স্কুলজ সাহেবের পরীক্ষা যন্ত্রে সালফিউরিক এসিড বোতলসংলগ্ন না করিয়া বোতল সংযুক্ত নলকে উত্তপ্ত করিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, উত্তপ্ত নল মধ্যদিয়া বায়ু প্রবেশ করায় ঐ বায়ুস্থিত জীবাণু সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই কারণ বশতঃ বোতলমধ্যস্থ কাথে জীবাণু উৎপন্ন হইতে পায় নাই। কিন্তু এই সকল প্রমাণাদি সত্বেও নিডহামের মতাবলম্বীরা তাহাদিগের সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিচলিত হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করেন নাই, কারণ তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন যে উক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিলেও কখন কখনও বোতলমধ্যস্থ কাথে জীবাণু পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত পরীক্ষা প্রণালীতে যে সকল দোষের হেতুবাদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্রোডার ও ভানডুস সাহেবদ্বয় (Schroder and Van Dusch) পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে বোতলের মুখ তুলা দ্বারা অবরুদ্ধ করিলে বহিস্থ বায়ুস্থিত জীবাণু সকল বোতলমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে অপারগ হয়। অতএব যদি তুলা জীবাণু পরিমুক্ত করা যায় এবং বোতলের মুখ বন্ধ করা যায় তবে তন্মধ্য দিয়া বায়ু অবাধে চালিত হইলেও বহিস্থ জীবাণু সকল তুলা মধ্যে নিহিত হইয়া থাকে। তৎপরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হফম্যান (Hoffman) এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পাস্তর (Pasteur) ও চেভরুইল (Chevreuil) মহোদয়গণ দেখাইলেন যদি বোতলের মুখ উত্তাপ দ্বারা গলাইয়া সূক্ষ্ম নলরূপে পরিণত করা যায় এবং ঐ নল মুখ বক্র করিয়া নিম্নাভিমুখে রাখিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে নল মুখ তুলা দ্বারা অনাবৃত থাকিলেও বোতল মধ্যস্থ 'কাথে' জীবাণু উৎপন্ন হয় না, বা উহা কোনও রূপে পচিয়া যায় না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা পাস্তর আরও দেখাইলেন যে ফুটন্ত জলে সকল জীবাণু বিনষ্ট হয় না; যে সকল জীবাণু মধ্যে ডিম্বাকার স্পোর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল "স্পোরগুলি" ফুটন্ত জলেও বিনষ্ট হয় না সেই কারণবশতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরীক্ষায় তৎকালিক পণ্ডিতগণ এতাদৃশ কষ্ট ও বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক টিনডাল (Tyndall) মহোদয় কৃত পরীক্ষাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে গৃহ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে তন্মধ্যস্থ জীবাণু সকল মাধ্যাকর্ষণ হেতু পৃথিবীতলে পতিত হইয়া থাকে। এরূপে বায়ু জীবাণুশূন্য হইলে যদি সেই গৃহে মাংসকাথ অনাবৃত অবস্থায়ও রাখা যায় তাহা হইলে তাহাতে কোনও জীবাণু পরিলক্ষিত হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে

বহিস্থিত জীবাণু ক্বাথ মধ্যে নিপতিত না হইলে তাহাতে জীবাণু উৎপন্ন হইতে পারে না।

নিডহাম সাহেবের মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের প্রতিবাদ এক একটী করিয়া খণ্ডিত হইয়া জীবোৎপত্তিসম্বন্ধে ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে যে জীব, জীব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা স্বতঃ উৎপন্ন হইতে পারে না। যেখানে কোনও জীব নাই বা তাহার বীজ নাই তথায় জীব উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। বিজ্ঞানের এই শিক্ষা সাধারণ চক্ষে অভিনব হইলেও ইহা অভ্রান্ত সত্য। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাবের বিষয়ীভূত অংশই বিবৃত হইল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দত্ত।

সেকাল আর একাল।

৺রাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গদেশে বিজাতীয়তা ও ইংরাজানুকরণ-প্রিয়তার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল তখন এই গ্রন্থ সেই স্রোতকে জাতীয়তা ও হিন্দুত্বের দিকে পরিচালিত করিতে বিশেষ সহায়তা করে। এই গ্রন্থে বঙ্গ সমাজের সেকালের অবস্থার সহিত একালের অবস্থার তুলনা করিয়া সমীচীন ভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে সুবিজ্ঞতা ও সুরসিকতার সুন্দর সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ইহা যেমন কৌতুকাবহ ও আমোদকর, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজী সংবাদ পত্রে ইহার প্রশংসা-পূর্ণ সমালোচনা পাঠ করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড নর্থব্রুক নিজ ব্যয়ে ইহার ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া লয়েন। অনেক দিন এই গ্রন্থ প্রচার সম্বন্ধে কোন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, তজ্জন্য বর্ত্তমান কালের অনেকেই ইহা পাঠ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

মূল্য ॥৵ আনা মাত্র। ডাকমাশুল ৵৹।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।

৺রাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

বঙ্গ সমাজে চিন্তা, ভাব ও মত সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। সেই অল্প সংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" উচ্চ স্থান অধিকার করে। যে সময়ে এই গ্রন্থ প্রচারিত হয় তখন সর্ব্বদেশে হিন্দুধর্ম্ম নিকৃষ্ট ও হীনধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। এই গ্রন্থেই সর্ব্ব প্রথমে এই সত্য প্রতিপাদিত হয় যে পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ প্রচারের পর হইতেই এদেশের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। এই গ্রন্থ প্রচারের কয়েক বৎসর পরে থিওসফিষ্ট দলের আবির্ভাব হয়। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা, অধ্যাপক মোক্ষমূলার, তদানীন্তন কালের ভারতের প্রধান সংবাদপত্র "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার" সম্পাদক জেমস্ রুটলেজ সাহেব এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য ও গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় "এডুকেশন গেজেট" সংবাদ পত্রে এই গ্রন্থ সমালোচনা উপলক্ষ লিখিয়াছিলেন যে, 'হিন্দুধর্ম্মরূপ তরণী জলমগ্ন হইতেছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার কাণ্ডারী হইয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গদর্শনে" এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া বলেন, "রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।" হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এক্ষণে পৃথিবীর নানাদেশে যে শ্রদ্ধা ভক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, এই বাঙ্গলা গ্রন্থ তাহার অন্যতম কারণ। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয়। এরূপ গৌরবের সামগ্রী বঙ্গের গৃহে গৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত।

মূল্য ॥৹ আনা মাত্র ; ডাকমাশুল ৴৹

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু;

৺রাজনারায়ণ বসুর বাটী, বৈদ্যনাথ দেওঘর, এই ঠিকানায় মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

পুষার কৃষি কালেজ।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই এখানকার কৃষিজাত সামগ্রীর উপর অল্পাধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। ভারতের মৃত্তিকা পৃথিবীর সকল দেশের জন্য শস্য প্রসব করিয়া ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। দেশের কৃষকেরা দরিদ্র এবং নিরক্ষর। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্য ত তাহাদিগের নাই, তাহার উপর সে বিষয়ে জ্ঞানেরও পূর্ণ অভাব। পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপে জমীর পাট করিয়া আবাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহারা তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই জানে না। অথচ এখন দেশের ফসলের উপর যেরূপ টান পড়িয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বে যেখানে একটি শস্য উৎপন্ন হইত সেখানে কেবল দুইটি নহে, অন্ততঃ চারিটি উৎপন্ন না করিতে পারিলে প্রয়োজনের সংকুলান হওয়া অসম্ভব। এক্ষণে আমরা যদি ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যে আমাদিগকে অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

শতাধিক বর্ষ ইংরাজ ভারতের রাজা হইয়াছেন, ভূরাজস্ব হইতেই প্রধানতঃ তাঁহাদিগের রাজকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে, কিন্তু ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এপর্য্যন্ত তাঁহারা কিছুই করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৮৬৬ সালের উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের পর হইতে এবিষয়ে গবর্মেণ্টের কতকটা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; তাহার পর ১৮৭৪ সালের বিহার দুর্ভিক্ষের পরে, ইহার কারণানুসন্ধান ও নিবারণের উপায় স্থির করিবার জন্য বিলাত হইতে যে কমিসন এদেশে আসিয়াছিল, তাহার রিপোর্টে কৃষির উন্নতির জন্য গবর্মেণ্টকে মনোযোগী হইতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সেই সময় হইতে এবিষয়ে গবর্মেণ্ট কতকটা মনোযোগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা অতি অল্পই করিয়াছেন। এক গুণের স্থানে দ্বিগুণ বা ততোধিকগুণ ফসল উৎপন্ন করা কৃষকের সাধারণ অভিজ্ঞতার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যতীত তাহা সম্ভবে না। এই জন্য য়ুরোপ ও মার্কিণে শিক্ষিত লোকের সহায়তায় কৃষি কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। এই সকল লোক রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া কৃষকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ভারতে যে এইরূপ শিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে দ্বিমত নাই। একমাত্র দেশের শাসন সম্বন্ধীয় ব্যয়ের কতকাংশ নির্ব্বাহের জন্য আমাদিগকে বিলাতে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার গম চাউল প্রভৃতি কৃষিজাত সামগ্রী প্রেরণ করিতে হয়। তাহার উপর অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রসাদে যে কোন বিদেশী আসিয়া ভারতবাসীর মুখের অন্ন সহজে আপন আপন দেশে চালান দিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। ইহাতে একগুণের স্থানে চতুর্গুণ উৎপন্ন করিবার যে বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন তাহার অনুশীলনের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে কেন? এইজন্য কয়েক বৎসর হইতে গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা মান্দ্রাজের সৈদাপথে, বোম্বাই প্রদেশের পুনা নগরে, যুক্ত প্রদেশের কানপুরে এবং মধ্য প্রদেশের নাগপুরে এক একটী কৃষি বিদ্যালয় ও তৎসঙ্গে কয়েকটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা এরূপ মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছেন যে তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ পরিদৃশ্যমান ফল প্রসূত হয় নাই। আজি প্রায় ২০ বৎসর হইতে চলিল মান্দ্রাজে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য প্রদেশেও একে একে একটি করিয়া বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু কি জানি কেন এ সমন্ধে বঙ্গদেশে কোন ব্যবস্থাই নাই। কেবল মাত্র সার আসলি ইডেন সাহেবের শাসন সময়ে কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দুই জন করিয়া ছাত্রকে কৃষি বিদ্যা শিক্ষার্থ বিলাতের সিসেষ্টার কালেজে বৃত্তি দিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থানুসারে ১০।১২ জন মাত্র ছাত্র বিলাতে গিয়া কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং প্রশংসার সহিত তথাকার কালেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু যাহাতে দেশের লোক তাঁহাদিগের শিক্ষার ফলভোগী হইতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষ

তাহার কোনরূপ ব্যবস্থা করিলেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের শিক্ষার্থ রাজকোষ হইতে যে অর্থ ব্যয় করিলেন তাহা নিরর্থক হইল। আপাততঃ তাঁহাদিগের মধ্যে তিন চারি জন মাত্র কৃষি বিভাগের কোন কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহারা কতকটা উপকার সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। যাহাতে এদেশে একটি আদর্শ কৃষি কলেজ সংস্থাপিত হয় সেজন্য দেশীয় সংবাদ পত্র সকল অনেক দিন হইতেই গবর্মেণ্টকে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন, কেননা কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্য শিখাইতে হইলে তাহা দেশের লোক ভিন্ন অপরের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং দেশের মধ্যেই একটী উচ্চ শ্রেণীর কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন আবশ্যক। এত দিন পরে তাঁহারা সাধারণের সেই বাসনা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বিহার অঞ্চলের পূষা নামক স্থানে একটী কৃষি কালেজ ও আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র সংস্থাপনের আয়োজন হইতেছে, অল্পদিন পরেই উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

এই কৃষি কালেজ স্থাপনের একটু ইতিহাস আছে, পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে তাহা বিবৃত করা প্রয়োজন। প্রায় দেড় বৎসর কাল অতীত হইল সুবিখ্যাত ধনকুবের আণ্ড্ কার্ণেগীর অংশীদার হেনরী ফিপ্‌স্ সাহেব আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতে কোনরূপ হিতকরকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য লর্ড কর্জ্জনের হস্তে বিশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ তিন লক্ষ টাকা প্রদান করেন। লর্ড কর্জ্জন আপনার অভিমত যে কোন হিতানুষ্ঠানে এই অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন ফিপ্‌স্ সাহেব এই কথা বলিয়া ঐ টাকা দেন। এই টাকার কিয়দংশ জলাতঙ্ক রোগ নিবারণের তত্ত্বান্বেষণে নিয়োজিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা ও তত্ত্বান্বেষণে নিয়োজিত করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। এদেশের কৃষির উন্নতি কল্পে তাঁহার প্রদত্ত অর্থের অধিকাংশ নিয়োজিত হইবে শুনিয়া ফিপ্‌স্ সাহেব তজ্জন্য আরও দশ হাজার পাউণ্ড লর্ড কর্জ্জনকে প্রদান করেন। এই অর্থ অবলম্বন করিয়াই পুষার কৃষি কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

এই কালেজ সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, এই কালেজের দ্বারা দেশের কৃষি কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে ও কৃষি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সাধারণে প্রচারিত হইবার সুবিধা হইবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয়গণ কলেজের কর্তৃত্ব ভার যেরূপ হস্তে ন্যস্ত করিতেছেন তাহাতে সে আশা মনে বড় স্থান পায় না। যাহা হউক সে বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে এই কলেজ কি প্রণালীতে পরিচালিত হইবে ও তথায় কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা হইবে পাঠকগণকে তাহার পরিচয় দিতেছি।

যদিও হেনরী ফিপ্‌স্ সাহেবের প্রদত্ত অর্থ পাইয়াই গবর্মেণ্ট এই কৃষিকালেজ সংস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু সেই অর্থে ইহার সমস্ত ব্যয়ের সংকুলান হইবে না। এজন্য বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট ও ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্ট উভয়কেই অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। ফিপ্‌স্ সাহেবের প্রদত্ত অর্থ কলেজের পরীক্ষাগার (Laboratory) সংস্থাপনেই পর্য্যবসিত হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্ট প্রথমে এই অর্থ পাইয়া কেবল মাত্র একটি কৃষি পরীক্ষাগার সংস্থাপনেরই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট দ্বারবঙ্গজেলার পুষা নামক স্থানে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও তৎসঙ্গে একটি কৃষিতত্ত্বালোচনা সমিতি সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই উভয় প্রস্তাব একসঙ্গে বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্ট একটি কালেজ স্থাপন করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন। পুষাতে গবর্মেণ্টের প্রায় ১২৮০ একর জমী আছে। এই স্থানে পূর্ব্বে সরকারী ঘোড়া পালনের আড্ডা ছিল। ১৮৭৪ সালে তাহা উঠিয়া গেলে তথায় একটি আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র সংস্থাপিত হয়, এই ক্ষেত্রে প্রধানতঃ তামাকের চাষ হইত। কিন্তু সরকারী তত্ত্বাবধানে ক্ষেত্রের কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পাদিত না হওয়ায় উহা কোন সওদাগর কোম্পানিকে ইজারা দেওয়া হয়। এক্ষণে তাঁহারা উহা ছাড়িয়া দিয়াছেন, সুতরাং ঐ স্থানে কালেজ সংস্থাপন করা সুবিধা মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্থানটি রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বহু দূর নহে, ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের ওয়েনী নামক ষ্টেশন হইতে উহা পাঁচ মাইল মাত্র। কিন্তু আমাদিগের আশঙ্কা হয় সহর অঞ্চল হইতে এত

দূরবর্ত্তী স্থানে এ দেশীয় ছাত্রগণ যাইতে সম্মত হইবে কি না; তবে এস্থান কৃষি বিষয়ক পরীক্ষাদির যেরূপ অনুকূল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে দূরত্বের অসুবিধাটুকু অনায়াসে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। উল্লিখিত ১২৮০ একর জমীর মধ্যে ৮০০ একর জমী বেশ আবাদের উপযুক্ত। পুষার প্রান্ত দিয়া গণ্ডক নদী প্রবাহিত হইয়াছে, ইহাতে অনাবৃষ্টির সময় ক্ষেত্রের জন্য জলের অভাব হইবে না। কৃষি বিভাগের ইনেস্পেক্টর-জেনেরেল সাহেব বলেন যে পুষার ভূমি ও তথাকার জল বায়ু এরূপ যে, সেখানে ভারতের সকল স্থানের ফসলের আবাদ স্বচ্ছন্দে করা যাইতে পারে। এ কথা সত্য হইলে পুষা যে কৃষি কলেজের পক্ষে আদর্শ স্থান তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পুষার সমস্ত জমীটা তিন ভাগে বিভক্ত করা হইবে। (১) আনুমানিক ৫০০ একরে কলেজের বাড়ী, ছাত্রাবাস ও রাস্তা প্রভৃতি থাকিবে ও তাহার মধ্য হইতে ৩৫০ একর আবাদের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হইবে। (২) ৩৫০ একর নামাল জমীতে ধান ও রবি খন্দের আবাদ করা হইবে। (৩) গণ্ডক নদীর তীরে প্রায় ১৫০ একর আন্দাজ যে জমী আছে, তাহা বর্ষা কালে প্রায় ভাসিয়া যায়, এই স্থান ঘাস কাটিবার ও গোচারণ জন্য স্বতন্ত্র রাখা হইবে। ইহা ছাড়া আর ২০০ একর জমী আছে তাহা গোমহিষাদি পালনের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই সকল সুবিধার জন্য গবর্মেণ্ট বলেন ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে এরূপ সুবিধাজনক জায়গা নাই।

কৃষিকলেজ যেখানে স্থাপনা করিতে হইবে সেখানে যে বিবিধ প্রকার ফসলের চাষ করিবার উপযোগী ভূমি এবং গোচারণ ও গোপালন প্রভৃতির জন্য বহু বিস্তৃত স্থান থাকা প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তা ছাড়া পুষাতে আর একটু সুবিধা আছে। সে সুবিধা এই যে, উহার সন্নিকটে অনেক নীল কুঠি আছে। গবর্মেণ্ট বলেন যে সরকারী আদর্শ ক্ষেত্রে যে সকল পরীক্ষা হইবে, তাহা নিকটস্থ নীলকুঠিতে শীঘ্র প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা। কুঠিতে প্রবর্ত্তিত হইলে তথায় যে সকল চাষা কাজ করে তাহারাও সেই সকল জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। এই রূপে উন্নত প্রণালীর কৃষিজ্ঞান দেশময় প্রচার হইবে। কর্ত্তৃপক্ষীয়ের এই আশা কতদূর সফল হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। সাহেবদিগের অবলম্বিত প্রথা দেশী কৃষকেরা যে সহজে অবলম্বন করিবে তাহা আমাদিগের বোধ হয় না। যে কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় প্রথমে শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যে তাহা গ্রহণ করে না। তাহার পরে অল্পে অল্পে নিম্ন শ্রেণীতে তাহা প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব এ দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা ভিন্ন অন্য উপায়ে বৈজ্ঞানিক কৃষিজ্ঞান নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে না। আমরা ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতে পারি যে, গবর্মেণ্ট এই যে কয়েক বৎসর ত্রিহুতী কুঠিয়ালদিগকে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বৎসরে ৫০,০০০, টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান করিয়া আসিলেন তাহার কোন ফল কি ত্রিহুতী কৃষকেরা লাভ করিয়াছে? কিন্তু ঐ টাকা যদি জমীদারদিগের কি কৃষিবিদ্যাভিজ্ঞ গবর্মেণ্টের দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা ব্যয় করিতেন তাহা হইলে অনেক ফল হইত। যাহা হউক এ স্থলে সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আপাততঃ মান্দ্রাজ বোম্বাই বা উত্তর পশ্চিমে কৃষিতত্ত্ব শিক্ষার জন্য যে সকল বিদ্যালয় আছে এবং গত কয়েক বৎসর শিবপুর কলেজের অন্তর্গত যে কৃষিশিক্ষার শ্রেণী খোলা হইয়াছে ইহার কোনটীতেই কৃষিবিদ্যা বিষয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান হয় না। তাহার কারণ এই যে প্রায়ই কৃষি বিষয়ে বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব শিখাইবার উপযুক্ত শিক্ষক কোন বিদ্যালয়েই নাই; থাকিলেও তাহা সংখ্যা অতি অল্প। এই সকল বিদ্যালয়ে কেবল কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক সূত্র মাত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা এই সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা ঐ সকল স্থান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা করেন ও তাঁহাদিগের সেই জ্ঞান ক্রমে ক্রমে দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করে। এই উদ্দেশ্যেই পুষায় কলেজের ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় উচ্চতর কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা করিবেন তাঁহারাই ক্রমে দেশীয় ভাষায় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া সাধারণকে সুশিক্ষিত করিতে পারিবেন। তাঁহারা যথার্থই বলিয়াছে

যে "Progress must begin at the top and spread downwards." অর্থাৎ উচ্চ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উন্নতি ক্রমে নিম্নদেশে বিস্তারিত হইবে।

যদিও প্রাদেশিক কৃষিবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য পুষার কলেজে ব্যবস্থা থাকিবে, কিন্তু যাঁহারা কোন কৃষি বিদ্যালয়ে আদৌ শিক্ষালাভ করেন নাই তাঁহারাও যাহাতে প্রথম হইতে তথায় শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হন, তাহারও বন্দোবস্ত করা হইবে। যাহারা প্রাদেশিক কৃষিবিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এই কলেজে অধ্যয়নার্থ আসিবে, তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইবে যাহাতে তাহারা কৃষিতত্ত্বের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে অথবা তদ্বিষয়ে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান করিতে সমর্থ হইবে; এমন কি যে সকল পদে বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন তাহারা যাহাতে সেই সকল পদলাভ করিতে পারে তাহাদিগকে সেরূপ শিক্ষা প্রদান করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ইহা স্থির করা হইয়াছে যে ছাত্রদিগকে তথায় পাঁচ বৎসরকাল অধ্যয়ন করিতে হইবে। যাহারা কোন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় অথবা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহারাই এই কলেজে প্রবেশাধিকার পাইবে। যে সকল ছাত্র কৃষিবিষয়ে কেবলমাত্র প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা করে অথবা এরূপ ব্যবহারযোগ্য জ্ঞান লাভ করিতে চাহে, যাহাতে তাহারা রাজস্ব বিভাগের নিম্নতন পদের উপযুক্ত হইতে পারিবে, তাহাদিগকে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইবে। এই দুই বৎসর অধ্যয়নের পর তাহারা এল,এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের সমশ্রেণীতে গণ্য হইবে। যাহারা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর অধ্যয়ন শেষ করিবে, তাহারা পুনা ও সৈদাপথ কৃষিবিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের সমান হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। এই তৃতীয় বৎসরেই এক প্রকার শিক্ষা সমাপ্ত হইবে, তবে যাহারা কলেজের আদর্শানুযায়ী জ্ঞানলাভ করে নাই বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে আর এক বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইবে। যাহারা এই তৃতীয় বার্ষিক বা চতুর্থ বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা সাধারণতঃ বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের সমশ্রেণীতে গণ্য হইবে। ইহার পর যে সকল ছাত্র কলেজে থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করা যাইবে, তদনুসারে বিশেষ বিশেষ কৃষিতত্ত্বে শিক্ষা প্রদান করা হইবে। কীটতত্ত্ব (Entomology), রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical Analysis) উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany) ইত্যাদি শাস্ত্রের কৃষিবিদ্যার সহিত যে পরিমাণ সম্বন্ধ আছে তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। আপাততঃ এই কলেজে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের অধ্যাপনা হইবে।—সমস্ত বিষয়ই যখন ইংরাজী ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া হইবে তখন সেই বিষয়গুলি আমরা যথাযথ ইংরাজীতেই প্রকাশ করিলাম।

১। Agriculture.
২। Chemistry (Inorganic, Organic and Agricultural).
৩। Systematic and Cryptogamic Botany.
৪। Agricultural Entomology.
৫। Geology as applied to Agriculture.
৬। Elementary Physics and Mechanics (in application to Agriculture).

ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদত্ত হইবে—

১। Veterinary Science so far as required by Agriculturist.
২। Land Survey and Mensuration.
৩। Farm management (practical) Farm accounts and allied subjects.

শিক্ষা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা আপাততঃ সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইতেছে। তবে পরে কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচিত হইলে কৃষি বিভাগ ও শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া গবর্মেণ্ট তাহা করিবেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে, এই কলেজে যাহারা শিক্ষালাভ করিবে তাহাদিগের ভবিষ্যতের আশা ভরসা কি? আমাদিগের দেশে বিলাতের ন্যায় Gentleman Farmer কৃষিজীবী ভদ্রলোক

নাই বলিলেও হয়। পল্লীগ্রামে যে সকল ভদ্রলোক কৃষিকার্য্য করেন তাঁহারা কেবলমাত্র আপনাদিগের সংসার নির্ব্বাহের উপযুক্ত দুই দশ বিঘা জমী আবাদ করিয়া থাকেন, এরূপ স্থলে সাধারণ লোকের শিক্ষিত কৃষিবিদের বড় প্রয়োজন হইবে না। দেশে যে সকল জমীদার আছেন তাঁহাদিগেরও সকলে এরূপ সম্পন্ন নহেন যে, কলেজ উত্তীর্ণ কৃষিবিদদিগকে জমীদারী পর্য্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন, তবে কতকগুলি জমীদারের সংসারে এই কালেজের ছাত্রেরা যে চাকরী পাইতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রধানতঃ গবর্মেণ্ট কতক পরিমাণে ইহাদিগকে চাকরী দিবার ব্যবস্থা না করিলে ছাত্র সংখ্যা যে অধিক হইবে আমদিগের তাহা মনে হয় না। শিবপুর কলেজের অন্তর্গত কৃষিশিক্ষার শ্রেণীতে যে অধিক ছাত্র আকৃষ্ট হয় নাই ইহাই তাহার কারণ। শিবপুর কৃষি শ্রেণীর উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে গত বৎসর একজন ডেপুটী কালেক্টর, একজন সবডেপুটী হইয়াছেন, তাহাতেই ইহার প্রতি ছাত্রদিগের একটু অনুরাগ জন্মিয়াছে, সেই জন্যই পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা এ বৎসর ছাত্রসংখ্যা কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুইজন ছাত্র ব্যতীত একজন কৃষিবিভাগের অধীনে Travelling Overseer ও দুই জন জেলাস্কুলের কৃষিবিদ্যা শিক্ষকের পদ পাইয়াছেন, আর একজন ৭৫ টাকা বেতন বলিয়া চাকরী গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কোন প্রকার উচ্চ পদের আশা না পাইলে অধিক ছাত্র আকৃষ্ট হইবে না। গবর্মেণ্ট মন্তব্যে এ বিষয়ে একটু আভাস আছে বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট বলিয়া আমরা মনে করি না। যে সকল ছাত্র এই কলেজে দুই বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা রাজস্ব বিভাগের নিম্নতন পদে নিযুক্ত হইতে পারে। অবশ্য যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বা স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষিকলেজে ভর্ত্তি হইবে তাহাদিগের পক্ষে ইহা কতকটা আকর্ষণের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু যাহারা উচ্চতম কৃষিতত্ত্বে শিক্ষালাভ করিবে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে হইলে উচ্চপদের ব্যবস্থা আবশ্যক। মন্তব্যের একস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে "Men with a still higher education will be required to fill posts in the Deparment of Agriculture itself, such as those of Assisthat Directors, Research Experts, Superintendents of Farms, Professors, Teachers, Managers of Courts of Wards and Encumbered Estates, অর্থাৎ দ্বিতীয় বার্ষিক তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর উত্তীর্ণ ছাত্রগণ অপেক্ষা যাহারা উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবে তাহারা কৃষি বিভাগের অধীনে আসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর, মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানের কার্য্য, কৃষিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যাপক, শিক্ষক, কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীনস্থ জমীদারীর কার্য্যাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ইহাতে কতকটা প্রলোভন আছে বটে। কিন্তু আমাদিগের এস্থলে একটী জিজ্ঞাস্য আছে। যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বা সেইরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কৃষিকলেজে প্রবেশ করিবে তাহারা কি এরূপ পদের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে? কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যে উচ্চতর শিক্ষার কথা বলিয়াছেন তাহার কোনরূপ সীমা নির্দ্ধারণ করেন নাই, অথচ বলিয়াছেন যে যাঁহারা দুই বৎসর কৃষি কলেজে শিক্ষালাভ করিবেন তাঁহারা এল,এ, পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের সমশ্রেণীতে ও যাঁহারা তিন বৎসর বা চারি বৎসর শিক্ষালাভ করিবেন তাঁহারা বি,এ, পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের সমশ্রেণীতে গণ্য হইবেন। ইহাতে আমাদিগের মনে একটা সন্দেহ জন্মিতেছে। আমাদিগের মনে হইতেছে যেন সম্প্রদায় বিশেষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এদেশীয় ছাত্রগণ কৃষিকলেজের উচ্চতম শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইবে আমরা এরূপ মনে করি না। ইংরাজী যাহাদিগের মাতৃভাষা তাহাদিগেরই প্রবেশিকা অবধি শিক্ষালাভ করিয়া উচ্চতর শ্রেণীতে প্রবেশ করা কতকটা সম্ভব হইতে পারে। এই জন্য আমাদিগের মনে হয় যে গবর্মেণ্ট সেই সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গবর্মেণ্ট যদি

প্রকৃত পক্ষে এদেশীয়দিগকে ঐ সকল পদ প্রদান করিতে চাহেন তাহা হইলে যাহারা উচ্চতম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবে তাহাদিগের সাধারণ শিক্ষারও একটু উচ্চতর সীমা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। আমাদিগের বোধ হয় যেমন এল, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে শিক্ষালাভ করিলে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পদলাভ করিতে পারেন, কৃষি কলেজেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। কেন না শিক্ষিত লোকে কৃষিবিদ্যা না শিখিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতির আশা অতি অল্প। সত্য বটে কৃষি-কলেজের উচ্চতম শিক্ষা লাভের জন্য প্রাদেশিক গবমেণ্ট সমূহকে বিশেষ নির্ব্বাচন করিয়া ছাত্র পাঠাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা আমরা যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। এবিষয়ে শিক্ষার একটা সীমা নির্দ্ধারণ করা আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি।

প্রস্তাবিত কৃষি কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় অল্পাধিক ত্রুটি সত্ত্বেও তদ্দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ সুফলের অনেক আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যেরূপ উপযুক্ত হস্তে এই শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইলে সুফল লাভের সম্ভাবনা ছিল, তাহা হয় নাই। কলেজের যিনি অধ্যক্ষ হইবেন তাঁহার যেরূপ সাধারণ কৃষিজ্ঞান থাকা আবশ্যক সেইরূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকাও প্রয়োজনীয়; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহা না করিয়া একজন বিহারী নীলকরকে কলেজের অধ্যক্ষ করিয়াছেন। অবশ্য নীল চাষ করিয়া ইনি ব্যবহার-যোগ্য কৃষি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কলেজে যে সকল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, সে জ্ঞান কি তাঁহার আছে? গবমেণ্ট বলিতেছেন ইহাঁর অধীনে যে সকল শিক্ষক থাকিবেন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী, সুতরাং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার কোনরূপ ত্রুটি ঘটিবে না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, কৃষিতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন লোক থাকিতে একজন নীলকরকে কলেজের অধ্যক্ষ করিবার আবশ্যক কি? রাজ পুরুষেরা বলিতেছেন যে অধ্যক্ষ পদের জন্য বিলাত হইতে এক জন কৃষিজ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাপক আনয়ন করিলেও আশানুরূপ ফল লাভ হইবে না; কারণ ভারতের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা না-থাকিবারই কথা। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি ভারতীয় কৃষিতে ব্যুৎপন্ন অথচ বৈজ্ঞানিক রীতিতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন এরূপ লোক কি গবমেণ্টের চক্ষে ঠেকে না? যাঁহাদিগকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বঙ্গীয় গবমেণ্ট বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা শিখাইয়া আনিলেন, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষিতত্ত্ব শিখিয়াছেন, একজন নীলকর অপেক্ষা কি তাঁহারা পুষা কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইবার অধিক উপযুক্ত নহেন? শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত প্রভৃতি সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বহুদিন যাবৎ সরকারী কৃষিবিভাগে কার্য্য করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবং সিরেণ্টার কলেজের উত্তীর্ণ আরও কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি কৃষি-বিষয়ে যে সকল গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, তাহা সাধারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং অনেক বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাঁরা কি একজন নীলকর অপেক্ষা উপযুক্ত নহেন? যখন উপযুক্ত কৃষিবিৎদিগের প্রতি গবমেণ্ট এইরূপ ব্যবহার করিলেন, তখন পুষা কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা আভাসেই বুঝা যাইতেছে। মন্তব্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে "Government cannot at present find teachers of agricultural subjects nor can they find trained practical men to manage experimental or demonstration farms" অর্থাৎ গবমেণ্ট এক্ষণে কৃষি বিষয়ক শিক্ষক দেখিতে পান না অথবা আদর্শ ক্ষেত্রাদির তত্ত্বাবধারকের পদের উপযুক্ত শিক্ষিত কৃতকর্ম্মা লোক দেখিতে পান না। আমরা উপরে যাহাদিগের নাম উল্লেখ করিলাম তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আদর্শ ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং ইচ্ছা করিলে গবমেণ্ট সেইরূপ লোককে ডেপুটী গিরীতে নিযুক্ত না করিয়া উল্লিখিত পদসমূহে নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু সেদিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি কোথায়? আমরা শুনিতেছি পুষা কলেজের নীলকর অধ্যক্ষের অধীনে

সিনেটের কলেজের উত্তীর্ণ কোন কোন এদেশীয় কৃষিবিৎকে নিযুক্ত করিবার কথা হইতেছে, অর্থাৎ যাঁহারা অধীনে থাকিবেন নীলকর মহাশয় কার্য্যতঃ তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া অধ্যক্ষতা করিবেন ও তদানুসঙ্গিক উচ্চ বেতন ভোগ করিবেন; আর যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে কলেজে শিক্ষা দান করিবেন তাঁহারা নগণ্য ভাবে অবস্থিতি করিবেন।

আমরা পুষা কলেজের প্রতিষ্ঠায় যেরূপ আনন্দিত হইয়াছি ইহার অধ্যক্ষতার ভার উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত না হওয়াতে সেই রূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছি। যাহা হউক আমরা আশা করি কালে এ বিষয়ে সুব্যবস্থা হইবে। আমাদিগের দেশীয় যুবকদিগকে আমরা এই কলেজে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করি। কৃষিই অন্নের নিদান। অতএব ভারতের অন্ন সংস্থান জন্য সেই উন্নত কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে সকলে যত্নবান্ হউন। গবমেণ্ট উচ্চ পদ প্রদান না করিলেও অধীত বিদ্যাবলে ধরিত্রী গর্ভ হইতে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিলেও বর্ত্তমান সময়ের এ দুরবস্থা দূর হইবে।

রেড়ী।

ইতিহাস।

আধুনিক উদ্ভিদ্বেত্তাগণ ভেরাণ্ডা গাছ আফ্রিকা দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু আমাদের দেশের পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। সুশ্রুত ও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ভেরেণ্ডার তৈলের গুণাবলীর নির্দ্দেশ পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে ভারতবর্ষের অনেক ভাষায় ইহাকে এরেণ্ডা বলিয়া থাকে। আফ্রিকায় ইহা 'কিকি' নামে অভিহিত। আমাদের দেশে এই নামের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। এবং আমাদের দেশে ভেরেণ্ডার উপকারিতা যেরূপ উপলব্ধ হইয়াছে এখন পর্য্যন্তও অফ্রিকায় তাহা এ সকল উপকারে আসে না। যাহা হউক ইহা আমাদের দেশজই হউক আর আফ্রিকা হইতে আনীতই হউক ইহা নিশ্চয় যে, আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়নের পূর্ব্বে এখানে ইহার চাষ করা হইত। অতএব যেমন করিয়াই হউক ইহা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে দেখা যাইত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইয়ুরোপে প্রথমে ইহার চাষ করা হয়। তখন ইহাকে রিসিনি বা কিক্ বলা হইত। তখন ইহার উপকারিতা আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া ইহার চাষের তত যত্ন লওয়া হয় নাই। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে ইহাকে প্রথমে ব্রিটিশ ফার্ম্মোকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ক্রমে ইহার চাষ ও আমদানী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮২০ সালে বঙ্গদেশ হইতে ৭,১০২ পাউণ্ড তৈল গ্রেট ব্রিটনে রপ্তানি করা হইয়াছিল।

বর্ণনা।

ভেরেণ্ডা গাছ সকলেই দেখিয়াছেন। সাধারণতঃ লাল ভেরেণ্ডা ও গাবভেরেণ্ডা এই দুই জাতিই দেখা যায়। অনেক বাগানের বেড়ার ধারে গাবভেরেণ্ডাই দেখা যায়। এ গাছ অনেক বড় হয় না এবং অনেক দিন ধরিয়া বাঁচে। ইহার পাতা গুলি একটী লম্বা ডাঁটাবিশিষ্ট। পাতা ও ডাঁটা হইতে তরল আঠা বাহির হইয়া থাকে। এই জন্য গবাদি পশু ইহা সহজে খাইতে চাহে না। ডাল কাটিয়া পুতিলে নূতন গাছের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহা পুতিবার বেশ সুবিধা। ইহার ফুল গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে জন্মিয়া থাকে ও প্রায়ই সবুজ বর্ণ হয়, পাপড়ী প্রায়ই জন্মে না। ফল গুলি ছোট ছোট কাঁটার ন্যায় এবং সবুজ বর্ণ হইয়া থাকে। ফল পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ দেখায় এবং বীজগুলি ফল ফাটিয়া বহির্গত হয়। বীজগুলি ½ ইঞ্চি লম্বা, ⅓ ইঞ্চি চওড়া ডিম্বাকৃতি এবং চ্যাপটা। বীজ গুলির ডগা ঠোঁটের ন্যায় হইয়া থাকে। বীজের খোসা ধূসরবর্ণ এবং তাহার গায়ে ধূসরবর্ণ দাগ আছে। অন্যান্য তৈলের ন্যায় রেড়ীর তৈল বীজের খোসা হইতে পাওয়া যায় না, ইহা বীজাভ্যন্তরস্থ অঙ্কুর হইতে পাওয়া যায়। রেড়ীর তৈল বিষাক্ত নয় বটে কিন্তু বীজের মধ্যে আর একটী বিষাক্ত পদার্থ আছে। এই জন্য বীজ এরূপ বিষাক্ত যে, তিনটী মাত্র বীজ ভক্ষণ করিলে মানুষ মরিয়া যাইতে পারে।

লাল জাতীয় ভেরেণ্ডা প্রায়ই পোড়ো জমিতে জন্মিয়া থাকে। ইহার পাতা ডাঁটা ও কাণ্ড লালবর্ণ হয়। পাতাগুলি হাতের আঙ্গুলের মত কাটা কাটা এবং ধারগুলি করাতের দাঁতের ন্যায়। এই জাতীয় ভেরাণ্ডারই তৈল প্রাপ্ত হইবার জন্য চাষ করা হয়। ইহাদের বীজ হইতেই গাছের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

তৈল।

ভেরাণ্ডার বীজ হইতেই তৈল পাওয়া যায়। ইহা দুই জাতি হইতে দুই প্রকার পাওয়া যায়। অনেক-বীজযুক্ত ফল হইতে পোড়াইবার তৈল পাওয়া যায় এবং অল্প-বীজযুক্ত ফল হইতে ঔষধে ব্যবহারোপযোগী তৈল পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ রেড়ীর তৈল ঘন এবং চট্‌চটে। ইহা বর্ণহীন এবং গন্ধহীন এবং অল্প বিস্বাদ যুক্ত হইয়া থাকে। দোকানে যে সকল তৈল বিক্রয় হয় তাহা হরিদ্রাবর্ণ এবং দুর্গন্ধ যুক্ত। এই তৈল ঠাণ্ডায় জমিয়া যায় না এবং বায়ুর প্রভাবে অধিক ঘন হইয়া থাকে। —১৮° সেণ্টিগ্রেডে ইহা হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডরূপে পরিণত হইয়া যায়। সমস্ত তৈল অপেক্ষা ইহা অধিক ভারী কারণ ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৯৭০। ঠাণ্ডা বিশুদ্ধ আলকোহলের সহিত ইহা সকল পরিমাণেই দ্রব হইতে পারে এবং ঈথার ও গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিডে ইহা দ্রব হইয়া যায়।

তৈলের উপকারিতা অনেক। এই তৈলই প্রধানতঃ মেসিন, কল কব্জা প্রভৃতি এবং ঘড়িতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পোড়াইবার তৈল এবং কেরাসিন, সরিষা প্রভৃতি অন্যান্য তৈল অপেক্ষা উজ্জ্বল ধূমবিহীন সাদা আলোক প্রদান করে। অতি ধীরে ধীরে পুড়িয়া থাকে বলিয়া ইহা ব্যবহার করিলে অনেক আয় দেখিয়া থাকে। আরও অন্যান্য তৈলের ন্যায় ইহা হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। এই সকল কারণে ইহা ভারতবর্ষে সমুদায় রেল কোম্পানি ও প্রায় সমুদায় গৃহস্থ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাথা ঠাণ্ডা রাখে বলিয়া এবং কেশমূল গুলি নরম ও পরিষ্কার রাখে বলিয়া ইহা বিশুদ্ধ করিয়া পমেটম প্রভৃতি অন্যান্য গন্ধ দ্রব্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তাজা বীজ হইতে প্রাপ্ত তৈল উজ্জ্বলতর আলোক প্রদান করে, এই জন্য তাহার মূল্য অধিক। এখন তাহা ৪০।৫০ টাকায় মণ বিক্রয় হয়। প্রধানতঃ ইয়ুরোপেই সেই তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে বলিয়া ইহার মূল্য এত অধিক। যদ্যপি আমাদের দেশে ইহা প্রস্তুত করা যায় তাহা হইলে তাহা ১০ টাকায় মণ বিক্রয় হইতে পারে। ধনবান ব্যক্তি মাত্রেরই এই বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহা যে একটী অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই তৈল আলকোহলে দ্রব করিয়া কোপাল্ (Copal) দ্রবে মিশাইলে অতি উৎকৃষ্ট পালিস্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাতে প্রধানতঃ গাড়ী, জাহাজের ক্যাবিন, ছবির ফ্রেম, তৈল-চিত্র, পার্চমেণ্ট, ম্যাপ, নানারূপ চামড়া নির্ম্মিত দ্রব্য প্রভৃতি অতি উত্তম রূপে পালিস হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে রেল কোম্পানিরা ভেরেণ্ডার তৈলে নাইট্রিক এসিড মিশাইয়া গাড়ীর চাকায় এবং অন্যান্য কল কব্জায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ভেরাণ্ডার তৈল কাপড় ছোপাইবার রঙের সহিত অনেক ব্যবহৃত হয়। বিশেষ মরিণ্ডা রংএর সহিত ইহা ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক চামড়া ট্যান করিতে ইহা প্রধানরূপে উপযোগী। মরক্কো লেদার প্রধানতঃ ইহার দ্বারা ট্যান হইয়া থাকে। ইহা চামড়া নির্ম্মিত দ্রব্য বেশ নরম ও পরিষ্কার রাখিতে পারে এই জন্য চামড়ার বড় ব্যাগে, ঘোড়ার সাজসজ্জা প্রভৃতিতে মাখাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মাখাইলে সেই দ্রব্যে ইন্দুর প্রভৃতির উপদ্রবের ভয় থাকে না; এবং সেই চামড়া পালিস করিবারও কোন অসুবিধা হয় না।

খইল।

রেড়ীর খইল গবাদি পশুর খাদ্য নহে। কিন্তু মহীশূরে এই খইল সিদ্ধ করিয়া সেই জল মহিষাদিকে খাওয়াইলে তাহাদের দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে। রেড়ীর খইল প্রধানতঃ সাররূপেই ব্যবহৃত হয়। ইহার আর একটী উপকারিতা আছে,—ইহা হইতে উৎকৃষ্ট গ্যাস প্রস্তুত করা যায় এবং সেই গ্যাস জ্বালাইলে অতি উজ্জ্বল শুভ্র আলোক পাওয়া যায়। আলোক জ্বালাইবার জন্য এলাহাবাদ ষ্টেসনে খইল হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিবার কল আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির নিজেদের রেড়ীর তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য যে কল আছে, তাহা হইতেই তাহারা গ্যাস প্রস্তুতের জন্য খইল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জয়পুরের প্রাসাদ এবং রাস্তা এই খইল হইতে উদ্ভূত গ্যাস দ্বারাই আলোকিত হইয়া থাকে। এই গ্যাস প্রস্তুত করিবার খরচ (তৈল ক্রয় বাদে) ১০০০ কিউবিক ফিটে প্রায় পাঁচ টাকা। পঞ্জাবে স্থানীয় কল চালাইবার জন্য রেড়ীর খইল জালানিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সার হিসাবে রেড়ীর খইলের ব্যবহার সর্ব্বজন বিদিত। ইক্ষুর ক্ষেত্রে কেবল মাত্র খইলের পরিবর্ত্তে ইহার সহিত হাড়চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। ধান ও আলুর ক্ষেত্রে এই সার ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও তাহা হইতে অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পানের চাষে রেড়ীর খইল অপেক্ষা সরিষার খইল অধিক উপযোগী, কারণ রেড়ীর খইল পান নষ্ট করিয়া ফেলে। অনেকে মনে করেন যে রেড়ীর খইলে ফস্‌ফেটের মাত্রা অন্যান্য খইল অপেক্ষা অধিক বলিয়া ইহার সার অত উপযোগী। কিন্তু মরটন্ সাহেব বলেন যে ইহাতে শতকরা ২·৮১ ভাগ ফস্‌ফেট আছে এবং অন্যান্য খইলে ইহাপেক্ষা অধিক ফস্‌ফেট আছে।

প্রোফেসার এণ্ডারসন্ রেড়ীর খইল বিশ্লেষণ করিয়া এই সকল পদার্থ নিম্ন লিখিত ভাগে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জল	শতকরা	১২.৩১	ভাগ
তৈল	"	২৪.৩২	"
আলবুমেন	"	২১.৯১	"
মিউসিলেজ, চিনি দিঃ	"	৩৫.৩৮	"
ভস্ম	"	৬.০৮	"

ভস্ম হইতে

নাইট্রোজেন বা সোরাজান	৩.২০	ভাগ
সিলিকা বা বালু	১.৯৬	"
ফস্ফেট্	২.৮১	"
ফস্ফরিক এসিড	০.৬৪	"

ঔষধ।

ঔষধ হিসাবে রেড়ীর তৈল প্রাপ্ত হইবার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহার চাষ করা হয়। ইহার বীজ হইতে নিষ্কাসিত তৈল বিরেচকরূপে সর্ব্বত্র অন্য বিরেচকাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ ইহা সর্ব্বকালে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নিঃসঙ্কোচে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ঔষধে ব্যবহার করিবার জন্য তৈল নিষ্কাসিত করিতে হইলে অগ্নির উত্তাপের প্রয়োজন হয় না। কারণ অগ্নির তাপ সংযোগে প্রাপ্ত তৈলের স্বাদ ও গন্ধ বিকৃত হইয়া যায় এবং তাহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়।

ভেরাণ্ডা গাছের মূলের ছালও বিরেচক ভাবে ব্যবহার হয়। ইহার ছাল, লঙ্কাপাতা ও দোক্তা-পাতা একত্র করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিলে ঘোড়ার পেটের বেদনা সারিয়া যায়।

প্রধানতঃ দুই প্রকার ভেরাণ্ডা গাছ দেখা যায়। সুশ্রুত সংহিতায় তাহাদিগকে লোহিত ও শ্বেত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের গুণ একই। ইহা বাতারি অর্থাৎ বাতের ঔষধ বলিয়া উক্ত আছে। এই গাছের মূল অন্যান্য স্নায়ু-সংক্রান্ত বেদনার ঔষধ বলিয়াও উক্ত আছে। ইহা বায়ুনাশকও বটে।

মুসলমান গ্রন্থেও এই দুই জাতীয় গাছের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহাদের মতে লোহিত জাতি অধিকতর কার্য্যকারী। তাঁহারা হাঁপানি কাশি, শ্লেষ্মাপ্রাধান্যে, উদরী ও বাধক প্রভৃতিতেও ইহা ব্যবহার করিতেন। বীজ মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে উত্তম বিরেচকের কার্য্য পাওয়া যাইত। ইহার পত্রেরও ঐ সকল গুণ আছে বলিয়া উক্ত আছে। ইহার পাতা বা বীজ বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে ঠুন্‌কো প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। তাঁহারা আফিং সেবনে মরণাপন্ন রোগীকে ভেরাণ্ডার রস পান করাইয়া বমনের সহায়তা করিতেন।

বীজ, তৈল অপেক্ষা অধিক বিরেচন-ক্ষমতা-সম্পন্ন। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত অতএব ইহা ঔষধরূপে ব্যবহার না করাই উচিত। তিন চারিটী বীজ খাইলে একটী মানুষ মরিয়া যাইতে পারে।

(Ehrlich) আরলিক্ নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক, প্রাণীদিগের শরীরে বীজের রস অতি অল্প মাত্রায় প্রবেশ করাইয়া এবং তাহা নষ্ট হইলে পুনরায় অল্প পরিমাণে প্রবিষ্ট করান। এইরূপে অনেক বার প্রবেশ করানর পর অবশেষে দেখিলেন যে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যে, সে প্রাণীর আর ভেরাণ্ডা বীজে জীবন নাশ করিতে পারে না। এই নূতন আবিষ্কারই চিকিৎসা জগতে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। কারণ এই আবিষ্কারই antitoxin serum আবিষ্ক্রিয়ার জন্মদাতা।

কেহ কেহ বলেন ভেরাণ্ডা পাতার রস বাহ্যিক প্রলেপ দ্বারা বা সেবন দ্বারা স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই নিমিত্ত গবাদি পশুকে উহার রস পান করান হয়।

অন্যান্য উপকারিতা।

মান্দ্রাজ প্রদেশে ভেরাণ্ডার পাতা প্রধানতঃ পশু-খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহাতে গবাদির দুগ্ধও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার খইল সাধারণতঃ গবাদির অনিষ্টকারী কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে মহিষকে খাইতে দিলে তাহাদিগের দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে।

রেড়ীর কাটী অর্থাৎ রেড়ীর শুষ্ক কাণ্ড সমূহ এবং ফলের খোসা ইক্ষুরস জ্বাল দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেড়ীর কাটীর দ্বারা সুন্দর চাল ছাওয়ান যাইতে পারে এবং এই কাটীতে উইপোকা ধরিবার আশঙ্কা থাকে না। এই কাটী ঘন সন্নিবেশিত করিয়া বেড়া দিবার জন্য সুন্দর উপযোগী। জীবন্ত গাছে প্রায়ই উই ধরিয়া থাকে।

এমন কি ইহাদিগের অভ্যন্তরেও উই পোকা বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

মৌমাছি ভেরাণ্ডা গাছ বড় ভালবাসে এবং প্রায়ই তাহাতে চাক বাঁধিয়া থাকে।

গুটীপোকা রেড়ীর পাতা খাইতে ভাল বাসে এই জন্য স্থানে স্থানে গুটী পালনের জন্য ইহার চাষ হইয়া থাকে।

ইহার কাণ্ড কাগজের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ছালে যদিও আঁশ আছে বটে কিন্তু তাহা পৃথক করিলে কোনও উপকারে আইসে না।

তৈল নিষ্কাসন প্রণালী।

তিন প্রকার উপায়ে বীজ হইতে তৈল নিষ্কাসিত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ পাচন করিয়া; দ্বিতীয়তঃ—চাপ সংযোগে; তৃতীয়তঃ আলকোহল বা অন্য দ্রাবক সংযোগে।

প্রথম প্রণালী প্রধানতঃ ইষ্ট ইণ্ডিসে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ বীজ গুলিকে খোলা হইতে বাছিয়া ফেলিয়া তাহা ভাজিয়া লওয়া হয় এবং পরে তাহাতে জল দিয়া ফোটান হয়। এইরূপ করিলে পর তৈল জলের উপরে ভাসিয়া উঠিবে এবং তাহা আস্তে আস্তে 'কাটাইয়া' লইতে হইবে। এই তৈলকে পুনরায় জলে ফোটাইতে হয়, তাহাতে অপেক্ষাকৃত বিষাক্ত পদার্থগুলি নষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৈলের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে বীজ গুলিকে 'সাঁকিয়া' লইতে হয়। কিন্তু তাহাতে তৈল একটু ধূসরবর্ণ এবং কটুস্বাদযুক্ত হয়। এই কারণে ইষ্ট ইণ্ডিস্ হইতে প্রাপ্ত তৈল প্রায়ই ধূসরবর্ণ ও কটুস্বাদ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রণালী—আমাদের দেশে চাপ সংযোগেই তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমে বীজ গুলিকে ফলের খোসা এবং ধূলা প্রভৃতি হইতে পরিষ্কৃত করিবার জন্য বেশ করিয়া জলে ধুইয়া লওয়া হয়। অনন্তর সেগুলিকে একটা লৌহ কটাহে রাখিয়া অল্প সেঁক দিতে হয়। এরূপ জ্বাল দিতে হইবে যাহাতে বীজগুলি না ভাজিয়া যায় অর্থাৎ যে তাপ অনায়াসে হাতে সহ্য করা যায়। এইরূপ করিবার কারণ এই যে ইহাতে বীজাভ্যন্তরিক তৈল সহজে নিষ্কাসিত হইতে পারে। অনন্তর বীজগুলিকে হাইড্রলিক প্রেস্ সংযোগে চাপ দেওয়া হয় এবং বীজ হইতে এক প্রকার সাদা তৈলযুক্ত পদার্থ নির্গত হইয়া আইসে। এই পদার্থকে পরে একটা কটাহে বীজের চারিগুণ ওজন জলে মিশাইয়া সিদ্ধ করিতে হয় এবং সময়ে সময়ে উপরে যে সকল ময়লা পদার্থ ভাসিয়া উঠে তাহা 'কাটাইয়া' লইতে হয়। এইরূপ করিলে পর বিশুদ্ধ তৈল জলের উপর ভাসিয়া উঠে। বিশুদ্ধ তৈল পরে ছাঁকিয়া লইতে হয় এবং তাহা পুনরায় অল্প পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া পুনরায় জ্বাল দিতে হয়। বাষ্প নির্গত হওয়া বন্ধ হইলে তাহা কড়া হইতে ঢালিয়া ফেলিলে বিশুদ্ধ বর্ণহীন তৈলে পরিণত হয়। শেষ ফোটানর সময় বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন; যেন কোনরূপে জ্বাল অধিক হইয়া না পড়ে, তাহাতে. তৈলের বর্ণ ধূসর হইয়া যাইবে ও স্বাদ বিকৃত হইবে। এই উপায়ের দ্বারা বীজের ওজনের সিকি পরিমাণ তৈল পাওয়া যায়।

তৃতীয় প্রণালী—আলকোহলে দ্রব করিবার প্রণালী কেবল ফ্রান্সেই দেখা যায়। ইহা হইতে প্রস্তুত তৈল শীঘ্র খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রকারে প্রাপ্ত তৈল অধিক কার্য্যকারী ও স্বাদহীন হইয়া থাকে।

ভেরাণ্ডার চাষ।

দুইপ্রকার ভেরাণ্ডা গাছ আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই প্রকারেই পাতার, কাণ্ডের ও ফলের আকৃতি বিভিন্ন। এই দুই জাতির এই বিভিন্নতা হেতু নানারূপ নামকরণ হইয়াছে। গাব গাছের ন্যায় আঠা নির্গত হয় বলিয়া প্রথম প্রকারকে আমাদের দেশে গাব ভেরেণ্ডা বলে। এই গাছগুলি প্রায় মানুষের মাথা ছাড়াইয়া উঠে এবং প্রায়ই বেড়ার ধারে পোতা হয়। এই সকল গাছের বীজ বেশ বড় এবং তাহা হইতে নিষ্কাসিত তৈল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রকম। দ্বিতীয় প্রকার গুলি ভেরাণ্ডা নামেই অভিহিত। ইহা প্রতি বৎসরেই মরিয়া যায়। কখনও কখনও ইহার চাষ করা হয়, অথবা ইহা অন্যান্য চাষের সহিত লাইন করিয়া পোতা হয়। ইহার বীজ যদিও ছোট

ছোট ও অল্প, কিন্তু ইহার তৈল উৎকৃষ্ট এবং উহাই বিশুদ্ধ করিয়া ঔষধার্থে বিক্রয় হয়। প্রথম জাতি হইতে প্রাপ্ত তৈল জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার বিরেচক ক্ষমতা অন্যাপেক্ষা অল্প।

বঙ্গদেশের নানা স্থানে ইহার যেরূপ উপায়ে চাষ হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

দিনাজপুর।

দিনাজপুর প্রদেশে হরিপুর সীমানায় ইহার চাষ করা হয় বটে, কিন্তু তাহা প্রধানতঃ এড়ির কাপড় প্রাপ্ত হইবার জন্য গুটি পোকার খাদ্যের নিমিত্ত পাতা পাইবার উদ্দেশে। যে টুকু তৈল পাওয়া যায় তাহা সে দেশীয় স্ত্রীলোকদের কাপড় রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তথায় দুই প্রকার রেড়ীরই চাষ হয় এবং বালী ও এঁটেল মিশ্রিত জমিতে চাষ করা হয়। জমিতেও অনেক বার লাঙ্গল দিতে হয় এবং লাঙ্গলের দাগে দাগে বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়।

সেখানে তৈল প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে বীজ গুলিকে উত্তমরূপে ভাজিয়া লইয়া পরে গুঁড়াইয়া ও ঝাড়িয়া মাটীর হাঁড়ি'র মধ্যে জলের সহিত ক্ষার মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করা হয়। তৈল উপরে ভাসিয়া উঠিলে ছাঁকিয়া লইয়া বিশুদ্ধ করা হয়।

পাটনা।

পাটনা জেলায় তিন প্রকার রেড়ীর চাষ হয়। ছোট, মাঝারী ও বড়, এই তিন প্রকার বীজ প্রায়ই দেখা যায়। বৈশাখ মাসে বড় বীজগুলি অন্যান্য "ভাদুই" শস্যের সহিত চাষ করা হয়। এই জাতীয় বীজ গুলি বড় হয় বটে কিন্তু খোসাও অনেক বাদ যায়। পৌষ মাসে ইহার বীজ সুপক্ক হইয়া থাকে। 'গোহুনি' জাতীয় রেড়ী আশ্বিন মাসে পোতা হয় এবং বৈশাখের গোড়ায় পাকিয়া যায়। দোআঁসলা জমিতে ইহার আবাদ হয় এবং প্রথম জাতি অপেক্ষা ইহাতে অধিক উৎকৃষ্ট তৈল লাভ হয়।

পাটনা জেলায় রেড়ীর গাছ ১০ হাত বাড়িয়া থাকে। নদীর ধারেই ইহার চাষ সুবিধাজনক। ধাতব সার ইহার পক্ষে উপকারী। পাহাড়ের মূলে সরস জমিও ইহার চাষের উপযোগী। এই সকল জমিতে প্রতি বিঘায় ২০।৩০ গাড়ি গোবর ফেলা প্রয়োজন। অনন্তর বর্ষার গোড়ায় ২।৩ বার চাষ দিতে হয় এবং বীজগুলি জলে না ভিজাইয়া দেড় হাত বা দুই হাত অন্তর গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুতিতে হয়। প্রতি বিঘায় ৩।৪ সের বীজ ফেলিলেই যথেষ্ট। প্রত্যেক গর্ত্তের মধ্যে দুটী করিয়া বীজ ফেলিতে হয়। গাছগুলি এক হাত বাড়িলে আর একবার জমিতে লাঙ্গল দেওয়া প্রয়োজন এবং মাঝে মাঝে জমি খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক; তাহাতে ঘাস জন্মিতে পারে না। ইহার ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন প্রয়োজন হয় না। মাঘের শেষে ফল সংগ্রহ করিতে হয়। প্রত্যেক বিঘা হইতে জমি অনুযায়ী চারি হইতে বার মণ ফসল পাওয়া যায়। প্রত্যেক জমিতে ৫।৬ বৎসর অন্তর একবার ইহার চাষ করা প্রয়োজন; কারণ ইহা শীঘ্রই জমিকে অনুর্ব্বরা করিয়া ফেলে।

পাটনায় তৈল নিষ্কাসন করিবার পূর্ব্বে খোলা বাদ দেওয়া হয় না। তথায় উৎকৃষ্ট জাতীয় ২৷৷০ সের ফলে এক সের তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং চারি আনায় সের বিক্রয় হয়।

মেদিনীপুর।

মেদনীপুর জেলায় প্রধানতঃ সুবর্ণরেখা এবং দুলং'নদীর মধ্যস্থিত চড়া জমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। আশ্বিনে ইহার চাষ হয়। দুই তিন বার লাঙ্গল দেওয়ার পর ইহার আবাদ হয় এবং মাঝে মাঝে কোদালে খুঁড়িয়া দেওয়া হয়। প্রতি বিঘায় এই রূপ খরচ হইয়া থাকে।

তিনবার লাঙ্গল দেওয়া	...	১৶০
একবার নিড়ান ...	...	৷৶০
১২ সের বীজ ...	...	৸০
জমীর কর ...	...	১৷০
		৩৷০

প্রতি বিঘায় ৩ মণ ফসল হয় এবং তাহা ৭৷০ টাকায় বিক্রয় হয় অতএব চাষারা ৪ টাকা করিয়া বিঘা পিছু লাভ পায়। তাহারা তৈল বিক্রয় করে না, ফল বিক্রয় করে। বাড়ীর ব্যবহারের জন্য তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে তাহারা প্রথমে বীজ গুলিকে

অন্ন চোঁয়াইয়া লইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া হাঁড়িতে জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া তৈল বাহির করিয়া লয়।

হুগলি জেলায় ইহার আবাদ হয় না; প্রায়ই পোড়ো জমিতে লাল জাতীয় ভেরেণ্ডা জন্মিতে দেখা যায় এবং বেড়ার ধারে লাগাইবার জন্য গাব ভেরেণ্ডার ব্যবহার দেখা যায়।

ভাগলপুর।

ভাগলপুর জেলায় ইহার আবাদ হইয়া থাকে। তথায় ইহার পাঁচ প্রকার বীজ আবাদ হয়। চুনকি বা ছোট বীজের জন্য আবাদ করিতে হয় না, দুই হাত অন্তর ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া একটী বীজ পুঁতিতে হয়। গাছ জন্মিলে তাহার বিশেষ কোনও যত্ন লওয়া হয় না। ইহা প্রায়ই বাড়ির নিকট পোড়ো জমিতে পোতা হয়। গাছগুলি ৭।৮ হাত লম্বা হইলে তাহার কাটী অনেকে ঘর ছাইবার জন্য ব্যবহার করে। এই গাছগুলি দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে। নূতন বৃক্ষের ফল গুলিতে পুরাতন বৃক্ষজাত ফল অপেক্ষা অধিক তৈল থাকে। ফলগুলি পাকিয়া পড়িয়া গেলে তাহা কুড়াইয়া লইয়া গোবরের সহিত পচিতে দেওয়া হয়। অনন্তর রৌদ্রে শুকাইয়া কোনরূপ চাপ সংযোগে তৈল বাহির করা হয়। গহুনা জাতীয় বীজ দেখিতে গমের ন্যায়। এটেঁল মাটীতে ইহার ভাল আবাদ হয়। জমি শক্ত হইয়া গেলে মাঝে মাঝে জল সেক প্রয়োজন। নদীর পাড়ে ইহার উৎকৃষ্ট আবাদ হয়। সমস্ত খরচ ধরিলে একবিঘার ৩৷৹ টাকা খরচ পড়ে এবং ৬৷৹ মণ ফল পাওয়া যায়। ৫ সের বীজে এক বিঘা জমিতে আবাদ হয়। ইহা ছয় হাতের অধিক বাড়ে না। কার্ত্তিক মাসে ইহার চাষ হয়।

বঙ্গদেশ ব্যতীত উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের স্থানে স্থানে ইহার চাষ হয় এবং সর্ব্বত্রই ইহার দ্বারা যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

রেড়ীর আবাদে গুটি পোকার বড় উপদ্রব হয়। এই জন্যই শীতের গোড়ায় ইহার চাষ করিতে হয়। কারণ তখন গুটী পোকা, 'পোকা' অবস্থায় থাকে, ও পক্ষী পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণী দ্বারা অনায়াসেই ধ্বংস হইতে পারে।

গুটীপোকা ইহা খাইতে বড় ভালবাসে এবং খাইলে অধিক পুষ্ট হয় ও তাহাদিগের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইজন্য স্থানে স্থানে তাহাদিগের খাদ্যের জন্য রেড়ীর চাষ হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে তৈল নিষ্কাসন প্রণালী।

কলিকাতায় প্রধানতঃ উত্তর বঙ্গপ্রদেশ হইতে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে বড় বড় ভেরাণ্ডা বীজ এবং মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে ছোট ছোট বীজ আমদানী হয়। তৈল নিষ্কাষণ এইরূপে সাধিত হয়:—

গৃহ-প্রণালী—চাষারা অনেকে আলোক জ্বালাইবার জন্য ঘরে ভেরাণ্ডার তৈল নিষ্কাসিত করিয়া লয়। তাহারা প্রথমে একটী খোলায় বালু রাখিয়া তাহার উপর মুড়ি ভাজার ন্যায় বীজগুলিকে ভাজিয়া লয়। এইরূপে ভাজিলে তৈল-পদার্থ বীজের মধ্যে তরলাকারে পরিণত হয়। অনন্তর জাঁতায় ভাঙ্গিয়া লইয়া, কুলা দিয়া খোসাগুলি পাছড়াইয়া ফেলে। পরে হামানিস্তায় বেশ করিয়া কুটিয়া ফেলে এবং তাহার পর জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া লয়। ১৷৹ সের জলে ২৷৹ সের বীজের গুঁড়া ফেলিতে হইবে। সমস্ত জল মরিয়া গেলে তৈল কটাহে পড়িয়া থাকে এবং পরে হাতার দ্বারা কোন পাত্রে তুলিয়া ফেলে। এই তৈল আর একবার জলের সহিত ফুটান হয়। তাহাতে ইহা আরও বিশুদ্ধ হইয়া যায়, কারণ এই প্রক্রিয়ায় দুষিত পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়। তথাপিও ঘরে প্রস্তুত তৈল প্রায়ই অপরিষ্কার ঘন চট্‌চটে হইয়া থাকে ও পোড়াইবার কালে কাল ধুম নির্গত হয়।

কলে প্রস্তুত প্রণালী—ক্ষেত্রমোহন বসাক এণ্ড কোং কলিকাতার একজন রেড়ীর তৈলের প্রধান ব্যবসাদার। ইহাদের তৈল $K\ B_1$ $K\ B_2$ $K\ B_3$ এই সকল মার্কা লইয়া অনেক পরিমাণে ইয়ুরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি হইয়া থাকে। তাঁহারা বড় ও ছোট উভয় বীজই তৈল নিষ্কাসনার্থে ব্যবহার করেন। বড় হইতে শতকরা ৪০ ভাগ এবং ছোট হইতে শতকরা ৩৭ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। কলিকাতায় উভয়েরই এক হন্দরের দাম ৩ টাকা। ছোট বীজ হইতেই ভাল তৈল নির্গত হয় এবং তাহাই প্রধানতঃ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাঁহারা চারি প্রকার তৈল বাহির করেন:—

১। বীজ না ভাজিয়া চাপ সংযোগে যে তৈল পাওয়া যায় তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ঔষধার্থে ব্যবহার হয়।

২। ঐরূপে নিষ্কাসিত, কিন্তু অত বিশুদ্ধ নয়। ইহা সাধারণতঃ শিল্প কার্য্যে ব্যবহার হয়।

৩। ঐরূপ কিন্তু ২য় অপেক্ষা অল্প বিশুদ্ধ। ইহা পোড়াইবার জন্য ব্যবহার হয়।

৪। ঐরূপ কিন্তু অপরিষ্কার, পোড়াইবার জন্য এবং কলে দিবার জন্য ব্যবহার হয়।

তৈল বাহির করিবার সময়ে চাপ দিবার জন্য হাইড্রলিক প্রেস ব্যবহার হয় না, কারণ তাহাতে ইচ্ছানুযায়ী অল্পাধিক চাপ দেওয়া যায় না। এই জন্য মেসার্স জেসপ্ এণ্ড কোং একটী নূতন কল আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারাও কল সাহায্যে চারি রকম তৈল পাইয়া থাকেন।

বাঙ্গালার জেল সমূহে, বিশেষতঃ রাজসাহী জেলে এই তৈল প্রস্তুত করা হয়। এখানে মাসে প্রায় ৭০০ শত মণ তৈল পাওয়া যায়।

বীজ ঝাড়া ও পরিষ্কার করা প্রায় স্ত্রীলোক কয়েদী দ্বারাই সম্পাদিত হয়। প্রথমতঃ তাহারা বীজ হইতে মাটীর ঢেলা বা তৃণাদি জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া তাহা চালুনির দ্বারা চালিয়া ফেলে।

অনন্তর সেই বীজগুলিকে ভাঙ্গিবার কলে ফেলিয়া ভাঙ্গা হয়। এই কল আর কিছুই নহে, ইহাতে দুইটী রোলার হাতে করিয়া ঘুরান হয় এবং বীজগুলি তাহার মধ্যে পিশিয়া গুঁড়াইয়া যায়।

অনন্তর সেই ভাঙ্গা বীজগুলি হইতে সযত্নে কুলার সাহায্যে ভুষী বা খোলা বাদ দিয়া একবার রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। বেশ শুকাইয়া গেলে তাহাকে আবার ঢেঁকী দ্বারা বা তদনুরূপ কলে কুটিয়া ফেলিতে হয়। কুটা হইয়া গেলে বীজ গুলিকে ১৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ৭½ ইঞ্চি চওড়া থলের মধ্যে পুরিয়া বেশ করিয়া মুখ আঁটিয়া দিয়া একটী Screw প্রেসে ফেলিতে হয়। প্রেসে চাপ পাইয়া থলে হইতে তৈল নির্গত হইতে থাকে। প্রেসের নীচে আগুণের উত্তাপ দেওয়া হয় তাহাতে তৈল শীঘ্র এবং অধিক পরিমাণে নিষ্কাসিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক থলের মধ্যে আধসের পরিমাণ গুঁড়া বীজ থাকে এবং একটী প্রেসে ১৩০ হইতে ১৫০ খানা থলে ধরিতে পারে।

অনন্তর এই প্রকারে ঘন তৈল জমিলে পর বড় বড় তামার কড়ায় এক ভাগ তৈল ও সিকি ভাগ জল দিয়া জাল দিতে হইবে। কত ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ দিতে হইবে তাহা কেবল অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা যায়। এই জন্য এই কাজটী অতি কঠিন। তৈল সংগ্রহের পর ইহা সাত আট পুরু কাপড়ের ভিতর দিয়া ও কাষ্ঠ কয়লার মধ্য দিয়া চুয়াইয়া চুয়াইয়া পড়িলে পর তাহা পরিষ্কৃত হইয়া ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। জেলের তৈল বাজারের ২ নং ও ৩ নং তৈলের মাঝামাঝি। ইহা জ্বালাইবার জন্য এবং কলে দিবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানি এবং আফিস্ সমূহে ব্যবহৃত হয়। ইহার দাম মণকরা ১০ টাকা হইতে ১০।০ হইয়া থাকে। জেলে কখনও কখনও ঔষধার্থ অল্প পরিমাণে তৈলও নিষ্কাসিত করা হয়। তাহা গবর্ণমেণ্টের কাজেই লাগিয়া থাকে।

ব্যবসা।

ভারতবর্ষে কলিকাতা সহরই তৈল নিষ্কাসন করিবার প্রধান স্থান। প্রায় সকল প্রকার তৈলের বীজ এখানে আমদানী হয় এবং কল দ্বারা নিষ্কাসিত হইয়া বাজারে ও দেশ বিদেশে রপ্তানি হয়। রেড়ীর বীজ এত অল্প পরিমাণে ভারতবর্ষে জন্মে যে দেশের খরচের জন্যই সঙ্কুলান হইয়া উঠে না, তাই তত রপ্তানি হয় না। রাজপুতানা ও পঞ্জাব প্রদেশে বীজের অভাব, অতএব ঐ সকল প্রদেশে রেড়ীর চাষ করা উচিত। সামান্য খরচে, সামান্য পরিশ্রমে ও যত্নে একটী লাভজনক ফসল পাইতে হইলে সকলের রেড়ীর চাষে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীবিরিঞ্চি মোহন কর।

ইক্ষু।

বঙ্গদেশে আকের চাষ বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এতদ্দেশে বোম্বাই আকের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল পোকা ধরিয়া কৃষকদের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় সংপ্রতি বোম্বাই আকের চাষ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। অধুনা সামসাড়া আকই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। ইহার রং পীতাভ শ্বেতবর্ণ। ইহা বেশ বড় এবং সরস হয়। তদ্ভিন্ন এই আকের চাষে আর একটী সুবিধা এই যে ক্ষেতে জল দাঁড়াইলে সহজে পচে না। কাজলা এবং পুরী আকের চাষ বীরভূম, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় হইয়া থাকে। খেড়ী আক বরাখরের নিকটবর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন হয়। ইহা অত্যন্ত কঠিন, ইহার মিষ্টতাও অপেক্ষাকৃত কম। বঙ্গদেশে বীরভূম, ঢাকা, ফরিদপুর, হুগলী, রঙ্গপুর ও ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় প্রচুর পরিমাণে এই আক উৎপন্ন হয়। নিম্ন লিখিত তালিকা দৃষ্টে এতদ্দেশীয় আক চাষের পরিমাণ বুঝা যাইবেঃ—

১৮৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত বঙ্গদেশে আকের জমীর পরিমাণ ৬৭১,৩৮১ বিঘা ছিল এবং এই আক হইতে ৬৭,৩৭,৬০০ মণ গুড় প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯০২-৩ সালে চাষের জমীর পরিমাণ ২৪,০০০০০ ও উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ ২,০৪,৫০০,০০ মণ।

এক জমীতে ক্রমান্বয়ে আক চাষ করিলে, ফসল ভালরূপ উৎপন্ন হয় না এবং আকে শর্করার ভাগও কমিয়া যায়। এক জমীতে প্রত্যেক তিন বৎসর পর আক উৎপাদন করাই শ্রেয়ঃ। সাধারণতঃ এদেশীয় কৃষকগণ এরূপ পর্য্যায় প্রণালীর অনুসরণ করে না। আলুর পর আক দিলে জমীর তাদৃশ পাইট করিবার আবশ্যক হয় না। কারণ যে জমী আলুর জন্য প্রস্তুত করা হয় তাহা আকের পক্ষেও উপযুক্ত। এরূপ স্থলে কেবল ৫।৬ বার লাঙ্গল দিয়া জমীর মাটি উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া লইতে হয়। কলাই, সরিষা প্রভৃতি ফসলের পরও আক চাষ করিতে পারা যায়। বর্দ্ধমানের লাল মাটিতে আক উত্তমরূপ জন্মে। ইহাতে ফস্‌ফরিক এসিডের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে আকের জমীতে উপযুক্ত পরিমাণ ফস্‌ফরিক্ এসিড থাকা আবশ্যক। ফলতঃ এঁটেল এবং লাল এই উভয় প্রকার মাটিতেই আক উত্তমরূপ উৎপন্ন হয়।

এতদ্দেশে কৃষকেরা কার্ত্তিক মাসের প্রথম হইতেই আকের জমী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভ হইতে ক্ষেত্রে টিকলি বসান পর্য্যন্ত জমী যতবার সম্ভব কর্ষিত হয়। আক চাষের মাটি উত্তমরূপ গুঁড়া হওয়া আবশ্যক এবং ক্ষেত্রের মাটি অন্ততঃ ৯ ইঞ্চি গভীর করিয়া আলোড়িত করা উচিত। বঙ্গদেশে সচরাচর আকের ডগা হইতে টিক্‌লি কাটা হয়। আকের গোড়া হইতে টিক্‌লি কাটিলে গাছ তাদৃশ পরিপুষ্ট হয় না। এই টিক্‌লি তিন প্রকার উপায়ে ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়ঃ—(১) ৬-৮ ইঞ্চি পরিমিত টিক্‌লির পাতা ছাড়াইয়া আড় করিয়া ক্ষেত্রে পুঁতিয়া দিতে হয়। (২) টিক্‌লি গুলিকে, শীতল ছায়াযুক্ত স্থানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বসাইয়া পরে গজা বাহির হইলে, ঐগুলিকে তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। (৩) পুকুরের ধারে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে টিক্‌লি বসাইয়া সময় সময় যথেষ্ট পরিমাণে জল সেচন করিতে হয় এবং গজা বাহির হইলে ক্ষেত্রে পুঁতিয়া দিতে হয়।

আক পাতিবার সময় ক্ষেত্রে ১ হাত অথবা পাঁচ পোয়া অন্তর সমান্তরালে শীরেল দিতে হয়, এবং এই শীরেলে ১ হাত অন্তর গর্ত্ত করিতে হয় এবং উক্ত শীরেলের জমীও উত্তমরূপ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিতে হয়। ফলতঃ জমি এরূপভাবে কর্ষণ করিতে হয় যে তাহাতে সেঁচ দেওয়ার অসুবিধা না হয় এবং বৃষ্টির জলও অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারে। নতুবা গোড়ায় জল বসিলে আকের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রথায় প্রথমতঃ চারাগুলি অপর স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরে চারাগুলি তুলিয়া গর্ত্তে রোপণ করা হয়। আর যে ক্ষেত্রে একেবারেই আকের টিক্‌লি বসান হয় তাহাতে শীরেলে আধ হাত অন্তর টিক্‌লি বসাইয়া ২।৩ ইঞ্চি মাটি চাপা দিতে হয়। উক্ত টিক্‌লিগুলি বসাইবার সময় যাহাতে উহার চোকগুলি ধারের দিকে থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ডগা বসাইয়া কোদালি দ্বারা দুই ধারের মাটি টানিয়া ধরাইয়া দিতে হয় নতুবা ডগাগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া যাইতে পারে। আখ পাতিবার সময় যদি বৃষ্টি না হয় তবে ক্ষেত্রে উত্তমরূপ জল সেচন করা আবশ্যক।

টিকুলির গজা সাধারণতঃ ১৫।২০ দিনের মধ্যেই বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অনেকটা জমির রসের উপর নির্ভর করে। চারা বাহির হইলে জমি খুঁসিয়া দেওয়া এবং শীরেলের মাটি সাবধানে ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আখ বসাইবার পর যতদিন না বৃষ্টি হয় ততদিন মাসে অন্ততঃ দুইবার করিয়া জল সেচন করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক বার জল সেচন করিয়া জমি খুঁসিয়া এবং আগাছা মারিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে উক্ত ফসলের অনেক উপকার হইয়া থাকে।

শ্রাবণ মাসের মধ্য ভাগ হইতে আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত আখের জোড় বাঁধিবার উপযুক্ত সময়। এবং ঐ সময়েই আখের শুক্‌না পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। আখের জোড় না বাঁধিলে বাতাসে গাছ ভাঙ্গিয়া যায় এবং শৃগালেও নষ্ট করে।

আখের সার সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কিছুই বলা হয়নাই। আখের চাষে দুইবার সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যে সময় আখ পাতা হয় তখন সরিষার খৈল উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া শীরেলের মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয় পরে ভাদ্র মাসের প্রথমে বিঘা প্রতি ৫।৬ মণ খৈল আখ গাছের গোড়ায় দিয়া মাটি ধরাইয়া দিতে হয়। এই ফসলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সার আবশ্যক হয়।

বঙ্গদেশের চাষীরা সাধারণতঃ আখের জন্য গোবর সার এবং খৈল ব্যবহার করে। কিন্তু এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে আখের জন্য আখের ছোবড়া এবং আখের পাতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। ইহাদ্বারা ফসলের সমধিক উপকার হইয়া থাকে। মূলের সিটি আখের উত্তম সার। আখ মাড়িবার পর আখের ছোবড়াগুলি ফেলিয়া না দিয়া পরবর্ত্তী চাষের জন্য সার করিয়া রাখা সর্ব্বথা বিধেয়।

অগ্রহায়ণ পৌষমাসে প্রায় সমস্ত আখ পাকিয়া উঠে এবং তখনই আখ কাটিবার প্রকৃত সময়।

এ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে আখ কাটিয়া লইবার পর ঐ জমীতে মাটি, পলিমাটি চাপা দেয়। ক্ষেতে আখের যে মুড়া থাকে তাহা হইতে পুনরায় চারা বাহির হয়। এই চারা হইতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহা প্রথমবারের ফসল হইতে বেশী। এবং এই দ্বিতীয় ফসল তুলিয়া লইবার পর পূর্ব্বোক্ত প্রথায় আর একবার ফসল লওয়া হয় এবং তাহা পরিমাণে প্রায় প্রথমবারের ফসলের ন্যায় হয়। এইরূপে তিনবার চাষ করিবার পর ঐ জমীতে আর আখ না দিয়া আউশ ধান এবং মাসকলাই দেওয়া হয়। এবং এই দুইটী ফসল তুলিয়া লইয়া সেই জমীতে পুনরায় তিন বৎসর উক্ত আখ চাষ হইয়া থাকে।

আয় ব্যয়।

এক বিঘা জমীতে উৎপন্ন আখের দাম (গুড় এবং ডগা বিক্রয়)	১১০৲
এক বিঘা জমীতে আখ চাষ করা এবং গুড় প্রস্তত করিবার খরচ	৭৪৸৶০
লাভ	৩৫।৵০
২৪ পরগণায় উৎপন্ন আখের মূল্য (গুড় এবং ডগা)	৫৬৲
চাষের খরচ	২৫৲
লাভ	৩১৲
বীরভূম জেলার উৎপন্ন আখের গুড়ের মূল্য	৬৪৲
চাষের খরচ	৩৮।/০
লাভ	২৫৸৴০

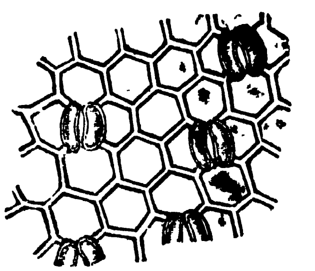
শ্রীহরিদাস মিত্র,
কাশিপুর, কৃষিশালা।

জন্তু ও উদ্ভিদ শরীরের ত্বক্।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ইত্যাদির হাত হইতে শরীর রক্ষার জন্য মনুষ্যের দেহ ত্বকে আবৃত, মেষের দেহ ত্বক্ ও লোমে ঢাকা, পক্ষীর দেহ ত্বক্ ও পালকে মোড়া। সেইরূপ উদ্ভিদের দেহও ত্বক ও ছালে ঢাকা। এই আবরণ না থাকিলে, জন্তু ও উদ্ভিদ্ উভয়ের প্রাণসংশয় হইত। আমাদের বাসগৃহ যে রূপ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, উদ্ভিদ্ ও জন্তুদেহ সেইরূপ ত্বক্‌রূপ আবরণে ঢাকা। গৃহ মধ্যে শীত উত্তাপ বৃষ্টি ও প্রবল বাতাসের গতিরোধের পক্ষে প্রাচীর যেরূপ, উদ্ভিদ্ ও জন্তুদেহ সম্বন্ধে ত্বক্ও সেইরূপ। অতএব জন্তু ও উদ্ভিদের ত্বক, উভয়ের কার্য্য একই প্রকার। জন্তু ও উদ্ভিদের ত্বকের গঠন-প্রণালীতেও একই প্রকার

নিয়ম দেখা যায়। জন্তুর ত্বকের যে অংশ বায়ুর সংস্পর্শে আইসে, সেই অংশ এক প্রকার দুর্ভেদ্য মসলা দ্বারা দৃঢ়ীভূত; এই দুর্ভেদ্য মসলার জন্য জলবায়ু ত্বক্‌রূপ প্রাচীর ভেদ করিতে পারে না। উদ্ভিদের ত্বকেও এইরূপ মসলা আছে, এবং সেই মসলার জন্য জলবায়ু সহজে উদ্ভিদ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

উদ্ভিদ্ ও জন্তুর ত্বকের সাদৃশ্য এইখানেই ফুরাইল না। আমাদের ঘরের প্রাচীরে যেরূপ দরজা জানালা থাকে, উদ্ভিদ্ ও জন্তুর ত্বকেও সেইরূপ ছিদ্রপথ আছে। গৃহের অভ্যন্তরের সমল বায়ু যেরূপ দরজা জানালা দিয়া বাহির হয়, সেইরূপ উদ্ভিদ্ ও জন্তুর দেহের অভ্যন্তরে যে সকল সমল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা উক্ত ছিদ্রপথ দিয়া নির্গত হয়। মনুষ্যের ত্বকে যে ছিদ্রপথ আছে, তাহা আমরা সহজেই দেখিতে পাই। কিন্তু উদ্ভিদের ত্বকের ছিদ্রপথ সেরূপ সহজে দেখা যায় না। উহা দেখিবার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক। অণুবীক্ষণ-সাহায্যে উদ্ভিদের ত্বক্ কিরূপ দেখায় পার্শ্বস্থ চিত্র দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।



এই চিত্রে ৩।৪টী ছিদ্রপথ দেখা যাইতেছে। উদ্ভিদ্ অভ্যন্তরের সমল বাষ্প ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হয় ও বাহিরের বিমল বাষ্প উক্ত পথে উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে।

ত্বকের এই মল-নির্গমন কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের জন্য, জন্তুদেহে যেরূপ বিশিষ্ট যন্ত্রের সন্নিবেশ আছে, উদ্ভিদ দেহে তাহার কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি উদ্ভিদের ত্বকের ছিদ্রপথ সকলও, উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুসারে কখন বহুবিস্তৃত, কখন অল্পবিস্তৃত, কখন বা একেবারে বন্ধ হইয়া, মল-নির্গমন-কার্য্যকে শাসনাধীনে রাখে। মনুষ্য যেমন আপন আবশ্যকমত ঘরের দরজা জানালা খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে, উদ্ভিদ্‌ও সেইরূপ আপন প্রয়োজন অনুসারে ত্বকের ছিদ্র-পথ খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে। ত্বকের ছিদ্রপথ দিয়াই উদ্ভিদ ও জন্তু-শরীরের ক্লেদ বহির্গত হয়, ত্বকের অন্যান্য অংশ এ কার্য্যে তত পটু নহে।

সৌসাদৃশ্যের আরও অনেক কথা আছে। মানুষের হাত ও পায়ের চেটোর ত্বক্ শরীরের অন্যান্য অংশের ত্বকের অপেক্ষা দৃঢ় ও পুরু। উদ্ভিদের ত্বক্‌ও সেই রূপ, বড় বড় গাছে, দৃঢ় ও পুরু হয়; এই পুরু ও দৃঢ় ত্বক্‌কেই গাছের ছাল কহে। আরও মানুষ ও অন্যান্য অনেক জন্তুর নখর, কেশ, লোম বা পালক আছে। এই সকল নখর কেশ প্রভৃতি পদার্থ ত্বকেরই রূপান্তর মাত্র, অর্থাৎ ত্বক্‌ই পরিবর্ত্তিত হইয়া আবশ্যক মত নখর কেশ প্রভৃতি পদার্থের উৎপাদন করে। অনেক উদ্ভিদ দেহেও এই রূপ কাঁটা ও কেশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহারাও উদ্ভিদ্ ত্বকের রূপান্তর মাত্র, অর্থাৎ উহারা ত্বকের পরিবর্ত্তনেও উৎপন্ন হয়।

মনুষ্য ও অন্যান্য অনেক জন্তুর ত্বকে তৈল নিঃসৃত হইবার ব্যবস্থা আছে। সেই তৈলে ত্বক্ মসৃণ ও শীতাতপসহিষ্ণু হয়। কোন কোন উদ্ভিদের ত্বকেও ঐরূপ তৈলাক্ত পদার্থ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হয়। দেশী বা চালকুমড়ার গায়ে যে এক পুরু সাদা খড়ির মত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এক প্রকার মোম বা তৈল। সেই মোমরূপ আবরণের জন্য, চালকুমড়া সহজে পচে না; চাল হইতে তুলিয়া ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিলেও ৩।৪ মাস কাল উহা না পচিয়া থাকে। ইহার সবিশেষ প্রমাণ এই যে, কুমড়ার গাত্র হইতে ঐ মোম তুলিয়া দিলে, কুমড়া অল্প দিন মধ্যে পচিয়া যায়। চালকুমড়া ব্যতীত আরও অনেক ফলে এই কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। পাতা প্রভৃতি উদ্ভিদের অন্যান্য অংশেও অনেক সময়ে এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অতএব উদ্ভিদ্ ও জন্তুর ত্বকের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী যে, একই প্রকার নিয়মের অধীন, তাহার আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। উদ্ভিদ্ ও জন্তুদেহের গঠন ও কার্য্য পরম্পরা, যতই তুলনায় আলোচনা করা যায়, ততই বুঝা যায় যে, জন্তু ও উদ্ভিদ্ গঠনের মূল পদার্থ একই; উদ্ভিদ্ ও জন্তুতে যত বাহ্য প্রভেদ দৃষ্ট হউক না কেন, মূলে উহারা একই পদার্থ; মূলে উহারা একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র বসু।

নবাবী আমলে ময়মনসিংহ জেলার বাজার দর।

[ময়মনসিংহের বিবরণ *, হইতে উদ্ধৃত]

সপ্তদশ শতাব্দীতে, সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে, এতৎ প্রদেশে চাউল টাকায় আট মণ বিক্রয় হইত। অন্যান্য দ্রব্যও এইরূপ সুলভ ছিল। ক্রমে বাজার দর বৃদ্ধি হইয়া যায়; এবং মুর্শিদকুলী খাঁর সময় টাকায় চারি মণ চাউল বিক্রয় হইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুনরায় এতদঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১১৪৬ বঙ্গাব্দের একখানা হস্তলিখিত গ্রন্থের জীর্ণ পৃষ্ঠায় ঐ সনের একখানা বাজার-ফর্দ্দ পাওয়া গিয়াছে। ঐ ফর্দ্দের এক পৃষ্ঠে "নারায়ণের পদ্মাপুরাণ" লিপিবদ্ধ হইয়াছে ও অপর পৃষ্ঠে কথিত বাজার ফর্দ্দ লিখিত রহিয়াছে। এই ফর্দ্দ হইতে সেই সময়ের বাজার-দর অবগত হওয়া যায়।

ফর্দ্দ এইরূপঃ—

/৭ শ্রীশ্রীদুর্গা
১১৪৬ সন।
তেরিখ শুক্কুরবার।

কাচা মরিচ, আদা, পিয়াজ, রশুন	৲১০ কৌড়ি
খেশারি ডাইল /১	১ দামড়ি *
লবন	১ দামড়ি
* * *	৶১০ কৌড়ি
মাছ	/০ কৌড়ি

* * যুগীর কাপড়ের দাম
এই হাটে দিবাহ— ৫ দাম

* * * *

সরফরাজ খাঁর শাসন সময়ে (১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে) ঢাকায় চাউলের মণ পুনরায় ৵০ আনা হইয়াছিল। উপর্য্যুক্ত ফর্দ্দও ঠিক সেই সময়ের; সুতরাং এই হিসাবে এতদ্ অঞ্চলেও চাউলের সের ১

* ময়মনসিংহের বিবরণ — "আরতি" সম্পাদক শ্রীকেদার নাথ মজুমদার প্রণীত। কলিকাতা সান্যাল এণ্ড কোং মূল্য ১৲ এক টাকা।

দামড়ি* ও মণ ৵৹ আনা ছিল। জিনিষের এইরূপ সুলভ মূল্য কত দিন ছিল অবগত হওয়া যায় না।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"। এই দুর্ভিক্ষে এ জেলার বহুলোক অন্নাভাবে স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ও শেষে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছিল। মনুষ্য বিক্রয়ে দলিল সম্পাদন করিতে হইত। ঐ সকল দলিল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এই সময়ে এক একটী মানুষ ২।৩ টাকায় বিক্রয় হইত। ভূমির মূল্য প্রতি কাণি ৷৷৹ আট আনা হইতে তিন চারি টাকা পর্য্যন্ত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এজেলায় অল্পাধিক পরিমাণে এই দুর্ভিক্ষ চলিয়াছিল। বহুলোক এই দুর্ভিক্ষের তাড়নায় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় অবস্থাপন্ন লোকে বহু দীঘি, পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয় প্রস্তুত করাইয়া বহুলোকের আহার যোগাইয়াছেন। দরিদ্রলোক পেটের জ্বালায় তখন কেবল আহার পাইয়াই মজুরী করিত। এই মন্বন্তর সময়ে কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত কাটাখালীর পরামাণিকদিগের একুশরত্ন ও বিশাল দীর্ঘিকার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং মধুপুরের বারতীর্থের সুবৃহৎ পুষ্করিণীটীর সংস্কার হইয়াছিল। কথিত আছে এরূপ দুর্ভিক্ষ এতদ্দেশে কখনও হয় নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে এই জেলার অবস্থা পুনরায় পরিবর্ত্তিত হয় এবং জেলায় সুভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময়ে হাটে বাজারে জিনিসের মূল্য কিরূপ ছিল তাহা তৎকালীন জেলা কালেক্টরের বার্ষিক বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করা গেল।†

জিনিস	পরিমাণ	মূল্য
ধান্য	১/	।৹ হইতে ।৵৹
চাউল	১/	৷৶৹ " ১৲
অরহর দাইল	১/	৷৶৹ " ১৲
সরিষার তৈল	১/	৪৲ " ৬৲
ঘৃত	১/	৮৲ " ১০৲
তামাক	১/	২৲ " ৪৲
লালীগুড়	১/	১৷৷৹ " ২৲
চিনি	১/	৩৲ " ৪৲
সুপারি	১/	৭৲ " ১০৲
কার্পাস	১/	৩৲ " ৪৲
আবির	১/	৫৲ " ৬৲
কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরের		
তঞ্জাব প্রতি থান		৪৲ " ১৫৲
সাধারণ পরিধেয় ধুতি	১ থান	৵৹ " ৷৷৹
হস্তী	১টা	৫০৲ " ১০০৲

এই সময় দেশে অর্থের অভাব ছিল। জিনিসের তেমন অভাব ছিল না। অর্থাভাবে এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যাইত। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে ফসল নষ্ট না হইলে, টাকার অভাব তখন কেহ অনুভব করিত না। যুগী বস্ত্র-বিনিময়ে কৃষক হইতে ধান চাউল গ্রহণ করিত। কৃষকও তাহার কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে তৈল, লবণ, মৎস্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিত। সরকারী রাজস্ব প্রদান ও তদনুরূপ গুরুতর কার্য্য ব্যতীত নগদ মুদ্রার প্রয়োজন প্রায় হইত না। ভৃত্যের বেতন প্রভৃতিও ক্ষেত্রের ধান্য দ্বারাই প্রদত্ত হইত।

তৎকালে বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বৃহৎ ব্যাপারও অতি সামান্য ব্যয়ে সম্পাদিত হইত। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে টেইলার সাহেব Topography of Dacca নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে তিনি দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানদিগের বিবাহ-ব্যয় এইরূপ লিখিয়াছেন:—

হিন্দুর বিবাহের ব্যয়।		মুসলমানের বিবাহের ব্যয়।	
ব্রাহ্মণ	১৲	কাজী	৷৷৹
বর-কন্যার কাপড়	২৲	বর-কন্যার কাপড়	৩৲
শাঁখা ও অন্যান্য	"	চিরুণী প্রভৃতি	।৹
অলঙ্কার	২৲	অলঙ্কার	৷৷৹
চিরুণী ও সিন্দুর	।৹	নাপিত	।৹
বাদ্যকর	।৹	ভোজন ব্যয়	২৲
বর-কন্যার মুকুট	১৲	বাদ্যকর ও অন্যান্য	৩৲
ধোপা	।৹	বর-কন্যার মুকুট	৷৶৹
নাপিত	।৹		
ভোজন ব্যয়	২৲		১০৲
বাজে খরচ	১৲		

* ৮ দামড়ি=১ দাম। ৪০ দাম=১৲ টাকা। সুতরাং তখনকার ১ দামড়ি বর্ত্তমান আধ পয়সার কিছু কম।

† Annual Report submitted by Mr. F. Le, Gross. (Collector) to the Board of Revenue dated 1-1-1796.

ধনী সম্প্রদায়ের ব্যাপারাদিতে কিরূপ ব্যয় হইত তাহা দেখাইবার জন্য এই মেলার কোন প্রাচীন জমিদার পরিবারের শত বৎসর পূর্ব্বের একটী ব্যাপারের ব্যয়-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সন ১২১১

হিসাব জিনিস খরিদ হাট সাহাগঞ্জ।

তেরিখ ২৮ জৈষ্ঠ।

আসামী—	জিনিস—	রোপৈয়া—	কৌড়ি
হরিদ্রা	/২ সের		।৶০
সিন্দুর	১ দফা		৶১০
চুর্ণ	/২॥০ সের		/১০
পান	২০ কুড়ি		১॥০
তামাক	/১ সের		/০
ডিঙ্গা কলা	১ ছড়ি		॥৶০
মরিচ	/২ সের		।৶০
আদা	/১ সের		৶০
মাষকলাই	/৫ সের		১।৵০
মসলা	১ দফা		৵১০
দাইল	/৭॥ সের		।৶১০
লবণ	/৭ সের		৪।৵০
চিনি	× ×		।/১০
আমলি	/২॥ সের		৶১৫
তার	৫টা		৵১০
ক্যাছলা	২ টা		৵০
পাতিল	৫ টা		/১৭॥
× ×	২ টা		/১০
তেজপাতা	১ দফা		/০
টিকিয়া	১ দফা		/০
বাঁশ	১ দফা		১৸০
পাট	১।০ সের		৶১৫
সন্ধুক লবণ	× ×		।৵০
ডিম	১ দফা		/০
ছিকর	১ দফা		ৎ২॥
লজ	॥ তোলা		।০
সাদা কাগজ	১॥ দিস্তা		।০
গুপারি	।০ সের		৫॥৵০
বংশ	৮ টা		৶০
			১৯৸৶০

আসামী—	জিনিস—	রোপৈয়া—	কৌড়ি
জের			১৯৸৶০
মটুকের রাঙ্গচা			
গং	১ দফা		৶০
× ×			।৵০
নাও কেরেয়া × ×			
আয়েনা মাল			॥০
কেবলা পাটুনি			।৶০
দুয়ারিয়া পাটুনি			৵০
			২১॥/০
সাবেক পাওনা ইত্যাদি			১॥৶৫
বাদ কৈফিয়ত ফেরত			॥৵০
			২৩৸৵৫

কাপড়

গুনি	১ জুর	৸০	
(অস্পষ্ট)	৩ খান	১৸৵০	
পাঁচ হাতি	১ খান	।০	
গামছা	১ খান	/৫	
গজি	১ খান	॥/১০	
একপাট্টা	১ খান	॥৶০	
পাগোড়ি পটকা	৪ গাছ	৸১০	
		৫ ৫	

এই সময় টাকায় সোওয়া তিন কাহণের অধিক কড়ি পাওয়া যাইত। ফর্দ্দের লিখিত ২৩৸৵৫ কড়ি ৭৲ টাকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপার ১২৲ টাকায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

চাউল, চিড়া, তৈল প্রভৃতির ব্যয় এই ফর্দ্দে নাই। এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিলেও বোধ হয় ২০৲ কুড়ি টাকার অধিক ব্যয় হইত না।

এই সময়ে দুর্গোৎসবাদি প্রধান প্রধান ক্রিয়া, কলাপেও এই প্রকার ব্যয় হইত। ১২২৮ সনে উক্ত জমিদার বাড়ীর দুর্গোৎসবে ১৯।/০ আনা খরচ হইয়াছিল। তখন কড়ি টাকায় ৫৵০ কাহণ পাওয়া যাইত। তৈল টাকায় /৫ সের ও গুড় টাকায় ।৫ সের পাওয়া যাইত। গাঁজা /। পোয়া ।০ আনা। এই পূজায় কীর্ত্তন ও নাচের জন্য ১৲ টাকা খরচ হইয়াছিল।

সেকালে শস্য হানি হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কিন্তু দুর্ভিক্ষে ধান চাউল বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় মহার্ঘ হইত না।

"বারকাহুট্টা আকাল
ক্ষেতে ক্ষেতে পাকাল

এই "আকালে" এ জেলায় ধান টাকায় বার কাঠা বা দেড় মণ বিক্রয় হইয়াছিল। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের এই ভীষণ "বারকাইট্টা আকালের" কথা ততোধিক বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধদিগের নিকট অবগত হওয়া যায়। এই "আকাল" সম্বন্ধীয় প্রচলিত প্রবাদটী দ্বারা অনুমান করা যায় যে টাকায় বার কাটা ধান পাইলেও লোকে উহা ভীষণ "আকাল" বলিয়া মনে করিত।

বার কাইট্টা দুর্ভিক্ষের পর ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ সনের দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৬ সনে ধানের মণ ১৸৴০ আনা ও চাউলের মণ ৪৴০ আনা হইয়াছিল। ১৮৭৪ সনের দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে ও দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল তাহা জেলা বিবরণী হইতে উদ্ধৃত হইল।*

জিনিস		১লা এপ্রিল ১৮৭৩	৩১শে মার্চ্চ ১৮ ৪
বুট	১/	২৸০	৩৲
অরহর দাইল	১/	৪৲	৪৲
মুগ দাউল	১/	৪৲	৪৲
মাষ দাইল	১/	২॥০	২॥০
খেসারী দাইল	১/	২।০	৩৵০
মশুরী দাইল	১/	৩৲	৩৸৵০
মটর দাইল	১/	২।০	৩॥৵০
সাধারণ চাউল	১/	১।০	৪৲—৪।৵০

এই বৎসর ৬৮'০৭ ইঞ্চি মাত্র বৃষ্টি হইয়াছিল। এই অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হয়। এই দুর্ভিক্ষ পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৭৮ সনে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের জলপ্লাবনে ও ১৮৭৯ সনের অতি বৃষ্টিতে দেশ শস্যশূন্য হইয়া যায় এবং ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময়ে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল †:—

মুগ দাইল	৫॥০—৮৸০
মাষ দাইল	৩॥০—৬৲
বুট দাইল	৪॥০—৫।০
অরহর দাইল	৪॥০—৬॥০
মশুরী দাইল	৪।০—৭।০
খেসারী দাউল	৩।০—৫৲
চিনী	২॥০ টাকায় ।৬ সের

* District Administration Report of 1872-73.

† Annual Administration Report 1879-80 by N. S. Alexander, Collector, Mymensingh.

এই দুর্ভিক্ষে টাঙ্গাইল অঞ্চলের বহু লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল। এই সময়ে টাঙ্গাইলে ধান একেবারেই পাওয়া গিয়াছিল না। লোক চিনা খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল। চিনাও টাকায় /৬॥ সের হইয়াছিল। সদর মহকুমায় প্রথমে চাউল /৫॥ সের করিয়া বিক্রয় হইয়াছিল। পরে সহরেও চাউল অভাব হইয়াছিল। সে সময় মোটা চাউল কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলে ও তথা হইতে নৌকাযোগে ময়মনসিংহে আসিত। এই সময়ে দিবা দ্বিপ্রহরে কালেক্টরী কাছারীর সম্মুখে ব্রহ্মপুত্র নদে একখানা চাউল বোঝাই নৌকা লুঠ হইয়া গিয়াছিল। সে দুর্ভিক্ষে অনেক লোক কচু এবং কলাগাছ খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

বিগত ১২৯৯ সনের দুর্ভিক্ষে নেত্রকোণা মহকুমায় সাধারণ চাউল টাকায় /৪ সের পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানেও ৭৲ হইতে ১০৲ পর্য্যন্ত মণ হইয়াছিল।

কবিরাজ

শ্রীবিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন

মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

৫নং কুমারটুলি—কলিকাতা

এই ঔষধালয়ে পুরাতন জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ছর্দ্দি (বমন), অপস্মার, মূর্চ্ছা, উন্মাদ বাতব্যাধি, বাতরক্ত, আমবাত, শূল, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, প্রমেহ, শোথ, উদর, অম্লপিত্ত, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, স্ত্রীলোকের বিবিধ রোগ ও বালরোগের আয়ুর্ব্বেদোক্ত নানাবিধ কাষ্ঠৌষধ, ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মোদক, দ্রাবক, ধাতুভস্ম, মকরধ্বজ ও মৃগনাভি প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মফস্বলের অধিবাসিগণ রোগের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানাইলে ভ্যালুপেবল ডাকে ঔষধ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

আমাদের ঔষধালয় ভারতবর্ষস্থ কৃতবিদ্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে—এমন কি আসিয়াখণ্ড উল্লঙ্ঘন করিয়া সাগর-পারস্থ সুদূর ইংলণ্ডবাসিগণের মধ্যেও কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ নিম্নে কয়েকখানি পত্রের মর্ম্মানুবাদ প্রকটিত করা হইল। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজের পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম না। কারণ সে সব পত্র (কন্‌ফিডেনসিয়েল) গোপনীয় বলিয়া গণ্য

৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পত্রের সংক্ষিপ্তানুবাদ,—

"আমার বন্ধু কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেনকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। তিনি উচ্চদরের সংস্কৃতাভিজ্ঞ এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন। আজকাল ইংরেজীমতে ডাক্তার হইয়া কবিরাজ-সম্প্রদায়কে কতকটা পশ্চাৎপদ করিয়াছে বলিতে হইবে, কিন্তু এদেশে যতদিন পণ্ডিত বিজয়রত্নের ন্যায় জ্ঞানবান, বহুদর্শী ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন কবিরাজ থাকিবেন, ততদিন হিন্দুচিকিৎসার গৌরব অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিতি করিবে।"

উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর

কে, জি, গুপ্ত স্কোয়ার।

"বিবিধ রোগের চিকিৎসায়, বিশেষতঃ যাপ্য রোগ সমূহের চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর উপযোগিতা ক্রমেই উপলব্ধি হইতেছে। এ সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেন মহাশয় যতদূর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং তিনি রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে যতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন, এরূপ উন্নতিশীল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক অতীব বিরল।"

কমলা

শ্রাবণ ১৩১১] [১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।

নানা প্রসঙ্গ।

লাহোরের সরকারী বাগিচায় নানা প্রকার য়ুরোপীয় ফলের গাছ রোপণের পরীক্ষা হইয়াছিল। এই পরীক্ষা সন্তোষ জনক হইয়াছে। এজন্য সম্প্রতি ইংলণ্ড ও ইতালী হইতে অনেক ফলের গাছ আমদানী করা হইয়াছে।

* * *

ব্রহ্মদেশের অনেক নদীতে স্বর্ণময় প্রস্তর খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি ভূতত্ত্ববিভাগ এই সকল প্রস্তরের পরীক্ষা করিতেছেন। আজ কাল কোন কোন য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী ব্রহ্মদেশের নদীগর্ভস্থ মৃত্তিকা হইতে স্বর্ণ উত্তোলনের চেষ্টা করিতেছেন। সেই জন্যই বোধ হয় গবর্মেণ্ট ইহার পরীক্ষা করিতেছেন।

* * *

যাঁহারা বাহাদুরী কাঠের কারবার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি যে, এবার ব্রহ্মদেশের জঙ্গল মহল পাইনমানা বিভাগে ছয় হাজার সেগুনের গুঁড়ি বিক্রয় করিবেন। ইহাঁর মধ্যে তিন হাজার গুঁড়ি ১৯০৫ সালে কাটিতে দেওয়া হইবে ও বাকী ১৯০৬ সালে কাটা হইবে।

* * *

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে বাঙ্গালার প্রায় ৫৯,১৭২ বিঘা জমীতে তুঁত আবাদ হইতেছে। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবাদ দেখা যায়। এক মেদিনীপুর জেলাতেই প্রায় ১৭,১০০ বিঘা জমীতে কেবল তুঁত আবাদ হইয়া থাকে। রেসমের কারবারের প্রধান আড়ং মুর্শিদাবাদে ৩৪০৭৭ বিঘায় তুঁত আবাদ হয়, তাহার পর বাঁকুড়াতে ২৩০৪ বিঘা আর বগুড়াতে ১৫০০ বিঘা।

* * *

তামাক বাঙ্গালার একটা প্রধান ফসল। গতবৎসরে প্রায় ১৬,১২,৫০০ বিঘা জমীতে তামাকের চাব হইয়াছিল। অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা ইহা কম। সাধারণতঃ প্রায় ১৭৪২,১০০ বিঘাতে এই আবাদ হইয়া থাকে। গত বৎসরে ২২২,২৫৫ টন তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল। মার্কিণ দেশে যে প্রণালীতে ইহার আবাদ হয় তাহা অবলম্বন করিতে পারিলে ব্যবসায়ের আরও উন্নতি হইতে পারে।

লাহোরের যাদুঘরে বাণিজ্য ও শিল্প দ্রব্য প্রদর্শন করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র উত্তর ভারতে কলিকাতা ও দ্বারবঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও এরূপ বাণিজ্য ও শিল্প সামগ্রী প্রদর্শনের ব্যবস্থা নাই। আমাদিগের বিবেচনায় প্রত্যেক জেলায় এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই সকল দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য এক একটি খটি স্থাপন করা উচিত। এতদ্দ্বারা ব্যবসায়ী ও কৃষক গণের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে।

* * *

ভারতের নানাস্থানের চীনামাটি লইয়া গবর্মেণ্টের ভূতত্ত্ববিভাগে পরীক্ষা করা হইতেছে। এই মাটি বিলাতের ইমপিরিয়াল ইনষ্টীটিউটে পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছে। কি উদ্দেশ্যে ইহার পরীক্ষা হইতেছে তাহা আমরা অবগত নহি। গবর্মেণ্ট যদি এদেশের লোককে চীনাবাসন প্রস্তুত করিবার জন্য সহায়তা করেন, তাহা হইলে অনেক লোকের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় হয়।

*

এদেশে বিলাতী ফলের আবাদ করিবার চেষ্টা হইতেছে। উত্তর-পশ্চিমে অনেক স্থানে এইরূপ ফলের বাগান দেখা যায়। সীমলা পর্ব্বতের সন্নিকটে মাহাসু নামক স্থানে মিউনিসিপালিটির একটি ফলের বাগান আছে। সেখানে আপেল, এপ্রিকট, চেরী, গ্রিনগেজ, পিয়ার, প্লম প্রভৃতি বিলাতী ফল বৃক্ষের চারা তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করা হয়। উত্তর পশ্চিমে যে সকল বিলাতী ফলের বাগান তৈয়ার হইয়াছে তাহাতে বেশ লাভ হইতেছে, আর আমাদের বাঙ্গালায় পৈতৃক আম বাগান গুলাও দিন দিন জঙ্গলে পরিণত হইতেছে।

* * *

সমগ্র ভারতবর্ষে দুইটি মাত্র দেশলাইয়ের কল আছে—একটি আহম্মদাবাদে ও আর একটি কোটাতে। তথাকার দেশলাই এ অঞ্চলে আসে না। সম্প্রতি Ranbir Match Manufacturing Co. নামে পঞ্জাবে আর একটি দেশলাইয়ের কল খুলিয়াছে। ইহার দেশলাই শীঘ্রই বিক্রয়ার্থ বাহির হইবে। এদেশে দেশলাইয়ের কারবারের যথেষ্ট স্থান আছে। বাঙ্গালায়

দুইটি কল উঠিয়া যাইবার প্রধান কারণ—আত্মকলহ। বাঙ্গালী যতদিন এই দোষ পরিহার করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহারা যৌথ কারবার পরিচালন করিতে সমর্থ হইবেন না। এবিষয়ে বোম্বাই, পঞ্জাব প্রভৃতি দেশীয় লোকের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

* * *

বিহার প্রদেশের নীলের তত্ত্বানুসন্ধান জন্য বিলাত হইতে দুই জন ওস্তাদ আসিয়াছেন। ইঁহাদিগের অনুসন্ধান কার্য্যের ব্যয়ভার বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট বহন করিবেন। বিহারের নীলের উন্নতির জন্য সাহারানপুরের বোটানিকাল গার্ডেনে বীজের পরীক্ষা হইয়াছিল। এই বাছাই করা বীজ বিহারী নীলকর দিগকে বিতরণ করা হইতেছে। ইহার ফলাফল গবর্মেণ্টকে বিদিত করিতে হইবে। দেশের অন্যান্য কৃষিদ্রব্যের উন্নতির জন্য গবর্মেণ্টের ঐরূপ মনোযোগ প্রার্থনীয়।

* * *

অনেকে বোধহয় অবগত নহেন যে কলিকাতা সহরে বড় বড় ব্যাংক সত্ত্বেও ভবানীপুরে বাঙ্গালীর পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র ব্যাংক আছে। ইহার নাম ভবানীপুর ব্যাংকিং কর্পোরেসন লিমিটেড। ইহা একটি যৌথ কারবার। ইহার মূলধন ৫১,৬৫০ টাকা। আজ আট বৎসর ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই আট বৎসরের মধ্যে ইহার কর্তৃপক্ষীয়েরা আট হাজার টাকার অধিক টাকা গচ্ছিত ভাণ্ডারে রাখিয়াছেন ও অংশীদার দিগকে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন। গত বৎসরে ইঁহারা অংশীদার দিগকে শতকরা ছয় টাকা হারে লাভ দিয়াছেন। এই ব্যাংকের হাতে সাধারণের লক্ষাধিক টাকা গচ্ছিত আছে। চেতলার শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য ইহার একজন ডাইরেক্টর। আমরা এইরূপ ছোট ব্যাংক স্থাপনের পক্ষপাতী।

* * *

এক্ষণে আসল অপেক্ষা নকলের দিকেই লোকের নজর। আসল নীল ছাড়িয়া যেমন নকল নীল লইয়া কারবার চলিতেছে, সেইরূপ আসল রেসমের পরিবর্ত্তে নকল রেসম তৈয়ার করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমেরিকার কানাডা রাজ্যে এতদুদ্দেশ্যে একটি কোম্পানি সংগঠিত হইয়াছে। বৃক্ষ বিশেষের আঁশ হইতে এই সকল রেসম বাহির করা হইতেছে। এই রেসমে নানা প্রকারের ফিতা ও বেড প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল সামগ্রী দেখিয়া হঠাৎ কেহই নকল মনে করিতে পারে না। একখানি শিল্পবিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ যে, আজ কাল স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদে এই নকল রেসমের ফিতা অধিক ব্যবহৃত হইতেছে, কেন না আসল অপেক্ষা ইহার চটক অধিক। আসল নীলের মত রেসমের ব্যবসায়ও নষ্ট হইবে না কি?

* * *

মান্দ্রাজ প্রদেশে কাবেরী নদী হইতে দমকলে জল তুলিয়া শস্যক্ষেত্রে সেচন করা হইতেছে। বাঙ্গালায় কি এই প্রথা অবলম্বিত হইতে পারে না? অনেক সময়ে দেখা যায় যে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়াতে সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী নদী হইতে দমকল দ্বারা জল সেচন করিতে পারিলে সেই শস্য অনায়াসে রক্ষা হয়। আমাদের বোধ হয় প্রত্যেক জেলায় যদি দুই চারিটি করিয়া দমকল রাখা হয় এবং যেখানে যখন আবশ্যক তথায় উহা পাঠান হয় তাহা হইলে কৃষকেরা জলাভাব হইতে অনেকটা রক্ষা পাইতে পারে। এজন্য যে ব্যয় হইবার সম্ভাবনা তাহা কৃষকেরা প্রদান করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবে না। কেবল কৃষিকার্য্যের জন্য কেন অনেক স্থানে এতদ্দ্বারা পানীয় জলও সরবরাহ করা যাইতে পারে। জলকষ্টের সময়ে এইরূপে দূরবর্ত্তী নদী হইতে গ্রামস্থ পুষ্করিণী সকল পূরণ করিতে যে ব্যয় হইবে গ্রামবাসীরা তাহা আহ্লাদের সহিত প্রদান করিবে। আমাদিগের বোধ হয় পল্লীগ্রামে এইরূপে জল যোগাইবার জন্য একটি ব্যবসায় করিলে বেশ চলিতে পারে।

* * *

বোম্বাইয়ের ধারবার জেলায় অনেকগুলি খনি বাহির হইয়াছে। সোণা তুলিবার জন্য দুইটী কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহা বিলাতী ধনীগণের দ্বারা পরিচালিত হইবে। কলিকাতার এক ঘর সওদাগর ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য ধাতু তুলিবার জন্য তথায় জমী পাট্টা লইয়াছেন। ইঁহারাও য়ুরোপীয়। এই সকল য়ুরোপীয় কোম্পানিতে অংশ লইতে পারিলেও মন্দের ভাল। কোন কোন য়ুরোপীয় বলেন খনির কার্য্যে বাঙ্গালীদিগকে অংশীদার লইতে সাহস হয় না। ইঁহারা অংশ লইবার অল্প কাল পরেই লভ্যাংশ পাইবার জন্য ব্যস্ত হন, ইহাতে কার্য্যে বড়ই ব্যাঘাত ঘটে। বাঙ্গালীদিগের এই নিন্দা কতদূর সত্য জানি না। তবে খনির কার্য্যে যে বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন প্রয়োজন তাহা স্বর্গীয় টাটার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলের বুঝা আবশ্যক। মধ্য ভারতের লোহার খনির পরীক্ষা কার্য্যে টাটা কত সময় ও অর্থ যে ব্যয় করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এইরূপ ধীরতা ব্যতীত বাণিজ্যে সফলতা লাভের সম্ভাবনা নাই।

* * *

কয়েক বৎসর হইল বাঙ্গালায় পশু চিকিৎসা বিদ্যালয় হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও এই বিদ্যালয় সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করে নাই। এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী উপলক্ষ করিয়া ছোটলাট সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে সরকারী পশুচিকিৎসাবিভাগে যে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন এই বিদ্যালয় হইতে সে অভাব পূরণ হয় না। এই জন্য তিনি আদেশ করিয়াছেন যে পর্য্যন্ত এখান হইতে প্রয়োজনানুরূপ পশু চিকিৎসক পাওয়া না যাইবে ততদিন বোম্বাই ও লাহোরের কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে নিযুক্ত করা হইবে।

* * *

বেলগেছিয়ার পশুচিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা যে অধিক হয় না, তাহার একটি কারণ এই যে সরকারী পশু চিকিৎসা বিভাগে এদেশীয়গণের উচ্চপদ লাভের আশা নাই। গবর্মেণ্ট যদি ইহাদিগের বেতনের একটু সুব্যবস্থা করেন তাহা হইলে উপযুক্ত ছাত্রের অভাব হয় না। আমরা এই বিদ্যালয়ের উন্নতির বিশেষ পক্ষপাতী। আজ কাল আমাদিগের দেশে

মনুষ্যের ন্যায় পশুদিগের মধ্যেও মহামারীর যথেষ্ট প্রাবল্য। দেশীয় গোবৈদ্যেরা যথা পশ্চিমে (Rinderpest) প্রভৃতি রোগের প্রতিকার করিতে অসমর্থ। পাশ্চাত্য প্রণালীর চিকিৎসার দ্বারা ইহার উপশম হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে এই কলেজোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের নিকট হইতে কৃষকেরা বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছে এরূপ সমাচার আমরা শুনিয়াছি। গো মহিষাদির স্বাস্থ্যের উপর কৃষিকার্য্যের উন্নতি যে বিশেষ নির্ভর করে তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। অতএব পশুদিগের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসকের যে বিশেষ আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য আমাদিগের ইচ্ছা যে আমাদিগের দেশের যে সকল যুবকের অন্য উচ্চতর ব্যবসায় অবলম্বনের উপায় নাই, তাঁহারা পশু চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। এ ব্যবসায়ে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নহে।

* * *

ব্রহ্মদেশের ভূগর্ভে অনেক রত্ন নিহিত আছে। তথাকার মণি খনির কথা অনেকেই অবগত আছেন। এই সকল মণি উদ্ধারের জন্য অনেক য়ুরোপীয় ধনী অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন। সম্প্রতি সান প্রদেশে কতকগুলি স্বর্ণ রৌপ্য সীস প্রভৃতি ধাতুর খনি বাহির হইয়াছে। এই সকল ধাতু উদ্ধারের অধিকার পাইবার জন্য সম্প্রতি বিলাতের কতিপয় ধনী গবর্মেণ্টকে আবেদন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের আবেদন যে গবর্মেণ্ট মঞ্জুর করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মাণ্ডই অঞ্চলের টীনের খনি এত দিন চীন বণিকদিগেরই একচেটীয়া ছিল, য়ুরোপীয় ধনীদিগের সে দিকেও দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা আর কতদিন নিশ্চিন্ত থাকিব? দেখিতে দেখিতে অনেক গুলি ভারতবাসীত খনিতত্ব শিক্ষা করিয়া আসিলেন, তাঁহাদিগের সেই বিদ্যার ফল লাভের জন্য কি কেহ উদ্যোগ করিবেন না?

* * *

পাটের আবাদ বাঙ্গালার এক প্রকার একচেটীয়া। কিন্তু বোধ হয় আর অধিক দিন তাহা টিকিবে না। ব্রহ্মদেশের মা-উবিন জেলায় এই আবাদের পরীক্ষা হইয়াছিল; তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে বাঙ্গালার ন্যায় সেখানেও পাটের আবাদ চলিতে পারে। সম্প্রতি সেখানকার পাট কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল, এখানকার মহাজনেরা তাহা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে সেখানকার লোক এই আবাদে মনোযোগী হয়, সেজন্য যে বিলাতী চটওয়ালারা চেষ্টা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে বাঙ্গালার একটি বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। পাটের আবাদে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা যদি ব্রহ্মদেশে জমী লইয়া ইহার চাষ করিতে পারেন তাহা হইলে বেশ লাভবান হইতে পারেন।

* * *

এদেশের গোজাতির উন্নতির জন্য গবর্মেণ্ট বৃষপালনের ব্যবস্থা করিতেছেন। পুষা ও শ্রীপুরে যে সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে, আপাততঃ তথা হইতে বৃষ বাছাই করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলবায়ু সহ্য করিবার উপযুক্ত করা হইবে ও পরে বিহার ও ভাগলপুরের গরুর উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে ব্যবহার করা হইবে। সেইরূপ মধ্য ও উত্তর বঙ্গের জন্য বেলগেছিয়া ও রামপুর বোয়ালিয়াতে বাথান স্থাপন করা হইবে। এইজন্য বেলগেছিয়া কলেজের অধ্যক্ষ মেজর গ্রেমণ্ডকে উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ ক্রয় করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

* * *

যাহাতে বাঙ্গালার প্রত্যেক বিভাগে একটি করিয়া আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপিত হয়, গবর্মেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন হইতে প্রতি বৎসরে এক এক বিভাগে একটি করিয়া এইরূপ আদর্শক্ষেত্র সংস্থাপন করা হইবে। এক্ষণে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মধ্যে গবর্মেণ্টের তিনটি মাত্র আদর্শ ক্ষেত্র আছে। একটি শিবপুরে, একটি চট্টগ্রামে ও আর একটি কটকে। এতদ্ব্যতীত হাতুয়া, টিকারী, ডুমরাও ও বর্দ্ধমানে যে চারিটি ক্ষেত্র আছে তাহার ব্যয় তথাকার রাজসংসার হইতে নির্ব্বাহিত হয়। আমাদিগের দেশের অন্যান্য সমর্থ জমীদারেরা যদি নিজ জমীদারীতে এইরূপ ক্ষেত্র স্থাপন করেন তাহা হইলে যেমন দেশেরও উপকার হয়, তেমনই ভবিষ্যতে তাঁহাদিগেরও লাভের উপায় হয়।

* * *

বরিশালের শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের তত্বাবধানে তথাকার জেলে কলা গাছের আঁশ হইতে কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। যদুবাবু আমাদিগকে এই কাপড়ের এক টুকরা নমুনা পাঠাইয়াছেন। এই কাপড়ের টানার সূতা কাপাসের এবং পড়েন কলা গাছের আঁশের। ইহা রেসমী কাপড়ের মত চিক্কণ এবং বেশ টেকসই। কমলায় যেরূপ বিবৃত হইয়াছিল বরিশাল জেলে সেই প্রণালীতেই এই বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং গাছের আঁশও সেইরূপে বাহির করা হইতেছে। যদু বাবু বলেন যে নূতন গাছ অপেক্ষা পুরাতন গাছ হইতে ভাল আঁশ বাহির হয়। এই আঁশ রৌদ্রে শুকাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা এই কাপড় দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আমাদিগের কার্য্যালয়ে আসিলে দেখিতে পাইবেন।

* * *

আজ কাল এদেশে সিগারেটের যেরূপ চলন হইয়াছে তাহাতে দেশে ইহা প্রস্তুত হইলে কতকটা অর্থক্ষতি নিবারিত হয়। সম্প্রতি দুইটি সিগারেটের কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার একটি বোম্বাই নগরে, অপরটি লাহোরে। কিন্তু ইহার জন্য তামাক তুরস্ক হইতে আমদানী হয়। এদেশে কি ঐরূপ তামাক তৈয়ার করা যায় না? আমরা জানি কলিকাতার প্রসিদ্ধ সওদাগর বেগ ডনলপ কোম্পানি পুষাতে তামাকের চাষ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ক্ষেত্রে সিগারেটের তামাক হইত। তাঁহারা এই তামাক তৈয়ার করিবার জন্য মার্কিণ হইতে একজন ওস্তাদ আনাইয়াছিলেন। পুষার যে সকল লোক ঐ ক্ষেত্রে কাজ করিত তাহারা ঐ তামাক প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। ঐ সকল লোক লইয়া কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যদি তামাক তৈয়ার করিতে শিখেন ত সিগারেটের কারবারের সুবিধা হইতে পারে। এ বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। আমরা শুনিয়াছি কলিকাতায় একটি সিগারেটের কারখানা স্থাপন করিবার জন্য একজন ধনী উদ্যোগ করিতেছেন এবং আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি আমদানী করিয়াছেন।

গোল আলু আয়র্লণ্ডের প্রধান ফসল। তথা হইতেই উহা এদেশে আনা হয়। এই গোল আলুর ফসলের সর্ব্বত্রই অধোগতি হইয়াছে। এদেশেও যেমন উহাতে রোগ ধরিয়াছে, উহার আদি জন্মস্থান আয়র্লণ্ডের আলুতেও সেইরূপ রোগ প্রবেশ করিয়াছে। একখানি ফরাসী কৃষি বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ যে দক্ষিণ আমেরিকার উরুগোয়ে প্রদেশের ম্যাসিডিস নদীর তীরে এক প্রকার আলু উৎপন্ন হইয়াছে, উহা বর্ত্তমান গোল-আলু অপেক্ষা সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট। অনেকের বিশ্বাস যে কালে এই আলু প্রধান্য লাভ করিবে। ইহার ফলন যথেষ্ট হইয়া থাকে এবং কোনরূপ রোগাক্রান্ত হইবারও সম্ভাবনা নাই। সাধারণতঃ যে প্রণালীতে আলুর চাষ করা হয় ইহার আবাদ ও সেই প্রথায় করা হয়। আজ প্রায় তিন বৎসর কাল ফ্রান্সে ইহার চাষ হইতেছে। এদেশের আলুতে যেরূপ রোগ ধরিয়াছে তাহাতে এই নুতন আলুর বীজ আনাইয়া পরীক্ষা করা উচিত।

* * *

মহীশূরের স্বর্ণখনি কিরূপ লাভজনক হইতেছে তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে:—গত বৎসরে Mysore Gold Mining Co. প্রত্যেক একশত টাকার অংশীদারকে ১৩৫ টাকা করিয়া লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন। ১৮৮৪ সাল হইতে এই কোম্পানি ৬,৭১৬,৪২৫ পাউণ্ড মূল্যের সোণা তুলিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে ৩,৫৬৫,৫৪২ পাউণ্ড লাভ অংশীদারদিগকে দিয়াছেন। গত বৎসরে ১৯২৮৯৭ আউন্স সোণা উঠিয়াছিল তাহার মূল্য ৭১৪২৪৭ পাউণ্ড। এই সোণা উঠাইবার জন্য সর্ব্ব সমেত ৩০৬,৭৬৪ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। এতাদৃশ লাভ হইয়াছে যে কোম্পানি এদেশ ও বিলাতস্থ কর্ম্মচারীদিগকে পাঁচহাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিয়াছেন। মহীশূর রাজ সোণা তুলিবার জন্য কোম্পানিকে ৩০ বৎসরের পাট্টা দিয়াছিলেন। খনি হইতে যত মূল্যের সোণা উঠিবে তাহার জন্য শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে রাজাকে সেলামী দিতে হয়। ছয় বৎসর পরে এই কোম্পানির মেয়াদ ফুরাইবে। কিন্তু খনিতে এখনও স্বর্ণের অক্ষয় ভাণ্ডার রহিয়াছে, এজন্য কোম্পানি সেলামীর হার শতকরা আরও আড়াই টাকা বাড়াইতে সম্মত হইয়াছেন। মধ্য ভারত ও বাঙ্গালায় অনেক খনি আছে। আমাদের দেশবাসীগণ কবে এই ব্যবসায়ে মনোযোগী হইবেন? সম্প্রতি একজন বাঙ্গালী খনিজ্ঞ মধ্য ভারতে খনি পরীক্ষায় যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষার ফল আমরা যথা সময়ে প্রকাশ করিব।

* * *

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী স্মরণার্থ বিলাতে ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট নামে একটি গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই গৃহে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল দেশের সকল দ্রব্য সংরক্ষিত হয়। দেশের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্যই এই ব্যবস্থা। বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর এক এক বিভাগের ভার আছে। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী রীতিমত পরীক্ষা করেন ও কিরূপে তাহার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। সম্প্রতি ভারতীয় পণ্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক এদেশীয় বিবিধ জাতীয় তামাকের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। অল্প আয়াসে যে ইহার উন্নতি হইতে পারে পরীক্ষায় তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালায় ও ব্রহ্মদেশে প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়। অতএব যাঁহারা ইহার ব্যবসায়ে নিযুক্ত তাঁহারা ইম্পিরিয়াল ইনিষ্টিটিউটের ভারতীয় পণ্যবিভাগের তত্ত্বাবধায়কের নিকট ইহার উন্নতি বিষয়ে পরামর্শ পাইতে পারেন। বাবলা ও তজ্জাতীয় বৃক্ষের আঁঠা সচরাচর Gum Arabic নামে অভিহিত হয়, তাহারও পরীক্ষা হইয়াছিল ও তৎসম্বন্ধে ব্যাপারীদিগের মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সকলেই এখানকার Gum Arabic পছন্দ করিয়াছেন ও যাহাতে উহা নিয়মিতরূপে বিলাতের বাজারে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। চামড়া তৈয়ার করিবার মসলারও পরীক্ষা হইয়াছিল। এই সকল মসলা চোলাই করিয়া তাহার সারাংশ বাহির করিবার উদ্যোগ হইতেছে। শুনিতে পাই ভারতের জঙ্গল হইতে হরীতকী মাজুফল ব্যতীত আরও যে সকল কষায় ফসল আছে তাহা চালানের যাহাতে সুবিধা হয় সে জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে অনুরোধ করা হইবে। বিদেশীয়দিগের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়াও কি আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব?

* * *

বৃটিশ ধনপতিদিগকে ভারতের শিল্প বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করিবার জন্য ফ্রাঙ্ক বার্ড উড সাহেব বিলাতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন আমরা তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি। বার্ড উড সাহেব ভারতের শিল্প বাণিজ্যের ছবি কিরূপ উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন পাঠকগণ উহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। এই চিত্রের বিপরীতে ভারত গবর্মেণ্টের বাণিজ্য বিষয়ক হিসাব রক্ষক ওকনার সাহেব আর একটি চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। ওকনার সাহেব বিলাতের সোসাইটী অফ আর্টস্ সভার ভারতীয় বিভাগে একটি বক্তৃতা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় তথাকার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে অর্থ নিয়োগ করা ভস্মে ঘৃতাহুতি। তিনি বলেন যে ভারতবাসী যেভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা নিতান্ত সাদামাটা রকমের। তাহাদের কিছুমাত্র বিলাসিতা নাই। এমন কি যাহারা ধনী, তাহাদিগেরও অভাব অতি অল্প সামগ্রীতে পূরণ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশের ধনীদিগের ন্যায় তাহারা গৃহ সজ্জিত করে না, তাহাদিগের পরিচ্ছদাদি সেরূপ মূল্যবান নহে, তাহারা যারপর নাই মিতাচারী, এরূপ অবস্থায় শিল্প সামগ্রী কাটতি হইবেক কিরূপে? পাশ্চাত্য দেশের শ্রমজীবিরা বিলাসিতায় যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে, ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধনীরাও সেরূপ ব্যয় করে না, তাহার উপর নিম্ন শ্রেণীর লোক দারিদ্র্য পীড়িত। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া ওকনার সাহেব বলেন যে ভারতের শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থ নিয়োগে কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

* * *

ওকনার সাহেব তাঁহার উক্তি সমর্থন করিবার জন্য কাচ

প্রস্তুত করিবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সরকারী কর্ম্মচারীরা বিশেষ তদন্ত করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতে উৎকৃষ্ট কাচ প্রস্তুত করিবার উপকরণ যথেষ্ট আছে এবং সে জন্য অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, তথায় কাচের কারখানা স্থাপন করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। কিন্তু তিনি সে মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন ভারতে কাচ প্রস্তুত করিলে তাহা ব্যবহার করিবে কে? সত্য বটে ভারতে পাঁচ কোটীরও অধিক ইমারত আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কয়টা বাড়ীর জানালাতে সার্সী দেখিতে পাওয়া যায়? তথায় হাজার করা একটা বাড়ীর জানালাতে কাচ আছে কি না সন্দেহ। তাহার পর ভারতবাসী জলপান করিবার জন্য কাচপাত্র ব্যবহার করে না, এবং কাচের বাসনাদিরও তাহাদিগের প্রয়োজন হয় না। এরূপ অবস্থায় যদি ভারতে কাচের কারখানা স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে সেই কারখানার উৎপন্ন সামগ্রী কাটাইবার জন্য অন্য দেশে এবং খুব সম্ভবতঃ য়ুরোপে চালান দিতে হইবে। কিন্তু ভারতের কাচের কারখানা-ওয়ালারা যে য়ুরোপীয় কারিকরদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। এরূপ অবস্থায় ভারতে কারখানা স্থাপনে ফল কি? কাচের কারখানা সম্বন্ধে যেমন, অন্যান্য সামগ্রী সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যায়। এইরূপে ওকনার সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভারতে শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য কল কারখানা স্থাপন করা অর্থের অপব্যবহার করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

* * *

ওকনার সাহেবের কথা যে অনেক পরিমাণে সত্য আমরা তাহা অস্বীকার করি না। বাস্তবিক ভারত যেরূপ দরিদ্র দেশ এবং ভারতবাসীর অভাব যেরূপ অল্প তাহাতে য়ুরোপের ন্যায় এদেশে সৌখীন সামগ্রীর কাটতি হইবার সম্ভাবনা যে অতি অল্প তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল ত অনায়াসে ভারতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে? ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিবার যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে তাহা পরমিটের আমদানী মালের তালিকা দেখিলেই বুঝা যায়। অবশ্য সে জন্য বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের আমরা পক্ষপাতী নহি। বার্ডউড সাহেব যেমন বৃটীশ ধনপতিদিগের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এদেশের শিল্প বানিজ্যের উজ্জল দিকটা দেখাইয়াছেন, ওকনার সাহেব বোধ হয় সেইরূপ বিলাতী কারিকর দিগের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া যাহাতে এদেশে শিল্পাদির উন্নতি না হয় তাহারই পরামর্শ দিয়াছেন। বিলাতী মহাজনেরা ওকনার সাহেবের পরামর্শে কর্ণপাত করিলে আমরা দুঃখিত হইব না। কিন্তু তাঁহার কথায় পাছে এদেশীয় লোক স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতিতে ভগ্নোৎসাহ হন, সেই জন্যই আমরা ওকনার সাহেবের উক্তির অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিলাম। বিলাতী শিল্পীরা যখন ভারতে মাল বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেছেন, তখন সেই সকল সামগ্রী এদেশে তৈয়ার করিতে পারিলে কেন না লাভ হইবে?

* * *

বাঙ্গালার কৃষি।

বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের কৃষি বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টের উপর ছোটলাট সাহেব সে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি উদ্ধৃত করা গেল।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান।

পাটের অবনতি বিষয়ে অনুসন্ধান লইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। অনেক পাটের ব্যাপারী ওজন বাড়াইবার জন্য যে পাটে জল দিয়া ভিজায় বলিয়া প্রকাশ তাহারও সবিশেষ তদন্ত করা হইয়াছিল। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে কৃষি বিভাগ বিশেষ বিশেষ জ্ঞ লোকের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৃষি কার্য্যের ইনস্পেক্টর জেনারেল, রয়াল বোটানিকেল গার্ডেনের সুপারিণ্টেডেণ্ট, দেশজ পণ্যের রিপোর্টার (Reporter on Economic Products) এবং কৃষি রাসায়নিক (Agricultural Chemist) প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্দ্ধমান আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে এবং ফরিদপুর ও জলপাইগুড়িতে পাটের অনেক প্রকার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন জাতীয় পাটের আবাদ বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য কৃতকর্ম্মা লোকদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তুলার আবাদ বিষয়ে বিগত বৎসরে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হইয়াছিল। স্থানীয় অবস্থানুসারে কোন্ কোন্ জাতীয় তুলা আবাদ করা শ্রেয়ঃ তাহা স্থির করিবার জন্য ও আবাদের প্রণালী নির্দ্ধারণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বীজের পরীক্ষা হইয়াছিল। এতদুদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক কৃষকদিগকে বীজ বিতরণ করা হইয়াছিল এবং স্থানীয় আবাদের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল বীজ বিতরণের ফল বড় একটা আশা জনক হয় নাই। কৃষিকার্য্যের ইনস্পেক্টর জেনারেল সাহেব বলেন যে, বিহার অঞ্চলে উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস আবাদের যথেষ্ট স্থান আছে। এই অভিপ্রায়ে পুষার কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় কার্পাসের আবাদ করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। তথায় আবাদের প্রণালী বিষয়ে ও জাতের উন্নতি করিবারও চেষ্টা করা হইতেছে।

আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র।

উড়িষ্যার কৃষকদিগকে উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য শিখাইবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্ট তথায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় সকল সময়েই জলের বিশেষ সুবিধা; এই প্রকার জলের সুবিধায় কেমন ভালরূপে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করা যায় তাহা তথাকার অধিবাসীদিগকে শিখাইবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্ট এই প্রস্তাব করেন। তদনুসারে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট গত বৎসরে কটকে একটি আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন। কৃষিক্ষেত্রে জল সেচন করিবার একটী নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে, এই ব্যবস্থানুসারে উড়িষ্যার এই নূতন ক্ষেত্রে এবং বর্দ্ধমান ও ডুমরাঁওয়ের ক্ষেত্রে জল সেচন করা হইবে। গত বৎসরে শিবপুরের আদর্শক্ষেত্রে এক প্রকার আউস ধানের পরীক্ষা হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সেই আউস শুখাতেও বেশ জন্মিয়া থাকে ও তাঁহার যথেষ্ট ফলন হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল বায়ু ও মাটিতে ইহার পরীক্ষার কিরূপ ফল পাওয়া যায় তাহা অবগত হইবার জন্য ছোট লাটসাহেব বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

এদেশের অনেক স্থানেই এক্ষণে কৃষি কার্য্যের উন্নতি বিষয়ে লোকে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছে দেখিয়া ছোটলাট সাহেব আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। উড়িষ্যার কৃষি কার্য্যের উন্নতির জন্য তথায় একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতি গবর্মেণ্টের সহিত সংস্রবশূন্য। ইহাঁরা স্বকীয় চেষ্টায় এই কার্য্য সংসাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। রাজসাহীতে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপন করিবার জন্য তথাকার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ভূমি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই ভূমির জন্য তাঁহারা কোন খাজনা লইবেন না। ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী গবর্মেণ্টের কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধানে একটি আদর্শ ক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যয় তিনি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন জেলায় আরও অনেক ভদ্রলোক উন্নত প্রণালীর কৃষি কার্য্য প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। এ সকল বাস্তবিকই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেখানে খাস মহল বা ওয়ার্ড ষ্টেটের প্রজারা বা অন্য ভদ্রলোকেরা স্বয়ং এই সকল পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছেন সেখানে ফল একেবারে সন্তোষজনক হয় নাই। কিন্তু যেখানে জেলার মাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোন ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে তথাকার ফল সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক হইয়াছে। এই কারণে গবর্মেণ্ট চারিজন ওভারসিয়ার নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাঁরা নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া পরীক্ষা কার্য্য সকল পরিদর্শন করিবেন। এই ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণরূপে সমীচীন তৎপক্ষে সংশয় নাই। জেলার রাজকর্ম্মচারীদিগের হস্তে যেরূপ নানা কার্য্যের ভার তাহাতে কৃষি কার্যের নানা প্রকার পরীক্ষায় মনোযোগ প্রদান করিতে তাঁহারা অল্পই অবসর পাইয়া থাকেন। নূতন ওভারসিয়ারগণ কেবল মাত্র কৃষিকার্য্য পরিদর্শন করিবেন সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা কৃষকদিগের মধ্যে কৃষিজ্ঞান বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইবে। এতাবৎকাল কৃষি বিভাগ যে সকল পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন সাধারণ কৃষকগণ যে তাহার কিছু মাত্র ফলভোগী হয় নাই, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছোট লাট সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন যে, বৎসরে বৎসরে নানা প্রকার পরীক্ষা কার্য্যের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু কোন কৃষকই তাহার সমাচার পায় নাই। বাস্তবিক যখন দেখা যায় যে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সমূহের নিকটস্থ প্রজারাও কোনরূপ উন্নত প্রণালী অবলম্বন করে নাই, তখন একাল পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য হইয়াছে তাহা যে ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছে তাহা কে না বলিবে। দেশে অনেক জমীদার ও ব্যবসায়ী লোক আছেন যাঁহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিশেষ উৎসুক, কিন্তু তাঁহাদিগের সহায়তা লাভ করিবার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বিত হয় নাই। এই জন্য ছোটলাট সাহেব বিবেচনা করেন যে এমন একটি মণ্ডলীর আবশ্যক যাঁহাদিগের দ্বারা দেশের সর্ব্বত্র কৃষিজ্ঞান প্রচারিত হইতে পারে। যাহাতে কৃষিকার্য্যে লোকের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, সে সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা হয় ও প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষির উন্নতি সাধিত হয়,

এই মণ্ডলী সে জন্য চেষ্টা করিবেন। তিনি বলেন যে এইরূপ মণ্ডলীর দ্বারা মধ্য প্রদেশে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে এবং তাঁহার বিশ্বাস যে বঙ্গদেশে সেইরূপ মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করিলে যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতে পারে। কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা করা ও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে কৃষি-জ্ঞান প্রচার করাই এই মণ্ডলীর এক মাত্র কার্য্য হইবে। তদ্ব্যতীত কৃষির উন্নতি বিষয়ে ও পতিত জমী সকলের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে তাঁহারা গবমেণ্টকে পরামর্শ দিতে পারিবেন। ছোটলাট বাহাদুরের ইচ্ছা যে এইরূপ একটি মণ্ডলী স্থাপনের দ্বারা যদি উপকার লাভ করা যায়, তাহা হইলে জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, এমনকি গ্রামে গ্রামে পর্য্যন্ত তাহার শাখা সংস্থাপন করা যাইতে পারে ও তদ্দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীণরূপে দেশের কৃষি কার্য্যের উন্নতি হইতে পারে।

রেশম।

লোকে যাহাতে নির্দ্দোষ বীজ ব্যবহার করিতে শিখে ও দেশে তুঁতের আবাদ বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা করিবার জন্য বেঙ্গল সিল্ক কমিটি নামে একটি সভা আছে। এই সভা উল্লিখিত কার্য্য সংসাধনে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার খাস মহলে রেশমের কাজ প্রসারিত হইতেছে। রেশমের আবাদের উন্নতির জন্য মেদিনীপুরের স্থানীয় লোক দিগের চেষ্টায় একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে সাধারণ কৃষিকার্য্য সম্বন্ধেও শিক্ষা প্রদত্ত হয়। কিয়ঞ্জড়ে রেশম আবাদের উন্নতির জন্য এক জন দক্ষ রেশম তত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জে তুঁতের আবাদ হইয়াছে এবং গুটি পালন ও রেশম বাহির করিবার প্রথা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।"

শিবপুর কৃষি।

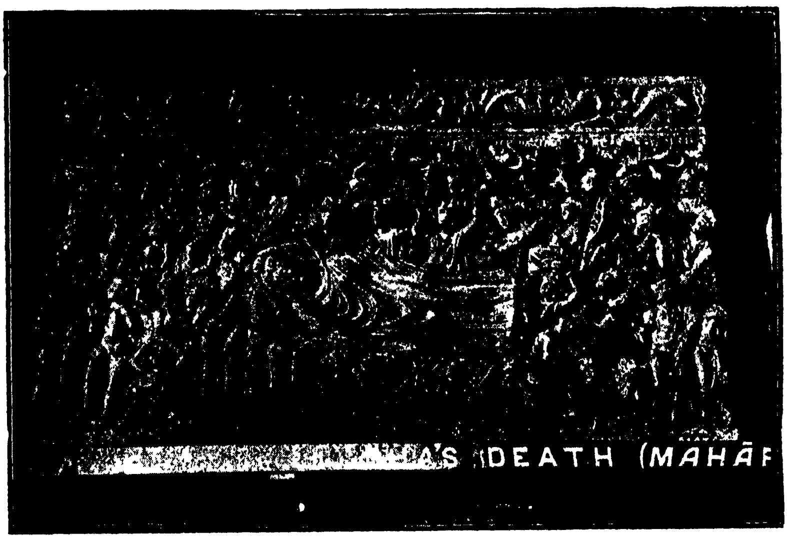
গতবৎসরে এই শ্রেণীর পরীক্ষা সন্তোষজনক হইয়াছিল। কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টর সাহেব বলেন যে, দেশে যে পরিমাণ কৃষিবিৎ ছাত্রের আবশ্যক, উল্লিখিত শ্রেণীর ছাত্র তাহার পক্ষে প্রচুর নহে। এই জন্য তিনি বলেন যে যতদিন উপযুক্ত রূপ ছাত্র সংখ্যা না পাওয়া যাইবে ততদিন বিভাগীয় আদর্শ ক্ষেত্র সংস্থাপন-কার্য্য ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিতে হইবে। ছোটলাট সাহেব বিবেচনা করেন যে পুষার কৃষি কালেজ ও তৎসংলগ্ন পরীক্ষালয় সংস্থাপিত হইলে এ অভাব পূর্ণ হইবে কেন না তাঁহার বিশ্বাস যে উক্ত কলেজ সংস্থাপিত হইলে তথায় অধিক পরিমাণে ছাত্র প্রবেশ করিবে। তাঁহার আশা আছে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনের জন্য যেরূপ উপযুক্ত কৃষিবিৎ লোকের প্রয়োজন তাহা উক্ত কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা পূর্ণ হইবে। কিন্তু আমাদিগের ধারণা অন্যরূপ। কৃষি কলেজের ছাত্রগণের যদি উচ্চ বেতনের চাকরী পাইবার আশা না থাকে, তাহা হইলে যে তথায় অধিক সংখ্যক ছাত্র প্রবেশ করিবে না ইহা এক প্রকার স্থির। গবমেণ্ট ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তাঁহারা যদি এখন প্রচার করেন যে, শিবপুর কৃষি শ্রেণী হইতে যাঁহারা পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা সকলেই ডেপুটী কালেক্টর হইবেন বা সেই শ্রেণীর কর্ম্মচারী-রূপে গণ্য হইবেন, তাহা হইলে দেখিবেন কত উপযুক্ত ছাত্র তথায় শিক্ষা লাভের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু একটি বা দুইটি উচ্চ পদ দিবার ব্যবস্থা করিলে কখনই অধিক সংখ্যক ছাত্র প্রবেশ করিবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। ডুমরাঁওয়ের মহারাণী পুষা কালেজের জন্য যে বৃত্তি দিতে প্রতি-শ্রুত হইয়াছেন তজ্জন্য ছোটলাট সাহেব তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সকল স্থানীয় কৃষক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে সেইরূপ সাহায্য দানে যাহাতে অগ্রসর হন, ছোটলাট সাহেব সে জন্য একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাস্তবিকই দেশের কৃষি শিল্প ইত্যাদির যাহাতে উন্নতি হয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সমূহের সে জন্য অর্থ ব্যয় করা একটি বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য।

বৌদ্ধযুগের শিল্পকার্য্য।

খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দ পর্য্যন্ত সময়ে ভারতে শিল্পবিদ্যার সবিশেষ অভ্যুন্নতি হইযাছিল। প্রাচীন ভারতের শিল্পবিদ্যাব ইতিহাস অন্য প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে এ স্থলে প্রাচীন শিল্পের দুই একটী নিদর্শন প্রদর্শিত হইতেছে।

গ্রীক শিল্প—খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীক্ বীর আলেকজন্দার ভারত আক্রমণ করেন এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমে বক্তিয়রাজ্য সংস্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে গ্রীক-শিল্প ভারতে প্রবেশ লাভ করে। নিম্নে গ্রীক-শিল্পের উদাহরণ স্বরূপ বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ চিত্র প্রদর্শিত হইল।

[১ম চিত্র—গ্রীক শিল্পের উদাহরণ



বুদ্ধ পর্য্যঙ্কের উপরে শয়িত। তাঁহার চতুর্দ্দিক মল্লগণ, যক্ষগণ, দেবগণ ও শিষ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান। আনন্দ তাঁহার সম্মুখে মূর্চ্ছিতাবস্থায় অবস্থিত। উপর হইতে বিদ্যাধরগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।

খৃঃ পূর্ব্ব ৪৪ অব্দে রাজা কনিষ্ক কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়।

জেনারেল কানিংহাম ১৮৭২ খৃঃ সাহদেরী নামক স্থানে ইহা প্রাপ্ত হন ও ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীকে প্রদান করেন।

শক শিল্প—খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে শক জাতি ভারতে প্রবেশ করে। ইহারা পঞ্জাব ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে রাজ্যস্থাপন করিয়া ভারতে নানাপ্রকার বৈদেশিক সভ্যতা বিস্তার করে। শক শিল্পের উদাহরণ স্বরূপে নিম্নে মৈত্রেয় বুদ্ধ ও বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ চিত্র প্রদর্শিত হইল।

[২য় চিত্র—শক শিল্পের উদাহরণ]

মৈত্রেয় বুদ্ধ মহাভদ্র কল্পে শাক্য সিংহের ৫০০০ বৎসর পরে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে আড়াই হাজার বৎসর পরে কেতুমতী নগরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নাগবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। ইনি সমগ্র জগতে বিরোধ উন্মূলন পূর্ব্বক মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুভাব স্থাপন করিবেন।



খৃঃ পূর্ব্ব ৪৪ অব্দে রাজা কনিষ্ক কর্ত্তৃক ইহা খোদিত হয়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে জেনারেল কানিংহাম সাহদেরী নামক স্থানে ইহা প্রাপ্ত হন ও ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটিকে প্রদান করেন।

[৩য় চিত্র—শকশিল্পের উদাহরণ]

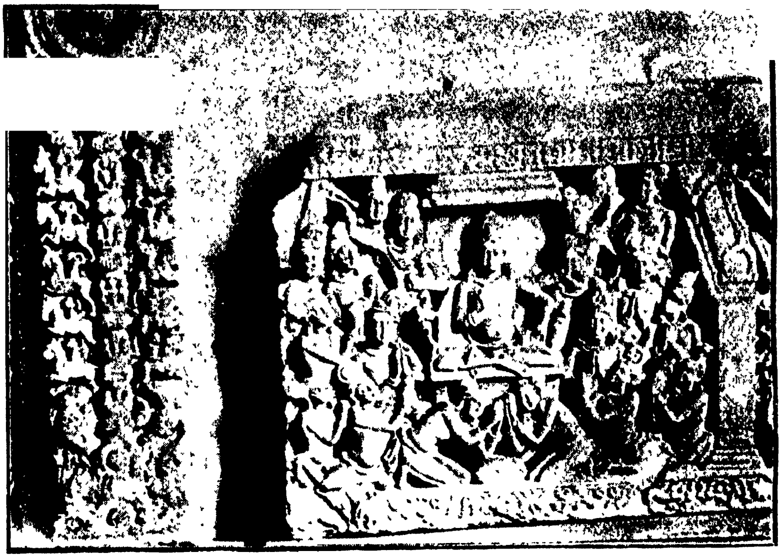


গোপা পর্য্যঙ্কের উপরে শয়িতা, বুদ্ধ তাঁহার পার্শে উপবিষ্ট। যশোধরা এবং মৃগজা তাঁহার উভয় পার্শে দাঁড়াইয়া আছেন দুই জন পরিচারিকা উভয় পার্শে নিদ্রিতা তাহাদের সম্মুখে মৃদঙ্গের ন্যায় বাদ্য যন্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বুদ্ধের গৃহের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহে প্রতিহারী দণ্ডায়মান।

এই ফলক জেনেরাল কানিংহাম খরকই নামক স্থানে প্রাপ্ত হন ও লাহোর মিউজিয়মে প্রদান করেন। এই ফলক রাজা কনিষ্ক খৃঃ পূর্ব্ব ৪৪ অব্দে খোদিত করেন।

দ্রাবিড়ীয় শিল্প—দ্রাবিড়ীয় জাতি ভারতের প্রাচীন অধিবাসী। ইহারাও নানা প্রকার শিল্পবিদ্যায় নিপুণ ছিল। দ্রাবিড়ীয় শিল্পের উদাহরণস্বরূপে নিম্নে শুদ্ধোদনের ধর্ম্মাধিকরণ-চিত্র প্রদর্শিত হইল।

[চতুর্থ চিত্র—দ্রাবিড়ীয় শিল্পের উদাহরণ]



(১) বামে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন। (২) দক্ষিণে শুদ্ধোদনের ধর্ম্মাধিকরণ।

(১) পরম জ্ঞান লাভের পর পঞ্চম সপ্তাহে বুদ্ধদেব ব্রহ্মাসহাম্পতির প্রার্থনা অনুসারে জগতে স্বোদ্ভাবিত ধর্ম্ম প্রচারে সম্মত হন। তদনুসারে তিনি বারাণসীতে গমন করিয়া কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণের নিকট মধ্যমমার্গের (আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ ও চতুরার্য্য সত্যের উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশ প্রদানকে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন বলে। বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মচক্র গম্ভীর, দুর্দ্দমন, দুরনুবোধ, দুর্বিজ্ঞেয়, সূক্ষ্ম, অভেদ্য, অপ্রপঞ্চ, অপ্রমেয় ও সর্ব্বত্রানুগত।

(২) শুদ্ধোদন পারিষদগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় বসিয়া আছেন। এই প্রস্তরফলক কাপ্তেন ম্যাকেঞ্জি অমরাবতীস্তূপে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে প্রাপ্ত হন ও এসিয়াটিক সোসাইটীকে প্রদান করেন। ফারগুসন সাহেব স্বীয় "Tree and Serpent Worship" নামক গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে এই অমরাবতীস্তূপ ২০০ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ে নির্ম্মিত হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এ, এম।
প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।

সমৃদ্ধি না অবনতি ?

আমাদিগের দেশের সকল প্রকার ব্যবসায়েরই ক্রমশঃ কিরূপ অবনতি হইতেছে, বিগত ১৯০১ সালের সেন্সস রিপোর্ট পাঠ করিলে তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাদিগের রাজপুরুষেরা দেশের আমদানী রপ্তানীর আধিক্য প্রদর্শন করিয়া দেশের সমৃদ্ধি প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন, কখন কখনও বা মাদক দ্রব্যের কাট্‌তি দেখাইয়া দেশের উন্নতির পরিমাণ করিয়া থাকেন; কিন্তু বর্ত্তমান সেন্সস রিপোর্ট তাঁহাদিগের সেই সকল উজ্জ্বল চিত্রে মসী নিক্ষেপ করিয়াছে। দেশ যে দিন দিন অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, এই রিপোর্টে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা উহার দুই এক স্থলের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

এই রিপোর্টের প্রথমেই আমরা দেখিলাম যে দশ বৎসর পূর্ব্বে যত লোক কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা দুই কোটি অধিক লোক সেই কার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতেই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে, যে দশ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল লোক যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, সেই সকল ব্যবসায়ের পথ রুদ্ধ হওয়াতেই তাহারা নিরুপায় হইয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। বিদেশীয় শিল্প সামগ্রী এদেশে যত অধিক পরিমাণে আমদানী হইতেছে ততই লোক জীবিকার জন্য ভূমাতার উপরই অধিক নির্ভর করিতেছে। কথা উঠিতে পারে যে, দশ বৎসরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে কৃষিজীবির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু আমরা দেখাইব যেমন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে তেমনই বিদেশীয় লোকের পরিচালিত অনেক ব্যবসায় বাড়িয়াছে এবং সেই সকল ব্যবসায়ে কেবলমাত্র মজুরী করিয়া সেই সকল বর্দ্ধিত লোকসংখ্যা জীবিকা অর্জ্জন করিয়াছে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে রেলওয়ের কার্য্যে ২,৪০,০০০ লোক নিযুক্ত ছিল, রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে এক্ষণে ৩,৫৭,০০০ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। কয়লার খনিতে ৬০ হাজার লোক বাড়িয়াছে, পাটের কলে ৬২ হাজার লোক বাড়িয়াছে, আর সূতার কলে ২৩ হাজার বাড়িয়াছে। এই ত গেল বাঙ্গালায় গোটাকতক বৈদেশিক ব্যবসায়ে লক্ষাধিক লোক বৃদ্ধি। তাহার পর নীলকুঠি চা-বাগান ইত্যাদিতে বহুসংখ্যক শ্রমজীবী বাড়িয়াছে। ব্রহ্মদেশে কেরোসিন তৈলের ব্যবসা আটগুণ বাড়িয়াছে সুতরাং সেখানেও শ্রমজীবির সংখ্যা বাড়িয়াছে; খনির কাজও পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাহাতে মজুরও বাড়িয়াছে। এইরূপে দেখা যায় এই দশ বৎসর যেমন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে তেমনই অনেকগুলি ব্যবসায়ের ও প্রসার হইয়াছে, তাহাতে সেই সকল লোক নিযুক্ত হইয়াছে। আবার এ দিকে দেশের লোক যে সকল স্বাধীনবৃত্তি করিত তাহা যখন হ্রাস হইয়াছে ও সেজন্য কৃষিবৃত্তিতে লোক বাড়িয়াছে; তখন দেশের যে অবনতি হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আশ্চর্য্য এইরূপ স্পষ্ট প্রমাণ দেখিয়াও আমাদের রাজপুরুষেরা দেশের সমৃদ্ধি হইতেছে বলিতে কুণ্ঠিত হন না। সেন্সস রিপোর্টের লেখকেরাও সেইরূপ সমৃদ্ধি প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা সে পক্ষে যে সকল যুক্তি তর্ক প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার কোনটাই প্রবল নহে। যে সকল যুক্তি তাঁহাদিগের মতের অনুকূল তাঁহারা সেইগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অপর দিকে যেগুলি প্রতিকূল তাহা একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন।

আমরা উপরে যে কয়েকটী বৈদেশিক ব্যবসায়ের উল্লেখ করিয়াছি সেগুলির শ্রীবৃদ্ধিতে যে দেশের বিশেষ কোন স্বার্থ নাই তাহা এদেশীয় লোকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অপর দিকে যে সকল এদেশের নিজস্ব তাহার যদি অবনতি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে দেশের যে অনিষ্ট হইয়াছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

যাহারা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল প্রস্তুত ও সরবরাহ করে সেন্সস রিপোর্টে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। এই শ্রেণীতে ১১টী ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী লোকের কথা বিবৃত হইয়াছে যথাঃ—যাহারা খাদ্য পেয়াদি প্রস্তুত করে, মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করে; রাজমিস্ত্রী সূত্রধর প্রভৃতি; যাহারা বস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত

করে ; কর্ম্মকার স্বর্ণকার কাংস্যকার যাহারা ধাতু ও জহরতের কাজ করে ; কাচের বাসন, মাটীর বাসন, পাথর প্রভৃতি যাহারা তৈয়ার করে ও কাঠ বেত পাতার কাজ যাহারা করে। অনুমান সাড়ে চারি কোটিরও অধিক লোক এই সকল ব্যবসায়ে নিযুক্ত বলিয়া প্রকাশ অর্থাৎ লোক-সংখ্যার অনুপাতে হাজার করা ১১৫ এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত। দশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৯১ সালে ৪,৮৬,৩১,০৯৭ লোক এই সকল ব্যবসায় করিত, আর ১৯০১ সালে ৪,৫৬,৭৬,৫৫৯ লোক ইহাতে নিযুক্ত ছিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে দশ বৎসরে ২৯,৫৪,৫৩৮ লোক কমিয়াছে। এই সকলের মধ্যে মৎস্য মাংসাদির কার্য্যে ৪০ লক্ষ নিযুক্ত আছে বলিয়া প্রকাশ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এই একটীমাত্র ব্যবসায়ে লক্ষ লোক কমিয়াছে। দধি দুগ্ধের কার্য্যে ৯,২৫০০০ লোক নিযুক্ত এবং ৮৮ হাজার লোক ঘৃত ব্যবসায়ী। এই দুই সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা একত্র ধরিলে মোটের উপর সমান আছে। ৪৭০০০ লোক যেমন ঘৃত ব্যবসায় ছাড়িয়াছে তেমনই ঐ সংখ্যা দধি দুগ্ধের ব্যবসায়ে বাড়িয়াছে। যাহারা মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। দশ বৎসর পূর্ব্বে আরও অধিক লোক এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। রিপোর্টের লেখকেরা বলেন যে এদেশের লোক মাংসাশী নহে বলিয়া এই সম্প্রদায়ের লোক হ্রাস হইয়াছে। এ কথাটা আমরা ভাল বুঝিলাম না। এদেশের হিন্দুগণই মাংসাশী নহে এবং হিন্দুবংশধরদিগের মধ্যে যাহাদিগের মাংস ভোজনে আপত্তি নাই, তাহাদিগের কিয়দংশ না হয় পৈতৃক সংস্কারবশতঃ তাহাতে বিরত ; কিন্তু এই দশ বৎসরে দেশে মুসলমান ও খৃষ্টানের সংখ্যা ত বাড়িয়াছে ? সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে যে মাংস ভোজনও বাড়িয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি যে মাংস বিক্রেতার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে হিন্দুদিগের মধ্যে যাহারা দশ বৎসর পূর্ব্বে মাংস ভোজন করিত, তাহারা আর্থিক কষ্টের জন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাতে দেশের দৈন্য বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছে।

গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ক, কলু, চাউলপেষক, ময়দাপেষক, ফলমূলবিক্রেতা, ভুনার, ময়রা, গুড় ও চিনি প্রস্তুত কারক, ইত্যাদি কয়েকটি ব্যবসায় রিপোর্টে একটি শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে যাহাদিগের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে রিপোর্টে তাহার এইরূপ কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে :—

১৮৯১ সাল অপেক্ষা এবারে যে শস্যব্যবসায়ীর সংখ্যা অনেক কমিয়াছে তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে যাহারা শস্য উৎপন্ন করিয়া বিক্রয় করে তাহাদিগকে কৃষক না বলিয়া শস্য বিক্রেতা বলা হইয়াছিল, এবারে তাহা সংশোধন করা হইয়াছে, ইহা তাহাদিগের সংখ্যা হ্রাসের বিশেষ কারণ, তদ্ব্যতীত অনেক স্থানে, বিশেষতঃ বোম্বাই ও উত্তর ভারতে শস্যবিক্রেতারাই টাকা ঋণ দিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদিগের অনেকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছে, ইহাও এই সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ। ব্রহ্মদেশ ও পঞ্জাব ব্যতীত সর্ব্বত্রই কলুর সংখ্যা কমিয়াছে। কেরোসিন তৈল আমদানী হওয়াতে কলুদিগের ব্যবসা লোপ পাইতেছে সুতরাং তাহারা ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিতেছে। বাঙ্গালায় ইহাদিগের অনেকে মুদীর কার্য্য করিতেছে, আর যুক্তপ্রদেশে ইহারা ভুনারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। গুড় ও চিনি-প্রস্তুতকারকদিগের সংখ্যাহ্রাসের কারণ বিদেশী চিনির আমদানী।

শস্যবিক্রেতাদিগের সংখ্যাহ্রাসসম্বন্ধে রিপোর্টে যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, আমাদিগের বোধ হয় তদ্ব্যতীত আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। দেশে যত রেল বিস্তৃত হইতেছে, ততই মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদিগের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। সহরের মহাজনেরা, প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষকদিগের সহিত কারবার করিতে সমর্থ হইতেছে। ইহা ভাল হউক আর মন্দ হউক, ইহা স্থির যে শস্য-ব্যবসায়ীদিগের অবস্থা দশ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা হীন হইয়াছে।

প্রায় ১৫ লক্ষ লোক ইমারতের কার্য্যে নিযুক্ত। ইহার সিকিভাগ ইট, টালি প্রভৃতি ইমারতের উপকরণ প্রস্তুত করিয়া থাকে বাকী রাজমিস্ত্রী ঘরামী ইত্যাদির কার্য্য করিয়া থাকে। রিপোর্ট লেখকেরা বলেন, যে ইট, টালী ইত্যাদি কারিকরের

সংখ্যা বাড়িয়াছে ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে দেশের অনেক স্থলেই লোকের অবস্থা ভাল হইয়াছে। তাহাতেই মাটীর ঘরের পরিবর্ত্তে কোঠা বাড়ী তৈয়ার করিতেছে। আমরা এ কৈফিয়তে সায় দিতে পারি না। দেশের লোক যে নূতন কোঠা করিতেছে না আমরা তাহা বলি না, কিন্তু তাহার সংখ্যা সামান্য। সরকারী পূর্ত্তবিভাগ ও রেলওয়ে নির্ম্মাণ বাড়িতেছে বলিয়াই যে ইট টালি তৈয়ারীতে অধিক নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই কার্য্যে ১,৪৩৭,৭৩৯ জন লোক নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে ইহাদিগের সংখ্যা হইয়াছে ১৫৭৯,৭৬০ অর্থাৎ ১৪২,০২১ জন বাড়িয়াছে। পূর্ত্তবিভাগ ও রেলওয়ের কার্য্যের জন্য এই সামান্য লোক বৃদ্ধি কি সম্ভব নহে? যদি দেশের অবস্থা উন্নত হইত তাহা হইলে ইহার দশগুণ অধিক লোকের প্রয়োজন হইত।

চট ও বস্ত্রবয়ন ও পোষাক তৈয়ারীতে এক কোটি আড়াই লক্ষ লোক নিযুক্ত অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার তুলনায় হাজার করা ৩৮ জন লোক এই ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে ১৮৯২ সাল অপেক্ষা প্রায় ১৪ লক্ষ লোক এই ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছে। পাট ও রেসম বয়নে কিছু লোক বাড়িয়াছে, কিন্তু পশম ও অন্যবিধ লোমবয়ন এবং পোষাক তৈয়ারিতে লোক কমিয়াছে। ১৮৯১ সালে ৮,৮২০,৬৫৩ জন লোক কার্পাস বস্ত্র বয়ন করিত, ১৯০১ সালে ৭,৭০২,০০৩ লোক এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত, অর্থাৎ ১,১১ ৮,৬৫০ বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিয়াছে। ইহার কারণ দর্শাইবার প্রয়োজন নাই। বিলাতী ও দেশী কলের কাপড়ের জন্যই যে ইহা ঘটিয়াছে তাহা সকলেই বুঝিতেছেন।

ধাতু ও জহরতের কার্য্য ও ব্যবসায় করে প্রায় সাড়ে ৩৭ লক্ষ লোক। তন্মধ্যে সোণা, রূপা ও জহরতের কাজ করে সাড়ে ১৭ লক্ষ; পিত্তল, তামা কাঁসার ব্যবসায় করে ৪ লক্ষ; টীন ও দস্তার করে ৭৬,০০০ আর লোহা ও ইস্পাতের কাজ করে ১৫ লক্ষ। ১৮৯১ সালের রিপোর্টের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, যে এই কয়টা ব্যবসায়ে শতকরা তিনজন করিয়া লোক হ্রাস হইয়াছে কিন্তু রিপোর্ট লেখকেরা সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। দেশের লোকের অবস্থা যে দিন দিন সমৃদ্ধ হইতেছে ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাধ্য, কাজেই অঙ্কপাতের ভেলকীর দ্বারা তাঁহারা সে কার্য্যসাধনে ত্রুটি করিবেন কেন? তাঁহারা বলেন উল্লিখিত হিসাবে যে শতকরা তিনজন লোক কমিয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে তাহা ঠিক নহে। কমা দূরে থাকুক বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ঐ সকল ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। কৃষিজীবিদের মধ্যে যাহারা লাঙ্গল ইত্যাদি তৈয়ার করে তাহাদিগকে কৃষক বলিয়াই ধরা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা যেমন কৃষক তেমনই কারিকর। এইরূপ প্রায় লক্ষ লোককে কৃষক বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, যদি সেরূপে না হইত তাহা হইলে কারিকরের শ্রেণীতে লক্ষ লোক বাড়িত। এই সকল শ্রমশিল্পের সহিত য়ুরোপীয় প্রতিযোগিতা নাই, সুতরাং দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে গৃহস্থালীর জন্য অধিক পরিমাণে ধাতু পাত্র ব্যবহার করিতে থাকিবে এবং অলঙ্কার ও জহরতাদি ক্রয় করিবে। আমাদিগের রাজপুরুষেরা যেন তেন প্রকারেণ দেশের সমৃদ্ধি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উপরি লিখিত কারিকর দিগের সংখ্যা কি প্রকাশ করিতেছে? সমৃদ্ধি প্রতিপন্ন করা দূরে থাকুক উহা সম্পূর্ণরূপে তাহার বিপরীত অবস্থা প্রদর্শন করিতেছে। দশ বৎসর কাল মধ্যে দেশে বহু লক্ষ লোক বাড়িয়াছে, অতএব দেশের যদি সমৃদ্ধির অবস্থা হইত, তাহা হইলে সর্ব্ব সাধারণে তাহার ফলভোগ করিত এবং এই শ্রেণীর কারিকর এক লক্ষ নহে, বহু লক্ষ দেখা যাইত। কিন্তু রাজপুরুষেরা যেরূপ কৈফিয়ৎ দিন না কেন, রিপোর্টে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কাংস্যকার, ও জহুরী প্রভৃতির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা ১১০,৬২৯ জন কমিয়াছে। তাহার পর আমরা যদি ইহাও ধরিয়া লই যে, ইহাদের সংখ্যা কমে নাই, পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও সেইরূপ আছে, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে এ দশ বৎসরে দেশের অণুমাত্র সমৃদ্ধি হয় নাই।

এইরূপে আমরা যে কোন ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি প্রায় সেইটীতেই অবনতি দৃষ্ট হয়। বাণিজ্যাদির অঙ্কে দেখা গেল যাহারা তেজারতী

বা সুদী কারবার করে তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে অথচ সাধারণ ব্যবসায়ীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ হ্রাস হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে লোকের অবস্থা হীন হইয়াছে বলিয়া তাহারা ঋণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, এজন্যই তেজারতী ও সুদী কারবার বাড়িয়াছে আর অন্যবিধ ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে। অতএব রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগের রিপোর্ট রিজোলিউসান্ প্রভৃতিতে দেশের সমৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া সর্ব্বদা যে অস্ফালন করেন তাহা কতদূর শূন্যগর্ভ তাহা এই সেন্সেস্ রিপোর্ট পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেশের এই দুরবস্থার জন্যই যে অধিক সংখ্যক লোক কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

এণ্ডি।

রঙ্গপুর জেলার দুঃখী গৃহস্থগণ কার্য্যান্তে এণ্ডির কার্য্য করিয়া থাকে। সামান্য এক পয়সা মূল্যের কাঠি কিনিয়া পালিতে পারিলে উহাদ্বারা চিরস্থায়ী কারবার এবং বহু আয় হইতে পারে। বৎসরে উহারা আটবার সূতার "কোয়া" (বাসা) প্রস্তুত করে। এই অষ্টম পুরুষ পরিবর্ত্তনে লক্ষ লক্ষ কীট জন্মায়, এবং ক্রমেই কার্য্যক্ষেত্র এতই বিস্তৃত হয় যে, গৃহস্থগণ সংসারের কাজ ফেলিয়া, উহা একাদিক্রমে পালিতে পারে না। এণ্ডির কারবার চিরস্থায়ী লাভজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এণ্ডির কার্য্য অত্যাশ্চর্য্য এবং আমোদজনক। একটি প্রজাপতি চারি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (১) ডিম্ব (২) কীট (৩) কোয়া (৪) প্রজাপতি।

১। এণ্ডিপালন। ডিম্ব—প্রজাপতি ৪।৫ দিন কাঠিতে বাঁধা থাকিলে,ঐ কাঠিতে ক্রমে ক্রমে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ঐ ডিম্বগুলি সন্তর্পণতার সহিত শুষ্ক পরিষ্কার নেকড়ায় "জলসরার" উপর রাখিতে হয়। মাছি এবং পিপীলিকা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ সাবধানতার প্রয়োজন। তখন উহাদিগকে অন্য পরিষ্কার বস্ত্রে লইয়া ডালিতে রক্ষা করিতে হয়। এণ্ডিপোকার আহার্য্য "এরণ্ড পত্র"। এরণ্ড পত্র ভোজী কীট, এইজন্যই ইহার নাম "এরণ্ডী" বা "এণ্ডি কীট," কলিকাতার অপভ্রংশ নাম "এঁড়ি"। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এণ্ডিপোকার আহারের জন্য অতি সুকোমল এরণ্ড পত্র টুকরা টুকরা করিয়া ডালিতে ছড়াইয়া দিতে হয়। ক্রমে পাতাগুলি খাইয়া ফেলিলে, পুনরায় পাতা দেওয় এবং এই সময়ে পরিষ্কার করিয়া দেওয়াই ইহার কার্য্য। কারণ ময়লার সহিত থাকিলে কীট মরিয়া যায়। যাহারা এই কীটের কার্য্য করে, তাহাদিগকে খুব পরিষ্কার থাকিতে হয়। ইহার পরম শত্রু লবণ, গন্ধক, ধুনা ইত্যাদি। খেজমতগারগণ ঐ সকল দ্রব্যের সংস্পর্শ দোষ হইতে কীট রক্ষা করিয়া থাকে।

২। কীট।—ডিম ফুটিয়া গেলে ৪।৫ দিন মধ্যেই কীটগুলি দুই ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হয়। চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত কীটগুলিকে দীর্ঘ হইতে দেখা-

যায়। ক্রমেই কীট বড় হইলে পুরু পাতা বড় বড় টুকরা করিয়া দিতে হয়। কীটগুলি ২।৩ দিন পরে অল্প সময়ের জন্ত রৌদ্রে রাখা প্রয়োজন। সর্ব্বদাই বস্ত্রাবরণে রাখিতে হয়। রৌদ্রের উত্তাপে কীটগুলি ঈষৎ গরম হইলেই পুনরায় ঘরে উঠাইতে হয়। ৭।৮ দিনের মধ্যে কীট সকল বড় হইলে "জলসরার আড়ে" ৫।৭টী এরণ্ড পত্র একত্র বাঁধিয়া তাহাতে পোকাগুলি ছাড়িয়া দিতে হয়। এই "আড়ের" নীচে একখানা "দরমা" বা চেটাই রাখিতে হয়। কীটগুলি হঠাৎ পাতা হইতে পড়িয়া গেলে পুনরায় তুলিয়া রাখা আবশ্যক। প্রতিদিনই নূতন পাতার "থোপনা" বাঁধিয়া দিতে হয়। শুষ্ক পত্রের থোপনা আড়েই থাকে। এণ্ডি কীট এই সময়ে শুষ্ক পত্রের শিরায় শিরায় "কোয়া" অর্থাৎ বাসা করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়।

৩। কোয়া।—এণ্ডি কীটের "কোয়া" প্রস্তুত শেষ হইলে কোয়াগুলি "থোপনা" হইতে লইয়া ডালায় করিয়া রৌদ্রে (প্রতিদিন গরম না হওয়া কাল পর্য্যন্ত) রাখিতে হয়। এইরূপে ৫।৭ দিন রৌদ্রের তাপ পাইলে কোয়ার মুখ ফুটিয়া একপ্রকার ঈষৎ হরিদ্রাভ মেটে ও সাদা বর্ণের প্রজাপতি বাহির হইয়া থাকে, থেজমতকারগণ এই প্রজাপতিগুলি লইয়া ক্রমে উহার পাখা দুইটা একত্র করিয়া কাঠিতে বাঁধিয়া থাকে। অনেক প্রজাপতি কোয়া হইতে ফুটিয়া ডালিতেই ডিম পাড়ে। ডালির ও কাঠির ডিম উভয়ই রাখিতে হয়। ডিম পাড়া শেষ হইলে প্রজাপতি গুলিকে ছাড়িয়া দিলেই যথেচ্ছ চলিয়া যায়।

৪। সূতা প্রস্তুত প্রণালী—কোয়াগুলি ফুটিয়া গেলে তাহা উত্তমরূপে জলে সিদ্ধ করিতে হয়। পরীক্ষা এই যে, সিদ্ধ কোয়ার মুখ ধরিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিলে যদি সহজে পারা যায়, তাহা হইলেই হইল; নচেৎ পুনরায় সিদ্ধ করা আবশ্যক। সুসিদ্ধ কোয়াগুলির মুখ টানিয়া প্রসারিত করিয়া উহার ভিতরে প্রবিষ্ট কীটগুলি এবং ময়লা ফেলিয়া পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া "আলতা পাতের" ন্যায় রাখিতে হয়। এদেশের এণ্ডি নির্ম্মাণকারিগণ এই "কোয়ার পাত" ভাল করিয়া ধুইতে জানে না, তাই বস্ত্র ও সূতা মলিন হয়। ব্যবসায়ীগণ ঐ কোয়ার পাত যতই পরিষ্কার করিয়া ধুইতে পারিবে, সূতার কাটতি এবং মূল্য ততই বেশী হইবে।

এতদ্দেশে কোয়ার পাত হইতে সূতা বাহির করিবার সময় উহা জলে ভিজাইয়া একখানা কাঠির অগ্রভাগে জড়াইয়া লয়, এবং ক্রমে টানিয়া "টাকুর" (টেকো) নামক এক প্রকার দণ্ড সাহায্যে সূতা কাটে। অন্য দেশে উহাকে "টিপ" কহে। ব্যবসায়ীগণ "রেসমের" কারবারে যেরূপ সূতা প্রস্তুত করে, তদুপায় অবলম্বন করিতে পারেন।

এদেশে সাধারণতঃ এণ্ডি সূতার (২০ গণ্ডা তারযুক্ত ১।০ হাত দীর্ঘ) "মোড়ক" ১৲ টাকা, ১।০ টাকায় বিক্রয় হয়।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন এই ছয় মাসে ছয়বার এবং শীতকালে অগ্রহায়ণ ও ফাগুন এই দুইবার, সাকুল্যে আটবার ইহাতে কোয়া জন্মে।

এরণ্ডপত্র ব্যতীত এণ্ডি কীট মাকই, কাণ্ডিউয়াটুকী, পাতা খাইয়া থাকে। ব্যবসায়ীদিগেরব্যবসায়ের পূর্ব্বে উহা জন্মাইতে হয়।

শ্রীবসন্তকুমার সেন।

ভারত দোহন।

ভারতবর্ষ যেমন ইংলণ্ডের বাণিজ্যের সহায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর কোন দেশ সেরূপ নহে। ইংলণ্ডের বাণিজ্যের হিসাব দেখিলে জানা যায় যে কানাডা হইতে ইংলণ্ডে বৎসরে ৪০ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার সামগ্রী রপ্তানি হয়, নিউ-জিলণ্ড হইতে ১৫ কোটি, অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশ হইতে সাড়ে ৩৪ কোটী, কিন্তু এক ভারতবর্ষ হইতে ৫৪ কোটি ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়। অপর দিকে ইংলণ্ডের শিল্পজাত সামগ্রী বৎসরে ৩৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রয় করিয়া থাকেন, অষ্ট্রেলিয়া ক্রয় করেন ২৪ কোটি ১৫ লক্ষ, কানাডা ১৬ কোটি, অন্যান্য বৃটীশ উপনিবেশ ৩০ কোটি, আর ভারতবর্ষ ক্রয় করেন ৫৩ কোটি ৫৫ লক্ষ। এই হিসাবে প্রতিপন্ন হইতেছে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজন তেমনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খরিদদার। ভারতবর্ষ হইতেই প্রধানতঃ কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ড তাঁহার শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য উভয়ই ইংরাজের হস্তে—ভারত-বাসী এই বাণিজ্যের লাভের অত্যল্প অংশই ভোগ করিতে পান। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে দিক দিয়া হউক ইংলণ্ডই লাভবান হইতেছেন। কিন্তু তাহাতেও ইংরাজ জাতির ক্ষুধা নিবৃত্ত নহে। ভারতের সমস্ত বাণিজ্য যাহাতে তাঁহাদিগের করায়ত্ত হয় তাঁহারা সর্ব্বথা তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে গবর্মেণ্টও তাঁহাদিগের সহায়। যাহাতে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা তাঁহাদিগের মূলধন ভারতে নিয়োগ করিতে যত্নবান হন, গবর্মেণ্ট সে জন্য নানাবিধ উপায়ে তাঁহাদিগের সুবিধা করিয়া দিয়া থাকেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও ভারত-বাসী নিশ্চেষ্ট। আমাদিগের মুখের অন্ন লইয়া যাইবার জন্য ইংরাজ জাতির উদ্যোগ ও যত্ন কিরূপ, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার পরিচয় দিব। ভারতের ধন দোহনের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়াও যদি ভারতবাসী নিদ্রা যান তাহা হইলে তাঁহাদিগের দারিদ্র্য দুঃখ যে কেবল অবসান হইবে না তাহা নহে, প্রত্যুত উত্তরোত্তর তাহা এরূপ বৃদ্ধি পাইবে যে শেষে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে।

বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন নামে একটি সভা আছে। এই সভাতে ভারতের রাজ নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রশ্নের আলোচনা হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই সভায় ফ্রাঙ্ক বার্ডউড সাহেব ভারতের বাণিজ্য বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সার জর্জ্জ বার্ড উডের নাম শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। ইনি ভারতের শিল্পকলার বড়ই অনুরাগী। ভারতের প্রাচীন শিল্প সমূহ সংরক্ষিত হয় এবং এখানকার শিল্পীগণের অবস্থার উন্নতি হয় সার জর্জ্জ বার্ডউডের ইহা আন্তরিক ইচ্ছা। ফ্রাঙ্ক বার্ডউড সাহেব এই সার জর্জ্জ বার্ডউডের পুত্র। পিতা যেমন ভারতবাসীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পুত্র সেই-রূপ বৃটিশ ধনপতিদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী। বৃটিশ ধনপতিরা কানাডা অষ্ট্রেলিয়া বা আফ্রিকার বাণিজ্যে যেরূপ মূলধন নিয়োগ করিয়া থাকেন, ভারতে সেরূপ করেন না, এজন্য ফ্রাঙ্ক বার্ডউড সাহেব বড়ই দুঃখিত। এই কারণে তিনি বিলাতী বণিকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে ভারতের বর্ত্তমান বাণিজ্যিক অবস্থার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন।

বার্ডউড সাহেব তাঁহার বক্তৃতার প্রথমে ভারতের প্রধান পণ্য কার্পাস, পাট, চাউল, নীল লবণ ইত্যাদির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন কার্পাস ভারতের সর্ব্ব প্রধান পণ্য। ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা উৎপন্ন হইতেছে এবং এক সময়ে ভারতের কার্পাসজাত বস্ত্রাদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কলে বস্ত্র প্রস্তুত আরম্ভ হওয়াতে এই বস্ত্র শিল্প মন্দীভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভারতে কাপড়ের কল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রথমে বোম্বাই নগরে একটিমাত্র কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ১৮৬১ সালে সেই একটীর স্থানে দশটি কল সংস্থাপিত হয়। এই দশটি কলে ৩,৩৮,০০০ চরকার সূতা প্রস্তুত হইতে থাকে। আর ১৮৯১ সালে সেই তিন লক্ষ চরকার স্থানে ৩৩ লক্ষ চরকা দেখা গিয়াছে। আর ১৯১০ সালে তাহা ৫০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে।

এত কল বৃদ্ধি হইয়াছে, অর্থাপি কার্পাসের আবাদ এখন পর্য্যন্তও স্থায়ীরূপে বৃদ্ধি পায় নাই। তিনি বলেন এই কার্পাসের আবাদের উন্নতি হইলে ভারতের কল সমূহ স্বদেশের অভাব পূর্ণ করিয়া অধিকাংশ প্রাচ্য ভূভাগের অভাব পর্য্যন্ত পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে। এই সকল কথা বলিয়া বার্ডউড সাহেব বিলাতী ব্যবসায়ীদিগকে ভারতে কার্পাস আবাদ করিতে ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কার্পাসের পরে তিনি পাটের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন কার্পাসের পরেই পাট একটি বিশেষ পণ্য। ইহা একমাত্র ভারতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে সুতরাং ইহার সহিত পৃথিবীর কোন দেশই প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ নহে, অতএব ইহার ব্যবসা বিশেষ লাভ জনক। তিনি বলেন ভারতের পাটের কল সকলে যে এখন অল্প লাভ হইতেছে তাহার একমাত্র কারণ মূলধনের অভাব। এই কথা বলিবার অভিপ্রায় কি তাহা বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। চা-আবাদে মূলধন নিয়োগ করিয়া চা-করগণ কিরূপ লাভবান হইয়াছেন বার্ড উড সাহেব তৎপরে তাহা বিশদরূপে বিবৃত করেন। তিনি ৪১টী যৌথ কারবারের হিসাব দ্বারা প্রদর্শন করেন যে উহাতে প্রায় ১৫ কোটি টাকা খাটিতেছে, এবং তাহাতে গড়ে শতকরা চারি টাকার উপর লাভ হইতেছে। তাহার পর চাউল ও নীলের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন এই দুইটী পণ্যের বিশেষ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে ইহাতেই ব্যবসায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। নীল সম্বন্ধে তিনি বলেন যে নকল নীল যদিও ইহাকে পরাস্ত করিতেছে, তথাপি ইহার এমন একটি বিশেষত্ব আছে যাহা অনুকরণ করা অসম্ভব। যখন সেই বিশেষ গুণের দিকে সাধারণের দৃষ্টি পড়িবে তখন আবার ইহার আদর হইবে। কিন্তু আপাততঃ যদি নীলকরগণ সম্মিলিত হইয়া ইহার একটা বাঁধা দর ধার্য্য করেন, তাহা হইলে সত্বর ইহার প্রসার হইতে পারে।

ইহার পর বার্ডউড সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের উল্লেখ করেন। তিনি প্রথমেই গোধূমের কথা অবতারণা করেন। তিনি বলেন ভারতের উৎকৃষ্ট গম বিলাতের বাজারে আদরে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার এমন অনেক গুণ আছে যাহাতে আটা ও ময়দা ভাল হয়। গত বৎসরে কানাডা হইতে ইংলণ্ডে যত গম রপ্তানি হইয়াছে, ভারত হইতে তদপেক্ষা অনেক অধিক চালান হইয়াছে। কিন্তু ইহার চাষের উন্নতি আবশ্যক। সাধারণতঃ ভারতে যেরূপ গম উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাতে উহা কানাডার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। অতএব ধনীরা যদি ভারতীয় গমের উন্নতিসাধনে যত্নবান হন তাহা হইলে তাঁহারা যে লাভবান হইবেন বার্ড উড সাহেব তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। ইহার পর তিনি চামড়ার ব্যবসায়ের কথা বলেন, এই ব্যবসায় যে বিশেষ লাভজনক তাহা তিনি কানপুরের কারখানার দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করেন। এখন সরকারী কারখানাতে চামড়া তৈয়ার হওয়াতে, সাধারণ লোকের তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করা কতকটা অসুবিধাজনক হইয়াছে সন্দেহ নাই। তথাপি সাধারণ লোকে যদি এই কারবারে মূলধন নিয়োগ করেন তাহাতে তাঁহারা কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না, বার্ডউড সাহেবের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস। এ বিষয়ে আমেরিকা যাহা করিতেছেন, ভারত তাহার অনুকরণ করিতে পারেন।

রেশম বয়ন ভারতের প্রাচীন ব্যবসা। এই কার্য্যে ভারতীয় শিল্পীরা বিশেষ দক্ষ। বার্ডউড সাহেব বলেন যে কাশ্মীরে এই রেশমের আবাদ অনায়াসে করা যাইতে পারে। এবিষয়ে কেবল মূল ধনেরই অভাব। তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দকে এই ইঙ্গিত দ্বারা তিনি কাশ্মীরে রেশমের আবাদে মূলধন নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। অতঃপর তিনি পাথুরে কয়লা ও লৌহ এবং ইস্পাতের কথা উত্থাপন করেন। আজি প্রায় ৬০ বৎসর হইল এদেশে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাতে প্রায় লক্ষাধিক লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথম ৪০ বৎসরে এই ব্যবসায়ের বিশেষ প্রসার হয় নাই, কিন্তু রেল ও কল কারখানা যত বাড়িতেছে ততই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। খনি সমূহের প্রধান ইনেস্পেক্টর

সাহেব বলেন যে বিগত ২১ বৎসরে কয়লার কাটতি চতুর্গুণ বাড়িয়াছে সুতরাং ইহার ভবিষ্যৎ যে আশাপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই। লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধে বার্ডউড সাহেব বলেন, যে এই কারবারের উন্নতি এক প্রকার নিশ্চিত, কিন্তু এই ব্যবসায়ে যেরূপ অধিক মূল ধনের আবশ্যক এরূপ আর কোন কারবারে নহে, যেহেতু প্রচুর পরিমাণে লৌহ খনি হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে লাভের সম্ভাবনা নাই। এই লৌহ খনির কার্য্য দিন দিন কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বার্ড উড সাহেব বলেন, যে ১৮৯১ সালে ভারতের খনি হইতে ৩৩,০০০ টন মাত্র লৌহ উঠিয়াছিল কিন্তু ১৯০২ সালে ৮১,০০০ টনের উপর উঠিয়াছে, অতএব ইহাতে টাকা খাটাইতে পারিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা।

চিনীর বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, যে আপাততঃ সমগ্র ভারতে প্রায় ৩০লক্ষ একর জমীতে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। ইক্ষু হইতে যে গুড় প্রস্তুত হয় তাহা ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং এই গুড়ের বাজারে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কিছু মাত্র নাই। বার্ডউড সাহেব বলেন, এই চিনীর কারবার প্রসারের যথেষ্ট স্থান আছে, মূলধন নিয়োগ করিলে ইহাতে লাভ বই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। তিনি তাহার পর তামাক, তিসি, সরিষা, কার্পাস-বীজ ইত্যাদির উল্লেখ করেন। তৎপরে খনিজ তৈলের উল্লেখ করিয়া বলেন যে কয়লার ন্যায় এই কারবারের শ্রীবৃদ্ধি অতি অল্প দিন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ভারতে যে পরিমাণ কেরোসিন তৈল ব্যবহৃত হয়, তদনুপাতে তথায় তৈল উৎপন্ন হয় না। ভারতীয় খনিজ তৈল পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা হইলে এই কারবারের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আর খনির খাদ যত অধিক হইবে, ততই যে পাতলা তৈল বাহির হইবে ইহাও তিনি খুব সম্ভব বলিয়া মনে করেন।

অতঃপর তিনি স্বর্ণ খনি সম্বন্ধে বলেন, যে ইংলণ্ডের অনেক ধনীই ভারতের স্বর্ণ খনির বিষয় অবগত আছেন, বিশেষতঃ সম্প্রতি একটি খনি বিলাতী ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কিন্তু আপাততঃ ভারতে যে দুই একটি স্বর্ণ খনি বাহির হইয়াছে তাহা নগণ্য; এখনও ভারতে স্বর্ণপূর্ণ বহুস্থান বিদ্যমান আছে। অর্থ নিয়োগ দ্বারা সেই সকল স্বর্ণ উদ্ধার করিতে পারিলে যথেষ্ঠ অর্থাগম হইতে পারে। উল্লিখিত খনিজ দ্রব্য ব্যতীত ভারত গর্ভে আরও অনেক প্রকার মূল্যবান প্রস্তরের খনি আছে; ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতির খনি আছে, টীনের খনি আছে; তন্মধ্যে অভ্রের খনির ভবিষ্যৎ তাঁহার মতে সম্পূর্ণ আশাপ্রদ। বঙ্গদেশে বহু কাল হইতে এই অভ্রের খনি বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে লোহিতাভ অভ্র বিশেষ আদরণীয়।

অবশেষে বার্ডউড সাহেব কাগজের কলের উল্লেখ করিয়া বলেন যে আপাততঃ সমস্ত ভারতে নয়টি মাত্র কাগজের কল বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে দুইটী ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি, অন্য গুলি যৌথ কারবার। এই কাগজের কলে বোম্বাই প্রদেশে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা খাটিতেছে। এই কয়টি কলদ্বারা যে ভারতের সমুদায় অভাব পূরণ হয় না তিনি সে বিষয়ে ইঙ্গিত করিতে বিস্মৃত হন নাই।

এইরূপে ভারতের নানা প্রকার চলতি কারবারের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এই সকল ব্যতীত আরও অনেক ব্যবসায় আছে যাহাতে এপর্য্যন্ত য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীগণ আদৌ মনোযোগ দেন নাই। সেই সকল লুপ্তপ্রায় ব্যবসায় পুনরুদ্ধারের জন্য মূল ধন নিয়োগ করিলে তাহার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি ভারতের গন্ধ দ্রব্যের প্রথম উল্লেখ করেন। আদিম কাল হইতে ভারতে নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য প্রচলিত আছে। কিন্তু বার্ডউড সাহেবের মতে ভারতে যে প্রণালীতে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা পাশ্চাত্য দেশের অনুসৃত প্রণালী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন দ্বারা ভারতে গন্ধ দ্রব্যের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। ভারতের বিবিধ সুগন্ধি উদ্ভিজ্জ উপযুক্ত চোলাইকারকের অভাবে বৃথা নষ্ট হইতেছে। যে কোন ব্যক্তি ইহাতে অর্থ নিয়োগ করিবেন তিনি নিশ্চয়ই ধনবান হইবেন।

ভারতের জলগর্ভে কিরূপ অপরিমেয় ধন বিদ্যমান আছে তাহা বিবৃত করিতে করিতে বার্ডউড

সাহেব বলেন যে, ভারতের নদ, নদী, সমুদ্রাদিতে কত যে সুস্বাদু মৎস্য বিদ্যমান আছে তাহা এক প্রকার অপরিজ্ঞাত। কেবল মাত্র সকলে সম্মিলিত হইয়া এই সকল মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন। দুই একবার এবিষয়ে চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কি জন্য সেই চেষ্টা সফল হয় নাই তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এবিষয়ে নিরাশ হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই।

বিবিধ প্রকার উদ্ভিজ্জ হইতে আঁশ বাহির করিয়া কিরূপ বস্ত্র বয়নের সূত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তিনি তাহারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। এদেশীয় নানা প্রকার ফলের ব্যবসায়ে মনোযোগ প্রদান করিলে বিলাতী ব্যবসায়ীরা কিরূপ লাভবান হইতে পারেন তাহাও সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়া ছিলেন। ভারতের অরণ্য মধ্যে অনেক প্রকার বৃক্ষ হইতে আটা বাহির করিয়া যে রবার (Rubber) প্রস্তুত করা হয় তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এদেশীয় লোক বড়ই অসাবধানতার সহিত রবার প্রস্তুত করে। তাহারা ইহার মধ্যে অনেক ময়লা রাখিয়া দেয়, তাহাতে এই কারবারের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। উন্নত প্রণালীতে ইহা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিলে ইহা সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইবে। ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার উপযোগী বহু সামগ্রী ভারতে বিদ্যমান আছে। মার্কিণ মহাজনেরা এই সকল দ্রব্যের ব্যবসা হস্তগত করিবার জন্য ইতিমধ্যেই অগ্রসর হইয়াছেন। ভারতে যদি ঔষধ প্রস্তুত করিবার কারখানা খোলা যায় তাহা হইলে যে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ তিনি Caffeine প্রস্তুত বিষয় উল্লেখ করেন। ভারতের চা-করেরা অব্যবহার্য্য গুঁড়া চা লইয়া বড় সমস্যায় পড়িয়াছেন। কিন্তু এই গুঁড়া চা হইতে Caffeine প্রস্তুত হইতে পারে। প্রতিবৎসর এই কাফিয়াইনের কাটতি বাড়িতেছে। আমেরিকায় ত ইহার অভূতপূর্ব্ব কাটতি। ভারতের কোন পর্ব্বত সন্নিধ্যস্থানে কুইনাইন ও কাফিয়াইন প্রস্তুত করিবার কারখানা করিলে তাহা লাভজনক হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ভারতে কাচের কারখানা সংস্থাপনেরও যে সময় উপস্থিত হইয়াছে বার্ডউড সাহেব তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন। এজন্য তিনি বিশেষরূপে তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। আরও অনেক ছোট বড় কারবারের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে বৃটীশ ধনীগণ ভারতে মূলধন নিয়োগ করিতে কি জন্য সঙ্কুচিত তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে, যে, ভারতের ব্যবসা সমূহের কথা অন্যান্য দেশের ন্যায় বিলাতের বাজারে বিশেষরূপে ঘোষিত হয় না। অথচ ভারতে যেরূপ গুপ্তধন নিহিত আছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর কোথাও সেরূপ নাই। তিনি বলেন যে অনেক ধনীর বিশ্বাস যে ভারত দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের লীলা ভূমি, তথাকার অধিবাসীরা রক্ষণশীল এবং জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান থাকায় কোন প্রকার নূতন উদ্যম সে দেশে সম্ভবপর নহে। তাহাদিগের এই সকল সংস্কার যে ভ্রান্ত বার্ডউড সাহেব তাহা প্রতিপন্ন করিয়া বলেন, যে ভারতের ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ এরূপ লোক লইয়া যদি কতকগুলি কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য যৌথ সমিতি সংগঠিত করিতে পারা যায় এবং যাহাতে বৃটিশ মহাজনেরা ভারতীয় কোন রাজপুরুষ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের মূলধন অল্পে অল্পে ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ে নিয়োযিত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে লর্ড কর্জ্জন যে একজন বাণিজ্য মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, বার্ডউড সাহেব তজ্জন্য তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে যাঁহারা মনে করেন ভারতের ব্যবসায়ে বৃটীশ মূলধন নিয়োগ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহারা যদি এখনও ঐরূপ নিদ্রা যান তাহা হইলে ভারতলক্ষ্মী অন্য কোন উদ্যোগী পুরুষের অঙ্কশায়িনী হইবেন।

ইংরাজ ধনীদিগকে ভারতের ব্যবসায়ে অনুরাগী করিবার জন্য বার্ডউড সাহেব অতি উজ্জ্বল বর্ণে এদেশীয় ব্যবসায়ের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি অতিরঞ্জিত হইলেও একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে এদেশে এখনও অনেক ব্যবসায় আছে, যাহা অবলম্বন করিলে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারা যায়। ইংরাজ ধনীগণ সেই সকল কারবারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে—ভারত ভূগর্ভনিহিত ধনরাশি লুণ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে—যদি ভারত সন্তানগণ নিম্নোল্লিখিত

হইয়া সেই ধন সংগ্রহে যত্নবান হন, তাহা হইলে তাঁহারা ক্রমশঃ সৌভাগ্য মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। বার্ড উড সাহেব যেমন বৃটিশ ধনীদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, আমরাও সেরূপ এদেশীয় ধনীবৃন্দকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য ধন অধিকার করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা সকল প্রকার নূতন চেষ্টার বিরোধী। সম্প্রতি একখানি বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকায় দেখিলাম, এদেশে যে দুই একটী যৌথ কারবার হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নানা প্রকার বিক্রপোক্তি করা হইয়াছে। লেখকের মতে অল্প মূলধনে যৌথ কারবার হইতেই পারে না। কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া জাহাজ ভাসাইয়া বিদেশ হইতে টাকা আনিতে না পারিলে যৌথ কারবার হয় না। এদেশে ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত যৌথ কারবারের কয়টাতে কোটি টাকা খাটিতেছে লেখক কি দেখাইয়া দিতে পারেন? অথচ, সেই সকল কারবারের অংশ এদেশীয়েরা গ্রহণ করিতেছেন, আর তাঁহারা নিজের তত্ত্বাবধানে যৌথ কারবার করিতে গেলেই যত দোষ! এই শ্রেণীর লেখকদিগের কথায় কোন শিক্ষিত লোকই নির্ভর করিবেন না, তাহা আমরা জানি। তবে তাঁহারা যে এতদ্দ্বারা দেশের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছেন তাহা বুঝাইবার জন্য ইহার উল্লেখ করিলাম। বিলাতের লোক যখন এদেশের ধন লুণ্ঠনে অগ্রসর, তখন দশে মিলিয়া তাঁহাদিগের সেই উদ্যোগ ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করাকি কর্ত্তব্য নহে? আমাদিগের বিশ্বাস ভারতের সুদিন সমাগত। যাঁহারা বাণিজ্য কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে সেই শুভদিন আনয়নের সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীতিনকড়ি মুখপাধ্যায়।

কোন্ প্রকৃতির জমির পক্ষে কিরূপ জল আবশ্যক।

১। বেলেমাটি—বেলেমাটিতে জল প্রবেশের পরিমাণ নির্গমের পরিমাণের সহিত প্রায় সমান। স্থানে স্থানে এক প্রকার বেলে মাটি দেখিতে পাওয়া যায় যাহার নিম্নস্তরে জল সর্ব্বদাই আবশ্যক থাকে। কুষ্টীয়া প্রদেশে কতকগুলি জমী এই শ্রেণীভুক্ত। বেলে মাটীতে জল প্রয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা কখন শুষ্ক হইতে না দিলেই শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা। এস্থলে মসক অথবা সিউনি ব্যবহার করাই প্রশস্ত।

১। আঁটাল মাটি—আঁটাল মাটি শুষ্ক হইয়া গেলে তাহাতে যেমন সহজে জল প্রবেশ করে না, তেমনি জল প্রবেশ করিলে তাহা শুষ্ক করা অতীব কঠিন। আঁটাল মাটির উপরিভাগ বেশ করিয়া চষিয়া দিলে তাহা হইতে জল সত্বরে বহির্গত হইয়া যাইতে পারে। বৃক্ষের মূল অধিক পরিমাণে জলসিক্ত হইলে বৃক্ষাণুস্থিত কোষগুলি যেরূপ ফুলিয়া উঠে মূল শুষ্ক হইলেও কোষগুলি তদ্রূপ শুকাইয়া যায়। তজ্জন্য বৃক্ষের পক্ষে অধিক জল অথবা অল্প জল কোনটিই মঙ্গলকর নহে। আঁটাল মাটি জলসিক্ত হইলে বিশেষ অপকার ঘটিতে পারে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আঁটাল মাটিকে দুই চারিবার কর্ষণ দ্বারা শুষ্ক করিয়া জল প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। আঁটাল মাটি সচরাচর বৃক্ষের পক্ষে তাদৃশ অপকারী নহে সুতরাং ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিলে আঁটাল মাটিতেও বৃক্ষাদি সুচারুরূপে জন্মিতে পারে।

৩। বোদমাটি—বোদমাটিতে অধিক জলের আবশ্যকতা নাই, সচরাচর আমাদের দেশে যে জলাজমী দেখা যায় তাহা অনুর্ব্বরা হইবার প্রধান কারণ এই যে বোদমাটির অঙ্গারক দ্রাবক বদ্ধ জলে পরিবর্ত্তিত হইয়া বৃক্ষাদির অপকার করিয়া থাকে সুতরাং বোদমাটিতে বদ্ধ জল থাকিতে দেওয়া অন্যায়।

৪। দোঁয়াসমাটি—দোঁয়াসমাটি কৃষিকার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক। যে সকল উদ্ভিদ আঁটাল অথবা বেলেমাটিতে সুচারুরূপে জন্মে না, দোঁয়াস-মাটিতে তাহারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মাটি দোঁয়াস। কোন কোন কৃষিবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের মতে এ দেশের মাটি ২০।৩০ হাত পর্য্যন্ত দোঁয়াস অথচ বেলে। ফলতঃ দোঁয়াস অথচ বেলে মাটিতে জল চুয়াইবার বিশেষ অসুবিধা হয় না। দোঁয়াস মাটিতে জল প্রয়োগের জন্য সিউনি অথবা ডোঙ্গা প্রশস্ত উপায়। যে স্থানের মৃত্তিকা জল হইতে অনেক পরিমাণে উর্দ্ধ, সেস্থলে লাঠা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দোঁয়াস মাটিতে বৃক্ষরোপণোপযোগী জলের অভাব অতি অল্পই অনুভূত হয়। সুতরাং ইহাতে জল প্রয়োগের জন্য অপরাপর জমীর ন্যায় তাদৃশ কষ্ট পাইতে হয় না।

অনেকস্থলে এরূপ মৃত্তিকা দৃষ্ট হইয়াছে যে তাহাতে জল লাগিলে শীঘ্র শুষ্ক হয় না এবং জল শুষ্ক হইয়া গেলেও মৃত্তিকা কর্ষণোপযোগী হয় না। এরূপ জমীকে কিয়ৎকাল পতিত রাখাই শ্রেয়ঃ, অথবা উহাতে এরূপ উদ্ভিদ রোপণ করা উচিত যে তাহার মূল মৃত্তিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে।

কৃষিক্ষেত্র সকল এরূপ স্থানে থাকা উচিত যে নিকটবর্ত্তী জলাশয় অথবা নদী হইতে ঐ স্থান উচ্চতর হয়। তাহা হইলে তাহাতে বন্যার সম্ভাবনা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ কৃষিক্ষেত্র এরূপ স্থলে অবস্থিত হইবে যে তথায় দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার অথবা তথা হইতে স্থানান্তরে আনিবার বিশেষ সুবিধা হয়। অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রশস্ত নদী, রেলওয়ে অথবা ষ্টীমার ষ্টেসন থাকা আবশ্যক। যেস্থানে এই দুইটীর অভাব সেস্থলে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হয় না। অনেকেই কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিবার সময় ইহা বিবেচনা করেন না। কিন্তু ইহা যে একটী প্রধান বিবেচ্য বিষয় তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ কৃষিক্ষেত্র এরূপ স্থলে থাকা আবশ্যক যে তথায় অনায়াসে ও অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে মজুর পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিদাস মিত্র,
কাশীপুর কৃষিশালা।

উদ্ভিদ জাতি।

মুকুল।

কাণ্ডোপরি বর্ত্তমান কতকগুলি অপরিপুষ্ট পত্রের গোছাকে মুকুল কহে। মুকুল প্রায় কাণ্ডের বর্দ্ধিষ্ণু স্থান সমূহে উৎপন্ন হয় এবং ইহা হইতেই বৃক্ষে নূতন কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র ও পুষ্প উৎপন্ন হয়। সপুষ্পক গাছের যে প্রথম কাণ্ড তাহাকে ভ্রূণ কলি কহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই কলি বৃদ্ধি পাইবে সাধারণতঃ ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রান্তে একটী মুকুল দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহাকে অন্ত্য মুকুল কহে। গাছের উর্দ্ধে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, এই অন্ত্য মুকুলের বৃদ্ধির উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

গাছের শাখা প্রশাখার নির্গমন, কাণ্ডের পার্শ্বস্থ মুকুলগুলির পূর্ণত্বের উপর নির্ভর করে। পাতার কোণ এবং কাণ্ডের গা হইতে কতকগুলি মুকুল বাহির হয় তাহাদিগকে কক্ষস্থ বা কাক্ষিক মুকুল বলে। গাছের বিস্তার প্রধানতঃ এই সকল কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে।

অন্ত্য এবং কাক্ষিক মুকুলগুলি উভয়েরই আকার অবিকল এক প্রকার, কেবল তাহাদের উৎপত্তির স্থান বিভিন্ন। উভয় মুকুলের মধ্যেই গাঁটের ব্যবধান স্থানগুলি অপ্রকাশিত এবং প্রথমাবস্থ পত্রনিচয় তন্মধ্যে সংলগ্ন থাকে।

শীত প্রধান দেশে এবং যে দেশে শীতের পরাক্রম বৎসরের কিছুকাল ধরিয়া অনুভূত হয়, মুকুলগুলি অতিশয় কোমল বলিয়া শীতের প্রচণ্ড পরাক্রম হইতে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। ইহার জন্য মুকুলের বাহিরেকার অংশ হইতে একটী আবরণ নির্গত হয়; তাহাকে মুকুল-শল্ক বলে। এই শল্ক বা আঁইসগুলি খোসার ন্যায় কঠিন এবং কখনও কখনও তাহাদের গায়ে আটাযুক্ত পদার্থ নিঃসৃত হইয়া তাহাকে আরও পুরু ও রক্ষা কার্য্যে কুশল করিয়া দেয়। কখনও বা সেই সকল আঁইস নরম রোমের দ্বারা আবৃত থাকে। এইরূপে এই সকল আঁইস মুকুলের অপরিপুষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল পত্র এবং বাহিরেকার বায়ু মণ্ডলের মাঝে জন্মিয়া আবরণের কার্য্য করে। এই সকল আঁইস উত্তাপ বহনে অপটু এই জন্য বাহিরেকার প্রচণ্ড উত্তাপ বা শৈত্য অন্তঃস্থিত কোমল পত্রগুলির বৃদ্ধির অন্তরায় হইতে পারে না অথবা তাহাদিগকে ধ্বংশ করিতে সক্ষম হয় না।

উষ্ণপ্রধান দেশে অথবা যে সকল দেশে শীতের পরাক্রম তত প্রচণ্ড হয় না, মুকুলগুলির এরূপে শীতের পরাক্রম হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন আবরণের প্রয়োজন হয় না, এইজন্য তাহাদের আঁইসের আবশ্যক হয় না। সেই কারণে মুকুলের সমুদায় পত্রগুলি এক প্রকারের হইয়া থাকে। এই সকল মুকুলকে আবরণহীন বা নগ্ন বলা যায়। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে বড় বড় বৃক্ষের মুকুলগুলি প্রায়ই নগ্ন হইয়া থাকে।

কাঁঠালের মুকুল বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আঁইস কিরূপ তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে। এই সকল আঁইস যে পত্রের অবস্থান্তর মাত্র, তাহার প্রমাণ এই যে ইহারা প্রকৃত পত্রের উৎপত্তি স্থান হইতে জন্মিয়া থাকে এবং ইহারা ক্রমশই আঁইস হইতে প্রকৃত পত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। দেবদারু জাতীয় উদ্ভিদে এই আঁইস পত্রাকৃতি এবং চম্পক ও ওক্ বৃক্ষে ইহা উপতৃণাকৃতি।

মুকুল মাত্রই কাণ্ড বা শাখার শৈশবাবস্থা মাত্র। ইহার মধ্যেই প্রকৃত শাখার সমস্ত অবয়ব গুলি ক্ষুদ্র ও অপরিপুষ্ট অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। অক্ষটী (Axis) এত ক্ষুদ্র থাকে যে সমুদয় পত্রগুলি স্থানাভাবে একত্র সমষ্টিভূত হইয়া উপর্য্যুপরি সজ্জিত থাকে। বসন্তের প্রারম্ভে বা বৃদ্ধি পাইবার সময় উপস্থিত হইলে এই সকল গাঁট গুলির ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতে থাকে সুতরাং পত্র গুলিও পৃথক হইয়া যায় এবং পরে সেই মুকুল একটী ক্ষুদ্র পত্রযুক্ত শাখায় পরিণত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে সকল পত্র স্থানাভাবে একত্রীভূত হইয়া গুচ্ছ ভাবে অবস্থান করিতেছিল ডাঁটার বৃদ্ধির সহিত সেই গুলি তফাৎ হইয়া যায়।

প্রায়ই দেখা যায় যে প্রথমে নির্গত কতকগুলি কাক্ষিক মুকুল শাখায় পর্য্যবসিত হয় না। বৃক্ষশাখার গোড়াকার পত্রের কোণে যে সকল মুকুল উৎপন্ন হয় তাহারাও বৃদ্ধি পাইয়া শাখায় পরিণত হয় না। কিন্তু যদিও তাহারা এরূপে শাখায়

পরিণত হয় না তথাপি তাহাদের শাখায় পরিণত হইবার ক্ষমতা লুপ্ত হয় না, এমন কি দুই এক বৎসর পরেও তাহারা প্রয়োজনানুসারে শাখায় পরিণত হইতে পারে। এই কারণে এই সকল মুকুলকে সুপ্ত মুকুল কহিয়া থাকে।

যেমন গাছের কাণ্ড হইতে শাখা নির্গত হইয়া থাকে তেমনি সেই সকল শাখার পত্রের কোণ হইতে আবার নূতন প্রশাখা নির্গত হইয়া থাকে। এইরূপে শাখার পুনঃ পুনঃ প্রশাখা নির্গত হইয়া বৃক্ষের বৃদ্ধি এবং বিস্তার হইয়া থাকে।

বৃক্ষের এইরূপ বৃদ্ধির ও বিস্তারের অতি সূক্ষ্ম নিয়ম ও ক্রম আছে। এই নিয়মানুসারে বৃক্ষকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যে বৃক্ষের অনেক শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া পরিধিতে বৃহৎ হইয়া যায়, যেমন আম, জাম, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ; দ্বিতীয়তঃ যে সকল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা নির্গত হয় না, কেবল মাত্র প্রান্তভাগেই পত্রাদি জন্মিয়া থাকে যেমন তাল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি। এইরূপ বৃক্ষের বিভিন্নতা মুকুলের সংখ্যা, বৃদ্ধির স্থান এবং বৃদ্ধি পাইবার উপায়ের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। যখন বৃক্ষের কাক্ষিক মুকুল অর্থাৎ কাণ্ডের কক্ষদেশ হইতে সমুৎপন্ন অথবা পত্রোৎপত্তির কোণ হইতে উদ্ভূত মুকুল বৃদ্ধি পাইয়া শাখায় পর্য্যবসিত হয় তখন ক্রমে বৃক্ষটী শাখা প্রশাখাধারী বিস্তৃত হইয়া বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু যখন ঐ সকল কাক্ষিক মুকুল পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় না, কেবল মাত্র অন্ত্য মুকুলই বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন বৃক্ষটী কেবল মাত্র উচ্চদিকেই বাড়িতে থাকে, তাহার আর শাখা নির্গত হইবার উপায় থাকে না।

প্রথম জাতীয় বৃক্ষের দুই প্রকারে শাখার নির্গমন হইতে পারে। প্রথমতঃ অন্ত্য মুকুলটীর বৃদ্ধির সহিত কাক্ষিক মুকুলেরও বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহাই সাধারণ বৃক্ষে দেখা যায়। কতকগুলি গাছে অন্ত্য মুকুলটী অপেক্ষা কাক্ষিক মুকুল অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং পুনরায় সেই সকল শাখার অন্ত্য মুকুল অপেক্ষা কাক্ষিক মুকুলের বৃদ্ধি প্রবলতর হইয়া থাকে।

কতকগুলি গাছে অন্ত্য মুকুলটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া সমান তেজে বাড়িতে থাকে এবং তাহা হইতে নানা শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল শাখা প্রশাখার আধিক্য বৃদ্ধি হেতু গাছের দুই পার্শ্বের শাখার বিস্তারের তারতম্য দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন গাছে অন্ত্যমুকুলটীর একেবারেই স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না অথবা কোন কোন গাছে ঐ মুকুলটী শীত বা উষ্ণাধিক্য হেতু বা কোন অনিষ্টহেতু একেবারেই পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। তখন পার্শ্বস্থ কাক্ষিক মুকুলদ্বয় অধিক তেজের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। পরে এই দুইটী শাখাকে অন্ত্যমুকুল হইতে উৎপন্ন শাখা বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ শাখা নির্গমনের ক্রমকে নিয়ন্ত-নির্গমন (Cymose) বলা যায়।

কখন কখনও অন্ত্য মুকুল বা কাক্ষিক মুকুল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেলে পর একটী শাখা অপরটী অপেক্ষা অধিকতর তেজের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এমন কি সময়ে সময়ে একটী শাখা একেবারেই বাড়িতে পারে না। তখন বর্দ্ধিত শাখাটীকেই গাছের মূল কাণ্ডের বর্দ্ধিতাংশ এবং দুর্ব্বল শাখাটীকে প্রবল শাখার একটী ক্ষুদ্র অঙ্গ বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু বস্তুতঃ দুইটীই এক স্থান হইতে উৎপন্ন এবং কেহই কাণ্ডের বর্দ্ধিতাংশ নয়, কেবল কাণ্ডের একটী অঙ্গের (মুকুলের) বর্দ্ধিতাংশ মাত্র। এইরূপ বৃদ্ধিকে একপদী বা Sympode বৃদ্ধি বলা যায়। মুকুলের কোন্ বিভাগটী দুর্ব্বল বা প্রবল হইবে তাহা বলা সুকঠিন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে ইহার একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। প্রথমতঃ একটী গাছের দুইটী শাখা নির্গত হইলেও, ডানদিকের শাখাটী ক্রমাগতই প্রবল হইতে পারে এবং বামদিকের শাখাটী দুর্ব্বল ও অপুষ্ট হইয়া বৃদ্ধি না পাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ ক্রমাগত একদিকের বৃদ্ধি ও অপর দিকের লোপ না হইয়া পর্য্যায়ক্রমে দক্ষিণদিকে বৃদ্ধি ও বাম দিকে লোপ অথবা বাম দিকে বৃদ্ধি ও দক্ষিণ দিকে লোপ হইতে পারে।

দ্বিতীয় জাতীয় বৃক্ষে ক্রমশঃ অন্ত্য মুকুলটীরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাদের কাক্ষিক মুকুল পুষ্ট, বর্দ্ধিত বা বিকশিত হয় না। এই কারণ এই সকল বৃক্ষ ক্রমাগত উচ্চ দিকে বাড়িতে থাকে।

উহাদের কাণ্ডের পার্শ্বদেশ হইতে চক্রাকারে পত্র বহির্গত হইয়া থাকে এবং গাঁটের ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে নারিকেল, খেজুর, তাল, সুপারি প্রভৃতিতে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় সমুদায় একবীজদলসম্পন্ন গাছই এইরূপ। এই সকল গাছের বৃদ্ধি একদিকে সীমাবদ্ধ বলিয়া ইহাদিগের ডগাটী কাটিয়া দিলে আর অন্যান্য কাক্ষিক বা আস্থানিক প্রভৃতি মুকুল নির্গত হইয়া গাছকে বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হয় না।

ইহা হইতে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, শাখা প্রশাখার নির্গমন, বৃক্ষের পত্রোৎপত্তি এবং তাহার কোণে মুকুলের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অনেক সময় কাক্ষিক মুকুলগুলি যথারীতি পুষ্ট হয় না এবং সেইজন্য বর্দ্ধিতও হইতে পারে না, আবার সময়ে সময়ে নূতন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষের বৃদ্ধির নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া দেয়।

যথেষ্ট আলোকের অভাবে অথবা অনেকগুলি গাছ পরস্পর সন্নিবিষ্ট হইলে অথবা অনুর্ব্বরা জমিতে জন্মিলে, অনেক গাছের মুকুল নষ্ট হইয়া যায়, অথবা বৃদ্ধি না পাইয়া অকালে মরিয়া যায়। কোন কোন জাতিতে স্বাভাবিক কারণে স্থানে স্থানে মুকুল উৎপন্ন হয় না। দেবদারু জাতীয় গাছে পাতা গুলি শাখার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু তাহাদিগের কোণ হইতে চক্রাকারে ডাল নির্গত হয় না। কাণ্ডের একস্থানে চক্রাকারে সমস্ত ডালগুলি উৎপন্ন হয় এবং দুইটী ডালের চক্রের মধ্যস্থান হইতে আর ডাল নির্গত হয় না। কতকগুলি মুকুল অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে সেই গুলি এক কালীন শাখায় পর্য্যবসিত হয় বলিয়া শাখাগুলিকে বৃক্ষকে অতি সুন্দর রূপে বেষ্টন করিতে দেখা যায়।

যে সকল মুকুল পত্রের কোণ হইতে বা আন্তারিক স্থান হইতে উৎপন্ন না হইয়া যথা তথা অনিয়মিত রূপে জন্মে তাহাদিগকে আস্থানিক বলা যায়। যখন বৃক্ষের তেজ একটু অধিক হইয়া তাহা অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখনই প্রায় এই সকল মুকুল উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদের তেজ ও বৃদ্ধি পাইবার উপযোগী আলোকাধিক্য প্রভৃতি সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মগুলি অনুকূল হইলে বৃক্ষের বৃদ্ধি এত সত্বর হইয়া থাকে যে উৎপাদিত মুকুলগুলির দ্বারা বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয় না। এইজন্য বৃক্ষের যথা তথা এই সকল আস্থানিক মুকুল নির্গত হইতে থাকে।

প্রাকৃতিক নিয়মগুলির অবর্ত্তমানে আমরা বৃক্ষের ডগা বা বর্দ্ধিত স্থান গুলি ছাঁটিয়া দিলে ঐ রূপ আস্থানিক মুকুলের নির্গমন দেখিতে পাই।

এই সকল মুকুল বৃক্ষের সর্ব্ব অঙ্গেই উৎপন্ন হইতে পারে। মূলেও এই আস্থানিক মুকুল দেখা যায়, আমলকির মূলে ইহা দৃষ্ট হয়। ঐরূপ মূল কাটিয়া পুতিলে গাছ হয়। সজিনা গাছের মোটা ডাল কাটিয়া দিলে পুনরায় গাছের কাষ্ঠাংশ হইতে আস্থানিক মুকুল নির্গত হইয়া শাখা প্রশাখা উৎপন্ন করিয়া থাকে। পত্র হইতেও এই জাতীয় মুকুল নির্গত হইতে থাকে। Gesmora Hoya প্রভৃতি জাতির পত্রে জোর করিয়া মুকুল জন্মান যায়। প্রথমতঃ পত্রে একটা চোট মারিয়া ভিজা জমিতে পুঁতিয়া দিতে হয়। ইহাতে রৌদ্র ও হাওয়া লাগা আবশ্যক। পরে এই সকল চোট লাগার ধারে ধারে মুকুল উৎপন্ন হইয়া নূতন কাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারে। এই জন্য অনেক সময় ঐ জাতীয় গাছ এবং কমলা লেবু জাতীয় দুইএক প্রকার গাছ পত্রের সাহায্যে জন্মান যাইতে পারে। পাথর কুচি গাছে পাতার ধারে ধারে এই আস্থানিক মুকুল দেখা যায়।

গাছের ডগা ছাঁটিয়া দিলে কেবল যে আস্থানিক মুকুলের নির্গমন হইয়া এবং তাহা বৃদ্ধি পাইয়া গাছটী ঝোপ বাঁধিয়া যায় তাহা নহে; ইহা ছাড়া কাক্ষিক মুকুল ও অনেক সুপ্ত মুকুলও তাহার সহিত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আস্থানিক মুকুল গুলি উহাদের অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে এবং ইহাতে প্রায়ই পত্র আইস দেখা যায় না। গাছের শাখা প্রশাখা নির্গমন কেবলমাত্র কাক্ষিক মুকুলের দ্বারা সম্পাদিত হয় না। ইহা ছাড়া প্রত্যেক কাক্ষিক মুকুলের পাশে একটী দুইটী বা তিনটী নূতন মুকুল ধারে ধারে বা উপর্য্যুপরি নির্গত হইতে দেখা যায়। ইহাদিগকে অতিরিক্ত মুকুল কহে। Willow জাতিতে এইরূপ তিনটি মুকুল পাশাপাশি নির্গত হইয়া থাকে এবং তাহ

হইতে ততগুলি শাখা জন্মিয়া থাকে। দেশী বাদাম গাছে কাক্ষিক মুকুলগুলি উপর্য্যুপরি সজ্জিত থাকে এবং প্রায়ই তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমস্থিত মুকুল হইতেই শাখা নির্গত হয়, অন্যগুলি মরিয়া যায়; এই জন্য শাখাটী একটু বড় হইলে আমরা তাহাকে পাতার ঠিক কোণ হইতে উদ্ভূত হইতে না দেখিয়া একটু উপর হইতে নির্গত হইতে দেখি। Tartarian Honey-suckle গাছে প্রকৃত কাক্ষিক মুকুল হইতে মোটা শাখাটী নির্গত হয় এবং অন্যান্য অতিরিক্ত মুকুলগুলি তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা উৎপন্ন করে। Larch এবং ash গাছে এই মুকুলগুলি প্রত্যেকে বিভিন্ন শাখা উৎপন্ন না করিয়া সকলগুলি মিশিয়া গিয়া একটী মোটা চ্যাপটা শাখা উৎপন্ন করে। Cuscuta গাছে পত্রের কোণে কাক্ষিক মুকুলটী অনেক ভাগে বিভাগ হইয়া যায়, তখন সেগুলিকে অতিরিক্ত মুকুল বলিয়া ভ্রম হয়। দেবদারু জাতীয় উদ্ভিদে বহু সংখ্যক পত্র মুকুল এক সঙ্গে বাহির হয়। ইহারা শাখায় পরিণত হইলে তাহাদিগকে গুচ্ছ শাখা বলে।

শাখা পাতার কোণ হইতে বা তাহার কিঞ্চিৎ উপর বা নিম্ন হইতে বা পাশ হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু Moss জাতীয় গাছে তাহার পরিবর্ত্তে শাখা পাতার অক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। কখনও বা পাতাটী একেবারেই উৎপন্ন হয় না কিন্তু তাহার কোণ হইতে শাখাটি নির্গত হইয়া যায়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মুকুলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বোঁটায় স্থানাভাবে পত্র গুলি উপর্য্যুপরি গুচ্ছ ভাবে সজ্জিত থাকে। যতদূর সম্ভব অল্প স্থান অধিকার করিবার জন্য পাতাগুলি নানা ভাবে সজ্জিত থাকে। মুকুলের মধ্যস্থিত সমস্ত পত্র গুচ্ছ গুলির সজ্জা একপ্রকার, আবার গুচ্ছটীর প্রত্যেক পত্রের সজ্জা আর একপ্রকার।

প্রত্যেক পত্রের অবস্থান প্রকার নানা রূপ হইতে পারে। প্রথমতঃ পত্রটী একেবারেই কুঞ্চিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ পত্রটি একটু ভাঁজ হইয়া যাইতে পারে। এই ভাঁজ নানা প্রকার হইয়া থাকে। টিউলিপ (Tulip) গাছে মুকুলস্থ পাতার মাঝখানে ভাঁজ হইয়া যায় এই জন্য পাতাটী যোপাট হইয়া অবস্থান করে; তাহাতে পাতার ডগাটী গোড়ার নিকট আসিয়া পড়ে, ইহাকে মুলিকাগ্র কহে। ওক, চাঁপা, বিলাতী গাছের পাতাগুলি পুস্তকের পৃষ্ঠার ন্যায় ভাঁজ হইয়া থাকে, ইহাকে মুদ্রিত কহে। দ্রাক্ষা লতার পাতা গুলি কাগজের হাত পাখার ন্যায় ভাঁজ হইয়া থাকে, তাহাকে কঞ্চিত পত্র বলে। কুলগাছের মুকুলেও এইরূপ দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ পত্রটী ভাঁজ না হইয়া নানা প্রকারে গুটাইয়া যাইতে পারে। Fern জাতির পাতা ডগা হইতে গোড়ার দিকে ফিতার ন্যায় গুটাইয়া যায়। ইহাকে মধ্যাগ্র পত্র কহে; কারণ, পত্রের অগ্রভাগ মধ্যস্থলে অবস্থিত করে। কলাগাছের কচিপাতা বা কচুর মাঝ একধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত গুটাইয়া যায়; ইহাকে বাতির ন্যায় দেখায় বলিয়া উপবর্ত্তিক কহে। পদ্ম জাতিতে পাতার দুইধার মধ্য শিরা পর্য্যন্ত গুটাইয়া যায়। পাতার উপর পিঠে এইরূপ জড়ান হইলে শিরার উভয় পার্শ্বদেশে দুইটী বাতি বা শলিতার ন্যায় দেখিতে হয় বলিয়া তাহাকে দ্বিবর্ত্তিক কহে যেমন কাঁটাল পত্রের দেখা যায়। করবী গাছের পাতার দুইধার ঐরূপ মধ্য শিরার দিকে গুটাইয়া যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে উক্তরূপ জড়ান অপর পৃষ্ঠায় হয় বলিয়া তাহাকে বি-দ্বিবর্ত্তিক কহে।

অতঃপর পত্রগুলি পরস্পর কিরূপে সজ্জিত থাকে দেখা যাউক। ইহা প্রধানতঃ তিন প্রকার। প্রথমতঃ, পাতা গুলি পরস্পরের সহিত না ঠেকিয়া থাকিয়া স্বাধীন ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পাতা গুলির ধার পরস্পরের সহিত কেবল মাত্র ঠেকিয়া থাকে তাহাকে প্রান্তিক কহে। তৃতীয়তঃ, একটী পাতা তাহার উপরের পাতার একটী ধারকে চাপা দিতে সক্ষম হয়। কলকে ফুলের পাপড়ী দেখিলে ইহা বেশ বুঝা যাইবে।

কখন কখন একটী মুকুলে পত্রগুলি পরস্পর ঠেকিয়া থাকিলেও পত্রের বৃদ্ধি হেতু ধারে যথেষ্ট চাপ পড়ে এবং তাহাতে স্পর্শকারী পত্র দুইটীর ধার ভিতর দিকে দুমড়াইয়া যায়। তখন তাহার অন্তঃসংবৃত অবস্থা বলে। মুকুলাভ্যন্তরস্থ পত্রগুলি দুইটী পংক্তিতে সজ্জিত হইলে পত্রগুলি মুদ্রিত

হইয়া একটী পত্র তাহার সম্মুখীন পত্রকে আলিঙ্গন করে এবং ঠিক ঘোড়ায় চড়ার মত দেখায় বলিয়া তাহা রোহক বলিয়া অভিহিত হয়। যদ্যপি ঐরূপ সম্মুখীন পত্রের একটী প্রান্ত মাত্র আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় তখন তাহাকে অর্দ্ধরোহক বলা যাইতে পারে।

শ্রীবিরিঞ্চিমোহন কর।

ময়ূরভঞ্জের খনিজ ধন।

[ইংরাজী প্রবন্ধ* হইতে সঙ্কলিত]

উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূ-তত্ত্ব-বিষয়ক অবস্থা এতাবৎ ভূতত্ত্ববিদগণের সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। অদ্যাবধি কোন ভূতত্ত্ববিদই তথাকার কোন তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই। গত ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৪ মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমি তথাকার কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করি। এই পরিদর্শনের ফল নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

ময়ূরভঞ্জের কতক অংশ শৈলময় ও কতক সমতল ভূমি; আমি প্রধানতঃ প্রথমোক্তরূপ স্থান সকলই পরিদর্শন করিয়াছি। এই স্থানের পরিমাণ প্রায় ২৪০০ বর্গমাইল। ইহার কতক অংশ খাস ময়ূরভঞ্জের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে এবং কতক অংশ বামনঘাটী ও পাঁচপীর মহকুমায় অবস্থিত।

সমতল প্রদেশের অতি অল্প স্থানই আমি পরিদর্শন করিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করিবার নাই; তবে এস্থলে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক মনে করিতেছি। ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদনগরের প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে মোলিয়া নামক স্থানে বড়বালাং নদীগর্ভে এক প্রকার চুণাপাথর দেখা গেল, তাহার রং কতক হরিদ্রাবর্ণ ও কতক হরিদ্রার আভাযুক্ত কপিশ। এই পাথরে অষ্ট্রিয়া (Ostræa) জাতীয় প্রস্তরীভূত কঙ্কাল (Fossils) অনেক পরিলক্ষিত হইল। আমি উহা ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টের ভূতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারী পিলগ্রিম সাহেবের পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কোন পরিচিত অষ্ট্রিয়া (Ostræa) জাতীয় কঙ্কালের সহিত উহার সৌসাদৃশ্য দেখেন নাই। তাঁহার মতে উহার কতকটা Ostræa Multicostata জাতীয় কঙ্কালের সহিত সাদৃশ্য আছে। বেলুচিস্থানের নারীনদীর গর্ভে যে এক প্রকার এই জাতীয় কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল ইহা অনেকটা তাহারই মত। পণ্ডিচারী হইতে খাসিয়া পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মধ্যে পূর্ব্বভারতের কোন স্থানেই গণ্ডোয়নার পরবর্ত্তী কঙ্কাল সংযুক্ত পাহাড় অদ্যাবধি দেখা যায় নাই, সুতরাং ময়ূরভঞ্জের বড়বালাং নদীগর্ভস্থ এই নবাবিষ্কৃত প্রস্তর ভারতের ভূতত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই রাজ্যের সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলার যতটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহাতে আমার অনুমান হয় যে মোলিয়ার ন্যায় সেখানেও এইরূপ কঙ্কালময় স্তর দেখা যাইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে এখানকার ভূগর্ভে যে সকল ধাতু দেখিলাম তাহার বিষয় বলিতেছি।

লৌহ।

লৌহের আকরই ময়ূরভঞ্জের প্রধান খনিজ ধন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এরূপ বিস্তীর্ণ ও ধাতুপূর্ণ লৌহ খনি অল্পই আছে। বামনঘাট বিভাগের নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়:—

১। গুরুমৈশানী পাহাড়ের পাদদেশে ও সানুদেশে প্রায় ৮ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে পূর্ব্বাংশ ব্যতীত উহা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইল।

২। স্কারন্দাপীর নামক স্থানের বাঁধগাঁয়ের নিকটে।

৩। সুলাইপত-বাদামপাহাড় শ্রেণীর পাদদেশে ও পার্শ্বে। এই স্থানটী বামনঘাটী বিভাগের দক্ষিণ প্রান্তে কণ্ডাড়িরা হইতে যৈধানপোশী পর্য্যন্ত প্রায় ছয় ক্রোশ ব্যাপী।

পাঁচপীর বিভাগের সিমলী পাহাড়ের প্রান্তদিয়া যে শৈল শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পাদদেশ পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের অনেক স্থানেই লৌহের আকর পরিদৃষ্ট হইল। কাঁসদাবেদী ও কনতিকনা

* NOTES ON THE GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES OF MAYURBHANJ—By P. N. Bose, B. SC., F. G. S., *Late Deputy Suptdt, Geological Survey of India.*

হইতে ঠাকুর মুণ্ডা পর্য্যন্ত এই স্থানটী প্রায় ২৫ মাইল।

খাস ময়ূরভঞ্জে গুড়গুড়িয়ার নিকট সীমলি পাহাড়ের কতকগুলি স্থানেও লোহার খনি দেখা গেল। এই সকল লোহা মৃত্তিকা ও প্রস্তরের সহিত চাপ বাঁধা অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোহার চাঁই বা চাপ কতক লাল বর্ণের Hæmatite এবং কতক গাঢ় ধূসর বর্ণের Magnetite. এই শেষোক্ত প্রকারের লৌহ গুরুমৈশানি পাহাড়ের পাদদেশ ও পার্শ্বদেশে, যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কোলাই-শিলার দক্ষিণ পূর্ব্বে, সুন্দলের পূর্ব্ব দিকে এবং কোটাপিঠির নিকটেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বামন ঘাটী ও পাঁচপীর বিভাগের আকরের লৌহ হইতে শতকরা ৬০।৬৫ ভাগ পরিষ্কৃত লৌহ বাহির হইতে পারে।

এই সমস্ত আকর হইতে কি পরিমাণ লৌহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব। কিন্তু বোধ হয় ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে এখানে যদি হালি গালাই করিবার হাপর কয়েকটী স্থাপন করা যায় তাহাহইলে উহা চিরদিনই সমান চলিতে পারে, কোন দিন মালাভাব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সিনী-ঘাটশিলা ষ্টেশন হইতে এই সকল খনিতে সহজে যাওয়া যায়। আর যদি ২৫।৩০ মাইল রেলপথ লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে গুরুমৈশানীর আকরের নিকট পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

এই সকল আকরের সন্নিকটে অনেকগুলি গালাইকর বাস করে। তাহারা যে লৌহ প্রস্তুত করে, লোকে তাহার যথেষ্ট আদর করে। কিন্তু তাহাদিগের হাপর বড়ই ছোট এবং তাহারা যে জাঁতা ব্যবহার করে তাহা কোন কাজেরই নহে। ভারতের আর কোথাও আমি এরূপ কমজোর জাঁতা ব্যবহার করিতে দেখি নাই। এই কারণে গালাইকরেরা যাহা সহজে গলে এরূপ আকরের লৌহই গালাই করে। ইহাতে প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নহে। এই সকল গালাই-করকে আমি কয়েক খণ্ড ধূসর বর্ণের চৌম্বক লৌহ (magnetite) দেখাইয়া ছিলাম। তাহারা বলিল উহা পাথরমাত্র এবং ধাতুর হিসাবে সম্পূর্ণ রূপে অকর্ম্মণ্য!! এখানকার অনেক স্থানে লাল ও হরিদ্রা বর্ণের মাটী (Red and yellow ochre) দেখিলাম। এই সকল মাটিতে স্থানীয় সাঁওতালেরা তাহাদিগের গৃহাদি রঞ্জিত করিয়া থাকে। কলিকাতায় এ মাটী চালান দিতে পারিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা।

খাল ভুমের প্রান্তে মৈলাম ঘাটী নামক স্থানে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত গন্ধক (Iron pyrites) দেখা গেল।

ম্যাঙ্গানীজ।

খাস ময়ূরভঞ্জ কুলিয়ানার নিকটে লেটারাইট প্রস্তরে (Laterite) ম্যাঙ্গানীজের চিহ্ন দেখিলাম তবে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না।

সুবর্ণ।

সুবর্ণরেখা নদী ময়ূর ভঞ্জের উত্তরপ্রান্তে প্রবাহিত, তদ্ব্যতীত বামনঘাটীতে কদকৈ ও বোড়াই নামে দুইটী নদী আছে। এই কয়টী নদীতেই মাটী ধুইয়া সোণা বাহির করা হইয়া থাকে। এইরূপ প্রণালীতে সোণা বাহির করা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নাই। তবে সপগোরা ও কুদের-সাইয়ের নিকটে বোড়াই নদীতে যাহা দেখিয়াছি এস্থলে তাহা বিবৃত করিতেছি। এখানকার প্রায় দুইবর্গ মাইল পরিমাণ চর ভুমি অল্লাধিক পরিমাণে সুবর্ণ-প্রসূ। এই স্থানের প্রায় পঞ্চাশ ঘর লোক এই মাটী ধুইয়া সোণা বাহির করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই মৃত্তিকার উপরিভাগে যথেষ্ট সোণা আছে। বৎসর বৎসর বর্ষাকালে যে ধোয়াট আসে তাহাতেই বোধ হয় উপরিভাগে অধিক পরিমাণে সোণা পড়িয়া থাকে। উহারা উপরিভাগের মাটীমাত্র চাঁচিয়া নদীর জলে তাহা ধুইতে থাকে এবং তাহা হইতে সোণা বাহির করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। স্থানে স্থানে টুকরা টুকরা স্বর্ণ সংযুক্ত প্রস্তর খণ্ডও দেখা গেল; কিন্তু এরূপ টুকরা আধ তোলার বেশী ওজনের কোথাও দেখিতে পাই নাই।

যে চর ভুমিতে সোণা থাকে তাহা দেখিতে ঈষৎ কটা বর্ণের এবং উপরিকার স্তর খুব পাতলা রূপে বিস্তৃত। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এই স্তরের দুই ফিট নীচে পর্য্যন্ত সোণা আছে।

গোদিয়া নদী ও তাহার শাখার নিকটবর্ত্তী রুয়ালী ও গোধাজনগিরির পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে একটী স্থান আছে সেখানেও সোণা দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানটি কুদারসই-সাপগোরার নিকট, কেবলমাত্র মধ্যে একটি পাহাড়ের ব্যবধান। এখানে প্রায় ১২ ফিট হইতে ১৫ ফিট পর্য্যন্ত মাটির নীচে সোণা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সোণা প্রস্তর ও বালুকাময় কর্দ্দমে মিশ্রিত। গোদিয়া নদীর একটি শাখা আছে তাহার নাম বণিজ বরণ। এই নদীতীরস্থ মৃত্তিকা ধৌত করিয়া দেখিলাম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে অতি উৎকৃষ্ট স্বর্ণ রহিয়াছে। এইরূপ সুবর্ণ সংযুক্ত প্রস্তর খণ্ড এখানে দুই তিন তোলা ওজন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় বিশ ঘর লোক এইরূপে সোণা বাহির করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কখন কখন ধালভূম হইতেও এখানে এই সোণা বাহির করিবার জন্য লোক আসিয়া থাকে। এই ব্যবসা যে বেশ লাভজনক ও অনায়াসসাধ্য তাহা যাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। ইহারা অতি সামান্য রকমের হাতিয়ার ব্যবহার করিয়া থাকে। যদিও উল্লিখিত চরভূমির অনেক নীচে পর্য্যন্ত সোণা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানকার লোক কেবলমাত্র উপরি-ভাগের স্তর ধুইয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। আমি এক স্থানে দেখিয়াছি যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচের স্তরেই উৎকৃষ্ট স্বর্ণ রহিয়াছে; কিন্তু তাহারা সে কথা জানে না এবং জানিলেও সে জন্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত নহে। যখন উপর কার মাটি চাঁচিয়া যাহা বাহির হয় তাহাতেই সংসার চলে, তখন আর অধিক পরিশ্রম করা তাহারা আবশ্যক মনে করে না।

উন্নত প্রণালীতে এই সোণা বাহির করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা লাভজনক হইবে কি না তাহা বিস্তৃতরূপে পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বলা যায় না। আমি সেরূপ পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাই নাই। বর্ষাকালই এইরূপ পরীক্ষা করিবার প্রশস্ত সময়। সে সময় নদী সকল জলপূর্ণ থাকাতে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়।

অভ্র।

বামনঘাটী বিভাগে মাইবেরী ও ডিভিং নামক স্থানে অভ্র আছে। কিন্তু যেখানে যেখানে খনন করিয়া দেখিয়াছি কোথাও বড় আকারের অভ্র দেখিলাম না। কোথাও দুই তিন ইঞ্চি অপেক্ষা বড় দেখিতে পাওয়া গেল না। এজন্য আমার মনে হয় তথায় বৃহদায়তন অভ্র আদৌ নাই।

খাস ময়ূরভঞ্জের নিকট শিরসা, বনগাঁরপসী ও জামগড়িয়াতে অভ্র আছে। শেষোক্ত স্থানটি আশাজনক বলিয়া মনে হইল। শঙ্করাই নদীর তীরে অনেক দূর পর্য্যন্ত অভ্রের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। উপরিভাগ খনন করিয়া আট ইঞ্চি ও তদূর্দ্ধ মাপের পর্য্যন্ত অভ্র পাইয়াছি। বিশেষ পরীক্ষার জন্য এখানে খনন কার্য্য চলিতেছে।

চূণা পথর।

বামনঘাটী বিভাগের রণগম, অসুরঘাটী, শুক-মৈশানী পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে, গুড়গুড়িয়ার পশ্চিমস্থ সীমলী পাহাড়ে এবং পাঁচপীর বিভাগের অলকাদের নামক স্থানে চূণা পাথর আছে।

বিবিধ।

বারিপদের নিকট লেটারাইট (Laterite) পাথরের নীচে এক প্রকার মাটি আছে তাহা চীনা বাসন করিবার বেশ উপযোগী। এতদ্ব্যতীত আসবেষ্টস্ (Asbestos) ওপাল (Opal) প্রভৃতি অনেক খনিজ পদার্থও কোন কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম। বাসনের উপযোগী পাথরও অনেক স্থানে আছে। খাস ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কুলিয়ানাতে ছুরি কাঁচি শানাইবার পাথর ও জাঁতা তৈয়ার হইয়া থাকে। বামনঘাটীর কোন কোন স্থানে আগেট (Agate) জ্যাস্পার (Jasper) প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তরও যথেষ্ট পরিমান আছে।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু, বি,এস সি; এফ, জি,এস।

শ্রীলশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতি তথা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ
বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত
সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৩ ও ৩৩ নং ফৌজদারী-বালাখানা, কলিকাতা।

অশ্বগন্ধা রসায়ন।

অকাল বার্দ্ধক্যের মহৌষধ।

কালের কুটিল মাহাত্ম্যে—নিজের কপাল দোষে, কর্ম্মবশে, জলবায়ুর দূষিত রসে—লোকে কত কষ্ট পায়: সুখের সংসার শোকের কাল-কারাগার। অকাল বার্দ্ধক্য—অকাল মৃত্যুর প্রভাব কিসে নিবৃত্তি পায়?

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

ভগ্নদেহে, মগ্ন প্রাণে—নূতন সুঠাম; লাবণ্য-জড়িত, পীযূষ-পূরিত, শোভাময় নবীন গঠন; আশা,— উল্লাস,— আনন্দের যৌবন-জোয়ার। কতদিন পরে—আবার কত দিন পরে আঁধার ঘরে বাসন্তী পূর্ণিমা রজত ধারে, আনন্দ মকরন্দের সৌরভ-সারে, চারিধারে সুধা ঢালিবে; শূন্য পিঞ্জর কাকলীরবে আবার মুখরিত হইবে।

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

জ্বরে—অনাচারে—অত্যাচারে—আহার বিহারের দোষে বারে বারে কত কষ্ট সহিলে; আজি প্রমেহ, কালি ধাতুদৌর্ব্বল্য, পরশ্ব শ্বাসকাস;—বারমাস দুঃখ—কষ্ট—যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কত বাজে ঔষধ ব্যবহার করিলে। কিন্তু কি ফল হইল? যাতনা বিগুণ বাড়িল; আঁধার ঘোরতর হইল! এইবার—

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

দেখিবে ইহার মোহিনী শক্তি। ইহ ইন্দ্রজাল নহে, ভোজবাজী নহে। ঋষিবর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ জীবনীয় ঔষধ অশ্বগন্ধার বীর্য্য হইতে বিশুদ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত

অশ্বগন্ধা রসায়ন।

ইহা স্বাস্থ্য-সংস্থাপক, রক্ত-সংশোধক, শুক্রজনক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও আগ্নেয়। সেইজন্য ইহা শুক্রতারল্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য শোণিতবিকার ও ক্ষুধামান্দ্যের মহৌষধ। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তির পরিচয় পাইবে;—তরলশুক্র আবার গাঢ় ও ওজস্বী হইবে, ক্ষীণ পেশী ও স্নায়ুতন্ত্র যৌবনের উদ্যমে তেজে আবার দৃঢ় ও কঠিন, সবল ও কর্ম্মঠ হইবে, নিষ্ক্রিয় যন্ত্র ও ইন্দ্রিয় সকল আবার সত্বর কার্য্য-তৎপর হইয়া সংসার সুখময় করিয়া তুলিবে। একবার—

অশ্বগন্ধা রসায়ন—ব্যবহার কর।

ইহা ছাত্রদিগের মহোপকারী; কারণ ইহা মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং অধিক অধ্যয়ন-জনিত কষ্ট ও দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া দেয়।

অশ্বগন্ধা রসায়ন—স্ত্রীদিগের রজঃ ও জরায়ু দুষ্টি, মৃতবৎসাদোষ ও প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া শরীর ও জরায়ু সুস্থ ও সবল করে।

মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ দেড় টাকা।

অঃ ভিঃ পিঃ ২/০ দুই টাকা এক আনা।
৩ শিশির মূল্য ৩৸০ তিন টাকা বার আনা।
১২ শিশির মূল্য ১৫৲ টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অপরের কথা কি বলিব

বঙ্গের প্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন যাহা বলিয়াছেন, একবার দেখ; তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন
শ্রীযুক্তবাবু আদ্যনাথ বসু এল, এম্‌, এস,
ডাক্তার মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"মহাশয়ের আবিষ্কৃত "অশ্বগন্ধারসায়ন" নানা-স্থানে ব্যবহার করাইয়া যেরূপ আশাতীত ফল পাইয়াছি, তাহাতে আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইহা "শারীরিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।" অধিকন্তু ইহা দ্বারা প্রমেহের এবং মূত্রকৃচ্ছ্রেরও বিশেষ উপকার হয়।"

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন, চিকিৎসক।
১৪৩ নং ফৌজদারী-বালাখানা, কলিকাতা।

কলার চাষ।

কলার চাষ এদেশে একেবারে নাই তাহা নহে। একটু জমী থাকিলে প্রায় সকল গৃহস্থই তাহাতে দুই একটা কলা গাছ রোপণ করিয়া রাখেন। কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালা দেশের এবং আসামের অনেক স্থানের জমী কলা গাছ রোপণের পক্ষে যেরূপ উপযোগী, উহার চাষ বর্ত্তমানেই যেরূপ লাভজনক আছে এবং একটু চেষ্টা যত্নদ্বারা যেরূপ অতিরিক্ত লাভজনক হইতে পারে, তাহাতে এবিষয়ে যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল বলিয়া মনে হয়।

জমির উপযোগিতার কথা মনে হইলে আমাদের দেশে এখন কলার যে চাষ আছে তাহাকে চাষ বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয় না। যাহাকে আমরা এত তাচ্ছিল্য করি একটু ব্যবসা বুদ্ধি খাটাইয়া ভিন্ন দেশের লোকে তদ্দ্বারা কি পরিমাণ অর্থ উৎপাদন করাইয়া লয়, তাহার একটা উদাহরণ দিলে পাঠক অতি সহজেই উভয় দেশের চাষের তারতম্য বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

১৮৬৮ সালে বেকার নামক জনৈক আমেরিকাবাসী ব্যবসায়ী জ্যামেকা দ্বীপের সহিত কারবার করিতেন। জ্যামেকা আমেরিকার ভূভাগ হইতে জাহাজে চারি দিনের পথ। অর্থাৎ এখান হইতে রেঙ্গুন যতদূর আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে জ্যামেকা দ্বীপও প্রায় ততদূর। বেকার সাহেব দেখিলেন জ্যামেকায় প্রচুর পরিমাণে কদলী উৎপন্ন হয় এবং তথায় ইহার মূল্যও অতি সামান্য। তাঁহার স্বদেশবাসী আমেরিকাণেরা যে অত্যন্ত কদলীপ্রিয় তাহাও তিনি অবগত ছিলেন। যদি কোন উপায়ে জ্যামেকা হইতে কদলী অবিকৃত অবস্থায় আমেরিকায় লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহা হইলে এই ব্যবসা হইতে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে তিনি সহজেই বুঝিলেন। ইচ্ছা ও চেষ্টায় জগতে কোন কার্য্য অসম্পন্ন থাকে না। শীঘ্রই ঐ উপায় স্থির হইল এবং তিনি জ্যামেকা হইতে কদলী রপ্তানী আরম্ভ করিয়া দিলেন। অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের আলস্য বা অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন ইচ্ছা পরিহার মানসে তাহাদিগকে উপযুক্ত বেতন দিতে লাগিলেন এবং তাঁহারাও সাধ্যানুযায়ী ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ফলে এই হইল যে এইরূপ প্রচুর ব্যয় সত্ত্বেও বেকার যথেষ্ট লাভবান হইলেন। ব্যবসা বিস্তৃতির সহিত ১৮৮৭ সালে তিনি "বষ্টন ফ্রুট কোম্পানি" (Boston Fruit company) নামক একটী যৌথ কারবার খুলিয়া নিজে উহার জ্যামেকাস্থিত সমস্ত কার্য্যের পরিদর্শক স্বরূপ রহিলেন। কোম্পানির কার্য্য এত সুন্দররূপে চলিতে লাগিল ও ফলের কাটতি এত অধিক হইয়া পড়িল যে, উপর্য্যুক্ত সময়ের অল্প দিন পরেই তিনি বাধ্য হইয়া দুই মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থাৎ তিন কোটি টাকা মূলধন করিয়া "ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি" নামে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর আর একটী কোম্পানি স্থাপন করতঃ ইউনাইটেড ষ্টেট্স অর্থাৎ যুক্ত রাজ্যের সমস্ত বন্দরে কদলী ও অন্যান্য ফল সরবরাহ আরম্ভ করিলেন। কোম্পানির ৪০টি পৃথক পৃথক বাগান ২,৫০,০০০ আড়াই লক্ষ বিঘা জমি দখল করিয়া আছে। এই সকল জমির অধিকাংশই কোম্পানির নিজ সম্পত্তি, সামান্য অংশ দীর্ঘকালের জন্য জমা করিয়া লওয়া হইয়াছে। টেলিফোনদ্বারা সকল বাগানগুলি এণ্টনিয়োর অবস্থিত প্রধান কর্ম্মচারীর বাগানের সহিত সংযুক্ত। আবশ্যকানুযায়ী বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত ১৬ খানি নিজের বাণিজ্যপোতে কোম্পানির সমস্ত মালামাল জ্যামেকা হইতে নিউইয়র্ক, বষ্টন প্রভৃতি নগরে প্রেরিত হয়। এইরূপে প্রতিবৎসর ৫ কোটি ছড়া কদলী ও ১০ কোটি নারিকেল রপ্তানী হইয়া থাকে। আমেরিকার আদিম নিবাসী নিগ্রো ও পূর্ব্বদ্বীপ হইতে আনীত মজুরদিগের দ্বারা চাষবাস সম্পর্কীয় সমস্ত কাজ সমাধা হয়। নিগ্রোগণ অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত বলিয়া শেষোক্ত মজুরদিগকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাগানের কাজের জন্য আনা হইয়াছে এবং সদ্ব্যবহারের গুণে তাহারা নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ এই অচিন্তনীয় প্রকাণ্ড ব্যাপারের যে দিকে তাকান যায় সেই দিকেই সুশৃঙ্খলা, নিয়ম, বন্দোবস্ত, সততা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ও সদ্বিবেচনার একটী সজীব মূর্ত্তি নয়ন পথে পতিত হয়। আমেরিকার লক্ষ লক্ষ প্রাণী এই মহদনুষ্ঠান দেখিবার জন্য বৎসর বৎসর জ্যামেকা দ্বীপে গমন করিয়া থাকে।

বিদেশীর নিকট থাকি, পাঠক দেখিবেন। যে কদলী আমাদের দেশে নিতান্ত উপেক্ষিত, স্থানান্তরে তিন কোটি টাকা মূলধন লইয়া তাহারই ব্যবসায় পরিচালিত! কলার ব্যবসায় যেরূপ ক্ষুদ্র আকারে আমাদের দেশে বিদ্যমান আছে তাহাতেও কাহারও লোকসান হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। পরন্তু বৈদ্যবাটী, সেওড়াপুলি, সিঙ্গুর প্রভৃতি স্থানে যেখানে কলার একটু বিস্তৃত চাষ আছে সেখানকার অনেক গৃহস্থ কেবল মাত্র ইহাকেই উপজীবিকা করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সামান্য উদ্যোগে কিরূপে এই ব্যবসায় পরিবর্দ্ধিত করা যায় আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে কলার চাষের বিষয়ে আমরা দুই একটী কথা বলিব। আমাদের দেশের লোকদের স্বভাব যে, তাঁহারা কোন বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস পান না। সকল জিনিষই "চলতি গোছের" সম্পন্ন করিতে পারিলেই ছাড়িয়া দেন। স্বভাবের এই দোষে আমাদের সর্ব্বনাশ হইল। জমিদারের জমিদারী ১০ বৎসর পূর্ব্বে যে খাজনা আদায় করিত এখন তাহা অপেক্ষা এক কপর্দ্দক অধিক করে না; চাষীর ক্ষেত্র ২০ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ শস্য উৎপাদন করিত এখন তাহা অপেক্ষা অল্প ভিন্ন বেশী শস্য উৎপাদন করে না; ব্যবসায়ী পূর্ব্বে যে ব্যবসা যেমন ভাবে করিতেন, এখন তাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র উন্নত প্রণালীতে কি বিস্তৃত ভাবে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা দেখা প্রায় আমাদের ভাগ্যে ঘটে না; অপর কথায় কাজকি যাঁহারা শিক্ষিত ও শিক্ষাভিমানী এবং (Learned profession) অর্থাৎ উচ্চশিক্ষামূলক ব্যবসায়ে রত আছেন বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন যদি সেই উকীল ব্যারিষ্টার ডাক্তার বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "মহাশয় বিগত দশ বৎসরের মধ্যে আপনাদিগের ব্যবসায় সম্বন্ধে যে সকল নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কতগুলি আপনি পড়িয়াছেন" তাহা হইলে অনেককেই অধোমুখ করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা যেখানে আছি সেই স্থানেই থাকিতে ভাল বাসি; অগ্রসর হইতে আমরা চাই না। বর্ত্তমান কালে যখন সকল পদার্থই বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক গতিতে চলিয়াছে তখন যিনি অগ্রসর না হইবেন তিনি যে বহুপশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের এই স্থিতিশীলতা বা জড়তা—শারীরিক ও মানসিক উভয় বিধিই কিসে দূর হয় তাহা সকলেরই চিন্তনীয়। যাহা হউক আমরা এখন যাহা বলিতে ছিলাম তাহাই বলি। কদলীর চাষে যাঁহারা রত আছেন তাঁহারা এবিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ ও যত্ন করেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কোন বিস্তীর্ণ কদলী ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তথায় গাছগুলির যেরূপ পাইট হওয়া উচিত তাহা হয় না। অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পল্লীগ্রামে গোয়াল ঘরের অনতিদূরে স্থাপিত কদলী বৃক্ষগুলি সাধারণতঃ সতেজ ও বৃহৎ এবং তাহাতে অধিকাংশ স্থলে ১॥০ দেড় হাত হইতে ২ হাত পর্য্যন্ত কাঁদি পড়িয়া থাকে এবং কলা গুলিও অপেক্ষাকৃত হৃষ্ট পুষ্ট ও বড় হয়। বিস্তৃত ক্ষেত্রের সকল গাছগুলিই প্রায় অনতিদীর্ঘ এবং কাঁদি ও ফলগুলি সেই পরিমাণে ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ। ঐ সকল কাঁদিগুলি ৷৶০ তিন পোয়া হইতে ১ হাত ঊর্দ্ধ ৷১ পোয়া হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং ফলগুলিও অপেক্ষাকৃত অপুষ্ট ও সরু হয়। চাষের অপকৃষ্টতা ও সার প্রদানের অব্যবস্থাই যে এই বৈষম্যের কারণ তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরগুলির মধ্যে কোন একটী স্থানে জনৈক ভদ্র কদলী ব্যবসায়ীর সহিত এ বিষয়ে আমার কথা বার্ত্তা হয়। তাঁহার ১৬/০ বিঘা করিয়া দুইটী কদলীক্ষেত্র আছে। সার প্রদানের ব্যবস্থা যে তাঁহার বাগানে নাই তাহা নহে। ঐ বাগান দুইটী হইতে বার্ষিক খরচ খরচা বাদে তিনি ৭০০৲ ৮০০৲ টাকা পাইয়া থাকেন, তাহা ও বলিলেন। উন্নত প্রণালীতে চাষের ও সারের ব্যবস্থা করিলে, তিনি হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান অপেক্ষা ২০০৷২৫০৲ টাকা বেশী পড়িতে পারে এবং জল তুলিয়া দিবার জন্য একটী (Pump) পম্পের প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে আরও ৭০০৷৮০০৲ টাকা বেশী লাভ হইতে পারে, তিনি এইরূপ বলেন। Pump প্রতি বৎসর কিনিতে হয় না

একবার কিনিয়া রাখিলে অনেক দিন চলে। উহার দামও ১০০।১৪৫৲ টাকার বেশী হইবে না। সুতরাং যে কার্য্যে ২৫০৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিলে ৭০০।৭৫০৲ টাকা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা না করা কিরূপ অবিবেচনার কার্য্য তাহা সকলেই অনুমান করিবেন। কিন্তু আমাদের আলস্য বা জড়তাবশতঃ আমরা কিছুতেই তাহা করিব না। চাষের এই দুরবস্থা যে কতদিনে আমাদের দেশ হইতে দূর হইবে তাহা কে বলিতে পারে? জমীকে উৎকৃষ্টতর প্রণালীর চাষের দ্বারা অধিক ফলপ্রসূ করিতে পারিলে নানারূপে সুবিধা হয়। উহাতে আবাদের খরচ অনেক অল্প পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পর্য্যবেক্ষণের জন্য অল্প সময়ের প্রয়োজন সুতরাং এবং উদ্বৃত্ত সময় ক্ষেত্রস্বামী অন্য কার্য্যে যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ উদ্বৃত্ত জমী অন্য কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত জমির সচ্ছলতা দিন দিন ঘুচিয়া যাইতেছে। এখন জমির উৎপাদিকা শক্তি কিসে বৃদ্ধি হয় সেই দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

চাষের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি যেমন আমাদিগের কোন নজর নাই, ব্যবসা বিস্তারের জন্য তদ্রূপ আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ড জর্ম্মাণীতে কদলী রপ্তানি হইয়া থাকে, আর আমাদের গৃহদ্বারে সুবৃহৎ বিক্রয় স্থান থাকিলেও আমরা তথায় উহা লইয়া গিয়া তথাকার অধিবাসিদিগের অভাব মোচন পূর্ব্বক নিজেরা লাভবান হইবার চেষ্টা করি না। সরস দোয়াঁস মৃত্তিকা কদলী বৃক্ষোৎপত্তির প্রধান অবলম্বন; নিম্ন, পূর্ব্ব ও পূর্ব্বোত্তর বঙ্গেই ঐরূপ জমীর প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই কারণেই তত্তৎস্থানে সুচারু ফল উৎপাদিত হইয়া থাকে। হুগলী জেলা পার হইয়া বর্দ্ধমান জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশাভিমুখে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, স্বভাবজ মৃত্তিকার জন্য কদলীর ততই অবনতি দেখা যায় এবং তজ্জন্য তথাকার চাষী কদলী রোপণ লাভজনক ব্যবসায় নহে বলিয়া উহাতে রত হয় না। অথচ ঐ সকল দেশে কদলীর আদর অন্য কোন স্থান হইতে কম নহে। সাহেবদিগের ত কথাই নাই; হিন্দু মুসলমান কে না কদলীভক্ত সুতরাং কদলীর অনাদর কুত্রাপি নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই কারণে পশ্চিম অঞ্চলে যতই কেন কদলী রপ্তানি করা যাউক না উহা কখন অবিক্রীত থাকিবে না। বর্ত্তমান সময়ে সামান্য পরিমাণ কদলী বৈদ্যবাটীর হাট হইতে ক্রয় করিয়া আসানসোল, রাণীগঞ্জ এবং তদূর্দ্ধ কিছু দূরের রেলওয়ে ষ্টেশনগুলিতে প্রেরীত হয় ও কেবল রেলযাত্রীদিগের ব্যবহারের জন্য দুর্ম্মূল্যে বিক্রীত হয়। ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদিগের সুবিধার জন্য যদি তথাকার বাজারাদিতে রীতিগত ভাবে প্রেরীত হয় তাহা হইলে আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ঐ সকল স্থানে লাভজনক দরে বিক্রয় না হইয়া থাকিতে পারে না। আর এইরূপ বিক্রয় স্থানের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। এলাহাবাদ, কানপুর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী পর্য্যন্ত কেন এইরূপ ব্যবসায় চালাইতে পারা যাইবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অধিক পরিমাণে মাল পাঠাইলে রেলওয়ে কোম্পানি সহজেই ভাড়া এত কমাইয়া দিবে, যাহাতে মাল রপ্তানির পক্ষে যে প্রতিবন্ধক বর্ত্তমান থাকা সম্ভব তাহা দূরীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু সে চেষ্টা, সে যত্ন, সে উদ্যম কোথায়? সে সতর্কতা কোথায়? সে নূতন পথ আবিষ্কার বাসনা কোথায়? একজন যাহা করিয়া তপস্যা করিয়াছে, তাহার আর আবশ্যক আছে কি না, এবং থাকিলেও উহাতে কৃতকার্য্য হইবার ক্ষমতা আমার আছে কি না, তাহা সম্যক বিবেচনা না করিয়া, আমি উহার নিকটেই প্রতিদ্বন্দ্বী কারবার খুলিয়া উভয়ের ক্ষতি করিব, কিন্তু তথাপি নূতনের দিকে যাইতে সাহস আমাদের জাতির কুলাইবে না। এইরূপে আমাদের দেশের যে কত অর্থ সামর্থ্য নষ্ট হইতেছে তাহা অবর্ণনীয়। তাহার কিয়দংশ যদি উপার্জ্জনের নূতন উপায় অবলম্বনে নিযুক্ত হইত, তাহা হইলে তদধিকারীর এবং দেশের অনেক উপকার হইত।

ফল বিক্রয়ই বাঙ্গালীর ব্যবসায় বিস্তৃতির একমাত্র উপায় নহে। অনেকের আশঙ্কা হইতে পারে অধিক মূলধনে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র করিলে উৎপন্ন ফলের সংখ্যা এত অধিক হইতে পারে যে যিনি অন্য স্থানে ব্যবসাকেন্দ্র খুলিয়া ঐ সকল ফল কাটাইবার আয়োজন করিবার ইচ্ছা না করেন, তাহার ফল,

কাটতির অভাবে পড়িয়া নষ্ট হইবে ও তদ্দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। অল্প মূলধনে কাজ করিলে এই আশঙ্কার একটু কারণ থাকিলেও যাঁহারা অধিক মূলধন লইয়া কারবার করিতে চাহেন, তাঁহাদের এইরূপ ভীত হইবার কারণ দেখা যায় না। সুপক্ব ফলের কাটতি কম হইলে, উহাকে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া ময়দা করিলে সহজেই বিলাতী সওদাগরদিগের নিকট বিক্রয় করা যাইতে পারে। ফল সবজি প্রভৃতি শুকাইবার কল আবিষ্কার হওয়াতে বর্ষাকালে রৌদ্রের অভাবে কল শুকাইবার ব্যাঘাত ঘটিবার ভয় নাই। ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বে বায়না লইয়া পরে চূর্ণ প্রস্তুত করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও বিলাতী সওদাগর ১০০ টন অর্থাৎ ২৭০০ শত মণ কদলী চূর্ণের বায়না লইয়া উহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি যে দর দিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকিলেও, যাহারা সাধারণতঃ ফাঁকি প্রস্তুত করে তাহারা বা অন্য কোন উপযুক্ত লোক ইহার প্রতি মনোযোগ করেন নাই। চেষ্টা করিলে সহজেই এই ফাঁকির শত শত টনের ক্রেতা পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং কল পচিয়া ধনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার আশঙ্কাও কতকটা অমূলক বলা যাইতে পারে।

কেবল ফলের উপরই কদলী ব্যবসায়ের সমস্ত লাভ নির্ভর করে না। কদলীর কোন অংশও নষ্ট হইবার নহে। কদলীর আঁশ হইতে উৎকৃষ্ট বস্ত্র হইতে পারে। ঐ আঁশ বস্ত্র বয়নের উপযোগী কি না তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। Eastern Landing Forwarding Co. Aloe fibre প্রস্তুতের জন্য তিন শত টাকা মূল্যের যে কল আনিয়া বিক্রয় করিতেছেন, উহাতে প্রস্তুত "কলার বাসনার" সূতাও আমরা দেখিয়াছি। উহা মজবুত, সূক্ষ্ম, মসৃণ ও চিক্কণ এবং অনেক অংশে উৎকৃষ্ট Aloe fibreএর ন্যায়। আমাদের বিশ্বাস কলার আঁশ অতি সত্বরেই উপযুক্ত কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার উপায় নির্দ্ধারণ হইবে। যে ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা এত অধিক তাহার প্রতি আমাদের যে আদৌ লক্ষ হয় না ইহাই আশ্চর্য্য। যদি কেহ এ বিষয়ে কোন সংবাদ জানিবার অভিপ্রায়ী হয়েন কমলা আফিসে জানাইলে, আমরা সাধ্যমত তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা পাইব।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়।

সোরা।

আদমসুমারীর রিপোর্টে প্রকাশ যে প্রায় ৫ লক্ষ লোক সোরার কারবারে নিযুক্ত। সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে লবণাক্ত পদার্থ হইতে সোরা উৎপন্ন হয়, তাহা কত প্রাণীতে মিলিত হইয়া যে প্রস্তুত করে তাহা কোন প্রকার গণনার দ্বারা স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব। সকলেই অবগত আছেন যে সোরা ভূমধ্যে জন্মিয়া থাকে; কিন্তু মৃত্তিকাতে উহা কিরূপে আবির্ভূত হয় তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। যে ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) নামক জীবাণু জগতের ধ্বংশ কার্য্যে নিযুক্ত, লক্ষ লক্ষ সেই জীবাণু মানবের অর্থাগমের জন্য মৃত্তিকা মধ্যে সোরা প্রস্তুত করিবার জন্য অনবরত পরিশ্রম করিতেছে। জল বায়ুর বিশেষ অবস্থায় যেমন ভিজা অথচ খর তাপে ও অম্লজানপ্রবণ বায়ুতে অথবা অন্ধকারযুক্ত স্থানে এই সকল সূক্ষ্ম জীবাণু পাহাড়াদির বিশেষ উপাদানে ও তাহা মনুষ্য পুরীষের সহিত মিলাইয়া তাহাকে Potassium nitrate বা সোরাতে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। প্রায় বর্ষাকালেই এই লবণাক্ত পদার্থ জন্মিয়া থাকে এবং শুষ্ক ঋতুতে উহা ভূমির উপরি ভাগে ফুটিয়া বাহির হয় ও তথায় ক্রমে ক্রমে শক্ত হইয়া লোণা মাটিতে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই সোরা জন্মিয়া থাকে। পঞ্জাব এবং যুক্ত প্রদেশে ও বাঙ্গালার গঙ্গা নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহা বিশেষ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালার বিহার অঞ্চলস্থ, সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, মুঙ্গের, দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় স্থানে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে যত সোরা রপ্তানি হয়, তাহার প্রায় দশ আনা অংশ প্রথমোল্লিখিত তিনটী স্থান হইতে আমদানী হইয়া থাকে। কাশ্মীর, পাতিয়ালা ও রোহিল খণ্ডের রামপুর রাজ্যেও অল্পাধিক পরিমাণে সোরা পাওয়া যায়। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশের কোন কোন স্থানেও উহা দেখিতে

পাওয়া যায় এবং সম্প্রতি মাদ্রাজ প্রদেশের কোই-ম্বাটোর, কৃষ্ণা ও ত্রিচিনপল্লীতেও উহা বাহির হইয়াছে।

লোণামাটি হইতে সোরা বিবিধ উপায়ে প্রস্তুত হয়। এই উভয় প্রথাই বিলক্ষণ সহজ। একটি প্রথা এই যে, লোণামাটি জলে মিশাইয়া উহা অনেকবার ধুইয়া ও ছাঁকিয়া সোরা বাহির করা হয়। অপর প্রথায় ঐ জল-মিশ্রিত লোণামাটি রৌদ্রের তাপে বা অগ্নির উত্তাপে রাখা হয়, পরে উত্তাপে জল শুকাইলে সোরা বাহির হয়। নুনিয়া বা লুণিয়া নামে কতকগুলি জাতি পশ্চিমাঞ্চলে এই কার্য্য করিয়া থাকে, অনেক স্থানে অন্য জাতিও সোরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। যে লবণাক্ত মৃত্তিকায় সোরা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কার্ত্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, বর্ষা আরম্ভ হইলে আর সেই মৃত্তিকা সংগ্রহ করা যায় না। ঐ মৃত্তিকা আধ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি পরিমাণ কোদাল দিয়া চাঁচিয়া তোলা হয়, কোথাও কোথাও বা ভাঙ্গা হাঁড়ি বা অন্য খোলা দ্বারাও চাঁচা হইয়া থাকে। যে জমিতে সোরা থাকে, তাহা চাঁচিবার পূর্ব্বে সরকার হইতে রীতি-মত অনুমতি লইতে হয়। যে পরিমাণ ভূমি চাঁচিবার অনুমতি দেওয়া হয় তাহার অধিক চাঁচিলে দণ্ড ভোগ করিতে হয়। সোরার মাটি হইতে লবণও বাহির হইয়া থাকে বলিয়া, এ বিষয়ে এত কড়া নিয়ম। লোণামাটি চাঁচা হইলে উহা গো-মহিষাদির পৃষ্ঠে কারখানাতে চালান দেওয়া হয়। কারখানায় উপরিলিখিত প্রথায় বড় বড় কটাহে মাটি জ্বাল দিয়া বা রৌদ্রে রাখিয়া দানা বাঁধা সোরা বাহির করা হয়। মাটি জ্বাল দিয়া প্রথমে যে সোরা বাহির হয় তাহাকে কাঁচা সোরা বলে, ইহাতে শতকরা ৫০ ভাগ খাঁটি সোরা থাকে।

এই কাঁচা সোরাকে আবার "রিফাইন" করা হয়। এই কার্য্য প্রায় কলিকাতায় অথবা বড় বড় সহরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতার উল্টা-ডিঙ্গী, বেলগেছে প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে সোরা "রিফাইনের" কারখানা আছে। এই সকল কারখানায় ইষ্টক নির্ম্মিত বড় বড় চুল্লীতে, বড় বড় লৌহ পাত্রে, সোরা জ্বাল দেওয়া হয় এবং উহা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টবে ঢালিয়া দানা বাঁধিবার জন্য রাখা হয়। কটাহে সোরা জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইলে যখন উহার তাপ একটি নির্দ্দিষ্ট ডিগ্রীতে উঠে, তখন উহা নামাইয়া রাখা হয়। ঐ সকল দানা চুনিয়া বাহির করা হয় এবং উহাতে যে জলীয় ভাগ থাকে তাহা বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই "রিফাইন" সোরা পাকা সোরা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সোরা "রিফাইন" হইলে যে সিটা বাহির হয় তাহা ঠিক খাইবার লবণের মত। সেই জন্য অনেক লবণের মহাজন ঐ "সিটা" ক্রয় করিয়া লবণের সহিত মিশাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই "সিটা" খাইবার জন্য যদি বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে উহার জন্য গবর্মেণ্টকে, লবণের যে মাশুল ধার্য্য আছে, সেই মাশুল দিতে হয়।

সকলেই অবগত আছেন এদেশে আতস বাজীর জন্য, যথেষ্ট পরিমাণ সোরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সোরা ব্যবহৃত হইত। ইছাপুরের বারুদের কারখানায় জন্য প্রতি বৎসর বহু পরিমাণ উৎকৃষ্ট সোরা গৃহীত হইত। য়ুরোপ ও মার্কিণেও যথেষ্ট রপ্তানি হইত। এক্ষণে টোটা (Cartridge) ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া আজকাল বারুদ তৈয়ার হয় না এবং গব-র্মেণ্ট আর সেরূপ সোরা ক্রয় করেন না। কিন্তু খাটি nitric acid ও nitro glycerine প্রস্তুত করিবার জন্য নীলগিরির Cordite Factory তে অনেক সোরা প্রয়োজন হইয়া থাকে। জমীতে সার দিবার জন্য যে সোরা ব্যবহৃত হয়, তাহা সকলেই জানেন। সোরাতে জমীর উর্ব্বরতা কিরূপ বৃদ্ধি হয়, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সমূহে গবর্মেণ্ট তাহার পরীক্ষা করিতেছেন। তামাক, অহিফেন ও আর দুই একটি ফসলের জন্য এদেশীয় কৃষকেরা চিরকাল সোরায় সার দিয়া থাকে। যদিও গবর্মেণ্ট রাইয়তদিগকে সোরা-সার ব্যবহারের উপকারিতা বুঝাইতেছেন, তথাপি ইহা ব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহারা তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। ইহার আর একটি দোষ আছে। যথা সময়ে উহা জমিতে প্রয়োগ না করিলে সুফল লাভ হয় না। অতএব কোন সময়ে কিরূপে সোরা সার ব্যবহার করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় কৃষকদিগকে সবিশেষ বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ হইতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মণ সোরা

রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৯০১-২ সালে ৩,৫৪,৪০১ হন্দর রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯০২-৩ সালে ৪১০৬২২ হন্দর রপ্তানি হইয়াছিল এবং গত বর্ষে ৩,৯৮,১১৪ হন্দর হইয়াছে। মরিচ দ্বীপে ইক্ষু ক্ষেত্রের জন্য যথেষ্ট গোয়া চালান হয়।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

সেকাল আর একাল।

৺রাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গদেশে বিজাতীয়তা ও ইংরাজানুকরণ-প্রিয়তার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল তখন এই গ্রন্থ সেই স্রোতকে জাতীয়তা ও হিন্দুত্বের দিকে পরিচালিত করিতে বিশেষ সহায়তা করে। এই গ্রন্থে বঙ্গ সমাজের সেকালের অবস্থার সহিত একালের অবস্থার তুলনা করিয়া সমীচীন ভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে সুবিজ্ঞতা ও সুরসিকতার সুন্দর সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ইহা যেমন কৌতুকাবহ ও আমোদকর, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজী সংবাদ পত্রে ইহার প্রশংসা-পূর্ণ সমালোচনা পাঠ করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড নর্থব্রুক নিজ ব্যয়ে ইহার ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া লয়েন। অনেক দিন এই গ্রন্থ প্রচার সম্বন্ধে কোন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, তজ্জন্য বর্ত্তমান কালের অনেকেই ইহা পাঠ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

মূল্য ৷৹ আনা মাত্র। ডাকমাশুল /৹।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।

৺রাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

বঙ্গ সমাজে চিন্তা, ভাব ও মত সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। সেই অল্প সংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" উচ্চ স্থান অধিকার করে। যে সময়ে এই গ্রন্থ প্রচারিত হয় তখন সর্ব্বদেশে হিন্দুধর্ম্ম নিকৃষ্ট ও হীনধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। এই গ্রন্থেই সর্ব্ব প্রথমে এই সত্য প্রতিপাদিত হয় যে পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ প্রচারের পর হইতেই এদেশের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। এই গ্রন্থ প্রচারের কয়েক বৎসর পরে থিওসফিষ্ট দলের আবির্ভাব হয়। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা, অধ্যাপক মোক্ষমূলার, তদানীন্তন কালের ভারতের প্রধান সংবাদপত্র "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার" সম্পাদক জেমস্ রুটলেজ সাহেব এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য ও গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় "এডুকেশন গেজেট" সংবাদ পত্রে এই গ্রন্থ সমালোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম্মরূপ তরণী জলমগ্ন হইতেছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাহার কাণ্ডারী হইয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গদর্শনে" এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া বলেন, "রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।" হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এক্ষণে পৃথিবীর নানাদেশে যে শ্রদ্ধা ভক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, এই বাঙ্গলা গ্রন্থ তাহার অন্যতম কারণ। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয়। এরূপ গৌরবের সামগ্রী বঙ্গের গৃহে গৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত।

মূল্য ৷৹ আনা মাত্র; ডাকমাশুল /৹

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু;

৺রাজনারায়ণ বসুর বাটী, বৈদ্যনাথ দেওঘর, এই ঠিকানায় মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

ফটোগ্রাফি।

মনুষ্য মরিয়া গেলে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কাহার না ইচ্ছা হয় তাহার মৃত আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে পাইলে দেখে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক অসাধ্য ও বিস্ময়কর কার্য্য সাধিত হইয়াছে। আমরা আজকাল সকলেই বায়স্কোপ যন্ত্র দেখিয়াছি। ঐ যন্ত্রের মহিমা জানিতে কাহারও অবিদিত নাই; বায়স্কোপের সাহায্যে আমরা মনুষ্যের গমনাগমনের প্রতিলিপি দূরবর্ত্তী টেমস নদীর আশ্চর্য্য সেতু, দিল্লীর দরবার কলিকাতায় বসিয়া প্রত্যক্ষ দৃশ্য করিতে পারি। ধন্য বিজ্ঞান তোমার মহিমা! জীবিতাবস্থায় মনুষ্যের গমনাগমনের, অঙ্গভঙ্গীর ফটোগ্রাফি সাহায্যে ছবি তুলিয়া রাখিলে, আলোকযন্ত্রের অদ্ভুত ক্ষমতায় বায়স্কোপে তাহা যে কোন সময়ে অবিকল প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। আবার ফনোগ্রাফ সাহায্যে মনুষ্যের স্বরের অনুকরণ করা যায়। এই দুই যন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্যের মৃত্যুর পরও তাহার স্বরের প্রতিরূপ শব্দ ও তাহার অবিকল অঙ্গ ভঙ্গীমা দর্শন করা যাইতে পারে। ফটোগ্রাফি বায়স্কোপের মূল। আমরা ফটোগ্রাফির উৎপত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ফটোগ্রাফির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিহাস। বয়াটবয়েন নামক জনৈক রসায়নবিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে রৌপ্য লবণে (Silver salt) সূর্য্যালোক পতিত হইলে কাল হইয়া যায়। প্রোফেসার সিল (Scheele) এই ক্রিয়ার প্রথম রাসায়নিক ব্যাখ্যা করেন। ১৮০২ সালে টমাস উড (Thomas wood) আলোক সাহায্যে প্রথম ছবি প্রস্তুত করেন। (Silver nitrate) সিলভার নাইট্রেট নামক রৌপ্য লবণ জলে দ্রব করিয়া ঐ জলে কাচ ও চর্ম্ম সিক্ত করিয়া তাহাতেই প্রথমে ফটোগ্রাফ তোলা হইত।

যে দ্রব্যের ফটোগ্রাফ তুলিতে হইবে তাহা মধ্যে রাখিয়া একদিকে (Silver nitrate) নামক লবণে সিক্ত কাচ ও অপর দিকে স্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া আলোক আসিবার বন্দবস্ত করা হইত। এইরূপ বন্দবস্ত করিলে কাচের উপর অভিনিক্ষিপ্ত বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয় ও কাচের অপর স্থানে আলোক পতিত হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়ায় কাল হইয়া যায় ও কেবল মাত্র পদার্থের প্রতিবিম্বপতিত স্থানে আলোকের কোন ক্রিয়া হয় না, সুতরাং সেই স্থান সাদা থাকে। এইরূপে কাল রঙের মধ্যে দ্রব্যের সাদা ছবি পাওয়া যাইত ঐ ছবি অবশ্য পদার্থের বিপরীত ছবি হইত। এইরূপে যে ছবি পাওয়া যাইত, তাহা সূর্য্যালোকে রাখা যাইত না কারণ তাহা হইলে সমস্ত কাচই কাল হইয়া ছবি লোপ পাইত, ঐ সকল ছবি বাতির আলোকে পরীক্ষা করা হইত। প্রোফেসার নিপসি (Nipce) যাহাতে ঐপ্রকার ছবি গুলিকে সূর্য্যালোকে চিরস্থায়ী করা যায় সে সম্বন্ধে ১৮১৪ সালে প্রথম অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। সূর্য্যালোকে অনাক্রান্ত রৌপ্য লবণ কাচ হইতে দূরীভূত করিবার কোন প্রক্রিয়া জানা ছিল না তাহাতেই সহজে চিরস্থায়ী ছবি পাওয়া যাইত না। ১৮২৬ অব্দে ডগারি (Daguere) সাহেব ফটোগ্রাফি সাহায্যে কাচের উপর পতিত ছবিগুলিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন। ১৮৩৯ সালে তিনি ঐ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া জগতে ঘোষণা করেন ও সেই নিয়ম প্রোফেসার ডগারি সাহেবের নাম বরাবর ডগারোটাইপ (Daguerrotype) বলিয়া অদ্যাবধি অভিখ্যাত।

ডগারোটাইপ নিয়ম:—এই নিয়মে পালিস করা একখণ্ড রৌপ্যনির্ম্মিত চওড়া পাতের উপর আয়োডিন বাষ্পে (Iodin vapour) সাহায্যে সিলভার আয়োডাইডের (Siiver Iodide) এর একটি পাতলা আবরণ রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়। এইরূপে প্রস্তুত রৌপ্যপতক ফটোগ্রাফি যন্ত্রের ক্যামেরা ভেদ করিয়া পতিত আলোকে লক্ষিত হয়। ইহাতে পতকের উপর অল্পক্ষণেই আলোকের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় কিন্তু পতকের উপর কোন দাগ হয় না। অথচ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব পতকের উপর অলক্ষিতভাবে থাকে। এক্ষণে ঐ পতক পারদ বাষ্পে রক্ষিত হইলে অলক্ষিত ছবি প্রকাশ পায় কারণ পারদের ছোট ছোট কণা যে যে স্থানে আলোক পতিত হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়াছে সেই সেই স্থানে লাগিয়া যায় এবং ছায়া পতিত স্থানে সিলভার আয়োডাইড

(Silver iodide) অনাক্রান্ত ভাবে থাকে তাহাতে পারদ বিন্দু সংলগ্ন হয় না। সোডিয়াম থায়োসালফেট (Sodium thiosulphate) জলে দ্রব করিয়া ঐ জলে উপর্য্যুক্ত রৌপ্যপতক ধৌত করিলে অনাক্রান্ত সিলভার আওয়োডাইড (Silver iodide) ধৌত হইয়া যায় এবং অভিলিপ্সিত পদার্থের সুন্দর প্রতিলিপি পাওয়া যায় ও ঐ ছবি সূর্য্যালোকেও নষ্ট হয় না।—এই নিয়মে প্রস্তুত ছবিকে ডগারোটাইপ প্রস্তুত ছবি বলে।

উক্ত ডগারোটাইপ প্রস্তুত প্রক্রিয়ার অনেক উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত ডগারোটাইপ প্রক্রিয়ায় ছবি তোলা হয় না উহা অপেক্ষা অনেক সহজ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এবং এক্ষণে ঐ সকলই প্রচলিত। মহাত্মা ফক্স ট্যাবল্ট (Fox Tabolt) এক নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন ঐ নিয়ম ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে প্রথম প্রচলিত হয়। উহাতে কাগজের উপর দ্রব্যের দীর্ঘকালস্থায়ী ছবি পাওয়া যায়। প্রথমে কাগজ লবণাক্ত জলে ভিজাইয়া পরে সিলভার নাইট্রেট দ্বারা ধৌত করিয়া ফটোগ্রাফিক যন্ত্রের ক্যামেরায় (Camera) স্থাপন করা হইত। এই নিয়মটিতে উত্তম ফটো পাওয়া যাইত না সুতরাং ইহা সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ নিয়ম বলা যাইত না। এই প্রকারে বিপরীত ছবি পাওয়া যাইত অর্থাৎ ছবির স্থানটি সাদা ও ক্যামরার অন্যান্য স্থান সাদা হইত। এই সকল ছবি লবণাক্ত জলে সিক্ত করিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী করা হইত। খৃঃ ১৮৪১ অব্দে প্রোফেসার টাবল্ট (Tabolt) এই নিয়মের উন্নতি করেন। তিনি কাগজ প্রথমে সিলভার নাইট্রেট সলিউসনে ডোবাইয়া পরে আবার ঐ কাগজ পোটাসিয়াম আওডাইড (Potassium Iodide) সলিউসনে ডোবাইতেন ইহাতে কাগজের উপর সিলভার আইডাইড নামক লবণের আবরণ পতিত হইত ও শেষে ঐ কাগজ ফটোগ্রাফিক ক্যামেরায় স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী ছবি পাওয়া যাইত। ঐ কাগজ ক্যামেরায় রাখিয়া আলোক দ্বারা আক্রান্ত হইলেও তাহাতে যে কোন রাসায়নিক কার্য্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পরে ক্যামরাকে সিলভার নাইট্রেড, এসিটিক অ্যাসিড (Acitic acid) ও গ্যালিক এসিড মিশ্রিত সলিউসনে রাখিলে ছবি ক্রমশঃ প্রকাশ পায় এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে ডেভলপমেণ্ট প্রসেস (Developtment process) বলে। এইরূপে প্রাপ্ত ছবিও বিপরীত ছবি হয় কিন্তু ঐ ছবিকে সাদা মোম দ্বারা আবরিত করিয়া স্বচ্ছ ছবি পাওয়া যায় ও সিলভার ক্লোরাইড (Silver chloride) ভিজান কাগজের উপর রাখিয়া সূর্য্যালোকে স্থাপন করিলে সুন্দর পসিটিভ (Positive) ছবি পাওয়া যায় এ ছবিতে ছবি খানিই কাল হয় ও অন্য স্থান সাদা থাকে। আমরা বাজারে যে সকল ফটোগ্রাফির ছবি দেখিতে পাই, সে সকলই পসিটীভ ছবি। উক্ত ফটোগ্রাফি প্রক্রিয়া বহুপূর্ব্বে টালবোটাইপ (Talbotype) ও ক্যালোটাইপ (Calotype) নিয়ম বলিয়া অভিখ্যাত ছিল।

১৮৫১ অব্দে পণ্ডিতবর আরচার (Archer) ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে কয়েকটি উন্নতিকর প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করেন। তিনি প্রথমে কলোডিয়ান (Collodian) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সোডিয়ম আওডাইড (Sodium Iodide) কিম্বা (Potassium Iodide) পটাসিয়াম আইডাইড, সলিউসন মিশ্রিত করিয়া আয়োডাইজড কলোডিয়ান (Iodised colodian) পাইরোজাইলান (Pyroxylin) নামক দ্রব্যের (সলিউসনে) মিশ্রণে সেলিউলোসের নিম্ন নাইট্রেট (Lower nitrates of cellulose) এলকহল ও ইথার মিশ্রিত করিয়া কলোডিয়ান সলিউষন তৈয়ার করেন। পরে ঐ কলোডিয়ানকে উল্লিখিত নিয়মে আয়োডাইসড্ (Iodised) করিয়া উক্ত আয়োডাইসড্ কলোডিয়ানের পাতলা প্রলেপ কাচের উপর দিয়া উক্ত কাচ ট্যাবল্ট টাইপ প্রক্রিয়ায় কাগজের পরিবর্ত্তে ক্যামেরায় দেওয়া হইত। কলোডিয়ান সলিউসন্ কাচের উপর ঢালিলে ইথর ও অ্যালকহল বাষ্প হইয়া লোপ পায় ও কলোডিয়ানের পাতলা ছোব কাচের উপর পড়ে। উক্ত কাচ প্লেট পরে সিলভার নাইট্রেটের জলে ডুবাইয়া ভিজা অবস্থাতেই ফটোগ্রাফি যন্ত্রের ক্যামেরায় স্থাপন করা হয়। উক্ত কলোডিয়ান ছোবযুক্ত কাচকে সেনসেটাইসড্ (Sensitised) প্লেট বলা হয়। উহা ক্যামেরায় রাখিলে উহাতে যে ছবি পড়ে তাহা প্রথমে দেখা যায় না এবং পরে উক্ত কাচের হীরাকষে (Ferrous Sulphate) ও

পাইরোগ্যালিক অ্যাসিড (Pyrogallic acid) ও অন্যান্য পদার্থ যাহাদের অন্য দ্রব্য হইতে (Oxygen) অক্সিজেন লইবার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ (Reducing agent) সুরা প্রভৃতির রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে রৌপ্য লবল রৌপ্যে পরিণত হয় ও অস্বচ্ছ ছবি যাহা উক্ত কাচের উপর ক্যামেরায় হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। অপরিবর্ত্তিত আয়োডিন যাহা উহাতে লাগিয়া থাকে তাহা পোটাসিয়াম থাওসলফেটের জলে ধুইলে দূরীভূত হয়। এবং এই প্রকারে যে বিপরীত (negative) ছবি পাওয়া যায় তাহা হইতে আবশ্যক মত পজিটিভ ছবি প্রস্তুত হয় আর আমরা সচরাচর সেই ছবি দেখিতে পাই এবং ঐ পসিটিভ ছবি প্রত্যেক বার সোডিয়াম থায়োসলফেটের জলে ডোবাইয়া স্থায়ী করা হয়। কলোডিয়ান উপর্য্যুক্ত রূপে প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র ছবি তোলা যায় অর্থাৎ ক্যামেরায় অতি অল্পক্ষণ রাখিলেই ছবি পড়ে ও পরে ডেভলপমেণ্ট (Development) করিয়া যে ছবি পাওয়া যায় তাহা অতীব সুন্দর ও অভিলিপ্সিত দ্রব্যের অবিকল ছবি।

সিক্ত প্লেটে ফটোগ্রাফি তুলিবার যে সমস্ত অসুবিধা আছে সে সকল দূরীকরণ জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল ও এক্ষণে যে প্রকারে ফটো তোলা হয় তাহাতে আর ঐ প্রকার কোন অসুবিধা নাই। আজকাল শুষ্ক প্লেট ফটোগ্রাফিতে কাচপ্লেটে সিলভার ব্রোমাইড সিলভার আয়োডাইড ও অল্প সিলভার জিলিটিন দ্বারা প্রস্তুত মিশ্রণের প্রলেপ দেওয়া হয়। সিলভার নাইট্রেটের সহিত অধিক পরিমাণে পটাসিয়ম ব্রোমাইড ও জেলাটিন (Gelatin) ও গরম জল একত্র মিশ্রিত করিলে উপর্য্যুক্ত মিশ্রণ প্রস্তুত হয়। ও পরে ঐ মিশ্রণ ১০০ ডিগ্রি (সেনটিগ্রেট) পরিমাণ উত্তাপে কিঞ্চিৎকাল গরম করিলে উক্ত মিশ্রণ প্লেটের উপযুক্ত হয়। উপর্য্যুক্ত নিয়মকে রাইপনিং প্রসেস বলে। প্লেটে লাগাইবার পূর্ব্বে ঐ মিশ্রণ হইতে পোটাসিয়াম ব্রোমাইড বিদূরীত করিবার জন্য গরম জলে ধৌত করা হয় ও পরে ঐ মিশ্রণ সমানভাবে কাচ প্লেটে লাগাইয়া শুষ্ক করা হয় এইরূপে প্রস্তুত প্লেট ক্যামেরায় রাখিলে ক্যামেরার ভিতর অদৃশ্য ছবি প্রস্তুত হয় ও ঐ ছবি অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য (যাহা দ্বারা আলোকে অনাক্রান্ত রৌপ্য লবণ রাসায়নিক ক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় না) সাহায্যে ক্রমশঃ বিকাশ পাইয়া থাকে। আমরা সচরাচর যে প্রকারের ফটোগ্রাফ দেখিতে পাই ঐ প্রকারে সমস্তই প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ ঐ কার্য্যের জন্য ফেরস অক্জেলেট (Ferrous oxalate) পাইরোগ্যালিক্ (Pyrogallic acid) কিম্বা হাইড্রোকিনোন ও এমোনিয়া ও এমোনিয়া ব্রোমাইড ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর ফেরস্ অক্জেলেট, ফেরিক অকজেলেট ও হাইড্রোকিনান কিনোনে পরিণত হয়। ফটোগ্রাফিতে ঠিক কি কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কি, কি রাসায়নিক দ্রব্যের উদ্ভব হয় অদ্যাবধি তাহা ঠিক জানা যায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মতের আবিষ্কার করিয়াছেন ও অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ*।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন।—"১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল যে আমাদের সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই নাই। দৈবক্রমে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। তাঁহার সহিত যৎকিঞ্চিৎ আলাপেই বুঝিতে পারি আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকার মধ্যেই অনেক চিত্তাকর্ষক গণনা আছে এবং দূরবীক্ষণ উদ্ভাবনা ও কোপার্নিকের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বকালে য়ুরোপীয় জ্যোতিষ অপেক্ষা আমাদের জ্যোতিষ কিছুমাত্র ন্যূন নহে"।

তাহার পর সুপণ্ডিত গ্রন্থকার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহার গবেষণার ফল ৫৫০ পৃষ্ঠার এই বিপুল গ্রন্থ বঙ্গভাষাকে উপহার দিয়াছেন। গ্রন্থ এই ৫৫০ পৃষ্ঠাতেই সম্পূর্ণ নহে। ইহা প্রথম খণ্ড মাত্র। আমরা ইহার দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক রহিলাম।

যোগেশবাবু এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া আপনার নাম বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের প্রথম শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, আর জগতে হিন্দুজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সাহিত্য ও দর্শনে, নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে হিন্দুজাতি জগতে অতুলনীয়, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু গণিতে ও বিজ্ঞানেও যে হিন্দুজাতি অতুলনীয় সে কথা আজিও সকলে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হিন্দু রসায়নের ইতিহাস এবং অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাস পাঠ করিলে তদ্বিষয়ে আর কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। প্রফুল্লচন্দ্রের গ্রন্থ ইংরাজীতে লিখিত, তদুপলক্ষে তাঁহার নাম ইয়ুরোপীয় সমাজে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত, কিন্তু আমরা এমনি কৃতী ও কৃতজ্ঞ যে আমাদের মধ্যে সে গ্রন্থের তত্ত্ব অতি অল্পই রাখি; আর যোগেশচন্দ্রের এই গ্রন্থ বাঙ্গালায় লিখিত—তাহার ত কথাই নাই; প্রায় এক বৎসর এই গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে কয়জন তাহার কথা শুনিয়াছেন?

গ্রন্থকার ভূমিকায় অন্যত্র লিখিয়াছেন "আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রের একটী ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সঙ্কলন করাই আমার উদ্দেশ্য।—উপস্থিত গ্রন্থদ্বারা এই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ এবং অন্যের চিত্ত আকৃষ্ট ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে।" যোগেশবাবুর শ্রম নিষ্ফল হয় নাই, তাঁহার এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তির চক্ষুর খুলিয়া যাইবে।

গ্রন্থের নামেই বুঝা যাইবে পুস্তকখানি দুই অংশে বিভক্ত (১) আমাদের জ্যোতিষী (২) আমাদের জ্যোতিষ। গ্রন্থকার বহু অনুসন্ধান করিয়া বৈদিক কাল হইতে এপর্য্যন্ত আমাদের জ্যোতিষীগণের এবং জ্যোতিষ গ্রন্থের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, পাঠক তাহাতে অনেক অজ্ঞাত ও অপরিচিত সংবাদ জানিতে পারিবেন। এই সমস্ত বিবরণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সংগৃহীত। দ্বিতীয় খণ্ডে আমাদের জ্যোতিষের বিবরণ। এই অংশে বৈদিককাল হইতে এপর্য্যন্ত জ্যোতিষ জ্ঞানের কিরূপ উন্মেষ হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইবেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র নীরস ও নিষ্ফল নহে। জ্যোতিষতত্ত্বের অনুশীলক যখন নূতন নূতন বিশ্বের পরিচয় পান, যখন সেই কোটি বিশ্বের মধ্যে একটি অখণ্ডনীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখিতে পান, যখন ব্রহ্মাণ্ডের বিশালত্ব ও আপনাদের ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করেন, তখনকার বিমলানন্দ অন্যে কে পাইবে? এই শাস্ত্রের আলোচনায় জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার প্রসার ও হৃদয়ের প্রশস্ততা বাড়িয়া যায়। তা ছাড়া ইহা একটী নিত্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা। তবে দেশ ও পাত্রভেদে এই বিদ্যার সাফল্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে জ্যোতিষের আলোচনা মানুষের কর্ম্মের শুভাশুভ লগ্ন নির্ণয় এবং মানুষের অদৃষ্টের শুভাশুভ ফল গণনার জন্য, আর পাশ্চাত্যদেশে জ্যোতিষের আলোচনা মানুষের গন্তব্য পথ ও আবশ্যক সময় নির্ণয় জন্য। আমরা পঞ্জিকার লগ্ন দেখিয়া কোন কাজে পা বাড়াইব, আর পাশ্চাত্যেরা কাজে ঝাঁপ দিয়া কোন্ দিকে কতদূর যাইতেছে, কোন্ সময়ে কোথায়

* আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ—প্রথমভাগ। কটক কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম,এ, এম, আর এ এস প্রণীত মূল্য ৩৲ টাকা।

পৌঁছিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিয়া আরও অগ্রসর হইতেছে। জ্যোতিষ আমাদের অদৃষ্টের ফল আঁটিয়া দিয়াছেন, আর পাশ্চাত্যেরা ভূদৃষ্টবিজয়ের জন্য জ্যোতিষকে পরিচালনা করিতেছেন। আমরা জ্যোতিষের দাস, কিন্তু জ্যোতিষ পাশ্চাত্যদিগের সেবায় নিযুক্ত। ফল যেরূপ হওয়া সম্ভব সকলে হাতে হাতে দেখিতেছেন।

ব্যবহারিক হিসাবে দিক্ নির্ণয় ও কাল নির্ণয়, জ্যোতিষ গণনার এই দুইটি প্রধান কার্য্য। আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহার ছাড়া জ্যোতিষের সাহায্যে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় সমস্যা যে মীমাংসিত হইতে পারে তাহা এই গ্রন্থে পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। নভোমণ্ডলে জ্যোতিষ্কগণের অবস্থানকাল সকল সময়ে এক নহে। জ্যোতিষে তাহাদের গতির পরিমাণ নিঃসংশয়িতরূপে নিরূপিত হইয়াছে ও হইতেছে, সুতরাং কোন সময়ে যদি জ্যোতিষ্কগণের সংস্থিতির নির্দ্দেশ পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার কাল গণনা অনায়াসেই হইতে পারে। এইরূপ গণনা দ্বারা অনেক ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় হইয়া অনেক বিষয়ে সংশয় নিরাকৃত হইতে পারে। পুণার মাননীয় বালগঙ্গাধর তিলক এই পথ অবলম্বন করিয়া বৈদিককালের আলোচনা করিতেছেন এবং তাহাতে অনেক নূতন তত্ত্ব অকাট্য প্রমাণের সহিত সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে এরূপ অনেক ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ের কথা পাঠক দেখিতে পাইবেন। ভবিষৎ তত্ত্বানুসন্ধায়ী এই পথ অবলম্বন করিলে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে পারিবেন।

আলোচ্য গ্রন্থে পৌরাণিক জ্যোতিষ অধ্যায়টি অতি মনোরম। আমরা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রকেই গ্রন্থের এই অধ্যায়টি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের পুরাণে অনেক আখ্যায়িকা আছে। তাহার মূল কি? অর্থ কি? গ্রন্থকার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন—"আমাদের মতে পুরাণবর্ণিত অধিকাংশ উপাখ্যানের তিন প্রকার মূল ছিল। কতকগুলির মূল বৈদিক আখ্যান, কতকগুলির নৈসর্গিক ব্যাপার, অপর কতকগুলির ঐতিহাসিক কিম্বদন্তি ও নৈতিক তত্ত্ব। বোধ করি, বৈদিক আখ্যানের মূলেও ঐতিহাসিক ও নৈসর্গিক ঘটনা ছিল। বোধ করি, স্বভাবকবি ঋষিগণের মনে স্বাভাবিক ঘটনা অধিক উদিত হইত। অবশ্য একই আখ্যানে ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক, ও নৈতিক তত্ত্ব মিশ্রিত হইতে পারে। যে সকল আখ্যান পাঠ করিলে জ্যোতিষ বিষয় মনে আসে, এখানে কেবল তাহাদেরই উল্লেখ করা যাইবে। পাঠককে অনুরোধ, তিনি যেন অপক্ষপাত দৃষ্টিতে এই সকল ব্যাখ্যান অবলোকন করেন।

পুরাণের সকল কথাই রূপকাবৃত নহে। স্থানে স্থানে ভূগোল ও জ্যোতিষ স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে। এ সকল স্থলে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। তবে একটা বিষয়ে পাঠক সতর্ক হইবেন। পৌরাণিক ভূগোল পাঠ করিবার সময় আধুনিক ভূগোল জ্ঞানের তুলাদণ্ড বাহির করিবেন না। সকল স্থলেই সমালোচক হইতে হইবে, এমন কথা কি আছে"।

গ্রন্থকার এই অধ্যায়ের শেষে পুনরায় কৈফিয়ৎ দিয়াছেন "কোন কোন উপাখ্যানের ব্যাখ্যা এত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, সকল পাঠক তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না। পরন্তু কোন কোন ব্যাখ্যাকে আধুনিক "বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা" মনে করিলেও আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। এই প্রস্তাবটি রচনা করিবার দুইটি উদ্দেশ্য। (১) আমাদের জ্যোতিষ ও পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি পরস্পর এমন সংশ্লিষ্ট যে, একটি জানিতে গেলে অন্যগুলিও কিছু কিছু জানা আবশ্যক হয়। পরিবর্ত্তী প্রস্তাবে তাহার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইবে। (২) কোন কোন পৌরাণিক উপাখ্যানের জ্যোতিষিক ব্যাখ্যাও সম্ভব, তদ্বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অন্য উদ্দেশ্য। এখানে প্রদত্ত ব্যাখ্যাই যে ঠিক, তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে, কিংবা সকল ব্যাখ্যাতেই কিছু সার আছে, তাহাও বলি না। পৌরাণিক কথার নিঃসন্দিগ্ধ ব্যাখ্যা সম্ভাব্য নহে"।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা গুলি কিরূপ রূপক তাহার নমুনা স্বরূপ আমরা নিম্নে "ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন" প্রস্তাবটি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। অন্যান্য উপাখ্যানের ব্যাখ্যার জন্য পাঠকগণকে মূল গ্রন্থের উপর বরাত দিলাম।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রাকৃত

জ্যোতিষ। পৃথিবীর আকার পরিমাণ গঠন প্রভৃতি, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এবং অনেকগুলি নৈসর্গিক ব্যাপার, যাহা আমাদের জ্যোতিষীগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়াছেন, এই অধ্যায়ের আলোচ্য। বলা বাহুল্য যে এখন নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞানের যেরূপ প্রসার হইয়াছে, সে কালে সেরূপ জ্ঞানের প্রত্যাশা করা অসম্ভব, তথাপি আর্য্যগণের জ্ঞানের প্রভাব দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

গ্রন্থকার পরিশিষ্টে ফলিত জ্যোতিষের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। জ্যোতিষে মানবজীবনের ফলাফল যাহা গণিত হয় তাহা সত্য না মিথ্যা? গ্রন্থকার তাহার এইরূপ উত্তর দিয়াছেন—

"আমরা ইহার উত্তর দিতে অক্ষম, কারণ ইহার উত্তর দিতে হইলে যাদৃশ আলোচনা আবশ্যক, তাদৃশ আলোচনা করি নাই। তবে ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা শুনা গিয়াছে. তাহা সংক্ষেপে বলিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করা যাইতেছে।

বিপক্ষ। জাতকগণনা যে ঠিক, তার কি প্রমাণ আছে?

স্বপক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা দৃঢ়তর প্রমাণ নাই।

বি। জন্মকালে দূর আকাশে কোথায় কি গ্রহ ছিল; তাহারা জাতকের ভাগ্যনিয়ামক হইবে, এ কথা হাস্যকর।

স্ব। ভাগ্য অর্থে কর্ম্মফল ভোগ। আমাদের ষড়্‌দর্শন বলেন, মানুষ যে কর্ম্ম করে, এ জন্মেই হউক, কি বহু জন্মেই হউক, তাহার শুভাশুভ ফলভোগ করিতেই হয়। কর্ম্ম দ্বিবিধ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। এ জন্মের কর্ম্ম দৃষ্ট, কেন না দেখা যায়; পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম অ-দৃষ্ট, কেন না দেখা যায় না। কর্ম্মফল নিবারণের তিন উপায় আছে; দৃষ্ট বা লৌকিক, বৈদিক, এবং তত্ত্বজ্ঞান। ঔষধাদি লৌকিক উপায়; যাগযজ্ঞ স্বস্ত্যয়নাদি বৈদিক উপায়। উক্ত ত্রিবিধ উপায় দ্বারা দৃষ্টকর্ম্মের ফলভোগ নিবারিত হইতে পারে। জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হইলে অদৃষ্টকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। কিন্তু জীবন্মুক্ত (মুক্ত কিন্তু জীবিত) ব্যক্তিরও প্রারব্ধ (যে কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে) যতক্ষণ শেষ না হয়, ততক্ষণ তাঁহাকে ফলভোগ করিতে হয়। ইহা ষড়্‌দর্শনের মত। সেই মতের সহিত জাতক গণনার কিছুমাত্র অনৈক্য নাই। ফলিত জ্যোতিষে দুই প্রকার গণনা হয়। (১) দৃষ্টকর্ম্মফল, (২) অদৃষ্ট কর্ম্মফল। গ্রহগণ এ জন্মে সকলেরই শুভাশুভ করিতে সমর্থ। রৌদ্রে বেড়াইলে, বৃষ্টিতে ভিজিলে যেমন তাহার ফলভোগ করিতে হয়, তেমনই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে, ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে গ্রহগণের আগমনে ও সমাগমে আমাদের ইষ্টানিষ্ট হয়। এই ইষ্টানিষ্ট গণনা সংহিতা করিয়া থাকে। [পাশ্চাত্য দেশে এ প্রকার গণনা নাই, এমন নহে। ভবিষ্যৎ কালের ঘটনা বলিতে গেলেই কোনরূপ গণনা আবশ্যক। সেইরূপ গণনাই সংহিতা। সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সহিত বৃষ্টি বাত্যার সম্বন্ধ নির্দ্দেশ সংহিতা করিয়া থাকে।] কিন্তু জাতক গণনা সেরূপ নহে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের কি ফল হইবে, তাহা জন্মকালীন গ্রহস্থিতি লক্ষ্য করিয়া বলিবার নামই জাতকগণনা। এখানে গ্রহদিগের কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহারা ফলসূচক মাত্র (৪৭৪ পৃঃ) স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে লোক সুখ দুঃখ ভোগ করে; এ কথা সকলেই জানেন।

বি। তবে জাতকগণনায় গ্রহবল, চেষ্টা, দৃষ্টি প্রভৃতি সংজ্ঞা কেন?

স্ব। সে সকল সংজ্ঞা মাত্র। সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত এরূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে। নতুবা গ্রহের পুংস্ত্রী শুভাশুভ ইত্যাদি কোন ভাগই নাই। যে গ্রহ দ্বারা যে বিষয় জানিতে পারা যায়, সেই সকল বিষয় অনুসারে গ্রহগণের ভাগ হইয়াছে।

বি। জাতকের জীবনের সহিত গ্রহস্থিতির কেন সম্বন্ধ থাকিবে?

স্ব। কেন থাকিবে না, তাহাও বলিতে পারা যায় না। জগতে এমন কি বস্তু আছে, যাহার সহিত জগতের মানুষের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা সর্ব্বদাই এরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকি। এ সকল সম্বন্ধের অধিকাংশই পার্থিব বস্তুর সহিত বটে, কিন্তু আর্য্যগণ এরূপ সম্বন্ধ দূরস্থিত গ্রহগণেরও সহিত নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

বি। এরূপ সম্বন্ধ অনুমান করিতে বিস্তর পরিদর্শন, বিস্তর ন্যায়সঙ্গত আলোচনা আবশ্যক। এত পরিদর্শন, এত আলোচনা হইয়াছিল কি?

স্ব। প্রাচীন আর্য্যগণ বিনা পরিদর্শনে কেবল কল্পনা দ্বারা জাতকস্কন্ধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এ কথার প্রমাণ নাই। বরং ইহার বিপরীত প্রমাণ আছে। বরাহাদি সকলেই বলিয়াছেন, জ্যোতিষ আগম শাস্ত্র—অর্থাৎ যে শাস্ত্র বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। অতএব উহা একজনের কি দুইজনের উদ্ভাবনা নহে। বহু ব্যক্তি বহু সময়ে উহা পরীক্ষা ও আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রকার আলোচনার ফলেই নানা মত হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে বড় একটা মতভেদ নাই। অধিকন্তু গণনাক্রম ভিন্ন হইলেও ফলে প্রায় এক দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা কপিল কণাদের দর্শন শিক্ষা করিতেন, তাঁহারা যুক্তি তর্ক বুঝিতেন না, বলা ধৃষ্টতামাত্র। বরাহ তাঁহার বৃহৎসংহিতার প্রথমেই কপিলের প্রকৃতি পুরুষ আনিয়াছেন।

বি। ফলিত জ্যোতিষকে আধুনিক বিজ্ঞানের তুল্য বলিতে পারেন ?

স্ব। আধুনিক বিজ্ঞান অর্থে যদি এরূপ বুঝায় যে উহা সম্পূর্ণ, উহার শেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইলে ফলিত জ্যোতিষ আধুনিক বিজ্ঞানের তুল্য নহে। উহার আরম্ভ মাত্র হইয়াছিল। যে সকল কারণে অন্যান্য শাস্ত্রের অধিক উন্নতি হয় নাই, সেই সকল কারণে ফলিত জ্যোতিষেরও হয় নাই। কিন্তু উহার গণনা সর্ব্বৈব মিথ্যা, একথা বলিতে পারা যায় না।

বি। কিন্তু অনেক গণনাই ত মিলিতে দেখা যায় না ?

স্ব। অনেক গণনা যে মিলে, তাহা যাঁহারা গণনা করাইয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আছে। কিন্তু তদ্দ্বারা সকলেই কি সকল রোগ উপশম করিতে পারেন ? ইহাতে শাস্ত্রের দোষ, শাস্ত্রব্যবসায়ীর দোষ থাকিতে পারে। তথাপি, আয়ুর্ব্বেদ যে শাস্ত্র নহে, এ কথা কেহ বলে না। যদি দশটা গণনার মধ্যে দুইটা মিলে, তাহা হইলেই উহাতে কিছু সত্য আছে, স্বীকার করিতে হইবে"।

"ভগীরথের গঙ্গানয়ন।

বিষ্ণুপুরাণে (২।৮) আছে, সর্ব্বপাপহরা সরিৎ গঙ্গা দেবাঙ্গনাদিগের অনুলেপন দ্বারা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া বিষ্ণুপদ হইতে নির্গতা হইয়াছেন। ইনি বিষ্ণুর বামপাদ-পদ্মের অঙ্গুষ্ঠ নখ হইতে স্রোতোরূপে বিনির্গতা হইয়াছেন। ধ্রুব ভক্তি পূর্ব্বক দিবারাত্র তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। ঐ নদী-জলে সপ্তর্ষিগণ যখন অবগাহন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করেন, তখন সুরগঙ্গার বীচিমালা দ্বারা তাঁহাদের জটাভার ইতস্ততঃ চালিত হইতে থাকে। গঙ্গার বিস্তীর্ণ বারিপ্রবাহ চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ক্ষয়-কালেও সমধিক কান্তি ধারণ করে। ইনি চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া মেরুপৃষ্ঠে পতিতা হইতেছেন, এবং জগৎ পবিত্র করিবার নিমিত্ত সেই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে গমন করিতেছেন। এক গঙ্গাই চতুর্দ্দিকে গমন করাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া চারি প্রকার হইয়াছেন। যথা সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ ও ভদ্রা। অলকনন্দা দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছেন, শম্ভু শত বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। শম্ভুর জটাকলাপ হইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইয়া সগর-সন্তান-গণের অস্থিচূর্ণ প্লাবিত করিয়া গঙ্গা সেই পাপাত্মা-দিগকে দেবলোকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

রামায়ণাদি পাঠে জানা যায়, কপিল মুনির ক্রোধে সগরতনয়গণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। ভগীরথ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে আনয়ন করেন। স্বর্গ হইতে আসিতে হইল বলিয়া গঙ্গা কুপিতা হইলেন। তাঁহার পতনবেগ হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শম্ভু স্বীয় জটাভারে গঙ্গাকে ধারণ করিলেন। তথা হইতে গঙ্গা চারিধারায় পতিত হইলেন। একস্থলে রাজর্ষি জহ্নু যজ্ঞ করিতেছিলেন। গমনকালে গঙ্গা স্বীয় প্রবাহ দ্বারা জহ্নুর যজ্ঞক্ষেত্র প্লাবিত করিলেন। তদ্দর্শনে জহ্নু রোষভরে গঙ্গার জলরাশি নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে দেবগণের স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় কর্ণ বিবর হইতে গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন। ইত্যাদি

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, এই তিন পথে গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত গঙ্গার এক নাম ত্রিপথগা। উপরে গঙ্গার যে বর্ণনা প্রদত্ত হইল, তাহা স্বর্গের গঙ্গার। ইহাঁর নামান্তর মন্দাকিনী, বিয়দ্গঙ্গা, স্বর্ণদা, সুরদীর্ঘিকা। ভগীরথ ইহাঁর নাম সাগর রাখিয়া ছিলেন। উক্ত আকাশ-গঙ্গার

স্রোতঃ উপাখ্যানাকারে বর্ণিত হইয়াছে; অর্থাৎ পার্থিব গঙ্গা উপলক্ষ করিয়া উপরের পৌরাণিকী কথা হয় নাই। ঐ কথার মূল আকাশ গঙ্গা। তাই বায়ু পুরাণ বলিয়াছেন (৪৭ অঃ)

দিবি ছায়াপথো যস্তু অনুনক্ষত্রমণ্ডলং।
দৃশ্যতে ভাস্বরো রাত্রৌ দেবী ত্রিপথগা তু সা॥

শকুন্তলায় কালিদাস,

ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগনপ্রতিষ্ঠাং
জ্যোতীংষি চক্রবিভক্তরশ্মি।
যস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়োঃ
মার্গো দ্বিতীয় হরিবিক্রম পূত এষঃ॥

বায়ু ও লিঙ্গপুরাণ আরও স্পষ্টতঃ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে,

"পুণ্যোদা আকাশগামিনী নদীর উদক অমৃত স্বরূপ। সেই নদী সপ্তম অনিল পথে (সপ্ত বায়ুর শেষের বায়ু) প্রবৃত্তা। তিনি জ্যোতিঃ সমূহকে অনুবর্ত্তন করেন, এবং জ্যোতিঃ সমূহও তাঁহাকে সেবা করেন। সেই নদী আকাশে কোটি কোটি তারা দ্বারা সমাযুক্তা। বায়ু দ্বারা প্রেরিতা হইয়া তিনি সূর্য্যের স্থায় অহরহঃ পরিবর্ত্ত করিতেছেন।"

আকাশ গঙ্গার এই সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্ব্বাংশে সত্য। অন্যান্য পুরাণে এই বিবরণ রূপকে আবৃত হইয়াছে। এখন সেই রূপক ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে সুরগঙ্গার উদ্ভব। দেখা যায়, শ্রবণা নক্ষত্র ও বিষ্ণু এক পর্য্যায়। শ্রবণা হইতে আরম্ভ করিয়া সুরগঙ্গার স্থিতি দেখিলে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে তাহাকে বিলুপ্ত বোধ হয়। সুতরাং শ্রবণা-রূপ ত্রিবিক্রমের পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার আরম্ভ মনে করা যাইতে পারে। * শ্রবণা হইতে উত্তরাভিমুখে দেখিলে গঙ্গার পার্শ্বে অভিজিৎ নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুর আর এক নাম অভিজিৎ ‡। অভিজিতের পূর্ব্বদিকে কতকগুলি উজ্জ্বল তারা (Cygnus) দৃষ্টিগোচর হয়। এই নক্ষত্রের (তারা সমূহের) পাশ্চাত্য নামের অর্থ হংস। কাব্যাদিতে মরালসমূহ আকাশগঙ্গায় সন্তরণ করিয়া থাকে। এই নক্ষত্র আমাদের কাব্যের হংস না হইতে পারে। এখানে বোধ হয়, আকাশগঙ্গা যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে। হয়ত বা উক্ত হংস নক্ষত্র বিষ্ণু পুরাণের সলিলবাসী প্রচেতাগণ। হয়ত তাঁহাদিগেরই জটা দ্বারা গঙ্গা প্রবাহ বিচলিত হইয়াছে। আরও উত্তরে গঙ্গার এক স্রোত ধ্রুবাভিমুখে প্রবাহিত দেখা যায়। এই স্রোতে শিবি (Cepheus) নক্ষত্র। বোধ হয় এই স্রোত দেখিয়া ধ্রুব কর্ত্তৃক গঙ্গাধারণ কল্পনা হইয়াছিল। এখান হইতে অন্য পথে গঙ্গার স্রোত দেখিলে প্রথমে পুরুষ † (Perseus) নক্ষত্র ও প্রজাপতি নক্ষত্র, এবং পরে আর্দ্রা নক্ষত্রের নিকট আসিতে হয়। § আর্দ্রার দেবতা রুদ্র। এই খানেই শম্ভু গঙ্গাধর নাম পাইয়াছেন। শম্ভুর জটা হইতে গঙ্গাকে ত্রিধারা হইয়া দক্ষিণে ক্ষিতিজের নিকট পতিত হইতে দেখা যায়। ইহার পরেই গঙ্গা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিলুপ্ত বোধ হয়। বোধ করি, জহ্নু মুনি গঙ্গাকে উদরস্থ করিয়াছেন। কিছু দূরে গঙ্গার পুনর্ব্বার আবির্ভাব দেখা যায় এই জন্য তিনি জাহ্নবী নাম পাইয়াছেন। সগরতনয়গণের শুভ্র অস্থিচূর্ণ যে গঙ্গাপ্লাবিত অগণনীয় তারকা মাত্র, তাহা সহজেই বোধ হয়।

পাতাল দক্ষিণে ও ভূপৃষ্ঠের নিম্নে অবস্থিত। জহ্নুমুনির আশ্রম ত্যাগ করিয়া গঙ্গা পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন। আর এক ধারা মেরুতে পতিত হইয়াছে। মেরুগিরি উত্তর দিকে, সেখানে শিব ভবন কৈলাসপুরী আছে। তথায় গঙ্গা যেন মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছেন। এইরূপে গঙ্গা ত্রিপথগা হইয়াছেন। ভূগঙ্গা, কবির চক্ষে আকাশগঙ্গার স্রোতোরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। স্বর্গ হইতে ভগীরথ এই স্রোত আনিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম ভাগীরথী হইয়াছে। নভোমণ্ডলে আকাশগঙ্গা, ভূমণ্ডলে ভূ-গঙ্গা। উভয়েই গঙ্গা—উভয়েই গমন করিতেছেন। একটি আখ্যানের সহিত অপর আখ্যানের যোগ পুরাণে নূতন নহে"।

* আকাশগঙ্গার এই অংশ কার্ত্তিক মাসের রাত্রি আরম্ভে যাম্যোত্তর রেখায় দেখা যায়। শ্রবণা নক্ষত্রের পাশ্চাত্য নাম ঈগল পক্ষী। বিষ্ণুর বাহন গরুড় পক্ষী মনে আসে।

‡ অভিজিতের পাশ্চাত্য নামের (Lyra) অর্থ বীণা। ইহার সহিত পুরাণের সঙ্গীত শ্রবণে বিষ্ণু পাদোদ্ভবা গঙ্গার সম্বন্ধ মনে আসে।

† ত্রিশূল চিহ্নিত নক্ষত্র নাম গুলি আমার রচিত; প্রাচীন গ্রন্থের নহে।

§ আকাশগঙ্গার এই অংশ বৈশাখ মাসে রাত্রি আরম্ভে যাম্যোত্তর রেখায় দেখা যায়।

কমলা

ভাদ্র ১৩১১] [১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা

নানা প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট যে প্রণালীতে কৃষিসভা সংস্থাপন করিয়াছেন, মহীশূররাজ্যে সেই প্রণালীতে কৃষিসভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতেছে।

* * *

মাতলায় সরকারী খাসমহলে তামাক ও ইক্ষুর চাষ খুব ভাল হইয়াছে। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমাতেও কতকগুলি ফসল আবাদ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

* * *

রাজপুতানার অন্তর্গত মাড়োয়ারে একজন পার্সী ভদ্রলোক খনির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতমাতার সঞ্চিত ধন ভারতবাসী যতই ভোগ করেন, ততই মঙ্গল।

যাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী কৃষিবিৎগণ পরস্পরে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে গবর্মেণ্ট একটি সরকারী কৃষি-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

* * *

মণিপুরে রেসম আবাদের নাকি বড় সুবিধা। কোন কোন য়ুরোপীয় ধনী ইহা জানিতে পারিয়া তথায় রেসমের কুঠী সংস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা যে আঁধারে সে আঁধারে।

* * *

আসামের চীফ কমিসনর ডাইরেক্টর অফ ল্যাণ্ড রেকর্ডস ও এগ্রিকলচরের সহকারী শ্রীযুক্ত ভূপাল চন্দ্র বসুকে কো-অপারেটীভ ক্রেডিট সোসাইটীর রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না।

* * *

আসামে রাজপুরুষেরা ব্রহ্মপুত্র নদের নিকটবর্ত্তী স্থানে পাটের আবাদ করিবার মানস করিয়াছেন। পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে তথায় পাটের আবাদ লাভজনক হইবে। বাঙ্গালার কৃষকগণ সাবধান হউন।

* * *

এ বৎসর বাঙ্গালার কৃষিবিভাগ রঙ্গপুর, গৌরীপুর, রাজসাহি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থলে রিয়া আবাদের পরীক্ষা করিবেন। কলে রিয়ার আঁশ বাহির করা প্রজার পক্ষে বড়ই ব্যয়সাধ্য হইবে। হাতের দ্বারা কিরূপ আঁশ ছাড়ান যাইতে পারে তাহা চৈত্র সংখ্যার কমলায় আমরা বিবৃত করিয়াছি।

* * *

কাংড়া পাহাড়ে শ্লেট পাথর পাওয়া যায়। তথায় এই শ্লেট পাথর বাহির করিবার জন্য একটি যৌথ কোম্পানি আছে। এই কোম্পানি গত পাঁচ ছয় বৎসর কাল অংশীদারদিগকে শতকরা বার টাকার হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন।

* * *

আমেরিকায় নিগ্রো দাসদিগের প্রায় এক কোটি বংশধর আছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কোনস্থানে আপনাদিগের ইচ্ছামত সুখ সচ্ছন্দে থাকিতে পায় না। এইজন্য তথায় ১৫ লক্ষ টাকা মূলধনে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিগ্রোদাসদিগের সুখসচ্ছন্দতা বিধান করাই ইহার উদ্দেশ্য। আমেরিকায় সকলই নূতন কাণ্ড।

* * *

সান ফ্রান্সিস্কো নগরে এক কোটি ডলার মূলধনে একটী ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার নাম জাপান-আমেরিকা ব্যাঙ্ক। এক জন জাপানী ও এক জন মার্কিণ উভয়ে আপন আপন দেশ হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া ইহা স্থাপন করিয়াছেন। উভয় দেশের বাণিজ্যের সহায়তা করাই এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য।

* * *

বর্ত্তমান বর্ষে ছয় মাস কালের মধ্যে ইংলণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও জ্যামেকা হইতে ছয় কোটি হইতে সাড়ে সাত কোটি টাকার ফল আমদানি করিয়াছেন। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আপেল রপ্তানি হয়, আর জ্যামেকা হইতে রম্ভা। ভারতে কত সুরসাল ফল আছে তাহা তথায় বিক্রয়ার্থ পাঠাইবার কোন উদ্যোগই নাই।

* * *

বিহারে India Development Company নামে একটি যৌথ কারবার আছে, ইহারা ইক্ষুর আবাদ ও চিনি তৈয়ার করিয়া থাকেন। এই কোম্পানি তাঁহাদিগের আবাদে জলের সুবিধা করিয়া দিবার জন্ম বঙ্গীয় গবমে'ণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিরূপে এই জল দেওয়া যায় তাহা পরীক্ষার্থে গবমে'ণ্ট গণ্ডক নদী হইতে জল সেচন করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

* * *

আসাম গোলাঘাটে উইলিয়ামসন নামে এক সাহেব তৎপ্রদেশে শিক্ষাবিষয়ের জন্ম ১০,০০০ পাউণ্ড বা দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই টাকার আয় হইতে তথায় একটি কারিকর-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহার নাম ছিল Williamson Artezan School. এই স্কুল উঠাইয়া দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ধুবড়ি গৌহাটি নওগাঁ তেজপুর প্রভৃতি স্থানে পুস্তকালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। আমরা এ ব্যবস্থা সমীচীন মনে করি না।

* * *

উত্তর পশ্চিমে "শ্রীগঙ্গাজী কটন মিল" নামে একটি সূতার কল সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা একটি যৌথ কারবার, এ দেশীয় মূলধনে ও দেশীয়দিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এ বিষয়ে উত্তর পশ্চিমের লোক বাঙ্গালীর আদর্শ। তথায় অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ও কল কারখানা এদেশীয়গণ চালাইতেছেন। এ বিষয়ে বঙ্গদেশ বড়ই পশ্চাৎপদ।

* * *

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজে কৃষিতত্ত্ব শিক্ষার শ্রেণী খোলা হইয়াছে। এখানে কৃষিতত্ত্বে যাঁহারা পারদর্শিতা দেখাইবেন তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন ডেপুটিকলেক্টর ও একজন সবডেপুটী কলেক্টরের পদ পাইবেন। এই বৎসরের পর বোধ হয়, আর তথায় কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্ম ছাত্র গৃহীত হইবে না। আগামী বৎসর হইতে পুষার কৃষিশিক্ষা আরম্ভ হইবে।

* * *

গবমে'ণ্ট খনিবিদ্যা শিখিবার জন্ম যে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এ বৎসর তাহা চারিজন ব্যক্তি লাভ করিয়াছেন; ইঁহারা সকলেই শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। চারিজনের মধ্যে একজন সাহেব, তিনজন বাঙ্গালী। এই চারিজনই ইতিপূর্ব্বে এদেশের খনির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমান্ অশোক বসু ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসুর পুত্র।

* * *

মহীশূর রাজ্যে মুরসেদ পিরণ নামে একজন মুসলমান ভদ্রলোক রেসম আবাদের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছেন। ইনি যে সমস্ত গুটি তৈয়ার করিয়াছেন, টাটার রেসমক্ষেত্রের সুপারিটেণ্ডেণ্ট তাহা নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ছয় ঘর লোককে পিরণ সাহেব রেসমের কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। মহীশূরের মৃত্তিকা তুঁতের আবাদের বিশেষ উপযোগী।

* * *

রাজপুতানার কিষণগড় নামক স্থানে ক্যানসেরিনাইট (Cancerinite) নামে একটী ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিষণগড়ের উত্তর-পূর্ব্বে মান্দাওরিয়া গ্রামের নিকট একটি পাহাড়ের নীচে এই ধাতু বাহির হইয়াছে। সরকারী ভূতত্ত্ব বিভাগে এই ধাতু পরীক্ষিত হইয়াছিল, উক্ত বিভাগ বলিয়াছেন যে ইহা অনায়াসে গালান যাইতে পারে।

* * *

মুর্গা বা কোঙ্গার ছাল বা সূতা বাহির করিবার একটি কল হইয়াছে। কলিকাতার ইষ্টারণ ল্যাণ্ডিং ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং কোম্পানী ইহা বিক্রয় করেন। কলে পাতা দিয়া সূতা বাহির হইলে পর তাহা কেবল ধুইয়া লইলেই বিক্রয়ের উপযোগী হয়। এই ছাল ছাড়ান কল যদি পৌনে এক ঘোড়া শক্তিযুক্ত এঞ্জিনে চালান যায়, তাহাতে দিন প্রায় তিন মণ সূতা বাহির হয়।

* * *

ময়ূরভঞ্জের মহারাজা স্বরাজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। এক বৎসরের মধ্যে মহারাজা বারিপদায় একটি তুঁতের আবাদ ও রেসম তৈয়ারী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার পর রিয়ার চাষ, কাসাভা বা শিমুল আলুর চাষ, ঢাকাই তুলা, পেশোয়ারি ধান, গবাদির জন্য গিনি ঘাস ইত্যাদি চাষের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

* * *

কারিকরদিগের বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ গবমে'ণ্ট এ বৎসর ব্রহ্মদেশে এগার হাজার টাকা ব্যয় করিবেন আর বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যালয়ের জন্য দুই হাজার টাকা দিবেন। আর কৃষিবিষয়ক উন্নতিকার্য্যে তথায় প্রায় ২২ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকা বিশেষরূপে রেশমের আবাদের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করা হইবে।

* * *

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাবড়া, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, সারণ, চম্পারণ, ভাগলপুর, পুরী, পালামৌ এই কয় জেলাতেই ইক্ষুর অবস্থা সন্তোষজনক। বিহারী নীলকর

আলু ও ইক্ষুর চাষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে বিদেশী চিনি এ দেশে আদৌ না আসিতে পারে তাহার চেষ্টা আবশ্যক হইয়াছে। এ জন্য গবর্মেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক।

* * *

বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এ বৎসর দেশের কৃষি কার্য্যের উন্নতি-কল্পে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। আমরা আশা করি যাহাতে দেশের প্রকৃত কৃষকেরা ইহার ফলভোগী হইতে পারে গবর্মেণ্ট তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। কেবল নীলকরদিগের হস্তে এই টাকা ব্যয় করিতে দিলে কোন উপকারের আশা নাই। ঐ উদ্দেশ্যে পঞ্জাব গবর্মেণ্টও ২৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

* * *

মান্দ্রাজে কলাগাছের আঁশের কারবার দিন দিন কালাও হইতেছে। এজন্য কয়েকটি যৌথ-কারবার সংগঠিত হইয়াছে। আঁশ বাহির করিবার জন্য যে সকল যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কাট্‌তি দিন দিন বাড়িতেছে। যে সকল লোক এই সকল কার্য্যে দক্ষ তাহারাও কাজ পাইতেছে। যাঁহারা বাঙ্গালায় এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা প্রকাশ করিতেছি যে, মান্দ্রাজে যে আঁশ বাহির করিবার যন্ত্র বাহির হইয়াছে, পুষার আদর্শক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষা হইতেছে।

* * *

দারজিলিংএর নিকট কলিম্পং নামক স্থানে ডাক্তার গ্রেহাম একটি সুগন্ধ দ্রব্যের কারখানা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই জন্য তিনি সম্প্রতি ফরাসিদেশের মার্শেল নগরের সন্নিকট গ্রাস নামক স্থানে গিয়াছিলেন। সেখানে অনেক সুগন্ধি দ্রব্যের কারখানা আছে। ডাক্তার গ্রেহাম তথায় সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী পরিদর্শন করিয়াছেন। এদেশে যেরূপ বহুবিধ পুষ্প আছে, তাহাতে সুগন্ধির কারখানার যথেষ্ট স্থান আছে।

* * *

অষ্ট্রিয়ার বোহিমিয়া নগরে কাচের বোতাম তৈয়ার করিবার কল আছে। এই সকল কারখানায় বালকেরা পাঁচ পেনী করিয়া দিন মজুরী পায়, স্ত্রীলোকেরা ১৫ পেনী হইতে ২০ পেনী পায়, আর পুরুষেরা ২০ পেনী হইতে দুই শিলিং পায়। ভিয়েনা নগর ঝিনুকের বোতামের জন্য প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডের বর্মিংহামেও অনেক প্রকার বোতাম প্রস্তুত হয়। এই সকল বোতামওয়ালারা সহস্র সহস্র টাকার বোতাম এদেশে বিক্রয় করে, অথচ এদেশে বোতাম প্রস্তুত করিবার উপকরণ অপ্রতুল নহে।

* * *

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয় খনিবিভাগের সরকারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। যতদিন তিনি সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহার অন্য কোন কার্য্য করিবার অবসর বা ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সে কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া এখন তিনি ময়ূরভঞ্জে কার্য্য করিলেও অনেকটা নিঃঝঞ্ঝাট হইয়াছেন; এখন যদি তিনি এদেশীয় কতকগুলি যুবক ছাত্রকে খনিতত্ত্ব-বিদ্যা-বিষয়ে শিক্ষাদান করেন, তাহা হইলে দেশের যৎপরোনাস্তি উপকার সাধিত হয়, এবং তাঁহারও একটা কীর্ত্তি থাকিয়া যায়। তিনি দেশের এ উপকার করিতে অগ্রসর হইবেন কি? বিজ্ঞান ও শিল্প সভার এ সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা এদেশে শিক্ষা দেওয়াইতে পারিলে, বিদেশ যাইবার আবশ্যক হয় না, ব্যয়ও অনেক কম পড়ে।

* * *

বড়লাট কার্জ্জন সাহেব এ দেশের শিল্পের উন্নতিকল্পে অনেক সময়ে অনেক কথা কহিয়াছেন। কিন্তু খালি কথায় চিঁড়া ভিজে না। এ দেশের যথার্থ উন্নতিকল্পে যদি তিনি যত্নবান্ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে (১) দেশের শিক্ষার দিকে নজর রাখিয়া যাহাতে স্বল্পব্যয়ে সকলে কার্য্যগুলি শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহার বিহিত উপায় উদ্ভাবন করুন। (২) এখন যেমন শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সমূহে সাহায্য দান করিয়া থাকেন, তেমনি যে কোন ব্যক্তি কোনরূপ শিল্প, বিজ্ঞান বা কৃষির উন্নতিকল্পে কার্য্য করিবে, তাহাকে ভূমি দিয়া ও এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়া সম্যক্ সাহায্য দানে উৎসাহিত করুন। ব্যবসায়েচ্ছু যুবকদিগের উপর নজর রাখিয়া সাহায্য দানে তাহাদিগকে সমুচিত উৎসাহিত করুন। কলিকাতাপ্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে এক একটি স্বদেশজাত দ্রব্য প্রদর্শনী খুলুন।

* * *

কাসিয়ার একটি কৃষি-ব্যাঙ্কের রিপোর্টে প্রকাশ যে ব্যাঙ্কটি দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছে। ইহার ১৫৩জন অংশীদার ছিল এখন ৩৪৫ জন হইয়াছে। ২০২ জন ব্যাঙ্ককে ঋণ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরে কেবল ৯৪জন মাত্র ঋণ দিয়াছিলেন। আর ব্যাঙ্ক ২২৬১জন কৃষককে টাকা ঋণ দিয়াছেন, পূর্ব্ব বৎসরে ১০০৩জন মাত্র ঋণ লইয়াছিল। বৎসর মধ্যে যত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল, বৎসর শেষে তাহার কড়া-ক্রান্তি পর্য্যন্ত সমস্ত আদায় হইয়াছিল; সে জন্য ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষীয়দিগকে কোন প্রকার ক্লেশ পাইতে হয় নাই। বৎসর শেষে ব্যাঙ্কের ৪২০ টাকা লাভ হইয়াছে, তাহার মধ্যে শতকরা বার টাকার হিসাবে ৩২০ টাকা ঋণদাতাদিগকে সুদ দেওয়া হইয়াছে ও ১০০ টাকা গচ্ছিত হিসাবে রাখা হইয়াছে। যতদিন এদেশের ব্যবসায়ীদিগের সাহায্যার্থ এইরূপ ব্যাঙ্ক সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন এ দেশে কি কৃষি, কি বাণিজ্য, কিছুরই উন্নতি হইবে না।

* * *

রেসম শিল্পের উন্নতির জন্য বাঙ্গালার অনেকস্থলেই বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। রাজসাহীর ডায়মণ্ড জুবিলি-শিল্প-বিদ্যালয় হইতে অনেকগুলি ছাত্র রেসম তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে। এই সকল ছাত্রেরা সকলেই চাকরি পাইয়াছে। গত বৎসর এই বিদ্যালয় হইতে অনূন সতেরটি ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল। টাটার রেসমের আবাদে শিক্ষালাভ করিবার জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা তথায় একজন শিক্ষককে পাঠাইয়াছিলেন। ইতালীর পাডুয়া হইতে বীজ আনাইয়া এখানে গুটি তৈয়ার করা হইয়াছিল। মেদিনীপুরের সাবং নামক স্থানে আর

একটী রেসমের কাষ শিখিবার বিদ্যালয় আছে। মেদিনীপুর জেলায় যাহাতে রেসমের কারবারের উন্নতি হয় ইহার তাহাই উদ্দেশ্য। এইরূপ মুর্শিদাবাদ ও মালদহে দুইটি বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট একটি করিয়া তুঁতের আবাদ করিবার আদর্শ ক্ষেত্র সংস্থাপিত হইয়াছে।

* * *

বাঙ্গালার ছোটলাট সাহেব বাঙ্গালায় কৃষি কার্য্যের উন্নতির জন্য একটি কৃষিসভা সংস্থাপিত করিয়াছেন। বাঙ্গালার অনেকগুলি জমীদার এই সভার সভ্য হইয়াছেন। যাহাতে মফঃস্বলে কৃষকদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে উন্নত কৃষিজ্ঞান প্রচারিত হয়, যাহাতে তাহারা বিবিধপ্রকার শস্য ও সারাদির পরীক্ষার ফল অবগত হইতে পারে, সভা তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যাহাতে মফঃস্বলের প্রত্যেক জেলায় ও প্রত্যেক মহকুমায় ইহার শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ও সেই সকল শাখা সভায় সভ্যগণ প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদিগকে কৃষিবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন তাহারও চেষ্টা করা হইবে। আমরা আশা করি মফঃস্বলবাসিগণ এইরূপ সভা স্থাপনে বিশেষ রূপে উদ্যোগী হইবেন। মাদ্রাজ প্রদেশে এইরূপ মফঃস্বল-সভা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।

* * *

মাদ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড নামক সংবাদপত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গ্রিন বার্লো নামক সাহেব ভারতবর্ষের শ্রমশিল্প সম্বন্ধে Industrial India নামে একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে আমাদিগের দেশের শিল্পাদি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কি উপায়ে এদেশের শিল্পসমূহের উন্নতিসাধন করিতে পারা যায় গ্রন্থকার সে বিষয়েও অনেক সুপরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। গ্রিন বার্লো সাহেব বহুদিন এদেশে থাকিয়া আমাদিগের জাতীয় চরিত্র বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এজন্য আমাদিগের যে যে বিষয়ে ত্রুটি আছে গ্রন্থমধ্যে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যদি সেই সকল দোষ পরিহার করিতে সমর্থ হই তাহা হইলে আমাদিগের কৃষিশিল্পের উন্নতি অতি সহজেই সাধিত হইতে পারে।

* * *

বার্লো সাহেব তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই ভারতে উৎপন্ন হয়। তিনি বলেন ভারতবর্ষ যেরূপ মহাদেশ তাহাতে এখানকার উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয় করিবার জন্য অন্য দেশের হাট বাজারে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না। ভারতের অধিবাসিগণ—দেশীয় রাজগণ হইতে সামান্য কৃষক—যদি দেশের জন্য চিন্তা করে, দেশের শিল্পকে রক্ষা করিতে উদ্যোগ করে, তাহা হইলে সহস্র প্রকার বিনষ্টকারী শুল্কের ব্যবস্থায় ও সহস্র প্রকার বৈদিশিক প্রতিযোগিতায় এখানকার শিল্পের অণুমাত্র ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি ভারতবাসীকে স্বদেশীয় শিল্প সামগ্রী ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতের শিল্প ও ভারতের বাণিজ্যের সহায়তা করাই প্রকৃত দেশহিতৈষিতা। শিল্প বাণিজ্যের সহিত যদি দেশহিতৈষিতার সমন্বয় হয় তাহা হইলে দেশের উন্নতি ও ধনবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু উৎপাদক দেশহিতৈষী হইলে চলিবে না, ক্রেতাকেও দেশহিতৈষী হইতে হইবে। এই কথা বলিয়া বার্লো সাহেব আমাদিগের বিদেশজাত সামগ্রীর পক্ষপাতিতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এদেশে এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন যাঁহারা দেশী জিনিসের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁহারা বিদেশজাত সামগ্রী ব্যবহার করিলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। এই সকল লোক আপনার দেশজাত সামগ্রীতে নীচের ন্যায় অন্ধ হইয়া, য়ুরোপীয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া আপনার দাম্ভিকতার পরিচয় দিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। ইহারা মনে করেন যে এইরূপ করিলেই লোকে তাহাদিগকে সৌখীন ও সুরুচিসম্পন্ন মনে করিবে। গ্রিন সাহেবের এই কথাগুলি যে অণুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

* * *

যদি ভারতে শিল্পী ও সাধারণ লোক সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে কোন সামগ্রীরই আমদানী করিবার আবশ্যক হয় না। আমরা বহুবার এই কমলাতে দেখাইয়াছি যে, আমাদিগের অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যাহা পূর্ব্বে এদেশে উৎপন্ন হইত, এখন তাহা আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করিতেছি। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে আমরা ভারতের চিনীর উল্লেখ করিতে পারি। পূর্ব্বে ভারতের চিনী দেশ বিদেশে যাইত কিন্তু এখন আমরা প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে প্রায় ৫,৮৫,০০,০০০ টাকার চিনী আমদানী করিয়া থাকি। ভারতের চিনীর কারবারকে নষ্ট করিবার জন্য য়ুরোপীয় চিনীওয়ালারা তাহা এখানে সস্তা দরে বিক্রয় করেন এবং তাঁহাদের যাহা ক্ষতি হয় তাঁহাদিগের দেশের রাজকোষ হইতে তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া হয়। এখন ভারতের লোক যদি সকলে প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় বলে আমরা য়ুরোপীয় চিনী ব্যবহার করিব না, তাহা হইলে দেখা যায় য়ুরোপীয় চিনী আমদানী বন্ধ হয় কি না। আর এদেশে যেরূপ অল্প মূল্যে মজুর পাওয়া যায় তাহাতে যদি য়ুরোপীয় উন্নত প্রণালীতে চিনী প্রস্তুত করিবার জন্য দেশের ধনীরা বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলেও বিদেশী চিনীর সহিত অল্পদিন মধ্যেই প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হন। এই উদ্দেশ্যে India Development Co. ইক্ষুর আবাদ ও চিনীর কারবার আরম্ভ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে এদেশের লাভ নাই। এ সকল কারবারে এদেশীয় মূলধন নিয়োজিত করিতে না পারিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ইহাই গ্রিন সাহেবের উল্লিখিত ব্যবসায়ের সহিত দেশহিতৈষিতার সমন্বয়। কিন্তু অনেক অদূরদর্শী অনভিজ্ঞ লোক ইহা অসম্ভব মনে করে। তাহারা কূপমণ্ডুক, আপনাদিগের কূপের বাহিরে যে জগৎ আছে তাহা জানেন না। তাহারা মনে করে, হইলই বা বিদেশজাত সামগ্রী, ইহা বিক্রয়ে ত আমরা লাভবান্ হইতেছি, তবে আবার দেশে উহা উৎপন্ন করিবার আবশ্যক কি? আবশ্যক কি তাহা বুঝেন ইরোপীয়েরা, সেই জন্যই তাঁহাদিগের এত উন্নতি। আমরা গ্রিন সাহেবের এই গ্রন্থ আমাদিগের ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বারান্তরে আমরাও ইহা হইতে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

* * *

শিল্পরক্ষার সদুপায়—
শিল্প-ব্যাঙ্ক।

য়ুরোপীয় জাতিনিচয়ের প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্পের এবং শিল্পিগণের অবস্থা যে দিন দিন হীন হইতেছে তাহা আমরা বারংবার দেখাইয়াছি, এবং তাহা সকলে দেখিতেছেন। যাঁহাদের ভাবিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইতেছেন। যাঁহাদের প্রাণ মাতৃভূমির জন্য যথার্থ কাঁদে, তাঁহারা প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য ব্যস্ত। নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিজ্ঞান সভা যে এত অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের সহানুভূতি পাইয়াছেন তাহা এই আকুলতার—এই উপায় অনুসন্ধিৎসার ফল। স্বদেশী জিনিষের উপর যে লোকের নব অনুরাগ দেখা যাইতেছে তাহাও এই আকুলতা—এই অনুসন্ধিৎসার ফল।

রোগ কি, প্রতীকার কি?—রোগ—আমাদের দুর্ব্বলতা; প্রতীকার,—বল-সঞ্চয়।

বল-সঞ্চয় কিসে হয়?—(১) জ্ঞানে, (২) জোট বাঁধায়, আর (৩) পয়সায়।

(১) জ্ঞান চাই। আর মান্ধাতার আমলের মাকু, হাতুড়ি, লাঙ্গল, শিউনীতে চলিবে না। য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপানে যে অভিনব মাকু, হাতুড়ি, লাঙ্গল, পম্প প্রভৃতি হইতেছে তাহা চালাইতে হইবে—তাহা শিখিতে হইবে। এখন শুভঙ্করীতে আর চলিবে না, কাল্কুলস চাই, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, খনিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতি সকলই চাই। জগতের চারিদিক আলোকে উদ্ভাসিত, আর আমরা নিবিড় অন্ধতামসে আজিও আচ্ছন্ন!

(২) জোট বাঁধা চাই। আমাদের প্রাচীন জাতিগত ব্যবসা এবং ব্যবসাগত জাতি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন আবার নূতন ভিত্তির উপর গড়িতে হইবে; নূতন করিয়া দল বাঁধিতে, পরস্পরের সাহায্যে নূতন করিয়া সমাজচালন করিতে হইবে।

(৩) আর পয়সা তো সকলের মূল—পয়সা হইলে সবই হয়, পয়সায় জ্ঞানলাভ হয়, পয়সায় দল বাঁধা হয়, পয়সাতেই লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, পয়সাতেই বল।

বল-সঞ্চয়ের যে তিনটি উপাদান, আমরা সেই তিনটি হইতেই বঞ্চিত, সুতরাং দুর্ব্বল। অতএব এই তিনটি উপাদানই আমাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে। এই তিনটিই পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে।

নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিজ্ঞান সভার তিনটি উদ্দেশ্য:—(১) জ্ঞানলাভের জন্য দেশ বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠান (২) এখানে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করা, আর (৩) শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য পয়সা দিয়া সাহায্য করা।

ইতিমধ্যে অনেকের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে, ইহার কোন্‌টা আগে করা আবশ্যক? অবশ্য নানা মুনির নানা মত। কেহ বলিতেছেন বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠাইয়া লাভ কি? তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইবে কোথায়? আগে দেশে যে সমস্ত শিল্প বর্ত্তমান আছে, মুমূর্ষু হইতেছে, অথবা মরিয়া গিয়াছে তাহাদের চাঙ্গা কর, অনর্থক কতকগুলা পণ্ডিত-মূর্খ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষার্থীরা ফিরিয়া আসিয়া যে শিল্পকার্য্যে সাফল্যলাভ করিবে তাহার প্রমাণ কি? তাহাদিগকে কত টাকা যোগাইবে? কেহ বা বলিতেছেন বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া লাভ নাই। এখানে নূতন নূতন শিল্পকার্য্যের প্রতিষ্ঠা কর, দেশে যত ভাল কারিকর পাওয়া যায় সংগ্রহ কর—প্রয়োজন মত বিদেশ হইতে পণ্ডিত ও ওস্তাদ আনাইয়া এদেশের লোককে শিখাইয়া লও।

ফলে সকল যুক্তির মূলেই কতকটা সত্য আছে। কোন পক্ষের আশঙ্কাই নিতান্ত অমূলক নহে। আমাদের বিবেচনায় উপরি উক্ত উপায়ের সকলগুলিই আবশ্যক। বিদেশে ছাত্র পাঠানও আবশ্যক, আর গুরু আমদানী করাও আবশ্যক। তা ছাড়া দেশে যে সমস্ত শিল্প বর্ত্তমান, মুমূর্ষু বা মৃত তাহাদিগের উদ্ধারও আবশ্যক।

ব্যাপার বড় গুরুতর! সকলের মূলেই পয়সা চাই। এ পয়সা আসে কোথা হইতে? যে দেশের লোক দুবেলা পেট ভরিয়া অন্ন পায় না, তাহারা পয়সা পাইবে কোথা হইতে?

বাস্তবিক আমাদের মনে হয়, মূলধনের সমস্যাটা বড়ই গুরুতর। পয়সা জুটাইতে পারিলে আর

আর সকলগুলি সহজসাধ্য হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় শিল্পের উন্নতিজন্য শিল্পব্যাঙ্ক স্থাপন করাই মূলধনলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। ইহাতে দুই প্রকার লাভ। (১) সঞ্চিত মূলধন নষ্ট না হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, (২) শিল্পের সাহায্য হইবে।

কৃষিব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি * প্রভৃতির আলোচনাকালে আমরা এইরূপ প্রণালীর মহাজনী দ্বারা মূলধন সরবরাহ করিবার উপায় দেখাইয়াছি। আমাদের প্রস্তাবিত শিল্প-ব্যাঙ্কও ঐ প্রণালীর মহাজনী। শিল্পের রক্ষা, উন্নতি ও সহায়তা করা এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য হইবে। মূলধন সংগ্রহ, টাকা ধার দেওয়া নিয়ম প্রভৃতি উপরি উক্ত ব্যাঙ্কগুলির মত হইবে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করিতে পারিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে।

মূলধনের অভাব দেশে চিরদিন আছে, কিন্তু পূর্ব্বে যে উপায়ে এই অভাব দূর করা হইত, এখন সে উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে না। পূর্ব্বে দেশের অভাব অতি অল্পই ছিল, সুতরাং অতি অল্প পরিমাণেই শিল্প-সামগ্রী উৎপন্ন হইত। যাহা উৎপন্ন হইত তাহার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন হইত তাহা ব্যক্তিগত সাহায্যেই সংগৃহীত হইত। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক; বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য তন্তুবায়দিগের মূলধনের অল্পই প্রয়োজন হইত, কেন না যাহাদিগের বস্ত্রাদি প্রয়োজন হইত তাহারা তন্তুবায়দিগকে সূত্রাদি উপকরণ দিত। প্রত্যেক গৃহস্থ আপনাদিগের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের জন্য চরকা কাটিয়া সূতা দিত, সুতরাং তন্তুবায়দিগকে মূলধনের জন্য ভাবিতে হইত না। বস্ত্রবিক্রেতারাও তন্তুবায়দিগের দ্বারা ঐ নিয়মে বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া লইত। এখনও বস্ত্রবিক্রেতারা অনেকটা ঐ নিয়মে বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া লইয়া থাকে। কেহ সূতা দেয় কেহ বা সূত্রাদি উপকরণের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দাদন দিয়া থাকে। এই প্রথা শিল্পের উন্নতির বিশেষ অন্তরায়। যে ব্যক্তি ক্রেতা সেই মহাজন হইলে তাহার সহিত বাধ্যবাধকতাপ্রযুক্ত শিল্পী স্বাধীনভাবে কারবার করিতে পারে না। ইহাতে শিল্পজাত সামগ্রীর মূল্য ক্রেতার ইচ্ছানুরূপ ধার্য্য হয়। সে কেবল পেটের অন্ন করিয়া খায় মাত্র। কেবল পেটের অন্ন করিয়া খাইতে পাইলেই তো আর অবস্থার উন্নতি হয় না?

বস্ত্রের সম্বন্ধে যেরূপ বলা গেল সকল শিল্প সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। অতএব মহাজন-খরিদ্দারের হস্ত হইতে কারিকরদিগকে রক্ষা করিতে পারিলে তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি ও সেই সঙ্গে শিল্পের উন্নতি হইতে পারে।

যে সকল দেশে শিল্প-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে ব্যাঙ্কগুলিই তাহার প্রধান সহায়। য়ুরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিল্পীরা ক্রেতার নিকট টাকা দাদন লইয়া মাথা বিক্রয় করেনা। তাহাদিগকে টাকা দাদন দিবার জন্য সে দেশে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। য়ুরোপের ব্যবসায়ীদিগকে টাকা সরবরাহ করিবার জন্য যে সমিতি আছে, তাহা যে ব্যাঙ্ক বই আর কিছুই নহে এ কথা বোধ হয় কাহাকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। এই সকল ব্যাঙ্ক হইতে সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা ঋণ লইয়া আপন আপন ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই জন্যই পাশ্চাত্য দেশে ব্যবসায়ের এত উন্নতি। কি প্রণালীতে এই সকল ব্যাঙ্ক টাকা দিয়া থাকেন তাহা আমরা বিবৃত করিতেছি।

প্রথমে চা বাগানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। যাঁহাদিগের চা বাগান আছে তাঁহারা সম্বৎসরে কি পরিমাণ চা উৎপন্ন করিবেন ব্যাঙ্ককে তাহার একটা তালিকা প্রেরণ করেন। ঐ পরিমাণ চা প্রস্তুত করিতে কত টাকা প্রয়োজন হইবে এবং তাহা বিক্রয় করিলে কত টাকা পাওয়া যাইবে, তাহারও একটা হিসাব প্রদান করিয়া থাকেন। এই হিসাব ঠিক কি না ব্যাঙ্ক অবশ্য তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তাহার পর ব্যাঙ্ক তাঁহাদিগের নিকট হইতে একখানি বন্ধক পত্র গ্রহণ করেন অর্থাৎ চা-বাগানে যে চা উৎপন্ন হইবে তাহা বন্ধক রহিল, সাদা এক Letters of hypothecation পত্রে ইহা লিখাইয়া লইয়া প্রয়োজন মত নির্দ্দিষ্ট টাকা যোগাইতে থাকেন।* তাহার পর যখন চা উৎপন্ন হয়, চা-কর

* কমলা ১ম খণ্ড ৭ম সংখ্যা (আষাঢ়) ৩৩০ পৃষ্ঠা।

* কমলা ১ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা (আষাঢ়) ৩৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহা ব্যাঙ্কওয়ালার নিকট প্রেরণ করেন, তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া আপনার টাকা আদায় করিয়া লন। যখন সমস্ত চা বিক্রয় হইয়া যায়, তখন বাকি টাকা চা-ওয়ালাকে প্রদান করেন। চা-কর যদি এরূপ সুবিধা না পাইতেন, তাহা হইলে কি তিনি সহজে আবাদ করিতে পারিতেন?

তারপর সওদাগরী আফিস দেখুন। এই কলিকাতা সহরে অনেক বড় বড় সওদাগরী আপিস আছে, তাঁহারা এক এক সময়ে দশ বিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য সামগ্রী আমদানি রপ্তানি করিয়া থাকেন। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ঋণ না পাইলে কয়জন সেরূপ করিতে পারিতেন? কোনও সওদাগর এক লক্ষ টাকার কাপড় আমদানি করিলেন, কাপড় যখন পৌঁছিল তিনি সেই জাহাজে-বোঝাই কাপড়ের চালান দেখাইয়া বন্ধক-পত্রে সহী করিয়া টাকা লইলেন ও তদ্দ্বারা যিনি কাপড় চালান দিয়াছিলেন তাঁহার দেনা শোধ করিলেন। তাহার পর জাহাজ হইতে কাপড় খালাস করিয়া তাহা "বানে দিলেন" অর্থাৎ Bonded Ware house নামক বন্ধকী মালের গুদামে রাখিলেন ও সেই গুদামের রসিদ ব্যাঙ্কওয়ালাকে অর্পণ করিলেন। তাহার পর যেমন যেমন মাল বিক্রয় হইতে লাগিল সেই পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্ককে দিয়া ঋণ শোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত কাপড় বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করেন ও নিজের লভ্যাংশ গ্রহণ করেন। টাকার জন্য তাঁহাকে আকাশ পাতাল ভাবিতে হয় না ও তাঁহার সমস্ত উদ্যম সেই একটি বিষয়ে নিয়োজিত করিতে হয় না। এস্থলে বলা আবশ্যক তিনি যত টাকার মাল আমদানি করেন ব্যাঙ্ক তাহার সমস্তটা ঋণ দেন না। মূল্যের সিকি অংশ ব্যাঙ্কের হাতে রাখিতে হয়। ইহার অর্থ এই যে, যদি কোন কারণে মূল্য ঘাটিয়া যায়, আর যিনি আমদানি করিয়াছিলেন তিনি যদি কোন কারণে ব্যাঙ্কের দাবী মিটাইতে অসমর্থ হন, তাহা হইলেও মাল বিক্রয় করিয়া আপনার প্রাপ্য পাইতে ব্যাঙ্ককে কষ্ট পাইতে হইবে না।

আর একটা দোকানদারীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। এক ব্যক্তি কোন ব্যাঙ্কের সাহায্যে দোকান খুলিলেন। ব্যাঙ্ক টাকা যোগাইতে লাগিলেন এবং দোকানের তহবিল নিজহস্তে লইলেন। মালপত্রও নিজের বিশ্বাসী লোকদিগের হেপাজতে রাখিলেন। ব্যাঙ্কের টাকার জোরে কারবার অল্প দিনে ফাঁপিয়া গেল। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

উপরে যেরূপ বিবৃত করা গেল, তাহাতে য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসা চালাইবার জন্য টাকার কিরূপ সুবিধা তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। এক্ষণে আমাদিগের দেশের শিল্পীদিগের জন্য যদি এইরূপ প্রথায় টাকা সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে অতি অল্প কালের মধ্যে তাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে। আমাদের কথা কাল্পনিক নহে সোলাপুরের কালেক্টর সাহেব তথাকার তন্তুবায়দিগকে টাকা সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের ব্যবসায়ের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে কমলাতে * প্রকাশ করিয়াছি। প্রত্যেক প্রধান নগরে এবং মফঃস্বলের প্রত্যেক মহকুমায় যদি এই রূপ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এবং সেই সকল ব্যাঙ্ক শিল্পী, ব্যবসায়ী এবং কারখানাদারদিগের নিকট রীতিমত জামিন লইয়া টাকা সরবরাহ করেন, তাহা হইলে কেবল যে তাঁহারা দেশের উপকার করিবেন তাহা নহে, আপনাদিগের নিয়োজিত মূলধনের সুদ হইতে প্রভূত লাভ করিতে পারিবেন।

কিছু দিন হইল এই কলিকাতা সহরে ১৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটি ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হয়। দশ বার বৎসরের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক মূলধনের অপেক্ষা অধিক টাকা গচ্ছিত করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অংশীদারদিগকে বাৎসরিক শতকরা ছয় সাত টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের দেশের ধনীরা কোম্পানির কাগজে অর্থ নিয়োজিত না করিয়া সমবেত চেষ্টাদ্বারা এইরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন। অবশ্য এই সকল ব্যাঙ্কের পরিচালন ভার ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন যোগ্য লোকের হস্তে রাখা প্রয়োজন এবং যে সকল দ্রব্যের জন্য বা কলকারখানার জন্য টাকা দিবেন তাহার মূল্য নির্দ্ধারণে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

আমাদিগের দেশের লোকের যে এরূপ

* কমলা, ১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা (আষাঢ়)।

ব্যবসা বুদ্ধি নাই তাহা নহে। যাঁহারা কৃষক বা অন্যান্য ব্যবসায়ীকে টাকা দাদন দেন, তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দূরে থাকুক যথেষ্ট লাভবান্ হইয়া থাকেন। এই জন্যই পল্লীগ্রামে অনেক লোক হাতে কিছু টাকা হইলেই তেজারতী করিয়া থাকেন।

দেশের লোক এখন যাহা করিতেছে, সেই কার্য্যই বিলাতি ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্তে একটু পরিবর্ত্তিত ও বিস্তৃত আকারে করিলে সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে। টাকা খাটাইবার জন্য এখন ভারতবর্ষের নানা স্থানে লোন কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত লোন কোম্পানি জামিন লইয়া লোককে টাকা ধার দিয়া থাকেন। এই সমস্ত লোন কোম্পানির রিপোর্টে দেখা যায় তাঁহারা বেশ লাভও করিতেছেন। যদি এই সমস্ত লোন কোম্পানি দেশের শিল্পোন্নতির জন্য টাকা সরবরাহ করেন তাহা হইলে তাঁহাদেরও লাভ হইবে এবং শিল্পসমূহেরও উন্নতি হইবে।

বড় বড় কারখানা করিতে বিস্তর টাকার প্রয়োজন। যৌথ-প্রথায় হউক অথবা কেহ নিজেই হউক যদি কেহ ঐরূপ কলকারখানা করেন এবং ব্যাঙ্কের নিকট টাকা পাইবার সুবিধা পান তাহা হইলে এ দেশে অতি অল্পায়াসেই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

আমরা উপরেই বলিয়াছি যে কারবারের জন্য মূলধন সাহায্য করা নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিজ্ঞান সমিতির একটা উদ্দেশ্য; তজ্জন্য তাঁহারা সংগৃহীত অর্থে কতকাংশ স্বতন্ত্র রাখিবেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় ঐ টাকায় শিল্প-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা। সমিতি যদি অন্য পদ্ধতি ছাড়িয়া এই ব্যাঙ্কের প্রণালীতে টাকা সরবরাহ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের মূলধন বজায় থাকিবে—শুধু বজায় থাকিবে না, বাড়িবে—আর ইচ্ছামত উদ্দেশ্যও সুসিদ্ধ হইবে। শুধু তাহাই নহে। মূলধন নষ্ট হইবার আশঙ্কা না থাকিলে অনেকে ব্যাঙ্কের জন্য টাকা দিতে অগ্রসর হইবেন। এজন্যই আমরা শিল্প-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার জন্য এই সমিতিকে অনুরোধ করি। আমরা অবগত হইলাম যে এই সমিতির কোন কোন সদস্য এইরূপ ব্যাঙ্ক-স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা আশা করি সমিতি এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবেন। আমাদের বিবেচনায় শিল্প-ব্যাঙ্ক স্থাপনই শিল্প রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

শিরীষ।

শিরীষ জিলেটিন নামক রাসায়নিক পদার্থসম্ভূত শুষ্ক বস্তু বিশেষ। বিশুদ্ধ জিলেটিন প্রস্তুত অতীব ব্যয় ও শ্রমসাপেক্ষ। কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটী মূল পদার্থই জিলেটিনের প্রধান উপাদান। জিলেটিনের শতকরা ৪৭'৮৮ কার্ব্বণ, ৭'৯১ হাইড্রোজেন ও ২৭'২১ অকসিজেন আছে। আইসিংগ্ল্যাস নামক পদার্থে শতকরা ৮৬ হইতে ৯৬ ভাগ জিলেটিন আছে। জিলেটিনের আঠা অতি দৃঢ়, কাষ্ঠাদি ইহাতে অতি সুন্দর ভাবে জুড়িয়া যায়। ফুটন্ত জলে জিলেটিন গলিয়া থাকে; কিন্তু শীতল জলে কদাপি দ্রব হয় না। এল্‌কোহল ট্যানিন জিলেটিনকে দ্রব হইতে অধঃপাতিত করিয়া দেয়। সল্‌ফিউরিক এসিড সংযোগে ফুটন্ত তাপে জিলেটিন শর্করায় পরিণত হয়। জান্তব পদার্থ হইতেই জিলেটিনের উৎপত্তি এবং এই জিলেটিনই শিরীষের সার। জান্তব পদার্থ হইতে যেরূপ জিলেটিন, উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে সেইরূপ গ্লুটেন নামক আর এক প্রকার আঠা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাগজ জুড়িবার কাই গ্লুটেন ভিন্ন আর কিছুই নয়। শিরীষে জিলেটিনের ভাগ যতই অধিক থাকিবে উহা ততই উত্তম হইবে। শিরীষ সূত্রধার ও অন্যান্য সন্ধিকারকগণের এক বিশেষ প্রয়োজনীয়। শিরীষদ্বারা কাষ্ঠখণ্ড জুড়িলে সন্ধিস্থলে কোনরূপ ফাঁক থাকে না।

শিরীষের বিস্তৃত ব্যবসা অনেক দেশেই আছে। এ ব্যবসায়ে লাভও সমধিক হইয়া থাকে। শিরীষের উপাদান প্রায় সকল দেশেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে। যে সমুদায় দ্রব্য মানবের পরিত্যক্ত তাহা হইতেই শিরীষ প্রস্তুত হয়, সুতরাং উপাদানগুলির মূল্য নাই অথবা অতি সামান্য। যাহা কিছু ব্যয় ও শ্রম তাহা কেবল সংগ্রহের নিমিত্ত। বাজারে শিরীষের কাট্‌তিও বেশ আছে। কিঞ্চিৎ শ্রম ও ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে অতি স্বল্প মূলধনে এক লাভের ব্যবসা হইতে পারে। উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিলে সর্ব্বত্রই ইহার আদর হইবে। কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকিলেই প্রস্তুত দ্রব্য উৎকৃষ্ট হইবে। আমাদের দেশে শিরীষের আঠা ভাল হয় না ও সেরূপ স্থায়ী হয় না। প্রস্তুতকারকের অজ্ঞতাই ইহার কারণ।

শিরীষের উপাদান সকলেই বিদিত আছেন। প্রাণীগণের অস্থি হইতে উপরের চর্ম্ম অবধি সমুদায় ভাগেই অল্প বিস্তর শিরীষ প্রস্তুতোপযোগী পদার্থ আছে। প্রাণীর অভাব পৃথিবীতে কোথায়? প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকরতপ্ত মরু হইতে প্রখর শীতল তুষারময় মেরু সন্নিহিত প্রদেশ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থলই প্রাণীবৃন্দ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত; সুতরাং সকল দেশে সর্ব্বকালে শিরীষের উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিঞ্চিৎ ব্যয় ও শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক একস্থলে অনেক সংগ্রহ করিতে পারিলেই শিরীষের ব্যবসায় চিরকাল সমভাবে চলিয়া যাইবে। আর প্রস্তুত-প্রক্রিয়াও অতি সরল; অন্যান্য পদার্থের ন্যায় দুরূহ ও জটিল নহে। ইহার সহিত অভিজ্ঞতা, সতর্কতা ও কার্য্যকুশলতার সমন্বয় হইলে উৎপন্ন দ্রব্যও উৎকৃষ্ট হইবে; উৎকৃষ্ট হইলে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় কারিকরগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে; তদ্বারা কাট্‌তি অধিক হইতে থাকিবে, ফলে লাভও বেশ সন্তোষজনক হইবে। কেবল জিনিষ করিতে পারিলে হয় না, ভাল করিতে হইবে।

পশু-চর্ম্ম সকলভাবেই শিরীষ প্রস্তুতোপযোগী। গোমেষাদির ক্ষুর, শৃঙ্গ, চর্ম্ম, নালী, পেশী ইত্যাদি হইতেই সচরাচর শিরীষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ দেশে ভাগাড়ে মৃত পশু-দেহ নিক্ষিপ্ত হইলে মুচিরা ছালটি ছাড়াইবার পর শকুনিরা মাংস খাইয়া ফেলে, অস্থিগুলি সংগৃহীত হইয়া চূর্ণ হইবার জন্য কলে প্রেরিত হয়। অবশিষ্ট ভাগ সংগ্রহ করিতে পারিলে শিরীষের কাজে অনায়াসে লাগিয়া যাইতে পারে। কসাইখানায় (Slaughter House) প্রতিদিন মানবের দগ্ধোদর কণ্ডূয়ন নির্ব্বৃত্ত করিবার জন্য কত পশু পশুলীলা সংবরণ করিয়া থাকে। চর্ম্ম ও মাংস ব্যতিরেকে অন্যান্য পরিত্যক্ত পশুদেহাবশেষ প্রভূত পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। চর্ম্মবিক্রেতার আড়তের অনাবশ্যকীয় চর্ম্মখণ্ড সকল সংগ্রহকরা কিছু প্রভূত ব্যয় সাপেক্ষ নহে। অব্যবহার্য্য চর্ম্মখণ্ড ও চর্ম্ম-

নির্ম্মিত পদার্থের ছিন্নাবশেষ সংগ্রহ করা অতীব দুঃসাধ্যও নহে। যানাদি বহনক্ষম পশুগণের ক্ষুরের ছাঁট ইত্যাদিও কার্য্যে লাগিতে পারে। পাদুকা প্রস্তুত কালে চর্ম্মকারগণ অনাবশ্যকীয় যে সকল কর্ত্তিত চর্ম্মখণ্ড ফেলিয়া দেয় কিঞ্চিৎ শ্রম বা ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক সেগুলির সংগ্রহ বিশেষ দুরূহ নহে। অব্যবহার্য্য পুরাতন চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্য নিচয়ও কার্য্যে লাগিতে পারে। ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সকল ডোম প্রভৃতি ইতর জাতিগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া যেরূপ কাগজ নির্ম্মাণে সহায়তা করে, সেইরূপ পুরাতন জীর্ণ চর্ম্মখণ্ড সকল সংগৃহীত হইয়া অনায়াসে শিরীষ প্রস্তুতের জন্য ব্যয়িত হইতে পারে। লাভের লোভ থাকিলে এরূপ সংগ্রহকারকের ও অভাব হইবে না।

পশুচর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারেই শিরীষ প্রস্তুতোপযোগী বটে কিন্তু চর্ম্মে অধিক পরিমাণে ট্যানিন সংযুক্ত হইলে উৎপন্ন শিরীষ অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। পশুচর্ম্ম ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে কোমল করা আবশ্যক। এই প্রক্রিয়া (Tanning) দ্বারা চর্ম্মের সহিত ট্যানিন নামক পদার্থ বিশেষের সংযোগ হয়। বৃক্ষ বিশেষের ত্বক হইতেই সচরাচর উক্ত ট্যানিন গৃহীত হয়। এই ট্যানিনের ভাগ চর্ম্মে অধিক থাকিলে বা ট্যানিন দৃঢ়রূপে চর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হইলে, তদুৎপন্ন শিরীষের আঠা সেরূপ দৃঢ় হয় না। উপাদান যেরূপ বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট হইবে আঠাও সেরূপ দৃঢ় ও স্থায়ী হইবে। চর্ম্ম বা শিরীষ প্রস্তুতোপযোগী অন্যান্য পদার্থ পচিয়া যাইলে শিরীষ খারাপ হইয়া থাকে; সুতরাং পচন নিবারণে শিরীষ-প্রস্তুতকারকের অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয়। মোটা চর্ম্ম হইতেই ভাল শিরীষ হইয়া থাকে।

শিরীষ প্রস্তুত করিতে হইলে চর্ম্মাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সকল চূণের জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। বৃহৎ চৌবাচ্চার ন্যায় আধারে অধিক চূণযুক্ত জলের অভ্যন্তরে দশ বার দিবস ডুবাইয়া রাখিতে হয় এবং মাঝে মাঝে অন্ততঃ তিন চারিবার চূণের জল বদলাইয়া দিতে হয়। এই প্রক্রিয়াদ্বারা চর্ম্মসংলগ্ন রক্ত ও অন্যান্য কোমল পদার্থ সকল বিদূরিত হয় এবং চর্ম্মের কঠিনতর উপরিভাগ চূণের দ্বারা আংশিক আক্রান্ত হইয়া জিলেটিনযুক্ত পদার্থের দ্রবণশীলতা বর্দ্ধিত করে। তৎপরে ক্রমোন্নত স্থলে এই গুলি রক্ষিত হইলে জল ঝরিয়া যায় এবং দিবসে তিন চারি বার নাড়িয়া শুকাইয়া লইতে হয়। তখনও উহার সহিত অনেক চূণ থাকিয়া যায়। তৎপরে বেশ শুকাইলে ঐগুলিকে পুনর্ব্বার স্বল্পমাত্র চূণযুক্ত জলে ডুবাইয়া পরিশেষে পরিষ্কার জল-দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হয়। তাহাতে জলের তোড়ে ময়লা ইত্যাদি ও অতিরিক্ত চূণ চলিয়া যায়। এইরূপে বেশ পরিষ্কৃত হইলে জল ঝরিতে দিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। চূণ যদি ধুইয়া না গিয়া অবিকৃত (Caustic State) থাকে তাহা হইলে তাপ লাগিলেই শিরীষ একেবারে খারাপ হইয়া যাইবে, এইজন্য যাহাতে চূণ না থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। জল ঝরিয়া যাইতে দিবার জন্য যদি চূণ অল্পমাত্র থাকে তাহা হইলে কিঞ্চিৎ কাল বহির্বায়ুতে রাখিলে চূণ বায়ুস্থ কার্ব্বণিক এসিডের সংযোগে কার্ব্বণেট হইয়া যাইবে ও তাহাতে শিরীষের কোন হানি হইবে না। Caustic অবস্থায় চূণ শিরীষ গালাইবার এক বিশেষ অন্তরায়। শিরীষের জন্য উক্ত চর্ম্মাদির খণ্ড সকলকে গালাইবার পূর্ব্বে যে একেবারে শুষ্ক করিতে হইবে এরূপ নহে, বরং কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিলেই ভাল হয়; কেন না তাহা হইলে শিরীষ শীঘ্র গলিতে আরম্ভ করে।

তাম্র বা পিত্তল নির্ম্মিত বৃহৎ অগভীর কটাহে শিরীষ গালান হইয়া থাকে। এই পাত্রগুলির আয়তন যেরূপ বৃহৎ, গভীরতা তদনুপাতে অতি অল্প। কটাহের তলদেশ ন্যুব্জাকার না হইয়া একেবারে সমতল। কটাহের তলা দুইটী— একটীর উপর আর একটী। নিম্নের তল হইতে তিন চারিটী তিন বা চারি ইঞ্চি উচ্চ পায়া উত্থিত হইয়া উপরের তলটী ধারণ করিয়া আছে। উভয় তলের ব্যবধান তিন চারি ইঞ্চি ও মধ্য শূন্য-গর্ভ। উপরের তলটী লৌহ বা তাম্র নির্ম্মিত সচ্ছিদ্র ঝাঁঝরার ন্যায়। অগলিত বা আংশিক গলিত চর্ম্মাদির খণ্ডসকল উপর তলে থাকে এবং গলিয়া যাইলে জলবৎ পদার্থ তলদ্বয়ের মধ্যস্থলে সঞ্চিত হয়। ইহাতে পুড়িয়া যাইবার বা তলায় ধরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। উক্ত তাম্র বা পিত্তল কটাহের তিন ভাগের দুই ভাগ পরিস্রুত

জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া উপরে অতি উচ্চ করিয়া উক্ত খণ্ডসকল চুর সাজাইতে হয়, তৎপরে নিম্নের চুল্লীদ্বারা সমভাবে মৃদু উত্তাপে দিয়া ফুটাইলে কিয়ৎক্ষণ ফুটিবার পর গলিতে আরম্ভ করে ও উপরের চুরীকৃত চর্ম্মখণ্ড সকল নামিয়া গিয়া দ্রবীভূত হইতে থাকে। এই সময় হাতাদ্বারা বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হয় ও মাঝে মাঝে সচ্ছিদ্র তলের উপরে চাপ দেওয়া আবশ্যক। ফুট যাহাতে সমভাবে হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। কাষ্ঠ বা পাথুরে কয়লা অপেক্ষা বাষ্পোত্তাপ দিতে পারিলে ভালই হয়; কারণ বাষ্পোত্তাপ সকল সময়, সমভাবে অনায়াসে রাখিতে পারা যায়।

গলিতে আরম্ভ করিয়া শিরীষ যেমন তরলাবস্থায় উক্ত তলদ্বয়ের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে, অমনি উহা ঢালিয়া লইতে হয়। নিম্নে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তাহাতে ইষ্টপককযুক্ত একটী নল লাগাইয়া দিয়া স্বেচ্ছামত ককটী ঘুরাইলেই গলিত শিরীষ আসিয়া অন্য পাত্রে রক্ষিত হয়। শিরীষ গলিলেই গড়াইয়া লইতে হয়। উৎপন্ন শিরীষের উৎকর্ষতা এই ক্রমের উপর নির্ভর করে। প্রথমবারে যাহা গালাইয়া পাওয়া যায় উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—দ্বিতীয়বারের উৎপন্ন শিরীষ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট, তৃতীয় বারের শিরিষ তদপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট, এইরূপ। ইহার কারণ এই যে ফারেনহাইটের ২১২° ডিগ্রী তাপে উৎপন্ন জেলেটিন যদি উক্ত তাপে আরও কিছুক্ষণ থাকে তাহা হইলে উহাতে এক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় যে সেরূপ আঠা বাঁধে না; সুতরাং গলিয়া গেলে যখনই এরূপ তরল দেখা যাইবে যে, শীতলাবস্থায় বসিয়া ঘন হইতে পারে এবং তার, দিয়া ঐ প্রকার ঘন শিরীষ পাতের ন্যায় করিয়া কাটিলেও অপেক্ষাকৃত কঠিন থাকিয়া বিচ্ছিন্ন হইবে, তখনই গলিত শিরীষ ঢালিয়া লওয়া উচিত ইহাই শিরীষের পাক। মোদকেরা যেরূপ চিনির পাক হইল কি না পরীক্ষার জন্য অঙ্গুলিতে কিঞ্চিৎ লাগাইয়া সূক্ষ্ম তার কাটাইয়া দেখে, শিরীষের পাকও হইল কি না জানিবার জন্য এক পরীক্ষা আছে। একটী ডিম্বের খোলার অর্দ্ধাংশ বা অতি পাতলা বাটীর ন্যায় কোন কাষ্ঠ-পাত্র গলিত শিরীষদ্বারা পূর্ণ করিয়া বায়ুতে কিয়ৎক্ষণের জন্য শীতল হইতে দিলে যদি দেখা যায় যে দুই চারি মিনিটের মধ্যে উহা "সমভাবে জমিয়া" যাইতে আরম্ভ করিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে শিরীষের পাক ঠিক হইয়াছে। তাহা না হইলে আর কিছুকাল ফুটাইতে হইবে। পাক ঠিক হইল কি না জানিতে বহুদর্শিতার আবশ্যক।" পাক ঠিক হইলে ইষ্টপককটিকে অর্দ্ধেক ঘুরাইয়া দিলে জলবৎ তরলাকার শিরীষ অল্পে অল্পে আসিয়া আর একটী পাত্রে পড়িতে থাকে। এই পাত্রটীর তিন দিক শীতল জল দ্বারা বেষ্টিত বা মুখটী পর্য্যন্ত শীতল জলে ডুবান থাকে। শেষোক্ত পাত্রের তলদেশে পূর্ব্বের ন্যায় একটী ছিদ্রে ইষ্টপককযুক্ত, এক নল আছে। এই পাত্রে আসিলে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া জুড়াইতে দিতে হয়। বেশ জুড়াইয়া আসিলে ইষ্টপকক ঘুরাইয়া দিতে হয় এবং এইবার ছাঁচে ঢালিতে পারা যায়। এইবার শিরীষের সহিত সামান্য (পাঁচ শত ভাগের এক ভাগ) ফটকিরি চূর্ণ মিশাইতে হয় এবং একটু নাড়িয়া চাড়িয়া শীতল করিবার জন্য রাখিতে হয়।

প্রথমবার গড়াইয়া লইলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট কারণ ইহা অতি তরল ও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ, উপরে যে প্রকার প্রণালী বিবৃত হইল উহার নাম ফ্লাণ্ডার্স বা ডচ্ প্রক্রিয়া। ইংরাজী প্রক্রিয়াও প্রায় এইরূপ। প্রথমবার গালাইয়া তরলীকৃত শিরীষ ঢালিয়া লইয়া অবশিষ্ট উপাদানে জল মিশ্রিত করিয়া পুনরায় ফুটান হয়। এইবার গলিয়া যাইলে যাহা পাওয়া যায়, উহার সহিত আবার নূতন উপাদান সংযোগে গলিত করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে তাম্রপাত্রে পাঁচ ঘণ্টাকাল থিতাইতে ও জুড়াইতে দিয়া শেষে ছাঁচে ঢালা হইয়া থাকে।

ছাঁচে ঢালিবার বাক্সগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত ও প্রায় সমচতুরস্র, কেবল তলার দিকটী উপরের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরু। বর্গাকার করিতে হইলে বাক্সে ছোট ছোট বর্গাকার খুবরি করিতে হয়। বাক্সগুলি সমোচ্চ করিয়া সাজাইয়া; ফুঁ-দিলের মুখে ছাঁকিয়া যাইবার জন্য কাপড় দিয়া কানায় কানায় উক্ত বাক্সগুলি তরল শিরীষদ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। যে ঘরে ছাঁচে ঢালা হয় উহার

মেজে বেশ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক এবং ঘরটি বেশ শীতল ও শুষ্ক হওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে শিরীষ শীঘ্র জমিতে আরম্ভ করে। তৎপরে ১২ হইতে ১৮ ঘণ্টা কাল স্থিরভাবে রাখিলে শিরীষ তখন অনেকটা বসিয়া যায়। যদি সন্ধ্যায় ছাঁচে ঢালা হয় তাহা হইলে প্রাতঃকালে অনেকটা দৃঢ়রূপে জমিয়া যায়। তখন ঐগুলিকে উপরের আর একটী গৃহে লইয়া রাখিতে হয়। এই গৃহের বাতায়নগুলি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া চারিদিক হইতে বায়ু সঞ্চালিত হইতে দিতে হয়। এই বায়ুপূর্ণ গৃহে ছাঁচের বাক্সগুলি উল্টাইয়া একটী আর্দ্র টেবিলের উপর এরূপভাবে রাখিতে হয় যেন শিরীষ টেবিলের উপর লাগিয়া না যায়। বাক্স হইতে শিরীষ ছাড়িবার জন্য লম্বা ছুরির ফলা জলে ডুবাইয়া তদ্দ্বারা বাক্সের চতুর্দ্দিকে সংলগ্ন শিরীষ অল্প করিয়া দিতে হয়। এইরূপে শিরীষ বাক্স হইতে ছাড়িয়া আসে। এইবার কাষ্ঠ ফ্রেমে সংলগ্ন টানা পিত্তলের সূক্ষ্ম তার-দ্বারা কাটিয়া থান থান করিতে হয়। প্রস্তুত শিরীষের স্থূলতা যেরূপ অভিলষিত হইবে, উহা তার-দ্বারা সেইরূপে কাটিতে হয়। তৎপরে ছুরির ফলা জলে আর্দ্র করিয়া যে প্রকারের ইচ্ছা সেই প্রকার আকার করা যাইতে পারে। বাজারে সাধারণতঃ লম্বালম্বি চিরিয়া ভাঙ্গিবার জন্য মাঝে মাঝে অল্প কাটিয়া দেওয়া হয়।

এইবার এইগুলিকে কাষ্ঠ ফ্রেমে সংলগ্ন জলের উপর থাকে থাকে সজ্জিত করিয়া দিয়া যাহাতে চতুর্দ্দিকে বাতাস লাগে এরূপভাবে রাখিতে হয়। জলের উপর থাকিবার কালে দিনে তিন চারিবার উল্টাইয়া দেওয়া উচিত।

শিরীষ শুষ্ক করা অতীব কঠিন এবং বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক। বেশ নেমশীতলে না রাখিতে পারিলে খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। বাহিরের আবহাওয়ার উপর শিরীষের শুষ্কতা অধিক নির্ভর করে। যদি যে গৃহে শিরীষ শুষ্ক হয়, উহার উত্তাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সামান্য গলিতে আরম্ভ করিয়া হয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যাইবে, নয়তো বাক্সের গায়ে লাগিবে, অথবা জলের সহিত এমন আটকাইয়া যাইবে যে বিচ্ছিন্ন করা সমধিক কঠিন হইবে। এরূপ হইলে আবার গলাইয়া ঠিক করিতে হইবে। যদি কুজ্ঝটিকা হয় তাহা হইলেও ভয়ের কারণ আছে, কারণ আর্দ্রতার আধিক্যও ঐ প্রকারে ক্ষতি করিতে পারে। যদি গরম বাতাস লাগে তাহা হইলে সঙ্কোচন কমিয়া গিয়া শিরীষে ফাট ধরিয়া যায়। আবার হাওয়া হঠাৎ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখিলে উক্ত গৃহের বাতায়নাদি একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে অনেকটা ক্ষতির হাত হইতে বাঁচিবার সম্ভাবনা। এইজন্য সকল ঋতু-শিরীষ প্রস্তুতের জন্য প্রশস্ত নহে। বসন্ত ও শরৎ-কালই শিরীষ প্রস্তুতোপযোগী কাল।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে আলনারা শুকাই-লেও শিরীষ বাজারে বিক্রয়োপযোগী হয় না। তখন চুল্লীর দ্বারা মৃদু উত্তাপ দেওয়াই বিধি। শীতল ও আর্দ্র দেশেই চুল্লীর প্রয়োজন। আমাদের দেশে সাধারণতঃ চুল্লীর উত্তাপ আবশ্যক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

এখন প্রস্তুত হইল, ছাঁচে ঢালিয়া আকৃতি বিশিষ্ট হইল, সবই হইল বটে, কিন্তু একটু দেখিতে ভাল না হইলে বাজারে চলিবে কেন? সুতরাং একটু চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করিতে হইবে। চক্‌চকে করা বিশেষ গুরুতর কিছুই নহে। খণ্ডগুলি এক একটী করিয়া গরম জলে একবার ডুবাইয়া লইয়া একটী বুরুস দ্বারা আস্তে আস্তে ঘষিলেই শিরীষ খণ্ডগুলি বেশ চিক্কণ হইবে, তৎপরে বায়ুতে রাখিয়া একদিন ধরিয়া শুষ্ক করিলে বাজারে বিক্রয়োপযোগী হইবে।

যে শিরীষ ভাঙ্গিলে ভগ্নস্থল অতি উজ্জ্বল দেখায় এবং বর্ণ ফিকা ও কঠিন বলিয়া বোধ হয় তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চীনে বেশ উত্তম শিরীষ প্রস্তুত হয়। বাজারে চাইনিজ গ্লু বা চীনে শিরীষ বলিয়া যাহা বিক্রয়ার্থ থাকে, তাহা প্রায়ই অবিশুদ্ধ, কারণ তাহা বস্তুতঃ চীনের নহে। ভাল শিরীষের আঠা অত্যন্ত অধিক। কাষ্ঠের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সন্ধির জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিরীষ বিশেষ আবশ্যক। সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিরীষ গোচর্ম্মের খণ্ড হইতে বিশুদ্ধভাবে প্রথম গালাই হইতেই হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন কোন কোন কারিকর ঘোর রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, বা দুর্গন্ধযুক্ত শিরীষ পছন্দ করিয়া থাকে। বর্ণের ঘনত্ব ও দুর্গন্ধ শিরীষের অবিশুদ্ধতার পরিচায়ক। উপা-

দান খারাপ হইলে ও অধিকক্ষণ ধরিয়া গালাইবার কালে ফুটাইলে শিরীষের বর্ণ কৃষ্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

ফ্রান্স দেশে হাড় হইতে এক প্রকার শিরীষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাড় হইতে মিউরিয়েটিক এসিড সংযোগে ফস্ফেট অফ্ লাইম পৃথক করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই গালাইয়া প্রস্তুত হয়। এই শিরীষ জলে শীঘ্রই দ্রবীভূত হইয়া যায় ও তাহার আঠা অতি অল্প। ভাল শিরীষ জলে কেবল কোমল হয় মাত্র, দ্রবীভূত হয় না। এবং ফুলিয়া থাকে। ইহা শিরীষের উৎকর্ষতার এক পরীক্ষা।

শিরীষের আঠা করিতে হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করত একটু জল মিশাইয়া কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তৎপরে বেশ ভিজিলে, অন্য পাত্রে জল রাখিয়া ফুটাইতে হয়, এবং এই অপর পাত্রস্থ ফুটন্ত জলে শিরীষ পত্র নিমজ্জিত করিয়া ফুটন্ত জলের তাপে শিরীষ গালাইয়া লইতে হয়। গরম জলে শিরীষ-পাত্র নিমজ্জিত রাখিলে শিরীষ অনেকক্ষণ গরম ও কার্য্যোপযোগী থাকে। উক্ত প্রকারে তাপ না দিয়া শিরীষ একেবারে ফুটাইলে আঠা নষ্ট হইয়া যায়।

এইবার আমরা শিরীষের রাসায়নিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শিরীষকে যদি অনেকবার ক্রমাগত উত্তপ্ত ও শীতল করা যায় তাহা হইলে শিরীষের আঠা আর সেরূপ থাকে না সংযোগশক্তি অত্যধিক পরিমাণে কমিয়া যায়। সাধারণ শিরীষ এল্‌কোহলে দ্রবীভূত হয় না; কিন্তু শিরীষ দ্রব এল্‌কোহলে সংযুক্ত হইলে শ্বেত স্থিতিস্থাপক আঠাযুক্ত শিরীষ অধঃপাতিত হইয়া থাকে। ক্লোরিণ গ্যাস উক্ত শিরীষ-দ্রবে সংযুক্ত হইলেও উক্ত প্রকার পদার্থ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া অধঃপাতিত হইয়া থাকে। সলফিউরিক এসিড সংযোগে শিরীষ-দ্রব অত্যদ্ভুত রূপান্তরিত হয়। ইহাদ্বারা জিলেটিন, শর্করা, লিউসাইনের উদ্ভব হয় এবং জান্তব পদার্থ পৃথক হইয়া যায়। নাইট্রিক এসিড সংযুক্ত করিয়া তাপ দিলে শিরীষ, ম্যালিক এসিড, অক্সালিক এসিড, ট্যানিন ও বসায় বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। এই ট্যানিনদ্বারা চর্ম্ম ট্যান করা হইয়া থাকে। সুতরাং চর্ম্মের দ্বারাও এই প্রকারে চর্ম্ম ট্যান হইতে দেখা যায়। এসেটিক এসিডে শিরীষ প্রথমে কোমল হয় এবং তৎপরে গলিয়া গিয়া থাকে। গলিত শিরীষে অধিক পরিমাণে চূণ ও চূণের ফস্ফেট দ্রব হইতে পারে। শিরীষে অনেক সময় এইজন্য লাইম ফস্ফেট থাকিয়া যায়। ট্যানিন শিরীষের সহিত বিভিন্ন অনুপাতে সংযুক্ত হইয়া যায় এবং একবার সংযুক্ত হইলে পৃথক করা অতীব দুরূহ।

শিরীষ বিশুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে পরিষ্কার জলদ্বারা কোমল করিয়া কয়েকবার কচলাইয়া লইতে হয় এবং তৎপরে বস্ত্রমধ্যে পুরিয়া ৬০° ডিগ্রী তাপযুক্ত পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। এই প্রকারে দ্রবনশীল জান্তব পদার্থ ও অন্যান্য অবিশুদ্ধাংশ নিম্নে পড়িয়া যায় ও বিশুদ্ধ শিরীষ বস্ত্রাভ্যন্তরে থাকে। তৎপরে জল না দিয়া ১২২° ডিগ্রী তাপে বেশ গলিয়া যাইলে ফিল্টার কাগজদ্বারা পরিস্রুত করিয়া লইলেই শিরীষ বিশুদ্ধ হইয়া যায়। ষ্টার্চ ফুটাইলে যেমন গম্ ও শর্করার উৎপত্তি হয়, চর্ম্ম গালাইলে সেই প্রকারে শিরীষের উৎপত্তি হয়।

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ, বি, এল্।

সুপারি।

সুপারি আমাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহা কেবল যে তাম্বুলের একটি প্রধান উপকরণ তাহা নহে, আমাদিগের সকল গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে ইহার আবশ্যক হইয়া থাকে। জাতকর্ম্ম হইতে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া পর্য্যন্ত গুবাক না হইলে চলে না। নূতন পঞ্জিকা শ্রবণ করিবার সময় সুপারি হাতে করিয়া বসিতে হয়। সকল অনুষ্ঠানে সংকল্প করিবার সময় উহার প্রয়োজন হয়; অনেকস্থলে মাল্য চন্দন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে পান সুপারি উপহার দিতে হয়। এই কারণেই বোধ হয় দেশজ সুপারিতে কুলায় না. আমাদিগকে বহু পরিমাণে সুপারি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। অতএব দেশে যদি অধিক আবাদ হয় তাহা হইলে বিদেশের আমদানি হ্রাস হইতে পারে ও তাহার ফলে দেশের লোকে লাভবান্ হইতে পারেন।

সুপারি পূর্ব্ববঙ্গেই যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বাখরগঞ্জের ন্যায় বোধ হয় নিম্ন বঙ্গের কুত্রাপি সুপারির আবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। বাগেরহাট ও মোরেলগঞ্জেও অনেক সুপারি-বাগান আছে। দৃশ্যের হিসাবে সুপারিবাগান দেখিতে বড় সুন্দর। সুপারি গাছ অধিক স্থান অধিকার করে না বলিয়া উহা খুব কাছাকাছি রোপণ করা হয়। সরু সরু গাছগুলি উর্দ্ধদেশে মস্তক উত্তোলন করিয়া বায়ু তাড়নে যখন শিরোদেশস্থ হরিদ্বর্ণ পত্র সকল সঞ্চালন করে তখন তাহার দৃশ্য বড়ই রমণীয়।

বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমে সুপারির আরও অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে অভ্যাগত ব্যক্তিকে সুপারি দিয়া সংবর্দ্ধনা করা হয়, বিবাহাদি উৎসবে সোনালী বা রূপালী দিয়া সুপারি মুড়িয়া তাহা নিমন্ত্রিত লোকদিগকে বণ্টন করা হয়। যাঁহার যত মর্য্যাদা অধিক তাঁহাকে সেই পরিমাণে অধিক সুপারি বিতরণ করা হইয়া থাকে।

লোণা মাটীতে সুপারি গাছ হয় না, এঁটেল মাটিতেও উহা ভাল হয় না। নিম্ন বঙ্গের সাধারণ মৃত্তিকাই ইহার পক্ষে অনুকূল। ইহা সাধারণতঃ উচ্চ ভূমিতে রোপণ করা হইয়া থাকে। গাছগুলি এক এক করিয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে বসান হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে অনতিগভীর জুলি কাটিয়া দেওয়া হয়। ঐ জুলির মাটী গাছগুলির গোড়ার চারিদিকে চারাইয়া দিতে হয়। সুপারি রোপণ করিবার পূর্ব্বে গৃহের প্রাঙ্গনে বা তদ্রূপ কোন স্থানে উহা বপন করা হয় এবং তাহা অঙ্কুরিত হইয়া যখন গাছগুলি একহাত পরিমাণ বড় হয় তখন উহা তুলিয়া উল্লিখিত রূপে রোপণ করা হয়। সচরাচর বীজসুপারি মাঘ ও ফাল্গুন মাসে বপন করা হয়। তিন চারি মাস মধ্যেই উহা অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরিত হইবার এক বৎসর পরেই উহা রোপণোপযোগী হয়। কিন্তু প্রায় বর্ষা না পড়িলে উহা রোপণ করা হয় না। যে জমীতে রোপণ করা হয় তাহাতে পূর্ব্ব হইতে গোময় বা খইলের-সার দিতে হয়। গাছগুলি প্রায়ই দুই হাত অন্তর বসাইতে হয়, কিন্তু কোথাও কোথাও উহা চারি হাত হইতে আট হাত পর্য্যন্ত অন্তরে বসান হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ এক বিঘা জমীতে ৩৫০টী সুপারি-গাছ রোপণ করা হয়। প্রত্যেক গাছে কি পরিমাণে সুপারি উৎপন্ন হয় তাহার কোন রূপ হিসাব নাই, তবে পূর্ব্বাঞ্চলে এইরূপ একটা প্রবাদ আছেঃ—

আট চৌকা দুয়া।
কাঠা প্রতি হাজার গুয়া॥

ইহার মর্ম্ম এই যে প্রথম সারিতে আট হাত অন্তর গাছ বসাইবে; দ্বিতীয় সারিতে চারি হাত অন্তর বসাইবে; তৃতীয় সারিতে দুই হাত অন্তর বসাইবে; তাহা হইলে প্রতি কাঠায় এক হাজার সুপারি উৎপন্ন হইবে। এই হিসাবে এক বিঘা জমীতে ২০,০০০ সুপারি উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। এখন এক বিঘায় যদি ৩৫০টি গাছ জন্মায় তাহা হইলে প্রতি গাছে প্রায় ৫৫টি করিয়া সুপারি পাওয়া যায়।

সুপারি গাছে একপ্রকার পোকা ধরে; তাহারা গাছের মাথা হইতে ছিদ্র করিয়া থাকে ও সেইরূপে পাতাগুলিকে নষ্ট করে। এ পর্য্যন্ত এই পোকা নিবারণের কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। অনেকস্থলেই সুপারি দুই আনা হইতে পাঁচ আনা কুড়ি বিক্রয় হয়। সুপারির কুড়ি সাধারণ কুড়ি নহে।

১১ সুপারিতে	এক ঘা হয়।
২১ ঘায়ে	এক কুড়ি।
৫ কুড়িতে	এক শ।
১০ শয়ে	এক হাজার।

দুই আনা করিয়া কুড়ি ধরিলে এক বিঘা জমীর উৎপন্ন সুপারির মূল্য প্রায় ১০।৶০। ইহা উৎপন্ন করিতে এইরূপ খরচ পড়ে—

এক বিঘায় সুপারি পাড়িবার খরচ	১৷০
জমীর খাজনা	১৷৷০
হাটে লইয়া যাইবার খরচ	৷৷৶১০
	৩৶০

১০।৶০ হইতে ৩৶০ আনা বাদ দিলে ৭৶০ লাভ থাকে। এই লাভ উপেক্ষণীয় নহে।

সুপারিগাছের ফলন পঞ্চম বৎসর হইতে আরম্ভ হয়, এবং বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ইহা ফল প্রসব করিয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সুপারির ফুল হয় এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে ফল পাকে।

ফল পাকিলে উহা পাড়িয়া দরমা বা চেটাই বিছাইয়া তাহার উপর শুকাইতে দেওয়া হয়। বেশ শুকাইলে খোলা ছাড়াইয়া সুপারি বাহির করা হয়। আর এক প্রণালীতে সুপারির ছাল ছাড়ান হইয়া থাকে। পাকা সুপারি এক মাস কাল গামলা বা টবের জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তাহার ছালগুলি বেশ নরম হইলে উহা ছাড়াইয়া ফেলা হয়। এইরূপ প্রথায় যে সুপারি বাহির করা হয় তাহাকে মজা সুপারি বলে। ইহা পানের সহিত চিবাইলে সুমিষ্ট আস্বাদ পাওয়া যায়। অনেকস্থলে এই সুপারি ভিজান জলে ইমারত গাঁথিবার জন্য চুণ সুরকি মাখা হইয়া থাকে। ইহাতে গাঁথুনি খুব দৃঢ় হয়। ছাদ পিটিবার সময় এই জল ঢালিয়া দিলে ছাদ খুব শক্ত হয়। সুপারি পোড়াইয়া চূর্ণ করিলে বেশ দাঁতের মাজন হয়। আজি কালিকার অনেক দাঁতের মাজনের প্রধান উপকরণ সুপারি-চূর্ণ।

মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট লওবাকি খুলনা প্রভৃতি স্থান হইতে সুপারি আমদানি হয়; উহা ব্রহ্মদেশ ও অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। এইস্থলে রপ্তানির তালিকা দিতেছি :—

১৯০১সালে	১,২১,৫০২ মণ
১৯০২ „	১,১৮৯৪২ „
১৯০৩ „	২১২৯৯৬ „

এই সমস্তই রেল দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া নৌকা করিয়াও অনেক সুপারি প্রেরিত হইয়া থাকে।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

কন্যা-বিবাহের সদুপায়—

শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষা।

মানবশরীরে কোন ব্যাধি জন্মিলে, যদি দীর্ঘ কাল তাহার কোন প্রতিকার না করা যায়, তবে সেই ব্যাধি ক্রমে শরীরচালনের যন্ত্রাদি নষ্ট করিয়া শেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করে। সমাজ-শরীর ও ঠিক সেইরূপ। যদি কোন কারণে সমাজ-শরীর বিকল হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয় এবং সময়মত তাহার প্রতিকার না হয়, তবে সে সমাজের ক্রমে অবসাদ এবং পরিশেষে ধ্বংস অনিবার্য্য।

ইংলণ্ডের শাসনাধীনে আসিয়া, আমাদের দেশীয় সমাজের কোন ক্ষতি হয় নাই সত্য, বরং আমরা উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছিলাম কিন্তু ইয়ুরোপীয় যন্ত্র-জাত (Machine-made) শিল্পদ্রব্য অধিক পরিমাণে এ দেশে আমদানী হইতে থাকায়, ক্রমেই দেশীয় শিল্প নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে; তাহাতে অল্পসংখ্যক লোকের চাকুরী এবং অধিকাংশ লোকের কৃষিকার্য্যই একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যেমন দেশশুদ্ধ লোকেই যদি ইঞ্জিনিয়ার হয় বা সকলেই যদি গবর্ণর জেনারেল হয় অর্থাৎ সকলেই যদি একইরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে সমাজ চলিতে পারেনা; সেইরূপ দেশশুদ্ধ লোকে চাষী হইলে সমাজ চলিতে পারে না। এ বিষয়ে অনেক অর্থনীতিবেত্তার মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

সকলেই কৃষি-বৃত্তি অবলম্বন করাতে ফল এই হইয়াছে, যে সকলেই আবশ্যকানুরূপ জমি পাইতে পারে না সুতরাং কতকগুলি লোককে ভূমির অভাবে এবং সকল প্রকার জীবিকাবৃত্তির অভাবে কেবলমাত্র মজুরীগিরি বা কুলিগিরি আশ্রয় করিতে হইয়াছে; অজন্মার বৎসরে তাহাদিগকেই প্রথমে উপবাস করিতে হয়, এবং অনাহারে শেষে প্রাণ-ত্যাগ ও করিতে হয়।

নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যের অভাবে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকের কষ্টও কম নহে। যাঁহাদের পরিবার প্রতিপালনোপযোগী ৫০।৬০ বা দুই এক শত বিঘা জমি ছিল, তাহাও ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে। শিল্পবৃত্তি তো কাহারই নাই। একমাত্র বিদ্যাজাত বৃত্তিই মধ্যশ্রেণীর অবলম্বন; কিন্তু তাহাতেও শতকরা এক জনের ভালরূপ চলে কি না সন্দেহ।

উপসর্গ।

মধ্যশ্রেণীর আবার ইহার উপর উপসর্গ আছে। উপার্জ্জন বা সঞ্চয় কিছু থাক আর নাই থাক, কন্যা-বিবাহের সময় এমন নিঃস্ব হইতে হইবে বা ঋণ-জালে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, পরিণামে পুত্র পরিবারের দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না, বা ভবিষ্যতে উন্নতি করিবার কোন আশাই থাকিবে না। বিদ্যা বা শিল্প শিখিবার অর্থ যদি ভাবী বংশাবলির না থাকে, তবে তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রদিগকে শিক্ষাবিহীন, অর্থবিহীন, ভূমি-বিহীন মজুর বা কুলিশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতে হইবে এবং তাহার পর যাহা ঘটিবে, তাহা স্মরণেও মন অবসন্ন হইয়া যায়।

অতএব আমাদের সমাজের যখন এই গুরুতর বিকার ঘটিয়াছে, তখন তাহার প্রতিকার একান্তই আবশ্যক। প্রতিকার না করিলে আমাদের টিকিবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।

কন্যা-বিবাহের বিপত্তিখণ্ডনজন্য দুই একটা সভা সমিতি ইত্যাদি হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল কারণ বিনষ্ট না হইলে, ঐ বিপত্তি হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। আসল কারণ নির্ণয় হইলে প্রতিকার সহজেই হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়। মধ্যশ্রেণীর হীনাবস্থাই বিবাহ-বিপত্তির কারণ।

কারণ নির্ণয়।

কন্যার বিবাহে অধিক যে পণ দিতে হয়, ইহাই বিবাহের প্রধান সমস্যা নহে, কারণ লোকে রীতি-মত ব্যয় করিয়াও আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন না। উপার্জ্জনে সক্ষম, এমন বেশী পরিমাণে সুপাত্রের অভাবই ইহার মূল কারণ; লোকে যে পরিমাণে সুপাত্র অন্বেষণ করে, তাহা অধিক মিলে না বলিয়াই, যে ২।৪ জন সুপাত্র আছে, তাহাদের দর চড়িয়া গিয়াছে। প্রয়োজন অপেক্ষা যোগান অত্যন্ত অল্প বলিয়াই সুপাত্রদিগের দর চড়িয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে মধ্যশ্রেণীর সকল গৃহস্থের গৃহে শাকান্নের অপ্রতুল ছিলনা বলিয়াই লোকে কন্যার বিবাহ দিতে গেলে কেবলই সদ্বংশজাত পাত্রের কামনা করিত। কিন্তু এক্ষণে লোকে সেরূপ করে না; এখন লোকে দেখে পাত্রের অন্নের সংস্থান আছে কি না? এখন আপন আপন অবস্থা দেখিয়া সকলেরই ভয় হয়, পাছে কন্যাটি খাইতে পরিতে না পায়। এই ভয়ের কারণে সকলেরই ইচ্ছা হয়, অন্নের সংস্থান আছে, এমন ঘরে, নয় উপার্জ্জনের ক্ষমতা আছে, এমন পাত্রে কন্যাটি দান করেন। কিন্তু এখন "ঠগ বাছিতে গ্রাম উজাড়" হইয়া যায়, সম্বন্ধ আসিলে সন্ধান লইয়া দেখুন প্রায় সকলেরই অবস্থা মন্দ; প্রায় সকলেই বিশেষরূপ উপার্জ্জনে অক্ষম। যে দুই চারিটির অবস্থা একটু ভাল, অথবা উপার্জ্জনের আশা আছে, সেইখানে সকলেই উপস্থিত সুতরাং একটি পাত্রের উপর পঞ্চাশ জনে পড়িয়া নিলাম ডাকের ন্যায় তাহার দর বাড়াইয়া দিয়া থাকেন। বাজারে একটি বি, এ পাশ পাত্র উপস্থিত; তাঁহার পিতা রেলির বাজারসরকার, সুতরাং অন্নের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যবস্থা আছে। এই সন্ধান পাইয়াই, তিন জন জমিদার, দুই জন সবজজ দুই জন ডেপুটি. তিন জন জেলার উকীল, দশ জন কেরাণী, তাহার ক্রেতা উপস্থিত! তখন একটা ভারী রকমের নিলামডাক আরম্ভ হইল। নিলামের ডাকে জজের উকীলের জয় হইল; কিন্তু তাঁহার কন্যাটি একটু কুরূপা বলিয়া একজন কেরাণী বাবুর কন্যা পাত্রের মাতার মনস্থ হইল কিন্তু উকিলের প্রস্তাবিত নিলামের ডাক তাঁহাকে দিতে হইবে! পৈতৃক ও নিজের দৈহিক যাহা কিছু ছিল, কেরাণী বাবুর সবই গেল; শেষ কিন্তু পাত্রমহাশয় কিছু কাল জজের কাছারী যাতায়াত করিয়া শেষ কেরাণীগিরিরই আশ্রয় লইলেন।

এই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ লক্ষ বালক বিদ্যালাভ করিতেছে, তাহার মধ্যে যে ১॥০ লক্ষ বালক প্রতিবৎসর বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করে, তাহার মধ্যে এণ্ট্রান্স, এফ এ, বি এ, বি এল, ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারি প্রভৃতি সকল প্রকার পাশ হওয়ার সংখ্যা বৎসরে পাঁচ হাজার মাত্র* অর্থাৎ দেড় লক্ষের মধ্যে পাঁচ হাজারের কিছু কিছু উপার্জ্জনের ক্ষমতা হয় মাত্র, বাকী এক লক্ষ ৪৫ হাজার বালকের কিছুই ক্ষমতা থাকে না; বিবাহব্যাপারেও এইরূপ অনুপাত দাঁড়ায়। দেড় লক্ষ সংসারপ্রবেশী বালকের জন্য উপস্থিত দেড় লক্ষ বালিকা মিলিয়া ৫ হাজার উপার্জ্জনক্ষম বালককে পাইতে ইচ্ছা করে, সেই জন্যই এই বিষম নিলাম ডাক পড়িয়া যায়।

প্রতিকার।

অতএব পূর্ব্বকথিত কারণ হইতে ইহাই বুঝায়, যে পরিমাণ উপার্জ্জনক্ষম পাত্রের আবশ্যক (Demand) সেই পরিমাণ পাত্র পাওয়া যায় না (অর্থাৎ Supply নাই) বলিয়া, উপার্জ্জনক্ষম পাত্রের দর বাড়িয়া গিয়াছে।

ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে, ইহাই দাঁড়ায় যে, বেশীপরিমাণ উপার্জ্জনক্ষম পাত্র তৈয়ারী করা আবশ্যক। যে দেড় লক্ষ বালক প্রতিবৎসর বিদ্যালয় ত্যাগ করে, তাহাদের মধ্যে যে পাঁচ হাজার বালকে নানা প্রকার পাশ হয়, তাহা বাদে বাকী ১ লক্ষ ৪৫ হাজার বালকের কোনরূপ ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্প বা কার্য্যকর বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই এই দুঃখ অনেকটা ঘুচিতে পারে। সমস্ত য়ুরোপীয় দেশে যাহাতে অধিকাংশ লোকে শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারে তাহার বিস্তৃতরূপ ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডে অনেকগুলি বিজ্ঞান শিক্ষার বিদ্যালয় আছে, তদ্ব্যতীত কত

---

* সমস্ত বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর পাশের সংখ্যা (১৯০২।৩ সালের ফল অনুযায়ী) এইরূপ;—

এম, এ	...	...	...	৬১	জন
বি, এ	...	...	...	৩৭০	,,
B Sc.	...	...	...	৮	,,
এফ, এ	...	...	...	১১৬২	,,
বি, এল	...	...	...	৩৩৭	,,
এম, বি		...	...	১৮	,,
এল্ এম, এস্		...	...	৫৪	,,
এঞ্জিনিয়ারিং (প্রথম)		...	...	২৪	,,
কৃষি	...	...	...	[illegible]	,,
ওভারসিয়ার	...	...	...	৩৭	,,
বাঙ্গালা ডাক্তারি		...	...	১১১	,,
এণ্ট্রান্স	...	...	...	২৬২৪	,,
				৪৮১২	

কলেজ, কারখানা লেবরেটরী, আছে তাহার সংখ্যা নাই; জর্ম্মাণি ফ্রান্স অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত য়ুরোপীয় রাজ্যে এইরূপ অসংখ্য বিজ্ঞান-বিদ্যালয় আছে।

বিজ্ঞান শিক্ষা।

এই সকল শিল্প-বিজ্ঞানশিক্ষাপ্রাপ্ত বালকের অনেকে ওকালতী ডাক্তারী পাশ হওয়া বালকের অপেক্ষা যে অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, যে কাচ তৈয়ারী করিতে পারে, যে ইঞ্জিন বয়লার, ইলেক্‌ট্রিক মোটর, ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম, রেল, ডাইনামো, টেলিফোন, ফনোগ্রাফ, গ্রামোফোন, টেলিগ্রাফ-যন্ত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারে তাহার উপার্জ্জনের অভাব থাকে না।

তবে কথা এই যে, এই সকল শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থের আবশ্যক। সে অর্থ দিবে কে?

কে ব্যবস্থা করিবে?

অনেকে বলিবেন, যে গবমেণ্ট যখন সকল শিক্ষারই ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন গভর্ণমেণ্টই করিবেন—

কিন্তু আমাদের এই বিশেষ প্রয়োজনীয় শিক্ষার কথা গবমেণ্ট ও দেশের প্রধান লোকেরা অবগত থাকিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কেহ উদ্যোগী হন নাই। ভারতের ভূত-পূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড ক্রশ, লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন এবং লর্ড রিপণ, ডফরিণ প্রভৃতি গবর্ণর জেনেরেল-গণ প্রত্যেকেই প্রকাশ্যভাবে বারবার বলিয়াছেন, যে বিস্তৃতভাবে শিল্প-বিজ্ঞানশিক্ষাদ্বারা ভারতবর্ষ একটি শিল্প-প্রধান (Manufacturing) দেশ হইলে, তবে সেখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কমিবে। কার্য্যতঃ গবমেণ্ট তাহার কিছুই করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এত অসংখ্য বিদ্যালয়, নানারূপ Laboratory, Workshop এবং কল কারখানা আছে কিন্তু আমাদের দেশে তেমন কয়টি আছে? কেহ কেহ বলেন যে, এ দেশে বিস্তৃত-ভাবে শিল্প-বিজ্ঞানশিক্ষার প্রচার হইলে পাছে ইংলণ্ডের ব্যবসায় নষ্ট হয়, সেইজন্য ইংলণ্ডের লোকে এ দেশে সেরূপ শিক্ষার বিরোধী; এবং সেই কারণেই বোম্বাই কলে জাত কতক নম্বর সূতা ও কাপড়ের উপর গবমেণ্টকে বাধ্য হইয়া মাশুল বসাইতে হইয়াছে।

এজন্য ইংলণ্ডের এই সকল দেশহিতৈষি-দিগকে আমরা দোষ দিতে পারি না, কারণ আমাদের জন্য তাঁহারা নিজের ক্ষতি করিবেন কেন? তবে আমাদের দেশের সম্রাটকে, আমরা তাঁহার মাতৃদেবীর কথা স্মরণ করাইয়া বলিতে পারি, যে তাঁহার একই রাজ্যে আমরা সমানরূপ শিক্ষা ও সুবিধা লাভ করিতে না পারিব কেন? কিন্তু সে কথা ইংলণ্ডের হিতৈষী প্রভুরা তাঁহার কাণে তুলিতে দিবার পূর্ব্বে এবং সেইমত ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে নিজে নিজেই সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কে টাকা দিবে?

অতএব আমাদিগকেই এই শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে, কিন্তু এই টাকা কে দিবে? আমাদের মধ্যে যাঁহারা ধনবান্, তাঁহাদের এই শিক্ষার অভাবে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই; অতএব দয়া ভাবিয়া তাঁহারা যাহা ভিক্ষা দিবেন, তাহাদ্বারা কার্য্য চলিবে না। আমাদিগের মধ্যে বাকী যাঁহারা, তাঁহারা এতই দরিদ্র যে জাতীয় ভবিষ্যদুন্নতির কথা তাঁহাদের ভাবিবার অবকাশ নাই; কারণ তাঁহারা নিজের ভবিষ্যতের একটা 'কূল কিনারা' করিয়া উঠিতে পারেন না।

তবে আমাদের মধ্যে কে এই অর্থ দিবে? নব প্রতিষ্ঠিত শিল্প-সমিতির প্রধান উদ্যোগী প্রশংসনীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রত্যেকের নিকট।০ চারি আনা হিসাবে বৎসরে ১লক্ষ টাকা তুলিবেন, কিন্তু তাহা সংগ্রহ করিবার এত হাঙ্গাম, যে কার্য্যতঃ তাহা কতদূর ঘটিবে সে বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে।

হাতে হাতে ফল।

তবে লোকে এই কার্য্যের জন্য অর্থ দিলে যদি হাতে হাতে তাহার ফল নিজে পাইতে পারেন, তবে তাঁহারা এই কার্য্যে কিছু ব্যয় করিতে পারেন; এই কথা ভাবিয়া আমরা প্রস্তাব করি-তেছি যে, যদি এইরূপ শিক্ষার বিস্তার হইলে কন্যা বিবাহের সুবিধা হয়, তবে কন্যার পিতামহাশয়েরা

কিছু কিছু অর্থ দিয়া একটা সমিতি (Association) গঠিত করিয়া এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

তাঁহারা যদি তাঁহাদের অর্থের জামিন (Guarantee) চাহেন, তবে এইরূপ সর্ত্ত করিতে পারেন যে যাঁহারা এই সমিতির স্থাপিত বিদ্যালয়ে শিল্পাদি শিক্ষা লাভ করিবেন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন যে যাঁহাদের অর্থে ও যত্নে এই শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে, তাঁহাদের কন্যা-বিবাহ করিলে তাঁহারা কিছুই দাবী করিতে পারিবেন না। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া যাহা দিবেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট হইবেন।

বলা বাহুল্য যে এই সমিতির সংগৃহীত অর্থের ভার এবং কার্য্যের ভার, দেশের গণ্য মান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের উপর ন্যস্ত হইলে সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার, এবং শিক্ষাকার্য্যের সুচারুরূপ বন্দোবস্ত হইতে পারিবে।

কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি প্রস্তাব আমরা নিম্নে দিলাম। অবশ্য তাহার অনেক অংশ পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিয়া লইলে চলিবে।

সমিতি Association.

১। যে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাজন্য য়ুরোপ ও আমেরিকায় কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে সেই বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমাদের সেরূপ অর্থবল নাই। দেশের গবর্মেণ্টের তাহা কর্ত্তব্য হইলেও ইংলণ্ডের শিল্পের বিঘ্নভয়ে তাঁহারা যখন তাহাতে মনোযোগী নহেন, তখন আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যাহা করা সম্ভব তাহাতে আমরা বিমুখ হইব কেন? প্রচুর অর্থ না থাকিলেও পরস্পরের সাহায্যে আমরা তাহা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিব।

২। সম্প্রতি শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যে একটি (Association) সমিতি গঠিত করা হইয়াছে অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঐ সমিতির চিরস্থায়িত্ব আশা করা যায় না, এই কারণে ঐ সমিতির কতকাংশ সংশোধন আবশ্যক অথবা নূতন একটি সমিতি স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

৩। এই সমিতি Indian Company's Act মতে রেজেষ্ট্রী করিয়া Joint Stock Company বা যৌথ কারবারের ন্যায় ব্যবসায়ীভাবে ইহার কার্য্য চলা উচিত।

৪। দেশের গণ্যমান্য কার্য্যক্ষম লোকে ইহার Director, Secretary প্রভৃতি হইবেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে রীতিমত ব্যবসায়ীর ন্যায় জামিন লইয়া কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবেন—

৫। এই সমিতির মূলধন দুই লক্ষ টাকা হইবে। প্রত্যেক অংশীদার একশত টাকা করিয়া ২০০০ জন অংশীদারে এই দুই লক্ষ টাকা দিবেন।

একশত টাকায় কন্যার বিবাহ।

৬। যিনি এই একশতমাত্র টাকা দিবেন তাঁহাকে কন্যার বিবাহে আর কিছু খরচ করিতে হইবে না। অথচ তিনি সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে পারিবেন। তবে ইচ্ছা করিয়া কিছু দিলে দিতে পারিবেন।

৭। সমিতির মূলধনের দ্বারা নানাপ্রকার শিল্প ও বিজ্ঞানবিষয়ক ব্যবসায় (Industry) শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮। অতএব সমিতি এই সকল শিক্ষার সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ছাত্র যিনি এই সমিতির কারখানা বা বিদ্যালয়ে বা সাহায্যে শিক্ষালাভ করিবেন তাঁহাকে এই সর্ত্তে এগ্রিমেণ্ট করিতে হইবে, যে সমিতির কোন অংশীদারের কন্যাকে বিবাহ করিতে গেলে তিনি কোন টাকা দাবী করিতে পারিবেন না। ঐ অংশীদার ইচ্ছা করিয়া যাহা দিবেন তাহাই লইতে হইবে। অপর কাহারও কন্যা বিবাহ করিলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ সমিতিকে তাহার জন্য ব্যয়িত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

পাত্র বিক্রয়ের লাভ।

৯। এই প্রকারে যদি জনকয়েক ছাত্র হাত-ছাড়া হইয়া যায় তাহাতে সমিতির বিশেষ ক্ষতি হইবে না। কারণ দুই হাজার অংশীদারের জন্য সমিতি দশ বৎসরে প্রায় চারি হাজার ছাত্র প্রস্তুত করিতে পারগ হইবেন। সুতরাং প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক যে যোগান তাহা হাত ছাড়া হইলে বরং সমিতির বিলক্ষণ লাভেরই কথা। কারণ সমিতির উদ্বৃত্ত (Excess) দুই হাজার জন ছাত্র প্রত্যেকে ৫০০ টাকা Compensation দিলে ২০০০ × ৫০০

১০০০০০০দশ লক্ষ টাকা সমিতির লাভ হইবার কথা। এ কথা কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই, কিন্তু কৌতুকাবহ হইলেও ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সমিতি এতগুলি বালককে উপার্জ্জনক্ষম করিতে পারিলে কন্যাবিবাহের জন্য কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না।

১০। সমিতির উদ্দেশ্য।

(১) একটি Polytechnic Institute অর্থাৎ নানাবিধ শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা।

(২) শিল্প ও Industry শিক্ষার জন্য য়ুরোপ আমেরিকা ও জাপানে ছাত্র পাঠান।

(৩) দেশীয় শিল্পজাতদ্রব্যের প্রসার বৃদ্ধি করা।

(৪) শিল্প শিক্ষিত ব্যক্তিকে মূলধনের দ্বারা সাহায্য করা।

Polytechnic Institute.

শিল্প-বিদ্যালয়।

১। আমাদের দরিদ্রদেশে য়ুরোপের আদর্শে কোনরূপ শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করা একেবারেই অসম্ভব। তবে এক্ষণে সামান্যভাবে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভবিষ্যতে তাহার কতকটা উন্নতি করা সম্ভব।

২। ইংলণ্ডের South Kensington নামক স্থানে এবং সুইজর্লণ্ডে জুরিচ নগরে এবং ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর স্থানে স্থানে যে সকল Polytechnic বিদ্যালয় আছে, তাহার এক একটিতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, এবং তাহার শিক্ষকমহাশয়েরা পৃথিবীর মধ্যে এক একজন স্বনামখ্যাত আবিষ্কারক।

৩। অতএব আমাদের সামান্য চেষ্টার সহিত সে সকলের নামোল্লেখ না করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় আমরা যেটুকু করিতে পারি তাহারই আলোচনা করা ভাল।

৪। এ প্রকার বিদ্যালয়ের দুইটি প্রধান অঙ্গ :—

(ক) বিস্তৃত পরিক্ষাগার—Laboratory.

(খ) বিস্তৃত কারখানা—Workshop.

৫। একটি বিস্তৃতভাবে Laboratory করিতে লক্ষটাকারও অধিক অর্থের আবশ্যক। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবরিটরী এইরূপ। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের স্থাপিত বিজ্ঞানসভার লেবরেটরীও অনেক অংশে নিকৃষ্ট নহে। অতএব আমাদের সমিতির যতদিন অর্থাভাব থাকিবে ততদিন আমরা ডাক্তার সরকারের লেবরেটরীতে প্রাথমিক রসায়ন ও প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি। তবে সেখানে শিক্ষাদাতা অধ্যাপক এবং উপকরণ ইত্যাদির ব্যয় সমিতিকে করিতে হইবে, এবং নূতন যন্ত্র, ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভগ্ন যন্ত্রের মূল্যও সমিতিকে দিতে হইবে।

৬। Engineering এবং কল কব্জা শিক্ষার জন্য যে Workshop আবশ্যক তাহা সমিতিকে করিতে হইবে।

৭। সমিতি আপাততঃ ১০ প্রকার শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। ইহার প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন করিয়া শিল্পবিষয়ে দক্ষ Professorএর বেতন, শিল্পকার্য্য জন্য দ্রব্যাদির বাবদে প্রতি বৎসরে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ১০০০০ দশ হাজার টাকা সমিতি একটি কমিটির হস্তে দিবেন।

৮। উক্ত ১০ প্রকার শ্রেণীর মধ্যে ৪।৫টি শ্রেণী কলকারখানার কার্য্য যদি করেন, তবে তাঁহারা সমিতির কারখানায় তাঁহাদের কার্য্য করিবেন এবং প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য যন্ত্র বাড়াইয়া লইবেন।

৯। প্রত্যেক শ্রেণীকে প্রতি বৎসরে যে দশ হাজার টাকা দেওয়া হইবে, তাহাদ্বারা শিক্ষকের সাহায্যে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, তাহা বাজারে বিক্রয় হইয়া যদি ঐ কারখানার কার্য্য চলিয়া যায়, তবে ভবিষ্যতে ঐ শ্রেণীতে আর টাকা দেওয়া আবশ্যক হইবে না; এবং ঐ শ্রেণীর ভবিষ্যতের লাভ ঐ শ্রেণীর ছাত্রদিগের হইবে। পরে ঐ শ্রেণী ভবিষ্যতে একটি ব্যবসায়ী কোম্পানী বলিয়া, বাহিরের লোককে অংশীদারস্বরূপে গ্রহণ করতঃ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিতে থাকিবেন।

১০। কোন শ্রেণী স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে থাকিলে সমিতি তাহার স্থানে নূতন আর একটি শ্রেণী আরম্ভ করিবেন এবং প্রতি বৎসর পূর্ব্ব শ্রেণীকে দেয় দশ হাজার টাকা এই নূতন শ্রেণীকে দিবেন।

১১। প্রত্যেক শ্রেণী স্বতন্ত্র একটি কমিটির অধীনে থাকিবে। উক্ত শ্রেণীর আয় ব্যয় কার্য্য-কলাপ সমস্তই কমিটি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

১২। বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণী যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে সমিতি ইন্স্পেক্টর দ্বারা তাহার তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিবেন। প্রত্যেক স্থানের কার্য্যকলাপসম্বন্ধে উন্নতি বা অবনতি ঐ ইন্স্পেক্টর, সমিতির নিযুক্ত ঐ বিষয়ের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট রিপোর্ট করিবেন; উক্ত প্রধান কর্ম্মচারী তাহার প্রতিকার করিবেন।

১৩। উপরিউক্ত দশটি শ্রেণীতে শিক্ষা দিবার জন্য দক্ষ শিক্ষক Expert professor সমিতি নিজ ব্যয়ে বিদেশ হইতে আনাইয়া দিবেন। তাঁহাদের বেতন পূর্ব্বকথিত প্রত্যেক শ্রেণীর বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট দশ হাজার টাকা হইতে প্রদত্ত হইবে।

১৪। প্রথম ২।১ বৎসর বৈদেশিক দক্ষলোক আনা ভিন্ন উপায় নাই, কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী সময়ের জন্য সমিতি প্রতি বৎসর ১০ জন সুশিক্ষিত ছাত্রকে য়ুরোপ আমেরিকা এবং জাপানে প্রেরণ করিবেন। ইঁহারা ফিরিয়া আসিয়া সমিতির শিল্প-শ্রেণীর শিক্ষাভার গ্রহণ করিবেন; তজ্জন্য যোগ্যতানুসারে প্রত্যেকে ১৫০।২০০৲ টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন। সমিতির শিক্ষক আবশ্যক না হইলে তাঁহারা অন্যত্র স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবেন।

১৫। যদি সমিতির মূলধনে সংকুলান হয় তবে সমিতি, এই সকল ছাত্রকে তাঁহার শিক্ষিত শিল্পের ব্যবসায়ের জন্য তাঁহাকে মূলধন দিবেন।

ডফরিণের কীর্ত্তি।

১৬। লর্ড ডফরিণের রাজত্বকালে, তাঁহার আদেশক্রমে ভারতগবর্মেণ্ট একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; যে যে শিল্পকার্য্যজন্য ভারতবর্ষে সুলভ এবং উৎকৃষ্টরূপ উপকরণ (Raw products) পাওয়া যায়, সেই সকল শিল্পকার্য্য এতদ্দেশীয় মধ্যশ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিলে অনেক উপকার হইতে পারে, ইহাই লর্ড ডফরিণের উদ্দেশ্য ছিল। ঠিক এই সকল কথা উল্লেখ করিয়া লর্ড ডফরিণ স্বহস্তে তদানীন্তন Financial Secretary ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ডফরিণ মহোদয়ের এই চেষ্টা ফলবতী হইলে মধ্যশ্রেণীর অনেকের অন্নের সংস্থান হইতে পারিত, এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদিগের স্থাপিত কারখানায় অনেক নিম্নশ্রেণীর লোকে নিযুক্ত হইয়া দুর্ভিক্ষের মৃত্যুসংখ্যা কমাইতে পারিত। আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে মহাত্মা ডফরিণের এই চেষ্টা কার্য্যে ফলবতী হইবার পূর্ব্বেই তিনি শাসনভার ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্মরণ থাকে লর্ড ডফরিণ এক জন Irishman.

গবর্ণমেণ্টের তালিকা।

১৭। আমরা আমাদের শিক্ষণীয় যে সকল শিল্পকার্য্যের তালিকা নিম্নে দিলাম, তাহার অধিকাংশই পূর্ব্বকথিত গবর্ণমেণ্টের তালিকা হইতে সংগৃহীত।

1. Meling of Iron from ores.
2. Manufacture of steel.
3. Iron sheets, Bolts and Steel joist, Tee Iron and Bridges, Girders and Rails.
4. Bolts, Nuts, Screws, Kodali, Hoes Axles, Nails Ploughs.
5. Galvanised Iron sheets, Corrugated sheets, Galvanised wares &.
6. Brass fittings for Buildings, Furniture and Harness &.
7. Locks and Padlocks.
8. Iron safes, Steel Trunks and Boxes.
9. Machine-tools such as Lathes, Drilling machines. Levelling machines.
10. Steam Engines and Boilers, Locomotives, Railway Wagons.
11. Dynamos and Motors, Electric fans, Electric tramways.
12. Telephones and Phonographs.
13. Telegraphic Instruments, Electric Bells.
14. Insulated wires, Wire drawing.
15. Printing Machines & Materials.
16. Oil mills, Flour Mills, Improved Hand Looms, Spinning Machines.
17. Vegetable oils.
18. Tanning.
19. India rubber goods and Vulcanites and Ebonites.
20. Perfumery.
21. Soap and Candle.
22. Pottery and Porcelain.
23. Portland Cements.
24. Glazed and Enamelled Tiles.
25. Paper, and Pasteboards, Rail-

way and Tramway Tickets.
26. Cutlery.
27. Surgical Instruments.
28. Surveying Instruments.
29. Carpenters' and Smiths' tools.
30. Glass making.
31. Umbrella.
32. Chemicals used in Arts and Manufactures.
33. do used in Medicines.
34. Tinctures, Acids and Alkalis.
35. Silk Manufactures.
36. Enamelled wares.
37. Paints and Varnishes.
38. Coir goods, Coir ropes.
39. Ropes Jute.
40. Gunnies aud Hessian Cloths. Jute carpets and Mattings.
41. Calico Printing.
42. Weaving and Spinning Wool, Cotton Silk and Jute.
43. Woodworking machinery.
44. Match making.
45. Lead Pencil, Steel Pens and other Stationery.
46. Photography & Photo-printing.
47. Color printing, Chromo Lithography.
48. Manufacture of Leather goods.
49. Lead sheetings for Tea chests.
50. Dyeing.
51. Bye-products of Coal.

১৮। উপর্য্যুক্ত কতকগুলি কার্য্য শিখিতে গেলে অনেক বৃহৎ কারখানার আবশ্যক সন্দেহ নাই। সেইজন্য আমাদের অবস্থামত একটি বড় কারখানা (Workshop) স্থাপন করিয়া বাকী অনেকগুলির প্রত্যেকটিতে ১০ হাজার টাকা ব্যয় করিলে অনেক কায চলিতে পারিবে।

১৯। তাহা হইলেও আমরা যে প্রকার বার্ষিক ব্যয়ের উল্লেখ করিয়াছি, অনেকে মনে করিতে পারেন যে এত অধিক ব্যয়, কেমন করিয়া দুই লক্ষটাকামাত্র মূলধন হইতে সংকুলান হইবে?

২০। আমরা হিসাব করিয়া দেখাইব, যে ইহার অপেক্ষা অল্প মূলধনে আমরা প্রতি বৎসরে এইরূপ ব্যয় সংকুলান করিতে পারিব। ঐ হিসাবে অবশ্য কিছু কিছু ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা একেবারে অসম্ভব নহে। কাহারও যদি তাহা অসম্ভব বোধ হয়, তবে দয়া করিয়া আমাদিগকে লিখিলে আমরা তাহা সংশোধন করিব।

২১। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে দেশের লোকের সহানুভূতি এবং পরস্পর সহায়তা ভিন্ন এই মহৎ কার্য্য কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না। সকলেরই মনে থাকা উচিত যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী একেবারে দরিদ্রভাবাপন্ন হইয়া নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে; অতএব এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য অর্থদ্বারা না হউক কায়মনোবাক্যে সততা, ধৈর্য্য, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত সকলেরই এই কার্য্যে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য, নহিলে কিছুই সাধিত হওয়া সম্ভব নহে।

২২। য়ুরোপের প্রধান প্রধান দেশের শিল্পবিদ্যালয় কিরূপ, তাহার কতক বিবরণ আমরা বারান্তরে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি।

চলিবার উপায়।

আমরা উপরে যে Polytechnic বা শিল্পবিদ্যালয়ের কথা বলিলাম, তাহার এবং সমিতির অন্যান্য বার্ষিক ব্যয় এইরূপ;—

উপর্য্যুক্ত বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীর বাটী ভাড়া, শিক্ষকের বেতন, শিল্প-উপকরণের মূল্যের জন্য ১০ হাজার হিসাবে ১০টি শ্রেণীর ব্যয়	১০০০০০৲
১০জন ছাত্রকে প্রতিবৎসর য়ুরোপ ও জাপান পাঠাইবার খরচ	২৫০০৲
প্রতিবৎসর ১০ জন ফিরিয়া আসিবার	২৫০০৲
৫জন জাপানে থাকার খরচ	৩৬০০৲
৫জন য়ুরোপে থাকার খরচ	৭২০০৲
এখানে ৩জন Chemistry ও Physics শিক্ষকের ফিঃ ৩০০ Lecture ১০ হিঃ—	৩০০০৲
Science Associationএর যন্ত্রাদি ভগ্ন হওয়া বা ক্ষয় হওয়ার কারণ	২০০০৲
শিক্ষার জন্য Chemicals ইত্যাদি	১০০০৲
সমিতির সেক্রেটারীর বেতন	১৮০০৲
প্রধান অধ্যক্ষ	৩০০০৲
২জন ইনস্পেক্টর	২৪০০৲
দ্বারবান বেহারা প্রভৃতি	১০০০৲
বাটী ভাড়া, কারখানার ভাড়া ইত্যাদি	৪২০০৲
১২ জন নিম্ন কর্ম্মচারী ৩০৲ হিঃ	৩৬০০৲
	১৩৭৮০০৲

২। অতএব আমাদিগকে প্রতিবৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় সংকুলান করিতে হইবে।

৩। এমন কোন উপায় নাই যাহাতে দুই লক্ষ টাকা মূলধনে বৎসরে দেড় লক্ষ টাকা আয় হইতে পারে।

৪। কিন্তু লোক বলের দ্বারা এবং পরস্পর সাহায্য (অর্থাৎ Co-operation) দ্বারা ইহার অপেক্ষা অল্প মূলধনে—এমন কি এক লক্ষ টাকাতেই বৎসরে দেড় লক্ষ টাকা আয় হইতে পারে। অর্থনীতি শাস্ত্রের পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

৫। এই সকল অর্থনীতির উপর নির্ভর করিয়া আমরা পরবর্ত্তী কয়েকটা উপায়ের প্রস্তাব করিলাম; কেহ তাহাতে কোন ভ্রম দেখাইয়া দিলে আমরা তাহা সংশোধন করিব।

৬। প্রথমতঃ সমিতি প্রত্যেক জেলায় জেলায় এবং কলিকাতায় স্থানে স্থানে এক একটি কমিটি গঠন করিবেন।

৭। উপরিউক্ত প্রত্যেক কমিটি একটি করিয়া হাইস্কুল ও কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন করিবেন।

৮। এই হাইস্কুল প্রচলিত এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত শিক্ষার বিদ্যালয় হইবে।

৯। তাহাতে যে সকল বালক অন্ততঃ ৫ বৎসর অধ্যয়ন করিবে, তাহারা সমিতির স্থাপিত শিল্প-বিদ্যালয়ে কোন প্রকার প্রবেশিকা (Admission) ফি না দিয়া নিযুক্ত হইতে পারিবে এবং যে বিদ্যালয়ে পাঠ করিবে, ঐ বিদ্যালয় এবং উহার সংলগ্ন কো-অপারেটিভ সোসাইটির একবৎসরের লাভাংশস্বরূপ সমিতি যে দশহাজার টাকা এবং একজন করিয়া শিল্প-শিক্ষকের শিক্ষার খরচ দিবেন তাহা পাইতে পারিবে। তাছাড়া ঐ শিল্প-বিদ্যালয় ভবিষ্যতে ব্যবসায় করিলে তাহার সম্পূর্ণ লাভাংশ পাইতে পারিবে।

১০। এই সকল বিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পাশ হইয়া যাহারা এফ, এ পড়িবে এবং অন্য শিক্ষা বা কার্য্য অবলম্বন করিবে তাহারাও এই লাভের অংশ পাইবে।

১১। এই সকল এণ্ট্রান্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ভিন্ন অপর-লোকে সমিতির শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে গেলে তাঁহাদিগকে প্রাবেশিক ফি ২০০৲ টাকা দিতে হইবে।

১২। এই সকল বিদ্যালয়ে যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসনে এণ্ট্রান্স পাশ করিবে, তাহারা ব্যতীত অপর বালকদিগের পক্ষে কোনরূপ শিল্প-শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়।

১৩। কেবল মাত্র এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পঠিত বালকদিগের পক্ষে বিজ্ঞান শিক্ষা কঠিন হইলে, সমিতি ইংরাজী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা করিবেন।

১৪। এই সকল বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ছাত্র সংখ্যা ৫০০ ধরিলে বিদ্যালয়ের আয় ব্যয় নিম্ন-হিসাব মত হইতে পারে। কলিকাতায় অনেকগুলি বিদ্যালয়ে ৫০০ অপেক্ষা অধিক ছাত্র আছে। এখনকার প্রচলিত বিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পাশ না হইলে (অনেক স্থলে হইলেও) বালকদিগের আর কিছুই উপায় নাই। কিন্তু প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে পাশ না হইলেও যখন একটা কার্য্য শিখিবার, এবং একটা ব্যবসা করিবার ব্যবস্থা থাকিবে তখন তাহাতে ৫০০ বালক হওয়া বিচিত্র নহে। তথাপিও প্রত্যেক জেলায় বিদ্যালয়ে যদি এত ছাত্র হওয়া সম্ভব না হয়, তবে সমিতি আপাততঃ কলিকাতা ও মফস্বলে অন্ততঃ ২০টি বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন।

প্রত্যেক বিদ্যালের মাসিক আয় ব্যয়।

মাসিক আয়।

১ম নাগাইত ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ৩০০ জন বালকের বেতন ৩৲ হিঃ	৯০০৲
৭ম, ৮ম শ্রেণী ১০০ জন ২৲ হিঃ	২০০৲
৯ম, ১০ম শ্রেণী ১০০ জন ১৲ হিঃ	১০০৲
	১২০০৲

মাসিক ব্যয়।

প্রধান শিক্ষক		৭৫৲
২য়	ঐ	৫০৲
৩য়	ঐ	৪৫৲
৪র্থ	ঐ	৪০৲
৫ম	ঐ	৩৫৲
৬ষ্ঠ	ঐ	৩০৲
৭ম	ঐ	২৫৲
৮ম	ঐ	২২৲

৯ম শিক্ষক	২০৲
১০ম ঐ	১৮৲
অঙ্ক শিক্ষক	৫০৲
৩ জন পণ্ডিত মহাশয়	৬০৲
ড্রয়িং ও ড্রিল শিক্ষক	৩০৲
বাটী ভাড়া	৭০৲
বেহারা ২ জন	১৬৲
	৫৯০৲

১৬। এখানে খরচের পরিমাণ মাসিক ৬০০৲ টাকা ধরিলেও বৎসরে অনায়াসে ৭০০০৲ টাকা বাঁচাইতে পারা যায়।

জেলা কমিটির দ্বিতীয় কার্য্য।

১৭। প্রত্যেক জেলায় এবং কলিকাতার স্থানে স্থানে এক একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

১৮। এই সকল সোসাইটিতে লোকসানের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, অথচ লাভ নিশ্চয়।

১৯। লাভ হওয়া ব্যতীত এই সকল সোসাইটি-দ্বারা দেশীয় শিল্প-জাত দ্রব্যের বেশী পরিমাণ কাটতি হওয়াও নিশ্চিত।

২০। মনে করুন, ৪০০ জন লোকে তাঁহাদের নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য খরিদ করার জন্য যদি প্রত্যেকে ১০৲ দশ টাকা দিয়া ৭০০০৲ টাকা এক ব্যক্তি বা কমিটির নিকট সংগ্রহ করেন, তাহার পর (*wholesale*) পাইকারী দরেঐ সকল দ্রব্য খরিদ করিয়া একস্থানে সংগ্রহ করতঃ নিজেদের আবশ্যক মত দ্রব্য সেখান হইতে খুচরা দরে খরিদ করিতে থাকেন, এবং তাহা হইতে অপরকেও বিক্রয় করিতে থাকেন তাহা হইলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে।

২১। যে ৪০০ জনে এই সোসাইটি করিবেন তাঁহারাত ইহার খরিদার থাকিবেনই—তা ছাড়া তাঁহাদের প্রত্যেকের ১ জন করিয়া আলাপি বন্ধু বান্ধব ধরিলে, আর ও ৪০০ জন খরিদার পাওয়া যাইতে পারে। অতএব এই মেম্বর ৪০০ জন এবং তাঁহাদের আলাপী ৪০০ জন, এই ৮০০ জনে প্রত্যেকে মাসে দশ টাকা করিয়া দ্রব্য খরিদ করিলে মাসের বিক্রয় ৮ হাজার টাকা হয়। এই আট হাজার টাকায় বিক্রয়ের উপর শতকরা ১০৲ টাকা লাভ ধরা যাইতে পারে; অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৬৲ টাকা লাভ ধরিলে মাসে ৫০০৲ টাকা বা বৎসরে ৬ হাজার টাকা লাভ হইতে পারে।

২২। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই লাভও বিদ্যালয়ের লাভের ন্যায় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগেরই হইবে। অতএব যেখানে একটি বিদ্যালয় থাকিবে সেখানে ৫০০ জন (বা ৪০০ জন) খরিদ্দার আমরা পাইলাম। এই ৫০০ জন বালকের অভিভাবকেরা কথিত কো-অপারেটিভ সোসাইটির মেম্বর হইবেন।

২৩। সোসাইটির মূলধনের জন্য প্রথম দেয় যে দশ টাকা তাহাও তাঁহাদিগকে দিতে হইবে না। তাঁহারা ছাত্রদিগের প্রাবেশিক ফি স্বরূপ যে ৩৲টাকা বা ২৲টাকা দিতেন, তাহার স্থানে প্রত্যেকে ৩৲ টাকা করিয়া দিলেই চলিতে পারে; মূলধন সমিতি দিবেন।

২৪। প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া সোসাইটি স্থাপন করা সম্ভব না হইলে সমিতি ২০টি বিদ্যালয়ের সহিত আপাততঃ ২০টি সোসাইটি স্থাপন করিতে পারেন।

২৫। এই সকল সোসাইটি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত যৌথঋণদানসমিতি Co-operative Credit Society ইত্যাদি আর আর দেশ হিতকর কার্য্যও করিতে পারিবেন।

দেশীয় শিল্প দ্রব্যের বিক্রয় বাহুল্য।

২৬। দেশীয় দ্রব্যের কাট্তির পরিমাণ বৃদ্ধি জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় ভারত ভাণ্ডার বা Indiain Store নামে যে শিল্পাগার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্থাপয়িতাগণ অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী একটু অন্য প্রকারে করিতে পারিলে আরও অনেক ভাল হয়।

২৭। তাঁহারা যদি কলিকাতায় ইয়ুরোপীয় বণিক দিগের ন্যায় দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া বহুসংখ্যক ব্যাপারী, দোকানদার, Co-operative Society এবং এজেণ্টকে তাঁহাদের দ্রব্য পাইকারী (Wholesale) দরে বিক্রয় করেন, এবং ক্ষুদ্র দোকানদারেরা খুচরা দরে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে অনেক বেশী পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইতে পারে।

২৮। মনে করুন একজন ক্ষুদ্র শিল্পকার কেবল মাত্র ২০০৲ টাকা মূলধনে প্রতি মাসে

৫০০ শিশি পারফিউমারি প্রস্তুত করিতে পারেন। Indian Store তাহা কতক লাভ দিয়া বা কমিশনে খরিদ করিয়া লইলেন। শিল্পকার সহজেই টাকা পাইয়া আবার পরবর্ত্তী মাসে কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

২৯। এখন Indian Store বা আমাদের প্রস্তাবিত সমিতির অধীনে যদি ৫০টি সোসাইটি, ২০০ জন দোকানদার ব্যাপারী ইত্যাদি থাকে, তাহা হইলে সমিতি ঐ ৫০০ শিশি ২৫০ জন দোকানদারকে ভাগ করিয়া বিক্রয় করিয়া দিলে প্রত্যেকের ২ শিশি বিক্রয় করিতে কিছুই বিলম্ব লাগিবে না। অথচ ঐ ক্ষুদ্র শিল্পীর ২০০৲ টাকা মূল ধনেই ব্যবসা চলিয়া যাইবে।

৩০। এই কারণে, যাহাতে বেশী পরিমাণ সোসাইটি স্থানে স্থানে স্থাপিত হয় সোসাইটি বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিবেন। সে জন্য যদি মফস্বলে স্থানীয় লোকে সোসাইটি স্থাপন জন্য উদ্যোগী হয়েন, সমিতি তাহার অর্দ্ধেক মূলধন দিবেন।

৩১। বেশী পরিমাণে কাটতি করিবার জন্য সমিতি সকল প্রকার শিল্পদ্রব্য এবং দেশীয় অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য কেহ বিক্রয় করিতে দিলে তাহা কমিশন লইয়া বিক্রয় করিয়া দিবেন। বিক্রয়ের পূর্ব্বে তাঁহাদের টাকা আবশ্যক হইলে, দ্রব্যের মূল্য বুঝিয়া শতকরা ৭৫।৮০ টাকা তাঁহাদিগকে দিবেন। এইরূপ কার্য্যে সমিতির কিছু মাত্র লোকসানের সম্ভাবনা নাই। কেহ প্রবঞ্চনা না করে সে জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই।

সারসংকলন।

১। আমরা পূর্ব্ব-কথিত কয়েক পৃষ্ঠায় সমিতির এই কয়টি উদ্দেশ্য দেখাইয়াছি:—

(ক) শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন।

(খ) শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত্র পাঠান।

(গ) শিল্প-কার্য্য জন্য ১০০০০৲ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা।

৪। শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য স্থানে স্থানে কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন।

২। এই কয়টি কার্য্যের জন্য সোসাইটির মূলধন নিম্নলিখিত রূপে খরচ হওয়া সম্ভব:—

(ক) ২০টি এণ্ট্রান্স বিদ্যালয় স্থাপনের খরচ ... ... ২০০০০৲

(খ) ২০টি কো-অপারেটিভ সোসাইটির মূলধন ... ... ৮০০০০৲

(গ) আরও ২৫টি ক্ষুদ্র সোসাইটির মূলধনের অর্দ্ধেক (৩০ দফায় লিখিত)... ২৫০০০৲

(ঘ) একটি বড় কারখানার (Workshop) জন্য খরচ ... ... ২৫০০০৲

(ঙ) ৩১। দফার লিখিত শিল্পজাত ও দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য লইয়া অগ্রিম (Advance) দিবার জন্য ... ৮০০০০৲

মোট ২৩০০০০৲

৩। সমিতির মূলধন ... ২০০০০০৲

৪। Admission fee ২০টি বিদ্যালয়ের (২৩ দফার লিখিত, ... ৩০০০০৲

মোট ২৩০০০০

৫। সমিতির প্রথম বৎসরের আয়।

২০টি বিদ্যালয়ের (১৬ দফায় লিখিত) সঞ্চয় ... ... ২০×৭০০০৲=১৪০০০০৲

২০টি কো-অপারেটিভ সোসাইটির বার্ষিক লাভ (২১ দফায় লিখিত) ৬০০০৲ টাকার স্থলে প্রত্যেক টিতে ৩০০০৲ টাকা করিয়া ধরিলেও ... ২০×৩০০০৲=৬০০০০৲

আরও ২৫টি ক্ষুদ্র সোসাইটির প্রত্যেকের ৫০০৲ টাকা আয় ধরিলে ...৫০০৲×২৫=১২৫০০৲

দেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের কমিশন (৩১ দফায় লিখিত) ... ১৮০০০৲

ঐ সকল দ্রব্য রাখিয়া প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা Advance করার সুদ শতকরা ১২৲ হিঃ ... ... ১২০০০৲

বার্ষিক আয় মোট ২৪২৫০০

৬। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, সমিতির এক বৎসরের খরচ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। অতএব যে টাকা উদ্বৃত্ত হইতে পারে, তাহা প্রত্যেক শিল্প-শ্রেণীকে আরও বেশী করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই হিসাবমত প্রত্যেক শিল্প-শ্রেণী প্রতি বৎসরে ২০ হাজার টাকা পাইতে পারেন।

৭। আমরা যে সকল কথা লিখিলাম, তাহা কেহ যদি মন না দিয়া, কেবল উপর উপর পাঠ করেন, তবে তিনি অনেক অসম্ভব কথা দেখিবেন, কিন্তু বুঝিয়া হিসাব করিয়া যদি দেখেন, তবে দেখিবেন, আমরা বেশী অসম্ভব কথা বলি নাই।

৮। ইহার দুই একটা উপায় অসঙ্গত বোধ হইলে, আমরা আরও একটা সহজ উপায় বলিতে পারি। সকলে জানেন, আমরা প্রতি বৎসর ৩২ কোটি টাকার সূতা ও সূতার কাপড় বিলাত হইতে আমদানী করিয়া থাকি। কোন সমিতি যদি কেবল এই বিলাতি কাপড় বিক্রয় করিবার উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা Organisation করিতে পারেন, তবে একটি সমিতি Association এক বৎসরে অন্ততঃ ৪ কোটি টাকার বিলাতি কাপড় বিক্রয় করিতে পারেন। বিলাতি কাপড় অবিক্রেয় নহে, সুতরাং বিলাত হইতে সাক্ষাৎভাবে আনাইয়া বিক্রয় করিলে টাকায় ৵১০ অর্দ্ধ আনা মাত্র লাভ ধরিলে বৎসরে ১২॥০ লক্ষ টাকা লাভ হইতে পারে। কলিকাতায় একা রেলি ব্রাদার বৎসরে ৪ কোটি টাকার বিলাতি কাপড় বিক্রয় করিয়া থাকেন।

৯। উপায় নানারূপ থাকিলেও প্রাণের আগ্রহ, উদ্যোগ, সততা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কিছুই সম্ভব নহে।

১০। কেহ এই সকল কথা প্রলাপ বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী মাতৃভূমির দুঃখ যাঁহার প্রাণ বিচলিত করিয়াছে, তিনি বুঝিবেন, যে ভালবাসাজনিত প্রলাপেও ফল আছে। স্বদেশের জন্য যাঁহাদের প্রাণ বিচলিত হইয়াছে, সেই মহাত্মাগণের নিকটে এই ক্ষুদ্র-জনের এই নিবেদন যে তাঁহারা কার্য্যতঃ যেন কিছু করিবার জন্য উদ্যোগী হয়েন।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

কার্পাস।

কার্পাস একটি মূল্যবান্ ফসল। কার্পাস লইয়া সংপ্রতি বিলাতে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে এবং তাহাতে তুলার চাষের উপর বিশেষ মনোযোগ না করিলে চলিবে না। তুলা এক-প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। মধ্য ভারতবর্ষে তুলাচাষের বেশ উন্নতি হইতেছে। এদেশেও স্থানে স্থানে ইহার উপর লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

দেশীয় তুলার বীজ কার্ত্তিক মাসে বপন করিতে হয়। আমেরিকাদেশীয় তুলার বীজে উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিয়া থাকে, সুতরাং এস্থলে উহারই চাষ বর্ণনীয়। দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় বীজ হইতে তুলা উৎপাদন প্রণালীর কোন পার্থক্য নাই।

তুলার চাষে বিঘা প্রতি ৫০ মণ গোবর এবং ২০ মণ ছাই সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বীজ বুনিবার সময় তুলার জমীতে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয় কারণ তুলার গাছের গোড়ায় জল জমিলে গাছ মরিয়া যায় সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই দাঁড়া বাঁধিয়া সাবধান হওয়া উচিত।

সাধারণতঃ যে দোআঁশ মাটীতে কাদার ভাগ কিছু বেশী থাকে তাহাতে তুলা ভাল হয়। ক্ষেত ঢালু থাকিলে দাঁড়া না বাঁধিলেও চলিতে পারে। যে জমীর জলীয় বাষ্প উদ্গীরণ করিবার ক্ষমতা নাই, (অর্থাৎ যাহা একবার সিক্ত হইলে শীঘ্র শুষ্ক হয় না) তাহাতে তুলার গাছ ভাল হয় না এবং হইলেও তুলা ভাল জন্মে না। তুলার জন্য একটু উচ্চ দোআঁশ অথবা পলিমাটিবিশিষ্ট ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করাই শ্রেয়ঃ। ফাল্গুন মাস হইতে এই জমীতে উত্তমরূপ চাষ দিয়া রাখিতে হয়। পরে বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে দুই হাত অন্তর গর্ত্ত করিয়া প্রত্যেক গর্ত্তে ৩।৪টী করিয়া বীজ পুঁতিতে হয়। ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইলে গর্ত্তে দুইটী করিয়া গাছ রাখিয়া অবশিষ্ট উঠাইয়া ফেলিবে। এবং যে সমস্ত গর্ত্তে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই তাহাতে উক্ত অঙ্কুরিত বীজ পুঁতিয়া দিবে। এইরূপে সমস্ত গর্ত্তেই গাছ রাখিতে হইবে।

এই গাছ একটু বড় হইলে যেটী বেশ সবল ও পরিপুষ্ট হইবে কেবল সেইটিকে রাখিয়া অপরটি তুলিয়া ফেলিতে হয়। জমীতে আগাছা হইলে মাঝে মাঝে নিড়াইয়া দেওয়া উচিত এবং জল না হইলে অল্প অল্প জল সেচন করিতে হয়। ঐ গাছ বেশ সবল হইয়া বাড়িতে আরম্ভ হইলে উহার উপরের দুই একটী ডাল ভাঙ্গিয়া দিতে হয় নতুবা ফলের মাত্রা কম হইয়া থাকে। রীতিমত

যত্ন করিলে ২।৩ মাসের মধ্যেই কার্পাস গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হয়।

আশ্বিন মাসের প্রথমার্দ্ধ ফল তুলিবার উপযুক্ত সময়। তুলিবার উপযুক্ত হইলে ফল না ফাটিতে ফাটিতে তুলিয়া ফেলিতে হয়। পরে রৌদ্রে বেশ করিয়া শুকাইয়া তুলা বাহির করিয়া লইতে হয়। তুলিবার সময় তুলার ছোট বড় ফলগুলি বাছিয়া ফেলিলে ভাল হয়। কারণ ফল অনুসারে তুলারও তারতম্য হইয়া থাকে।

আমাদের দেশীয় তুলা তাদৃশ ভাল নহে। বিদেশীয় তুলার কতকগুলি জাতি ভারতবর্ষে বেশ জন্মিতে পারে এবং তাহার চাষ করিয়াও বেশ লাভ করা যায়। সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত তুলাগুলি আদর্শক্ষেত্রে উৎপাদন করিয়াছেন (১) নিউ অব্ লিয়েন্স (New oblians) (২) আপল্যাণ্ড জর্জিয়ান্ (Upland Georgian) এবং (৩) বামি (Bahmie)। এতদ্ভিন্ন গারোপর্ব্বতজাত তুলা এবং মিশরদেশীয় তুলাও চাষের উপযুক্ত। গারোপর্ব্বতজাত তুলার ফল বড় এবং তুলা নরম। ইজিপ্সিয়ান্ তুলার ফল বড় এবং তুলাও বেশ শক্ত। এই সমস্ত তুলা আমাদের দেশে চাষ করা কর্ত্তব্য।

তুলার বীজের খৈল অতি মূল্যবান্ সার। ইহাতে ফস্‌ফরাসের মাত্রা অধিক পরিমাণে আছে বলিয়াই ইহা এতাদৃশ মূল্যবান্। তুলা যেরূপ প্রয়োজনীয় উহার উৎপাদনে সেরূপ লাভ হয় নাই। অধিক পরিমাণে চাষ করিতে পারিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা। অধুনা ম্যান্‌চেষ্টারের জন্য যদিও তুলার লাভ কমিয়া গিয়াছে তথাপি দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনের যথেষ্ট প্রয়াস হইতেছে বলিয়া ইহার চাষও অধিক পরিমাণে করা যাইতে পারে এবং বহির্বাণিজ্যও অনেকটা চলিতে পারে। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

১ বিঘা জমী চাষ করিতে মোট খরচ	৮৲
বিঘা প্রতি ১ মণ তুলা হইলে এবং তুলা ভাল হইলে তাহার মূল্য	২২৲
লাভ	১৪৲

শ্রীহরিদাস মিত্র, বি, এল,
কাশিপুর কুমিলা।

কবিরাজ

শ্রীবিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন

মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

৫নং কুমারটুলি—কলিকাতা

এই ঔষধালয়ে পুরাতন জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ছর্দ্দি (বমন), অপস্মার, মূর্চ্ছা, উন্মাদ বাতব্যাধি, বাতরক্ত, আমবাত, শূল, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, প্রমেহ, শোথ, উদর, অম্লপিত্ত, চক্ষুরোগ, শিররোগ, স্ত্রীলোকের বিবিধ রোগ ও বালরোগের আয়ুর্ব্বেদোক্ত নানাবিধ কাষ্ঠৌষধ, ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মোদক, দ্রাবক, ধাতুভস্ম, মকরধ্বজ ও মৃগনাভি প্রভৃতি ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মফস্বলের অধিবাসিগণ রোগের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানাইলে ভ্যালুপেবল ডাকে ঔষধ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

আমাদের ঔষধালয় ভারতবর্ষস্থ কৃতবিদ্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে—এমন কি আসিয়াখণ্ড উল্লঙ্ঘন করিয়া সাগর-পারস্থ সুদূর ইংলণ্ডবাসিগণের মধ্যেও কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ নিম্নে কয়েকখানি পত্রের মর্ম্মানুবাদ প্রকটিত করা হইল। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজের পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম না। কারণ সে সব পত্র (কনফিডেনসিয়েল) গোপনীয় বলিয়া গণ্য

৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পত্রের সংক্ষিপ্তানুবাদ,—

"আমার বন্ধু কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেনকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। তিনি উচ্চদরের সংস্কৃতাভিজ্ঞ এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন। আজকাল ইংরেজীমতে ডাক্তার হইয়া কবিরাজ-সম্প্রদায়কে কতকটা পশ্চাৎপদ করিয়াছে বলিতে হইবে, কিন্তু এদেশে যতদিন পণ্ডিত বিজয়রত্নের ন্যায় জ্ঞানবান, বহুদর্শী ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন কবিরাজ থাকিবেন, ততদিন হিন্দুচিকিৎসার গৌরব অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিতি করিবে।"

উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর

কে, জি, গুপ্ত স্কোয়ার।

"বিবিধ রোগের চিকিৎসায়, বিশেষতঃ যাপ্য রোগ সমূহের চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর উপযোগিতা ক্রমেই উপলব্ধি হইতেছে। এ সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেন মহাশয় যতদূর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং তিনি রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে যতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন, এরূপ উন্নতিশীল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক অতীব বিরল।"

লেবু ও সাইট্রিক্ এসিড।

আমাদের দেশে যত প্রকার সুন্দর সুস্বাদু ফল আছে, তাহার মধ্যে লেবুর স্থান বড় অধিক নিম্নে নহে।

বিশেষতঃ কমলালেবুতে যেমন সর্ব্বপ্রকার রস সমভাবে বর্ত্তমান, এমন আর কোন ফলে নাই বলিলেই হয়। সে হিসাবে কমলালেবুকে সকল ফলের শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। যেমন নয় প্রকার রস বর্ত্তমান না থাকিলে, কোন কাব্যগ্রন্থের মাধুর্য্য সম্পাদিত হয় না, সেইরূপ সকলপ্রকার রস না থাকিলে, সে ফলে আর ফল কি? ইহাতে কাব্যের কথিত বীর, বীভৎস, রৌদ্র ও হাস্য প্রভৃতি সকল রস না থাকিলেও মাধুর্য্যে এই ফল অতুলনীয়। তবে অপক্ব অবস্থায়, ইহাতে বীভৎস ও করুণরস বিশেষরূপে বুঝা যায়।

লেবুর নানা প্রকার জাতি আছে; তাহার মধ্যে কমলা, নারেঙ্গা, গোঁড়া, কাগজী, পাতি, সরবতি, বাতাবি, এই কয়প্রকার প্রধান।

কমলালেবু।

ইহার সংস্কৃত নাম নাগরঙ্গ। এতদ্ভিন্ন ইহাকে, নারাঙ্গি, সন্তরা, অমৃতফল, কমলা ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। ইহার যতগুলি ইয়ুরোপীয় নাম, তাহার সমস্তই নাগরঙ্গ বা নারাঙ্গ হইতে গৃহীত হইয়াছে। যথা:—

Portugese—Laranga.
Spanish—Naranga.
Latin—Aurantim.
English—Orange.

ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বোপদ্বীপের প্রায় সর্ব্বত্রই এই ফল দেখিতে পাওয়া যায়; তবে স্থান বিশেষে ইহার স্বাদের ইতর বিশেষ আছে। সকল স্থানের অপেক্ষা শ্রীহট্ট বা সিলেট, নাগপুর এবং দার্জ্জিলিঙ্গের লেবুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

খাসিয়া পর্ব্বতের দক্ষিণ শ্রীহট্টে, নাগপুরের নিকট মধ্যপ্রদেশে, দিল্লীর সন্নিকট প্রদেশে ইহার বিস্তৃত আবাদ আছে; তাহা ছাড়া নেপাল, সিকিম, গাড়োয়াল ও আরঙ্গাবাদে ইহা অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীহট্টেই অধিক পরিমাণে জন্মে। শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনর ষ্টিভেনসন সাহেবের রিপোর্টে জানা যায় যে, প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় দুই লক্ষ, আড়াই লক্ষ টাকার কমলা সিলেট হইতে কলিকাতা রপ্তানি হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, যে ইহা পূর্ব্বে এ দেশে ছিল না; চীন এবং কোচিন চীন হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতে ইহার উল্লেখ আছে এবং বিখ্যাত পটুগীজ পরিব্রাজক ভাস্কোডিগামা এই ফলের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন দেখিয়া বোধ হয়, অনেক প্রাচীন কাল হইতেই কমলা আমাদিগের প্রতিবেশিনী।

খাসিয়া পর্ব্বতের দক্ষিণদেশে বহুদূর ব্যাপিয়া এই বৃক্ষের কুঞ্জবন বিস্তৃত। কলিকাতার বিখ্যাত এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির মাসিক পত্রিকায় ব্রাউন লো সাহেব তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। Vol. I. Part IV New series, 1869, p. 327

যে জমীতে এই সকল বৃক্ষ জন্মায়, সেই জমী প্রায়ই বালুকা ও প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। ব্রাউন লো বলেন, যে কমলা-বৃক্ষের শিকড়ের নীচে জল বর্ত্তমান থাকিলে তাহা বৃক্ষের বিশেষ সুবিধা জনক। এই জল জমীর উপরিস্থিত আবদ্ধ (Stagnant) জল নহে। জমী প্রস্তরখণ্ড ও বালুকাময় বলিয়া নিকটস্থ নদীর জল চুয়াইয়া (Percolate) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে বৃক্ষের নীচে এই জল বর্ত্তমান থাকে। যে জমীতে ইহার আবাদ আছে, সে জমী প্রায়ই সমতল ক্ষেত্র এবং নদীর দিকে অল্প মাত্রায় ঢালু। ইহার মধ্যে যে সকল নাবাল জমী আছে, এবং যেখানে জল দাঁড়ায়, সেইরূপ নাবাল জমীতে কমলাবৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং সেই সকল জমী বাদ পড়িয়া থাকে। এখানে (সিলেটে) এক এক লক্ষে প্রায় এক হাজার একর অর্থাৎ ৩ হাজার বিঘা জমীতে কমলার চাষ আছে। প্রায় দুইঘণ্টা কাল পদব্রজে বেড়াইলেও কমলা-কুঞ্জ শেষ হয় না। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে যখন সকল বৃক্ষেই ফল ধরিয়া থাকে তখন অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। সিলেটের কমলাসম্বন্ধে ব্রাউনলো লিখিলেন, "আমি ইটালির অন্তর্গত সরেন্টোর কমলাবাগান দেখিয়াছি কিন্তু ইটালির নাতিশীতোষ্ণ রৌদ্র ও জল বায়ুতেও সিলেটের লেবুর মত মিষ্ট মাত্রায়

অম্ল-মধুর-কষায়-রস বিশিষ্ট সুমধুর আস্বাদযুক্ত লেবু আর কোথাও দেখি নাই।" ব্রাউনলো বলেন যে, সিলেটের জল বায়ু এবং ভূমি কমলা-লেবুর আবাদের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত। ব্রাউন লো সাহেবের সংগৃহীত সিলেটের কমলা-আবাদের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার ওয়াল্ডি নিম্নলিখিত দ্রব্য পাইয়াছিলেন।

এল্যুমিনা	৬·০৯
লৌহপেরক্সাইড	৪·৯৩
চুণ	·১৯
ম্যাগ্নিসিয়া	·১৩
ক্ষারদ্রব্য (Alkales)	·৮০
Silica solution	·১৫
লৌহ অক্সাইড ও চুণ মিশ্রিত এল্যুমিনা	৩·৪৯
Organic matter	৫·৬৬
Silica and quartz (বালুকা ও প্রস্তর)	৭৮·৫৬
	১০০

কমলাবৃক্ষের চাষ করিতে গেলে, জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে টব বা বাক্সের মধ্যে মাটী দিয়া তাহাতে বীজ রোপণ করিতে হয়; অঙ্কুর হইলে তাহাতে জাল ঢাকা দেওয়া থাকে পাছে ইন্দুরাদিতে নষ্ট করে। পরবর্ত্তী বর্ষাকালে চারা টব হইতে তুলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হয়। চারা তুলিতে গেলে, টবটি ভাঙ্গিয়া আস্তে আস্তে মাটী ভাঙ্গিয়া লইতে হয়, যাহাতে শিকড়ের কিছুমাত্র হানি না হয়। কলম করিবার প্রথা কিম্বা বীজ বাছিয়া লওয়ার বিশেষ সাবধানতা নাই। বোধ হয়, তাহাতে আরও উন্নতি হইতে পারে।

গাছ বড় হইলে পাতা ছাঁটিয়া দিবার কিম্বা ডাল কাটিয়া গাছ হালকা করিবার কিছুই নিয়ম নাই। ফরাসি ও ইটালিয়ান লেবুর বাগানে এই সকল বিশেষ নিয়ম ও বিশেষ যত্ন থাকা সত্ত্বেও, তাহারা সিলেটের ন্যায় সুস্বাদু ও সুমিষ্ট ফল উৎপাদন করিতে পারে না।

কমলালেবুর গাছ সচরাচর প্রায় ২৫।৩০ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ফল পাকিলে মই করিয়া কতকটা উঠিয়া, জালবাঁধা আঁকুশীদ্বারা ফল পাড়িতে হয়। যে সকল ফল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং 'গাছপাকা' তাহা সিলেটেই বিক্রয় হয়, কারণ তাহা বেশী দিন টিকে না। তদপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ফল, শালতি করিয়া রপ্তানি হইয়া ছাতক কিম্বা কালি বাজারে বিক্রীত হয়। ৭৫০ গণ্ডা লেবুতে (৩০০০) এক শণ হয়। কালি বাজারে এক শণ লেবুর মূল্য প্রায় ৬৲ টাকা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাগপুরেও বেশী পরিমাণে লেবু জন্মে। কুলার সাহেব বলেন যে, গত বার বৎসরের মধ্যে নাগপুর কামটি এবং এই প্রদেশের অন্যান্য স্থানে কমলালেবুর অনেক নূতন বাগান হইয়াছে, এবং ক্রমেই ইহার চাষ বাড়িতেছে; বোম্বাই অঞ্চলে নাগপুরে লেবুর বিশেষ আদর। ১৮৮৫ সালে একমাত্র নাগপুর ষ্টেশন হইতে ২২৬০০ মণ লেবু বোম্বাই প্রদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ২১০টা লেবুতে একমণ ধরা যাইতে পারে।

কমলালেবুর খোসা হইতে একপ্রকার তৈলবৎ দ্রব্য বাহির হয়, তাহা চুলকানি প্রভৃতির ঔষধ। খোসা হইতে মোরব্বা প্রস্তুত হয়। রস হইতে সিরপ প্রস্তুত করিয়া অনেক দিন রাখা যাইতে পারে। তাহা গ্রীষ্মকালে সরবত করিয়া পান করিতে অতি উপাদেয় এবং অজীর্ণ ও উদরাময় রোগের পরম ঔষধ। মুসলমান হাকিমেরা কমলার অনেক গুণবর্ণনা করিয়াছেন।

কমলালেবুর বৃক্ষ দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, যে ৬০০ শত বৎসরেরও অধিক কাল তাহারা বাঁচিয়া থাকে। ইটালির অন্তর্গত ভার্সেলেশ নগরের কমলার বাগানে 'General Constable' নামে বৃক্ষের বয়স প্রায় ৪৫০ বৎসর। রোমনগরের অন্তর্গত সেণ্ট সেবাইনা কনভেণ্টের একটি বৃক্ষের জন্ম তারিখ, ১২০০খৃঃ অব্দে। অর্থাৎ তাহার বয়স ৭০০ বৎসরের অধিক। এক একটি বৃক্ষে ১০০০ হইতে ৬০০০ পর্য্যন্ত ফল ধরিয়া থাকে। এক একটি বৃক্ষ ঊর্দ্ধে প্রায় ৫০ ফিট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গুঁড়ী বা কাণ্ড পরিধিতে ৮ হাত বা ১২ ফুট হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে ৪ফুট প্রশস্ত তক্তা হইতে পারে। ইহার কাষ্ঠের বর্ণ হরিদ্রাভ শ্বেত; কতক পরিমাণে কঠিন এবং ইহার আঁইষ (Granis) ঘন সন্নিবিষ্ট।

সাইট্রিক এসিড, নিরোলি প্রভৃতি অনেক কথা পরে বলা যাইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার দত্ত।

কুসুম ফুল।

যে অবধি য়ুরোপে কৃত্রিম রঙ্গের প্রচলন হইয়াছে, তদবধি ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ রঙ্গের কাটতি একেবারে কমিয়া গিয়াছে। যখন নীলের মত একটা বৃহৎ কারবার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন ছোট ছোট কারবারের যে আর দাঁড়াইবার স্থল নাই তাহা কি আর বলিতে হইবে! ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশ হইতে য়ুরোপ ও মার্কিনে মঞ্জিষ্ঠা ও কুসুমফুল যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইত, কিন্তু এখন এই উভয়বিধ উদ্ভিজ্জ রঙ্গেরই রপ্তানি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস চিরদিন এরূপ থাকিবে না। কৃত্রিম রঙ্গের পশার যেন একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতেছে। নকল নীল অপেক্ষা আসল নীলের প্রতি আবার লোকের দৃষ্টি পড়িতেছে। ইহাতে বোধ হয় অন্যান্য স্বাভাবিক রঙ্গের পুনরায় আদর হইবে।

কুসুমফুল ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। তবে নিম্নবঙ্গ অপেক্ষা বিহার প্রদেশেই ইহার অধিক আবাদ হইয়া থাকে। নিম্নবঙ্গের বর্দ্ধমান জেলার কোন কোন স্থানে ইহার অল্প পরিমাণ আবাদ আমরা দেখিয়াছি। পূর্ব্বে ঢাকা জেলাতে ইহার যথেষ্ট আবাদ হইত। বিহার অঞ্চলের মজঃফরপুরে ইহার যথেষ্ট আবাদ দেখা যায়; কিন্তু পূর্ব্বে ইহার আবাদ যে পরিমাণ হইত, এখন তাহার দশভাগের একভাগ জমীতেও তাহা দেখা যায় না।

কুসুমফুলের গাছ দুই জাতীয়। একপ্রকার গাছে কাঁটা আছে তাহাকে বিহার অঞ্চলে কুঠি বলে, আর মুন্দি নামে এক জাতীয় গাছ আছে তাহাতে কাঁটা নাই। সাধারণতঃ আলু, সরিষা, অহিফেন, যব, গম, তিষি ও ছোলার সহিত কুসুমফুলের আবাদ করা হইয়া থাকে। ইহা সকল রকম মাটিতেই জন্মিয়া থাকে, তবে বেলে মাটিতে বা দোয়াঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।

কুসুমফুলের চাষে সার দিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, তবে অহিফেন বা গোধূম সহিত বপন করিলে শেষোক্ত ফসলের জন্য গোময় সার দিতে হয়। যদি অন্য কোন ফসলের সহিত কুসুমফুল বপন করা না হয়, তাহা হইলে, বিঘা প্রতি ৩॥ সের বীজ ছড়াইলে যথেষ্ট হয়, কিন্তু অন্য ফসলের সহিত বপন করিলে বিঘা করা দুই সের বীজ বপন করা যাইতে পারে। ইহা সচরাচর কার্ত্তিক মাসেই বপন করা হয়। ইহার গাছ এক হাত অন্তর বসাইলেই ভাল হয়, এই জন্য ঘন জন্মিলে গাছ উপাড়িয়া দেওয়া হয়। গাছ একটু বড় হইলে উহার ডাল ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে গাছগুলি বেশ ঝাঁকড়াল হয়। গাছে কুঁড়ি ধরিবার পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইলে বড় ভাল হয়, কিন্তু অতিবৃষ্টি হইলে ফুল নষ্ট হইয়া যায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে গাছে লাহি নামক একপ্রকার পোকা ধরে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

সচরাচর মাঘ মাসের শেষ ভাগে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে কুসুমফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে যদি একটু পশ্চিমে বাতাস বয়, তাহা হইলে ফুলের রঙ্গ ভাল হয়। ফুল তুলিবার উপযুক্ত হইলে, স্ত্রীলোক বা বালক বালিকারা ছোট ছোট টুকরি করিয়া এই ফুল তুলিয়া থাকে। অবশ্য ক্ষেত্র বড় হইলে ফুল তুলিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে হয়। এই সকল লোক ১৬টি ফুল তুলিলে একটি ফুল পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। কখন কখন ধান বা ভুট্টা পারিশ্রমিক স্বরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। শস্যে পারিশ্রমিক দিতে হইলে যে পরিমাণ ওজনের ফুল তুলে, তাহার অর্দ্ধেক শস্য পায়। অর্থাৎ পাঁচ সের শস্য তুলিলে আড়াই সের ধান বা ভুট্টা দেওয়া হয়। এই ফুল প্রাতঃকালেই তোলা হয় এবং দিনের বেলায় ছায়াযুক্ত স্থানে উহাকে শুকান হয়। সন্ধ্যা কালে ফুলগুলি সামান্যরূপ রগড়াইয়া গুঁড়া করিয়া খাটিয়ার উপর শুকাইতে দেওয়া হয়; এইরূপ গুঁড়া না করিলে, ফুলগুলি জড়াইয়া ডেলা পাকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তিন বিঘা জমীতে যদি কেবলমাত্র কুসুমফুলের আবাদ করা হয় তাহা হইলে এইরূপ ব্যয় হইয়া থাকে :—

তিন বিঘা জমীর খাজনা	১২৲
রোডসেস ইত্যাদি	৸০
দুইবার লাঙ্গল দিবার খরচা	৩৸০

দশ সের বীজ	১।০
ভূমি খনন	১৲
	১৮৮০

তিন বিঘা জমীতে প্রায় এক মণ ফুল হয় ও সাড়ে ধাঁর মণ বীজ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে ফুল টাকায় দুই সের দরে বিক্রয় হইত কিন্তু বিলাতী রঙ্গের চলন হওয়াতে টাকায় ছয় সের করিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে এখনও কুসুম ফুলের আবাদে বেশ লাভ আছে।

পূর্ব্বে ঢাকা জেলাতে যথেষ্ট কুসুম ফুলের আবাদ হইত। পুরাতন একটি হিসাবে প্রকাশ যে ১৮২৪।২৫ সালে কলিকাতার পবমিট হইতে যে ৮৪৪৮ মণ কুসুম ফুল রপ্তানি হইয়াছিল, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ ঢাকার নিকটে উৎপন্ন হইয়াছিল। সে সময়ে এই ৮৪৪৮ মণ কুসুম ফুলের মূল্য ২,৯০,৬৫৫ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। এখন ঢাকাতে এ আবাদ নাই বলিলেই হয়। নবাবগঞ্জ থানার এলাকায় কিছু কিছু চাষ হইয়া থাকে। শুনা যায় পূর্ব্বে পাথরঘাটার কুসুম ফুল হইতে উৎকৃষ্ট রঙ্গ প্রস্তুত হইত।

বাঙ্গালা দেশে অতি সহজ প্রণালীতে কুসুম ফুলের রঙ্গ প্রস্তুত করা হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ফুলগুলি ছায়াযুক্ত স্থানে শুকান হইয়া থাকে, কেন না রৌদ্রে দিলে রঙ্গ নষ্ট হইয়া যায়। ফুল শুকান হইলে উহা কলসীতে পুরিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, অধিক ফুল হইলে একটি ক্ষুদ্র চোরকুটরীর মত ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর রাখিয়া দেওয়া যায়। যথাসময়ে ফুলগুলিকে বাহির করিয়া একটি উখড়ি বা উদুখলে ঢালিয়া উহা চূর্ণ করা হয়। যখন উহা উপযুক্তরূপে চূর্ণ হয়, তখন চারিধারে চারিটি খোঁটা পুতিয়া তাহাতে একখানি কাপড় ঝুলাইয়া বাঁধা হয়। ফুলগুলি সেই কাপড়ে ঢালিয়া দিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ফুলে যে পীত রং থাকে তাহা ধুইয়া ফেলিবার জন্য এইরূপ করা হইয়া থাকে। তাহার পর সেগুলিকে রগড়াইয়া গোল গোল ফেনি বার্ত্তাসার আকারে পাকান হয় এবং রেড়ীর পাতার উপর রাখিয়া আর একটি পাতা চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। পরদিন ঢাকা খুলিয়া মাদুর বা চেটাইয়ের উপর বিছাইয়া শুকাইতে দেওয়া হয় ও উপযুক্তরূপ শুকাইলে উহা বিক্রয় করা হয়। যদি ফুলের পরিমাণ অধিক হয় তাহা হইলে চূর্ণ করিবার সময় কলাগাছের ক্ষার বা সাজিমাটি মিশান হয়। এক সের ফুলে দুই ছটাক পরিমাণ মিশাইলেই যথেষ্ট হয়। মাটি সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে কাপড়ে ছাঁকা হইয়া থাকে। যে ফুলগুলা একবারমাত্র জল ঢালিয়া ছাঁকা হয় তাহাতে ঘোর লাল রং হইয়া থাকে, দ্বিতীয়বার ছাঁকিলে তদপেক্ষা ফিকা রং হয়, তৃতীয়বার ছাঁকিলে আরও ফিকা হয়। একরূপ ছাঁকিবার সময় তেঁতুল, লেবু, আম বা দধির মত অম্ল সামগ্রী মিশান হইয়া থাকে। এক সেরে চারি ছটাক পরিমাণ অম্ল দেওয়া হয়। কুসুমফুল হইতে নানা প্রকার রং উৎপন্ন হয় যথা:—(১) লাল বা এক রঙ্গা (২) গোলাপী (৩) বেগুনি (৪) বাদামী (৫) নওরঙ্গী বা কমলালেবুর রং (৬) চাঁপাফুলের রং ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন রঙ্গে রঞ্জিত করিতে হইলে অন্যবিধ রং উহার সহিত মিশাইতে হয়।

বিহার অঞ্চলে বিবাহাদি শুভকার্য্যে কুসুম ফুলে রঞ্জিত বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জন্য উক্ত প্রদেশে যে সময়ে বিবাহাদি হয় সে সময় বস্ত্ররঞ্জকেরা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া থাকে। মুঙ্গের এইরূপ বস্ত্রাদি রং করিবার প্রধান স্থান।

কুসুমফুলের বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই তৈল অনেক স্থানে দীপ জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। বিহার ও উত্তর পশ্চিমে কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য যে এক প্রকার চামড়ার ডোল ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাতে কুসুম বীজের তৈল মাখান হয়; এরূপ করিলে মূষিক বা বাঁটে উহা নষ্ট করিতে পারে না। সরিষা তিসি তিল প্রভৃতি বীজ হইতে যেরূপে তৈল বাহির করা হয় কুসুমবীজ হইতেও সচরাচর সেই প্রণালীতে তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। কিন্তু কোথাও কোথাও আর এক প্রথায় তৈল বাহির করা হয়। একটি কলসীর উপর ৬ ইঞ্চি পুরু করিয়া মাটি লেপিয়া দেওয়া হয়, তাহার পর কলসীতে বীজ রাখা হয় ও কলসীটি তুন্দুরের উপর বসান হয়। তাহার পর

কলসীর মুখটীতে অশক্ত ঘুঁটে চাপাইয়া বন্ধ করা হয়। বলা বাহুল্য কলসীর তলায় একটী ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্র দিয়া একটু একটু তৈল চুয়াইয়া তন্দুরের মধ্যস্থিত আর একটী পাত্রে পড়িতে থাকে।

তৈল বাহির করিবার আর একটী প্রথা এইরূপ। গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে একটী পাত্র রাখা হয়। তাহার পর একটি কলসীর ভিতর বীজ পুরিয়া তাহার মুখে একখানি খুরি কাদা লেপিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। ঐ খুরিখানির মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র থাকে। তাহার পর কলসীটী উপুড় করিয়া গর্ত্তের মধ্যস্থ পাত্রের উপর রাখা হয় এবং কলসীর উলটান তলায় ঘুঁটের আবরা দেওয়া হয়। কলসীটী পূর্ণ থাকিলে অল্পক্ষণ পরেই তৈল চুয়াইয়া পড়ে। এই প্রথায় বীজ হইতে অধিক তৈল বাহির হয়; প্রায় দুই সের বীজে দশ ছটাক তৈল পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যবিধ প্রণালীতে সাত আট ছটাকের অধিক তৈল বাহির হয় না।

ডুমরাঁও অঞ্চলের লোক বলে যে কুসুম-বীজের তৈলে খোস পাচড়া সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। এই তৈল তিন চারি বার লাগাইলেই, যেমন কোন খোস হউক না কেন শুকাইয়া যায়। পোড়া তৈলে বাত ও অনেক প্রকার ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহাতে গবাদি পশুদিগের ক্ষত আরোগ্য হইতে শুনা গিয়াছে। কোন কোন স্থানে রন্ধনেতেও কুসুমবীজের তৈল ব্যবহৃত হয়।

কুসুমফুলের গাছ যখন কচি থাকে, তখন উহার ডগা অনেক স্থলে রন্ধন করিয়া খায়। অনেক দরিদ্র লোক বীজমধ্যস্থ শ্বেত পদার্থটী চূর্ণ করিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে অনেক সময়ে অজীর্ণ রোগ আনয়ন করে। বর্দ্ধমান অঞ্চলে মুড়ি প্রভৃতির সহিত কুসুমবীজ মিলাইয়া খাইয়া থাকে। কুসুমবীজ ভাজা খাইতে বেশ সুস্বাদু। উহা দেখিতে ধানের গড়গড়ির মত।

পূর্ব্বে বৎসরে প্রায় ছয় সাত লক্ষ টাকার কুসুমফুল বিদেশে রপ্তানি হইত, এখন লক্ষ টাকা মূল্যেরও ফুল রপ্তানি হয় না। ১৮৭৮।৭৯ সালে ৪৭৭৭ হন্দর কুসুমবীজ সমগ্র ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, ইহার মূল্য ১,৮৬,৭৭১ টাকা, কিন্তু গত বর্ষে ৪৩১৩ হন্দর রপ্তানি হইয়াছিল, ইহার অধিকাংশ বঙ্গদেশ হইতেই প্রেরিত হইয়াছিল। এই ফুলের মূল্য ৬৭,৫০৬ টাকা। এখন চীনদেশেই প্রায় সমস্ত ফুল রপ্তানি হয়, অতি অল্প পরিমাণ জাপান ও ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

১৮৯৫ সালে বোম্বাইপ্রদেশে যত তৈল বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কুসুমবীজ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯০২।৩ সালে তথায় ইহার আবাদ অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে রঙ্গের জন্য কুসুমফুলের চাহিদা (Demand) না থাকিলেও, তৈলের জন্য ইহার আবাদ চলিবে। পঞ্জাবপ্রদেশে ঘৃতের সহিত কুসুম বীজের তৈল ভেঁজাল দেয় বলিয়া তথায় উহা যথেষ্ট বিক্রয় হইয়া থাকে। তথায় অনেক দরিদ্র লোক ঘৃতের পরিবর্ত্তে কুসুম বীজের তৈলে লুচি ভাজিয়া খায়।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

পিপুল।

পিপুল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কলিকাতার বাজারে উহা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এমন কি সময়ে সময়ে ১০০ টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। অত্যন্ত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইলেও ৪০ টাকার কম কখন বিক্রয় হয় না। রীতিমত বাগান করিয়া চাষ করিতে পারিলে প্রতি বিঘায় ৫/ মণ শুষ্ক পিপুল প্রস্তুত হইতে পারে। অন্ততঃ ৪০ টাকা করিয়া মণ বিক্রয় করিলেও এক বিঘার পিপুল হইতে বার্ষিক অন্যূন ২০০ টাকা আয় হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে কৃষকগণ পিপুলের চাষ করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

সচরাচর তিন জাতীয় পিপুল দেখিতে পাওয়া যায়। গজপিপুল, ঘোড়াপিপুল, ও সাচিপিপুল। গজপিপুল পাহাড়ের জঙ্গলে জন্মে। ইহার লতা খুব মোটা হয় এবং বড় বড় গাছ বহিয়া উঠে, কেহ ইহার আবাদ করে না। গজপিপুলের লতার সহিত ঘোড়াপিপুলের বা সাচিপিপুলের লতার

কোন সাদৃশ্য নাই। ঝোড়া ও সাচিপিপুলের লতার কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু উহাদের ফল বিভিন্ন জাতীয়। ঝোড়াপিপুলের আকৃতি ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা এবং দেখিতে পাটলবর্ণ। ইহার ফল জন্মিবার কিছুদিন পরে, লতা হইতে ঝরিয়া যায় অথবা পচিয়া যায়; সুতরাং উহা আমাদের কোন কাজে আসে না। সাচিপিপুল বড় হইলেও দুই ইঞ্চির অধিক লম্বা হয় না। ইহার ফল প্রথমাবস্থায় ধূসরবর্ণের হইয়া ক্রমশঃ হরিৎ বর্ণে পরিণত হয় এবং শুষ্ক হইলেও গাঢ় হরিৎ বর্ণ দেখা যায়। এই প্রবন্ধে সাচিপিপুলের চাষের বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম চাষ করিবার পূর্ব্বে যে স্থানে অধিক পরিমাণে পিপুলের লতা আছে, তাহার ফল দেখিয়া সাচিপিপুলের লতা চিনিয়া রাখিতে হয় (আষাঢ় মাসে ফল ধরে এবং পৌষ মাসে ফল পাকে)। তাহার পর জমী প্রস্তুত হইলে ঐ সমস্ত লতা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে রোপণ করিতে হয়। প্রথমেই ধান্যাদির মত বিস্তৃতরূপে চাষ করা যাইতে পারে না। কারণ ইহার বীজ হইতে গাছ (লতা) জন্মে না। লতা সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। লতাও একস্থানে অধিক পরিমাণে পাওয়া সুকঠিন; সুতরাং ক্রমশঃ ইহার আবাদ বৃদ্ধি করিতে হয়। একবার ক্ষেত্রে ইহার গাছ জন্মাইতে পারিলে পরে উহার জন্য আর অন্য কোন স্থানে খোঁজ করিতে হয় না। সেই লতার দ্বারাই অন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়।

পিপুলের ক্ষেত্রকে "পিপুলের বাগান" বলে। এস্থলে আমরাও "বাগান" বলিয়া উল্লেখ করিব। যে স্থানে পিপুল-বাগান করিতে হইবে, তাহার মাটী দো-আঁশ হওয়া আবশ্যক। বাগানের জমী উচ্চ হওয়া উচিত এবং সেই জমীতে যাহাতে বৃষ্টির জল আটকাইতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। পিপুল-বাগান করিবার পূর্ব্বে তাহার চারি পাশে ১ কি ১॥০ ফুট গভীর নালা কাটিয়া জমী চিহ্নিত করিয়া লইতে হইবে এবং তাহার উপর বেশ করিয়া এরণ্ড কিম্বা চিতা গাছের বেড়া দিতে হইবে। সেই জমীতে যাহাতে গরু বাছুর প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার উপায় করা নিতান্ত কর্তব্য। তৎপরে পৌষ মাস হইতে লতা রোপণের পূর্ব্ব মাস পর্য্যন্ত, মাসের মধ্যে তিন চারিবার লাঙ্গল দিয়া ঐ জমী উত্তমরূপে চষিতে হয়। বাগানের জমী ন্যূনকল্পে ১৫।১৬ অঙ্গুলি খনিত হওয়া আবশ্যক। পিপুলের জমীতে অত্যল্প পরিমাণে গোবরের সার দেওয়াও এক-প্রকার মন্দ ব্যবস্থা নয়। অগ্রহায়ণ কিম্বা পৌষ মাসের মধ্যে এইরূপে বাগান প্রস্তুত করিতে হয়। এই সময়েই নালার ধারে ধারে বেড়া দেওয়া উচিত।

পিপুল লতার সহিত "ধঞ্চে" গাছের "প্রণয়" বড়ই বেশী। ধঞ্চে গাছের শীতল ছায়ায় পিপুল লতা বেশ সতেজে জন্মিয়া থাকে এবং ঐ সমস্ত গাছ আশ্রয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফলোৎপাদন করে। অতএব পিপুল চাষ করিবার পূর্ব্বে বাগানের মধ্যে মধ্যে ৫ হাত অন্তর একটি একটি করিয়া "ধঞ্চে" গাছ লাগান আবশ্যক। জমী প্রস্তুত হইলে ফাল্গুন মাসের প্রথমে ঐ জমীতে দীর্ঘ প্রস্থ সমানে চার হাত অন্তর ছোট ছোট "থানা" করিয়া তাহার মধ্যে ৩।৪টি করিয়া ধঞ্চের বীজ পুতিয়া দিয়া তাহার উপর প্রত্যহ অল্প অল্প জল দিলে আপনি আপনাই চারা জন্মে। ঐ চারা-গুলি ৮।১০ অঙ্গুলি বড় হইলে অপেক্ষাকৃত সতেজ একটীমাত্র চারা রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। পরে চৈত্র মাসের শেষে পিপুলের লতা সংগ্রহ করিয়া বৈশাখের প্রথমেই সেই সমস্ত লতাগুলিকে ১৫।১৬ অঙ্গুলি পরিমিত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহার ৫।৬ গাছি লতা একত্র করতঃ "আঁটী" বাঁধিতে হয়। এইরূপ "আঁটী" বাঁধিবার সময় লতাস্থ গাঁইটগুলি যাহাতে উল্টা-পাল্টা না হইয়া যায় এবং বিপরীত ভাবে রোপিত না হয় এরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পরে সেই সমস্ত "আঁটী" গুলির গোড়ায় গোবরমাত্র মাখা-ইয়া ঐ ধঞ্চে গাছের ফাঁকে ফাঁকে একহাত অন্তর দীর্ঘ প্রস্থ সমানে সার করিয়া ৪।৫ অঙ্গুলি মাটীর নীচে খাড়াভাবে পুতিতে হয়। আঁটী-গুলি পুতিবার পর বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তাহার গোড়ায় কিছু কিছু জল দেওয়া কর্তব্য। কৃষকেরা সাধারণতঃ এই প্রণালী অনুসারে পিপুলের চাষ করিয়া থাকে কিন্তু

অন্তরপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং সুপ্রণালীসিদ্ধ পিপুল চাষের প্রণালী পরে বর্ণিত হইবে।

লতা সংগ্রহ হইলে সেইগুলি কিছুদিন একস্থানে "জমা" করিয়া রাখিয়া, পরে তাহা হইতে বোঁটা-শুদ্ধ পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় এবং তদ্দ্বারা ৯।১০ অঙ্গুলি পরিমিত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর এক হাত ব্যবধানে কিছু কিছু মাটী খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ঐ একটি একটি "খণ্ড" এবং খণ্ডীকৃত ৩।৪ গাছি লতা দুই আঙ্গুল মাটীর নীচে পুঁতিয়া দিতে হয়। ঐ সকল "খণ্ডে" প্রত্যেক লতায় ৫।৬টী করিয়া গাঁইট থাকা আবশ্যক। এইরূপে লতা পুঁতিলে কিছুদিন পরে উহা হইতে সতেজে লতা পিপুলের চারা জন্মে। চারাগুলি কিছু বড় হইলে পর বাগানের সমুদায় জমী অল্প অল্প খুঁড়িয়া দিতে হয় এবং ইহার পর জমীতে ঘাস জন্মিলে নিড়াইয়া দিতে হয়, অন্য কোন যত্নের আবশ্যক করে না। চারাগুলি বড় হইয়া ক্রমে ক্রমে "ধঞ্চে" গাছ বাড়িয়া উঠে এবং আষাঢ় মাসের শেষ হইতে ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফল প্রদান করে।

এই সময় লতাগুলির মধ্যে মধ্যে "জাফরী" প্রস্তুত করিয়া দিলে তাহা ঐ "জাফরীর" গা বাহিয়া উঠিয়া অধিক পরিমাণে ফলদান করিতে পারে। লতা বেশী ঘন হইলে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ লতাগুলি কাটিয়া ফেলিয়া তাহা পাতলা করিয়া দিতে হয়।

"ধঞ্চের" গাছগুলি ৩।৪ মাসের হইলে বাগানে ছায়াদানের উপযুক্ত হয়। আবার ওদিকে পিপুলের লতা বাড়িয়া উঠিয়া সেই সমস্ত গাছ আশ্রয় করে। এই জন্য পিপুল চাষে প্রথম বৎসর কিছুমাত্র লাভ হয় না। কেবল খরচ করাই সার হয়। কারণ বৈশাখ মাসে লতা পুঁতিয়া তাহা হইতে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ফল প্রাপ্তির আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। প্রথম বৎসর ধঞ্চেগাছ ও পিপুলের লতা বড় হইতেই ৪।৫ মাস সময় লাগে, সুতরাং লতা হইতে ফল জন্মিবার উপযুক্ত সময় অতীত হইয়া যায়। দ্বিতীয় বৎসর হইতে, পিপুল চাষে লাভ আরম্ভ হয়। যত্ন করিয়া রাখিলে ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত, পিপুলের বাগান রাখা যাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যে লতা পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। ফল তুলিবার পর লতাগুলির গোড়া কাটিয়া দিলে সেই গোড়া হইতে আপনা হইতেই নূতন লতা গজাইয়া উঠে। ক্রমে বাগানের "ধঞ্চে" গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া গেলে নূতন গাছ লাগাইয়া পুরাতন গাছগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। ধঞ্চে গাছ "বুড়া" হইয়া গেলে তাহাতে বাগানের ছায়াদানের উপযুক্ত পাতা জন্মে না।

আষাঢ় মাস হইতে লতায় পিপুল ধরে এবং পাকিতে আরম্ভ হয়। একসঙ্গে সমস্ত পিপুল পরিপক্ক হয় না, অগ্রপশ্চাৎ হইয়া পাকিতে থাকে। অতএব একদিনে অথবা এক সময়ে সমস্ত পিপুল উঠাইতে হয় না, ক্রমশঃ তুলিতে হয়। পিপুল তুলিবার সময় টান লাগিয়া লতাগুলি যাহাতে ছিঁড়িয়া না যায় তদ্বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। পিপুল পাকিতে আরম্ভ হইলে, তাহার মধ্য হইতে সুপক্ক পিপুলগুলি তুলিয়া রৌদ্রের উত্তাপে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। ১০।১২ দিন সমানে রৌদ্র পাইলেই পিপুল শুকাইয়া যায়। অপক্ক পিপুল তুলিয়া শুষ্ক করিলে তাহা চিম্‌সে হইয়া যায় এবং পিপুলের দানা না বাঁধিলে অত্যন্ত অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়।

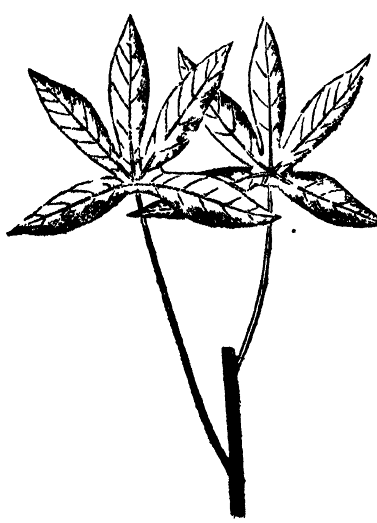
পিপুল উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া তাহা কুলাদ্বারা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করতঃ বিক্রয়ার্থ বস্তাবন্দী করিয়া রাখিতে হয়; সুবিধা মত দর পাইলে তখন তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত।

শ্রীবসন্তকুমার সেন।

কাসাভা বা শিমুল আলু ও টেপিওকা।

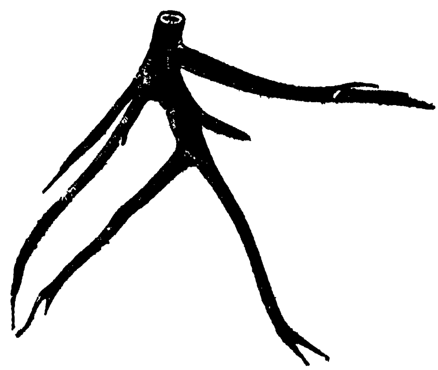
টেপিওকা কি তাহা বোধ হয় আমাদিগের অনেক পাঠকই অবগত নহেন। ইহা দেখিতে ঠিক সাগুদানার ছোট ছোট পিণ্ড। যেন সাগুদানা চটকাইয়া তাহার এক একটি বাড়ি করিয়া শুকান হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক উহা তাহা নহে। উহা কাসাভা নামক একপ্রকার উদ্ভিজ্জের মূল হইতে প্রস্তুত হয়। এই কাসাভার মূলকে এ দেশের অনেকে শিমুল আলু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কাসাভার পাতা দেখিতে শিমুল-পাতার ন্যায় এজন্য ইহার নাম শিমুল আলু। টেপিওকা য়ুরোপীয়দিগের একটি বিশেষ আহার সামগ্রী। এইজন্য ইহা যথেষ্ট পরিমাণে এ দেশে আমদানী হইয়া থাকে।

১ম চিত্র। কাসাভার পত্র।



এক্ষণে এ দেশের অনেক স্থলে কাসাভার চাষ হইতেছে, কিন্তু আমেরিকাই ইহার জন্মস্থান। ইহার গাছগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এবং কতকটা এরণ্ড গাছের সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়; কিন্তু এরণ্ড গাছ যেরূপ পলকা কাসাভা সেরূপ নহে। ইহার ডাঁটি বেশ শক্ত। পাতাগুলি চৌড়া এবং সাত কিম্বা আট অঙ্গুলে বিভক্ত। ইহার শিকড় অনেকটা চুবড়ী আলু বা খাম আলুর মত। শিকড়গুলি স্ফীত ও তাহার উপরের ছাল কখন লালের আভাযুক্ত কটা কখন বা কাল।

২য় চিত্র। কাসাভার মূল।



ছাল ছাড়াইলে ভিতরের শাঁসটা সাদা দেখায়; কিন্তু কোন কোন শিকড়ের শাঁস পীতবর্ণও দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাঁস ষ্টার্চে (Starch) পরিপূর্ণ। উহা ধুইয়া শুকাইলে আহারোপযোগী হয়। এই কাসাভা নানা জাতীয় আছে। তন্মধ্যে যাহাকে উদ্ভিদতত্ত্ববিৎগণ—Manihut utilissioma বলেন, তাহাই এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় কাসাভার মধ্যে কতকগুলির মূল সচ্ছন্দে খাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলির মূল যারপরনাই বিষাক্ত। পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সর্ব্বপ্রকার কাসাভার মূলেই প্রুসিক বা হাইড্রোসিয়ানিক (Prussic or Hydrocyanic) এসিড্ বিদ্যমান্ আছে; তবে যে সকল মূল মিষ্ট তাহাতে এই বিষাক্ত এসিডের পরিমাণ অল্প, আর যেগুলি তিক্ত তাহাতে ইহার পরিমাণ অধিক এবং সেই জন্য উহা খাইলে শারীরিক অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। সৌভাগ্যবশতঃ ঐ মূল শুষ্ক করিলে বা জ্বাল করিয়া ধুইলে ঐ বিষাক্ত এসিড় দূর হয় এবং লোকে সচ্ছন্দে উহা হইতে উপাদেয় আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া লয়।

অনেকে অনুমান করেন যে পর্ত্তুগীজেরাই প্রথমে এদেশে কাসাভা আনিয়াছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশে পর্ত্তুগীজদিগের একটি উপনিবেশ ছিল। তাঁহারা আফ্রিকা হইতে

ব্রেজিলে দাস বিক্রয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহারা ব্রেজিল হইতে মাঠ কলাই ও কাসাভা আমদানী করেন ও ক্রমে উহা ভারতের, তাঁহাদিগের অধিকৃত, গোয়ায় লইয়া আসেন। এই গোয়া হইতেই ভারতের সর্ব্বত্র কাসাভার চাষ প্রচারিত হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মরীচ দ্বীপ হইতে কতকগুলি নূতন কাসাভার গাছ সিংহলে নীত হইয়াছিল। আবার ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আর এক দফা কতকগুলি গাছ কলিকাতায় ও শ্রীরামপুরে আনয়ন করা হইয়াছিল। তাহার পর পুনরায় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপ হইতে কতকগুলি গাছ কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছিল। এক্ষণে বাঙ্গালা, আসাম, উত্তর-প্রদেশ হইতে পশ্চিম পূর্ব্ব উপকূলে কুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ও পশ্চিম উপকূলে গোয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বহু ক্ষেত্রে ও উদ্যানে কাসাভার চাষ হইতেছে। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশে চীনাবাও ইহার আবাদ করিয়া থাকেন। এই সকল বিভিন্ন স্থানের কাসাভার গাছ ও মূলের অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায়, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রায় সুতের রকমের কাসাভা গাছ জন্মিয়া থাকে। মহীসুরেও দুই রকমের কাসাভা আছে। এই দুই জাতীয়ের মধ্যে আবার এক-স্থানের মূল অন্য স্থানের মূল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাসাভার চাষ যাহাতে বিস্তৃত হয় আজ কাল গবর্মেণ্টকে সেদিকে কতকটা মনোযোগী দেখা যাইতেছে। আমাদিগের দেশের কৃষকেরা চিরদিন যে সকল শস্যের আবাদ করিয়া আসিতেছে তাহা ছাড়িয়া তাহারা সহজে নূতন কিছু করিতে অগ্রসর হয় না। ইহা আমাদিগের দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির একটি অন্তরায়। নূতন ফসল আবাদ করিলে যে লাভবান্ হওয়া যাইতে পারে তাহা পাটের দৃষ্টান্তের দ্বারাই বুঝা যাইবে। পূর্ব্বে এদেশে অতি অল্প পরিমাণই পাটের আবাদ হইত কিন্তু এই ফসল এক্ষণে এরূপ লাভজনক দাঁড়াইয়াছে যে অনেকে অতি অল্প মাত্র ধান চাষ করিয়া অধিকাংশ ভূমি পাটের চাষেই নিয়োগ করিয়া থাকে। কালে কাসাভার চাষও যে বিশেষ লাভজনক হইবে এক্ষণে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই জন্যই সম্প্রতি Agricultural Ledger নামক সরকারী কৃষি-বিষয়ক পত্রিকায় ইহার আবাদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা কাসাভার গাছ ও মূলের প্রতিকৃতি এস্থলে প্রকাশ করিলাম। ইহার চাষ অন্যান্য ফসলের চাষ অপেক্ষা বেশ সুবিধা-জনক। ধানের আবাদের জন্য যে পরিমাণ বৃষ্টির প্রয়োজন, তাহার সিকি পরিমাণ বৃষ্টিতে কাসাভার চাষ স্বচ্ছন্দে হইতে পারে। আবার যদি একাদিক্রমে ছয় মাস বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে কাসাভার গাছ নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে অতি বৃষ্টিতেও ইহা বিনষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই। সচরাচর বসন্তকালেই কাসাভা রোপণ করা হইয়া থাকে এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে মাটী খুঁড়িয়া উহার মূল বাহির করা হয়। এই মূল ফালা ফালা করিয়া চিরিয়া, জলে সিদ্ধ করিয়া ও পরে রৌদ্রে শুকাইয়া ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে ইহা কাঁচাই বিক্রয় হয়। ইহাকে বাঙ্গালায় প্রায় শিমুল আলুই বলে কিন্তু অন্যান্যস্থলে রুটী আলু, গাছ ময়দা, গাছ আলু, জাহাজী আলু, মিষ্ট আলু ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

এদেশে কৃষকেরা কাসাভার যে চাষ করিয়া থাকে তাহা প্রধানতঃ তাহাদিগের নিজের ব্যবহারের জন্যই করে, অতি অল্প পরিমাণই বিক্রয়ের জন্য উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইহার যেরূপ প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এদেশে ইহার চাষ যাহাতে লাভজনক হয়, সে পক্ষে চেষ্টা করা আমাদের বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। কাসাভা হইতে ব্রেজিল দেশে চারি প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হয়। একটীর নাম কুয়াক (Couac) (২) কাসাভা চূর্ণ, (৩) ব্রেজিল আরোরুট, (৪) টেপিওকা। কাসাভা চূর্ণ করিলে যে মোটা দানা বাহির হয় তাহারই নাম কুয়াক; আর যাহা ময়দার মত মিহি হয় তাহাকে কাসাভা চূর্ণ Cassava meal বলে। মূল ধুইয়া যে পরিষ্কার গুঁড়া বাহির হয় তাহাই ব্রেজিল আরোরুট এবং উহা অগ্নির উত্তাপে উহাই শুষ্ক করিলে টেপিওকা প্রস্তুত হয়। কাসাভা মূল ছাড়াইবার জন্য ব্রেজিল দেশে দুইপ্রকার প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে।

এক প্রকার প্রথা এই যে মূলের যে অংশটি খাইবার উপযুক্ত উহা একখানি তক্তার উপরে একটা হাতিয়ারের দ্বারা মাড়িয়া ফেলা হয়। মাড়া হইলে উহা একটা মাদুর বা একখানি কাপড়ের উপর চব্বিশ ঘণ্টা ছড়াইয়া রাখা হয়। এই অবস্থায় উহা গাঁজিয়া উঠে। পরে একটা থ'লের ভিতর পুরিয়া উহার রস নিংড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর একটি প্রথা এই যে মূলগুলি ছাড়াইয়া উহা কিছুদিন জলে ফেলিয়া রাখা হয়; তাহার পর মাড়িয়া ফেলা হয়। কুয়ার্ক প্রস্তুত করিতে হইলে, রস নিংড়াইবার জন্য থ'লের উপর যথেষ্ট চাপ দিতে হয়, তাহার পর দানাগুলি শুকাইয়া চূর্ণ করিতে হয়। টেপিওকা করিতে হইলে. গুঁড়াগুলি একত্রিত করিয়া শুষ্ক করা হয়। যখন উহা উপযুক্তরূপে শুষ্ক হয় তখন আগুনের আঁচে কটাহের উপর ফেলিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে উহা পরস্পরের গায়ে গায়ে লাগিয়া বাতি বা শাখার আকার ধারণ করে; তখন উহা বোতলে পুরিয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হয়। ব্রেজিল হইতে প্রায় ২৬ হাজার পাউণ্ড মূল্যের টেপিওকা য়ুরোপের রপ্তানি হইয়া থাকে এবং উহা তথায় যথেষ্ট উচ্চ দরে বিক্রয় হয়। মলক্কা সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে টেপিওকার ব্যবসায়ের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৬২ হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত এই নয় বৎসরে প্রায় ৩২৯০৮ হন্দর করিয়া গড়ে প্রতি বৎসর রপ্তানি হইয়াছে; ইহার মূল্য প্রায় ৪১,৪৫৩ পাউণ্ড। তাহার পর পাঁচ বৎসর কাল, বৎসরে ৭৩,০০০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের টেপিওকা রপ্তানি হইয়াছে। অতঃপর শুনিলে অবাক হইতে হয়! ১৯০৩ সালে, দানা টেপিওকা যাহাকে "Pearl Tapioca" বলে, তাহা প্রায় ৩১৬,৮০০ হন্দর রপ্তানি হইয়াছে। ডাক্তার জর্জ্জ আর্চিবল্ড বলেন, যে, কালে কাসাভার গুঁড়া (Cassava starch) ভুট্টার গুঁড়াকে (Maize or corn starch) পরাস্ত করিবে। এই সকল কারণেই আমরা আমাদিগের দেশবাসী-দিগকে কসাভার চাষের প্রতি মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। কেবল কাসাভার চাষ নহে, এ দেশে টেপিওকা প্রস্তুত করিতে পারিলে একটা অর্থাগমের পথ আবিষ্কৃত হইবে।

টেপিওকা তৈয়ার হইলে তাহার যে সমস্ত তলানি পড়িয়া থাকে তাহা গো মহিষাদি ও শূকর প্রভৃতিকে খাওয়াইবার জন্য, সিংহল, সিঙ্গাপুর, পেনাং প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় হয়। আবার কোন কোন স্থানে কাসাভার মূলও গো মহিষাদিকে খাওয়ান হয়। বহুকাল হইতে মরিচদ্বীপে এই উদ্দেশ্যেই ইহার চাষ করা হইত, কিন্তু ফ্লরিডা হল-বাহক পশুর জন্য ইহার চলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যুক্তরাজ্যে যত কাসাভার চাষ হয় শতকরা তাহার ৯৫ ভাগ পশুর আহারের জন্যই করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কাসাভা কাঁচা অবস্থায় এরূপ বিষাক্ত পদার্থে পূর্ণ থাকে যে তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এই জন্য কাঁচা অবস্থায় কোন কীট বা পশু কাসাভা মূল খায় না; ইহাতে চাষাদিগের বড় সুবিধা। পশু বা কীটের অত্যা-চারে গাছ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না; কিন্তু পরিপক্কাবস্থায় সেই বিষাক্ত পদার্থ হ্রাস পায় এবং উহা সিদ্ধ করিলে বা আগুনে ঝলসাইলে বিষাক্ত পদার্থ আদৌ থাকে না; ইহা, পশুদিগকে, গমের ভুসি, কাসাভা বীজ চূর্ণ এবং অন্যবিধ শস্যের সহিত, কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া খাইতে দেওয়া হয়। গোল আলু, রাঙ্গা আলু বা শালগম প্রভৃতি কন্দে যেরূপ জলীয় ভাগ আছে, কাসাভাতে সেরূপ নাই। যদি সিদ্ধ করিয়া পশুদিগকে খাইতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভাল করিয়া ধুইয়া কাটিয়া দিলে কোন আশঙ্কার কারণ থাকে না। অনেক স্থানে উহার পাতা লোকে শাকের মত রাঁধিয়া খায়।

কাসাভা-মূলের উপর যে ডগা বা ডাঁটাটি থাকে তাহাই চারি ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া জমীতে পুতিয়া দিলে গাছ জন্মে; কিন্তু যাহাতে এই ডাঁটাতে কোনরূপে শিশির বা হিম না লাগে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। এই জন্য খড় বা বিচালি জড়াইয়া পোতা ভাল—অর্থাৎ যে ভাগটা জমীর উপরে থাকিবে, সেই অংশটা খড় জড়াইয়া রাখিলে গাছ মরিবার আশঙ্কা থাকে না; কিন্তু যদি শিশির লাগিবার কোন ভয় না থাকে, তাহা হইলে ডাঁটাগুলি উল্লিখিতরূপে ছোট ছোট করিয়া পুতিলেই চলে। বেলে মাটি-তেই কাসাভা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। ডাঁটা

চারান হইলে প্রথম দুই মাস উহাতে কিছু কিছু জল দেওয়া আবশ্যক হয়। আবাদী জমী অপেক্ষা যে জমী বন জঙ্গল কাটিয়া সবে মাত্র পরিষ্কার করা হইয়াছে তাহাতে কাসাভা বসাইলে ফসল ভাল হয়। ইহার চাষ অধিক ব্যয়সাধ্য নহে। ১৮ বিঘা জমীতে ৩০।৪০ টাকা ব্যয় করিলে ৮০০।৯০০ মণ কাসাভা উৎপন্ন হয়। ইহা পৌষ, মাঘ মাস হইতে পোতা হয়, আর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ফসল তুলিবার উপযুক্ত হয়। যে ভূমিতে কাসাভা লাগান হয় তাহাতে ধান বা গম দেওয়া যাইতে পারে এবং ধান বা গম কাটার পর কাসাভা খুঁড়িয়া উঠান যাইতে পারে। কোন কোন স্থানে কাসাভার সহিত ভুট্টার আবাদও করা হয়। যে জমীতে কাসাভা বসান হয়, পর বৎসর সেই জমীতে ইক্ষু বসাইলে ফসল ভাল হয়।

কাসাভা-মূল যখন খুঁড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত হয়, তখন আলু প্রভৃতি ফসলের মত একেবারে উঠান উচিত নয়। যে পরিমাণ বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা বা ব্যবহারে আবশ্যক সেই পরিমাণ তোলা উচিত। তাহা না করিলে উহা হাওয়া লাগিয়া পচিয়া যায়। এমন কি বিশেষ সাবধান না হইলে দুই তিন দিনের মধ্যেই উহাতে কাল দাগ ধরে। মাদ্রাজের বাজারে যে সকল কাঁচা কাসাভা বিক্রয় হয় তাহা অনেক সময়ে পচিতে আরম্ভ হইয়াছে দেখা যায়; কিন্তু পণ্ডিচারীকাডালোরে যে সিদ্ধ করা মূল বিক্রয় হয় তাহা ততটা পচে না।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

কাপড় বুনিবার নূতন কল।

সাধারণ লোকের সহজে বস্ত্র বয়ন কার্য্য নির্ব্বাহ হেতু বস্ত্রের লম্বা টানা তৈয়ারী করিবার কারণ একটি হস্তচালিত ওয়ার্প মেশিন গবর্ণমেণ্ট হইতে পেটেণ্ট লইয়া প্রস্তুত করিয়াছি। কলটীর নাম Hand Power Warp Machine for Weaving All Sorts of Textures, অর্থাৎ সকল প্রকার কাপড় বুনিবার যন্ত্র।

এ কলটী তিন ভাগে বিভক্ত যথা—

১মটীর নাম	Winding Machine. অর্থাৎ সুতা জড়াইবার কল।
২য়টীর নাম	Dressing or Seasoning Machine. অর্থাৎ সুতা পাট করিবার কল।
৩য়টীর নাম	Sizing Machine. অর্থাৎ বহর ঠিক করিবার কল।

১মটি ওয়াইণ্ডিং মেসিন; অর্থাৎ ৩ হাত বহরে ৪ হাজার সংখ্যা, লম্বা ১ হইতে ২ হাজার গজ, এক একটী সুতা একত্রে কেহ কাহার সহিত না জড়ায় স্বাধীনভাবে পাশাপাশি রাখিয়া সারবন্দিরূপে ২টী লাটায়ে জড়ান যায় এরূপ কল।

২য়টী উক্ত সুতাগুলির টানা ২টী লাটাই হইতে খুলিয়া পুনর্ব্বার মাড়সিক্ত হইয়া টানাটানি দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া, ব্রসের দ্বারা ঝাড়াপোঁছা ভালরূপে পরিষ্কার ভাবে নির্ব্বাহ হইয়া পোক্তাই ভালরূপে যাহাতে হয় এরূপে ২টী সানার মধ্য দিয়া অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া অপর ২টী লাটায়ে জড়াইয়া রাখা যায়।

৩য়টী উক্ত তৈয়ারি টানায় সুতাগুলি লাটাই হইতে খুলিয়া বহর স্থির করিয়া প্রত্যেক ইঞ্চিতে যে পরিমাণ দিবার কল্পনা করা যায়, তাহা দিয়া আবশ্যক বহর মত কএটী বিলাতী মোটা কাগচের খোলের 'সেকসানে' প্রত্যেক ৭।৮ গজ লম্বার মধ্যে মধ্যে এক একটী সুতা কিম্বা কাগচের 'লিজ' দিয়া রাখা ও মাপ দেওয়া যায়।

এই ওয়ার্প মেশিন একটীতে ১০×২॥০ হাত ধুতি কিম্বা সাড়ি বস্ত্রের উপযোগী টানা ৪ ঘণ্টা কাল কার্য্য করিলে ৮৪ জোড়া বস্ত্রের ৮৪০ গজ হয়। ৮ ঘণ্টা কালে ১৬৮ জোড়া ১৬৮০ গজ হয়।

এখানে টানা তৈয়ারি করিয়া বস্ত্র বুনিলে কদাচ একজন লোক ২।৩ দিবসে ১ জোড়া কাপড় বুনিতে পারে। তৈয়ারি টানা পাইলে অনায়াসে তাহাতে ৪।৫ জোড়া নিত্য বুনিতে পারে। টানা প্রস্তুত করা বিষম কঠিন। একজন তাঁতির সমস্ত পরিবারবর্গ, ছেলে মেয়ে, একত্রে সমস্ত দিনে এক জোড়া বস্ত্রের টানা প্রস্তুত করিতে পারে কি না তাহা সন্দেহ। Agricultural Society's Report এ প্রকাশ, প্রত্যেক ১০ হাতি ধুতির এক জোড়া টানার খরচা বোম্বাইয়ের কেলকার মহাশয়ের হিসাবে ॥০ আনা, চন্দননগর শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামের দর ॥৴০। বিলাতি হস্তচালিত কলের দ্বারা এক এক তাঁতের জন্য এক এক সেট কলের মূল্য ৭৫০ হইতে ১০০০ টাকা। তাহা এখানে কে আনাইয়া উন্নতি করিবে? এই উপরোক্ত ছোট ১২টী + ৬টী = ১৮টী লাটাই যুক্ত এক একটী টানার কল অন্তত ৮৪ জোড়া ১০×২॥ হাতি বস্ত্রের টানা নিত্য ৪ ঘণ্টা কার্য্যকরিলে হইতে পারে। চারি জোড়ার হিসাবে নিত্য এক একখানি তাঁতে যদ্যপি বস্ত্র বুনিতে পারা যায় তবে ২০।২১খানি তাঁতের কার্য্য এই একটী টানার কলে চলিতে পারে। কিম্বা ৮ ঘণ্টা কাল নিত্য কার্য্য করিতে পারিলে ১৬৮ জোড়া ১০×২॥০ হাত বস্ত্রের টানা তৈয়ার হইতে পারে। ইহাতে ৪২ খানি তাঁত চালান যায়। এক একটী পল্লীতে মধ্যবিত্ত লোক ২।৪ জন মিলিয়া ৫।৬ হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ দ্বারা এক একটী ওয়াপ মেশিন ও ২১ খানি তাঁত লইয়া চালাইলে নিত্য নিম্ন খরচা বাদ ৩০ হইতে ৪০ টাকা লাভ হয়।

নিত্য খরচ—	
তাঁতি ২৭ জন	১৩॥০
মুটে ৩ জনা	১৲
মোট	১৪॥০
বাজে খরচ	॥০
মোট	১৫৲

আমাদনি - বস্ত্র ৮৪ জোড়া ৸০ হিঃ ৬৩৲ অর্থাৎ লভ্য কেবল মজুরি ও সূতার মূল্য বাদ, বস্ত্র ৮৪ জোড়া মূল্য ॥৴০ হিঃ ৫২॥০

বিলাতি তাঁত এক একখানিতে ৩০ হইতে ৩৬ ইঞ্চি চওড়া বস্ত্র মাত্র বুনন হয়, তাহার মূল্য ২৭৫+৭৫=৩৫০৲ টাকা; সে সকল তাঁতে ২॥০ হাত

বহরের বস্ত্র বোনা যায় না। আড়াই ফুট চওড়া হইতে পারে।

এখানকার দেশী তাঁতের কিয়দংশ উন্নতি করিলে ৫৪ ইঞ্চি চওড়া, মানুষের দ্বারা চালিত হইবে এরূপ কলের মূল্য ১০০৲ টাকা আন্দাজ হইতে পারে ১৫০৲ হইলেও হানি নাই।

এই তাঁতে ২০ হইতে ১২০ কাউণ্ট সূতা পর্য্যন্ত বুনা যাইবে। বিলাত হইতে কয়েকটী জিনিস আসা অপেক্ষায় কলটী অসম্পূর্ণ আছে। ২।৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে এরূপ আশা করা যায়।

আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া কলটী কিয়দংশ স্থানাভাবে আমার বাস-গৃহ মধ্যে স্থাপন করিয়া পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছি যে কলটীতে এদেশের বস্ত্র শিল্পের বিশেষ উন্নতি পুনর্ব্বার হইতে পারে। এদেশে বস্ত্রশিল্প এককালে উন্নত ছিল, কিন্তু কলের দ্বারা বস্ত্র অধিক পরিমাণে হওয়ায় এখনকার হস্তচালিত টানা ও বোনা বস্ত্রের মূল্য বিস্তর অধিক পড়ন হয়, একারণ একেবারে বস্ত্রশিল্প লোপ হইয়াছে। কলের সহিত মানবশক্তির প্রতিযোগিতা হয় না, অনেক তাঁতি এই টানা তৈয়ারী কলটীর জন্য আমার নিকট আশা করিতেছেন যে এই টানা প্রস্তুতের কলটী তাঁহারা পাইলে অল্পমূল্যের তাঁতে বস্ত্র বয়ন করিয়া অনায়াসে অল্প মূল্যে বস্ত্র প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারেন। তৈয়ারি টানা ক্রয় করিতে না পারায় ও টানা ২।৪ জোড়া হস্তের দ্বারা করিতে বিস্তর পরিশ্রম, সূতা নষ্ট ও খরচা পড়ে, একারণ এই বস্ত্র শিল্প একেবারে লোপ হইতেছে। এখানকার তাঁতিরা সকলে অপরাপর কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়াছে। পেট না চলিলে লোক কোন কিছুই করিতে পারে না। এই কলটী প্রস্তুত করিতে আমার বিস্তর খরচা পড়িয়াছে। এমন কি এক একটী অংশ ২।৩ বার করিয়া বাতিল করিতে হইয়াছে। কলটী সম্পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবার কারণ এই যে আমি মধ্যবিত্ত লোক, অর্থ সংগ্রহ করিয়া একার্য্য করিতে অসমর্থ। ইতিমধ্যে আড়াই হাজার টাকার উপর খরচা পড়িয়াছে. এখন বিস্তর টাকার প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ না হইলে শেষ করিতে পারিতেছি না। এখন দেশের সহৃদয় ধনবান লোকদিগের নিকট জানানও যাইতেছে কিন্তু এদেশের লোকের সহানুভূতি এবিষয়ে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহায্য পাইলে আমি শীঘ্র এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি।

শ্রীদীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় *।

---

* কমলার প্রথম সংখ্যায় আমরা দীনবন্ধু বাবুর কলের কথা লিখিয়াছিলাম। দীনবন্ধু বাবু অবস্থাপন্ন নহেন, নিজের সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, এখন অপরের সাহায্য ভিন্ন কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। তিনি যে এই বৃদ্ধ বয়সে এরূপ একটা সর্ব্বজন-প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তজ্জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু কেবল ধন্যবাদে কাজ হইবে না, অর্থ চাই। কোন ব্যবসায়ী অথবা দেশহিতৈষী কি তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইবেন না? কেবল দেশহিতৈষিতার হিসাবে নহে—ব্যবসায়ের হিসাবেও কেহ টাকা দিলে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। আমরা জানি দীনবন্ধু বাবু এই কলের জন্য অনেক ফরমাইস পাইয়াছেন, কল গুলি প্রস্তুত হইলে বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট লাভ হইবে।—সং

পোকা লাগা ও ধসা ধরা।

[সরল কৃষি-বিজ্ঞান* হইতে উদ্ধৃত]

সাধারণ নিবারণোপায়।—ফসলে পোকা লাগিয়া অথবা "ধসা ধরিয়া" কখন কখন অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার রাখিতে পারিলে, এবং ভালরূপে অনেক দিন ধরিয়া অনেকবার ধরিয়া জমীতে চাষ দিতে পারিলে, পোকা লাগিয়া ও ধসা ধরিয়া ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কর্ষিত ভূমির উপর কাক, শালিক প্রভৃতি পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে বসিয়া ভূমি হইতে কীট খুঁটিয়া খাইয়া থাকে। অনেক দিন পর্য্যন্ত আকর্ষিত অবস্থায় পতিত আছে এরূপ ভূমির মৃত্তিকা খনন করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় উহা নানাপ্রকার কীটের বাসায় পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে ভূমি কর্ষিত হইলে এই সকল বাসা ভাঙ্গিয়া যায় এবং পক্ষীগণও আলোড়িত মৃত্তিকা হইতে সহজে কীট খুঁটিয়া খাইতে পারে। অনেক দিন ধরিয়া মধ্যে মধ্যে ভূমি কর্ষণ করিতে পারিলে সূর্য্যের রশ্মি ও উত্তাপ মৃত্তিকার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উপর পতিত হইয়া নানাপ্রকার ধসা-রোগের বীজকে নষ্ট করে। অনেক কৃষক আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে ধান্য কাটিয়া পুনরায় বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাস না পড়িলে আর জমীতে চাষ দেয় না। চৈতালী ফসল যদি নাও জন্মান হয় তথাপি ধান্য ছেদনের অব্যবহিত পরেই একবার ভূমি কর্ষণ করিয়া, পরে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত মাসে একবার করিয়া জমীতে চাষ দিয়া বর্ষারম্ভে ধান্য রোপণ করা উচিত। এরূপ প্রথা অবলম্বন করিতে পারিলে কীট ও ধসা-রোগের হস্ত হইতে প্রায় নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যদি ধান্য ছেদনের পরেই দেখা যায়, ভূমি নিতান্ত শুষ্ক, কঠিন ও চাষ দিবার অনুপযুক্ত হইয়া আছে, তাহা হইলে মাঘ বা ফাল্গুনে যে দিবস প্রথমে বৃষ্টি হইবে, সেই দিবসেই চাষ দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত অনেক দিবস ধরিয়া মৃত্তিকা শ্লথ অবস্থায় রাখিতে পারিলে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তিরও বৃদ্ধি হয়।

বীজ-শোধন।—কোন কোন কীটের ও ধসা-রোগের উৎপত্তির কারণ বীজে কীটের ডিম্ব বা রোগের বীজ নিহিত থাকা। বীজ, কলম ইত্যাদি বপন বা রোপণ করিবার সময় উহাদের শোধন করিয়া লওয়া উচিত। বীজাদি শোধন বা রোগ-বিচ্যুত করিতে হইলে উহাদের কীট-নাশক ও জীবাণু-নাশক বা রোধক কয়েকটী সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। এই সকল সামগ্রী হয় বিষাক্ত নতুবা তীব্র স্বাদ অথবা দুর্গন্ধযুক্ত। সাধারণতঃ তুঁতিয়া মিশ্রিত জলের মধ্যে বীজ বা কলম ডুবাইয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ চূর্ণ শেঁকোবিষ, চূণ, ক্ষার ও সর্ষপ বা রেড়ির খোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শুকাইয়া লইয়া, ঐ দিবসেই বপন বা রোপণার্থ ব্যবহার করা উচিত। যদি এক ছটাক গুঁড়া তুঁতিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে ২০০ ছটাক অর্থাৎ বার তের সের আন্দাজ গরম জলের সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া লইয়া, এক দিবসের মধ্যেই এই তুঁতিয়া মিশ্রিত জল ব্যবহার করিয়া লইতে হয়। শেঁকোবিষ অতি সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত; অর্থাৎ যদি একমণ চূর্ণ খোল, পাঁচ সের চূর্ণ ক্ষার ও পাঁচ সের চূর্ণ চূণ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে এক ছটাক শেঁকোবিষ ভাল করিয়া চূর্ণ করিয়া উক্ত তিনটী সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা নিয়ম। তুঁতিয়ার জলের মধ্যে বীজ, কলম বা মূল অনেকক্ষণ রাখিলে উহার উৎপাদিকা শক্তির নাশ হয়, এ কারণ বীজাদি তুঁতিয়ার জলে এক মিনিটমাত্র ডুবাইয়া চূর্ণ ও শুষ্ক সার-পদার্থ দ্বারা শুকাইয়া লইতে হয়।

অন্যান্য উপায়।—কখন কখন দেখা যায়, উত্তম করিয়া অনেক দিবস ধরিয়া ভূমি কর্ষণ করিয়া এবং বীজ শোধন করিয়া ব্যবহার করিয়া লইয়াও, কোথা হইতে আসিয়া ফসলে পোকা লাগিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ প্রায় রাত্রিকালে পতঙ্গ উড়িয়া আসিয়া গাছের পাতায় বা ডালে ডিম্ব প্রসব করিয়া চলিয়া যাওয়া এবং ঐ সকল ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইয়া কীটাবস্থায় পরিণত হওয়া। ডিম্ব হইতে প্রস্ফুটিত ঐ কীটই গাছের পত্রাদি খাইয়া, অথবা গাছের রস শোষণ করিয়া, অথবা

---

* সরল কৃষিবিজ্ঞান। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শ্রীনিত্য গোপাল মুখোপাধ্যায়, M.A., M.R.A.S., F.S.A.S. প্রণীত।

গাছের ডালের বা ফলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ফসলের ক্ষতি করে। রাত্রিকালে ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বালাইতে পারিলে কীটের দৌরাত্ম্য হ্রাস হয়। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং কার্ত্তিক মাসেই কীটের দৌরাত্ম্য অধিক হইয়া থাকে। এই দুই সময়ে সন্ধ্যারাত্রে ক্ষেত্রে অগ্নি জ্বালাইতে পারিলে, অনেক পতঙ্গ অগ্নিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া গাছে ডিম্ব প্রসব না করিয়া আপনা হইতেই অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া মরিয়া থাকে। পঙ্গপাল ঝাঁকে ঝাঁকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে উড়িয়া গিয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষুধা নিবারণার্থ ক্ষেত্রে নামিয়া ফসলের অনেক ক্ষতি করে। পূর্ব্ব হইতে পঙ্গপাল আসিতেছে ইহা জানিতে পারিলে গ্রামশুদ্ধ লোক ক্ষেত্রে যাইয়া হোল্লা করিতে পারিলে পঙ্গপাল গ্রামের ক্ষেত্রে না নামিয়া অন্যত্রে উড়িয়া চলিয়া যায়।

কার্পাস চা, ইত্যাদি **অধিক কালস্থায়ী ফসলে** পোকার দৌরাত্ম্য যদি অধিক হয়, সন্ধ্যার পরে পাটকাটি অথবা খড়ের আঁটিতে আগুন লাগাইয়া দিয়া, ঐ জ্বলন্ত আঁটি ক্ষেত্রের গাছে স্পর্শমাত্র করিতে করিতে চলিয়া যাইতে হয়। গাছগুলি সামান্য পরিমাণে ঝল্‌সাইয়া যাইবে বটে, কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যেই পুনরায় সতেজ হইয়া উঠিবে এবং কীট আর দেখা যাইবে না। যদি একবার ঝল্‌সাইয়া লইলে কীট এককালীন নষ্ট না হয়, তাহা হইলে আর একবার ঝল্‌সাইয়া লওয়া যাইতে পারে। অগ্নিদ্বারা ধসা-রোগেরও বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। গাছ ঝল্‌সাইবার একপ্রকার যন্ত্রেরও ব্যবহার আছে। ইহা, আস্‌বেষ্টস্ নামক অদাহ্য পদার্থের গোলা, একটী ছড়ির উপর লাগান। কেরোসিন তৈলে গোলা ডুবাইয়া জ্বালাইয়া এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়।

চারা-গাছে পোকা।—বেগুন গাছ, কপি গাছ, ইত্যাদি গাছে যদি চারা অবস্থায় পোকা লাগে, তাহা হইলে শেঁকো বিষ, চুণ ও ক্ষার চূর্ণ করিয়া পুঁটুলির মধ্যে রাখিয়া, এইরূপ ২০।২৫টী পুঁটুলি বাঁশে বা যষ্টিতে ঝুলাইয়া চারা গাছের উপর ঝাড়িতে ঝাড়িতে চলিয়া যাইতে হয়। এক ভাগ শেঁকো বিষ, ১০০ ভাগ চূর্ণ ও ১০০ ভাগ ক্ষার ব্যবহার করা উচিত। বাঁশের বা যষ্টির দুই দিকে দুই জন থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যেই এক বিঘা জমীতে বিষ ছিটান হইয়া যায়। বেগুন গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে, অথবা ফুল-কপির ফুল দেখা দিলে, অথবা বাঁধা কপি বাঁধিতে আরম্ভ করিলে, অথবা শাকের কোন অবস্থাতেই, শেঁকো বিষ ব্যবহার করা উচিত নহে। বিষাক্ত গুঁড়া ছিটাইবার জন্য কয়েক প্রকার হাপর যন্ত্রেরও ব্যবহার আছে।

মৃত্তিকার মধ্যে পোকা।—চোরা পোকা, কোরা পোকা প্রভৃতি কতকগুলি পোকা মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া ক্ষতি করে। চোরা-পোকা রাত্রিকালে মৃত্তিকা হইতে বাহিরে আসিয়া গাছ ও পাতা খাইতে ও নষ্ট করিতে থাকে। কোরা-পোকা কীটাবস্থায় দিবা-রাত্রি মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া গাছের শিকড় কাটিয়া গাছ নষ্ট করে। পতঙ্গ অবস্থায় কোরা-পোকা রাত্রিকালে মৃত্তিকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া গাছের পাতা খাইতে থাকে। মৃত্তিকার কীটকে মারিতে হইলে পিচ্‌কারি দ্বারা কেরোসিন বা রেড়ির তৈলের আরক ব্যবহার করা উচিত। কেরোসিন তৈলের আরক প্রস্তুত করিতে হইলে অর্দ্ধ বোতল কেরোসিন তৈল ও অর্দ্ধ বোতল ঘোল একত্র করিয়া উত্তম করিয়া দশ মিনিট ধরিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। এই মিশ্রিত পদার্থ ৫০ বোতল জলের সহিত মিলাইয়া দিয়া পিচ্‌কারিদ্বারা গাছের গোড়ায় গোড়ায় প্রবেশ করাইয়া দিলে গাছের গোড়ায় যত পোকা আছে সমস্ত মরিয়া যায়। পিচ্‌কারির পরিবর্ত্তে যে দমকল পৃষ্ঠে করিয়া ব্যবহার করার নিয়ম আছে ঐ দমকল ব্যবহার দ্বারা অনেক জমীতে অল্প সময়ের মধ্যে আরক ছিটান চলে। দমকল ব্যবহার রাত্রিকালেই হওয়া উচিত কেননা, রাত্রিকালেই এই পোকাগুলি মাটীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া গাছে উঠে এবং রাত্রিকালে আরক অধিকক্ষণ তরল অবস্থায় থাকে, ছিটাইতে ছিটাইতে শুকাইয়া যায় না। রেড়ির তৈলের আরক প্রস্তুত করিতে হইলে, তৈলটী সোডার সহিত জ্বাল দিতে দিতে ও আলোড়ন সহ জল ঢালিতে ঢালিতে প্রস্তুত করিয়া

লইতে হয়। ইহাও দমকলের দ্বারা রাত্রিযোগে 'ছিটাইতে হয়।

গাছের উপরিভাগে যদি কোন পোকা লাগিয়া ফসল নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে কেরোসিন বা রেড়ির তৈলের আরক দম্‌কলের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিতে হয়। তামাকসিদ্ধ জল, হিঙের জল, হলুদ ও লঙ্কার গুঁড়া এ সমস্ত ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিলেও পোকা পলাইয়া বা মরিয়া যায়। মহুয়ার খোল জ্বালাইয়া ক্ষেত্রে ধূম দিতে পারিলেও পোকা পলাইয়া যায়।

গাছ গুলি এক ফুটের অধিক উচ্চ হইয়া গেলে ক্ষেত্রে কুক্কুট, পেরু ইত্যাদি গৃহ-পালিত পক্ষী ছাড়িয়া দিলে উহারা গাছের পোকা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইয়া ফেলে। তামাক ও বেগুন গাছের পাতায় পোকা লাগিলে এই উপায় অবলম্বন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। নিতান্ত চারা গাছের মধ্যে কুক্কুটাদি পক্ষী ছাড়িয়া দিলে উহারা গাছ খাইয়া নষ্ট করে।

চিতে-লাগা, ধসা-ধরা, কুড়ে লাগা, তুলসী-মারা, হওয়া, পচ্-ধরা, বোঞা-লাগা, হর্দ্দা হওয়া ইত্যাদি রোগ আণুবীক্ষণিক জীবিতাণু বা বীজাণু-দ্বারা ঘটিয়া থাকে। জমীতে জল আট্‌কাইলে, অথবা পূর্ণমাত্রায় জমীতে সূর্য্যের কিরণ না পড়িলে প্রায় এই সকল রোগ হইয়া থাকে। ধান্য ভিন্ন অন্য কোন ফসলই প্রায় আবদ্ধ জলের উপর থাকিয়া সুস্থ ও সতেজ অবস্থায় বর্দ্ধিত হইতে পারে না। পাট, অড়হর, ভুট্টা, জুয়ার, ইক্ষু, এ সকল গাছ বর্ষার ফসল হইলেও চারা অবস্থায় আবদ্ধ জলদ্বারা প্রায়ই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বেগুণ ও লঙ্কা গাছের গোড়ায় জল আট্‌কাইলেই প্রায় "ভার্ম্ম ভাঙ্গা রোগ" অথবা "তুলসী-মারা" অথবা "ধসা-ধরা" হইয়া ফসল মারা যায়। জল যাহাতে জমীতে না দাঁড়াইতে পায় এরূপ প্রণালী পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার মাটী উস্কাইয়া দেওয়াতে গাছ সতেজ হইয়া বাড়িয়া যায়, মৃত্তিকার মধ্যস্থ কীটাদির বাসা আলোড়িত হয়, সূর্য্যের রশ্মি মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধসা-রোগের বীজ নষ্ট করে। এ কারণ মধ্যে মধ্যে কোদালি, নিড়ানি ইত্যাদির ব্যবহারদ্বারা পোকা-লাগা ও ধসা-ধরার পক্ষেও উপকার দর্শে। গমের হর্দ্দা-রোগ নিবারণের কোন সদুপায় অদ্যাবধি স্থির হয় নাই। এই রোগের বীজাণু গমের বীজের সহিত আইসে, এ কারণ নির্ব্বাচিত অর্থাৎ রোগশূন্য বীজ তুঁতিয়ার জলদ্বারা শোধন করিয়া ব্যবহার করিলে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়। ধানের শু, এবং ভুট্টা ও জুয়ারের ভূষা-রোগও এই জাতীয়। তুঁতিয়ার জলে এই সকল ফসলের বীজ ডুবাইয়া ব্যবহার করিলে বীজের দোষটা কাটিয়া যায়।

বীজ রক্ষা।—নানা উপায় অবলম্বনদ্বারা কীটের উৎপাত প্রশমিত থাকিলেও শস্য ছেদনকালে এককালীন কীটের ডিম্ব বিচ্যুত শস্য সংগ্রহ করিতে পারা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অলক্ষিতভাবে কিছু কিছু কীটের ডিম্ব প্রায়ই ফসলের মধ্যে থাকিয়া যায়। বীজ রক্ষা করিতে গেলে উহাকে শোধন করিয়া লইয়া রক্ষা না করিলে ভাণ্ডারের মধ্যেই ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইয়া ভাণ্ডারের বীজ বা শস্য কীট-দষ্ট হইয়া অল্প-বিস্তর নষ্ট হইয়া যায়। কৃষকগণ ভুট্টা, গম প্রভৃতি শস্যের বীজ প্রায়ই কীট হইতে রক্ষা করিতে পারে না। একারণ কীট-দষ্ট বীজ চতুর্গুণ পরিমাণ ব্যবহার করিয়াও কখন কখন পূর্ণ-মাত্রায় ফসল জন্মাইতে পারে না। বীজ রক্ষা করিবার সহজ উপায় কার্ব্বণ্-বাইসলফাইড্ নামক আরক ব্যবহার করা। ৪০/ মণ বীজ রক্ষা করিতে একসেরমাত্র কার্ব্বণ-বাইসালফাইড ব্যবহার করিতে হয়। এই আরক অতি সহজ দাহ্যমাণ পদার্থ; একারণ ইহার নিকট দীপ বা অগ্নি কখনই লইয়া আনা বিধেয় নহে। বৃহদাকার জালার মধ্যে উত্তমরূপে শুষ্ক বীজের পুঁটুলি বা আল্গা বীজ রাখিয়া উহার মধ্যে খোলা এক পাত্র আরক প্রবেশ করাইয়া দিয়া জালার মুখ গোবর দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া এক ঘণ্টা পরে বীজ বাহির করিয়া লইয়া উহা টিনের আধারের মধ্যে অথবা লবণাক্ত থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া রাখিলে বীজ কীট-বিচ্যুত অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। লবণের জলে থলিয়া-গুলি ভিজাইয়া, শুকাইয়া লইলে ঐ থলিয়ার মধ্যে কীট প্রবেশ করে না। জালার মধ্যে বীজ রাখিয়া জালার মুখে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ শুষ্ক নিমের পাতা দিয়া রাখিলেও বাহিরের কীট জালার মধ্যে প্রবেশ করে না।

কমলা

আশ্বিন]

[১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।

নানা প্রসঙ্গ।

যাহাতে ভারতজাত দ্রব্যসামগ্রী জাপানে সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত জাপানের সে বিষয়ে একটি সন্ধি হইয়াছে।

* * *

কলিকাতার ম্যাকিনন মেকেঞ্জি কোম্পানির হাউসের অংশীদার পিটার ম্যাকিনন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বহু দিন এ দেশ হইতে চলিয়া গিয়া বিলাতের আপিসের কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন। ইনি তাঁহার ভ্রাতা স্যর উইলিয়ম ম্যাকিননের ন্যায় সহৃদয় ও উদারচেতা ছিলেন।

হইবে। যিনি নিযুক্ত হইবেন তিনি এক্ষণে গিরাজুলিয়া বন্দরে অণুবীক্ষণিকের কার্য্য করেন। ইঁহার বেতন হইবে বৎসরে ৯০০০ হইতে ১২০০০ টাকা। আর এক জন জীবাণুতাত্ত্বিক ও কৃষিবিৎও এইরূপ বেতনে নিযুক্ত হইবেন। যে সকল এতদ্দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তি গবর্মেণ্টের ব্যয়ে বিলাতে গিয়া কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিলেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে এ সব পদ ঘটিবে না।

* * *

শিল্পশিক্ষার উন্নতিসাধন জন্য কোইম্বাটোরে একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষার জন্য প্রত্যেক নগরে একটী করিয়া পুস্তকালয় সংস্থাপন করা এ সভার বিশেষ উদ্দেশ্য। বাস্তবিক শিল্পাদি সম্বন্ধে পুস্তকাদির অভাব অনেক শিক্ষিত লোক বিশেষরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, সুতরাং সভা এই অভাব মোচনে অগ্রসর হইয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

* * *

পঞ্জাব বাসীরা দেশের শিল্পোন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি হাফিজাবাদে Ranbir Match Manufacturing Co. নামে একটি দেশলাইয়ের কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানি অনেক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া অনেক সুন্দর দেশলাই প্রস্তুত করিতেছেন। এমন কি ইহা কোন অংশে য়ুরোপীয় দেশলাই অপেক্ষা ন্যূন নহে। এই কারখানায় মূলধন লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে; কিন্তু আপাততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া কার্য্যারম্ভ করা হইয়াছে। ভারতে আর দুইটি দেশলাইয়ের কারখানা আছে; একটি আহম্মদাবাদে ও আর একটি রাজপুতানায় কোটা নগরে।

মেল ব্যাঙ্ক ৫১ হাজার টাকার উপর লাভ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১৫ হাজার টাকা অংশীদারদিগকে লাভ দিয়াছেন, লোকসান খাতে দশ হাজার টাকা জমা রাখিয়াছেন, আর বাকী টাকা পর বৎসরের হিসাবে জের টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। এইরূপ অল্প মূলধনে বাঙ্গালার জেলায় জেলায় যদি এক একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় তাহা হইলে স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়।

* * *

গোরক্ষপুরে কায়স্থ ট্রেডিং ও ব্যাঙ্কিং কর্পোরেসন নামে একটি যৌথ কারবার আছে। ইহা টাকার লেন দেন ও অন্যরূপ কারবার করিয়া থাকেন। এই কোম্পানির ষাণ্মাসিক রিপোর্টে প্রকাশ যে ছয়মাসে ১০৯৪১ টাকা লাভ হইয়াছে। ইহা হইতে অংশীদারদিগকে শতকরা ১২২ টাকার হিসাবে ৮৪০০ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হইবে, ২০০০ টাকা গচ্ছিত হিসাবে জমা রাখা হইবে, ৫০০০ টাকা অন্যান্য ব্যয় মিটাইবার জন্য জমা থাকিবে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের দ্বারা দেশের ব্যবসায়ের যেমন সাহায্য হয়, তেমনি যাঁহারা ইহাতে মূলধন নিয়োগ করেন তাঁহারাও লাভবান হন।

* * *

ভারতে এখন অনেকগুলি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অধিকাংশই বিদেশী মূলধনে সংস্থাপিত। বাঙ্গালায় যে ৩।৪টি কল আছে তাহার সকলগুলি য়ুরোপীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত। লক্ষৌনগরে অপার ইণ্ডিয়ান কাউপার মিল নামক একটী কাগজের কল আছে ইহা সম্পূর্ণরূপে দেশীয় মূলধনে পরিচালিত। সমস্ত ভারতে এখন আটটি কাগজের কল চলিতেছে, ইহার মূলধন ৭৩,২০,০০০ টাকা। ১৯০২ সালে এই কয়টি কল হইতে ৬৪,৩৮,৩১৯ টাকার কাগজ তৈয়ার হইয়াছে। ইহা যথেষ্ট নহে। লর্ড রিপন নিজ শাসন কালে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে সরকারী কার্য্যালয় সমূহের জন্য এদেশজাত সামগ্রী স্বাধ্য দরে পাইলে তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করা হইবে না। এই ব্যবস্থা যে ঠিক অনুসৃত হইতেছে না তাহা সকলেই জানেন। উচ্চশ্রেণীর কাগজপত্র গবর্মেণ্ট বিলাত হইতেই আমদানী করিয়া থাকেন, সুতরাং এদেশীয় কল সকল হইতে তাহা সরবরাহ হয় না। ইহাতে কল সকলের উন্নতি হইবে কিরূপে? এমন কি রাণীগঞ্জে বামার লরি কোম্পানি যে একটি কল করিয়াছিলেন, তাহা বন্ধ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন। রাজসাহায্য ব্যতীত কোন দেশেই শিল্পের সম্যক্ উন্নতি হইতে পারে না।

* * *

এদেশে প্রভূত পরিমাণে চামড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের গো মহিষ ছাগ মেষাদির চামড়া লইয়া গিয়া য়ুরোপীয় মার্কিনেরা তাহা পরিষ্কার করিয়া আবার এদেশে আনিয়া বিক্রয় করেন। এদেশ হইতে বৎসরে প্রায় [illegible] [illegible] টাকা মূল্যের চামড়া বিদেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible]। চর্ম্ম-নির্ম্মিত সামগ্রী ও পরিষ্কৃত চামড়া বিদেশ হইতে বাঙ্গালাতেই প্রায় বৎসরে ৩।১০ লক্ষ টাকার আমদানী হয়। এই চামড়া যদি এদেশে পরিষ্কৃত হইত তাহা হইলে আমাদিগকে বিদেশ হইতে এত টাকার চামড়া আমদানী করিতে হইত না এবং পরিষ্কৃত চামড়া তৈয়ার করিয়া বিদেশে পাঠাইতে পারিলে দেশের যথেষ্ট লাভ হইত। সম্প্রতি মান্দ্রাজ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ এই চামড়া পরিষ্কার করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতেছেন। যাঁহারা ইহা শিক্ষা করিতে চাহেন তাঁহারা মান্দ্রাজে গিয়া শিখিতে পারেন। চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য যে সকল মশলা প্রয়োজন হয় তাহা য়ুরোপীয়েরা এদেশ হইতে লইয়া যান সুতরাং এদেশে যে অতি সুলভে পরিষ্কৃত চামড়া প্রস্তুত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক যিনি এই প্রণালী শিক্ষা করিয়া এই ব্যবসায় নিযুক্ত হইবেন তিনি আপাততঃ বিশেষ লাভবান হইবেন।

* * *

আমেরিকার তুলার মহাজনদিগের ধর্ম্মঘটের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় বলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যে তুলার আবাদের জন্য একটি সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, এ কথা অনেকেই অবগত আছেন। সম্প্রতি এই সমিতি ভারতে কার্পাস আবাদের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য লর্ড কর্জ্জনকে এক পত্র লিখিয়াছেন। যাহাতে গবর্মেণ্ট কতকগুলি বীজক্ষেত্র সংস্থাপন করেন এবং নানা প্রকার বীজ লইয়া পরীক্ষা করেন তাঁহারা সে জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কার্পাস চাষের উন্নতির ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি কার্পাস বিভাগ সংস্থাপন করিয়া মার্কিন ও মিশর দেশ হইতে উপযুক্ত লোক আনাইয়া তাহার কার্য্যভার তাহাদিগের হস্তে দিতে বলিয়াছেন এবং কৃষকদিগের নিকট ফসল বাঁধা রাখিয়া দাদন দিবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। বৃটিশ শিল্পের মঙ্গলের জন্য ভারত গবর্মেণ্ট এ দেশের তুলার চাষের উন্নতিতে মনোযোগী হইবেন। মফঃস্বলবাসিগণ যদি এই সময়ে উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলার আবাদ করিতে পারেন তাহা হইলে লাভবান হইবেন।

* * *

দক্ষিণ ভারতে মরীচ দ্বীপের এক জাতীয় লাল ইক্ষুর চাষ হইতেছে। ইহার ফল নাকি ভাল হইতেছে এবং কৃষকেরা আদর করিয়া উহার আবাদ করিতেছে। পুষা অঞ্চলে যে ইক্ষুর আবাদ হইতেছে সেখানেও নাকি ইহার পরীক্ষা হইতেছে। দক্ষিণ ভারতের সামলকোট আদর্শ পরীক্ষা ক্ষেত্রে এই লাল জাতীয় ইক্ষু সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহা অন্য জাতীয় ইক্ষু অপেক্ষা ওজনে ভারি এবং ইহাতে গুড়ও অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এদেশের ইক্ষু চাষীরা সামলকোট পরীক্ষা ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

* * *

মধ্য ভারতে কার্পাসের আবাদ প্রতি [illegible] বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০৯।১০ সালে [illegible] [illegible] [illegible] কার্পাস আবাদ করা হইয়াছিল [illegible] [illegible] দেখা যায় নাই। গত বৎসরে মধ্য প্রদেশ ও বিরারে আবাদ আরও বাড়িয়াছে।

তথায় সাধারণতঃ অন্যান্যের সহিত কার্পাস বপন করা হয়। কিন্তু কার্পাসের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এখন আর উহা অন্য ফসলের সহিত বপন করা হইতেছে না। বোম্বাইয়ের কল সমূহ এই শ্রেণী তুলাতেই কাজ করিতেছে। যুক্তপ্রদেশ মধ্য প্রদেশের অনেক তুলা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

* * *

মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট তৎপ্রদেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতির বিশেষ সুব্যবস্থা করিতেছেন। স্যামলকোটের আদর্শক্ষেত্র দ্বারা তথাকার ইক্ষু চাষের বিশেষ উন্নতি হইতেছে। যাহাতে কৃষকগণ ইহার আবাদে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে সে জন্য কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ইন্সেপেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া কৃষকদিগকে ইক্ষুর আবাদ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। মান্দ্রাজ গবর্মেণ্টের এই দৃষ্টান্ত কি বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট অনুকরণ করিতে পারেন না? বাঙ্গালায় ইক্ষু চাষের যে উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে তাহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু এ জন্য তাঁহাদিগের বিশেষ কোন চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না।

* * *

মান্দ্রাজে খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ ও অভ্রের ব্যবসায়ের বেশ উন্নতি হইতেছে। গত বৎসর তথা হইতে সাড়ে চারি লক্ষ টাকার অধিক ম্যাঙ্গানিজ ইংলণ্ডে রপ্তানি হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর পৌনে চারি লক্ষ টাকা মূল্যের পরিমাণ রপ্তানি হইয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় এই ধাতু আবিষ্কৃত হওয়াতে যুক্তরাজ্যে বড় একটা রপ্তানি হয় নাই। অভ্র যদিও পরিমাণে অধিক রপ্তানি হয় নাই কিন্তু জিনিস খুব ভাল হইয়াছে বলিয়া ইংলণ্ডের খরিদদার গণ উহার বিশেষ আদর করিয়াছে।

* * *

গত বৎসর লক্ষ্ণৌয়ের সরকারী ফলের বাগানে কমলা লেবু সঞ্চয় করিয়া রাখিবার পরীক্ষা হইয়াছিল। সন্টা, সিন্ট্রা, ও শ্রীহট্ট লেবু লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। শেষোক্ত দুই প্রকার লেবুর ছাল পাতলা ও আলগা বলিয়া বহুদিন টিকে নাই; ইহাদের প্রায় দশ আনা অংশ জুন মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সন্টার লেবুর ছাল পুরু থাকাতে তাহার অল্পই নষ্ট হইয়াছিল। আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত সেগুলি কোনরূপে পচে নাই এবং সম্পূর্ণ রসাল ছিল। এই ফলগুলি ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে বেশ পরিপক্ক হইলে সংগ্রহ করা হয় এবং কতকগুলি দেবদারু কাঠের বাক্সের ভিতর তক্তা দিয়া পৃথক পৃথক খাটাল করিয়া তাহার ভিতর এক এক থাক সাজাইয়া রাখা হয়। প্রত্যেক খাটালের পরিসরে এক থাক লেবু সাজাইবার অধিক নহে। তাহার পর ঐ বাক্স একটি ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহে ঘরটি একবার করিয়া খুলিয়া ফলের অবস্থা দেখা হইত। এই পরীক্ষার ফল এক প্রকার সন্তোষজনক বিবেচিত হইয়াছে। যাঁহাদের প্রচুর কমলালেবু আছে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা গ্রীষ্মকালে [illegible] লইয়া বেশ টাকা লাভ করিতে পারেন।

ফল-কুঞ্জনাশ এবং নাশ করিবার জন্য নিমপাতার কি গুণ আছে মান্দ্রাজের সরকারী কৃষি বিভাগ তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। উক্ত প্রদেশে মাকি জমিতে নিমপাতার সার দেওয়া হয়। নিমের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়, তাহা বিশেষ কোন প্রয়োজনে লাগিতে পারে কি না উক্ত বিভাগ সে বিষয়েও অনুসন্ধান লইতেছেন। আমাদিগের এদেশে নিমপাতা বা নিম বীজের ঐরূপ কোন ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। মান্দ্রাজ প্রদেশের ন্যায় এখানকার কৃষি বিভাগ এ বিষয়ের পরীক্ষা করিতে পারেন। এদেশে নিম যথেষ্টই জন্মিয়া থাকে।

* * *

মার্কিন সাধারণ তন্ত্র দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহারা কেবল সার বা বীজের পরীক্ষা অথবা দেশে কি পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা তাহার তালিকা সংগ্রহ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না। তথায় কৃষি বিভাগ নানা শাখায় বিভক্ত। একটি শাখা কেবল ঋতুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন এবং তদনুসারে কৃষকদিগকে কার্য্য করিতে পরামর্শ দেন; একটি বিভাগের কেবল পশু পালনের দিকেই দৃষ্টি, অন্য বিভাগ কেবল উদ্ভিদাদি রোপণ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেন, কোন বিভাগ মৃত্তিকার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন। এইরূপ বন বিভাগ, রাসায়নিক বিভাগ প্রভৃতি নানা বিভাগ দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিয়া থাকেন। যুক্ত রাজ্যের এ বিষয়ে এতই অনুরাগ যে নবজিত কিউবা ও ফিলিপাইন দ্বীপেও কৃষি পরীক্ষাগার সকল স্থাপন করিয়াছেন। মার্কিনেরা অল্প দিনে ফিলিপাইন-বাসিদিগের সমৃদ্ধির জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ইংরেজ ভারতে শত বৎসর রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

* * *

মধ্য ভারতে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যে সরকারী সভা আছে তাহার কার্য্য এইরূপে সম্পাদিত হয়:—

প্রত্যেক জেলাতে একটি করিয়া শাখা সভা আছে। সভার প্রত্যেক সভ্যকে কৃষি বিষয়ে যে সকল পরীক্ষা কার্য্যের ভার দেওয়া হয় তাঁহারা তাহা আপন আপন গ্রামে প্রবর্ত্তিত করিতে এক প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রত্যেক সভার অধিবেশনে কতক গুলি কার্য্য স্থির করা হয় এবং কতকগুলি সভ্যকে তাহার ভারার্পণ করা হয়। তাঁহারা যথা সময়ে প্রধান সভায় তাঁহাদিগের কার্য্যফল জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

* * *

এইরূপে এই সকল সভা তথাকার কৃষির উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। ইহারা সরকারী কৃষি বিভাগ ও দেশের কৃষকমণ্ডলীর মধ্যে একটি যোগ স্থাপন করিয়াছেন। কি বীজ-বিতরণ, কি সারের গুণাগুণের কথা, কি নূতন কৃষিপ্রণালী অনুসরণের কথা, সকল বিষয়ই কর্তৃপক্ষ ইহাদিগের দ্বারা কৃষক-দিগকে বিদিত করিতে পারেন। বাঙ্গালায় ও ছোট লাট সাহেব ঐরূপ কৃষি সভা স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু জেলা সভা গুলি সম্বন্ধে কত দূর কি হইয়াছে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে

সম্ভাবনা নাই। মধ্য ভারতের ন্যায় এখানে সভা স্থাপন করিতে না পারিলে প্রতিমত কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

* * *

আজকাল চা-র আবাদে ক্ষতি হইতেছে বলিয়া চা-করগণ কিয়া মুগা প্রভৃতির চাষ করিতেছেন। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে অনেক চা-কর মুগার আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। মুগার আঁস লণ্ডনে যে দরে বিক্রয় হয় তাহাতে ইহাতে বেশ লাভ থাকে। মুগার আবাদেও আঁস বাহির করিতে টন করা ১৪ পাউণ্ডের অধিক ব্যয় হয় না, কিন্তু বিলাতের বাজারে উহা ২০ হইতে ৩০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হয়। ইংরেজেরা কেমন মতলব খাটাইয়া লাভ করেন, আর আমরা কেবল হাঁ করিয়া তাহা দেখি।

* * *

সকল ফলেই সময়ে সময়ে কীট প্রবেশ করিয়া নষ্ট করে কমলালেবুতেও ঐরূপ কীট ধরে। ডাক্তার লীস নামক একজন কীটতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কমলালেবুর বাগানে সূর্য্যমুখী ফুলের গাছ চারাইতে পারিলে কমলায় কীট ধরে না। সূর্য্যমুখীর ফুলগুলি এরূপ সময় চারাইতে হইবে যেন কীটের দৌরাত্ম্যের সময় উহার ফুল ফুটে। সূর্য্যমুখী ফুল ফুটিলে আর কমলায় কীট প্রবেশ করিবে না। আর সূর্য্যমুখী হইতেও অনেক উপকার পাওয়া যাইতে পারে। ইহার ফুল হইতে মৌমাছিরা মধু সঞ্চয় করিয়া নিকটে চাক বাঁধিতে পারে এবং উহার বীজে পশু পক্ষীর আহারের একটা বিশেষ ব্যবস্থা হইতে পারে। সূর্য্যমুখীর প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা বারান্তরে বিবৃত করিব।

* * *

এক সময়ে বাঙ্গালার রেশম য়ুরোপের আদরের সামগ্রী ছিল। ভারতের কোথাও বাঙ্গালার মত রেশম উৎপন্ন হইত না। মুর্সিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূমে যেমন তসর ও গরদের কাপড় প্রস্তুত হইত সেরূপ কুত্রাপি দেখা যাইত না। এখনও মুর্সিদাবাদ মালদহে বহু ক্রোশ ব্যাপী স্থানে তুঁতের আবাদ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সহস্র সহস্র লোক রেশম আবাদ ও রেশমী বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু গুটির ডিম সকল রোগাক্রান্ত হওয়াতে এই ব্যবসায় এক প্রকার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এক্ষণে ইহার উন্নতির জন্য কতকটা চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া মনে হয় যে আবার এই ব্যবসায়ের পুনরুন্নতি হইবে।

* * *

সম্প্রতি গবর্মেণ্টের উদ্যোগে মুর্সিদাবাদে গুটি পালন করিবার জন্য একটি ক্ষেত্র সংস্থাপিত হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক রেশমতত্ত্বে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শানুসারে ও বিশেষ চেষ্টাতেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুনিতেছি মালদহ ও মেদিনীপুরে এইরূপ আর দুইটি ক্ষেত্র সংস্থাপিত হইবে। গুটি পালন ও রেশম বাহির করিবার প্রণালী শিক্ষার জন্য গবর্মেণ্ট রেশম সমিতিও চারিটি আদর্শ ক্ষেত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই সকল আদর্শ ক্ষেত্রের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

রাজসাহীর রেশম শিল্প বিদ্যালয়টিকে গবর্মেণ্ট বিশেষ যত্ন করিতেছেন। এই বিদ্যালয়টি এক্ষণকার আমাদিগের বন্ধু রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় চেষ্টাতেই সংস্থাপিত হয়। এখানে ছাত্রদিগকে রেশম বাহির করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। গত বৎসর এই বিদ্যালয় হইতে সতের জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ বিষয়ে এত উদ্যোগী যে বাঙ্গালোরে টাটার রেশমক্ষেত্রে রেশমতত্ত্ব শিক্ষার্থ একজন শিক্ষককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতালীর পাডুয়ার রেশমকীটপরীক্ষাগার হইতে এই বিদ্যালয় যে ডিম আনাইয়াছিলেন তাহাতে সুফল ফলিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে সকল রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল তাহাতে গত বৎসর বেশ আয় হইয়াছিল। মেদিনীপুরেও এইরূপ একটি বিদ্যালয় আছে। গবর্মেণ্ট যদি বিলাতী শিল্প ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থে অন্ধ না হন, তাহা হইলে এদেশের শিল্প শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিতে পারে।

* * *

য়ুরোপে যে সকল বিদ্যালয়ে একটিমাত্র শ্রমশিল্প বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকে Monotechnic স্কুল বলে, আর যেখানে বিবিধ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকে Polytechnic স্কুল বলে। এক লণ্ডন সহরে প্রায় ১১টি পলিটেকনিক স্কুল আছে। ইহার যে কিছু যন্ত্র তন্ত্র সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তাহা লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিলের শ্রমশিল্প বিভাগ প্রদান করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্ট মহাসভা ও মিউনিসিপালিটিও ইহার সাহায্যার্থ যথেষ্ট টাকা দিয়াছেন। দেশের অনেক ধনীলোক এই সকল বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ প্রভূত অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। নর্দাম্পটনে একটি পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউট আছে, তাহার সাহায্যার্থে মার্কুইস অব নর্দাম্পটন ত্রিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের ভূমি দান করিয়াছেন। ঐ ভূমির উপরই স্কুল স্থাপিত। সাউথ ওয়েষ্ট লণ্ডন পলিটেকনিক বিদ্যালয়ের ভূমির মূল্য দশ হাজার পাউণ্ড, উহা লর্ড ক্যাডোগ্যান দান করিয়াছেন। দেশের লোক এইরূপ উদ্যোগী না হইলে কি দেশের উন্নতি হয়। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে পলিটেকনিক বিদ্যালয়ের যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষোন্নতি বিধায়িনী সভা এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে ভাল হয়।

* * *

সন্ন্যাসী স্বামী রামতীর্থ পূর্ব্বে লাহোর কালেজের গণিত ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ উপাধিধারী এবং শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। তিনি এক্ষণে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেশহিতব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি আমেরিকায় গিয়া ভারতীয় যুবক বৃন্দের শ্রমশিল্পাদি শিক্ষা বিষয়ে একটি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বামী রামতীর্থ কেবল ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াই তাঁহার সন্ন্যাসব্রত সম্পাদন করেন না। যাহাতে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয় তিনি সে জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল। সম্প্রতি তিনি আমেরিকার ফ্রাঙ্কো নামক স্থানে এ দেশীয় বিদ্যার্থীদিগের সাহায্যের জন্য একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। যে দেশীয় যে সকল যুবক অর্থাভাবে

কৃষি শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন, এই জন্য তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিবেন। যে সকল ছাত্র এইরূপ শিক্ষার্থ যাইবেন, ভারতবর্ষের একটি কমিটি তাঁহাদিগকে মনোনীত করিবেন। তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, তাঁহারা যখন শিল্প শিক্ষা সমাপন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিবেন তখন তাঁহাদের অর্জ্জিত বিদ্যা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। যাহাতে এ দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের উন্নতি সাধন হয়, যাহাতে তাহারা উন্নত প্রণালীর কৃষি শিল্পাদি শিক্ষা করে তাঁহারা সেজন্য পরিশ্রম করিবেন। স্বামী রামতীর্থ ও মার্কিনের বদান্য দেশবাসীরা ভারতের কি মঙ্গল সাধন করিতেছেন তাহা সকলে দেখুন।

* * *

বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে লণ্ডনের কৃষ্টাল প্যালেসে ইংলণ্ডের নিজ ও উপনিবেশ সমূহের উৎপন্ন সামগ্রীর প্রদর্শনী হইবে। অন্যান্য প্রদর্শনীতে সরকার হইতেই দ্রব্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, কিন্তু এই প্রদর্শনীতে ভারত গবমে'ণ্ট এদেশ হইতে কোন সামগ্রী প্রদর্শন করিবার ভার লইবেন না। এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি তাহা বুঝিলাম না। এদেশের কারিকরেরা জনপদের মেলাতেই আপনাদের দ্রব্যজাত প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে না, সুতরাং এই প্রদর্শনীতে যে ভারত জাত সামগ্রী বিশেষরূপ প্রদর্শিত হইবে তাহা বোধ হয় না। কোন উদ্যমশীল ভারতবাসী কি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে পারেন না?

নূতন অর্থনীতি ও ভারতীয় বাণিজ্য।

ইংরেজ অর্থনীতিকেরা চিরদিনই অবাধ বাণিজ্যের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ড কোন কালেই এই নীতি অবলম্বন করেন নাই। তামাক চা কাফি চিনি ইত্যাদি সামগ্রীর উপর ইংলণ্ডে তাহাদিগের মূল্যের বহু গুণাধিক মাশুল গৃহীত হইয়া থাকে। তথাপি য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশাপেক্ষা ইংলণ্ড যে কতক পরিমাণে এই নীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন ইহা সত্য। অবাধ বাণিজ্যনীতি সকল সময়ে সকল দেশের উপযোগী না হইলেও এই নীতি যে ন্যায় সঙ্গত ইহা অস্বীকার করা যায় না। সরল ভাবে এই নীতি অনুসৃত হইলে বাণিজ্যের প্রসার ও সেই সঙ্গে জাতীয় ধন বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই জন্যই কবডেন প্রভৃতি মনীষীগণ রাজনীতিক বিষয়ে [illegible] এই নীতির অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই উপদেশ অনুসারে যতটুকু কাজ হইয়াছে তাহাতে ইংরাজ জাতির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। উঁহাদিগের বাণিজ্য পোত যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক অধিক কবডেনের নীতিই তাহার মূল কারণ।

সম্প্রতি কোন কোন ইংরেজ এই অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রতিকূলাচরণে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিলাতী মন্ত্রী সমিতির সদস্য চেম্বারলেন সাহেবের নাম অনেক পাঠকই অবগত আছেন। বুয়র যুদ্ধের ইনিই প্রধান নায়ক। উপনিবেশ বিভাগের সেক্রেটারীর পদে থাকিয়া তিনিই যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি অর্থনীতিতত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়াছেন। মন্ত্রী সমিতি তাঁহার নীতি অনুসরণে অসমর্থ বলিয়া তিনি সদস্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যাহাতে ইংলণ্ডের লোক অন্তত: তথাকার শ্রমজীবী সম্প্রদায় তাঁহার নূতন মত গ্রহণ করে সে জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন।

সকলেই জানেন ইংলণ্ড শিল্প প্রধান দেশ। তথাকার শ্রমজীবী সম্প্রদায় প্রধানতঃ শিল্প কার্য্যের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্স জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশে শিল্পের বিশেষরূপ উন্নতি হইয়াছে—মার্কিনের ত কথাই নাই। ইংলণ্ড অপেক্ষা জর্ম্মনিতে মজুরীর হার কম বলিয়া জর্ম্মানেরা তাহাদিগের শিল্পজাত অনেক সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই কারণে বৃটিশ শিল্পীদিগের শিল্প সামগ্রীর কাটতি কমিয়া যাইতেছে। কেবল যে ইংলণ্ডেই এইরূপ ঘটিতেছে তাহা নহে, ইংরেজাধিকৃত অন্যান্য স্থানেও জর্ম্মাণ শিল্পীরা বৃটিশ শিল্পীদিগকে পরাজয় করিতেছে। এই জন্য চেম্বার্লেন সাহেব ইংলণ্ডের শ্রমজীবী ও শিল্পীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিদেশজাত সামগ্রীর উপর মাশুল বসাইতে চাহেন। বিদেশী শিল্পের উপর মাশুল গৃহীত হইলে সে সকল সামগ্রী আর সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে না, তাহা হইলেই বৃটিশ শিল্পীদিগের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা দূর হইবে—তথাকার শিল্প রক্ষা পাইবে। দেশজাত শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য এই মাশুল গ্রহণের প্রস্তাব হইতেছে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে "রক্ষা-কর" বা Protection

Duty. সকল দেশের শিল্প দ্রব্যের উপর সমান হারে মাশুল গ্রহণ করিলে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না এবং তাহা অবাধ বাণিজ্য নীতির অনুমোদনীয় না হইলেও তাহাকে ন্যায়পর ব্যবস্থা বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু চেম্বার্লেন সাহেবের নীতি সেরূপ নহে। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে যে দেশ বাণিজ্য বিষয়ে ইংলণ্ডের সহিত যেমন ব্যবহার করিবেন, ইংলণ্ডও তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। অর্থাৎ যাঁহারা ইংলণ্ডের দ্রব্যাদি অল্প হারে মাশুল লইয়া তাঁহাদিগের দেশে আমদানী করিতে দিবেন, ইংলণ্ডও তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি অল্প হারে মাশুল লইয়া দেশে প্রবেশ করিতে পারিবেন, আর যাঁহারা উচ্চহারে মাশুল লইবেন তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। এই ব্যবস্থাব তিনি নাম দিয়াছেন Retaliation বা প্রতিশোধ নীতি। কিন্তু ইংলণ্ডের উপনিবেশ সমূহ সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা করা হইবে। তাঁহারা ইংলণ্ডের দ্রব্যজাত যাহাতে তাঁহাদিগের দেশে অবাধে যাইতে দেন, সেজন্য তাঁহাদিগের দ্রব্য সামগ্রীও যাহাতে সেইরূপ ইংলণ্ডে আসিতে পারে এরূপ নীতির অনুসরণ করা হইবে। ইহাকে তাঁহারা Preference বা Preferential Tariff বলেন। এই সকল কথার মধ্যে ভারতের কোন কথা নাই। ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। ভারত ইংরেজের অধীন, সুতরাং ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থের যখন যেরূপ নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিবেন তখন তাহাই করিবেন, ইহা প্রতিরোধ করিবার ত কোনও উপায় নাই। তাহা না হইলে কোন্ ন্যায় নীতি অনুসারে এ দেশ জাত বস্ত্রের উপর মাশুল গৃহীত হইতেছে? যাহা হউক এ ক্ষেত্রে সে কথা আলোচনার কোন আবশ্যক নাই।

চেম্বার্লেন সাহেব শিল্প রক্ষা নীতি প্রচার করিলে সকলেই জিজ্ঞাসা করিল যে তাঁহার এই নীতি ভারতে প্রবর্ত্তিত হইবে কি না? জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই যে ভারত যখন উপনিবেশ সমূহের ন্যায় স্বতন্ত্র রাজ্য নহে, ইহা যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধীন, তখন ইংলণ্ডে যে নীতি অনুসৃত হইবে ভারতে তাহা না হইবে কেন? ইংলণ্ডেরই আদর্শে যখন ভারতে অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন রক্ষানীতিই বা সেইরূপ প্রবর্ত্তিত হইবে না কি জন্য? কথাটাতে চেম্বার্লেন সাহেবের চমক ভাঙ্গিল। তিনি বুঝিলেন ভারতে রক্ষানীতি অবলম্বিত হইলে, তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিফল হয়। অর্থাৎ ভারতে যদি ইংলণ্ডের ন্যায় রক্ষানীতি অনুসারে বিদেশী শিল্পের উপর মাশুল গৃহীত হয়, তাহা হইলেই ত বৃটিশ শিল্পীদিগের প্রমাদ। ইংলণ্ডের শিল্প সামগ্রী—কি বস্ত্র কি অস্ত্রবিধ—ভারতে যেরূপ বিক্রয় হইয়া থাকে সেরূপ আর কোথাও ত হয় না। এরূপ অবস্থায় ভারত যদি ইংলণ্ডজাত সামগ্রীর উপর মাশুল ধার্য্য করে, তাহা হইলে তাঁহারা সে সমস্ত বিক্রয় করিবেন কোথায়? বাস্তবিক ইহাই চেম্বার্লেন সাহেবের প্রস্তাব গৃহীত হইবার পক্ষে একটি বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে। চেম্বার্লেন সাহেব যদি সাম্যনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া বলেন যে ইংলণ্ডে যে নিয়মে কাজ হইবে ভারতেও সেই নিয়ম চলিবে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের কোন শ্রমজীবীই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবে না। এই জন্যই তিনি কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিতেছেন যে, এ বিষয়ে ভারতের সহিত একটা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে। যাহাতে ভারতের চা, কাফি, চাউল, চিনি, গোধুম প্রভৃতি দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধাজনক মাশুলের হার ধার্য্য হয় তাহা করা যাইবে। চেম্বার্লেন সাহেবের এই ব্যবস্থায় যে ভারতের কোন প্রকার উপকার হইবে না তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। কিন্তু তাঁহার নীতি যদি সাধারণ ভাবে পরিগৃহীত হয় তাহা হইলে ভারতের কৃষি শিল্প উভয়েরই যে ক্ষতি সাধিত হইবে প্রথমে তাহা আমরা প্রদর্শন করিব।

এক্ষণে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ১২৬ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি টাকার সামগ্রী কেবল শিল্প কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। পাট তুলা চামড়া ও নানা প্রকার বীজ ও উদ্ভিদজাত পদার্থ এই শ্রেণীতে ধরা যাইতে পারে। আর খাদ্য সামগ্রী যেমন চা, চাউল, গোধুম প্রভৃতি ৩৬ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশে রপ্তানি হয়। নীল, নানা প্রকার সুতাদি ও অন্যান্য সামগ্রীতে ৩০ কোটি টাকার জিনিষ রপ্তানি হয়। এই সকল সামগ্রীর সমস্ত

মূল্য যে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে তাহা নহে। ভারতের হিসাবে প্রথমে ঐ বিলাতে যে ব্যয় করেন তাহা এই রপ্তানি বাণিজ্যের দ্বারা পরিশোধ করিতে হয়। কিন্তু এই যে এত টাকার জিনিস রপ্তানি হয় ইহার সমস্তই যে ইংলণ্ডে রপ্তানি হয় তাহা নহে, অন্যান্য দেশেও চালান হইয়া থাকে। উপরে যে ৬০ কোটি টাকার শিল্পের উপকরণ রপ্তানি হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রায় ৩৩।৩৪ কোটি টাকার সামগ্রী ইংলণ্ড ব্যতীত অন্যত্র প্রেরিত হয় এবং তাহার অধিকাংশই বিনা মাশুলে সেই সেই দেশে গৃহীত হইয়া থাকে। এক্ষণে চেম্বার্লেন সাহেবের নীতি অনুসারে ভারতে যদি ইংলণ্ডজাত সামগ্রীর উপর মাশুল লইয়া অন্যান্য দেশের জিনিসের উপর মাশুল গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে সেই সেই দেশ যে ভারত জাত সামগ্রীর উপর সেইরূপ মাশুল লইবার ব্যবস্থা করিবেন না তাহা কে বলিতে পারে? এক মাত্র পাট ব্যতীত আর যে সকল শিল্পের উপকরণ এদেশ হইতে রপ্তানি হয়, তাহা অন্যান্য দেশেও জন্মে। এক সময়ে চাউল ভারতে একচেটিয়া ছিল, কিন্তু ক্যারোলিনার চাল এখন ভারতের সহিত প্রতিযোগীতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর পাটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য প্রকার উদ্ভিদের আঁশ ব্যবহারেরও চেষ্টা হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপেও পাটের আবাদ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় যদি জর্ম্মানী ফ্রান্স বা আমেরিকা ভারতের প্রতিশোধ লইবার জন্য ভারতজাত সামগ্রীর উপর মাশুল লইবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে ভারতের ব্যবসা যে হ্রাস হইয়া যাইবে ও অন্যান্য দেশের ব্যবসা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতে এখন শিল্পাদির কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই, এবং ইংরেজ শিল্পীরা এখানকার শিল্পোন্নতির যেরূপ বিরোধী তাহাতে কোন কালে যে সম্যক্ প্রকারে এখানকার শিল্পের উন্নতি হইবে সে আশা দুরাশা। এখানকার অধিকাংশ লোককে চির দিনই কৃষিকার্য্যের উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় বিদেশীরা কৃষিজাত সামগ্রীর উপর মাশুল বসাইলে ভারতীয় কৃষিজীবীর কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা সকলে একবার ভাবিয়া দেখুন। তাহা হইলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন চেম্বার্লেন সাহেবের নীতি অবলম্বিত হইলে ভারতের কিরূপ অনিষ্ট হইবে। যদি বুঝিতাম যে এই নীতির অবলম্বনে এখানকার শিল্পের উন্নতি হইবে তাহা হইলেও আমরা কতক পরিমাণে তাঁহার সেই নীতি অনুমোদন করিতে পারিতাম। কিন্তু তিনি ভারতবাসীকে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত হইতে দিতে চাহেন না, তাঁহাদিগের হস্তে তিনি চিরদিন লাঙ্গল রাখিতে চাহেন, তখন ভারত বাসীরা তাহার কৃষি জাত সামগ্রী অন্যস্থলে বিক্রয় না করিলে তাহাদিগের উদরান্নের সংস্থান হইবে কোথা হইতে? ইংলণ্ড ত আর সমুদয় কৃষিজাত সামগ্রী লইতে সমর্থ নহেন। চেম্বার্লেন সাহেব বলিতেছেন যে ভারতের তামাক কাফি চা ইত্যাদির মাশুলের হার হ্রাস করিয়া দিবেন তাহা হইলে সে ক্ষতি পূরণ হইবে। কিন্তু এব্যবস্থায় লাভ হইবে কাহার? চার ব্যবসা একমাত্র ইংরেজেরই একচেটিয়া। সুতরাং চা-র মাশুল হ্রাস করিয়া দিলে ইংরেজেরই লাভ। ভারতীয় কৃষকের ত তাহাতে লাভ নাই। তামাকের ব্যবসায় অতি অল্পই হইয়া থাকে। তমাক ও কাফিতে পুরা এক কোটি টাকার ব্যবসা হয় না, অতএব তদ্দ্বারা অন্যান্য ব্যবসায়ের ক্ষতি পূরণ হইবে কোথা হইতে? চেম্বার্লেন সাহেব আপনার দিকে পুরাকোল টানিতে চাহেন। ভারতের শিল্পও কাড়িয়া লইবেন, আবার তাহার কৃষিকর্ম্মেরও ক্ষতি করিবেন, সুতরাং তাঁহার নীতি অবলম্বিত হইলে ভারতের শিল্প বাণিজ্যের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে।

ইংরেজের অবাধ বাণিজ্য নীতি যদি অকপট ভাবে অনুসৃত হইত তাহা হইলে এদেশের শিল্পের ততদূর অনিষ্ট হইত না। তাঁহারা যদি ম্যাঞ্চেষ্টারের ইষ্টের জন্য এদেশজাত বস্ত্রের উপর মাশুল না লইতেন, তাহা হইলে ধীরে ধীরে এদেশের শিল্পের উন্নতি হইত। দেশজাত বস্ত্রের উপর মাশুল গ্রহণ করা অবাধ বাণিজ্য নীতির অনুমোদনীয় নহে। ইহা স্বার্থপর নীতি। এই স্বার্থপর নীতির জন্যই ভারতের শিল্প নষ্ট হইতেছে—অবাধ বাণিজ্য ইহার কারণ নহে।

শিল্পরক্ষার সদুপায়—

শিল্প-ব্যাঙ্ক।

২

কেবলমাত্র নির্দ্ধারিত মূলধন নিয়োগ করিয়া কোন ব্যবসায়ী আপনার কার্য্য পরিচালন করিতে পারেন না। হয় ত বাজার মন্দা পড়াতে তাঁহার কতক সামগ্রী বিক্রয় হইতে বিলম্ব হইল, হয় ত যাহাদিগকে তিনি মাল বিক্রয় করিয়াছেন, তাহারা যথাসময়ে তাহার মূল্য প্রদান করিতে পারিল না, এইরূপ একটা না একটা কারণে ব্যবসায়ী লোকের টাকা আটক পড়ে। অথচ মাল কিনিয়া চালান আবশ্যক, তাহা না করিলে বসিয়া থাকিতে হয়, তাহাতে একদিকে অকারণ কারবারের আয় অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া পড়ে অপর দিকে সম্ভ্রমেরও ক্ষতি হয়। এই দুইটী বিষয়েই ব্যবসায়ী লোকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। এই কারণে ব্যবসায়ী মাত্রকেই মধ্যে মধ্যে ঋণ করিতে হয়। আমাদের দেশে ব্যববসায়ীদিগের আবশ্যক মত ঋণ পাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় নাই। সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতেই তাহাদিগকে ঋণ লইতে হয়। এইরূপ ঋণ গ্রহণের অনেকগুলি অসুবিধা। তাহার মধ্যে প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে ঠিক আবশ্যক সময়ে ঋণ পাইবার নিশ্চয়তা নাই, তাহার পর ইহাতে সুদ অধিক লাগে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধা যে ঋণদাতার প্রয়োজন হইলেই উহা পরিশোধের জন্য পীড়াপীড়ি হয়। ইহা ব্যতীত আর অনেক অসুবিধা আছে তাহার মধ্যে একটা এই যে যাহা বন্ধক দিয়া ঋণ লইতে হয় তাহা অনেক সময়ে অন্যের টাকা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক মূল্যের না হইলে সে ঋণ পাওয়া যায় না। যেখানে এতগুলি অসুবিধা সেখানে কারবারের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। এদেশে অনেক লোক কারবারে নিযুক্ত হইয়া শেষে নানা প্রকার ক্ষতি সহ্য করিয়া যে কারবার গুটাইয়া বসেন, এই সকল অসুবিধাই অনেক সময় তাহার কারণ।

এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের জন্যই ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। গ্রেটব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাজ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ের যে অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাই তাহার প্রধান কারণ। এদেশে মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে এই ব্যাঙ্কের প্রণালীতে ব্যবসায়ীদিগকে ঋণ দিবার ব্যবস্থা আছে বলিয়া তাহারা ব্যবসায়ে যারপরনাই উন্নতিলাভ করিয়াছে। সওকার বা মহাজনেরা স্বতন্ত্রভাবে যাহা করেন, সম্মিলিতভাবে একটি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ব্যাঙ্ক তাহাই করিয়া থাকেন। সকল ব্যাঙ্কই যে যৌথ কারবার তাহা নহে। রথচাইল্ড বা ব্যারিং ব্রাদার্সদিগের কারবারে ইদানী একাধিক অংশীদার দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় উহা একজনের কারবার ছিল। নিয়ম মত টাকা ঋণ দেওয়া ও গচ্ছিত রাখাই এই কারবারের উদ্দেশ্য। যাহাদিগের আপন আপন টাকা খাটাইবার জ্ঞান নাই বা অন্য কোন কারণে সুবিধা ও সময় নাই, যাহাতে তাহারা একস্থানে টাকা গচ্ছিত রাখিয়া সুদ পাইতে পারে এবং যাহারা টাকার অভাবে কারবার করিতে অসমর্থ তাহারা যাহাতে ঋণ পাইতে পারে ইহাই ব্যাঙ্কের মূল উদ্দেশ্য। তাহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক অন্যরূপ টাকার কারবারও করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথা পরে উল্লেখ করা যাইবে।

য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা কিরূপে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া আপনাদিগের কারবার চালাইয়া লাভবান হইয়া থাকেন আমরা ইতিপূর্ব্বে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে এক প্রকার বিবৃত করিয়াছি। উপরে যে কয়েকটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্যাঙ্কের দ্বারা তাহা দূর হয় বলিয়াই ঐ সকল কারবারীকে কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। প্রথমতঃ টাকা ঋণ দেওয়াই ব্যাঙ্কের কারবার সুতরাং ব্যবসায়ীদিগের যখনই ঋণের আবশ্যক হয় তখনই তাঁহারা তথায় টাকা পাইতে পারেন। তাহার পর তাঁহারা অনবরত লেন দেন করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগের সুদের একটা নির্দ্ধারিত হার আছে, লোকের দরকারের গুরুত্ব বুঝিয়া সুদের হারের ইতর বিশেষ করা হয় না। কেবলমাত্র বাজারের চাহিদা (Demand) অনুসারে অথবা ব্যাঙ্কের হাতের টাকার পরিমাণানুসারে সেই সুদের হ্রাস বৃদ্ধি

হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত মহাজন অপেক্ষা সে হার যে অনেক কম তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এদেশের অনেক সম্ভ্রমশালী কারবারীকে সময়ে সময়ে আমরা চোটা প্রথাতে টাকা ঋণ লইতে দেখিয়াছি। এই প্রথাতে অনেক সময়ে বার্ষিক শতকরা শত টাকা সুদ লাগিয়া থাকে। যাঁহারা এই চোটা সুদে টাকা দেন তাঁহারা কদাচ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লওয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা এই যে কারবারী আপনার সুবিধামত উহা পরিশোধ করিতে পারেন। ইহাতে ছয় মাসের জন্য টাকা প্রয়োজন হইলে এক বৎসরের সুদ গণিতে হয় না, অথবা মহাজনের প্রয়োজন মত অন্যত্র হইতে ঋণ করিয়া সদ্য সদ্য পরিশোধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না। কেহ যদি নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ করেন এবং যথাসময়ে তাহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে নূতন করিয়া খতে সহি করিলেই মুদ্দত বা নির্দ্ধারিত সময় বৃদ্ধি করা যায়। ইহাতে দেখা যাইতেছে আমাদের দেশের কারবারের উন্নতির জন্য য়ুরোপীয় প্রথায় ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত না হইলে কোন কারবারেরই উন্নতি হইবে না। পূর্ব্বে শিল্পের উন্নতির জন্য যেরূপ প্রণালীতে ব্যাঙ্কের কার্য্য করা আবশ্যক বলিয়াছি ব্যবসায়ীদিগের সাহায্যের জন্য অবস্থানুসারে প্রায় সেই প্রণালী অনুসৃত হইতে পারে। কিন্তু প্রথমে এবিষয়ে কতকগুলি দেশহিতৈষী উদ্যোগশীল অথবা বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এদেশের লোক যতদিন কোন একটা কারবারের লাভ দেখিতে না পায়, ততদিন সে দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু একবার কোন ব্যক্তি বা সমিতিকে কোন কারবারে লাভবান দেখিলে অমনি সকলে সেই কারবার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় কয়টা পোষাক পরিচ্ছদের দোকান ছিল। যোড়াসাঁকোর, মজুমদার কোম্পানীই ইহার পথ প্রদর্শক। তাহার পর মল্লিক ব্রাদার্ তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ক্রমে কলিকাতা সহর পোষাকের দোকানে ছাইয়া পড়িয়াছে। মফস্বলের সহরগুলিও উহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বদেশজাত কাপড়, বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য দশ বৎসর পূর্ব্বে একখানা দোকান ছিল কি না সন্দেহ, এখন সহরের অনেক অংশেই এরূপ দোকান দেখা যায়। অন্য কথা দূরে থাকুক দেড় বৎসর দুই বৎসরের মধ্যে গ্রামোফোনের দোকান কত বৃদ্ধি হইয়াছে। সেইরূপ ব্যাঙ্কের ধুয়াটা যদি একবার উঠে তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এদিকেও যে লোকে অগ্রসর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য একার্য্যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত, বিচক্ষণ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির আবশ্যক, কিন্তু এরূপ লোকের অভাব নাই ইহা আমরা জানি। সাধারণ লোকের একবার প্রতীতি জন্মিলে ও লাভ বুঝিলে অর্থের অভাব হইবে না। কিন্তু প্রথমে প্রবর্ত্তনা করাই গুরুতর ব্যাপার।

ব্যাঙ্কের কার্য্য অনেকবিধ। কেবল যে টাকা গচ্ছিত রাখা ও ঋণ দান করা তাহা নহে। এ দুইটি কার্য্য ছাড়া স্থানান্তরে টাকা পাঠান, হুণ্ডি ভাঙ্গান, ও হুণ্ডি আদায় করা, গচ্ছিত টাকায় কারবার করা ইত্যাদি অনেক কার্য্য এই ব্যাঙ্কের কার্য্যের অন্তর্গত। কিন্তু প্রথমাবস্থায় কেবল সুদি কারবারে অর্থাৎ ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোককে ঋণ দান ও গচ্ছিত গ্রহণ এই দুইটিতে মনোযোগ দিলে অধিক দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে হইবে না। ক্রমে যতই উন্নতি হইতে থাকিবে ততই অন্যান্য বিভাগে মনোযোগ দিলেই চলিবে।

ইংলণ্ড ও মার্কিনে ব্যাঙ্ক সকল দ্বিবিধ প্রথায় ব্যবসায়ীদিগকে ঋণ দান করিয়া থাকেন, (১) ব্যবসায়ী বা অন্য খাতকের নিকট হইতে কোন মূল্যবান সামগ্রী বা সম্পত্তি দলিল রাখিয়া তাহার মূল্যের পরিমাণ অনুসারে কিছু টাকা হাতে রাখিয়া ঋণ দান করেন। (২) ঋণ গৃহীতার নিজের জামিনীতে অথবা তাহার পক্ষে দুইজন লোকের জামিন লইয়া যে রূপ টাকা প্রয়োজন হয় তাহ তাহার আবশ্যক মত প্রদান করেন ও সুবিধামত পরিশোধ লন। এই রূপে কারবারীরা অনায়াসে আপনাদিগের কারবার চালাইতে সমর্থ হয় ও ব্যাঙ্কও লাভ করিতে থাকেন। উক্ত প্রথাতেই দেশের ধন বৃদ্ধি হয় ও সরকারী চাকুরীর প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইয়া থাকে। এই জন্যই বলিতেছি যে যতদিনে আমাদের দেশের লোক দেশের ব্যবসায়ী দিগকে অর্থ সাহায্য করি-

বাব অত ব্যাঙ্ক স্থাপনে উদ্যোগী না হইবেন, ততদিন এদেশের লোকের কারবারে অনুরাগ হইবে না, অর্থাভাবের জন্য ও প্রয়োজন কালে ঋণ লাভের অসুবিধার জন্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে সকলেই সঙ্কুচিত হইবে। মাড়োয়ারীরা দেশ হইতে এক পয়সা মূলধন আনে না। কিন্তু তাহাদিগের স্বদেশীয় স্রফ (Shroff) বা ব্যাঙ্ক ওয়ালাগণ অর্থ দিয়া সাহায্য করেন বলিয়া অল্প দিন মধ্যে এক একজন সামান্যাবস্থাপন্ন লোক লক্ষ পতি হইয়া থাকেন, ইহা প্রতিদিন চক্ষের উপর দেখা যাইতেছে। এই জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা যদি শিক্ষা না করি তাহা হইলে আমাদিগের কোন কালে উন্নতি হইবে না।

কলার আঁশ।

(প্রশ্নোত্তর)

কলাগাছের আঁশ ও কলার চাস সম্বন্ধে কমলাতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া অনেকে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে আমাদিগকে নানা জনে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সেই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র প্রত্যুত্তর করা অপেক্ষা কমলাতে প্রকাশ করা শ্রেয়স্কর বিবেচনায় আমরা তাহাই করিলাম। এতদ্দ্বারা অন্যান্য পাঠকেরও উপকার হইতে পারিবে। আমাদিগের নিকট যে সকল প্রশ্ন আসিয়াছে তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

১। কলার চাসের জন্য কিরূপ ভূমির প্রয়োজন।

২। এই চাষ সম্বন্ধে বিশেষ কোন পুস্তক আছে কিনা?

৩। আঁশ বাহির করিবার জন্য কোন কল আছে কি না এবং তাহার মূল্য কত।

৪। সূতা বাহির হইলে তাহা বিক্রয় হইবে কোথায় এবং কিরূপ।

৫। কত জমী লইয়া আবাদ আরম্ভ করিতে হইবে এবং সে জন্য কিরূপ মূল ধনের প্রয়োজন।

কেহ কেহ আবার কোথায় কিরূপে কলা তিন পোয়া বা এক সের উজ্জ্বল পরিষ্কৃত বিক্রয় করিবেন এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, যাহা হউক আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে উপরি লিখিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর ৯ম সংখ্যক কমলাতে "কলার চাষ" শীর্ষক প্রবন্ধে পাইবেন। কলার চাষ সম্বন্ধে আমরা কোন পুস্তক দেখি নাই এবং সে জন্য পুস্তকের আবশ্যকও তত নাই। নিম্নবঙ্গের সর্ব্বত্রই কলার চাষ আছে, সুতরাং সকলেই ইহাতে অভিজ্ঞ। তবে আঁশ বাহির করাটা শিক্ষা করা আবশ্যক। ২য় সংখ্যক কমলাতে আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃত করিয়া সকল কথা লিখিয়াছি। তাহা পাঠ করিয়া যদি কেহ আপনাপনি আঁশ বাহির করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি ত্রিবাঙ্কুরে গিয়া এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতে পারেন। তথায় কলার আঁশ বাহির করিবার জন্য একটি কল প্রস্তুত হইয়াছে, সম্প্রতি পুষার আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষা হইতেছে। ইহার মূল্য কত তাহা আমরা জানি না, যাঁহারা এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে অভিলাষী তাঁহারা ত্রিবাঙ্কুর বা পুষরি এ বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে পারেন। তবে কলিকাতার Eastern Landing clearing and Forwarding Company মুগার সূতা বাহির করিবার জন্য যে কল আমদানী করিয়াছেন, তাহাতে কলার আঁশ ও বাহির হয়। এই কলের মূল্য তিন শত টাকা।

সকলেই জানেন যে কলা ফলিলে ও তাহা পরিপক্ক হইলে গাছ কাটিয়া ফেলা হয় এবং তাহা হয় গরুর আহারে পর্য্যবসিত হয় অথবা পড়িয়া নষ্ট হয়। কলার বাগান রীতিমত আবাদ করিলে তাহার ফল বিক্রয় দ্বারাই বিশেষ লাভ পাওয়া যাইতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে প্রথম বাগান তৈয়ারীর পর প্রায় তৃতীয় বৎসর হইতেই ফল বিক্রয় দ্বারা লাভ হয়। এক্ষণে যে সকল গাছ ফল পাকা হইলে কাটা হয়, তাহার আঁশ বাহির করিয়া বিক্রয় করিলে আরও অধিক লাভ হইবে। এই আঁশ বিলাতে বিক্রয় হইয়া থাকে এবং তথায় প্রতি টন (এক টন ২৭ মণ) ২৫ পাউণ্ড হইতে ৩৫ পাউণ্ড দরে পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক কলা গাছের গড়ে ওজন প্রায় দেড় মণ হইতে এক মণ পঁচিশ সের। এইরূপ প্রত্যেক গাছ হইতে

পযোগী আঁশ বাহির হয়। যে কোন মজুর সপ্তাহ কালের মধ্যে এই আঁশ বাহির করার প্রণালী শিখিতে পারিবে এবং সে দিন আটটি করিয়া গাছ হইতে আঁশ বাহির করিবে। এই মজুরের রোজ চারি আনা হইতে সাড়ে পাঁচ আনার অধিক হইবে না। তাহা হইলে এক টন আঁশ বাহির করিতে টন প্রতি ৫৫ টাকার অধিক ব্যয় পড়িবে না। তাহার পর উহা বিলাতে পাঠাইতে জাহাজ ভাড়া দালালী ও অন্যান্য খরচায় টন প্রতি ৩৫ টাকা খরচ হইতে পারে। ইহাতে এক টন কলার আঁশের বিলাতে ৯০ টাকা পড়তা হইবে। তাহা হইলে কম লাভ হইলেও একটন আঁশে ২৮৫ টাকা লাভ হইতে পারে। দেশের এই বর্ত্তমান দারিদ্র্যের দিনে এই লাভ উপেক্ষণীয় নহে। এখানে বলা আবশ্যক তিন বিঘা জমীর আবাদ হইতে এক টন বা ২৭ মণ পরিমান আঁশ পাওয়া যাইতে পারে। এই হিসাবে যিনি যেরূপ পারেন তিনি সেইরূপ আবাদ করিতে পারেন। তবে রীতিমত কারবার করিতে হইলে অধিক জমা লইয়াই আবাদ করা ভাল। নিম্নবঙ্গের সর্ব্বত্র এক বন্দে দুই তিন হাজার বিঘা আবাদের উপযোগী জমী পাওয়া যায় না। সেরূপ পাওয়া গেলে যাঁহাদিগের ক্ষমতা আছে তাঁহারা সেইরূপ অধিক জমী লইয়া আবাদ করিলে ভাল হয়। তাহার অভাবে খণ্ড খণ্ড বাগান করিলেও চলে। কিন্তু যাঁহারা তত দূরও করিতে পারিবেন না তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কলা বাগানের মালিক দিগের নিকট অল্প মূল্যে গাছ ক্রয় করিয়া তাহা হইতে আঁশ বাহির করিয়া বিক্রয় করিতে পারেন। এ দেশের অনেক বাগানের মালিক আহ্লাদের সহিত যে অল্পমূল্যে গাছ বিক্রয় করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই কেন না এক্ষণে ঐ সকল গাছ হইতে তাঁহারা কোন উপকারই পান না। পূর্ব্বে কলার বাসনা জ্বালাইয়া ধোপারা ক্ষার প্রস্তুত করিত ও তদ্দারা কাপড় ধোলাই করিত, কিন্তু এক্ষণে সাবান সস্তা হওয়াতে আর সেরূপ করে না। সুতরাং কলা গাছ হইতে কোন লাভই পাওয়া যায় না। তবে এ কথা বলা প্রয়োজন, এইরূপে গাছ সংগ্রহ করাতে একটু অসুবিধাও আছে আর ব্যয়ও আছে। ভিন্ন ভিন্ন বাগান হইতে একটি ঘটিতে গাছ বহিয়া আনিতে অতিরিক্ত গাড়ী ভাড়া যা জুটে ভাড়া লাগিবে। নিজের বাগান হইলে যেমন গাছ গুলি কিনিতে হইবে না, সেইরূপ বহনী খরচও পড়িবে না।

যেরূপে কলা গাছের আঁশ বাহির ও তাহা বিক্রয় করিবার কথা বলা গেল, তাহাতে যিনি যেরূপ সমর্থ তিনি সেইরূপ মূল ধন নিয়োগ করিতে পারেন। দুই এক হাজার মূল ধনেও এই কারবার চলিতে পারে, আর দশ বিশ হাজার সংগ্রহ করিয়া করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। কিন্তু যাঁহাদের পুঁজি অল্প এবং যাঁহারা প্রথম কারবার করিবেন তাঁহারা একেবারে আবাদ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বাগান হইতে গাছ কিনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। তৎপরে ফলাফল দেখিয়া কার্য্য করিবেন।

আঁশ এখানে কোথায় বিক্রয় হয় এরূপ আমরা শুনি নাই। কিন্তু এখানে অনেক এজেন্সী আপিস আছে তাঁহারা উহা বিলাতে যথাস্থানে বিক্রয়ার্থ পৌঁছাইয়া দিতে পারেন অথবা বিলাতে যাঁহারা পাট প্রভৃতি বিবিধ সূত্রের দালালী করেন একা এক তাঁহাদিগের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

একজন আমাদিগকে লিখিয়াছেন কলা বিক্রয়ের কিরূপ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। এবিষয়ে এদেশে সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে। সাধারণতঃ কলার ব্যবসায়ীরা বাগানের মালিকের কাছে আপনারা গিয়াই কলা ক্রয় করিয়া আনেন। অবশ্য এরূপ বিক্রয়ে লাভ অল্প হয়। কিন্তু এস্থলে মনে রাখা উচিত কারবারের সমস্ত লাভ নিজে খাইব মনে করিলে কারবার হয় না। সেরূপ করিতে গেলে কারবারের অনেক ঝঞ্চাট নিজে লইতে হয় এবং তাহাতে হয়ত অন্য দিকে ক্ষতি ভোগ করিতে হয়। এই জন্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরা দালাল এজেণ্ট প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া কারবার চালাও করিয়া থাকেন। এদেশে বৈদ্যবাটি প্রভৃতি কয়েকটি হাটে সচরাচর কলা বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু দেশে কলার আবাদ যদি অধিক হয় তাহা হইলে বিক্রয়ের ক্ষেত্রও বাড়াইতে হইবে। অতএব দেশের যে সকল স্থলে কলা পাওয়া যায় না, সেই সকল স্থলে কলা চালান দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অধিক লাভ হইতে পারে। ইংরেজেরা জাহাজে বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ার টাটকা

আঙ্গুর খাইতে পান, আর আমরা কাশীতে গিয়া বর্দ্ধমান, চাঁপার আবাদ লইতে পাই না। তাই বলিতেছি বর্দ্ধমানের ওদিকে যে কোন স্থানে কলা চালান দিলে লাভ হইতে পারে। এ কথা পূর্ব্বেও একবার কমলাতে বিবৃত হইয়াছে।

দেশী তার্পিণ।

এদেশে যে পরিমাণ তার্পিণ তৈল ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতেই আমদানী হইয়া থাকে। অতি অল্প কাল হইল, সরকারী জঙ্গল মহলে তার্পিণ প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহা এদেশের বাজারে বিক্রয় হইতেছে। হিমালয় প্রদেশের এক জাতীয় দেবদারু গাছের নির্য্যাস হইতে কিরূপে তার্পিণ, ধুনা ও রজন প্রস্তুত হয় আমরা তাহা ৮ম সংখ্যক কমলাতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। সাধারণ লোকে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগের কারখানা তুলিয়া দিতে যে প্রস্তুত আছেন, একথাও আমরা সেই উপলক্ষে পাঠকদিগকে বিদিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই কারবারের ভবিষ্যৎ আরও আশাজনক বিবেচিত হওয়াতে আমরা পুনরায় এবিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে অগ্রসর হইয়াছি।

একখানি বিলাতী বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকায় দেখা গেল যে আমেরিকার তার্পিণ ব্যবসায়ীরা একপ্রকার ধর্ম্মঘট করিয়াছেন যে, তাঁহারা এতাবৎ যে পরিমাণ তার্পিণ তৈয়ার করিতেন, তাহা আর করিবেন না। আগামী বৎসরে শতকরা ১০ ভাগ পরিমাণ তার্পিণ কম উৎপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। দেবদারু গাছের মূল্য বৃদ্ধি ও শ্রমজীবী দিগের মজুরীর হার বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবল তার্পিণের মূল্য বৃদ্ধি হইবে তাহা নহে, যে পরিমাণ তার্পিণের প্রয়োজন তাহা সরবরাহ হওয়াও কতক পরিমাণে অসম্ভব হইবে। যাঁহারা তার্পিণ দ্বারা নানা প্রকার রং প্রস্তুত করেন এবং অন্যান্য কার্য্যের জন্য তার্পিণ ব্যবহার করেন, মার্কিণ কারখানা ওয়ালাদিগের এই ধর্ম্মঘটের কথা শুনিয়া তাঁহারা বড়ই চিন্তাকুল হইয়াছেন। তার্পিণের পরিবর্ত্তে অন্য কোন রূপ তৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না সে বিষয়ে তাঁহারা নানা অনুসন্ধান করিতেছেন। এদিকে ইংলণ্ডে ও অন্যত্র তার্পিণ তৈলের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এই ঘটনা হইতে ভারতের বিশেষ মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে। এদেশে তার্পিণ তৈয়ার করিবার ব্যবসায় আর পরীক্ষাধীন নহে। গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর নিজ তত্ত্বাবধানে তার্পিণ তৈয়ার করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ লোকে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারেন এবং তদ্দ্বারা একটি নূতন আয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারেন।

বন বিভাগের কার্য্যে শিক্ষা প্রদানের জন্য দেরাদুনে Imperial Forest School নামে যে বিদ্যালয় আছে ১৮৮৮ সালে তথায় তার্পিণ চোলাই করিবার জন্য একটি কারখানা সংস্থাপিত করা হয়। জৌনসর ও তিহরী গাড়ওয়ালের জঙ্গলের দেবদারু গাছ সমূহের নির্য্যাস বাহির করিয়া তথায় চোলাই করিবার বন্দোবস্ত করা হয়। বর্ষা ঋতুর অবসান হইলেই ঐ সকল গাছের নিম্নদেশ ছিদ্র করিয়া তাহা হইতে নলের দ্বারা কতকগুলি পাত্রে নির্য্যাস সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কুমায়ূন প্রদেশের জঙ্গলে ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগেই গাছ সকল ছিদ্র করিতে আরম্ভ করা হয়। তথায় সূর্য্যের তেজ যতই প্রখর হইতে থাকে, ততই দেবদারু হইতে অধিক নির্য্যাস নির্গত হইতে থাকে। এমন কি আষাঢ় মাসেই অধিক পরিমাণে রস বাহির হইয়া থাকে। দেরাদুনের কারখানা জঙ্গল হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া ঐ সমস্ত নির্য্যাস আনয়নে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। কোন কোন জঙ্গল কারখানা হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূর। এই জন্য ঐ সমস্ত নির্য্যাস গাড়ী বা গো-মহিষাদির পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া কারখানায় আনয়ন করিতে হয়। প্রায় সমস্ত বৎসরই এই সমস্ত নির্য্যাস চোলাই করা হইয়া থাকে। দশ মণ পরিমাণ নির্য্যাস চোলাই করা যাইতে পারে এইরূপ পাঁচটি তামার ডেকচিতে উহা জাল দেওয়া হয়। ১৯০০-০১ সালে তথায় ১৭০১ মণ চোলাই করা হইয়াছিল। ১৯০১-০২ সালে ১৫২৮ মণ এবং ১৯০২-০৩ সালে

১৬০২ মণ চোলাই করা হয়। এইরূপ চোলাই দ্বারা শতকরা ৭২ হইতে ৭৭ ভাগ ধুনা ও ১৪ হইতে ১৮ ভাগ তার্পিণ তৈল বাহির হইয়া থাকে। তিন বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেরাদূনের কারখানাতে বেশ লাভ হইতেছিল, কিন্তু গত দুই বৎসর ধুনার বাজার ৫৶০ হইতে ২।৶ আনার নামিয়া যাওয়াতে কিছু ক্ষতি হইতেছে। বন বিভাগের অধ্যক্ষ ১৯০২-০৩ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ কারখানা সংস্থাপনের প্রারম্ভ হইতে একটা হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দেখা গেল এই কয়েক বৎসরে ৭৯,৪১৭ টাকা আয় হইয়াছে। এবং মূলধন ও অন্যান্য হিসাবে ৮১,০৩৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কারখানার বাড়ী, যন্ত্রাদি ও অন্যান্য সরঞ্জামের মূল্য ১৫,২৫২ টাকা ধরা হইয়াছে। তাহা হইলে ইহাতে ১৩,৬৩৬ টাকা লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

১৮৯০ সালে গবর্ণমেণ্ট নৈনিতালে একটি তার্পিণের কারখানা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এ স্থান রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী অথচ জঙ্গল মহল হইতেও বহুদূরে অবস্থিত নহে সুতরাং অনেক বিষয়ে সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৯০০-১০ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে এখানে তার্পিণ ও ধুনা তৈয়ার করাতে বেশ লাভ হইয়াছিল। বিদেশের আমদানী জিনিসের সমান মূল্যে এখানকার উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয় হইয়াছিল এবং সে জন্য কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ঐ বৎসর ২২,২৬৭ গাছ হইতে রস বাহির করা হয় তাহাতে ১৪৫৪ মণ নির্য্যাস বাহির হয় অর্থাৎ প্রতি গাছে দুই সের নয় ছটাকের কিঞ্চিদধিক পরিমাণ নির্য্যাস পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে ১৬২৫ গ্যালন তার্পিণ এবং ৮১৭ মণ ধুনা উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে সম্বৎসরে ৫৭৬৫ টাকা লাভ হইয়াছিল। পর বৎসর ইহা অপেক্ষাও সুফল লাভ হইয়াছিল। দ্বিগুণ নির্য্যাস চোলাই করা যাইতে পারে এরূপ একটি নূতন ভাঁটি তৈয়ার করা হইয়াছিল এবং অন্যান্য বিষয়েও কারখানার উন্নতিসাধন করা হইয়াছিল। ঐ বৎসর ৩৮,৬৩২টি গাছে রস পাতা হইয়াছিল তাহাতে ২৭১১ মণ নির্য্যাস পাওয়া যায় অর্থাৎ গাছ প্রতি পৌনে তিন সেরের অধিক নির্য্যাস বাহির হয়। ইহাতে ২২০৪ গ্যালন তার্পিণ এবং ১০৮৪ মণ ধুনা পাওয়া গিয়াছিল, সুতরাং লাভও বিলক্ষণ হইয়াছিল। এইরূপে এখানকার তার্পিণ ও ধুনা উভয়েরই কাটতি অধিক হওয়াতে এবং গ্রাহকেরা উহার আদর করাতে ১৯০২-০৩ সালে আরও অধিক মাল তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করা হয়। সে বৎসর ৪২৯৭৯টি গাছে রস পাতা হয়, তাহাতে ২৯,৮৮৯ মণ অর্থাৎ গাছ প্রতি পৌনে তিন সেরের হিসাবেই রস পাওয়া যায়। ইহাতে ৪৪৬৭ টাকা লাভ হয়। এ বৎসর ধুনার মূল্য ৫৲ টাকা মণ হইতে ২৸০ মণ কমিয়া যায়। ইহাতেও যে এইরূপ লাভ হইয়াছে তাহা যারপরনাই সন্তোষজনক বলিতে হইবে। অতঃপর ধুনার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, এক্ষণে প্রায় ৪ টাকা করিয়া মণ দরে উহা বিক্রয় হইতেছে, সুতরাং এই কারখানার যে আরও উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পঞ্জাবের কাংড়া বিভাগের অধীন নূরপুর সরকারের আর একটি তার্পিণের কারখানা আছে। যে পরিমাণ জঙ্গল এই কারখানার নিকটবর্ত্তী তাহাতে ১০,০০০ মণ নির্য্যাস সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে ১৫ হাজার গ্যালন তার্পিণ ও সাড়ে সাত হাজার মণ ধুনা উৎপন্ন হইতে পারে। যাহাতে সুলভে এই তার্পিণ অন্যত্র চালান দেওয়া যাইতে পারে সে জন্য রেলওয়ে কোম্পানীরা ভাড়ার হার হ্রাস করিয়াছেন, সুতরাং বিদেশের আমদানী তার্পিণের সহিত এই দেশী তার্পিণ প্রতিযোগিতা করিতে অনায়াসে সমর্থ হইবে। এই সকল বিবরণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমাবধি এই তার্পিণের ব্যবসায়ে লাভ হইয়াছে এবং কি তার্পিণ কি ধুনা কিছুই বিক্রয় করিতে অধ্যক্ষদিগকে কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হয় নাই। আমরা শুনিলাম যে প্রায় ৩০০০ মণ ধুনা কারখানাতেই বিক্রয় হইয়াছে। গত বৎসর একজন গ্রাহক সমস্ত ধুনা ৩।৶০ মণ দরে লইবার জন্য স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই সকল সুবিধা দেখিয়াও কি এদেশের লোক এইরূপ একটি লাভজনক কারবারে নিযুক্ত হইতে যত্ন করিবেন না?

এক্ষণে সরকারের সমস্ত ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়ে এবং সামরিক বিভাগে দেশী তার্পিণ ব্যবহৃত

হইতেছে। কয়েকটি রেলওয়ে এবং রংয়ের ও বার্নিসের কারখানাও দেশী তার্পিণে কাজ করিতেছেন। এই তৈল রসায়নিক পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাহার ফল সন্তোষজনক বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক আর্মস্ট্রং ও ডাক্তার বর্ষ্টার্টর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাসায়নিকেরা ইহা য়ুরোপ বা মার্কিণের তার্পিণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত একটী প্রসিদ্ধ সাবানের কারখানায় ও একটি বার্নিসের কারখানায় এখানকার রজন লইয়া কাজ করিতেছে। ক্রমে এদেশের গালার কারখানাসমূহে ও কাগজের কুলে যে এদেশজাত রজন ব্যবহৃত হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে আশা করা যাইতে পারে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই আমরা এদেশের ধনীদিগকে এই কারবারের প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। কোন কোন য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী এই সকল অবস্থার আলোচনা করিয়া আপনাদিগের মধ্যে ইহার একটি যৌথ কারবার সংস্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন। সুতরাং অচির কাল মধ্যে যে এই কারবার সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপীয়দিগের আয়ত্তাধীন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব সময় থাকিতে যদি এদেশের লোক সতর্ক হন তাহা হইলে দেশের কতকটা ধন রক্ষা করিতে সমর্থ হন। অবশ্য একার্য্য পরিচালনের জন্য কতকগুলি কৃতকর্ম্মা লোকের আবশ্যক। কিন্তু অর্থের সংগ্রহ হইলে সে জন্য কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। দেরাদুন নৈনিতাল বা সুরপুরের কারখানায় যে কৃতকর্ম্মা রাসায়নিক আছেন তাহা বোধ হয় না। সাধারণ লোকের সাহায্যেই এই সকল কারখানা পরিচালিত হইতেছে। সেখানে যাহারা কার্য্য শিখিয়াছে তাহাদিগকেও অতি সহজেই নিযুক্ত করিতে পারা যায়। ঘোড়া হইলে চাবুকের জন্য ভাবিতে হয় না। প্রয়োজন কেবল উদ্যোগের। আমাদের মধ্যে কি এরূপ উদ্যোগী পুরুষ কেহই নাই। সরকার যে এই কারখানা অন্য লোকের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন তাহা যুক্তপ্রদেশের বনবিভাগের রিপোর্ট সম্বন্ধে তথাকার রাজস্ব সেক্রেটরীর মন্তব্য পাঠে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। উক্ত মন্তব্যে উল্লিখিত হইয়াছে :—

The Government of India have watched with considerable interest, the progress made during the past few years in the manufacture of Turpentine in the Jaunsar and Nainital Divisions. The industry has now apparently reached successful commercial stage, and the local Government might with advantage consider what steps can be taken with a view to its extension and whether it might not be more profitably conducted by private enterprise.

আমাদিগের দেশবাসীগণ কি এরূপ সুযোগ ছাড়িয়া দিবেন ?

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

ম্যালেরিয়া কীটাণু।

ম্যালেরিয়া কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা বহু দিবস পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে (Leveran) লেভেরান্ নামক জনৈক ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন যে, ম্যালেরিয়া পীড়িত, ব্যক্তির শোণিতের প্রধান উপাদান লোহিত কণিকার মধ্যে, এক প্রকার কীটাণু দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক এদেশে আসিয়া বহু যত্ন সহকারে এই কীটাণুর তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া বহুবিধ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এক্ষণে এই কীটাণু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত থাকিলেও এদেশে অনেকেরই নিকট সম্পূর্ণরূপে অবিদিত।

বলা বাহুল্য, ম্যালেরিয়া কীটাণু পরান্নপুষ্ট, অর্থাৎ ইহা অন্যের শরীর মধ্যে বাস করিয়া ও phase কারণ এই অবস্থায় ইহা মনুষ্যশরীর মধ্যে বাস করে। দ্বিতীয় অবস্থার নাম Extra-corporeal phase কারণ এই অবস্থায় ইহা নরদেহের বাহিরে অবস্থিতি করে। ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণাদির দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, যে ম্যালেরিয়া কীটাণু আর এক অবস্থায় মানুষের শরীরে বাস করে; সেই অবস্থার নাম Latent phase বা গুপ্ত অবস্থা।

প্রথম অবস্থা (Intracorporeal phase)।—এই অবস্থায় ম্যালেরিয়া কীটাণু মানুষের শরীরের মধ্যে বাস করে। দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ম্যালেরিয়া কীটাণুকে অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিলে, ইহাতে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এই কীটাণু রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে একটী অপেক্ষাকৃত মলিন এবং অস্পষ্ট গোলাকার পদার্থের ন্যায় দৃষ্ট হয় (চিত্র খ)।



খাদ্য শোষণ করিয়া আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহার জীবনযাত্রা দুই অবস্থায় (Phases) বিভক্ত; প্রথম অবস্থার নাম Intracorporeal কিছুক্ষণ পরে তাহার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ রেণু উৎপন্ন হয়; এই রেণুগুলি (pigments) প্রথমে বিশৃঙ্খলভাবে কীটাণু মধ্যে বিকীর্ণ থাকে; কিন্তু অল্পক্ষ

পরেই ইহারা একত্রিত হইয়া কতকগুলি গুচ্ছ নির্ম্মাণ করে (চিত্র, ষ); অবশেষে এই রেণু-গুচ্ছগুলি একত্রিত হইয়া কীটাণুর মধ্যস্থলে আসিয়া অবস্থিতি করিতে থাকে (চিত্র ম,)। কীটাণুর মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম রেখা দৃষ্ট হয় (চিত্র ভ) এবং এই রেখাগুলি পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া কীটাণুর দেহটীকে কতকগুলি গোলাকার খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলে (চিত্র ব)। এই সকল খণ্ডকে Spore বা গুটিকা কহে, এই প্রক্রিয়ার নাম Sporulation। এই গুটিকা-গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় এবং লোহিত কণিকাকে ধ্বংশ করিয়া শোণিত রসে ভাসিতে থাকে (চিত্র, ফ)। রেণুগুলি কোন গুটিকার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া শোণিত রসে (Plasma) পতিত হয়। গুটিকাগুলির অধিকাংশ শ্বেত কণিকা (White blood corpuscle) কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেও কতকগুলি পুনরায় অন্য লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে এবং পূর্ব্ববর্ণিত রূপে তথায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। (চিত্র, ক) একটী সুস্থ লাল কণিকা, উহা গুটিকাদ্বারা আক্রান্ত হইতেছে রেণুগুলিও শ্বেত-কণিকা দ্বারা ভক্ষিত হয়।

এক্ষণে কীটাণুর গঠনবিধি সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা উচিত। কীটাণুর শরীরের উপাদানকে জৈবনিক (Protoplasm) কহে। জৈবনিকের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র গোলাকার পদার্থ আছে তাহার নাম নাভি (Neucleus)। এই নাভির মধ্যে আর একটী ক্ষুদ্রতর পদার্থ আছে; তাহাকে নাভিক (Neucleolus) কহে। গুটিকা লাল কণিকার মধ্যে প্রবেশ করিবার পর ইহার নাভি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর হয় এবং অধিকতর স্পষ্ট দেখায়; ইহার সহিত জৈবনিকের আয়তনেরও বৃদ্ধি হয় এবং নাভিক নাভির এক পার্শ্বে গমন করে এবং নাভি ও জৈবনিকের মধ্যভাগ হইতে ক্রমে পার্শ্বদেশে গমন করে। এই সময়ে কীটাণুটীকে ঠিক অঙ্গুরির ন্যায় দেখায়; পরে কীটাণুটী লোহিত কণিকামধ্যে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে নাভিকও আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অস্পষ্ট এবং অবশেষে অদৃশ্য হইয়া যায়। গুটিকা উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও নাভি এবং নাভিক এই উভয়েরই কোন চিহ্ন দেখা যায় না; পরে, বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ জৈবনিক মধ্যে বিস্তৃত হয় এবং পরে প্রত্যেক খণ্ডের চতুর্দ্দিকে জৈবনিক বিন্যস্ত হইলে প্রত্যেক খণ্ড এক একটী গুটিকাতে পরিণত হয়।

গুপ্তাবস্থা—পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ম্যালেরিয়া জ্বরের আরোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার কীটাণু রক্ত হইতে অদৃশ্য হয়; এই অদৃশ্যতা আপনাআপনি হইয়া থাকে, অথবা ইহা কেবল কুইনিন সেবনের ফলমাত্র। অনেক সময়ে এই অদৃশ্যতা কিছুদিনের জন্য লক্ষিত হয়, এবং কয়েক মাস পরে ম্যালেরিয়া কীটাণু ও তৎসঙ্গে ম্যালেরিয়াজ্বরের পুনর্ব্বার আবির্ভাব হইতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই বোধগম্য হইবে যে, ম্যালেরিয়া কীটাণু এতাবৎ কাল শরীর হইতে অপসারিত হয় নাই। ইহারা শরীরের কোন্ অংশে কি ভাবে অবস্থিতি করে, কি কারণেই বা পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয় সে সমস্ত বিষয় এক্ষণে অন্ধকারে নিহিত। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে শরীরের দুর্ব্বলতায় কীটাণুগণ সবল ও সক্ষম হইবার সুবিধা পায় এবং শরীরের সবলতায় অথবা কুইনিন প্রয়োগে তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় অবস্থা—(Extracorporeal Phase)। ম্যালেরিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে এই কীটাণু এক জনের শরীর হইতে অন্যের শরীরে যাইতে পারে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ম্যালেরিয়া-কীটাণু কি প্রকারে এক দেহ হইতে অপর দেহে প্রবেশ করে এবং একটী দেহ ত্যাগ করিবার পর ও অন্য দেহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কি অবস্থায় থাকে, ইহা বিশেষ পরীক্ষাদ্বারা এইরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে:—ম্যালেরিয়া রোগীর শরীর হইতে রক্ত লইয়া বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিতে থাকিলে কিছুক্ষণ পরে এক হইতে ছয়টী বা ততোধিক বাহুবিশিষ্ট গতিশীল গোলাকার কীটাণু শোণিত-রসে ভাসিতে দেখা যায় (চিত্র, ঠ)। কখন কখন ঐ বাহুগুলি কীটাণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় (চিত্র, ড)। এই কীটাণুকে Flagellated Body কহে এবং ইহার বাহুর নাম Flagella। এই বাহুগুলি কীটাণু অপেক্ষাও

অধিকতর সঞ্চরণশীল। বহু গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে এই বাহুবিশিষ্ট কীটাণু দুই প্রকার ম্যালেরিয়া কীটাণুর পরিবর্তন দ্বারা উৎপন্ন হয়, (১) অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কীটাণু (Crescent body) হইতে, এবং (২) গুটিকা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া কীটাণুর প্রথম অবস্থা হইতে উৎপন্ন হয়।

রোগাক্রমণের ৭ হইতে ১০ দিনের পর রক্তে অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণু দৃষ্ট হয় (চিত্র ভ)। কুইনিনে ইহার কোন অনিষ্ট হয় না। ইহাদের দেখিতে অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায়, দুই কোণ গোলাকার এবং concave দিকে লোহিত কণিকার অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। (চিত্র, চ, ছ) অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণু তিন প্রকার (১) ইহাতে রেণুগুলি বিকীর্ণ থাকে; (২) ইহাতে রেণুগুলি মধ্যস্থলে থাকে এবং (৩) ইহার জৈবনিকে বর্ণহীন গোলাকার বিলক (Vacuoles) সমূহ দৃষ্ট হয়। ইহাদের বয়সের তারতম্যানুসারেই কেবল এই প্রকার প্রভেদ লক্ষিত হয়।

অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণু ম্যালেরিয়া কীটাণু হইতে উৎপন্ন। যখন একটী লোহিতকণিকা দুইটী কীটাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন কীটাণুদ্বয়ের সঙ্গমে অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণুর উৎপত্তি হয়। এই অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণু প্রথমে ডিম্বাকৃতি পরে গোলকাকৃতি রূপ ধারণ করে। লোহিতকণিকাটী ক্রমে ক্রমে গলিত হইয়া অদৃশ্য হয়। এই অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণুতেই প্রথম লিঙ্গ-ভেদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণু স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে দুই প্রকার। পুং কীটাণুর জৈবনিক স্বচ্ছ এবং রেণুগুলি বিকীর্ণ থাকে (চিত্র, চ)। স্ত্রীকীটাণুর জৈবণিক কণাময় (granular) এবং রেণুগুলি উহার মধ্যভাগে অঙ্গুরী আকারে অবস্থিত (চিত্র ছ ঝ ঞ)। অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণু গোলাকার আকৃতি ধারণ করিলেও উহার জৈবনিক মধ্যে এই সকল প্রভেদ লক্ষিত হয়। গোলকও (Sphere) স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে দুই প্রকার। পুংগোলকের রেণুগুলি মধ্যস্থল হইতে পার্শ্বদেশে বিক্ষিপ্ত হয়। এই সময়ে ঐ গোলক হইতে এক বা ততোধিক বাহু প্রসারিত হইতে থাকে (চিত্র, ঞ, ঠ)। স্ত্রীগোলকে বাহুর পরিবর্ত্তে গাত্র হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁড়ি (bud) বাহির হয় (চিত্র, ঢ)। যে জাতীয় ম্যালেরিয়ার কীটাণুতে অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণু উৎপন্ন হয় না সেই জাতীয় কীটাণু Sporulation এর পূর্ব্বে লোহিত কণিকা হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ পরে বাহু প্রসারিত করিয়া Flagellated bodyতে পরিণত হয়।

বহু দিবস হইতে অনুমিত হইতেছে যে ম্যালেরিয়া এবং মশকে কিছু সম্বন্ধ আছে; বহু পূর্ব্বে ইতালী দেশীয় চাষারা জ্ঞাত ছিল যে, মশক দংশনে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে আফ্রিকাবাসীরাও এই রূপ মনে করিত। এই সকল বিষয় অবগত হইয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে Manson সাহেব অনুমান করিলেন যে ম্যালেরিয়া কীটাণু যখন পরাঙ্গপুষ্টঃ, তখন ইহা বংশ রক্ষার্থে অবশ্যই এক জনের শরীর হইতে অপরের শরীরে যাইবে; আর যখন দেখা গিয়াছে যে, ম্যালেরিয়া কীটাণু নব শরীর পরিত্যাগ না করিলে Flagellated bodyতে পরিবর্ত্তিত হয় না, তখন বোধ হয় কীটাণুটী দ্বিতীয় অবস্থার প্রারম্ভেই এই আকৃতি ধারণ করে। পুনরায়, প্রথম অবস্থায় ম্যালেরিয়া কীটাণু মনুষ্যশরীরের বাহিরে যাইতে পারে না, কারণ এই অবস্থায় ইহা সততই লোহিত কণিকার মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং এ পর্য্যন্ত মল মূত্র, ঘর্ম্মাদির সহিত বহির্গত হইতে দৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং ইহাকে মনুষ্যের দেহ পরিত্যাগ করিতে হইলে ইহাকে কোন রক্ত শোষক প্রাণীদ্বারা শোষিত রক্তের সহিত বাহিরে আসিতে হইবে। আর যখন দেখা যাইতেছে যে মশক রক্ত শোষক, এবং ইহারা ম্যালেরিয়া সংক্রামিত স্থানে এত অধিক পরিমাণে বাস করে (বিশেষতঃ কয়েক জাতীয় মশককে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়) তখন বোধ হয় মশক কর্ত্তৃক এই কীটাণু একের দেহ হইতে অন্য দেহে নীত হয়।

এই অনুমানের সাপক্ষে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রস সাহেব প্রমাণ করিলেন যে অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণু রক্তের সহিত মশক কর্ত্তৃক শোষিত হইলে তাহাদের মধ্যে অনেকে Flagellated bodyতে পরিণত হয় এবং পরে বাহুগুলি খসিয়া যায়। ১৮৯৭ সালে তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, যদি কয়েক জাতীয় মশককে ম্যালেরিয়া পীড়িত ব্যক্তির রক্তপান করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার পাকস্থলীর

গাত্রে রেণুযুক্ত কীটাণু সমূহকে অবস্থিতি করিতে এবং বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দেখাইলেন যে যদি এক প্রকার মশককে ম্যালেরিয়া কীটাণু জাতীয় Proteosoma কীটাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত পক্ষীর রক্ত পান করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই কীটাণু ঐ মশকের পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় গুটিকা উৎপাদন করে এবং এই গুটিকা সকল মশকের লালাগণ্ডে উপনীত হয়; এবং যদি ঐ মশক অন্য কোন সুস্থদেহ পক্ষীকে দংশন করে সেই পক্ষীর রক্তেও প্রোটিয়োসোমার আবির্ভাব হয়। তিনি আরও প্রমাণ করিলেন যে কেবলমাত্র এক জাতীয় মশকেই কোন এক জাতীয় কীটাণু দৃষ্ট হয় সেই জাতীয় মশক কিন্তু অন্য জাতীয় কীটাণুর বাসস্থান হইতে পারে না।

এই সময়ে ম্যাককালাম সাহেব ম্যালেরিয়ার কীটাণুজাতীয় Halteridium কীটাণু লইয়া পরীক্ষা করিয়া আবিষ্কার করিলেন যে স্ত্রীগোলকদিগের গর্ভোৎপাদন করাই বাহুগুলির প্রকৃত কার্য্য, এবং গর্ভ সঞ্চারের পর স্ত্রীগোলকগুলি চলচ্ছক্তিসম্পন্না হয় এবং তাহাদের আকারগত বিভিন্নতাও লক্ষিত হয়।

রস এবং ম্যাক্ক্যালামের পরীক্ষা লইয়া অনেকে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে গ্রাসি সাহেব প্রমাণ করিলেন যে Anopheles গণীয় কয়েক প্রকার মশকই, ম্যালেরিয়া কীটাণু এক শরীর হইতে তুলিয়া লইয়া অন্যের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। রস সাহেব যে সকল বিষয় Proteosomaতে আবিষ্কার করিয়াছিলেন গ্রাসি সাহেব ক্রমে ক্রমে সেই সমস্তই ম্যালেরিয়া কীটাণুতে বাহির করিলেন।

একণে ম্যালেরিয়া কীটাণুর দ্বিতীয় অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা উচিত। অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণু Anopheles গণীয় মশক কর্ত্তৃক শোষিত হইবার পর গোলকে পরিণত হয় (চিত্র, ঞ, ট)। যে গোলকগুলি পুং অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণু হইতে উৎপন্ন হয় সেগুলি পুংগোলক, আর যে গুলি স্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্র কীটাণু হইতে উৎপন্ন হয় সেগুলি স্ত্রীগোলক। পুংগোলক বাহু প্রসারিত করিয়া Flagellated bodyতে পরিণত হয় (চিত্র, ঠ) এবং স্ত্রীগোলকগুলি আপনার গাত্র হইতে কতকগুলি কুঁড়ি (bud) বাহির করে (চিত্র ঢ)। পুংগোলক হইতে বাহুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া কুঁড়ির মধ্য দিয়া স্ত্রীগোলকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথায় কিছুক্ষণ নড়িতে থাকে, পরে অদৃশ্য হইয়া যায় (চিত্র, ণ) এই স্ত্রীগোলকটী পুনর্ব্বার অন্যান্য বাহুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও কোনক্রমে ইহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না। কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীগোলকটীর আকারের পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। ইহা ক্রমে দীর্ঘাকার ধারণ করে এবং দুইটী মেরুর একটী সূক্ষ্ম, অপরটী স্থূল ও গোলাকার হইয়া থাকে এবং রেণুগুলি স্থূলাগ্রে সঞ্চিত হয় (চিত্র, ত)। স্ত্রীগোলকটী এইরূপ আকার ধারণের পরই নড়িতে থাকে। এই পরিবর্ত্তিত কীটাণুকে Vermicule কহে। ইহা মশকের পাকস্থলীতে উপস্থিত হইয়া তাহার কৈষিক ও ঝিল্লী স্তর ভেদ করিয়া পেশীময় স্তরে আসিয়া চলচ্ছক্তিবিহীন হইয়া তথায় থাকিয়া যায়। কিছুদিন এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া ইহা আয়তনে বর্দ্ধিত হয় এবং আঁচিলের ন্যায় পাকস্থলীর বহির্দিকে অগ্রসর হয়; এই সময়ে নব্য কলল (Young Zygote) কহে (চিত্র, থ)। তাহার পর ইহার অন্তঃস্থ জৈবনিকের পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। জৈবনিক এবং নাভি উভয়েই খণ্ড খণ্ড হইয়া কতকগুলি গোলকে পরিণত হয় এই সময়ে কীটাণুকে Zygotomere কহে (চিত্র দ, ধ)। ইহাদের অন্তর্গত গোলকগুলির গাত্রে লম্বা লম্বা ছুঁচের ন্যায় বহুসংখ্যক পদার্থ দৃষ্ট হয়, এইগুলির নাম Sporozoits এবং এই সময়ে কীটাণুকে Blastophore কহে (চিত্র, ন)। কিছুক্ষণ পরে এই গোলকগুলি অদৃশ্য হইয়া যায় এবং Sporozoitsগুলি কেবল বর্ত্তমান থাকে। এই সময়ে এই কীটাণুকে 'বর্দ্ধিত কলল', কহে (চিত্র প)। সপ্তাহ মধ্যে ইহাদের আবরণ ছিন্ন হইয়া Sporozoitগুলি মশকের শরীরের খোলের মধ্যে ভাসিতে থাকে। মশকের সহিত খোলের লালা-গণ্ডদ্বয়ের সংযোগ আছে এবং লালা-গণ্ডদ্বয় মশকের শুণ্ডের সহিত সংযুক্ত। যখন মশক মনুষ্যের শরীরে শুণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিয়া রক্ত শোষণ করে তখন লালার সহিত Sporozoit সমূহ মনুষ্য-

শরীরে প্রবেশ করে। প্রত্যেক Sporozoit রক্তে প্রবেশ করিয়া বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া থালার (disc) ন্যায় আকার ধারণ করে এবং একটী করিয়া থালাকৃতি কীটাণু মনুষ্যের লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। এইরূপে ম্যালেরিয়া কীটাণু অপর এক মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সমুদায় প্রাণীকে দুই প্রধান বিভাগে ভাগ করিয়াছেন ;—Protozoa (আদ্যপ্রাণী) এবং Metazoa। আদ্যপ্রাণীর অন্তর্গত Sporozoa শ্রেণীতে Hœmocytozoa নামে একটী বর্গ (order) আছে। ম্যালেরিয়া কীটাণু এই বর্গের অন্তর্গত।

Laveran সাহেব হিমাসিটোজোয়াকে তিন গণে (genera) বিভক্ত করিয়াছেন—(১) হীমামীবা (২) পাইরোপ্লাস্‌মা এবং (৩) হীমোগ্রিগারিণা।

১। হীমামীবা।—এই জাতীয় কীটাণুর দেহে কৃষ্ণবর্ণ রেণু দৃষ্ট হয় ; ইহাদের দুইটি অবস্থা আছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থা মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত কণিকা মধ্যে এবং দ্বিতীয় অবস্থা মশকের শরীর মধ্যে পুষ্ট হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় লিঙ্গভেদ পরিলক্ষিত হয়? ল্যাভেরণ সাহেব এই গণীয় কীটাণুকে পাঁচ ছয়টী জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি এনোফিলিস জাতীয় এবং অপর কতকগুলি কুলেক্‌স জাতীয় মশক কর্ত্তৃক মনুষ্য শরীরে নীত হয়। আবার কতকগুলি কুক্কুট, বানরের রক্ত হইতে কোন প্রকারে মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

২। পাইরোপ্লাস্‌মা।—ইহাদের অন্তর্দেশে রেণু আছে। এই জাতীয় কীটাণু খণ্ড খণ্ড হইয়া বহুসংখ্যক রেণু উৎপন্ন না করিয়া দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হয়। এই দুই খণ্ড দুইটী কীটাণুতে পরিণত হয়। ইহারা দ্বিতীয় অবস্থায় উকুণের (Tick) অভ্যন্তরে বাস করে ; কিন্তু এই অবস্থায় তাহাদের লিঙ্গভেদ হয় কি না তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গণটীই প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়।

Piroplasama bigemenum – ইহারা গোজাতীয় পশুর শরীরে বাস করে :—উকুণগুলি যখন ইহাদের রক্তপান করে তখন কীটাণু রক্তের সহিত উকুণের শরীরে প্রবেশ করে। উকুণগুলি কোন অজ্ঞাত উপায়ে আপনার ডিম্ব সকলকে সংক্রামিত করে। যখন এই সকল ডিম্ব হইতে কীটশাবক বাহির হইয়া অন্য কোন গোজাতীয় পশুর রক্তপান করিতে থাকে তখন এই কীটাণুকে তাহার শরীরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এই কীটাণু গোজাতির Cattle Feverএর কারণ। এই প্রকার কীটাণু কুক্কুর মেষ ঘোটক এবং কখন কখন মানুষের শরীরেও দৃষ্ট হয়।

৩। হীমোগ্রিগারিণা।—ইহারা উভচর প্রাণীর রক্তে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব-বর্ণিত কীটাণু লোহিত কণিকার মধ্যে কিম্বা শোণিত রক্তে ভাসমান থাকে। ইহাদের বংশবৃদ্ধির বিষয় এক্ষণে অজ্ঞাত আছে।

ম্যালেরিয়ার কীটাণু নানা প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কীটাণু ভিন্ন ভিন্ন সময় মধ্যে গুটিকা উৎপাদন করে। ইহাদের আকার গত প্রভেদও আছে এবং প্রত্যেকের উদ্ভাবিত ম্যালেরিয়াজ্বরের লক্ষণ সমূহও বিভিন্ন। ইহারা প্রধানতঃ Benign অদূষ্য এবং Malignant (দূষ্য) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর কীটাণুতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কীটাণু উৎপন্ন হয় না এবং ইহা হইতে উদ্ভূত জ্বর তত মারাত্মক নহে। ইহা দুই প্রকার (১) Quartan বা ত্র্যাহিক এবং (২) Tartian বা দ্ব্যাহিক। Malignant বা দূষ্য কীটাণু তিন প্রকার (১) Subtertian (দ্ব্যাহিক) (২) Pigmented quotidian (রেণুময় দ্ব্যাহিক) এবং (৩) Unpigmented quotidian (রেণুহীন দ্ব্যাহিক)।

ত্র্যাহিক কীটাণু (Quartan parasite) ইহাদের প্রথম অবস্থার কাল ৭২ ঘণ্টা। কীটাণুতে রেণু সঞ্চয়ের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ চলচ্ছক্তি বর্ত্তমান থাকে। রেণুগুলি স্থূল ও অচল। পূর্ণ বর্দ্ধিত কীটাণুর আয়তন একটী লোহিত কণিকার ন্যায়। গুটিকাগুলি সংখ্যায় ৬ হইতে ১২ এবং স্খলিত হইবার পূর্ব্বে কেন্দ্রস্থিত রেণুগুলির চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থার প্রারম্ভে ইহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির পরিবর্ত্তে গোলকাকৃতি ধারণ করে। আক্রান্ত লোহিত কণিকার বর্ণের এবং আয়তনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। এই কীটাণুর সমুদায় প্রথম অবস্থা

শরীরের রক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। কুইনিন প্রয়োগে ইহারা রক্ত হইতে অদৃশ্য হয়। কিন্তু বহুদিন গুপ্ত অবস্থায় থাকিবার পর ইহারা পুনরায় রক্তে দৃষ্ট হয়।

ত্র্যাহিক কীটাণু (Tertian parasite)—ইহাদিগের প্রথমাবস্থার কাল ৪৮ ঘণ্টা। রেণু সঞ্চয়ের পূর্ব্বে ও পরে কীটাণু বেশ সবল থাকে। ইহার রেণুগুলি সূক্ষ্ম এবং চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট। আয়তনে লালকণিকার সদৃশ বা তদপেক্ষা বৃহত্তর। গুটিকাগুলির সংখ্যা ১৫ হইতে ২০ পর্য্যন্ত এবং স্খলিত হইবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে দ্রাক্ষাগুচ্ছের ন্যায় দেখায়। ইহাদিগের দ্বারা আক্রান্ত লোহিত কণিকার বর্ণ লোপ পায় এবং তাহারা আয়তনে বৃদ্ধি হয়। কুইনিন প্রয়োগে ইহারা রক্ত হইতে অদৃশ্য হয়। এই কীটাণু বহুকাল অদৃশ্য অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় লক্ষিত হইতে পারে।

রেণুময় ত্র্যাহিক কীটাণু—ইহাদিগের প্রথমাবস্থা ২৪ ঘণ্টা কাল, কখন কখন আরও অল্প সময়। রেণু সঞ্চয়ের পূর্ব্বে কীটাণু বেশ গতিশীল থাকে। রেণু সঞ্চয়ের পর তেমন চলচ্ছক্তি দৃষ্ট হয় না। রেণুগুলি অতি সূক্ষ্ম এবং পরে দুই তিনটী গুচ্ছে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহারা আয়তনে লোহিত কণিকার সিকি অংশ। গুটিকাগুলি সংখ্যায় ৬ হইতে ৮ এবং বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে বিশৃঙ্খলভাবে একত্রিত থাকে। ইহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কীটাণু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা আক্রান্ত লালকণিকার বর্ণ গাঢ় হয় এবং তাহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কুইনিন প্রয়োগের কিছু দিন পরে ইহারা রক্ত হইতে অদৃশ্য হয়। কিন্তু কয়েক মাস অদৃশ্য থাকিয়া পুনর্ব্বার দেখা দেয়।

রেণুহীন ত্র্যাহিক কীটাণু—ইহাদিগের প্রথমাবস্থায় ২৪ ঘণ্টা কাল বা তদপেক্ষা অল্প সময়। এই অবস্থায় ইহারা অত্যন্ত গতিশীল এবং আয়তনে লালকণিকার সিকি অংশ। গুটিকা গুলি সংখ্যায় ৬ হইতে ৮ এবং স্খলিত হইবার পূর্ব্বে তারকাকারে একত্রিত থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কীটাণু দৃষ্ট হয়। আক্রান্ত লোহিত কণিকার বর্ণ গাঢ় হয় এবং তাহা সঙ্কুচিত হয়। অন্যান্য বিষয়ে ঠিক রেণুময় ত্র্যাহিক কীটাণুর ন্যায়।

চাতুর্থিক কীটাণু। ইহাদের প্রথমাবস্থা ৪৮ ঘণ্টা কাল। ইহারা গতিশীল ও রেণুগুলি সূক্ষ্ম এবং রেণুকে কম্পিত হইতে দেখা যায়। আয়তনে লালকণিকার অর্দ্ধাংশ। গুটিকা গুলি সংখ্যায় ১০ হইতে ১৬ এবং বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে বিশৃঙ্খল ভাবে একত্রিত থাকে। ইহাদের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কীটাণু দৃষ্ট হয়। আক্রান্ত লালকণিকার বর্ণ গাঢ় হয় কিম্বা বর্ণহীন হয় ও তাহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। অন্যান্য বিষয়ে রেণুময় ত্র্যাহিক কীটাণুর অনুযায়ী।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ঘাসের চাষ।

ঘাসের চাষ শুনিয়া মফঃস্বলস্থ ও সহরের অনেকেই হয় তো হাসিবেন; তাঁহারা বলিবেন যে অনায়াসলব্ধ তৃণাদির আবার চাষের আবশ্যকতা কি? যাহা মারিয়া উঠা দুরূহ তাহার জন্য আবার পয়সা খরচ করিয়া কি হইবে এবং তাহাতে লাভই বা কি? কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে তৃণাদির চাষে যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপকার পাই না বটে কিন্তু গবাদি তৃণজীবী মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী জন্তুগুলির আহারের প্রধান উপযোগী দ্রব্য হওয়ায় তাহা মনুষ্যেরও বিশেষ লক্ষের অন্তর্গত। চাষের বলদ, গাড়ীর বলদ, দুগ্ধবতী গাভীগুলি এবং অশ্ব, মহিষ, ছাগাদি গৃহপালিত নানাজাতীয় পশুগুলি যে মনুষ্যের জীবনধারণের এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান সহায় তাহা বোধ হয় বুঝিতে কাহারও বাকী নাই। যাহাতে গোবংশের উন্নতি হয় সে বিষয়ে আমাদের যত্নবান্ হওয়া উচিত। যেহেতু গবাদি পশুর উন্নতির উপর আমাদের উন্নতি ও তাহাদের অবনতিতে আমাদের অবনতি নির্ভর করিতেছে, সে জন্য আমাদের ন্যায় গবাদি পশুকুল যাহাতে অনায়াসে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাদি পাইতে পারে তাহার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে যেরূপ যত্নে গবাদি গৃহপালিত পশুগুলি লালিত পালিত হয় তাহা শুনিলে এদেশের ধনী লোকেরাও আশ্চর্য্য হইবেন অথচ এই সব পশুপালনে ইহলৌকিক উপকার ভিন্ন তাঁহারা

পারলৌকিক পুণ্যাদির আশাও করেন না। আমার নিজের মতে প্রত্যেক গৃহস্থেরই এই গবাদি পশুখাদ্যের চাষ করিয়া লাভালাভ দেখা উচিত। কিছুকাল এই চাষ করিলে গবাদির জন্য যে ব্যয় হইত তাহার অনেক লাঘব হইবে; গবাদির স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইলে তাহাদের নিকট হইতে আশাতীত ফল পাওয়া যাইবে; অথচ নগদ টাকা ঘর হইতে বাহির করিতে হইবে না।

আমরা সম্প্রতি গিনি ঘাস নামক উৎকৃষ্ট ও বিশেষ লাভকর ঘাসের চাষ সম্বন্ধে প্রথমে বলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। এই গিনি ঘাস কতকটা উলুঘাসের ন্যায়; ইহার পাতা চওড়ায় তদপেক্ষা বড় এবং মোলায়েম, লম্বায় ২॥০ হাত হইতে ৩ হাত পর্য্যন্ত হইয়া গুচ্ছ বাঁধে; ঘাসগুলি বেশ সবুজ রং বিশিষ্ট বারমাসই গবাদি পশুর কাঁচা অবস্থায় ব্যবহারোপযোগী। ইহা শুষ্ক করিয়া রাখিলেও অনেক দিনের জন্য থাকে। গিনি ঘাস যে সে মাটীতে আবাদ করা যাইতে পারে, ইহার জন্য সরস দোআঁস মাটী হইলেই ভাল হয়। আমরা দেখিয়াছি যে কাশীপুর কৃষিশালায় এবং মধুপুরস্থ কঙ্করবহুল মাটীতে ইহা রোপিত হইয়া বিনা সারে ৪।৫ বার কাটিং দিয়াছে। বর্ষায় রোপণের পর ঐ জমী হইতে কাটিয়া লইবার খরচা ভিন্ন ছেচ, সার দেওয়া প্রভৃতি কোন খরচাই হয় নাই। কাশীপুর কৃষিশালাস্থ উদ্যানে ইহা দোআঁশ মাটীযুক্ত একস্থানে উপর্য্যুপরি ৫।৬ বৎসর সমানভাবে ৫।৬ বার কাটিং দিয়াছে। ঐ বাগানে ৪ অঙ্গুলি গভীর দোআঁশ মৃত্তিকাসংযুক্ত ৩।৪টী খোলা গামলায় এই গিনি ঘাস অতি সুন্দররূপে ৪ বৎসরকাল বর্দ্ধিত এবং ৪।৫ বার বার্ষিক ফসল দিয়াছিল। উলুপ্রভৃতিতে মাটীকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, গিনি ঘাসে তাহা হয় না। কাশীপুর কৃষিশালাস্থ উল্টাডাঙ্গার বাগানে প্রায় একস্থানে এই ঘাস ১২ বৎসরকাল রোপিত হইয়া সার ও জলসিঞ্চন লাভে বৎসর বৎসর ১০।১২টী কাটিং বা ফসল দিতেছে। সে জন্য সকলে ২।১ বিঘা এই ঘাস লাগাইয়া বেশ সার দিয়া ও গ্রীষ্মের সময় জল দিয়া প্রায় প্রতিমাসে ১টী করিয়া কাটিং বা বৎসরে ১০।১২ ক্ষেপ ঘাস সংগ্রহ করুন। ধান্যে কেবলমাত্র বৎসরে একক্ষেপ ফসল পাওয়া যায়, বৎসর বৎসর পাইট বা ক্ষেত্র মেরামত করিতে হয় কিন্তু এই গিনি ঘাস একবার মাত্র রোপণ করিলেই অনায়াসে ৫।৭ বৎসর চলিতে পারে, তবে এক একবার লাঙ্গলদ্বারা ঘাসের মূলের গুচ্ছগুলি পাতিলা করিয়া সার দিলে বা গোড়াগুলিতে বর্ষার পূর্ব্বে বা শীতের শেষে একবারমাত্র পুড়াইয়া ছেঁচ দিলে নবীন তেজে নবীনরূপে বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরে পর্য্যাপ্ত ফসল দেয়।—ইহাতে সুখাদ্য ঘাসের মোটে নিত্য প্রতি কাঠায় ১টী গরুর অনায়াসে খোরাক চলিতে পারে।

সরস আর্দ্র জমীতে এটেল বা দোআঁশ বালীবহুল জায়গাতে এই গিনি ঘাসের শিকড় বর্ষার কিছু প্রারম্ভে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর রোপণ করিতে হয়। গিনি ঘাসের মূল রোপণ করাই প্রশস্ত; নতুবা বীজ হইতেও ঘাস হইতে পারে, তবে তাহা হইতে ফসল পাইবার প্রথমে কিছু বিলম্ব হয়। এই গিনি ঘাস বিচালীর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে গৃহস্থের বিশেষ সুবিধা হয়।

শ্রীহরিদাস মিত্র।

অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসুর নূতন আবিষ্কার।

বিজ্ঞানজগতে নিউটনের গৌরব—তিনি মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। নিউটনের পূর্ব্বেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মানুষের জ্ঞানগোচর ছিল, কিন্তু এই মাধ্যাকর্ষণই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গ্রহ-উপগ্রহ-সম্বলিত সৌর জগৎ এবং কোটি সৌরজগৎ সম্বলিত নক্ষত্র মণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা প্রমাণ করিয়া গণিত শাস্ত্রে কষিয়া মাজিয়া নিউটন তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

বিজ্ঞানজগতে নিউটনের স্থান অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু আমাদের জগদীশচন্দ্র যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নামও বিজ্ঞান জগতের অতি ঊর্দ্ধে সর্ব্বোচ্চ স্থানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকিবে। কে বলে বাঙ্গালী মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানে অক্ষম? অতি প্রাচীন কালে জ্ঞানালোক জ্বালিয়া হিন্দু জগতের তিমির নাশ করিয়াছেন, আর এই বিংশ শতাব্দীতে হিন্দুই আবার নূতন করিয়া উহা জ্বালিয়া সমস্ত জগৎ উজ্জ্বলিত করিতে অগ্রসর। ধন্য জগদীশ! তোমা হইতে জগতে হিন্দুর গুরুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

সরস্বতী তীরে মহর্ষিগণ যে তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, যে একই চৈতন্য আকার ভেদে সর্ব্বত্র একই ভাবে বিরাজ করিতেছেন, হিন্দুগণ আপ্তবাক্য বলিয়া সেই তত্ত্ব বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু এ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রয়োজন শুনিয়া হিন্দু সন্তান শিহরিয়া উঠিবেন; কিন্তু অহিন্দু বৈজ্ঞানিক কেহ সংশয়বাদী হইলে সে সংশয় নিবারণ করিতে পারিবেন না, এজন্য এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট অবিজ্ঞানসম্মত বলিয়া উপহসিত ছিল। উপহসিত—যেহেতু তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অপরিজ্ঞাত। জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের প্রণালীতে এই সমস্ত তথ্যের যাথার্থ প্রতিপন্ন করিয়া সংশয় নিরাকরণ করিয়াছেন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বজ্রনির্ঘোষে যে সমস্ত সত্য হিন্দুকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, এখন হিন্দুকণ্ঠ হইতে তাহা পুনরুচ্চরিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত হইতে চলিল।

একই চিৎশক্তি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একই নিয়মে একই শৃঙ্খলে কার্য্য করিতেছে, জগদীশচন্দ্র এ তথ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছেন। কথাটা নূতন নহে—কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নূতন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, দার্শনিকের কূট অনুমান ও তর্কের উপর দিয়া জগদীশ এ তত্ত্বে উপনীত হয়েন নাই, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জগদীশ চন্দ্রের মুখের কথা এই—"আমি চারিদিকে এমন সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছি, যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাবৎ ব্যাপারের মধ্যে একটা সুন্দর একতা বর্ত্তমান। আমি এই সমস্ত ব্যাপার এখন এক একটী করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে পরীক্ষায় নিযুক্ত। এক একটি ব্যাপারের মধ্যে পরীক্ষায় যাহা পাইতেছি তাহা অভাবনীয়। এখন এই সমস্ত স্বতন্ত্র পরীক্ষা ও তাহার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি। ইহার পর সমস্ত বিচ্ছিন্ন ব্যাপারগুলি হইতে একীকরণের (generalisation) উপকরণ পাওয়া যাইবে। কতদিনে যে এ কাজ সম্পন্ন হইয়া উঠিবে বলিতে পারি না, বোধ হয় অবিরাম পরিশ্রম করিয়া সমস্ত জীবনেও কুলাইবে না।"

জগদীশচন্দ্র এক্ষণে উদ্ভিদ্ জাতির কার্য্যকলাপ পরীক্ষায় নিযুক্ত, এবং সে পরীক্ষায় যাহা পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শীঘ্রই উহা ইংলণ্ডের Royal Society নামক প্রধান বৈজ্ঞানিক সভার পত্রে প্রকাশিত হইবে। উদ্ভিদ্-তত্ত্ব বিষয়ে যাঁহার যাহা কিছু জানা আছে তাহা ভুলিয়া পুনরায় নূতন করিয়া শিখিতে হইবে।

উদ্ভিদগণ জৈব (Organic) বটে, কিন্তু তাহারা প্রাণীর ন্যায় চৈতন্যবিশিষ্ট, এ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকদিগের জানা নাই। জগদীশ প্রমাণ পাইয়াছেন যে উদ্ভিদ্ও প্রাণীর ন্যায় চেতন পদার্থ।

উদ্ভিদ্ শারীরবিধান (Vegetable physiology) এখন নিতান্ত শৈশবে অবস্থিত। উদ্ভিদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, খাদ্য সংগ্রহ, রক্ত (রস) সঞ্চালন, বংশ-বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়ার মোটামুটি কয়েকটি কথামাত্র লোকের জানা ছিল। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করিতে করিতে সেই সমস্ত ক্রিয়ার বিশেষ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন। তিনি

দেখিয়াছেন প্রাণীদের ন্যায় উদ্ভিদ্-শরীরেও হৃদয় আছে, এবং স্নায়ুমণ্ডলী (nervous system) আছে, উদ্ভিদ্‌গণ প্রাণীর ন্যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে, উহাদের নাড়ী বহে, উহারা খাদ্য গ্রহণ ও জীর্ণ করে, বংশ বৃদ্ধি করে আর—সুখ দুঃখ হয় ত ও অনুভব করে ; অনুভবশক্তিটা স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য। জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন উদ্ভিদ শরীরে স্বতন্ত্র স্নায়ুমণ্ডলী বর্ত্তমান আছে।

যখন জীবের ন্যায় উদ্ভিদ্‌গণের স্পন্দমান সঞ্চালন যন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলী আছে তখন জীব ও উদ্ভিদের প্রভেদ বড় একটা অধিক নহে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রিয়া একরূপ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

লজ্জাবতী লতা প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদে স্পর্শজনিত বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য জাতীয় উদ্ভিদে সহসা আমরা দেখিতে পাই না, জগদীশ চন্দ্র দেখিয়াছেন সকল জাতীয় উদ্ভিদেই অনুভব শক্তি আছে।

বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগে জীবশরীরে অবস্থান্তর ঘটে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও নাড়ীর গতির ব্যতিক্রম হয়, স্নায়ু বিকারও জন্মিয়া থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তিতেও উদ্ভিদশরীরেও সেগুলি ঘটিয়া থাকে। শীতাতপের তারতম্যে জীবদেহে যে সমস্ত ক্রিয়াব্যতিক্রম হয় উদ্ভিদশরীরেও তদনুরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে।

জীবদেহে আঘাত করিলে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, উদ্ভিদ দেহেও তদনুরূপ হইয়া থাকে।

ঔষধাদি প্রয়োগে জীব শরীরে যেরূপ শারীরিক ক্রিয়ার (Physological action) পরিবর্ত্তন হয় উদ্ভিদ শরীরেও তদনুরূপ হইয়া থাকে।

জগদীশচন্দ্র একজন প্রাকৃততত্ত্বান্বেষী (Physicist), কিন্তু এসমস্ত তত্ত্ব জীবতত্ত্বজ্ঞানীর (biologist) সাধনালব্ধ বিষয় তাঁহার গোচরে আসিয়াছে। ইহা জীবতত্ত্বান্বেষীগণ বড় একটা অপমানের কথা বলিয়া মনে করেন।

প্রাকৃততত্ত্বান্বেষী জীবতত্ত্বের এসমস্ত কার্য্য কি করিয়া উদ্ভাবন করিলেন ইহাও একটা জানিবার কথা। পাঠক অবগত আছেন যে জগদীশচন্দ্র প্রথম তাড়িতের কার্য্য কলাপ লইয়াই গবেষণা করেন এবং ঐ সম্বন্ধে নানা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তারের সংযোগবিনা তাড়িত শক্তি সঞ্চালিত হয়, জগদীশ তাহা দেখাইয়া জগৎকে চমকিত করেন। আজ যে মার্কণির তারবিহীন টেলিগ্রাফ্ বার্ত্তা চলিতেছে, জগদীশচন্দ্রের নিকট তাহা নূতন নহে। তাহার পর দুই বৎসর হইল তিনি দেখাইয়াছেন যে জীবদেহের ন্যায় জড় পদার্থও তাড়িত ক্রিয়ায় সাড়া দেয়।

যখন জড় ও প্রাণী উভয়েই একরূপ ক্রিয়া প্রদর্শন করে, তখন এই উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী উদ্ভিদেরও সে ক্রিয়া প্রদর্শন করা উচিত, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জগদীশচন্দ্র নানা জাতীয় উদ্ভিদ লইয়া বিবিধ পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন, আর জগদীশ চন্দ্রের হাতে প্রকৃতি নিজ রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন।

তিনি দেখিলেন যে উদ্ভিদ শরীরের ক্রিয়াও প্রাণী শরীরের ক্রিয়ার অনুরূপ। কেবল তাড়িত ক্রিয়া একরূপ নহে, তাহাদের শারীর ক্রিয়াও (Physiological action) একরূপ।

এ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন।

সাধারণ বিশ্বাসের বিরোধী কেহ কোন কথা বলিলে লোকে তাহা সহজে বিশ্বাস করে না, পাগল বলিয়া উপহাস করে। আপামর সাধারণ লোক অপেক্ষা পণ্ডিতগণের মধ্যে এটা আবার অধিক। মূর্খ লোককে যা তা বুঝাও সহজে বুঝিবে, কিন্তু জ্ঞানাভিমানীকে কোন কথা বুঝান বড় কঠিন। তাঁহারা নূতন কথা সহজে বিশ্বাস করেন না, আর করিবেনই বা কেন ? গ্যালিলিও যখন বলিলেন পৃথিবী ঘুরিতেছে, তখন তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলী উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং অশাস্ত্রীয় কুশিক্ষাপ্রচারজন্য গ্যালিলিওকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। জগদীশ যখন বলিলেন জড়পদার্থও তাড়িত ক্রিয়ায় সাড়া দেয় তখন বড় বড় তাড়িতবিৎ পণ্ডিত একথা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন—অবশেষে চাক্ষুষ প্রমাণে বাধ্য হইয়া মত পরিবর্ত্তন করেন। উদ্ভিদ-শারীর-ক্রিয়া বিষয়েও যে সমস্ত অভিনব তত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা লইয়াও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মধ্যে একটা ঘোরতর আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। এ সমস্ত নূতন তত্ত্ব সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।

দেশী তাঁতের উন্নতি।

বস্ত্র শিল্পের জন্য ভারত চির বিখ্যাত। এক কালে ভারতই য়ুরোপকে বস্ত্র যোগাইত। কিন্তু এক্ষণে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষবাসীই এক্ষণে আপনার নগ্নতা দূর করিবার জন্য য়ুরোপের মুখাপেক্ষী। বাষ্পীয় কলের আবিষ্কারে ভারতের সকল শিল্পই য়ুরোপ-বাসিদিগের হস্তগত হইয়াছে। কলের সহিত মানুষ যুঝিতে পারে না সুতরাং হতাশ হইয়া সে উদ্যম ত্যাগ করিতে হইতেছে। ইহাতেই আমাদিগের বস্ত্র-শিল্প ও অন্যবিধ হস্ত-শিল্প ক্রমেই লোপ পাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে য়ুরোপের বা ইংলণ্ডের কলে উচ্চ শ্রেণীর সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত না। লোকের সাধারণ ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র সকলই কলে প্রস্তুত হইত মাত্র, তাহাতে এ দেশী তন্তুবায়গণ সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা অর্জ্জন করিত। কিন্তু ক্রমে এ দেশজাত সকল প্রকার বস্ত্রের অনুকরণে বিলাতি কাপড় তৈয়ারি হইয়া আসিতেছে সুতরাং তন্তুবায়গণ দারিদ্র্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহাদিগের এই দুরবস্থা দূর করা একটি গুরুতর সামাজিক প্রশ্ন। যত শীঘ্র এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। ইতিপূর্ব্বে কমলায় মূলধনের অভাব দূর করিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ প্রদান হইয়াছে কেবল যে তাহাতেই এই সমস্যার মীমাংসা হইবে তাহা নহে। যতই কেন মূলধনের আয়োজন করা হউক না, বাষ্পীয় শক্তি মনুষ্য শক্তিকে পরাজয় করিবেই করিবে। সুতরাং কেবলমাত্র মূলধনের আয়োজনে কি হইবে?

বাস্তবিক যখন এই কথা মনে হয় তখন নিরাশা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে এখনও আমাদিগের নিরাশ হইবার কারণ নাই। য়ুরোপে যে এত কল কারখানার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এমন কি রুটি-তৈয়ারি ও কাপড়-কাচা পর্য্যন্ত কলে নিষ্পন্ন হইতেছে, সেখানেও এখনও হস্তশিল্প আপনার প্রাধান্য সম্যক প্রকারে রক্ষা করিতেছে, তথায় হস্তশিল্প বিনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন তাহার উন্নতি হইতেছে। যাহাতে হস্তশিল্প রক্ষা পায় সে জন্য লোকে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। এই কারণে বাষ্পীয় শক্তির শ্রেষ্ঠতা সত্বেও, মানবশক্তি তাহার নিকট পরাজয় মানিতেছে না। য়ুরোপবাসীরা যদি আপনাদিগের হস্তশিল্প রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তবে আমরাই বা কেন না হইব? অতএব যে উপায়ে তাহা রক্ষা করিতে পারা যায়, সেজন্য সমাজহিতৈষী মাত্রেরই যত্ন করা আবশ্যক।

আজকাল আমাদের দেশে অনেক প্রকার কারখানা খুলিবার কথা শুনা যায়। কেহ বলেন সাবানের কারখানা কর, কেহ বলেন কাচের কারখানা খোল, কেহ বা আলুমিনামের কারখানা স্থাপনে পরামর্শ দিয়া থাকেন। এইজন্য এদেশীয়-দিগের মূলধনে এই শ্রেণীর দুই একটা কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল কারখানা যে অপ্রয়োজনীয় আমরা তাহা বলি না। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় যাহাতে বস্ত্রবয়নের উন্নতি সাধিত হয়, এরূপ কারখানা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, এদেশের বস্ত্রশিল্পের কোন প্রকার উন্নতি সাধন একেবারেই অসম্ভব। এই জন্য যখন আমরা শিল্পের কোন প্রকার উন্নতি বিষয়ে আলোচনা হইতে দেখি, তখন শিল্প সম্বন্ধে কাহাকেও কোনরূপ প্রস্তাব করিতে দেখি না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, সকলেরই বিশ্বাস যে, হস্তনির্ম্মিত বস্ত্র কোন কালে কলের কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না, সুতরাং তাহার উন্নতির চেষ্টা অসম্ভব।

হস্তনির্ম্মিত বস্ত্র যে কলের কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না, এ কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু দেশী তাঁতের উৎপাদিকা শক্তি যদি কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহা হইলে যে, এই শিল্প একেবারে লোপ পাইবে না, এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। বিবেচনা করুন এখন একজন তাঁতি যে সময়ের মধ্যে এক যোড়া কাপড় তৈয়ার করিয়া থাকে, সেই সময়ের মধ্যে যদি দুই যোড়া বা ততোধিক কাপড় তৈয়ার করিতে পারে, তাহা হইলে যে, সে এখনকার অপেক্ষা সুলভ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ সুলভে যদ দেশী কাপড়

বিক্রয় হয়, তাহা হইলে লোকে যে, বিলাতীর পরিবর্ত্তে দেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইবে, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। এই জন্যই আমরা বলি যাহাতে দেশী তাঁতের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে সে পক্ষে বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

এক্ষণে বিদেশ ও বিলাত হইতে আমাদের দেশে প্রতিবৎসর প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার বস্ত্র আমদানী হয়, তদ্ভিন্ন অন্যান্য তন্তুজাত সামগ্রীও প্রায় ১০।১২ কোটি টাকার আমদানী হইয়া থাকে। অতএব তাঁতের কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিতে পারিলে কত টাকা যে আমাদের দেশে থাকিয়া যায় তাহা বলা যায় না। এই জন্য যাহাতে তাঁতিরা ফ্লাইসাটল ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে, আমরা তাহার পরামর্শ দিয়াছিলাম। শ্রীরামপুর অঞ্চলে অনেক দিন হইতে এই ফ্লাইসাটল মাকু ব্যবহার করিয়া তথাকার তাঁতিরা বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছে। আমাদিগের দেশের সাধারণ লোক অনভিজ্ঞ। তাহারা সহজে কোন নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে সাহস করে না। ইহা আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি। কিন্তু যদি সেই নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া অন্যে উপকার পাইতেছে ইহা বুঝাইতে পারা যায়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সকলেই তাহা অবলম্বন করে। এই জন্যই বস্ত্রবয়ন সম্বন্ধে যে সকল নূতন উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা স্থানীয় তন্তুবায়গণ যাহাতে অবলম্বন করিতে অগ্রসর হয়, সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করা দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য? কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা না করিয়া অনেক শিক্ষিত নামধারী লোক ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন। কোন কোন অতিবিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা যে, এদেশের ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যাহা বলেন তাহার বিপরীতে কোন কথা বলিলেই প্রবীণতার পরিচয় দেওয়া হয়। বহুদিন অতীত হয় নাই একখানা মহাজনী পত্রিকায় এক ব্যক্তি ফ্লাইসাটল ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ অভদ্রভাবে রসিকতা করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া আমরা এরূপ আশ্চর্য্য হইলাম যে, সম্পাদক সেরূপ অর্ব্বাচীনতা পূর্ণ প্রবন্ধ কিরূপে প্রকাশ করিলেন। দেশী তাঁতের যে কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারে না এবং তাহার চেষ্টা যে মূর্খতা মাত্র লেখকের ইহাই ধারণা। কেবল তাহাই নহে, আজকাল যে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবার জন্য অনেকে উদ্যোগী হইয়াছেন লেখক তাঁহাদিগকেও উপহাস করিতে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার ব্যবসা জ্ঞান এইরূপ যে, আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যে কোনটির উন্নতি দেশের পক্ষে হিতকর তাহা বুঝিতে না পারিয়া যাঁহারা স্বদেশজাত শিল্পসামগ্রী ব্যবহার করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া স্বদেশজাত তিন্তিসরিণা আহার করিয়া দেশহিতৈষিতা প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন। একথাগুলি অবান্তর হইলেও ইহার উল্লেখের প্রয়োজন আছে। অজ্ঞ লোকের কথায় যাঁহারা ভুল বুঝেন, তাঁহাদিগের সে ভ্রান্তি দূর করা আবশ্যক এই জন্যই ইহার উল্লেখ করিয়া কমলার মূল্যবান স্থান নষ্ট করিলাম।

এ দেশীয় শিল্পের যে উন্নতি হইতে পারে, ইহা কেবল যে আমরা বলিতেছি তাহা নহে। যাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁহারাও এই মত প্রকাশ করিতেছেন। কয়েক মাস হইতে কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই. বি, হাভেল সাহেব এবিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। আমাদের দেশের লোকে যদি হাভেল সাহেবের এই কার্য্যে সহায়তা করেন তাহা হইলে দেশের লোকের যে কি উপকার হয় তাহা বলা যায় না। এখনও বাঙ্গালায় প্রায় চারি লক্ষ লোক তাঁতে কাপড় বুনিয়া খায়। এদেশেও যদি কাপড়ের কলের উন্নতি হয়, তাহা হইলে এই চারি লক্ষ লোক ক্রমে ক্রমে অন্নহীন হইবে। সুতরাং এই হস্তশিল্প যাহাতে একেবারে লোপ না পায়, প্রত্যুত কলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারে তাহারই চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

আজি প্রায় ৬০।৭০ বৎসর অতীত হইল কতকগুলি য়ুরোপীয়ের চেষ্টাতে শ্রীরামপুর অঞ্চলের তন্তুবায়দিগের তাঁতের কতকটা উন্নতি হয়। ইহার জন্যই আজিও তাহারা টিকিয়া আছে। তাঁতের এই উন্নতিতে তন্তুবায়গণ পূর্ব্বে যাহা উপার্জ্জন করিত তাহার দ্বিগুণ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতে অনেকে তাহাদের দেখাদেখি আপন আপন তাঁতের উন্নতি সাধন করিয়াছে। এক্ষণে প্রায় দশ হাজার তাঁতি শ্রীরামপুরের তাঁতি-

দিগের ন্যায় উন্নত যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। আর্ট স্কুলের হ্যাভেল সাহেব বলেন যে, শ্রীরামপুরের হস্তচালিত তাঁতের উন্নতি সাধনের পর যুরোপে ঐ বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে তুরস্কের রুমানিয়া দেশে এই উন্নত প্রণালীর হস্তচালিত তাঁত ব্যবহার হইতেছে। এই তাঁতে দশ ঘণ্টা কাজ করিলে ৩৪ গজ কাপড় তৈয়ার হইয়া থাকে। এই কাপড়ে প্রতি ইঞ্চিতে ৬০খি সূতা বোনা হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের সাধারণ হস্তচালিত তাঁতে যে পরিমাণ কাপড় তৈয়ার হয়, ইহা তাহার ছয় গুণ এবং শ্রীরামপুরের এখনকার উন্নত তাঁতে যাহা তৈয়ার হয় তাহার তিন গুণ। ভাবিয়া দেখুন দেখি ইহাতে কত লাভ।

আণ্ডামান দ্বীপের ভূতপূর্ব্ব চিফ কমিসনার কর্ণেল স্যার রিচার্ড টেম্পেল বলেন যে আণ্ডামান দ্বীপের কয়েদীদিগের জন্য এক্ষণে এই উন্নত প্রণালীর বিলাতী তাঁতে কাপড় তৈয়ার হইতেছে। এই তাঁত স্ত্রীকয়েদীদিগের দ্বারা চালিত হয়। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্বে হস্তচালিত তাঁতে তিন জন স্ত্রীলোক যে পরিমাণে কাপড় তৈয়ার করিত এই নূতন উন্নত তাঁতে এক একজন স্ত্রীলোক সেই পরিমাণ কাপড় তৈয়ার করিয়া থাকে। অশিক্ষিত কয়েদী স্ত্রীলোকদ্বারা যদি ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সুদক্ষ তন্তুবায়েরা কত অধিক ফল পাইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। অতএব এই উন্নত প্রণালীর তাঁত যাহাতে আমাদিগের দেশের প্রত্যেক তন্তুবায় ব্যবহার করিতে পারে তাহার জন্য সকলেরই বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সকলেই অবগত আছেন যে হস্তচালিত কাপড়ের বুনন ভাল হয় বলিয়া এবং ইহা অধিক টেকসই হয় বলিয়া, লোকে উহার পক্ষপাতী। এবং এজন্য বিলাতী কাপড়ের এতাদৃশ প্রতিযোগিতাতেও উহা অদ্যাবধি বিলুপ্ত হয় নাই। অতএব যাহাতে এই নূতন উন্নত তাঁতের প্রবর্ত্তনে হস্তনির্ম্মিত বস্ত্রের অধিক উন্নতি সাধিত হয়, তাহার জন্য সকলে চেষ্টিত হউন। যাঁহারা এই তাঁতের বিষয় অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা কলিকাতার আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবকে লিখিলে অবিলম্বে সকল তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় যে তাঁত আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহার বিষয়েও আমরা সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। গত সংখ্যায় জন্মভূমিতে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

গবর্ণমেণ্ট-মেডিকেল-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্তের



কেশরঞ্জন কাহার ব্যবহার করা উচিত ?

১। যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়।

২। যাঁহারা মাথাঘোরা—মাথাধরা—অনিদ্রা প্রভৃতি পীড়ায় পীড়িত।

৩। যাঁহাদের মনে উৎসাহ নাই, শরীরে স্ফূর্ত্তি নাই।

৪। যাঁহাদিগকে বিচার, বক্তৃতা বা অধ্যয়নাদিতে ক্লান্ত হইতে হয়।

৫। যাঁহারা চুলের বিবর্ণতা—অকালপক্কতা ও টাক প্রভৃতিতে উৎপীড়িত।

৬। যাঁহাদের মস্তিষ্ক উষ্ণ, চুল ছোট বা পাতলা, এবং প্রকৃতি বায়ু প্রধান।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা, ডাঃমাঃ ।/০ আনা। তিন শিশি ২।০ টাকা, ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

শ্বাসারিষ্ট	কষ্টকর শ্বাসরোগে মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন।
শ্বাসারিষ্ট	সেবনে শ্বাসবেগ সত্বর প্রশমিত হয়।
শ্বাসারিষ্ট	সেবনে—সুনিদ্রা হয় ও যন্ত্রণা নাশ হয়।
শ্বাসারিষ্ট	হাঁপানি রোগের—বহু পরীক্ষিত মহৌষধ।
শ্বাসারিষ্ট	কষ্টকর শ্লেষ্মার—সহজ উপশমে সক্ষম।
শ্বাসারিষ্ট	সকল অবস্থায় সহজে সেবনীয় মহৌষধ।
শ্বাসারিষ্ট	হাঁপানি কাশির প্রতিকারে সম্পূর্ণ সক্ষম।
শ্বাসারিষ্ট	সেবনে প্রত্যক্ষ ফল—পরীক্ষা প্রয়োজন।

মূল্য প্রতি শিশি ঔষধ ... ১।০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ।৶০ আনা।

দ্রব্যগুণ-শিক্ষা

অর্থাৎ অনায়াসে সকল দ্রব্যে গুণাদি জানিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।

৩য় সংস্করণ,—মূল্য ৸০ বার আনা।

দ্রব্যগুণ যে কেবল চিকিৎসকেরই জানিবার বিষয়, তাহা নহে; দ্রব্যগুণ সাধারণ গৃহস্থেরও অবশ্যজ্ঞাতব্য। চিকিৎসক দ্রব্যগুণ না জানিলে তাঁহার চিকিৎসা করা চলে না। গৃহস্থও যদি দ্রব্যগুণ, প্রত্যেক পদার্থের উপকারিতা, অনুপকারিতা প্রভৃতি বিবেচনাপুর্ব্বক আহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও অনিষ্টকর পদার্থের আহারাদি দোষজন্য রোগে কষ্টভোগ করিতে হয় না।

এই পুস্তকে ঔষধের উপকরণ, আহার্য্য, ব্যবহার্য্য, ডাল-ভাত, খাজা-গজা, লুচি-সন্দেশ প্রভৃতি সকল দ্রব্যের গুণ, মাত্রা, প্রস্তুত-প্রণালী, প্রয়োগবিধি, ধাত্বাদির শোধন-মারণ-বিধি, এবং প্রত্যেক পদার্থের সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা, পারসী, হিন্দী, গুজরাটি, কর্ণাটি, মহারাষ্ট্রীয়, তেলেগু, ও উৎকলদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন নাম অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য প্রত্যেক পদার্থের নাম অকারাদি বর্ণক্রমে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ভাষা অতি সরল—সামান্যমাত্র বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

জাপান যুদ্ধের সংবাদ

লইবার জন্য আপনি যেমন উৎসুক-নেত্রে সংবাদপত্রস্তম্ভ-সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করেন—বলুন দেখি—আপনার দেহজাত রোগ সমূহের প্রকৃত চিকিৎসার উপায় সম্বন্ধে সেরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন কি না? দারুণ ম্যালেরিয়া ও জ্বরের সময় আসিয়াছে—আপনার দৃষ্টি কেবল কুইনাইনের দিকে। কিন্তু আমাদের আয়ুর্ব্বেদে এমন জ্বরনাশক মহৌষধ আছে, যাহা এক বার সেবনে জীবনেও কখন কুইনাইন সেবনের আবশ্যক হয় না। আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত "পঞ্চতিক্ত বটিকা" সেবনে নির্দ্দোষে সর্ব্ববিধ জ্বর আরাম হয়। একবার আরাম হইলে "আর" পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। জ্বরের প্রাবল্য-কালে—পঞ্চতিক্ত বটিকা মফঃস্বলের প্রতি গৃহেই সঞ্চিত থাকা উচিত।

মূল্য প্রতি কৌটা ... ১ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৵০ আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

উদ্ভিদ্ জাতি।

পত্র।

পত্র কাহাকে বলে তাহা আর কথায় বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ইহা উদ্ভিদের একটী প্রধান অঙ্গ এবং তাহার কাণ্ড ও শাখা প্রশাখার পার্শ্বদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পত্র গাছের ছালের বিস্তীর্ণ অংশ নহে, কারণ ইহার মধ্যে কাণ্ডের ন্যায় সমুদায় আভ্যন্তরিক অংশই বর্ত্তমান। পত্রই প্রধানতঃ উদ্ভিদ্ জীবনের অস্তিত্বের উপায়, কারণ উদ্ভিদ্ অন্যান্য শরীরাপেক্ষা প্রাণ ধারণের জন্য পত্রের নিকট অধিকতর ঋণী। ফণিমনসা, হাড়জোড়া প্রভৃতি কতকগুলি গাছে পত্র জন্মায় না সত্য, কিন্তু সেই গাছগুলির ত্বক আবশ্যকমত পত্রোপযোগী কার্য্যে কুশল হইয়া যায়।

আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে এই সকল শব্দ পত্র শব্দের পর্য্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে।—

অমর { ১ পত্র ৩ ছাদন ৫ দল
২ পলাশ ৫ ছদঃ ৬ পর্ণ

শব্দ রত্নাবলী { ৭ পাত্র ৯ বর্হ ১১ পত্রক
৮ ছাদন ১০ বর্হন

এই সকল শব্দগুলি পত্র শব্দের পর্য্যায়বাচী বটে, কিন্তু ইহাদের সকলগুলিই পত্রের মৌলিক অর্থবাচী কি না সন্দেহ। এই জন্য পত্র শব্দ বলিলে আমাদের যাহা ধারণা হয় অন্য শব্দে ঠিক সেরূপ ধারণা হয় না।

দল শব্দ কেবল পত্রবাচী নহে। লীলাবতীর মতে ইহা অর্দ্ধবোধক, হেমচন্দ্রের মতে খণ্ডবাচী। এই দুই প্রকার অর্থ থাকাতে দল শব্দে যে ফলক বা ফলধর বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভ্রূণ-কলিকে আবৃত করিয়া থাকে তাহাদিগকে বুঝায়। পর্ণ শব্দ-যে সকল পত্র সংলগ্ন হইয়া এক স্থান হইতে উৎপন্ন হয় তাহাদেরই জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন ত্রিপর্ণ বা সপ্তপর্ণ। অন্যান্য শব্দগুলি পত্রের ঠিক মৌলিক অর্থবাচী নহে এবং সেগুলি দ্বারা আমাদের প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না বলিয়া আমরা সে শব্দগুলি ব্যবহার করিব না।

মূল ও কাণ্ড ব্যতীত বৃক্ষের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গই একমাত্র পত্রের বিভিন্ন পরিণতি মাত্র। এই কারণে পত্রকে নানা স্থানে নানা কার্য্যের জন্য উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত, নানা আকার ধারণ করিতে হয়। গাছের সবুজ পত্র, কেবল মাত্র সূর্য্যালোকে অজৈবিক পদার্থগুলিকে জৈবিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ এবং সে সকল পদার্থই গাছের পোষণ কার্য্যে সহায়তা করে। কিন্তু সবুজ পত্র গাছের বংশ বৃদ্ধির জন্য রেণু উৎপন্ন করিতে অথবা কোমল কাণ্ড বা পুষ্পকে রক্ষা করিতে অথবা বীজাভ্যন্তরস্থ কোমল অঙ্কুরকে রক্ষা ও খাদ্য প্রদান করিতে কুশল নয়। এই কারণে সবুজ পত্রকেই ঐ সকল বিষয়ে উপযোগী হইবার জন্য পরিবর্ত্তিত হইতে হয়। তখন আমরা আর সবুজবর্ণ পত্রকে রেণু উৎপন্ন করিতে দেখি না। তখন রেণু পুংকেশর (Stamens) দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পুংকেশর বৃক্ষের সবুজবর্ণ পত্রের পরিণতি ভিন্ন কিছুই নহে। আমরা এ সকল বিষয় পরে আলোচনা করিব। খাদ্য সঞ্চয়ের আধার যে সকল অন্তর্ভৌম কাণ্ড ভূমির নিম্নে সূর্য্যালোকবিহীন স্থানে জন্মায়, সেগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য আর সবুজবর্ণ, পাতলা, কোমল পত্রের আবশ্যক হয় না তথায় পত্র তাহার পরিবর্ত্তে শুষ্ক, বর্ণহীন, পুরু আঁইসের আকার ধারণ করিয়া সেই সকল কাণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই সকল আঁইস এবং পুংকেশর, সবুজ পত্র হইতে দেখিতে ও কার্য্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও তাহাদের প্রথম জীবন একই, অর্থাৎ তাহারা একই নিয়মে একই ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরে বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, সমস্ত বৃক্ষের পুষ্টি ও বৃদ্ধি অনায়াসে সম্পাদিত হইবার জন্য যে সকল কার্য্যের আবশ্যক, তজ্জন্য বৃক্ষের একমাত্র পত্রকেই নানা স্থানে নানা আকার ধারণ করিতে হয়।

পত্রের উৎপত্তির পূর্ব্বে গাছের গায়ে একটু ফুলো দেখা যায়। উহাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পত্রে পরিণত হয়। কিন্তু পত্রের বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ কাণ্ড ও শাখার ন্যায় পত্র ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে পারে না। প্রত্যেক গাছের পাতার বৃদ্ধির একটী সীমা আছে। প্রত্যেক বৃক্ষের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য যতগুলি পত্র ও যত বড় পত্রের প্রয়োজন ঠিক

সেই বৃক্ষে তদনুরূপ পত্র জন্মিয়া থাকে। ইহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ দেখা যায় না তবে ইহা প্রকৃতির নিত্যব্যবস্থার নির্দেশ বলিয়া মনে হয়।

কাণ্ডের বিশেষ স্থান হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া পত্রকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বীজ-দল বা ভ্রূণ-পত্র (Cotyledons) দ্বিতীয়তঃ শাখাপত্র। বীজদল অঙ্কুরেই দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্কুর কালে যে ভ্রূণ-কলি (Plumule) নির্গত হয় তাহার প্রথমতঃ কাণ্ডভাগ ও পত্রভাগের বিভিন্নতা থাকে না। ক্রমশই তাহার ভ্রূণ-পত্র ও ভ্রূণ মূল (Radicle) নির্গত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সমুদায় ভ্রূণকলিটীকে এবং তাহার বর্দ্ধিত অংশগুলিকে খাদ্য প্রদান করা এই পত্রের প্রধান কার্য্য। যতদিন বীজের খোসা দ্বারা এই পত্র ঢাকা থাকে তত দিন পত্র দুইটী তাহার মধ্যে অপরিপুষ্ট অবস্থায় থাকে পরে বীজের খোলা ফাটিয়া গেলে তাহা একেবারেই অযৌগিক পদার্থ গ্রহণ করিতে বা তাহা যৌগিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হয় না। তথাপি অঙ্কুরটীর বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের আবশ্যক। অঙ্কুরের কোমল মূলগুলি মূল-কেশ দ্বারা ভূমি হইতে খাদ্য আহরণের পূর্ব্বে এবং তাহার কোমল পত্র ভূমির উপর বৃদ্ধি পাইয়া ও বিস্তৃত হইয়া বায়ু হইতে খাদ্যাহরণ করিবার পূর্ব্বে অঙ্কুরটী দুইটী উপায়ে খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একটী উপায় এই যে, বীজদলই ঐ সময়ের জন্য প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। যে গাছ হইতে বীজ উৎপাদিত হয় সেই গাছই এই বীজদলের মধ্যে প্রচুর খাদ্য রাখিয়া দেয়। আর একটী উপায় এই যে, বীজদল ছাড়া বীজের মধ্যে অপর স্থানেও খাদ্য সঞ্চিত থাকিতে পারে। এই সঞ্চিত খাদ্যকে ভ্রূণান্ন (Albumen) কহে।

এই বীজ-দল হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া অঙ্কুরের মূল ও পত্র জন্মিলে পর তাহার এই সঞ্চিত ভাণ্ডারের প্রয়োজন হয় না। বীজদলকে তখন অন্য কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু যে সকল অঙ্কুরের খাদ্য দ্রব্য এই পত্রে সঞ্চিত না হইয়া বীজের অন্য স্থানে সঞ্চিত হইয়া থাকে তাহাদের বীজদলের কার্য্য অন্যরূপ হইয়া পড়ে। তাহারা ঐ সঞ্চিত খাদ্যকে দ্রব করিয়া এবং তাহাকে প্রয়োজনীয় খাদ্যে পরিণত করিয়া ভ্রূণকলির বর্দ্ধিত প্রদেশে প্রেরণ করে। এই জন্য ঐ সকল বীজ দলের কোষ (Cell) গুলিকে এরূপ উপযোগী হইতে হয় যে, তাহারা ঐ সঞ্চিত খাদ্য, বীজের অন্য স্থান হইতে টানিয়া লইয়া, তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইবে। খাদ্য টানিয়া লইবার জন্য উপরকার স্তরের কোষগুলিকে পর-গাছের মূলের কোষের ন্যায় শোষণতৎপর হইতে হয়। বীজের যে স্থানে খাদ্য সঞ্চিত থাকে সেই খাদ্যের সহিত বীজদলের যে অংশ সংলগ্ন থাকে সেই সকল অংশের কোষগুলিই এইরূপ শোষণ কার্য্যে তৎপর হইয়া থাকে। শোষণকালে এই সকল কোষের আয়তন অনেক বাড়িয়া যায়। যবের বীজদলস্থ কোষগুলি নিজ আকার অপেক্ষা আট দশ গুণ বড় হইয়া থাকে। কখনও কখনও বীজদলের এক পার্শ্বে একটী ফুলো হয় উহা ক্রমশই সঞ্চিত খাদ্যাগারের দিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং যতই তথাকার খাদ্য কমিয়া আইসে ততই তাহা সেই ফাঁকে বর্দ্ধিত হয়। অতএব দেখা গেল যে, এই সকল শোষণকারী কোষ সমুদায় বীজদলের উপর অথবা তাহার কোন বিশেষ অংশ হইতে (যেমন নারিকেলে) খাদ্য আহরণ করে। সুতরাং ইহা বেশ বুঝা যায় যে, যে সকল গাছের বীজদলে যত শোষণকারী কোষ খাদ্যের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিবে সেই গাছের অঙ্কুরের বৃদ্ধি ততই শীঘ্র সম্পাদিত হইবে। এই কারণে দুই তিন দিনের মধ্যেই ঘাসের অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে। কিন্তু নারিকেলের বীজদলের কেবলমাত্র একটী অংশ খাদ্যের সহিত স্পৃষ্ট থাকে বলিয়া ইহার অঙ্কুর তত শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এই জন্য নারিকেলের কলি নির্গত হইতে অনেক দিন লাগিয়া থাকে। আরও, যে সকল বীজের খাদ্যে শ্বেত-সারের (Starch) ভাগ অধিক মাত্রায় থাকে, তাহা শীঘ্রই দ্রব হয় বলিয়া শোষণ কার্য্যও তৎপর সমাধিত হয়; যেমন ঘাসের অঙ্কুরে হইয়া থাকে। কিন্তু নারিকেলের বীজ-দলের ন্যায় বসা (Fat) খাদ্যে মিশ্রিত থাকিলে তাহা শোষণ করিতে বিলম্ব লাগে, এই জন্য অঙ্কুরের বৃদ্ধি হইতেও বিলম্ব হইয়া থাকে।

খাদ্য শোষণ ব্যতীত বীজদলের আর একটী কার্য্য আছে। তাহা এই যে, কলি ও ...

ডগাকে বীজের খোলার বাহিরে আনয়ন। বীজ পুষ্ট হইলে তাহার আভ্যন্তরিক অঙ্কুরকে বাহ্য বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বীজের উপর এক বা দুই স্তর (অন্তঃ ও বহিঃ) ত্বক থাকে। এই ত্বক অত্যন্ত কঠিন। খেজুরের বীজ দেখিলে ইহা বেশ অনুমিত হয়। এই সকল স্তরের কেবল মাত্র দুই চারি স্থান দিয়া অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশের পথ আছে। এই সকল স্তর অত্যন্ত পুরু ও কঠিন অতএব অভ্যন্তরস্থ অঙ্কুর যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহাকে স্থানাভাবে বাহির হইয়া পড়িতে হয়। বাহির হইতে হইলে, হয় এই কঠিন স্তরের মধ্যে কোন রন্ধ্রপ্রদেশ দিয়া নির্গত হইতে হইবে, অথবা স্তরগুলিকে ফাটাইয়া ফেলিতে হইবে; ইহা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। এই বহির্নিক্রমণ কার্য্যে বীজদলই প্রধান সহায়। প্রত্যেক জাতীয়, প্রত্যেক গণীয় গাছে এই বহির্নিক্রমণ বিভিন্ন প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঘাস জাতিতে এই পত্র ঘুরিয়া গিয়া কঞ্চুকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া থাকে এবং বীজদলের খানিকটা অংশ মাত্র খাদ্য শোষণ করিতে থাকে। এবং পরে ভ্রূণ মূলের বৃদ্ধি হইলে এবং নূতন পত্রোদ্গম হইলে পর বীজদল মরিয়া যায়। এইরূপ প্রায় সমস্ত এক-বীজদল সম্পন্ন গাছের বীজপত্র সমস্ত কলিটীকে সংবৃত করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত না তাহারা বেশ সুখে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততদিন তাহাদের সংরক্ষণে ব্যাপৃত থাকে।

দ্বি-বীজদল সম্পন্ন গাছে দুইটী করিয়া বীজদল থাকে। এই সকল গাছে খাদ্য দ্রব্য বীজপত্রেই সঞ্চিত থাকে। আঁটি বিশিষ্ট সমুদয় ফলের গাছই এই জাতীয়। এই সকল বীজদল বেশ কঠিন ও পুরু, কাটিলে দেখিতে মাংসের ন্যায় এবং একটু ভারি হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে এই জাতীয় পত্র পরস্পর জুড়িয়া থাকে। পত্রের যে সকল গুণ আছে ইহারা সেগুলি বিবর্জ্জিত। ইহারা বৃদ্ধি পাইয়া বীজের ত্বক ফাটাইয়া ফেলে এবং তাহার মধ্য দিয়া সমুদায় কলিটী ও বীজদলের কেবলমাত্র বোঁটা দুইটী বাহির হইয়া পড়ে। বীজদলের অন্ত অংশগুলি কিন্তু বীজের মধ্যে অবস্থান করে। এবং কলির অন্তান্ত অংশকে খাদ্য প্রেরণ করিতে করিতে তাহারা ক্রমশই লঘু হইয়া আসে এবং অনেকটা কুঁকড়াইয়া গিয়া ক্রমে শুকাইয়া যায়। এই অবকাশে কলিটী মাটীর মধ্যে মূল চালাইয়া খাদ্য শোষণ করিতে আরম্ভ করে। কলির ডগা হইতেও নূতন সবুজবর্ণ পাতা জন্মিয়া খাদ্যাহরণ করিতে থাকে।

দ্বি-বীজদলকে তিনটী কার্য্য করিতে হয়। প্রথমতঃ, তাহারা সঞ্চিত খাদ্য-ভাণ্ডারের কার্য্য করে; দ্বিতীয়তঃ, তাহারা কোমল কুঞ্চিত অপরিপুষ্ট কলিটীর রক্ষাব কার্য্যে সহায়তা করে। তৃতীয়তঃ, তাহারা কলিটীকে বীজ মধ্য হইতে বাহিরে আসিতে সাহায্য করে। এই সকল কার্য্যের পর আর তাহাদের প্রয়োজন হয় না, তাহারাও সেই হেতু শুষ্ক হইয়া যায়।

কোন কোন গাছে (Water-chestnut) দুইটী পত্র বিভিন্নরূপে বর্দ্ধিত হইয়া এই কার্য্যগুলি বিভাগ করিয়া লয়। সে ক্ষেত্রে একটী দল কেবল মাত্র পুরু হইয়া বীজ মধ্য হইতে খাদ্য প্রেরণ করিতে থাকে এবং অন্যটী শুষ্ক আঁইসবৎ হইয়া কলিকে রক্ষা করিতে করিতে বীজের বাহিরে পর্য্যন্ত উপনীত হয়।

কোন কোন গাছে এই দুইটী বীজদল বীজ হইতে বহির্গত হইয়া, শুষ্ক না হইয়া ক্রমে বিস্তৃত সবুজবর্ণ পত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। ইহাই অনেক গাছে দেখা যায়। সমুদায় লাউ কুমড়া প্রভৃতি শাক সবজীর বৃদ্ধি এই প্রকার। এই সকল পত্রের বীজ হইতে বহিঃনির্গমন অতি সুন্দর। একটী লাউ গাছের অঙ্কুর উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাউক। অঙ্কুরিত হইবার সময় প্রথমে মূলটী বীজের ডগা হইতে বহির্গত হইল। পরে ইহা বেঁকিয়া গিয়া একটু ঘুরিয়া মাটির দিকে চলিল। এতক্ষণ ধরিয়া বীজদলই অঙ্কুরের খাদ্যের সংস্থান করিয়া আসিতেছিল। পরে মূলের শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া মূল মাটীর সহিত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল। এই সময় কলিরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলিটীর দুইটী প্রান্তই দৃঢ় আবদ্ধ, কারণ এক প্রান্ত মূলাকারে মাটীর সহিত বদ্ধ, অন্য প্রান্ত পত্রের সহিত বীজের মধ্যে আবদ্ধ। অথচ কলির বৃদ্ধির কামাই নাই, কাজে, কাজেই তাহাকে খিলানের ন্যায় একটু বাঁকিয়া যাইতে হয়।

এইরূপ বাঁকিয়া যাওয়া সত্ত্বেও যখন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন এক প্রান্তে অধিক টান পড়িতে

লাগিল। কিন্তু মূল, চাপের দ্বারা একটুও নড়িল না, কারণ উহা মাটীতে বদ্ধ সুতরাং বীজদলকেই এই চাপটা সমুদয় সহ্য করিতে হইল। এই চাপ হেতুই লাউয়ের বীজের খোলটা ফাটিয়া গিয়া পাতা দুইটী বাহির হইয়া আসিল। পরে কলিটী বাঁকা অবস্থা ত্যাগ করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং পত্রদ্বয় ক্রমে খুলিয়া গেল এবং প্রকৃত পল্লবের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতক্ষণ না সমুদায় পত্রটী বীজের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিল ততক্ষণ পত্রদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত থাকে নচেৎ তাহাদের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

এই সকল বীজদল পত্রের ন্যায় প্রায়ই সম্পূর্ণ ও অবিভক্ত এবং ইহারা দেখিতে প্রায়ই ডিম্বাকার হইয়া থাকে। এই সকল পাতা কখনও কখনও দ্বিধা, ত্রিধা বা চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইতে পারে। দুইটী পাতাই প্রায় একই প্রকারের হইয়া থাকে। কখনও কখনও একটী পাতা অন্যাপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিত হয় এবং অপরটী ক্রমে ক্ষীণ হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। যখন এই সকল পাতা বীজাভ্যন্তর হইতে বায়ু মধ্যে নীত হয় তখন তাহাদের কোষের মধ্যে পত্র-হরিৎ (Chlorophyl) জন্মিতে থাকে। তখন পাতাগুলি সবুজ বর্ণ হইয়া আইসে এবং বায়ু হইতে খাদ্যাহরণে কুশল হইয়া পড়ে। এই সকল পাতায়, সবুজবর্ণ পাতার যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন এবং সবুজ বর্ণ পাতার সংরক্ষণের জন্য কেশ, কাঁটা, শোঁয়া প্রভৃতি যে সকল অঙ্গের প্রয়োজন, ক্রমে তাহা জন্মিয়া থাকে। দুই একটী গাছে এই পত্রদ্বয়ই এক বৎসর পর্য্যন্ত গাছটীকে বাঁচাইয়া রাখে। কারণ প্রথম বৎসরে সে সকল গাছে আর অন্য পাতার উদ্গম হয় না। প্রায় অধিক গাছেই সত্বর অন্য অন্য পাতা নির্গত হইয়া থাকে এবং ইহারাও তাহাদের ন্যায় কার্য্য করিয়া তাহাদের সহিত স্থান পাইয়া থাকে।

যে সকল পত্র শাখা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে শাখা-পত্র বলে। গাছের কাণ্ডস্থ গাঁট হইতে শাখা-পত্র জন্মিয়া থাকে। এই সকল গাঁটের উপর, পত্রের কোণে নূতন শাখা উৎপন্ন করিবার জন্য কাক্ষিক মুকুলের আবির্ভাব হয়। এই হেতু প্রত্যেক পত্রোৎপত্তি স্থানের বিভিন্নতার উপর বৃক্ষের শাখা নির্গমনের পথও বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য কাণ্ড পার্শ্বে পত্রের উৎপত্তি স্থান কিরূপ, তাহা দেখা আবশ্যক।

আমরা প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থেই ভগবানের একটী অদ্ভুত শৃঙ্খলা দেখিতে পাই। প্রকৃতির কোন পদার্থই বিশৃঙ্খলা নহে। একটী আশ্চর্য্য নিয়ম বা ক্রমে প্রত্যেক ব্যাপার অন্যের সহিত সম্মিলিত। জগতে কত সহস্র সহস্র জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের কত সহস্র সহস্র পত্রোদ্গম হইয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই সকল পত্রোৎপত্তির একটী সুন্দর নিয়ম আছে। কাণ্ডপার্শ্বে পত্রের সুশৃঙ্খল অবস্থানকে পত্র-বিন্যাস (Phyllotaxis) কহে। পত্র সমূহ দুই প্রকার প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, প্রত্যেক গাঁট হইতে একটী মাত্র পাতা উদ্গত হইতে পারে। আতা এবং নোনা প্রভৃতি বহুসংখ্যক উদ্ভিদের কাণ্ড এবং শাখা প্রশাখার পত্র সমূহে লক্ষিত হইবে যে, প্রথম পাতাটী যে গ্রন্থি হইতে নির্গত হইয়াছে, দ্বিতীয় পাতাটী ঠিক তাহার উপবিস্থ গ্রন্থির অপর পার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়াছে। অতএব গোড়া হইতে গণিয়া গেলে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম প্রভৃতি পত্র ডালের এক দিকে অবস্থিত এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি পত্র ডালের অপর দিকে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপ ভাবে অবস্থিত পত্রকে বিপর্য্যস্ত (Alternate) পত্র কহে। ইহাদের অবস্থান প্রকার এইরূপ :—

৬

৫

৪

৩

২

১

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক গাঁট হইতে দুইটী বা ততোধিক পাতার সমাগম হইতে পারে। পেয়ারা, জাম প্রভৃতি বহুসংখ্যক উদ্ভিদের পত্র কাণ্ডের বা শাখার প্রত্যেক গ্রন্থির, উভয় পার্শ্বদেশ হইতে উৎপন্ন হয়। উভয় পত্রই এক সমতল ক্ষেত্রে অবস্থান করে। এই সকল পত্রকে অভিমুখ (Opposite) পত্র বলা যায়।

ছাতিম, করবী, বাঁদুলহাটী, প্রভৃতি বহুসংখ্যক

উদ্ভিদে প্রত্যেক গাঁট হইতে তিনটি বা চারিটি বা ততোধিক পাতা নির্গত হইতে দেখা যায়। এই সকল পাতা কাণ্ডকে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে বলিয়া ইহাদিগকে পরিগ্রন্থি (Whorled) পত্র বলিয়া থাকে। প্রত্যেক গাঁট হইতে কেবলমাত্র একটি পাতার নির্গমনই পত্রোদ্গম প্রণালীর আদর্শ। সুতরাং যেখানে একটি গ্রন্থি হইতে দুইটি বা তিনটি পাতার উদ্গম দেখা যায় তথায় দুইটি বা তিনটি গ্রন্থির একত্র সমাবেশ ও গ্রন্থি-মধ্যের (দুইটি গ্রন্থির ব্যবধান স্থানের) অন্তর্দ্ধান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বেগুণ জাতীয় দুই একটি গাছে একটি গাঁট হইতে দুইটি পাতার উৎপত্তি দেখা যায়। ইহা হয় দুইটি গ্রন্থির একত্র সমাবেশ মাত্র, অথবা একটি পাতাই বৃদ্ধির পূর্ব্বে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি পাতা উৎপাদন করিয়াছে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, পাতা বাড়িবার সময় ইহার বোঁটা কাণ্ডের পার্শ্ব হইতে বিভিন্ন না হইয়া কাণ্ডের সহিত জুড়িয়া গিয়াছে; তখন সেই পাতাটিকে প্রকৃত উৎপত্তি স্থান হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় না, তাহার উপর হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। এই সকল নানা কারণে পাতার উৎপত্তি স্থানের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

উল্লিখিত কারণগুলিই যে একগ্রন্থি হইতে একটী পাতার উৎপত্তি না হইয়া দুই বা তদধিক পাতার সমাগম আনয়ন করে, তাহার প্রমাণ এই যে, কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ডে ও শাখায় পত্রোদ্গম প্রণালী ত্রিবিধ প্রকারেই সমাহিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত জল বায়ু ও আলোক পাইলে, গাছের বৃদ্ধির সময় উপপত্র (Stipules) গুলিও পাতার ন্যায় সমান রূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই কারণেও একটী গ্রন্থি হইতে দুইটী বা তদধিক পত্রোদ্গম সম্ভব হইতে পারে।

বিপর্য্যস্ত পত্রগুলি আবার নানা রূপে সজ্জিত হইয়া থাকে। প্রকৃত বিপর্য্যস্ত-বিন্যাসে প্রথম পাতাটী যে স্থানে জন্মিয়াছে কাণ্ডের ঠিক বিপরীত দিকে দ্বিতীয় পাতাটী জন্মায় এবং তৃতীয় পাতাটী প্রথম পাতার ঠিক উপর হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব সেই গাছের পাতাগুলি দুইটী সারে সজ্জিত হইয়া থাকে,—একটী সারে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম পত্র প্রভৃতি এবং অপর সারে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ পত্র প্রভৃতি। নোনা, ও ঘাস জাতিতে এইরূপ বিন্যাস দেখা যায়। ইহাকে দ্বি-সারক বিন্যাস বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদ্যপি ঐরূপ দ্বিতীয় পাতাটী প্রথম পাতার অপর দিকে না জন্মিয়া কাণ্ডের ব্যাসের এক তৃতীয়াংশের ব্যবধানে জন্মায় এবং তৃতীয় পাতাটী অপর তৃতীয়াংশের ব্যবধানে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে চতুর্থ পাতাটী তৃতীয় পাতা হইতে সমান ব্যবধানে প্রথম পাতার ঠিক উপরে আসিয়া পড়ে, এইরূপে উৎপন্ন পাতার তিনটী সার হইতে পারে বলিয়া ইহাকে ত্রি-সারক বিন্যাস বলা যাইতে পারে। তাল, নারিকেল, গুপারি প্রভৃতি সমুদায় একবীজদল সম্পন্ন গাছেই এইরূপ বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পত্রের অবস্থান প্রকার এইরূপ :—

৭

৬

৫

৪

৩

২

১

কাণ্ডের গা দিয়া প্রত্যেক পত্রের বোঁটা ছোঁয়াইয়া যদ্যপি একটী লাইন কাটা যায়, তাহা হইলে সেই লাইনটী ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া (spirally) উঠিতে থাকে। দ্বি-সারক বিন্যাসে প্রথম পাতা হইতে দাগ কাটিতে আরম্ভ করিলে দ্বিতীয় পাতার বোঁটা ছোঁয়াইয়া তৃতীয় পাতার নিকট উপস্থিত হইলে দাগটী সমুদায় বৃক্ষটীকে বেষ্টন করে। এইরূপ ত্রি-সারক বিন্যাসে দাগটী চতুর্থ পত্রের নিকট আসিলে তবে তাহা দ্বারা সমুদায় বৃক্ষটী বেষ্টিত হইতে পারে। প্রথম পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ঠিক উপরকার পত্রের নিকট দাগটীকে উপস্থিত হইতে হইলে তাহাকে কতকগুলি পত্রের বোঁটা ছুঁইয়া আসিতে হইবে এবং হয়ত প্রথম পত্রের ঠিক উপরকার পত্রের নিকট আসিতে হইলে দাগটীকে একবার, দুইবার বা অনেকবার বৃক্ষের পরিধিকে বেষ্টন করিয়া যাইতে হইবে। ইহা এইরূপে সহজে প্রকাশ করা

হয় :—প্রথম পাতাটীর ঠিক উপরকার পাতার দাগটীকে আসিবার জন্ম যতবার বৃক্ষের পরিধিকে বেষ্টন করিতে হইবে, তাহাকে একটী ভগ্নাংশের উপরে রাখিয়া এবং উক্ত কার্য্যে দাগটী যতগুলি পাতার বোঁটা ছুঁইয়া যাইবে তাহাদের সংখ্যাটী নিয়ে রাখিলেই হইল। এইরূপে দ্বি-সারক বিন্যাসে, দাগটী বৃক্ষের পরিধিকে একবার বেষ্টন করে ও দুইটী পাতা ছুঁইয়া আইসে বলিয়া ইহা $\frac{1}{2}$ এই ভগ্নাংশের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এইরূপ ত্রি-সারক বিন্যাসে দাগটীকে প্রথম পাতা হইতে তাহার ঠিক উপরের পাতার নিকট আসিতে হইলে একবার গাছকে বেষ্টন করিতে হইবে এবং তিনটী পাতার বোঁটা ছুঁইয়া আসিতে হইবে এইজন্য তাহা সংক্ষেপে $\frac{1}{3}$ এই ভগ্নাংশের দ্বারা সহজে প্রকাশ করা যায়। এই ভগ্নাংশটী আর একটী বিষয়ও আমাদের জানাইয়া দেয়। ইহাদ্বারা আমরা প্রত্যেক পাতার ব্যবধানের দূরত্বও বুঝিতে পারি। অর্থাৎ $\frac{1}{3}$ এই ভগ্নাংশের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে গাছের পরিধিকে তিন ভাগে ভাগ করিলে যে দূরত্ব হয় পাতা দুইটীও সেই দূরত্বের ব্যবধানে উৎপন্ন। পঞ্চ-সারক বিন্যাসে ষষ্ঠ পাতাটী প্রথম পাতার ঠিক উপরে অবস্থিত। দাগটী প্রথম হইতে ষষ্ঠ পত্রে উপনীত হইবার সময় দুইবার বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া আইসে এবং পাঁচটী পাতা ছুঁইতে হয় বলিয়া ইহা $\frac{2}{5}$ এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে। কলা গাছে প্রথম পাতাটীর উপর নবম পাতাটী সজ্জিত, অতএব দাগটীকে নবম পাতাটীর নিকট উপস্থিত হইতে হইলে তিনবার কাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া উঠিতে হয় এবং আটটী পাতা ছুঁইয়া যাইতে হয় এই জন্ম ইহা $\frac{3}{8}$ ভগ্নাংশে প্রকাশিত হইতে পারে।

উক্ত $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{8}$, প্রভৃতি, সংখ্যাগুলি একত্র রাখিলে পরি আমরা একটী আশ্চর্য্য মিলন দেখিতে পাই তাহা এই যে, প্রত্যেক ভগ্নাংশের ভাজ্য ঠিক তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী ভগ্নাংশের ভাজ্যের (Numerator) একত্র যোগে এবং তাহাদিগের ভাজক রা পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী ভাজকের (Denomenotor) একত্র যোগে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং সত্য সত্যই প্রকৃতিতেও এইরূপ দেখা যায় যে অন্যান্য গাছের বিন্যাসগুলি $\frac{5}{13}$ $\frac{8}{21}$ প্রভৃতি ভগ্নাংশে সজ্জিত আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যবর্ত্তী আর কোন বিন্যাস নাই।

পত্রগুলির উৎপত্তি স্থানের দূরত্ব গ্রন্থিমধ্যের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। গ্রন্থিমধ্যগুলি এত ছোট হইয়া যাইতে পারে যে অনেকগুলি পত্র একস্থান হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হইবার সম্ভাবনা। আঁইস-পত্রগুলি প্রায়ই এই কারণে একস্থান হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। কলা, আদা প্রভৃতি গাছের পাতা এঁটে বা গেঁড়ো হইতে অল্পস্থানের মধ্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয় যে, তাহারা একস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ কেবলমাত্র গ্রন্থিমধ্যের বৃদ্ধির অভাব হেতু পত্রগুলি ঐরূপ একত্র সমষ্টিবদ্ধ হইয়া থাকে। লার্চ (Larch) গাছে একটী শাখার সমস্ত গ্রন্থিমধ্যগুলি বৃদ্ধি পায় না, সুতরাং শাখার প্রায় সমস্ত পত্রগুলি শাখার উৎপত্তিস্থানের পত্রকোণে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হয়।

অভিমুখী পত্রগুলিরও ব্যবচ্ছেদে পত্রের ন্যায় নিক্রমণের বিশেষ নিয়ম আছে। ইহাদেরও পত্রসংখ্যা নিরূপণের জন্য ভগ্নাংশ ব্যবহার করা হয়, কেবলমাত্র অভিমুখী পত্র বুঝাইবার জন্ম ভগ্নাংশটীকে একটী ব্রাকেটের মধ্যে পুরিয়া রাখিতে হয়। যেমন বেল ফুলের গাছের পত্রের সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইলে অর্থাৎ একটী বিশেষ পত্রের ঠিক উপরের পত্রের নিকট একটী লাইনকে ডাঁটার গা দিয়া ঘুরিয়া উঠিতে হইলে যে সকল পত্রের উৎপত্তিস্থানের নিকট দিয়া যাইতে হয় সেই সকল পত্রগুলির সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইলে ($\frac{1}{2}$) রাখিলেই চলে। ইহাতেও এই বুঝায় যে সেই দাগটী একটী পাতা হইতে তার ঠিক উপরের পাতার নিকট পৌঁছিতে একবার মাত্র কাণ্ডকে পর্য্যটন করিয়াছে এবং পথে দুইটী পাতার উৎপত্তি স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অভিমুখী পত্রদ্বয় প্রায়ই একান্তর (alternate) ভাবে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এক জোড়া পত্র উপরের জোড়ার ঠিক আড়ভাগে থাকে। এইরূপ পত্রকে চতুষ্কোণী (Decusate) পত্র বলে। বেল ফুলের গাছের, পিয়ারা প্রভৃতি গাছের পত্র এইরূপ। তিনটী পাতা একটী গাঁট হইতে উৎপন্ন হইয়াও ঐরূপে সজ্জিত হইতে পারে।

আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে অভিমুখী পত্রের গ্রন্থিমধ্যের বৃদ্ধি হেতু ব্যবচ্ছেদি-পত্রের উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২
.
৫
৩ ' ৮ ৭ . ৪
৯
.
৬
.
১

উপরস্থিত চিত্র হইতে ইহা বেশ উপলব্ধি হইবে যে প্রথম পত্রদ্বয় সকলের নীচে অবস্থিত তাহার ঠিক উপরে আড়ভাগে আর এক জোড়া অর্থাৎ ৩।৪ সংখ্যক পত্রদ্বয় অবস্থিত পুনরায় তাহাদের উপরে ও আড়ভাগে ৫।৬ পত্রদ্বয় এবং তাহাদের আড়-ভাগে ও ৩।৪ সংখ্যক পত্রের উপরে ৭।৮ সংখ্যক পত্র অবস্থিত। যখন পাতাগুলি কচি থাকে তখন অভিমুখী বা ব্যবচ্ছেদী পত্রের পার্থক্য বুঝা যায় না; কিন্তু তখনও ষষ্ঠ পাতা প্রথম পাতার ঠিক উপরে থাকে এবং, নবম পত্র তাহার উপরে থাকে। এইরূপ সজ্জা অভিমুখী ও ব্যবচ্ছেদী দুই প্রকার পত্রেরই সম্ভব। কেবল গ্রন্থিমধ্যগুলির উপযুক্ত বৃদ্ধির অভাব হেতু তাহারা অভিমুখী হইয়া যায়।

শ্রীবিরিঞ্চিমোহন কর।

গার্হস্থ্য ওলাউঠার চিকিৎসা।

রোগ-প্রতিষেধক।

যে সকল স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়ম ও উপায় অবলম্বনে এবং প্রতিপালনে ওলাউঠা রোগ না হইতে পারে, তাহাদিগকে উক্ত রোগ-প্রতিষেধক অথবা রোগ-নিবারণের উপায় কহে। এতদ্বিষয় সর্ব্বাগ্রে সকলেরই বিশেষরূপ জ্ঞাত থাকা কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অজ্ঞতা, অনবধানতা ও ঔদাস্য অধিকাংশ স্থলে এই কয়েকটী উক্ত পীড়ার উৎপত্তির কারণ বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে এই রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কতিপয় সহজ উপায় নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল।

আঘ্রাণ।—ওলাউঠা রোগীর বাহ্যে ও বমনের গন্ধ কোন প্রকারে শরীরস্থ না হয়, তাহা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ উহা দ্বারা উক্ত রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

তামার চাকতী।—ওলাউঠা প্রবল কালে এক একটী তামার চক্তী অথবা পয়সা ছিদ্র করিয়া তলপেটে ঘুনসীর সহিত বাঁধিয়া রাখিলে এই পীড়া প্রায় আক্রমণ করে না। ইহার কারণ, এই যে ডুমা নামক জনৈক রসায়ন বিদ্যাবিৎ ডাক্তার বহু অনুসন্ধান দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে তাম্রকারদিগের মধ্যে প্রায় এই রোগ হয় না, এবং যদি কখনও হয়, তাহা চিকিৎসা সাধ্য। আমাদের দেশে পূজা ও সন্ধ্যাবন্দনার সময় যে তাম্রের বাসন ব্যবহারের নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহাও ওলাউঠা রোগ-প্রতিষেধকের পক্ষে একটী প্রধান কারণ।

গন্ধক।—অপর ডাক্তার হেস্লিং বলেন, গন্ধক ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক। এক দিন অন্তর প্রস্রাবে প্রায় এক ভরি, গন্ধকচূর্ণ আঙ্গুলের মোজা বা জুতার মধ্যে রাখিয়া ব্যবহার করিলে ক্রমে ক্রমে তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ওলাউঠার বিষ বিনষ্ট করে, সুতরাং উক্ত রোগ আর জন্মিতে পারে না। এরূপ দেখা গিয়াছে যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে এক জনও ওলাউঠা রোগগ্রস্থ হন নাই। ওলাউঠা মারিভয়ের সময় তিনি আরো উক্ত নামের (সল্ফর) ঔষধের ১ম অথবা ৬ষ্ঠ ক্রম প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে একবার করিয়া খাইতে বলেন। গন্ধক যখন উক্ত রোগোৎপাদক কীটাণুর ধ্বংসকারক তখন প্রতি গৃহস্থ ও দোকানদারেরা দুই বেলা ঘরে ধুম প্রয়োগ কালে কখন কখন তাহার সঙ্গে স্বল্পপরিমাণে গন্ধক মিশাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু অধিক পরিমাণে দিলে গন্ধকের ধূমে কাশির পীড়া আনীত হয়।

লবণ।—বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রাকৃতিক নিয়ম যতই প্রচারিত হইবে ততই আমাদের মঙ্গল। গম্পেল নামক এক জন ডাক্তার বলেন, যে লবণ আমরা প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা একটুকু লইয়া এক গ্লাস বিশুদ্ধ জলে মিশাইয়া ওলাউঠা প্রবল কালে প্রত্যহ প্রাতঃকালে খালিপেটে পান করিলে প্রতিষেধকের কার্য্য করে। বাস্তবিক রসায়ন বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে মানব দেহে লবণাক্ত দ্রব্যের ভাগ কম হইলে ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হয়। তাঁহারা বলেন, যে মনুষ্যের শোণিতে ও ঘর্ম্মে ফস্ফেট অব সোডা এবং লবণ মিশ্রিত আছে বলিয়া আমাদের গাত্রের ঘর্ম্ম ও রক্ত লবণাক্ত স্বাদ।

সোহাগা।—বিলাতের এক খানি চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, সোহাগা ব্যবহারে ওলাউঠার ব্যাসিলস্ নামক কীটাণু বিনষ্ট করে। উহা ক্রমে ক্রমে স্বল্প পরিমাণে খাইতে হয়। উহার প্রমাণার্থে এরূপ লিখিত হইয়াছে যে বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে ইটালী এবং ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানে যখন ওলাউঠার ভয়ানক মড়ক উপস্থিত হইয়া অসংখ্য লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছিল, তখন যাহারা সোহাগার কারখানায় কার্য্য করিত, তাহাদের মধ্যে একজনও উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হয় নাই।

"কুপ্রম" ও "ভেরেট্রম"।—পল্লিতে ওলাউঠার মারীভয় উপস্থিত হইলে কেহ কেহ ডাক্তার রুবিণী কৃত কর্পূরের আরক (ইংরাজীতে ইহাকে "ক্যাম্ফর" কহে) প্রত্যহ এক ফোঁটা মাত্রায় দিবসে দুইবার সেবন করিতে বলেন। কিন্তু ডাক্তার লুজি সাহেব "কুপ্রম" ও "ভেরেট্রম" নামক ঔষধদ্বয় ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন। তিনি আরও বলেন যে, সুস্থ শরীরে সে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা শ্রেয়ঃ নহে। পেটবেদনা, পেটখুঁচানি এবং উদরাময় লক্ষণে ছয়টী "কুপ্রমের" অণু বটিকা ছয় চামচে জলে গুলিয়া সেই জল এক এক চামচে দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিলে পূর্ব্বকার মত স্বাস্থ্য লাভ হয়। তিনি কর্পূরের আরককে ওলাউঠার প্রতিষেধক বলিয়া গণ্য করেন নাই।

স্নান ও বাতাসা, মিচ্রি ও চিনির পানা।—ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালীন কোন প্রকার উদরাময় উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিবে, নচেৎ ঐ রোগ ভয়াবহ হওয়া সম্ভব। ভেদ বা বমন উপস্থিত হইলে স্নান করা বা বাতাসা, মিচ্রি ও চিনির পানা কোন মতেই ব্যবহার করা উচিত নহে; কারণ ঐ সকল কার্য্যদ্বারা উপকার না হইয়া বরং বিশেষ অপকার হইয়া থাকে। এমন কি, উহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে দেখিয়াছি।

উদরাময় থাকিলে স্নান করা নিষিদ্ধ। অনেক লোক, দুই একবার ভেদ হইলে, গরম হইয়াছে বলিয়া স্নান করেন। এরূপ স্থলে স্নান করিলে, পীড়া প্রায় ভয়ানকরূপে আক্রমণ করে।

বাসগৃহ।—পরিষ্কার ও দুর্গন্ধবিহীন বাটীতে বাস করা নিতান্ত আবশ্যক। শয্যাগৃহে যাহাতে অবিরত নির্ম্মল বায়ু সঞ্চারিত হয় এরূপ ব্যবস্থা করিবে। বাটীর আঁস্তাকুড়, নর্দ্দমা ও পাইখানা সর্ব্বদা পরিষ্কৃত ও শুষ্ক রাখা উচিত এবং সময়ে সময়ে গুঁড়া চুণ, আলুকাৎরা কার্ব্বলিক এসিড্ ও ফিনাইল জলের সঙ্গে মিশাইয়া সেই সেই স্থানে ছড়াইতে হয়। ক্ষুদ্র বাড়ীতে বহুসংখ্যক লোক একত্রে বাস করিলে বায়ু দূষিত হইয়া ওলাউঠা জন্মে।

বায়ু ও জল।—বিশুদ্ধ বায়ুসেবন ও নির্ম্মল শীতল জলপান করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই দুই পদার্থ আমাদের জীবনস্বরূপ, এবং তাহাদের পরিশুদ্ধির প্রতি আমাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কারণ দূষিত জল ও বায়ুর মধ্যে ওলাউঠার কীটাণু অবস্থিতি করতঃ সহজেই আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনিষ্ট করে। ডাক্তার কোহ্ সাহেব আকায়াব নগরের ওলাউঠার মহামারি সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন যে, বর্ম্মা দেশীয় লোকেরা অপরিষ্কার জলপান করাতে বহু সংখ্যক ব্যক্তি উলাউঠা রোগে মরিয়া যায়। তদ্দেশস্থিত মগেরা যে পর্য্যন্ত দূষিত পুষ্করিণীর জল পান করে নাই, সে পর্য্যন্ত তাহারা কোনক্রমে উক্ত রোগাক্রান্ত হয় নাই। তৎ স্থানীয় ১৬০ জন চীনেরা কেবল মাত্র গরম জল ও চা পান করিত, তাহারা সকলে সুস্থ ছিল। সেই সময়ে এক খানি মার্কিন জাহাজ তথায় উপস্থিত হয়, পোতস্থিত ব্যক্তিরা যে পর্য্যন্ত পোতসঞ্চিত জল ব্যবহার করিতেছিল, সকলেই ভাল ছিল। পরে সেই বারি নিঃশেষ হওন কালে পরীক্ষা স্বরূপ কাপ্তেন ও অপর তিন জন সেই স্থানের জলপান করেন। চারি জনেরই ওলাউঠা পীড়া জন্মে, তন্মধ্যে দুই জন মরিয়া যান।

কলিকাতায় এক্ষণে কলের জল হওয়াতে আমাদের অনেক মঙ্গল হইতেছে, কিন্তু এমন অনেক স্থান আছে যথায় বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে জল গরম করিয়া কয়লা ও বালিপূর্ণ কলসের মধ্য দিয়া উহা শোধিত করিয়া লইলে উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিবার অনেক সম্ভাবনা। এরূপ আরও প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে একমাত্র জলের দোষে স্থান বিশেষের লোকদিগের গলগণ্ড, গোদ, ও কয়েক প্রকার চর্ম্মরোগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কোনক্রমে শরীরে ঠাণ্ডা লাগাইবে না, এবং হঠাৎ শরীরের ঘর্ম্ম শীতল বাতাস বা জলদ্বারা বন্ধ করিও না। এতদ্ভিন্ন আহারের বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য।

খাদ্য।—অধিক ঘৃতপক্ক বা গরম মসলা সংযুক্ত খাদ্য এবং কোন প্রকার কাঁচা, পচা, বাসি বা টক্ ফলও দ্রব্যাদি খাওয়া উচিত নহে। আউস বা নূতন চাউল, লাউ, কুমড়া, শসা, ফুটী, তরমুজ, বাঁধা কপি, তাল, কাঁঠালের আস,

পেয়ারা, বিচি, শাক, বেগুণ কাঁচা ফল, বাজারের খাবার, ইলিস মৎস্য, গলা, পচা শুঁটকি মৎস্য এবং মাংস প্রভৃতি দ্রব্য যাহা খাইলে উদরাময় হওয়া সম্ভব, তাহা ভক্ষণ নিষিদ্ধ। খাদ্যদ্রব্য সর্ব্বদা ভালরূপে ঢাকিয়া রাখা উচিত, কারণ ওলাউঠার মলের উপর মাছি মশা প্রভৃতি কীটাদি বসিয়া কোন খাদ্যদ্রব্যের উপর বসিলে তাহাদের পদদ্বারা সেই বিষ উহাতে আনীত হয় এবং সেই খাদ্য ভক্ষণে পীড়া জন্মে।

মাদক দ্রব্য।—কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা কোন মতে উচিত নহে, এমন কি, তামাক চা কাফি অধিক পরিমাণে সেবন করা নিষিদ্ধ। তামাকে "নিকোটিন", কাফিতে "কাফিন", এবং চাতে "থিন" নামক মাদক পদার্থ থাকায় সে সকল দ্রব্য সেবনে পাকযন্ত্রের দোষ জন্মে, যথা, ক্ষুধামান্দ্য, পাককৃচ্ছ্রতা এবং অজীর্ণতা ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে।

নিরামিষ ভোজন।—ওলাউঠা মড়কের সময় মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজনে অনেক শুভজনক ফল দেখা গিয়াছে। লোকহিতৈষী হাউয়ার্ড সাহেব মৎস্য মাংস না খাইয়া মারীভয় স্থানের রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়া এক দিনের জন্যও পীড়িত হন নাই। নিউইয়র্কের অন্তঃপাতী আলবানী নামক স্থানে একটী অনাথ-নিবাস ছিল। তথায় দরিদ্র বালকদিগের মধ্যে সর্ব্বদা ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হওয়াতে প্রায় প্রতি মাসে এক জন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। পরে তাহাদিগের মধ্যে নিরামিষ ভোজন প্রচলন দ্বারা উক্ত রোগ নিবারিত হইয়াছিল। অতি অল্প দিন হইল কলিকাতায় একবার গ্রীষ্মকালে ওলাউঠার বড় প্রাদুর্ভাব হয়। তৎকালে মদগুর ও অপরাপর মৎস্যের ভিতরে এক প্রকার কীটাণু দর্শনে কিছুকালের জন্য অনেকে মৎস্যভক্ষণ রহিত করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হন। কোন কোন মৎস্য শব ভক্ষণ করে বলিয়া সেই সেই মৎস্য ভক্ষণে বিরত থাকা উচিত।

আহারের নিয়ম।—"ক্ষুধা না থাকিলে কখন ভোজন করিবে না"—এই নিয়মটির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে অনেক সময় অর্শের রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। নিয়মিত সময়ে আহার করা উচিত। দিবসে ৯টা ও রাত্রে ৮টার মধ্যে আহার করিবে। অসময়ে আহার নিষিদ্ধ। যে সকল খাদ্য সহজে পরিপাক হইবার নহে ও যাহাতে উদরাময় হওয়া সম্ভব, সে সমস্ত দ্রব্য পুষ্টিকর ও বলকারক হইলেও কদাচ খাইবে না। রাত্রিকালীন আহার কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিমিত ও সুপাচ্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালে গোয়ালার দধি দুগ্ধ ও বাসি দুগ্ধ খাওয়া অনুচিত। দুগ্ধ গরম না করিয়া কখন খাওয়া উচিত নহে। ঠাণ্ডা দুগ্ধে সহসা এক প্রকার কীটাণু জন্মে।

বিশুদ্ধ গো দুগ্ধ ব্যবহার।—আজ কাল অনেকেই বাজারের দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন, কিন্তু বাজারে প্রায় বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া সুকঠিন। সেই সকল দুগ্ধ ফুকা দেওয়া, অথবা পীড়িত গাভী হইতে দোহা কিম্বা মহিষের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করা প্রভৃতি নানা কারণে দূষিত হইয়া থাকে; ঐরূপ দুগ্ধ সেবন ওলাউঠা রোগোৎপত্তির অন্যতম কারণ। বিশেষতঃ যে গোয়াল ঘর অতিশয় অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধময়, সে গোয়ালে দুগ্ধ দোহন করিয়া রাখিলে তাহাতে এক প্রকার বেসিলাস নামক কীটাণু জন্মে, এবং সেই দুগ্ধ পানে ওলা-উঠার উদ্ভব হয়। এই জন্য আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে গোয়াল ঘর পরিষ্কার ও পবিত্র রাখিবার প্রণালী চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে ব্যবসায়ী অজ্ঞ গোয়ালাদের দুগ্ধ পানে অনেক প্রকার পীড়া জন্মিতেছে। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত ডাক্তার কোট সাহেব যে ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন, বাজারের দূষিত দুগ্ধপান তাহার প্রধান-তম কারণ। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সকল গৃহস্থের বাটীতে গাভীপালন প্রথা প্রচলন হেতু সকলেই বিশুদ্ধ দুগ্ধপান করিতে পাইতেন, এবং সেই কারণে ওলাউঠা রোগেরও সে সময়ে তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না।

শারীরিক ও মানসিক সাবধানতা।—অধিক বা গুরু আহার, ইন্দ্রিয়সেবন, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত সুরাপান, মনের উত্তেজনা, অতিশয় শারী-

[illegible] ও মানসিক পরিশ্রম, অগ্নি বা রৌদ্রের উত্তাপে অধিকক্ষণ থাকা, ইত্যাদি কোন প্রকার অনিয়ম করা উচিত নহে। বিশেষতঃ যে গৃহে সর্ব্বদা আগুন থাকে, তথাকার বায়ুও অস্বাস্থ্যকর হয় বলিয়া সেস্থানে অবস্থান করা কোনক্রমে উচিত নহে।

পল্লিতে ওলাউঠার মহামারী উপস্থিত হইলে কোন মতে ভীত না হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ ও দৃঢ়সঙ্কল্প হওতঃ প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করা উচিত। কারণ মনের সহিত শরীরের বড় নৈকট্য সম্বন্ধ; মন ক্ষুণ্ণ হইলে শরীরও অসুস্থ হয়। এজন্ত ব্যায়াম, আহার ও নিদ্রার সময় প্রসন্ন ও প্রফুল্লচিত্ত থাকা অতি আবশ্যক। উৎকট ভয়, দুর্ভাবনা, দ্বেষ, অসূয়া, ক্রোধ, নৈরাশ্য, চিন্তা ও অতিশয় উল্লাস প্রযত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে।

পরিশ্রম।—শরীর দুর্ব্বল থাকিলে সহজেই এই রোগ আক্রমণ করিতে পারে, তজ্জন্ত যাহাতে অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে দেহ ক্ষয় না হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। সকলেরই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে থাকিয়া নিয়মিতরূপে বহির্বায়ুতে পরিশ্রম করা বিধেয়।

পূর্ব্বস্বাস্থ্য।—ডাং মোরহেড্ বলেন যে পূর্ব্বে কোন পীড়াবশতঃ শরীর দুর্ব্বল থাকিলে ওলাউঠা হইবার অনেক সম্ভাবনা।

পরিধেয়।—যেরূপ পরিধেয় ব্যবহার করিলে অন্তঃকরণের প্রফুল্লতা সম্বর্দ্ধিত এবং শরীরের সন্তাপ সমভাবে রক্ষিত হয়, সেইরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করিবে। ভিজে কাপড়, মোজা ও কষ্টদায়ক বা কষা জুতা এবং বস্ত্রাদি ব্যবহার করা কখনও উচিত নহে।

স্তন্যপান।—শিশুর মাতার ওলাউঠা হইলে শিশুটিকে কোনক্রমে তাঁহার অতি ক্ষীণ ও পীড়িত শরীরের দূষিত স্তন্যপান করিতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তদ্দ্বারা উভয়ের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

জনতা।—মেলা এবং তীর্থস্থানে অধিক লোকের সমাগমে, যাত্রা, বিবাহ, নিমন্ত্রণ ইত্যাদি উপলক্ষে সঙ্কীর্ণ স্থানে অধিক জনতা হেতু এবং [illegible] ও শারীরিক দ্রব্যের দোষে উক্ত পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই সকল স্থানে অবস্থিতি কালে অতি সাবধান হওয়া উচিত।

হিন্দু পদ্ধতির উপকারিতা।—হিন্দু গৃহস্থের যে সকল নিয়ম পদ্ধতি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করা আমাদের কোন মতে শ্রেয়স্কর নহে। সেই সকল বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত বাক্যের প্রতি উপেক্ষা করিলে ঘটনাক্রমে উক্ত পীড়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; তজ্জন্য সংক্ষেপে নিম্নে কয়েকটী বাক্য নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এই সকল বাক্যের গূঢ়মর্ম্ম সেকালের লোকেরা বহু জ্ঞান ও অনুসন্ধান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের সেই সকল নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।

১। অনর্থক হাত উচ্ছিষ্ট করিতে নাই ও হাত এঁটো হইলে তৎক্ষণাৎ ধৌত করা উচিত।

২। আহারের পূর্ব্বে হাত ধুইয়া আহার করা উচিত।

৩। বাজারের কাঁচা তরকারী প্রভৃতি ঘরে তুলিবার পূর্ব্বে ধৌত করিয়া লইতে হয়। *

৪। নিরামিষ ও আমিষ দ্রব্য এক সঙ্গে বাজার হইতে মিশাইয়া আনিতে দিতে নাই।

৫। যার্ তার্ হাতে খাইতে নাই।

৬। শয়নাগারে, রন্ধনশালায় ও ঠাকুরঘরে জুতা পায়ে দিয়া যাইতে নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।
প্রাচীন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার,
৩ নং চোরবাগান লেন, কলিকাতা।

---

* এতৎসম্বন্ধে এরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে যে অনেক ডাক্তার কোন তরকারী বিক্রেতার পুত্রের ওলাউঠার চিকিৎসা করিতে যান। তথায় যাইয়া দেখিলেন রোগী যে তক্তাপোশে শয়ান রহিয়াছে, তাহার নিম্নে তরকারির ঝাকা। রোগীর মলমূত্রাদি সমুদায় তাহার উপর পড়িতেছিল। ডাক্তার মহাশয় তদ্দর্শনে অবাক্ হইয়া বলিতে লাগিলেন যে এই দ্রব্যগুলি যাহারা ব্যবহার করিবে তাহারা অবশ্য ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ সকল তরকারী ধৌত করাইয়া স্থানান্তরে রাখিতে বলিলেন। অনেকে বোধ দেখিয়াছেন যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বাজারের চেঙ্গারী হইতে বেগুন পটল ইত্যাদি তুলিয়া লইয়া শিশুর হাতে দিয়া ভুলাইয়া থাকেন। [illegible] স্ত্রীলোকেরা বাজারের তরকারি ধৌত না করিয়া [illegible] তুলেন না।

কস্তুরী।

বৃটীশ বাণিজ্য বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যেই ইংরাজ তিব্বতবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন সে বাণিজ্য কিরূপ বৃদ্ধি হইবে তাহা ভবিষ্যতে ফলের দ্বারা পরিচিত হইবে কিন্তু এই ঘটনায় তিব্বতীয়রা ভারতে বাণিজ্য করিতে সাহস করিবেন কি না তাহা বলা যায় না। তিব্বতের বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে কস্তুরী বা মৃগনাভি একটা প্রধান সামগ্রী। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন প্রসিদ্ধ হীরক ব্যবসায়ী ট্যাভার্নিয়ে এদেশে আসিয়াছিলেন তখন তিনি বহুমূল্য পণ্যের মধ্যে মৃগনাভির নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। ট্যাভার্নিয়ে প্রধানতঃ গোলকণ্ডার হীরকের ব্যবসা করিতেন, তিনি বলিয়াছিলেন যদি সতর্কতার সহিত ভুটান হইতে মৃগনাভির ব্যবসা করা যায় তাহা হইলে বিলক্ষণ লাভবান হওয়া যায়। ট্যাভার্নিয়েব সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত অল্পাধিক পরিমাণে তিব্বতের সহিত ভারতের এই মৃগনাভির ব্যবসা চলিতেছে। প্রাচীন কালে তিব্বৎ হইতে এদেশে মৃগনাভি আসিত কি না বলা যায় না, সম্ভবতঃ আসিত না, যেহেতু আমরা কোন গ্রন্থাদিতে তিব্বতী মৃগনাভির পরিচয় পাই না, যে ত্রিবিধ মৃগনাভি আছে তৎসম্বন্ধে রাজনির্ঘণ্ট প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়:—

কপিলা পিঙ্গলা কৃষ্ণা কস্তুরী ত্রিবিধা ক্রমাৎ।
নেপালেঽপিচ কাশ্মীরে কামভূপেঽপি জায়তে॥
কামভূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীরদেশসম্ভূতা কস্তুরীহ্যধমা স্মৃতা॥

ইহাতে তিব্বতের কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক এক্ষণে তিব্বৎ হইতে যে যথেষ্ট পরিমাণে মৃগনাভি আমদানী হইয়া থাকে তাঁহা এই নিম্নে যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে।

পুরুষ জাতীয় কস্তুরী মৃগের নাভি হইতেই যে মৃগনাভি উৎপন্ন হয় ইহা সকলেই জানেন। এই মৃগ যে কেবল তিব্বতেই আছে তাহা নহে। নেপাল, [illegible] উত্তর চীন ও সাইবিরিয়া দেশের [illegible] পর্ব্বতে বহু সংখ্যক কস্তুরী মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গসমূহের সর্ব্বত্রই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে ইহারা পর্ব্বতের ৮০০০ [illegible] নীচে আর নামে না। ফাল্গুন চৈত্র মাসে [illegible] শস্যের অঙ্কুর সকল খাইবার লোভে যখন উহারা ক্ষেত্র মধ্যে আসিয়া থাকে তখন কৃষকেরা উহাদিগকে ধরিবার জন্ত ফাঁদ পাতিয়া রাখে এবং সেই ফাঁদে পড়িলেই মারিয়া মৃগনাভি লইয়া থাকে। পূর্ব্বে মৃগনাভি সকল রাজার ধন বলিয়া বিবেচিত হইত, এই জন্ত কস্তুরী মৃগ ধরিবার জন্য রাজা দলের লোক নিযুক্ত থাকিত। পৃথিবীর মধ্যে তিব্বৎ ও আনাম প্রদেশেই প্রচুর পরিমাণে কস্তুরী পাওয়া যায় এবং তথা হইতে স্থল পথে চীন, টঙ্কিন ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়। এই দুই স্থানের কস্তুরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং উহা সাধারণতঃ চীন দেশের মধ্য দিয়া অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয়। সাইবিরিয়া মৃগনাভি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

তিব্বৎ, নেপাল, সিকিম ভুটান, মাস্মা ও মিসমি পাহাড় হইতেই ভারতে মৃগনাভি আমদানী হইয়া থাকে। ব্রহ্মের উত্তর সান বিভাগ শ্যাম দেশ ও পশ্চিম চীন হইতেও ইহা কতক পরিমাণে আমদানী হয়। উপরে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে মৃগনাভির তিন প্রকার বর্ণ আছে যথা কপিল, পিঙ্গল ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহার মধ্যে কামরূপের কৃষ্ণবর্ণ মৃগনাভি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অনেকে অনুমান করেন যে, যাহা কামরূপী মৃগনাভি বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা প্রকৃত পক্ষে তিব্বতী। তিব্বৎ হইতে কামরূপের পথে আমদানী হয় বলিয়াই এ দেশ বাসীরা উহাকে “কামভূপোদ্ভবা” অর্থাৎ কামরূপের উৎপন্ন সামগ্রী বলিয়াই মনে করিত। নেপালের মৃগনাভি পিঙ্গল বা নীলাভ, উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মৃগনাভি। আর কাশ্মীরী মৃগনাভি বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ তাহা কাশ্মীরজাত নহে। উহা চাংথান হইতে [illegible] চালান হয় এবং তথা হইতে কাশ্মীরের লে নামক স্থানে আমদানী হয়। লে-তে মৃগনাভির মূল্য ৫৷৵০ হইতে ১২ টাকা।

কস্তুরী মৃগকে ফাঁদে ধরিয়া বা গুলি [illegible] মারা হইলে শিকারীরা উহার [illegible] কাটিয়া লয়। ঐ নাভিমধ্যে এক [illegible]

রক্তের ন্যায় পদার্থ থাকে, নাভিটি কাটিয়া রাখিলে সপ্তাহের মধ্যে তাহা শুকাইয়া যায়। উহাই কস্তুরী। শিকারীরা সেই সলোম শুষ্ক নাভি বিক্রয় করিয়া থাকে। এই নাভি গুলির ওজন সচরাচর ২ তোলা এবং উহার মূল্য ১০ টাকা হইতে ২৫ টাকা। রকহিল (Rockhill) নাম একজন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী মঙ্গোলিয়া প্রদেশে ও তিব্বতের সন্নিকটে ভ্রমণ কালে কতকগুলি মৃগনাভি ক্রয় করিয়াছিলেন; তিনি উহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার সমুদয় পাথেয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন বাউয়ার (Bower) নামে আর একজন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন যে তাসিলিং নামক স্থানে তিনি সাত টাকায় তিনটা মৃগনাভি ক্রয় করিয়াছিলেন। রকহিল সাহেব বলেন এ সকল নিকৃষ্ট মৃগনাভি; উৎকৃষ্ট মৃগনাভি দশ টাকা বার টাকার কম একটি পাওয়া যায় না।

মৃগনাভির এইরূপ উচ্চ মূল্যের জন্য ব্যবসায়ীরা অনেক সময়ে প্রতারণা করিয়া থাকে। শিকারীরা কৌশল করিয়া নাভির চামড়া কাটিয়া কস্তুরী বাহির করিয়া লয় এবং সেই চামড়ার থলির মধ্যে কোন প্রাণীর শুষ্ক যকৃৎ বা রক্ত পুরিয়া দিয়া উহা বেমালুম সেলাই করে। কেহ কেহ উহা ওজনে ভারি করিবার জন্য ঐ শুষ্ক রক্তের সহিত সীসা ভরিয়া দেয়। একজন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন, শিকারীরা জীবন্ত হরিণকে জোঁক লাগাইয়া রক্ত বাহির করিয়া লয় এবং শুকাইয়া গুঁড়া করে ও হরিণের চামড়ার মধ্যে পুরিয়া ঠিক নাভির আকারে সেলাই করে। এইজন্য চীনদেশে, বিশেষতঃ সাংহাইতে কস্তুরী পরীক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার সূচাকৃতি যন্ত্র আছে তাহা নাভির মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া বাহির করিয়া লইলে ভিতরে সীসা আছে কি না তাহা জানিতে পারা যায় এবং দুর্গন্ধের দ্বারা উহা প্রকৃত কস্তুরী কি না তাহা বুঝা যায়। টাটকা কস্তুরীর গন্ধ প্রীতিপ্রদ নহে। সেই গন্ধ এক প্রকার উগ্র আমোনিয়ার মত এবং কখনও কখনও পচা মাংসের মত মনে হয়, কিন্তু যখন উহা শুকাইয়া বেশ পরিপক্ব হয় তখন উহা সৌরভে প্রাণ আমোদিত করে। সম্প্রতি লণ্ডনে কতকগুলি মৃগনাভি পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে কোন প্রকার কুরুৎ বা কুমারু বন্ধ বাহির হয় নাই, কিন্তু কস্তুরীর সঙ্গে চামড়া, চুল, কাগজ, খণ্ড খণ্ড সীসা ও সিন্দূর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

কস্তুরীর গুণ অতিশয় উষ্ণ, এইজন্য বিকারগ্রস্ত রোগীর শরীর শীতল ও নাড়ী ক্ষীণ হইলে চিকিৎসকেরা উহা সেবন করাইয়া থাকেন। ইহা শুক্রবর্দ্ধক বলিয়াও প্রসিদ্ধ। মুখরোগ, হিক্কা, ছর্দ্দি কফ, রক্তপিত্ত ইত্যাদি রোগের জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।* ইহার আস্বাদ কটু ও তিক্ত এবং ক্ষারের ন্যায়। ভাব- প্রকাশে ইহার গুণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

কস্তূরিকা কটুস্তিক্তা ক্ষারোষ্ণা শুক্রলা গুরুঃ।
কফবাতবিষচ্ছর্দ্দি শীতদৌর্গন্ধ্য দোষহৃৎ॥

গত ১৪ বৎসর তিব্বৎ ও ভূটান হইতে যত টাকার কস্তুরী আমদানী হইয়াছে এইস্থলে তাহার একটি তালিকা দিলাম। ইহাতে সকলে দেখিবেন যে তিব্বতী কস্তুরীর মূল্য মধ্যে মধ্যে ইতর বিশেষ হইয়াছে কিন্তু ভূটান হইতে যাহা আসিয়াছে তাহার মূল্য সমভাবেই আছে।

		তিব্বৎ হইতে		ভূটান হইতে	
১৮৯০—৯১	সালে	১৬০৯১	টাকা	১৮৫৬৫	টাকা
১৮৯১—৯২	"	৩৭৮৩৯	"	১৩১১৮	"
১৮৯২—৯৩	"	১৮৪৯২	"	১২৬৭৯	"
১৮৯৩—৯৪	"	৩৩৪৩	"	১১৯৮	"
১৮৯৪—৯৫	"	৮১২০৪	"	১২৪২৪	"
১৮৯৫—৯৬	"	৪৬৬২৫	"	১৫৩৮৮	"
১৮৯৬—৯৭	"	৬৩০০০	"	১৮৫৭২	"
১৮৯৭—৯৮	"	৮৯৬০	"	১৩০০০	"
১৮৯৮—৯৯	"	৯৮৫৬২	"	১৩৮৪২	"
১৮৯৯—১৯০০	"	১২৭১০৪	"	১৪৯৯৫	"
১৯০০—০১	"	৪৯০৮৮	"	১৪৬৩৬	"
১৯০১—০২	"	৬৮২৫৪	"	১৭৫৫৪	"
১৯০২—০৩	"	১১৪০৭২	"	১৭৩২২	"
১৯০৩—০৪	"	১৬৩৫২	"	২৩৩১৩	"

গত বৎসর সরকার হইতে তিব্বতী কস্তুরীর ৪০ টাকা আউন্স ও ভূটানী কস্তুরীর ৩২ টাকা আউন্স ধার্য্য হইয়াছিল। টিব্বত হইতে ইংলণ্ডে যে কস্তুরী প্রেরিত হইয়াছিল তাহার

* মুখরোগহিক্কাকফদৌর্গন্ধ্য... ইতি রাজনির্ঘণ্ট।

রক্তপিত্ত হর্দ্দি মূর্চ্ছাহৃৎ। ইতি রাজবল্লভঃ।

উৎকৃষ্টগুলি ১১৯ সিলিং ও নিকৃষ্টগুলি ৬৫ সিলিং করিয়া আউন্স দরে বিক্রয় হইয়াছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতি আউন্স ৯০ সিলিং হইতে ৯৫ সিলিংএর উর্দ্ধ দরে কোন কস্তুরী বিক্রয় হয় নাই। এ বৎসর ৭২ সিলিং হইতে ৭৫ সিলিং করিয়া আউন্স দর শুনা যাইতেছে।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

কার্পাস।

[সরল কৃষি বিজ্ঞান* হইতে উদ্ধৃত]

এদেশের কার্পাষের চাষের উন্নতি-কল্পে গবর্ণমেণ্ট ও কৃষিয়াল সাহেবেরা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে যথেষ্ট কার্পাস যাইতেছে না, এবং কার্পাসের মূল্য বাড়িতেছে। এই সময়ে কৃষিগণ যদি ভাল ভাল জাতীয় কার্পাস, সুনিয়মে চাষ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে দেশের সমূহ উন্নতি হইতে পারে। এদেশে একার প্রতি কার্পাসের গড় উৎপন্ন দেড় মণ মাত্র; কিন্তু কোন কোন জাতীয় কার্পাস হইতে একার প্রতি গড় চারি মণ আঁশও উৎপন্ন হয়। নিকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস না জন্মাইয়া কেবল ঐ সকল শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাস জন্মাইলে গড় উৎপন্ন বাড়িয়া যাইবে। বিদেশীয় যে সকল জাতীয় কার্পাস বঙ্গদেশে জন্মান হইয়াছে তন্মধ্যে সি-আইল্যাণ্ড কার্পাস ও পেরুভিয়ার কিড্‌নি-কার্পাস হইতে ফল ভাল পাওয়া গিয়াছে। মিসর দেশীয় কার্পাস বিনা জল সেচনে ভাল জন্মে না। ইহার আঁশ শুভ্র, শক্ত, সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বটে, কিন্তু ফলন কম। এ দেশীয় কয়েকটী শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাস সাধারণতঃ জন্মাইতে পারিলে উন্নতি অধিক হইবার সম্ভাবনা। গারো-হিল্ কার্পাস দেখিতে সুন্দর বটে, ইহার ফলনও অধিক, কিন্তু ইহার আঁশ নিতান্ত ছোট ও মোটা। এ জাতীয় কার্পাসের বিস্তৃত চাষ দ্বারা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মানভূমের বুড়ি-কার্পাস ইহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহার আঁশ [illegible] দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম এবং ফলনও অধিক। ইহার গোটা বীজ হইতে আঁশ সহজে ছাড়ে না। বীজগুলি মসৃণ নহে, মকমলের ন্যায় সবুজ রঙের রোঁয়ায় পূর্ণ। দেব কার্পাসের আঁশ বুড়ি কার্পাসের আঁশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ঢাকাইকার্পাস প্রভৃতি কয়েক জাতীয় দেব-কার্পাসের বীজ মসৃণ এবং আঁশ বীজ হইতে সহজে ছাড়িয়া আইসে। দেব-কার্পাসের গাছ ১২।১৪ ফুট উচ্চ হয় এবং একবার লাগাইলে ইহা দশ-পনের বৎসর জমি অধিকার করিয়া থাকিতে পারে। চৈত্র অথবা বৈশাখ মাসে ঢাকাই কার্পাসের বীজ উত্তম-রূপ প্রস্তুত ডাঁটিতে লাগাইয়া দিয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে (অর্থাৎ, বর্ষারম্ভের সময়) ৪ হাত অন্তর মাঠে চারা উঠাইয়া লাগাইলে স্থায়ীভাবে এই কার্পাসের আবাদ করিয়া লইতে পারা যায়। যে মাঠে চারা লাগাইতে হইবে উহা চারি মাস ধরিয়া মধ্যে মধ্যে গভীর ভাবে চাষ দিয়া জমি অতি সুন্দররূপে পূর্ব্বে হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। জমিতে সার দিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। ছাই কার্পাসের পক্ষে উত্তম সার। জিপ্‌সম্ চূর্ণ, অস্থি চূর্ণ, অস্থি-ভস্ম, এ সমস্তও কার্পাসের জন্য উত্তম সার। যে স্থানের মাটিতে চূণের ভাগ অধিক, ঐ স্থানে লবণ সাররূপে ব্যবহার করিলে কার্পাসের বিশেষ উপকার হয়,—ফলের পরিমাণ অধিক হয় এবং আঁশ দৃঢ় ও লম্বা হয়। সারের দ্বারা যত না উপকার হয়, ৪।৫ মাস ধরিয়া অনবরত জমি চাষ দেওয়াতে তদপেক্ষা অধিক উপকার হয়। ছোট কার্পাস গাছ লাগাইতে হইলে চারা জন্মাইবার ডাঁটি পৃথক ভাবে প্রস্তুত না করিয়া, ক্ষেত্রের প্রস্তুত জমিতে একেবারে লাইন ধরিয়া দুই ফুট অন্তর দুইটী করিয়া বীজ তিন ইঞ্চি গভীর করিয়া লাগাইয়া দিয়া যাইতে হয়। লাইনগুলি ২॥০ ফুট অন্তর হওয়া উচিত। নিতান্ত ক্ষুদ্র জাতীয় কার্পাস জন্মাইতে হইলে একার প্রতি ৫ সের বীজ ছিটাইয়া দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু নিকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস জন্মাইতে খরচ পোষায় না। বীজ ছিটাইয়ে বা লাইন ধরিয়া লাগানর, প্রকৃত সময় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, অর্থাৎ রীতিমত বর্ষারম্ভের [illegible] পূর্ব্বে।

---

* সরল-কৃষিবিজ্ঞান। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, M. A., M. R. A. S., [illegible] প্রণীত।

নানাজাতীয় শ্রেষ্ঠ কার্পাস জন্মাইয়া যেটীর ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে, যেটীর তুলার পরিমাণ বীজের ওজনের অনুপাতে অধিক হইবে, যেটীর আঁশ সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা, দৃঢ় ও শুভ্র, হইবে, যেটীর বীজ মসৃণ অর্থাৎ যাহার আঁশ বীজ হইতে সহজে ছাড়িয়া যাইবে, যেটীতে সহজে পোকা লাগিবে না, সেইটী নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া বিস্তৃত-ভাবে জন্মান উচিত। এইরূপ পরীক্ষা ভারত-বর্ষের নানা স্থানে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাদ্বারা কার্পাসের চাষের সমূহ উন্নতি হওয়া সম্ভব। এই সমস্ত গুণ-সম্পন্ন কার্পাস নির্ব্বাচিত করিয়া লওয়া শুদ্ধ সময় ও পরীক্ষা সাপেক্ষ এরূপ নহে, ইহা সংস্থাপিত করিতে হইলে যত্ন সহকারে জাতি-সঙ্কর সৃজন করা আবশ্যক। জাতি-সঙ্কর সৃজন করিতে হইলে ভাল ভাল জাতীয় কার্পাসের গাছ টবে করিয়া জন্মাইয়া যে গাছের যে গুণটী আছে সেই গুণটী অন্য গাছে প্রবেশ করিয়া দিবার জন্য একটী গাছের পুষ্পগুলি পুংকেশর প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়া অপর গাছের পুষ্পের পুংকেশর প্রস্ফুটিত হইলে উহার পরাগ একটু মধুর সাহায্যে উঠাইয়া লইয়া ঐ পরাগ-সহ মধু পূর্ব্বকথিত গাছের পুংকেশর বিচ্যুত পুষ্পগুলির গর্ভ-কেশরের উপর পাতিত করিয়া দিতে হয়। অপর গুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাস গাছের পরাগ গর্ভ-কেশরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে বীজ প্রস্তুত করিবে উহা হইতে গাছ জন্মাইলে এই গাছের কয়েকটীতে উভয় গাছের গুণই লক্ষিত হইবে। উভয় গাছের গুণসম্পন্ন ফলের বীজ হইতে ৪৫ বৎসর ক্রমাগত গাছ জন্মাইতে জন্মাইতে ও নির্ব্বাচন প্রতি বৎসর করিতে করিতে উভয়-গুণসম্পন্ন একটী জাতি দাঁড়াইয়া যাইবে। এইরূপ জাতিসঙ্কর সংস্থাপিত করিতে হয়। এইরূপে নানা জাতির গুণ একই জাতির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারা যায়। বীজ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এই একটী বিশেষ কার্য্য বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। মিসর, সি-আইল্যাণ্ড, ইত্যাদি কার্পাসের আঁশ চা দাই-কার্পাসের, দেব-কার্পাসের, রাম-কার্পাসের ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ জাতীয় দেশীয় কার্পাসের আঁশ অপেক্ষা দীর্ঘ। কিন্তু এই সকল জাতীয় দেশীয় কার্পাসের গাছ ১০।১২ হাত উচ্চ হয়, ইহাতে বড় একটা পোকা লাগে না, ইহার আঁশ শুভ্র ও সূক্ষ্ম হয় এবং ফল অধিক ধরে। এমনস্থলে জাতি-সঙ্কর সংস্থাপন করিয়া, দেব-কার্পাসাদি শ্রেষ্ঠজাতীয় দেশী-কার্পাসে সি-আইল্যাণ্ডাদি কার্পা-সের বিশেষ গুণটী প্রবেশ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

বড় জাতের কার্পাস লাগাইলে দুই শ্রেণীর গাছের মধ্যে প্রায় ছয় ফুট করিয়া ছায়াস্থান থাকিয়া যাইবে। এইরূপ ছায়া স্থানে চীনারবাদাম জন্মান যাইতে পারে। চীনার বাদাম উঠান দ্বারা জমির ওলট্ পালট্ হইবে এবং ইহাতে কার্পাস গাছের উন্নতি হইবে। চীনার বাদামের শিকড়ে মূল-গণ্ড প্রচুর পরিমাণে থাকিবার কারণ জমির উর্ব্বরতাও বৃদ্ধি হইবে। এরূপ করাতে দ্বিতীয় বৎসরেও কার্পাসের ক্ষেত্রে কোন সার দিবার আবশ্যক হইবে না। তৃতীয় বৎসর হইতে জমি খোঁড়া ও পচা গোবর-সার অথবা খোল দেওয়া আবশ্যক হইবে। মাঘ-ফাল্গুন মাস হইতে পাকা ফল উঠাইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখমাস পর্য্যন্ত ফল উঠান চলিবে। পরে গাছগুলির ডাল ছাটিয়া জ্বালাইয়া দিয়া, জমিতে চাষ ও সার দিয়া যাইতে হয়। দ্বিতীয় বৎসর হইতে আশ্বিনমাস হইতে ফল পাড়া ও তুলা সংগ্রহ চলিবে। চর্কিদ্বারা বীজ হইতে তুলা বিচ্যুত করিয়া লইতে অনেক পরিশ্রম ও খরচ পড়ে। চর্কিদ্বারা সমস্ত দিবসে অর্দ্ধসের মাত্র তুলা সংগ্রহ হইয়া থাকে। ম্যাকার্থির কটন্-জিনের দ্বারা প্রত্যহ এক মণেরও অধিক তুলা বীজ-বিচ্যুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এদেশে তুলার বীজ হইতে তৈল বাহির করিবার কারখানা নাই, হইলে ভাল হয়। এই তৈল সাবান প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়, এবং তুলার বীজের খোলও গোরুর পক্ষে অতি শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

ছোট জাতীয় কার্পাসের গাছে প্রথম বৎসর হইতেই আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে ফল পাড়া আরম্ভ হইতে পারে। ইহারাও কয়েক জাতীয় গাছ ক্ষেত্রে এক বৎসরের অধিক রাখিতে পারা যায়। বিলাতী কার্পাসের বীজ আশ্বিন মাসে বপন করিলে কিছু ভাল ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ গাছে তত পোকা লাগে না। আশ্বিন মাসে বীজ লাগাইলে ফাল্গুন মাসে ফল পাড়া আরম্ভ হয়। লক

ও অর্দ্ধপক্ক ফল এক-কালে পাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া খোলা ছাড়াইয়া পরে তুলা বীজ-বিচ্যুত করিতে হয়। দশ দিন অন্তর একবার করিয়া ফল পাড়িলেই চলে; কেবল সম্পূর্ণ পক্ক ফল পাড়িতে হইলে সপ্তাহে দুইবার করিয়া ফল সংগ্রহ আবশ্যক করে। প্রথম ৩।৪ সপ্তাহে সংগৃহীত ফলগুলি বীজের জন্ত পৃথক করিয়া রাখা উচিত। বর্ষা থাকিতে থাকিতে যদি প্রথম ফল পাকিয়া যায় তাহা হইলে ঐগুলি বীজের জন্ত রাখা উচিত নহে। ফল পাড়া আরম্ভ করিবার সময় কার্পাস ক্ষেত্র একবার খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত।

কার্পাস জন্মাইতে বিঘা প্রতি ১০৲ টাকার অধিক ব্যয় হওয়া উচিত নহে। আয় কার্পাসের ফলনের উপর নির্ভর করে। বিঘা প্রতি এক মণ তুলা ও দুই তিন মণ বীজ জন্মিলে কার্পাস জন্মাইয়া লাভ আছে। বুড়ি-কার্পাস, ঢাকাই-কার্পাস দেব-কার্পাস ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাস যত্নপূর্ব্বক জন্মাইলে এই পরিমাণে তুলা ও বীজ হওয়া সম্ভব। এক মণ তুলার দাম ১৬৲ হইতে ২০৲ টাকা ও তিন মণ তুলার বীজের দাম (যদি এই বীজ গরুকে খাইতে দেওয়া হয়) তিন টাকা ধরা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে বিঘা প্রতি আপাততঃ গড়ে অর্দ্ধমণ বা পঁচিশ সের তুলা মাত্র হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় তুলা জন্মানতে লাভ নাই। কার্পাসের চাষের উন্নতি করিতে পারিলেই লাভ হইতে পারে।

কমলা

কার্ত্তিক ১৩১১] [১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা।

সম্পাদকের নিবেদন।

কমলার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রথম বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ হইল, অর্থাৎ আঠার মাসে আমাদের বৎসর শেষ হইল। ইহাতে স্পর্দ্ধা করিবার কিছুই নাই, গৌরব করিবার কিছুই নাই, ইহা কেবল আমাদের দারুণ মর্ম্মপীড়ার কারণ। কমলার ন্যায় পত্রিকা পরিচালন করিবার জন্য যেরূপ অর্থ সামর্থ আবশ্যক, তাহা আমাদের নাই। তথাপি বর্ত্তমান সময়ে দেশের অভাব বুঝিয়া আমরা কর্ত্তব্যানুরোধেই এই পত্রিকা পরিচালনার ভার লইয়াছিলাম, এবং যথাসাধ্য সেই কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টাও করিয়া আসিতেছি। চেষ্টা সফল হইবার বিলম্ব অনেক।

এই পত্রিকায় গালি নাই গল্প নাই আজগুবিও কিছু নাই, সুতরাং আজিকার কালে ইহা আমাদের সাধারণের আদরণীয় হইবে কিনা তদ্বিষয়ে অনেকে সংশয় করেন। কিন্তু আমাদের আশা অন্যরূপ, আমাদের আশা কমলা দরিদ্রের কুটীরে ও রাজার প্রাসাদে সর্ব্বত্র বিরাজ করিবে। কেননা আমরা সকলের সেবায় প্রবৃত্ত। গুণজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও আমাদের সহযোগীবর্গ যে ভাবে এই পত্রিকাখানি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই আমাদের আশাতীত। এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি। কিন্তু এখনও সর্ব্বসাধারণের নিকটে কমলা আশানুরূপ আদর পায় নাই; কমলা এখনও আপন পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই। সেজন্য কমলার হিতৈষী বন্ধুবর্গের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন কমলার কল্যাণ কামনায় একটু যত্ন ও একটু মনোযোগ করেন। প্রত্যেকের চেষ্টায় যদি কমলার দুইটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ হয় তাহা হইলে আর ভাবনা থাকে না।

হাঁক ডাকে গগন ফাটান কমলার কার্য্য নহে। কমলা চায় ধীর নীরব কার্য্য। সুতরাং কেবল লেখা লেখিতেই কমলার কর্ত্তব্য শেষ হইবার নহে। শিল্প বিজ্ঞানাদি বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যতঃ কিছু করাই কমলার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন কমলা এখনও নিজেই নিজের ভার লইতে সমর্থ হয় নাই তখন তাহার উপর এরূপ দুরাশা কিরূপে করি? ইহার উত্তর "দশের লাঠি একের বোঝা।" বাস্তবিক যদি দেশের দশজন লোকে কমলার সহিত যোগ দেন তাহা হইলে কার্য্যতঃ কিছু করা বিশেষ দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। আমাদের এঅঞ্চলে টাটার ন্যায় বিরাট শক্তিমান ব্যক্তি নাই, দেশের দশজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে আজও শিখেন নাই, সুতরাং এ অঞ্চলে বড় বড় আয়োজন হওয়া আজি কালি দুর্ঘট। ছোট ছোট আরম্ভ করিয়া তাহাতে সফল হইলে বড় বড় কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

ছোট ছোট কল কারখানা, ছোট ছোট ব্যাঙ্ক, ছোট ছোট কৃষি শালা প্রভৃতি অনেক কাজ অল্প লোকে বন্ধু বান্ধব পরস্পরে মিলিয়া করিতে পারেন। তাছাড়া কৃষি শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার জন্য সকলে স্থানে স্থানে সভা সমিতি গঠিত করিতে পারেন। দেশের নানা স্থানে রাজনৈতিক সভা, সাহিত্য সভা, ধর্ম্ম সভা, [illegible] প্রভৃতি অনেক আছে, সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বিজ্ঞান শিল্প-

বিষয় আলোচনার জন্ত তদ্রূপ সভা সমিতি স্থাপিত কেন না হইতে পারে? এ সমস্ত কার্য্যে আমাদের সহায়তা যদি কাহারও আবশ্যক হয় তাহা হইলে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব আমরা সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি। কমলার পাঠকবর্গের মধ্যে যদি হাতে কলমে ঐরূপ কার্য্যের কোন প্রস্তাব করেন আমরা সাদরে তাহার আলোচনা করিব।

কমলা গত বৎসর নিতান্ত অনিয়মিতরূপে বাহির হইয়াছে। অনিয়মে প্রকাশিত হওয়া সাময়িক পত্রের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক। সেজন্ত আমরা কমলা নিয়মিত রূপে প্রকাশ করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমাদের একার উপর উহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। আমাদের ন্তায় গ্রাহকগণের অনুগ্রহের উপরও উহা বিশেষ নির্ভর করে, অতএব গ্রাহকগণও যেন কমলার প্রতি উদাসীন না হন। নিয়মিত প্রকাশের সুবিধার জন্ত বৈশাখ মাস হইতে কমলার দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ করা যাইবে। বৈশাখ মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে।

নানা প্রসঙ্গ।

আসাম গবমেণ্ট খাসিয়া-পর্ব্বতে মৌমাছি রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই পর্ব্বতের অধিবাসীরা বহুকাল হইতে মৌমাছি রক্ষা করিয়া মোম বিক্রয় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। অবশ্য যে প্রথায় তাহারা এই কার্য্য করে তাহা অতি নিকৃষ্ট। এই জন্ত রাজ-পুরুষেরা তাহাদিগকে উন্নত প্রণালীতে মৌমাছি রক্ষা করিতে শিক্ষা দিবেন। অন্তান্ত প্রদেশেও এ বিষয়ে শিক্ষা-দান আবশ্যক।

* * *

বোম্বাই প্রদেশের ধারবারে স্বর্ণখনির অনুসন্ধান চলিতেছে। এবং অনেকগুলি খনি বাহির হইয়াছে। যে সকল খনি বাহির হইয়াছে তাহাতে সোণা তুলিবার অধিকার লাভের জন্ত খুব প্রতিযোগিতা চলিতেছে। অধিকার লাভেচ্ছুদিগের মধ্যে অধিকাংশই য়ুরোপীয়, তবে দুই এক জন পার্সীও অধিকার লাভ করিয়াছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। কত দিনে বাঙ্গালীরা এই সকল কার্য্যে মনোযোগী হইবেন?

* * *

আসামের নাগা পর্ব্বতে এক প্রকার বন্ত দারুচিনি জন্মিয়া থাকে। ইহার ব্যবসা হইতে পারে কি না তাহা অবগত হইবার জন্ত কর্তৃপক্ষ উহার কিছু নমুনা কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। ব্যবসায়ীরা উহার সাত টাকা করিয়া মণ ধার্য্য করিয়াছে। সিংহল দেশ হইতে যে দারুচিনি আমদানী হয় তাপেক্ষা এই দারুচিনির ছাল খড় পুরু এবং তাহা ইহার তিনগুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতার কোন সাহেব সওদাগর এই আসামী দারুচিনীর ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে, আসাম গবমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

* * *

মিসরে ইংরাজের আধিপত্যে তথাকার তামাকের কারবারের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসর মিসর হইতে ৮০ কোটি সিগারেট বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। প্রায় ২৫ হাজার লোক তথায় এই সিগারেট কারখানায় মজুরী করিয়া থাকে। আজি কালি ভারতে মৈসরী সিগারেটের যথেষ্ট চলন হইয়াছে। বৎসরে প্রায় দুই কোটি সিগারেট এদেশে আমদানী হয়। এ দেশে যথেষ্ট তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা হইতে সিগারেটের উপযুক্ত তামাক তৈয়ার করিতে পারিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা।

* * *

এ দেশে রিয়ার চাষ সম্বন্ধে কত কাল হইতে আন্দোলন হইতেছে কিন্তু কার্য্যে এ পর্য্যন্ত কোন ফলই হয় নাই। কিন্তু মার্কিনে ইহার কার্য্য চলিতেছে। একজন সুইডেনবাসী তথায় যাইয়া রিয়ার সূতা বাহির করিতেছেন এবং উহার চাষ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি এজন্ত তথায় একটি যৌথ কারবার সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহারা তথায় বৎসরে চারিবার রিয়ার ফসল উঠাইতেছেন। তাঁহারা যে ভাবে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই সেখানে রিয়ার কারবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা কেবল পরের মুখ পানে তাকাইয়া বসিয়া থাকিব।

* * *

বাঙ্গালার মধ্যে চাউলের পরে পাটের কারবারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সমস্ত ভারতবর্ষে এখন ৩৬ টি পাটের কল আছে; তাহার মধ্যে একটি কেবল কানপুরে, আর সকল গুলিই বাঙ্গালাতে প্রতি-ষ্ঠিত। বাঙ্গালার এই ৩৫টি কলে প্রায় সাত কোটি বিশ লক্ষ টাকা নিয়োজিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ মূলধন সমস্তই প্রায় বিদেশীর, তবে অধিকাংশ কলেতেই বাঙ্গালীদের কিছু কিছু অংশ আছে, কিন্তু তাহা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর ন্তায় নগণ্য। বাঙ্গালার প্রায় ২৫০০,০০০ বিঘা জমীতে পাটের আবাদ হইয়া থাকে। এই পাট ইংলণ্ড, জর্ম্মানী, ফ্রান্স, মার্কিন সর্ব্বত্রই রপ্তানি হইয়া থাকে। প্রায় অর্দ্ধেকের কিছু কম ইংলণ্ডে যায় আর বাকি অর্দ্ধেক অন্তান্ত দেশে যায়।

* * *

গত জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মহীশূরে ১৩টি স্বর্ণ খনিতে কার্য্য চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। এই খনিগুলির সমস্তই ইংরেজেরা জমা লইয়াছেন। গত জুন মাসাবধি এক বৎসরে এই সকল খনি হইতে ৬১২, ৭৭৭ আউন্স সোণা উঠিয়াছে। ইহার মূল্য ৩,৫০,৩২,৮৬৬ টাকা। এই মূল্যের সোণার জন্য মহীশূর-রাজ ১৭,৫১,৬৫৩ টাকা সেলামী পাইয়াছেন। সুতরাং ৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। এই সকল খনিতে যদি এ দেশের লোক টাকা খাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে দেশের এত টাকা নষ্ট হইত না। সে দেশ হইতে, অনায়াস আমদানীর

দায় নানা পথে দেশের টাকা বিদেশে যাইতেছে, সে দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে লোকক্ষয় হইবে না ত কি ?

* * *

সরকারী মজুরীর তালিকায় প্রকাশ যে ব্রহ্ম দেশের মজুরেরাই এ দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হারে মজুরী পাইয়া থাকে। ১৮৭৩ সালে ব্রহ্মের কৃষিক্ষেত্রের শ্রমজীবীরা মাসে ১৩৷৹ টাকা হইতে ১৫৷৹ উপার্জ্জন করিত। পর বৎসরে ১৬ টাকা ১৭ টাকা হারে মজুরী পাইত। তাহার পর দশ বৎসর কাল এই হার কিছু নামিয়াছিল। এমন কি ১৮৮১ সালে ১২৷৹ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। এখন ১৪ টাকাই বাঁধা হার হইয়াছে। বাঙ্গলায় কৃষক দিগের মজুরীর হার বাড়িতেছে বটে, কিন্তু তাহা বড়ই ধীরে ধীরে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদিগের মজুরী ৫ টাকার অধিক ছিল না; এখন উহা গড়ে ৭ টাকা হইতে ৭৷৹ আনা দাঁড়াইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলাতেই মজুরের হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৯০২ সালে তথায় প্রতি কৃষক মাসে ১০ টাকা মজুরী পাইত এখন প্রায় ১১৷৹ করিয়া পাইতেছে। রাজমিস্ত্রী, সূত্রধর, কামার ইত্যাদির পারিশ্রমিক গত ৩০ বৎসরে ক্রমেই বাড়িয়াছে। ১৮৭৩ সালে তাহাদিগের মজুরী গড়ে ৭ টাকা হইতে ১০ টাকা ছিল, ১৮৭৫ সালে ১৫ টাকা হয়; ১৮৮০ সালে আবার কমিয়া যায় ১২ টাকায় দাঁড়ায়। পাঁচ বৎসর ঐরূপ থাকে. তাহার পর ১৮৮৫ সালে আবার ১৫ টাকা হয় এবং তাহার পর ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত ১৫ টাকা হইতে ১৬ টাকা হয়। ১৮৯৭ সালে ১৮ টাকা হইতে ২০ টাকা হয়। এখন ইহার হার ১৮ টাকা হইতে ২২ টাকা।

* * *

বাঙ্গালায় পাটের কলের উল্লেখ করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান এলেন সাহেব একটি সুন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন। শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষোন্নতি বিধায়িনী সভায় সহায়তা করিবার জন্য ভবানীপুরে একটি সভা হইয়াছিল। সেই সভায় এলেন সাহেব সভাপতি ছিলেন। তিনি তথায় বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালায় যে শিল্পাদি শিক্ষার জন্য এরূপ আয়োজন হইতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। * * * গঙ্গার দুই ধারে সারি সারি কত পাটের কল দেখা যায়। এই পাটের কলের প্রতিবৎসরই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় ইহার সহিত বাঙ্গালীদের কোন সম্পর্ক নাই। এ বিষয়ে উদ্যম, কৌশল, অর্থ সমস্ত ইউরোপীয়দিগের, এমন কি ইহার মজুরেরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালী নহে, পশ্চিম দেশবাসী।" এলেন সাহেব বলেন, "এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বাঙ্গালীরা কি হাত গুটাইয়া থাকিবে? তাহারা বিদেশীর এই উদ্যমশীলতা দেখিয়া কি জাগ্রত হইবে না। এত বড় একটা ব্যবসায়ের লাভ বাঙ্গালীর হাত হইতে বিদেশীর হাতে যায় ইহা কি বাঞ্ছনীয়?", এলেন সাহেবের কথায় বাঙ্গালী কি জাগ্রত হইবেন?

* * *

এ দেশে দীর্ঘ আঁশ যুক্ত তুলার আবাদ করিবার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার নাম Indian Cotton-growing Syndicate। ইহা বাঙ্গালী ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগের উদ্যোগে সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে এই সমিতি ঐরূপ তুলা উৎপন্ন করিবার পরীক্ষা করিতে পারেন, সে জন্য বিলাতের Brtish Cotton-growing Association তাহাদিগকে তিন হাজার পাউণ্ড বা ৪৫ হাজার টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন। ভারতের রাজকোষ হইতেও ঐরূপ অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। বিহার প্রদেশে এই পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে ইংরেজ নীল-করেরাই বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট নীলকরদিগকে এইরূপে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে আক্ষেপের কোন কারণ দেখি না। আমরা এরূপ কার্য্যে উপযুক্ততা না দেখাইলে কিরূপে সাহায্যের আশা করিতে পারি? দেশের কয়জন শিক্ষিত ভদ্রলোক প্রকৃত পক্ষে কৃষিব্যবসায়ী এবং কৃষির উন্নতিকল্পে যত্নবান্। যতদিন আমাদিগের দেশের লোক কার্য্যের দ্বারা আপনাদিগের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিবেন তত দিন এইরূপে তাঁহারা উপেক্ষিত হইবেন। অল্পদিন পরেই এ দেশের তুলার আবাদে যে প্রভূত য়ুরোপীয় মূলধন নিয়োজিত হইবে তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

* * *

মান্দ্রাজ প্রদেশের গো মহিষাদির উন্নতির জন্য এ বৎসর স্থানীয় রাজ-ভাণ্ডার হইতে হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল স্থানীয় মেলায় গো মহিষাদি প্রদর্শিত হয় তথায় যাহারা উৎকৃষ্ট জাতীয় জীব আনয়ন করিবে তাহাদিগকে দশ হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কিন্তু এতাদৃশ অল্প টাকায় আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আরও সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সকল প্রদেশেই গো মহিষাদির উন্নতির জন্য এইরূপ সাহায্য দান আবশ্যক।

* * *

বাঙ্গালার কৃষকদিগের গরুই একমাত্র সহায়। এখানকার গো জাতির দিন দিনই অবনতি হইতেছে। পূর্ব্বে এ দেশে লোকে পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে যে সকল বৃষ উৎসর্গ করিত, তাহারা অবাধে গ্রামমধ্যে বিচরণ করিয়া বিশেষরূপ বলিষ্ঠ হইত সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা বলিষ্ঠ বৎস সকল উৎপাদিত হইত। কিন্তু যে অবধি হাইকোর্টের বিচারে ধর্ম্মের ষাঁড় কাহারও সম্পত্তি নহে বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে, সেই সময় হইতে পল্লীগ্রাম সমূহে ষাঁড়ের অভাব উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্মের ষাঁড়ের মালিক না থাকাতে যে কেহ তাহাকে ধরিয়া মিউনিসিপালিটির খোঁয়াড়ে পাঠাইতেছে। এক্ষণে অনেক গ্রামের লোককে গাভীকে ষাঁড় দেখাইতে হইলে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়, তথাপি ভাল ষাঁড় পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে বহু সংখ্যক গাভীর জন্য একটির অধিক ষাঁড় পাওয়া যায় না। ইহাতে যে দুর্ব্বল বৎস উৎপন্ন হইবে তাহাতে বিচিত্র কি আছে? যাহাতে ধর্ম্মের ষাঁড় কেহ ধরিতে না পারে এবং তাহাদিগকে খোঁয়াড়ে দিতে না পারে এরূপ ব্যবস্থা বিশেষ আবশ্যক। তাহা না হইলে এ দেশের গো জাতির উন্নতির সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের পূর্ব-পুরুষেরা এই সামাজিক মঙ্গলের জন্যই বৃষোৎসর্গের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহাতে বৃষগণের প্রতি কেহ অত্যাচার না

করে এই জন্য তাহাদিগের অঙ্গ ত্রিশূল চক্রে অঙ্কিত করা হইত।

* * *

দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালায় অনেকগুলি ছোট ছোট রেলওয়ে নির্ম্মিত হইল। এই রেলগুলি প্রধানতঃ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে নির্ম্মিত। যত দিন রেলওয়ে লাভজনক না হইবে, ততদিন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মূলধনের উপর সুদ দিতে সম্মত হওয়াতেই এই রেলওয়ে গুলিতে টাকা দিতে কেহ বড় কুণ্ঠিত হন নাই। অনেক এদেশীয় লোক এ সকল ক্ষুদ্র রেলওয়ের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার কোনটিই খাঁটি এদেশীয় মূলধনে প্রস্তুত হয় নাই বা দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত নহে। সম্প্রতি সেরাজগঞ্জ হইতে উলাপাড়া পর্য্যন্ত নয় ক্রোশ পথে একটী ক্ষুদ্র রেলওয়ে নির্ম্মাণের কথা হইতেছে। সেরাজগঞ্জ পাট ব্যবসায়ের একটি প্রধান আড়ং। পাট চালানের সুবিধা করিবার জন্য এই রেলপথ নির্ম্মাণের কথা হইতেছে। এইরূপ একটি ক্ষুদ্র রেলপথ চালাইতে কি আমাদিগের দেশবাসীরা অসমর্থ? এগার লক্ষ টাকা মূলধনে ইহা নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহাতে টাকা খাটাইলে বার্ষিক শতকরা সাড়ে এগার টাকা লাভের সম্ভাবনা আছে। এইরূপ নিশ্চিত লাভের কারবারেও যদি দেশের লোক অগ্রসর না হন তাহা হইলে এদেশের টাকা বিদেশে যাইবে না ত কি?

* * *

১৯০৩।৪ সালে বাঙ্গালায় ৫৮টি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি বা পল্লী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল ব্যাঙ্ক হইতে অংশীদার ব্যতীত আর কেহ ঋণ পাইতে পারেন না। তথাপি এতগুলি ব্যাঙ্ক যে স্থাপিত হইয়াছে ইহা অনেকটা আশাজনক। এই ৫৮টির মধ্যে ২৬টি সরকারী খাস মহলে স্থাপিত হইয়াছে, ১৬টি ওয়ার্ড এষ্টেটে স্থাপিত হইয়াছে, আর বাকি ১৬টি অন্যান্য জমীদারের তালুকে স্থাপিত হইয়াছে এই সকল সমিতিতে গবর্ণমেণ্ট সম্বৎসরে ৪৩০০ টাকা ঋণ দিয়াছেন, ওয়ার্ড ষ্টেট সমূহ হইতে ৬০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যান্য লোকে ৬০৩৭ টাকা দিয়াছে। আমরা আশা করি এই সকল পল্লী ব্যাঙ্কের আদর্শে মফঃস্বলে শিল্পাদি কার্য্যের সহায়তার জন্য যৌথ ব্যাঙ্ক সকল সংস্থাপিত হইবে। দেশের গচ্ছিত টাকা এইরূপে একযোগে না খাটাইতে পারিলে দেশের দারিদ্র্য দূর হইবে না।

* * *

এদেশে লক্ষ লক্ষ মণ চা উৎপন্ন হয়। এই সকল চা সীসার পাতে আবৃত করিয়া বাক্সবন্দী করা হইয়া থাকে। এই পাত সীসা বিলাত হইতে আমদানী হয়। সম্প্রতি কলিকাতার অষ্ট্রেলিয়াস টিন কোম্পানি এদেশে পাত সীসা তৈয়ার করিবার জন্য কলিকাতার সন্নিকটে কামারহাটীতে একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারা অষ্ট্রেলিয়া হইতে সীসা আমদানী করিয়া এখানে পাত তৈয়ার করিবেন। এই কারখানা যে লাভ জনক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ একটি কারখানার দ্বারা সমস্ত চা বাগিচার অভাব পূরণ হইবে তাহা নহে। ভারতবর্ষে অনেক সীসের খনি আছে। এই সীসা [illegible] তাহাকে [illegible] পাত তৈয়ার করিলে লাভ হইতে পারে। এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার উদ্যোগী লোক কি দেশে আছেন?

* * *

সীসের কথা বলিতে ছুরী কাটারী কাস্তে কোদালি প্রভৃতি হাতিয়ারের কথা মনে পড়িল। চা-বাগিচা আবাদের জন্য এই সকল জিনিস বিলাত হইতে কত যে আমদানী হয় তাহার নির্ণয় নাই। আমাদের দেশে লোহার খনি বা কারিকর কিছুরই অভাব নাই। তথাপি বিলাত হইতে এদেশে কুড়ুল কোদাল আমদানী হইয়া থাকে।

* * *

আমরা একবার নদীয়া জেলার সীমহাট গ্রামের কামারদিগের দ্বারা কয়েকখানি চা-গাছ কাটিবার ছুরি (Pruning knife) তৈয়ার করাইয়াছিলাম এবং তাহা একটি চা-বাগিচার ব্যবহার্থ পাঠাইয়াছিলাম। তাহাতে সন্তোষজনকরূপ পেকাজ হইয়াছিল এবং বিলাতী ছুরী অপেক্ষা তাহার মূল্যও অনেক কম ছিল। কেবল পালিস ও বাঁট বিলাতীর ন্যায় সুন্দর হয় নাই কিন্তু তাহাতে কাজের কোন অসুবিধা হয় নাই। বিলাতী যন্ত্রাদির দ্বারা ঐরূপ ছুরী এ দেশে তৈয়ার করিতে পারিলে তাহার যথেষ্ট কাটতি হইতে পারে। আজ কাল চাঁ-বাগিচার মালিকেরা ব্যয় সংক্ষেপের জন্য যেরূপ মনোযোগী হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার সকল এদেশে প্রস্তুত করিতে পারিলে বিলক্ষণ কাটতি হইতে পারে।

* * *

কেবল চা-বাগিচার জন্য বলি কেন, এ কৃষি প্রধান দেশে কুড়ুল, কোদাল, কাস্তে প্রভৃতি প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রয়োজন। কিন্তু এখন দেশী যন্ত্রাদি ক্রমেই অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। সেফিল্ড বর্ম্মিংহাম হইতে ইয়েট, গ্রিফিন প্রভৃতি আমাদের জন্য কৃষিযন্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন, ইহা কি লজ্জার কথা নহে? অল্প মূলধনে এ দেশে এই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণের দুই চারিটি কারখানা বেশ চলিতে পারে। শিবপুর কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা এই সকল কারখানা বেশ চলিতে পারে, আর দেশী লোহার অতি সুলভে তাহার গড়ন হইতে পারে। একবার শিবপুর কলেজের একটি ছাত্র চুঁচুড়াতে এইরূপ একটি কারখানা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কারখানাটির ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছিল কিন্তু উপযুক্তরূপ মূলধনের অভাবে তাহা তুলিয়া দিতে হইল। আমরা শুনিতেছি কয়েকজন এ দেশীয় লোক কোন লৌহখনির নিকট এইরূপ একটি কারখানা খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহারা সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া দেশের একটি অভাব মোচন করিবেন এবং অন্যকে তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রোৎসাহিত করিবেন।

* *

অনেকেরই বিশ্বাস যে এখন আর এ দেশে লবণ প্রস্তুত হয় না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এখনও মান্দ্রাজ, বোম্বাই, সিন্ধুদেশ, ব্রহ্মদেশ ও উড়িষ্যার কোন কোন স্থানে লবণের দোকান বিদ্যমান আছে। সাধারণতঃ সমুদ্রের লবণাক্ত জল হইতে এই লবণ [illegible] করা হইয়া থাকে। উড়িষ্যার চিকা

ডুব ও রাজপুতানার সম্বর হ্রদের জল হইতেও যথেষ্ট লবণ তৈয়ার হইয়া থাকে। এইরূপে ভারতবর্ষে এখনও প্রায় বৎসরে দশ লক্ষ টন অর্থাৎ প্রায় দুই কোটি চুয়াত্তর লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। ১৯০৩ সালে ৮৯৪,৮৪০ টন দেশী লবণ তৈয়ার হইয়াছিল। উক্ত বৎসর মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে সাধারণতঃ যে পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হয় তদপেক্ষা কম হইয়াছিল বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ৩৩ কোটি লোকের জন্য দশ লক্ষ টন লবণ কিছুই নহে। এই জন্য ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণী হইতে প্রভূত পরিমাণে লবণ আমদানী হয়। এক বাঙ্গালাতেই প্রায় মাসে দশ লক্ষ মণ লবণ আমদানী হয়। বর্ত্তমান বর্ষের এপ্রেল মে ও জুন এই তিন মাসে ৩২,৫২,১১৮ মণ লবণ আমদানী হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব তিন মাসে ২৭,৮৫,৭৫৭ মণ আমদানী হইয়াছিল। এপ্রেল মে জুন এই তিন মাসের আমদানীর উপর গবর্ণমেণ্ট ৬১,৩৭,২৫২ টাকা মাশুল আদায় করিয়াছেন।

* * *

বাঙ্গালার অনেক স্থানে লবণ প্রস্তুত করিবার উপযোগী মৃত্তিকা আছে। পূর্ব্বে তমোলুকে লবণের দোকান ছিল। কিন্তু বৃটিশ বণিকদিগের পরার্থপরতার জন্য সে সকল উঠিয়া যায়। লবণ প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত যন্ত্রাভাবে মজুরীরা স্বহস্তে লবণ প্রস্তুত করাতে তাহাদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এইরূপ আন্দোলন দ্বারা তাঁহারা সরকারকে দোকান বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য করেন। তথাপি বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতের অন্যত্র লবণ প্রস্তুত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযোগে লবণ প্রস্তুত করিলে কর্ত্তৃপক্ষীয়ের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। আমাদের দেশে অনেক বড় বড় লবণব্যবসায়ী আছেন, যাঁহারা এক এক সময়ে জাহাজ জাহাজ লবণ ক্রয় করিয়া থাকেন। ইঁহারা যদি দুই একটি নেমক দোকান সংস্থাপন করেন তাহা হইলে নিজেরা যেমন লাভবান হইবেন, সেইরূপ দেশের অনেক লোকের জীবিকা অর্জ্জনের একটি নূতন পথ খুলিয়া দিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশের ধন বিদেশীয় গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উক্ত রেলওয়ের জন্য ব্যস্ত থাকাতে তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে দেশে লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবসা পুনঃ স্থাপনের জন্য কি কোন উদ্যোগী পুরুষ নাই?

* * *

এদেশে সূর্য্যমুখী ফুলের সৌন্দর্য্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে কেহ ইহার আদর করেন না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় অন্যান্য ফসলের মত ইহার আবাদ হইতেছে। রুষিয়ার লোকে সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ ভুট্টা প্রভৃতির মত খাইয়া থাকে এবং তাহা হইতে তৈল বাহির করে। এই তৈল দেখিতে ঠিক অলিভ তৈলের ন্যায়, ইহার খৈল গো মহিষাদির পক্ষে বড় পুষ্টিকারক এবং [illegible] তাহারা তৃপ্তি পূর্ব্বক উহা খায়। পরীক্ষার [illegible] স্থির হইয়াছে, সূর্য্যমুখী ফুলের বীজে ভুট্টা, মটর প্রভৃতি [illegible] বপন করিলে উহা হইতে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার মৃত্তিকা-স্থিত নাইট্রোজেনকে বিশেষরূপে শোষণ করে। তিন ফুট অন্তর তিন ফুট অন্তর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ইহার বীজ রোপণ করিতে হয় এবং প্রত্যেক সারিতে তিন চারি ইঞ্চি অন্তর এক একটি বীজ পুতিতে হয়। তাহার পর মধ্যের গাছ উপড়াইয়া ৮'৯ হইতে ১৮ ইঞ্চি দূরে এক একটি গাছ রাখিতে হয়। তাহার পর ভুট্টার আবাদের প্রণালীতেই ইহার আবাদ হইয়া থাকে। বীজ গুলি সম্পূর্ণরূপ পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই তাহা ভাঙ্গিয়া লইতে হয়, এবং সপ্তাহ কাল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া খোসা ছাড়াইতে হয়। সূর্য্যমুখীর আবাদে ব্যবসা চলিতে পারে কি না তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। সূর্য্যমুখীর আর একটা গুণ প্রকাশিত হইয়াছে। কমলা লেবুর বাগানের সন্নিকটে এবং নূতন কমলা লেবুর বাগানের মধ্যে রোপণ করিলে লেবু ও লেবুর গাছ পোকা ধরা হইতে রক্ষা পায়। ফালগুন হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত কমলা লেবুর বাগানে এই সকল পোকার প্রাদুর্ভাব হয়। অতএব যাহাতে ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভেই সূর্য্যমুখী ফুটিতে পারে এইরূপ হিসাব করিয়া উহা রোপণ করা আবশ্যক। এই ফুল ফুটিলে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা এক এক স্থানে জড় হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগকে সহজে নষ্ট করা যায়।

* * *

লাহোরে কতকগুলি পঞ্জাবী ভদ্র লোক গণেশ ফ্লোয়ার মিল নামে একটি ময়দার কল সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহার মূলধন চারি লক্ষ টাকা। প্রায় দশ বৎসর এই কারবারটি সংস্থাপিত হইয়াছে, এই দশ বৎসরে অংশীদারেরা যে লভ্যাংশ পাইয়াছেন তাহাতে মূলধনের শতকরা ৯০ টাকা আদায় হইয়াছে এবং অংশগুলির মূল্য শতকরা ৩০ টাকা বাড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত গচ্ছিত খাতে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা জমা করিয়াছেন। গত বৎসরে এই কোম্পানির ১,০৬,২১০ টাকা লাভ হইয়াছে। ইহার শতকরা ১২॥ হিসাবে অংশীদারদিগকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লভ্যাংশ দিয়াছেন, ২৫ হাজার টাকা কল কারখানার মূল্য হ্রাস হিসাবে খরচ লিখিয়াছেন, ১২০০ টাকা কর্ম্মচারীদিগকে পুরস্কার করিয়াছেন, ১২০৲ টাকা দাতব্য করিয়াছেন, ৫০০০ টাকা অনাদায়ী হিসাবে জমা রাখিয়াছেন ও অন্যান্য বাবদে কয়েক হাজার খরচ করিয়া আগামী বর্ষে ২২ হাজার টাকা জের লইয়া গিয়াছেন। এই কোম্পানির রিপোর্টের সমালোচনা উপলক্ষে একজন সুবিজ্ঞ সম্পাদক বলিয়াছেন যে, এই কারবারের প্রশংসা করা আর "কাঞ্চনে সোণালী কাজ, ও শ্বেতপদ্মে চূণকাম করা" সমান। বাঙ্গালায় যতগুলি বড় বড় ময়দার কল আছে তাহা প্রায়ই ইংরেজদিগের। ইঁহাদিগের প্রতিপত্তিতে বাঙ্গালীদিগের কলগুলি প্রায় কোণঠেসা হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার নিকটে সাহেব দিগের যে কয়টি কল আছে তাহার একটির মূলধন সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ও আর দুইটির আড়াই লক্ষ টাকার অধিক নহে। ইহার সকলগুলিতেই প্রায় শত করা আট টাকা দশ টাকা করিয়া প্রতি বৎসর লাভ হইতেছে। বাঙ্গালীরা কি এইরূপ মূলধন সংগ্রহ করিয়া ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন না? আমাদিগের উদ্যমহীনতার জন্যই আমরা সর্ব্বত্র ক্ষেত্রেই স্থানচ্যুত হইতেছি।

পাট-ব্যবসায়ীর বিপদ।

পাট বাঙ্গালার একচেটিয়া ব্যবসা। ইতিপূর্ব্বে অনেক দেশে পাটের আবাদ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও বাঙ্গালার পাটের মত উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া যায় নাই। এই কারণে এ দেশের অনেক পাট-ব্যবসায়ী নানা প্রকারে খরিদদারদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সদুপায়ে এই ব্যবসায়ে অধিক লাভের সম্ভাবনা সত্ত্বেও মহাজনেরা যে কেন অসদুপায় অবলম্বন করে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই অসদুপায় দ্বারা আপাততঃ সহজে অর্থলাভ হইলেও তাহার ভবিষ্যৎ ফল যে দেশের পক্ষে ও ব্যক্তিগত হিসাবে অনিষ্টকর, এদেশের অশিক্ষিত মহাজনেরা তাহা বুঝেনা এবং এই জন্যই য়ুরোপীয় সওদাগরেরা এদেশীয় ব্যবসাদারদিগকে আদৌ বিশ্বাস করেন না।

পাটব্যবসায়ীরা অধিক অর্থলোভে পাটকে ওজনে ভারি করিবার জন্য, বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে উহাতে জল দিয়া ভিজাইয়া থাকে, এবং কোথাও কোথাও বস্তার ভিতরে যে পাট থাকে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কাদা মাটি মাখাইয়া ভারী করে। এই রূপ ব্যবহারে কেবল যে ক্রেতাদিগের অর্থ ক্ষয় হয়, তাহা নহে কিন্তু পাটও নষ্ট হইয়া যায়। পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এইরূপ ভিজা ও দাগী পাটে যে সকল সূত্র ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত হয় তাহা টেকসই হয় না। ইহাই একমাত্র ক্ষতি নহে, বস্তার ভিতর এই জল বসাতে পাট এরূপ বিবর্ণ হয় যে, তাহার উৎপন্ন সামগ্রী সকল দেখিতে অতিশয় বিশ্রী হয় এজন্য তাহা ভাল দরে বিকায় না। এই সকল কারণে কিছুদিন হইল ইংরেজ পাটব্যবসায়ীরা মিলিত হইয়া গবর্ণমেন্টকে ইহার প্রতিবিধানের জন্য আবেদন করেন। তাঁহাদিগের সেই আবেদনানুসারে কর্ত্তৃপক্ষ কৃষিবিভাগের দুই জন বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীকে ইহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নিত্য গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান সমূহে অনুসন্ধান লন এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সিরাজগঞ্জ চাঁদপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাটের অবস্থার তদন্ত করেন। ইহারা উভয়েই অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছেন যে, ১৮৯৬ সাল হইতে পাট ব্যবসায়ে এইরূপ প্রবঞ্চনা আরম্ভ হইয়াছে এবং ইদানী উহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৯১ সালে পাট এরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল যে, উহা ৯ টাকা করিয়া মণ দরে বিক্রয় হইয়াছিল। এইরূপ উচ্চ দর ও সেজন্য ক্রেতাদিগের আগ্রহ দেখিয়া অনেক মাড়োয়ারী মহাজন পাট ভিজাইতে ও তাহাতে বালী মাটি মাখাইয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। তাহার দেখাদেখি এক্ষণে অনেক স্থানের মহাজনেরা এইরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহা নিবারণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন।

পাপের শাস্তি কিরূপ হাতে হাতে পাওয়া যায় তাহা প্রবঞ্চক মহাজনেরা বিশেষরূপ বুঝিতে পারিবেন। আমাদের মাড়োয়ারীদিগের ব্যবসাবুদ্ধির আমরা সর্ব্বদাই প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের নিম্নশ্রেণীর মহাজনদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে, প্রতারণা না করিলে ব্যবসায়ে লাভবান হওয়া যায় না। এই শ্রেণীর মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরাই কম মাপের বিলাতী কাপড় আমদানীর কারণ। ইহাঁরাই দশ হাতী কাপড় সকল সাড়ে নয় হাত ও পৌনে দশহাত মাপে তৈয়ার করাইয়া আনিতেন ও তাহা দশ হাতী বলিয়া বিক্রয় করিতেন। বিলাতী তন্তুবায়গণও ক্রমশঃ ঐরূপ আরম্ভ করিলেন। ইহার প্রতিকারার্থ গবর্ণমেণ্ট Merchandise Marks Act নামক আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। পাটের ব্যবসায়ে যে প্রবঞ্চনা আরম্ভ হইয়াছে তাহারও দমনার্থ শীঘ্রই সেইরূপ একখানি আইন হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

বর্ত্তমান দণ্ডবিধির দ্বারা পাটের ব্যবসায়ের এই প্রবঞ্চনা দমন হইবে না বিবেচনা করিয়া কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর ম্যাডক্স সাহেব এ বিষয়ে রুষ দেশে যে আইন আছে তাহারই অনুকরণে একখানি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এই খসড়া আইনে যেরূপ ধারা সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে যদি কেবল প্রকৃত অপরাধিদিগের দণ্ড হইত তাহা হইলে আমরা সানন্দে ইহার সমর্থন করিতাম, কিন্তু ইহাতে [illegible] অধিক [illegible]

বাঁধা যাইবে বলিয়া আমরা ইহাতে ভীত হইয়াছি—এবং কর্তৃপক্ষকে এই কঠোর কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

রুষ দেশে ব্যবস্থা আছে যে, পাট বা শণে কোন অন্য পদার্থ মিশ্রিত করিলে অথবা তাহা জল দিয়া ভিজাইলে, অপরাধীর এক মাস কারাবাস ও একশত রুবল অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। বোম্বাই অঞ্চলে কার্পাস ভেঁজাল সম্বন্ধেও একটা আইন আছে। তাহাতে ব্যবস্থা আছে যে, কার্পাসে কোন রূপ ময়লা মাটি মিশাইলে, অথবা তাহা শিশিরে ভিজাইলে সেই তুলা ক্রোক করা হয় ও তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা হয় অথবা তাহা পরিষ্কার করিয়া বিক্রয় করা হয়।

এই দুইখানি আইনের আদর্শে ডাইরেক্টর ম্যাডক্স সাহেব ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে কোন ব্যক্তির নিকট কোন প্রকার জলে বা শিশিরে ভিজান পাট থাকিবে, অথবা কাদা মাটী বা বালী মাখান পাট দেখা যাইবে, কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন রকমের পাট এক বস্তায় বাঁধা দেখা যাইবে, তাহার সেই পাট সরকারী ইনস্পেক্টরেরা আটক করিবেন এবং তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত করিবেন। তাহার অপরাধ প্রমাণিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার অর্থদণ্ড করিবেন এবং সেই পাট শুকাইতে ও পরিষ্কার করিতে যে ব্যয় হইবে তাহা তাহার নিকট হইতে আদায় করিবেন।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গবর্মেণ্ট দুই শত টাকা বেতনের ১৫ জন ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিবেন। রপ্তানি পাটের উপর মণকরা এক পয়সা হিসাবে মাশুল আদায় দ্বারা এই ইনস্পেক্টর দিগের বেতন ও সেই বিভাগের অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। বাঙ্গালা হইতে যে পাট রপ্তানি হয় তাহার উপর এই এক পয়সা হিসাবে মাশুল লইলে বৎসরে ৫৪ হাজার টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই ব্যয় সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু আইনে এই ইনস্পেক্টরদিগকে যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে গরিব কৃষক গণ যে বিশেষরূপে অত্যাচার ভোগ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থলোভী মহাজনদিগের পাপের জন্য নিরীহ কৃষকেরা কষ্ট ভোগ করিবে বলিয়াই আমরা এই আইনের প্রচলনে ... দিকে বাধা হইয়াছি। কেবল তাহাই নহে। এক দিকে যেমন ইহাতে গরীবেরা উৎপীড়িত হইবে, অপর দিকে তেমনি প্রকৃত অপরাধীরা তাহাদিগের ... আইনের উদ্দেশ্য বিফল করিবে।

এই আইনের ব্যবস্থা এরূপ কঠোর এবং ইহাতে ইনস্পেক্টর দিগকে এরূপ অপ্রতিহত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা কেবল রুষ দেশের পক্ষেই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এই আইন অনুসারে যে কোন ইনস্পেক্টর যে কোন গুদামে ভিজা বা ভেঁজাল পাট আছে বলিয়া সন্দেহ করিবেন সেই খানে প্রবেশ করিয়া পাট ক্রোক করিতে পারিবেন। পুলীশ কর্ম্মচারীরা সর্ব্বত্র এই ইনস্পেক্টরদিগকে সহায়তা করিবেন। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্য না থাকিলেও কেবল মাত্র ভিজা পাট ঘরে থাকিলেই—এই আইন অনুসারে লোকে অপরাধী হইবে।

সকলেই অবগত আছেন যে পাট যতই শুষ্ক হউক না কেন, তথাপি তাহা কিছু পরিমাণে ভিজা থাকিবে। অবশ্য সে জন্য আইনে ব্যবস্থা থাকিবে যে শত করা আট বা দশ ভাগ জল থাকিলে তাহা শুখা পাট বলিয়া গৃহীত হইবে। কিন্তু বর্ষার সময় কোনরূপ জল না মিশাইলেও পাটে তদপেক্ষা অধিক জল থাকে ইহা কোন কোন স্থলে দেখা গিয়াছে; কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলেও শিশিরে ভিজা পাটের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করা কতদূর সমীচীন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা স্বীকার করি কোন কোন মহাজন ওজনে ভারী করিবার জন্য পাট শিশিরে রাখিয়া থাকে, কিন্তু অনেক কৃষক যে স্থানাভাবে বাড়ীর উঠানে পাট রাখিতে বাধ্য হয় ইহাও সত্য কথা। তাহার পর যে সময়ে পাট কাচিয়া তাহা রৌদ্রে শুকান হয়, তখন কোন কৃষকই তাহা রাত্রিকালে ঘরে তুলিয়া রাখে না। উহা দিনের বেলা যেমন রৌদ্র পায় রাত্রিতে তেমনি শিশির পায়। ম্যাডক্স সাহেবের আইন অনুসারে এজন্য ইনস্পেক্টরেরা যে প্রত্যেক কৃষকের পাট আটক করিয়া আপনাদিগের পেট মোটা করিতে চেষ্টা করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? ইনস্পেক্টর গণের ক্ষমতা অপব্যবহারের কোন প্রকার প্রতিবন্ধক আইনে দেখা গেল না। সুতরাং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে

কৃষকদের কৃষকদিগের কষ্টের অবধি থাকিবে না। আমরা এই কারণে কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে ধীরভাবে কার্য্য করিতে অনুরোধ করি। যাহাতে পাট-ব্যবসায়িদিগের ক্ষতি না হয় এবং প্রবঞ্চনা করিয়া পাট ভিজান একেবারে বন্ধ হয় তাহা করা হউক, কিন্তু নিরীহ লোকে যাহাতে অত্যাচার ভোগ না করে তাঁহারও ব্যবস্থা আবশ্যক।

আমাদের বিবেচনায় একেবারে এই কঠোর আইন বাহাল না করিয়া যাহাতে পাটের মহাজনেরা সাবধান হইয়া চলে তাহার উপায় অবলম্বন করা হউক। যে সকল জেলায় পাট উৎপন্ন হয় গবর্ণমেণ্ট সেই সকল স্থানে ইস্তাহার জারী করুন যে পাট ভিজা থাকিলে তাহা বিদেশের খরিদদারেরা কিনিতে চাহে না, এজন্য ভিজা পাটের মূল্য অধিক পাওয়া যায় না। অতএব মহাজনেরা যদি উচ্চ দরে পাট বিক্রয় করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহারা যেন ভাল করিয়া পাট শুকাইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। এরূপ না করিলে গবর্মেণ্ট এজন্য আইন করিবেন। সেই আইনে ভিজা পাটের জন্য মহাজন দিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে। এইরূপ ইস্তাহার জারী করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন কি ফল হয়, তাহার পর যেন আইন প্রণয়নে অগ্রসর হন। ম্যাডক্স সাহেব যে খসড়া আইন তৈয়ার করিয়াছেন, তাহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ইনস্পেক্টরদিগের হস্তে অতদূর ক্ষমতা কখনই দেওয়া যাইতে পারে না। আর যেখানে কোন প্রবঞ্চনার অভিপ্রায় দেখা না যাইবে, সেখানে অপরাধ গণ্য হইবে না, এরূপ ধারা সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন। আমরা আশা করি ইংরেজ পাট-ব্যবসায়িদিগের সন্তোষের জন্য গবর্মেণ্ট সহস্র সহস্র প্রজাকে বিপন্ন করিবেন না।

এই উপলক্ষে আমরাও আমাদিগের দেশের মহাজন দিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা সততা অবলম্বনে যত্নবান হউন। আমাদিগের দেশের ব্যবসায়ে কখনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না যতদিন আমরা ব্যবসায়ে সততা অবলম্বন করিতে শিক্ষা না করিব। আমাদিগের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি গ্রামে গ্রামে গিয়া শুষ্ক পাট খরিদ করিয়া কলিকাতায় চালান দিতে পারেন এবং যাহাতে প্রত্যেক বস্তার এক জাতীয় পাট থাকে এইরূপ করিয়া গাঁট তৈয়ার করেন, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারা ইউরোপীয় পাট ব্যবসায়ীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন এবং ক্রমে লাভবান হইতে পারেন। এখনও যাঁহারা এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া পাটের গাঁট তৈয়ার করেন তাঁহারা বেশ লাভ করিয়া থাকেন। সততাই উন্নতির সোপান কোন ব্যবসায়ী যেন এ কথা বিস্মৃত না হন। অসত্য পথ কিরূপ বিপদসমাকুল তাহা এই পাটের নূতন আইন স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে।

আসামের স্বর্ণক্ষেত্র।

ইংরেজের অসীম অধ্যবসায়ে আসামের অরণ্য উদ্ভিদে সোনা ফলিয়াছে। ইংরেজ অনুর্ব্বর বিজন ভূমুর আবাস স্থল আসামকে উর্ব্বর জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা অনেক সময়ে দম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিকই কি আসাম চিরদিন একটী নগণ্য দেশ মধ্যে পরিগণিত ছিল? আসামবাসীরা কি চিরদিন অন্নহীন পরমুখাপেক্ষী ছিল? যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন এক সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ (আসামের প্রাচীন নাম) কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল। তখন চা-গাছের পাতায় সোণা ফলিত না বটে, কিন্তু আসামের নদী সৈকতে প্রভূত স্বর্ণ উৎপন্ন হইত। আসামের এই স্বর্ণ লোভেই মুসলমানেরা আসাম অধিকারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে আসামের নদীকূলস্থ বালুকা হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইত। আসামের এই স্বর্ণের কথা মহাভারতে উল্লেখ আছে। মুসলমান সম্রাটদিগের "পাতসানামা" ইতিবৃত্তেও ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। গোলাম হোসেন সেলিম প্রণীত রিয়াজুস-সুলতান নামক আর একখানি ইতিহাসে প্রকাশ যে, আসামের বার হাজার লোক ব্রহ্মপুত্র নদের বালুকা হইতে স্বর্ণ বাহির করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। ইহার জন্য প্রত্যেক লোককে রাজভাণ্ডারে এক তোলা করিয়া সোণা দিতে হইত। এই সোণা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার এক তোলা ৮ টাকা ৯ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত না। পাতসানামাতে দেখা যায় অন্যান্য স্থানের স্বর্ণাপেক্ষা আসামের সোণা অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইত। কিন্তু সে বহু শতাব্দী পূর্ব্বেকার কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর [illegible] আসামের রাজগণ তথাকার স্বর্ণ হইতে [illegible] লাভ করিতেন, ইতিহাসে [illegible] পাওয়া যায়। রাজা রাজেশ্বর সিংহের [illegible] (১৭৫১ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৬৮) কেবল [illegible] রাজ-ভাণ্ডারে [illegible] স্বর্ণ [illegible]। [illegible]

রাজা গৌরীনাথ সিংহের সময়ে (১৭৮০ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৯৪) ইহার পরিমাণ হ্রাস হয়। তিনি ৪০০০ তোলার অধিক স্বর্ণ পাইতেন না। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহার পরিমাণ আরও কমিয়া যায়। তখন ২০০০ তোলা মাত্র রাজ-ভাণ্ডারে জমা হইত। সে সময়ে সোণাওয়ালাদিগের (অর্থাৎ যাহারা বালুকা ধৌত করিয়া সোণা বাহির করে) সংখ্যাও হ্রাস হইয়াছিল। তখন উত্তর আসামে দেড় হাজার লোক মাত্র এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এখন তিন ঘর সোণাওয়ালা বই আর কাহাকেও এই কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায় না।

কি জন্য এখন আর অধিক লোক আসামের নদী হইতে সোণা ধুইয়া বাহির করে না ইহার তদন্ত করা প্রয়োজন। যে দেশ হইতে ৬৭ হাজার তোলা সোণা রাজভাগ বলিয়া আদায় হইত, সে দেশের নদী কি এখন আর পর্ব্বত হইতে স্বর্ণ বহন করিয়া আনে না? ব্রহ্মপুত্র নদ ত এখনও খরবেগে তিব্বতের পর্ব্বতগাত্র ধৌত করিয়া, কত গৈরিক পদার্থ ইতস্ততঃ ছড়াইতে ছড়াইতে আসামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সহিত কি স্বর্ণ আসেনা? তাহা কখনই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অনন্ত-রত্ন-প্রভব হিমালয় রত্নশূন্য হন নাই। ইহার অন্তর্বিধ কারণ আছে। সেই কারণ কি, তাহা সরকারী ভূতত্ব বিভাগের খনি সম্বন্ধীয় বিশেষ কর্ম্মচারী ম্যালকম ম্যাকল্যারেন সাহেব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেকগুলি কারণ দর্শাইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, আসামের নদী সকল হইতে কি পরিমাণ সোণা পাওয়া যায় তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তথাকার সোণাওয়ালাদিগকে আর নদী তীরস্থ বালুকা ধুইতে দেওয়া হয় না। এই সকল নদীর মধ্যে সুবর্ণশ্রী নদীই প্রধান। তদ্ব্যতীত লোকে চা-বাগিচায় মজুরী করিয়া অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে বলিয়াও অনেকে সোণা বাহির করার পরিশ্রমজনক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। ম্যাকল্যারেন সাহেব আরও বলেন সোণাওয়ালাদিগের উপর [illegible]দিগের (মাড়োয়ারী) অত্যাচার ইহার আর একটী কারণ। এই অত্যাচার কি তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। যাহাই হউক ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে গত পঞ্চাশ বৎসর কাল আসামের

নদী হইতে সোণা বাহির করা হয় নাই। কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোন কোন নদীতে সোণা বাহির করিবার অধিকার কোন কোন কোম্পানীকে প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু একমাত্র স্বর্ণশ্রী নদী ব্যতীত আর কোথাও রীতিমত প্রণালীতে স্বর্ণ বাহির করিবার চেষ্টা হয় নাই এবং সে জন্ম বিশেষরূপ অর্থ নিয়োগ করাও হয় নাই।

১৮৮৫ সালে স্বর্ণশ্রী নদীগর্ভস্থ কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড হইতে যে সোণা বাহির হইয়াছিল তাহা পরীক্ষা করিয়া কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন যে একটন পরিমাণ প্রস্তর হইতে প্রায় ৫২ আউন্স সোণা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেকেই আশান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরে যখন প্রকাশ পাইল যে, উল্লিখিত সোণা ঐ পরিমাণ পাথর হইতে বাহির হয় নাই, প্রকৃত উহা বহু পরিমাণ পাথর ধুইয়া যে বালুকা বাহির হয়, তাহারই প্রতিটনে ৫২ আউন্স সোণা পাওয়া গিয়াছিল, তখন সকলেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন।

ইহার পর ১৮৯৯ সালে স্বর্ণশ্রী নদীতে পরীক্ষার্থ সোণা বাহির করিবার জন্য কতকগুলি চা-কর মিলিয়া লক্ষ টাকা মূলধনে একটি যৌথ সমিতি স্থাপন করেন। পরীক্ষায় ব্যবসা লাভজনক বিবেচিত হইলে তাঁহাদিগের রীতিমত কারবার স্থাপন করার উদ্দেশ্য ছিল। ইহারা তিন বৎসর কাল এই পরীক্ষা কার্য্যে প্রায় ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিন বৎসর পরে দেখিলেন যে, এই পরীক্ষাকার্য্যে আরও অধিক অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক। কিন্তু আর অধিক অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদিগের সে চেষ্টায় বিরত হন। ইহার কিছুদিন পরে আর একটী নদীতে রীতিমত প্রণালীতে পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। কেননা পূর্ব্বে যে যৌথ সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল সেই সমিতিরই একজন অংশীদার এই বৎসর সরকারের নিকট সোণা বাহির করিবার অনুমতি লইয়াছেন। ইনি এখনও কার্য্যারম্ভ করেন নাই, কিন্তু সেই [illegible] টাকা মূলধনে সংগ্রহের [illegible] একটি যৌথ সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

[illegible] গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে লিপ্ত আছেন। গত বৎসরে ম্যাকল্যারেন সাহেব আসামের সকল নদীতেই এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছেন। এই পরীক্ষাকার্য্য অতিশয় কষ্টকর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক এই পরীক্ষায় আসামের নদী সমূহে যে ভাল সোণা পাওয়া যায় তাহা তিনি স্থির করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন আসামের সোণা নিকৃষ্ট বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা অমূলক। তিনি বলেন মুসলমান ঐতিহাসিকেরা আসামবাসীদিগের যেরূপ চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই অনুমান হয় তাহারা খাটি সোণায় খাদ মিশাইত, এবং এই জন্যই উহা ওরূপ অল্প মূল্যে বিক্রয় হইত। ম্যাকল্যারেন সাহেব বলেন নদিয়ার উত্তরে ভুরমুড়া, ডিহিং নদীর দিহিবা মুক নামক খাড়ি, দের পাই ও স্বর্ণশ্রী প্রভৃতি নদীতে স্বর্ণ বাহির করিতে পারিলে তাহা লাভজনক হইবার সম্ভাবনা। প্রথমোক্ত নদী দুইটির প্রস্তর নিখুঁত করিয়া পরীক্ষা করা হয় নাই বটে, কিন্তু ১০০। ১৫০ টাকা ব্যয় করিলেই সে বিষয়ে পরীক্ষা হইতে পারে। এই সামান্য অর্থ ব্যয় করিলেই বুঝা যাইবে যে, ২।৪ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া আরো চাহিয়া অধিক পরীক্ষা প্রয়োজন কি না? কিন্তু দের পাইতে সোণা বাহির করিবার চেষ্টা করিলে যে তাহা লাভজনক হইবে ম্যাকল্যারেন সাহেবের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিরূপে কি প্রণালীতে এই সকল নদীতে সোণা বাহির করিতে হইবে তাহা ম্যাকল্যারেন সাহেব তাঁহার প্রকাশিত রিপোর্টে পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা ভূতত্ত্ববিভাগের প্রকাশিত রিপোর্ট পাঠ করিলে অবগত হইবেন। যাঁহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন [illegible] তাঁহাদিগকে একেবারে অধিক টাকা [illegible] করিয়া [illegible] করিতে বলেন না। তিনি দুই তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] কার্য্য [illegible] [illegible]

এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন আসামকে যতদূর বলিয়া যেরূপ অভিহিত করা হয় আসাম বাস্তবিক সেরূপ উপেক্ষার যোগ্য নহে। আসামের ভূমি যে কেবল চা আবাদের উপযোগী তাহা নহে। তথায় ধান্য, সরিষা, পাট প্রভৃতি শস্য আবাদ করিলে ভাল-রূপ জন্মিয়া থাকে ইহা পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভূগর্ভে প্রচুর কয়লা কেরোসিন তৈল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। ইংরেজ ধন-কুবেরগণ চা ছাড়িয়া অনেকে এই সকল খনির কার্য্যে মূলধন নিয়োগ করিতেছেন। নদী-গর্ভে সুবর্ণেরও অভাব নাই। কিন্তু এই সমস্ত ধন-ভাণ্ডার কি বিদেশীয়েরা লুণ্ঠন করিবেন আর আমরা চুপ করিয়া দেখিব? আমরা বিদেশীয়-দিগের সমকক্ষ বলিয়া অনেক সময় স্পর্দ্ধা করি। কিন্তু সে সমকক্ষতা কেবল তাহা-দিগের ভাষায় পরীক্ষা ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ত দেখিতে পাই না। বাস্তবিক ইংরেজের সহিত সমকক্ষতা দেখাইতে হইলে তাহাদিগের মত উদ্যমশীলতা অধ্যবসায় ও কার্য্যতৎপরতার আবশ্যক। আসামের ক্ষেত্র হইতে যে সকল ইংরেজ কোটি কোটি টাকা দেশে লইয়া যাইতেছেন তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে আমা-দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন, কিন্তু একমাত্র উদ্যম-শীলতার জন্য তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা যে দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি তাহার কারণ দেশের সমস্ত ধন ক্রমশঃই বিদেশীয়দিগের করতল-গত হইতেছে। যাহাতে আর অধিক দিন এই-রূপে বিদেশীয়েরা সমস্ত গ্রাস করিতে না পারেন সে জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে, তাহা না হইলে, আমরা আর্য্যজাতি বলিয়াই গৌরব করি, আর আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা পৃথিবীতে সভ্যতার বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া গৌরব করি, [illegible] হইতে আমরা রক্ষা পাইব না। আমাদিগের জাতীয় রক্ষা করিতে হইবে [illegible] জাতীয় [illegible] হয় ও [illegible] বৃদ্ধি পায় সে

গবাদির আহার ও সেবা।

[[illegible] হইতে উদ্ধৃত]

উদ্দেশ্য স্থির।—শকট-বহন, ভূমি কর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে এবং দুগ্ধ ও ঘৃত লাভার্থ, এদেশে গো ও মহিষ পালিত হয়। গো ও মহিষ জাতির উন্নতি করিতে হইলে এই দুই প্রকার উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া উহাদের পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যক। যেরূপ ভাবে জন্তুদিগের পালন করিলে উহাদের বল ও কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, ঠিক্ সেইরূপ ভাবে পালন না করিলে দুগ্ধবতী গাভী অথবা মহিষীর দুগ্ধদানের ক্ষমতা বর্দ্ধিত না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া থাকে। বল ও কার্য্যক্ষমতা যেরূপ জনক ও প্রসূতি হইতে বংশের অনুগামী হয়, দুগ্ধদান ক্ষমতাও ঠিক্ সেইরূপ হইয়া থাকে। এ কারণ হল ও শকট বহনের উপযোগী গো-মহিষ, দুগ্ধ দোহনার্থ গো-মহিষের সহিত একত্র পালিত না করিয়া সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে পালিত করা কর্ত্তব্য। উহাদের পৃথক্‌ভাবে আহারাদির ব্যবস্থা করাও কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ একই ব্যক্তির পক্ষে দুই প্রকার জন্তু পালন না করিয়া একই উদ্দেশে একই প্রকার জন্তুর পালন বিধেয়। ইহা দ্বারা যে উদ্দেশে জন্তু পালিত হইতেছে ঐ উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিষ্ণুভাবে সাধিত হইতে থাকে; অর্থাৎ, দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষী কাল-সহকারে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দিতে থাকে, এবং কার্য্যকারী বৃষাদি কাল-সহকারে উত্তরোত্তর অধিক বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইতে থাকে।

দুগ্ধবতী গাভী ও উহার উপযুক্ত বৃষ।—দুগ্ধবতী গাভীর বা মহিষের একটী জাতি সৃজন করিতে হইলে প্রথমতঃ কয়েকটী সুলক্ষণ দেখিয়া কয়েকটী গাভী ও মহিষী ও একটী বৃষ বা মহিষ [illegible] করা আবশ্যক। এ গুলির, গ্রীবা ক্ষীণ, পশ্চাদ্ভাগ বিশাল, পা-গুলিন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও [illegible], [illegible], লাঙ্গুল বহুপুচ্ছ বিশিষ্ট ও মৃত্তিকা স্পর্শী হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাদের প্রকৃতি শান্ত, গতি [illegible] [illegible] তীক্ষ্ণ প্রভৃতি হওয়া আবশ্যক। [illegible] জাতি [illegible] প্রথম [illegible] হওয়া ভাল, কোনো বিদেশীর উন্নতি-সাধন যত আয়াসসাধ্য, বিদেশীর জন্তুর উন্নতিসাধন তাদৃশ নহে। তবে অনেক স্থান ধরিয়া কোন বিদেশীর জাতি কোন স্থানে বাস করিবার কারণ যদি উহাদের ঐ স্থানের জল-বায়ু সহ্য হইয়া গিয়া স্থানীয় জাতিদের ন্যায়ই রৌদ্র ও বৃষ্টি ভোগ করিয়াও পীড়াগ্রস্ত হয় না, এমন দেখা যায়, তাহা হইলে ঐ জাতীয় গাভী অধিক দুগ্ধ দান করিলে উহারই কয়েকটী নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। যে আকারের গাভী লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে, বৃষও সেই আকারের হওয়া কর্ত্তব্য। বৃহদাকারের বৃষ ব্যবহার দ্বারা প্রসবকালে গাভীর অনেক অনর্থ ঘটিয়া থাকে। দেখিতে ক্ষীণ অথচ ৩.৪ [illegible] দুগ্ধ দেয় এই প্রকার ক্ষুদ্রাকারের দেশী গাভী লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা ভাল।

পালন-নিয়ম।—এরূপ ক্ষুদ্র কয়েকটী দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষী নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া, উহাদের এমনভাবে পালিত করিতে হইবে যাহাতে উহাদের দুগ্ধ দিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে থাকে। দুগ্ধবতী জন্তুর জল, বায়ু, ও রৌদ্র সহ্য করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। এ কারণ এ জাতীয় জন্তুগুলির জন্য পরিষ্কার গৃহ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় ইহাদের মাঠে রাখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু দিবাভাগে রৌদ্রতাপের আতিশয্য হইলে ইহাদের বৃক্ষতলে বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক, এবং রাত্রিকালে গৃহাভ্যন্তরে রাখিয়া যাহাতে মশকের দংশনে উহারা কষ্ট না পায় এ কারণ ক্ষণেককাল ধরিয়া গৃহাভ্যন্তরে ধুনার বা ঘুঁটের ধূম করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। গোশালা এমন পরিষ্কার রাখিতে হয় যেন উহাতে প্রবেশ মাত্র এমন বোধ না হয় যে গৃহটী মানুষের বাসের অনুপযুক্ত। যে গৃহে মানুষে শীতে, অথবা গ্রীষ্মে, অথবা টানা বাতাসে, অথবা বৃষ্টির ছাটে, অথবা দুর্গন্ধে, অথবা মৃত্তিকার সিক্ততার কারণ, কষ্ট পায়, সেরূপ গৃহে দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষকে রাখা উচিত নহে। যে সকল গো-মহিষ শকট বা হল বহনের জন্য রক্ষিত হয় উহাদের রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত ইত্যাদি ভোগ করাইয়া কষ্ট-সহিষ্ণু করা ভাল, কিন্তু [illegible] করিতে গেলে দুগ্ধবতী গাভী [illegible] করিয়া

দুগ্ধ প্রদায়িনী শক্তির বৃদ্ধি।—গবাদি জন্তুর দুগ্ধ প্রদায়িনী শক্তি বাড়াইবার জন্য কয়েকটী বিশেষ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।

১ম,—গাভীর প্রথম বৎস জন্মিবার পর হইতেই উহাকে দশ এগার মাস পর্য্যন্ত দোহন করা উচিত। দ্বিতীয় বৎস জন্মিবার একমাস মাত্র পূর্ব্বে দোহন রহিত করা উচিত। ইহা দ্বারা গাভীর শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ, প্রসবের একমাস পূর্ব্বে পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিবার অভ্যাস থাকিয়া যায়।

২য়,—বৎসের মায়া করিয়া অথবা আলস্য হেতু আংশিক পরিমাণে দুগ্ধ দোহন করা কখনই উচিত নহে। যতদূর সম্ভব টানিয়া দুগ্ধ দোহন করা উচিত। ইহাতে গাভীর দুগ্ধ দানের ক্ষমতা বিশেষ বাড়িয়া যায়। ভাল করিয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়া পরে বাছুরকে মাতার নিকটে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে গাভীর বাঁটের ছিদ্রগুলি পরিষ্কার থাকে এবং পালানে দুগ্ধ জন্মিবার আসক্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

৩য়,—প্রত্যহ এক বা দুইবার অপেক্ষা তিন বা চারিবার দুগ্ধ দোহন করিলে, গাভীর দুগ্ধ দানের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। অন্ততঃ দুই সন্ধ্যা দুগ্ধ দোহন না করিলে গাভীর দুগ্ধ দানের আসক্তি হ্রাস হইয়া আইসে।

৪র্থ,—প্রত্যহ একই সময়ে ও একই লোকের দ্বারা দোহন কার্য্য করান কর্ত্তব্য। লোক পরিবর্ত্তন ও সময় পরিবর্ত্তন দ্বারা দুগ্ধ দিবার ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যায়।

৫ম,—প্রত্যেকবার দিবসের মধ্যে অথবা অন্ততঃ একবার দুগ্ধ দোহনের পরে, পালানের গাত্রে রেড়ির তৈল মালিশ করিয়া দিলে জন্তুদিগের দুগ্ধ দিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। বাঁটে যেন রেড়ির তৈল না স্পর্শ করে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

৬ষ্ঠ,—দুগ্ধ দোহন কালে জন্তুদিগকে কিছু সুখাদ্য সামগ্রী আহার করিতে দেওয়া উচিত,—যথা কলাইয়ের ভুসী, খৈল, লবণ, গুড় ইত্যাদি। দুগ্ধ দিবার জন্যই গৃহ-স্বামী এই সকল সুখাদ্য সামগ্রী খাইতে দেন, ইহা জানিতে পারিয়া জন্তুগণ যত্ন সহকারে ও নির্বিবাদে দুগ্ধ দান করে।

৭ম,—দুগ্ধের পরিমাণ ও মিষ্টতা বৃদ্ধি করিবার উপযোগী খাদ্য গাভী বা মহিষীকে দেওয়া উচিত। খাদ্য সম্বন্ধে এই কয়েক প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে:—

(ক) যেখানে যথেষ্ট চরাইবার মাঠ আছে ও যেখানে মাঠে অপর্য্যাপ্ত ঘাস জন্মিয়া থাকে, সেখানে প্রত্যহ দুইসের মাস কলাই, সিদ্ধ করিয়া একসের জুয়ার বা দেবধান্যের ছাতু ও পাঁচসের ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধবতী গাভীকে খাইতে দিলে উহার দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে; অথবা, কেবল মাত্র দুইসের ছোলার ডাল সমস্ত দিবস জলে ভিজাইয়া সন্ধ্যার সময় খাইতে দিলেও গোরুর দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে।

(খ) অতি প্রত্যূষে, অর্থাৎ, রাত্রি দুই তিনটার সময় হইতে, গোরুকে চরাইতে পারিলে গোরুর দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। দিবসেও নিয়মিত দুই তিন ঘণ্টা চরান আবশ্যক।

(গ) কুলের পল্লব ও পত্র কুচাইয়া কাটিয়া উহার সহিত দুই-একসের কার্পাসের বীজ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলেও দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। এ স্থলেও গরুকে নিয়মিত চরান আবশ্যক।

(ঘ) কাঁটানোটে গাছ, কাঁচা বেল, মাসকলাই ও মুগ একত্রে সিদ্ধ করিয়া সমস্ত দিবস মাঠে চরিবার পরে সন্ধ্যার সময় গোরুকে খাইতে দিলে উহার দুধ বাড়ে।

(ঙ) যেখানে চরিবার বড় সুযোগ নাই সেস্থানে প্রত্যহ দুইটী করিয়া ছানি দিতে পারিলে গোরুর দুগ্ধ বাড়ে। প্রত্যেক বার একসের করিয়া খৈল জলে ভিজাইয়া দিয়া, উহার সহিত এক মুঠা লবণ মিশ্রিত করিয়া দিয়া উহা পাঁচসের কাটা বিচালি বা ভুসীর সহিত মিশাইয়া দিলেই ছানি দেওয়া হইল। অর্দ্ধসের খৈলের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধসের গুড় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৮ম,—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ পাইতে হইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার অথবা পরিস্রুত জল পানের ব্যবস্থা গো-শালার মধ্যে থাকা বিশেষ আবশ্যক। দশ সের শুষ্ক খাদ্যের সহিত একমণ জল যোগান আবশ্যক। কিন্তু আহার্য্য সামগ্রী গুলি জল-পূর্ণ হইলে একটী দেশী গোরু একমণ জল খাইতে পারে না। সকল গোরু সকল ঋতুতে সমান পরিমাণে আহার ও জলপান করে না। বৃহদাকারের গোরু প্রত্যহ একমণেরও অধিক

আহার করে। বঙ্গদেশের গোরু সাধারণতঃ অর্দ্ধমণ মাত্র আহার করিয়া থাকে। কিন্তু শুষ্ক আহার দিতে হইলে প্রত্যহ দশ বারসের মাত্র দিলেই যথেষ্ট হয়, অর্থাৎ, প্রাতঃকালে ৫ সের খড় বা ভুসী একসের খৈল ও গুড় এবং সন্ধ্যার সময় আর ৫ সের খড় বা ভুসী, ও আর এক সের খৈল ও গুড় প্রত্যেক বার অর্দ্ধমণ বা পঁচিশ সের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

গাভীর যত্ন—গোরুর দুগ্ধ শুকাইয়া গেলে উহাকে মাঠে রাখিয়া সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ একটী মাত্র 'ছানি' দেওয়া উচিত। ঐ ছানির জন্য অর্দ্ধ সের মাত্র খৈল বা কার্পাসের বীজ ও দুই তিন সের মাত্র খড় বা ভুসী ব্যবহার করা উচিত। প্রসবের পূর্ব্বে গাভী, কিছু কৃশ হইয়া যায় তাহাতে ক্ষতি নাই; মোটা হইলে ক্ষতি আছে। প্রসব হইতে আর তিন চারিদিন মাত্র বিলম্ব আছে যখন এরূপ বোধ হইবে, তখন প্রত্যহ অর্দ্ধসের যব সিদ্ধ, এক-পোয়া গুড়, অর্দ্ধপোয়া সর্ষপ বা মসিনার তৈল ও অর্দ্ধ ছটাক লবণ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। ইহাদ্বারা প্রসবান্তে গোরুর দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে। প্রসবান্তে ৪।৫ দিবস জন্তুদের জলীয় পদার্থ আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। খড় (২।৩ আঁটী মাত্র) গমের ভুসী, (অর্দ্ধসের) গুড় একপোয়া, মেথি এক ছটাক, আদ্রক বা শুঁট অর্দ্ধপোয়া, তৈল অর্দ্ধপোয়া, এই সকল সামগ্রী ৪।৫ দিবস খাইতে দিয়া পরে ক্ষুদ ও কলাই সিদ্ধ, দুগ্ধ ও গুড়ের সহিত মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। পরে ৫।৭ আঁটি খড়ের সহিত প্রত্যহ একপোয়া গুড়, একসেরের কলাই ও অর্দ্ধসের চালের ক্ষুদ ব্যবহার করা ভাল। প্রসবের পরে তিন সপ্তাহ ধরিয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া উহা গাভী বা মহিষীকেই খাইতে দেওয়া উচিত, কেননা এই সময়ের দুগ্ধ পান করিলে মানুষের উদরাময় পীড়া হওয়া সম্ভব। বাছুর খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহা দোহন করিয়া গোরুকেই গুড় কলাই ও ক্ষুদের সহিত জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতেও গোরুর দুধ বাড়ে। প্রত্যেক বারে দুগ্ধ দোহনের পরে বাছুরকে গাভীর সহিত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। বাছুর বাঁটের ছিদ্র পরিষ্কার রাখিয়া ঠুনকা রোগ হইতে রক্ষা করে। প্রসবান্তে ২১ দিবস পরে প্রায় দুগ্ধের পরিমাণ স্বভা-বতঃই বাড়িয়া থাকে। এই সময়ে দোহনাদি কার্য্যের জন্য নিযুক্ত লোককে কখনই পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে। এ সময়ে গোরুকে স্থানা-ন্তরিত করিলেও দুধ না বাড়িয়া বরং কমিয়া যায়। যদি গোরু স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে প্রসবের দুই মাস পূর্ব্বে অথবা প্রসবের এক সপ্তাহ পরে কিম্বা তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে করা উচিত। তিন সপ্তাহ গত হইলে ক, খ, গ, ঘ, ও ঙ, নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের মধ্যে একটীর ব্যবস্থা করা উচিত। তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হইলে পূর্ণ-পরিমাণে (অর্থাৎ, দেশী গোরুর জন্য ১৪ আঁটি ও পশ্চিমে বড় গোরুর জন্য ২০ আঁটি) খড় খাইতে দেওয়া উচিত।

বাছুরের যত্ন—বাছুরকে প্রসবের এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রসূতি হইতে পৃথক্ করিয়া দুগ্ধ পান করাইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। বাছুর ভিন্ন গোরুর দুধ দোহা যায় না, এ নিয়ম বিলাতে আর নাই। এক সপ্তাহের মধ্যে বাছুরকে সরাইয়া ফেলা হয় বলিয়া, গোরুর বিনা বাছুরে দুগ্ধ দিবার অভ্যাস জন্মিয়া যায়। কিন্তু একমাস কাল পর্য্যন্ত দোহিত দুগ্ধ বাছুর যত পান করিতে পারিবে ততই দেওয়া উচিত। দোহনের পরে প্রত্যহ কিছুক্ষণ বাছুরকে বাঁট টানিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এক মাসের মধ্যেই বাছুর ঘাস খুঁটিয়া খাইতে শিখিবে। কিন্তু তখনও তক্র বা ঘোল অথবা ভাতের মাড় বা ফেন, মসি-নার খোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুইবার করিয়া বাছুরকে খাইতে দেওয়া উচিত। তিন মাস গত হইলে বাছুরকে ঘাস, ভুসী খোল, ভাতের মাড় এই সকল সামগ্রী একত্র করিয়া দুইসের ছানি সন্ধ্যার সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। ছয়মাস কাল এইরূপে রাখিয়া পরে বাছুরদের কেবল মাঠে চরিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে বকনের প্রথম বাছুর জন্মান উচিত।

মহিষ, বলদ ও বৃষের যত্ন।—মহিষ যে সে প্রকারে ঘাস পাতা খাইয়া, এমন কি অশ্ব-শালার অপরিষ্কার খড় ইত্যাদি খাইয়া কার্য্যক্ষম থাকিয়া যায়। কিন্তু ইহাদেরও সন্ধ্যার সময় ভুসী ও খোল মিশ্রিত অর্দ্ধমণ আন্দাজ ছানি দেওয়া উচিত। বৃষদের বিশেষ যত্নের কিছুই আবশ্যক করে না। উহাদের বলদের সহিত রাখিয়া বলদকে যে খাদ্য দেওয়া যায় ঐ খাদ্যই দেওয়া উচিত। তবে নিতান্ত

স্থূলকায় হইলে বৃষদেরও কিছু কায করাইয়া লওয়া উচিত। হল ও শকট বহনকারী বলদদের কষ্ট-সহিষ্ণু করা আবশ্যক বটে, কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে উহাদের প্রায় গাভীরই ন্যায় ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ উহাদেরও সন্ধ্যার সময় অন্ততঃ একটা ভূসী বা খড় ও খৈল বা কার্পাস বীজ মিশ্রিত ছানি দেওয়া উচিত। যদি চরিবার মাঠে অধিক না থাকে তাহা হইলে ইহাদেরও দুইবার ছানি দেওয়া আবশ্যক। বলদগণ যখন কোন কায না করে তখন উহাদের কেবল মাঠে চরিতে দেওয়া উচিত, খোল, ভূসী বা ছানি দেওয়া উচিত নহে।

আহারের পরিবর্তন।—সকল প্রকার জন্তুকেই যতদূর সাধ্য প্রত্যহ একই প্রকার আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি আহারের পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যে গোরুর বিচালি ও খৈল খাওয়া অভ্যাস উহাকে এককালীন ঘাস না দিয়া, ঘাসের সহিত খৈল ও বিচালি মিশাইয়া দিয়া ক্রমশঃ ঘাস খাওয়ান অভ্যাস করা ভাল। আহারের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হেতু কেবল দুগ্ধ কমিয়া যায় এরূপ নহে, অনেক সময় এই কারণে পেট ফুলিয়া অথবা অন্য কোন সাংঘাতিক পীড়া জন্মিয়া গো-মহিষ মারা যায়। যেমন গো-শালায় সর্ব্বদা পরিষ্কার পানীয় জল রাখা কর্ত্তব্য, সেইরূপ কয়েকটী বৃহৎ খণ্ড সৈন্ধব লবণও রাখা উচিত। এই লবণ লেহন করাতে অনেক পীড়া নিবারিত হয়।

আহারের পরিমাণ।—যে গোরুর বা মহিষের ওজন দশমণ, উহাকে প্রত্যহ (ওজনের দশ ভাগের একভাগ, অর্থাৎ) একমণ আহার দেওয়া উচিত, কিন্তু এরূপ গোরুর বা মহিষের প্রত্যহ অর্দ্ধমণ (অর্থাৎ শরীরের ওজনের বিশ ভাগের একভাগ, দুগ্ধ দান করা উচিত। সকল জন্তু সম্বন্ধেই শরীরের ওজন ও আহারের মধ্যে যে এই অনুপাতটী থাকা উচিত ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সামান্য এদিক্ ওদিক্ হইলে কিছুই আসিয়া যায় না; কিন্তু যে গোরুর প্রত্যহ অর্দ্ধমণ আহার করা উচিত উহাকে দশসের খাইতে দিলে উহার শরীর নিশ্চয়ই শীর্ণ হইয়া যাইবে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ গোরুরই আহারাভাবে এই অবস্থা।

গো-শালার বন্দোবস্ত।—নিতান্ত বর্ষা ও শীতের সময় বলদদেরও গো-শালার মধ্যে রাখা উচিত। এক একটী গাভী বা বলদের জন্য ৫ ফুট প্রস্থ, ১০ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট উচ্চ স্থান আবশ্যক। পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই শ্রেণী করিয়া রাখিতে পারিলে ২০ ফুট প্রস্থ ও ৫০ ফুট দীর্ঘ গো-শালায় ২০টী গাভী বা বলদ থাকিতে পারে। মধ্যবর্ত্তী নালার মধ্যে উভয় শ্রেণীরই মূত্র আসিয়া পড়িয়া বাহিরে গিয়া একটী পাকা গর্ত্তে জমিতে পারে, এবং তথা হইতে ঐ মূত্র ক্ষেত্রে সারের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী নালাটী চারি অঙ্গুলি মাত্র গভীর হওয়া আবশ্যক, অধিক গভীর হইলে জন্তুগণ উহার মধ্যে পড়িয়া গিয়া কষ্ট পাইতে পারে। প্রত্যহ মল-মূত্র স্থানান্তরিত করিয়া গো-শালা ধৌত করা ও পরিষ্কৃত অবস্থায় রাখা নিতান্ত আবশ্যক। বৃষ ও গো-বৎস গুলির জন্য পৃথক্ দুইটী কুঠরী থাকা কর্ত্তব্য।

খোল-ভূসী।—গাভীর পক্ষে তিসী তিল, অথবা চীনাবাদামের খোল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বলদ ও বৃষের পক্ষে সর্ষপের খোল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কলাই, ছোলা, ভূসী, গম, যব, এ সকল জিনিষ যদি খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহাদের কোন একটী সামগ্রীর দুই সেরের পরিবর্ত্তে এক সের খোল বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ, যে গোরুকে দুই সের খোল খাইতে দেওয়া হয়, উহাকে একসের খোল ও দুইসের ছোলা অথবা কলাই বা যব খাইতে দিলে চলে। খোল খাওয়ানতে খরচ কম পড়ে এইরূপ দেখা যায়। তবে স্থান বিশেষে তিসীর বা তিলের খোলের দাম ৪.৫ টাকায় মণ; এরূপ স্থানে একসের খোলের পরিবর্ত্তে একসের ভূসীও একসের কলাই, অথবা দুইসের যব অথবা একসের যব ও একসের ছোলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছোলা, গম, যব, ইত্যাদি ছাতু করিয়াই খাইতে দেওয়া উচিত। কলাই সিদ্ধ করিয়াই খাইতে দেওয়া উচিত। ভাত খাইতে দেওয়াতে গবাদি জন্তুর বিশেষ উপকার দর্শে না, এবং অধিক ভাত খাইতে দিলে অনেক সময় গোরুর ব্যারাম হয়। ভাতের মাড় ভাত অপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্য। খোল জলে ভিজাইয়া খড়ের সহিত মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত।

গার্হস্থ্য ওলাউঠার চিকিৎসা।

২

রোগীর প্রতি ব্যবহার।

১। রোগীকে প্রশস্ত, পরিষ্কৃত ও বাতাস-সঞ্চালন যুক্ত ঘরে রাখা আবশ্যক। যেন সেঁতান মেজে না হয়।

২। শয্যাটী পরিষ্কৃত হইবে, এবং মল মূত্র লাগিলে তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া দিবে।

৩। ওলাউঠার ভেদ আরম্ভ হইলেই রোগীর সর্ব্বশরীর কম্বল বা ফ্লানেল অথবা কোন গরম বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। তন্মধ্যে তলপেট ও পদদ্বয় বিশেষরূপে গরম রাখিবে। তলপেট ফ্লানেল দ্বারা জড়াইবে ও পদদ্বয় গরম জলের বোতল দ্বারা গরম রাখিবে।

৪। ওলাউঠা রোগীকে সর্ব্বদা শয়ন করাইয়া রাখিবে। মলাদি ত্যাগের নিমিত্ত সরা দিবে কোন ক্রমে উঠিতে দিবে না। পায়খানায় যাওয়া আসা করিলে শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া নাড়ীশূন্য হইবে।

৫। অধিক কথা কহিতে এবং উঠা বসা করিলে শরীর অতি দুর্ব্বল হেতু পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছা ও এককালে নাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারে।

৬। জলপান করিতে চাহিলেই অল্প অল্প নির্ম্মল শীতল জল ও অধিক বমন হইলে বরফের টুকরা মাঝে মাঝে দেওয়া যায়। কিন্তু ওলাউঠা রোগীকে বরফ না দিয়া যদি কেবল শীতল জল দিলে চলে, তাহাই করা ভাল; কারণ বরফ সকলকার পক্ষে ও সকল সময়ে হিতকর নহে। জল ভিন্ন অপর কোন দ্রব্য খাইতে দিবে না।

৭। পিপাসার জন্য জল চাহিলে কখন তাহা বন্ধ করিবে না। বড় চামচের এক চামচে বা ছোট চামচের দুই তিন চামচে শীতল জল মাঝে মাঝে পান করিতে দিবে।

৮। রোগী কোন মতে বিরক্ত বা হতাশ্বাস না হয়, এবং তাহার নিকট কেহ যেন হা হুতাশ প্রকাশ না করেন এরূপ করা উচিত। তাহার নিকট পীড়াটী "বড় কঠিন ও আরোগ্য হওয়া অসম্ভব," এরূপ কথা কেহ যেন প্রকাশ না করেন।

৯। রোগীর প্রতি সর্ব্বদা শান্ত ব্যবহার ও আশ্বাস-জনক বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক।

১০। ঘরের মধ্যে কোনরূপ গোলমাল করিতে দিবে না। এক জন বা দুই জন সুবোধ আত্মীয় রোগীর নিকট থাকিলেই চলিবে, কারণ এক ঘরে অধিক লোক থাকিলে পরস্পরের শ্বাস প্রশ্বাসে বায়ু দূষিত হইয়া উঠে ও বহু জনতায় রোগ বৃদ্ধি হয়।

১১। যদি "পতনাবস্থা" অর্থাৎ নাড়ী ছাড়িয়া যখন হিমাঙ্গ হয়, তখন গাত্রাবরণ সহ্য হইবে না, এবং তাহাও দেওয়া অনাবশ্যক।

১২। যাহাতে ঘরে নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালিত হয় এবং ঘরটী শুষ্ক ও পরিষ্কৃত ভাবে থাকে এমন উপায় অবলম্বন করিবে। দিবসে গৃহের অভ্যন্তরে সুন্দররূপে বায়ু গমনাগমনের সুবিধা করিয়া রাখিবে।

১৩। পীড়া বৃদ্ধি বা হিমাঙ্গ হইলে অর্থাৎ যখন নাড়ী ছাড়িয়া যায়, তখন ঘরের সমস্ত দরজা ও জানালা দিবা রাত্র খুলিয়া রাখিবেক। যদি দুর্য্যোগ হয়, তবে সেই মুক্ত দরজা জানালায় কাপড়ের পরদা দিতে হইবে।

১৪। শীতকালে বা অন্য কোন সময়ে দরজা জানালা খোলা থাকার জন্য বাতাস বড় ঠাণ্ডা বোধ হইলে রোগীর ঘরে কয়লা অথবা গুলের আগুন রাখিয়া দেওয়া উচিত।

১৫। ওলাউঠা রোগীর ভেদ ও বমন যেখানে সেখানে ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে; কারণ উক্ত ভেদ বা বমন কোন প্রকারে শরীরস্থ হইলে এই ভয়াবহ পীড়া হইবার সম্ভাবনা। মল ও বমি হইবা মাত্র স্থানান্তরিত করিবে অথবা তৎক্ষণাৎ তাহার উপর ছাই চাপা দিবে।

১৬। রোগীর ভেদ বমন ও বস্ত্রাদি পুষ্করিণী প্রভৃতির জলে না ধুইয়া জমির মধ্যে পুতিয়া, রাখিবে অথবা বস্ত্রাদি অগ্নি-সংযোগে পুড়াইয়া ফেলিবে, নচেৎ সেই সকলের দ্বারা বহু লোকের পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

১৭। ওলাউঠা রোগীর সেবা শুশ্রূষা কিম্বা অন্য কোন কারণে তাহার নিকটে যাইতে হইলে খালিপেটে না যাইয়া কিছু আহার করিয়া যাওয়া ভাল; অন্ততঃ এক গেলাস জলপান করিয়া যাইবে।

১৮। ওলাউঠা রোগীর সেবা শুশ্রূষার পর নিজের হাত পা ইত্যাদি ভালরূপে ধৌত করা উচিত। পরিহিত বস্ত্র ছাড়িয়া, অন্য কাচা কাপড় পরিবে।

১৯। ওলাউঠা রোগীর হাত পা ও পেটে খিল ধরিলে তাহার প্রতীকার সর্ব্বদা আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা ঘটে যে,তাহার সঙ্গে অন্য বাহ্যিক উপায় অবলম্বন না করিলে আর চলে না। তখন হস্ত দ্বারা সেই সেই স্থান ঘর্ষণ করিলে অথবা এক্ টুকরা ফ্লানেল কাপড় এল্‌কোহল্ নামক উৎকৃষ্ট মদে ভিজাইয়া সেই সেই স্থানে ঘর্ষণ করিলে খিল ধরার উপশম হয়। কিন্তু অন্যান্য উপায় অবলম্বন অপেক্ষা সুস্থ ও সবল আত্মীয় ব্যক্তির দুই হস্ত ঘর্ষণ দ্বারা খালধরার স্থানে বারম্বার প্রয়োগ করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সময়ে সময়ে গরম জল বোতলে পুরিয়া তাহার উপর গড়াইলেও চলে। কেহ কেহ বলেন জলে স্বল্প পরিমাণ লবণ গুলিয়া সেই জল গরম করিবে, এবং তাহাতে অল্প মাত্রায় সোরা ফেলিয়া সেই গরম জলে এক টুকরা কম্বল ভিজাইয়া উত্তমরূপে নিঙড়াইয়া খিলধরা স্থানে চাপিয়া ধরিবে, পরে উহার উপর অন্য একটা গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। পূর্ব্বোক্ত কোন একটী বাহ্য প্রয়োগ বারম্বার করিলে খিলধরার শীঘ্র উপশম হয়।

২০। রোগী যাহাতে ভরসাহীন না হয় এমন যত্ন করিবে। নিদ্রা আসিলে কোন মতে ঘুম ভাঙ্গাইবে না; এবং ঘুম ভাঙ্গাইয়া কখন ঔষধ খাওয়ান উচিত নহে।

২১। ভেদ বমি বন্ধ হইলেও দশ বা বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত শয্যা হইতে উঠিতে দিবে না এবং রোগীর গাত্র ঢাকিয়া রাখিবে। কখন কখন বাতাস লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া পুনর্ব্বার রোগ দেখা দেয়।

২২। যে সকল ওলাউঠা রোগে কর্পূরের আরক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এরূপ স্থলে রোগের সূত্রপাতে সাত আটবার উক্ত ঔষধ সেবনের পর বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতে দেখিলে এবং রোগীর মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে আর ঔষধ দিবে না; কারণ প্রায়ই এইরূপ অবস্থার পর পীড়ার শান্তি হয়।

২৩। যে ব্যক্তি বহুকাল ধরিয়া অহিফেন ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহার পীড়াকালীন কদাচ উহা বন্ধ করা উচিত নহে। বন্ধ করিলে রোগীর বিষম ফল দর্শে; এমন কি আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে দেখিয়াছি। তবে অহিফেন ব্যবহারের এক বা দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে ঔষধ সেবন করিতে হইবে। তাহাতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণের কিছুমাত্র লাঘবতা হয় না; আমার চিকিৎসাধীনে আমি এরূপ অনেক স্থলে দেখিয়াছি। সম্প্রতি কলিকাতা কাঁশারীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের বাহুস্তম্ভ পাকিয়া বিষম জ্বর বিকার উপস্থিত হয়। একমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু তিনি দুই বেলায় প্রায় অর্দ্ধ ভরি ওজনে অহিফেণ খাইতেন। তথাপি আমি যে সকল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইতে দিতাম, তাহাতে উক্ত ঔষধের গুণের কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই। যেরূপ ঔষধের গুণ সেইরূপ সুফল ফলিয়াছিল।

পথ্য-বিধান।

যখন শত শত সুচিকিৎসকেরা ব্যবস্থা করিলেও একমাত্র সুপথ্যের অভাবে বা সামান্যরূপ ত্রুটিতে চিকিৎসার সমস্ত উপকারিতা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন পথ্য-বিধানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

২। ওলাউঠার আক্রমণ কাল হইতে প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ কাল পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ জল ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য খাইতে দিবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পাকযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্র আবার পূর্ব্বেকার মত স্বাভাবিক অবস্থায় না আইসে, অর্থাৎ যতক্ষণ হরিদ্রা বর্ণের মল ও স্বাভাবিক মূত্র না হয়, ততক্ষণ কোন প্রকার কঠিন প্রকার খাদ্য দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

৩। রোগ একটু উপশম হইলে রোগী আহারের জন্য নিরতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে কেবল জলপক্ক আরারুট বা বার্লি অতি তরল ভাবে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে একটু লবণ মিশাইয়া দুই তিন ঝিণুক পরিমাণে মাঝে মাঝে পথ্য দিবে।

৪। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় ওলাউঠার প্রথম পথ্যের সময় "সাগুর জল" দিতে

বলেন। তাহা এই প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবে —সাগুদানাগুলি শীতল জলে বেশ করিয়া ধুইয়া এক ঘণ্টা কাল পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহা ছাঁকিয়া লইয়া পরিস্কৃত জল মিশাইয়া মৃদু মন্দ অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। মাঝে মাঝে উহা খুন্তি বা কাটি দ্বারা নাড়িতে হইবে। পরিশেষে আস্তে আস্তে উহার উপরকার স্বচ্ছ তরল পদার্থটী পরিস্কৃত নেকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে উৎকৃষ্ট সাগুর জল প্রস্তুত হইবে। ছাঁকিবার সময় নেকড়া খানি না টিপিয়া ঢিলাভাবে ধরিলে সেইরূপ জলবৎ পদার্থ বাহির হইতে থাকিবে। যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় সাগু-প্রস্তুত প্রণালী পাঠ করিতে চান, তাঁহারা মৎকৃত "মেডিকেল ডিকস্নারি" নামক গ্রন্থ দ্বিতীয় সংস্করণের ২৯৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

৫। ওলাউঠা রোগীর পেটের ভিতরে এক প্রকার জ্বালা বোধ হয়, সে তাহা বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুধা বোধে আহারের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। সে সময় তাহাকে এক বা দুই ঝিনুক ঠাণ্ডা জল, লেবুর পানা, বা কাঁজি* ভিন্ন আর কোন কঠিন খাদ্য সামগ্রী দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ রোগীর পতনাবস্থায় পাকস্থলীর ও অন্ত্রের ভিতরকার আবরক ঝিল্লী খসিয়া পড়াতে তাহারা নিস্তেজ হইয়া যায়, সুতরাং উহাদের শোষণ ও স্রাবণ ক্রিয়া রহিত হয়। এ অবস্থায় সাগু কি দুগ্ধ দিলে রোগী পেট ফাঁপিয়া শীঘ্রই মরিয়া যায়।

বহুকাল পূর্ব্বে আমি একটী ভদ্র সন্তানের এইরূপ অকাল মৃত্যু হইতে দেখিয়াছি। তাহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা না জানিয়া "পতনাবস্থায়" এক পেট ভরিয়া সাগু খাইতে দিয়াছিল। আর একটী প্রত্যক্ষ উদাহরণ এস্থলে দেওয়া গেল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল এই মহানগরী কলিকাতায় যখন সর্ব্ব প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রচলন হইতেছিল, সেই সময়ে বহু বাজারস্থ দত্ত বংশোদ্ভব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ও ডাক্তার বেরিনী সাহেব উভয়ে স্বর্গীয় মহাত্মা প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের অনুরোধে চোরবাগান নিবাসী একটী নিচশ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকের ওলাউঠা রোগ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। বহুল যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বিনা অর্থে দিবারাত্র খাটিয়া রোগীর পীড়ার অনেক উপশম করেন। ডাক্তার মহাশয়দের অনুপস্থিত কালে সেই রোগী ক্ষুধা প্রকাশ করাতে তাহার বাটীর অজ্ঞ লোকেরা তাহাকে ভিজে চিঁড়া ও দধি খাইতে দিয়াছিল। রোগী অল্পক্ষণ মধ্যেই পেট ফুলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অতএব ওলাউঠা রোগীর কথানুযায়ী কদাপি আহার দেওয়া উচিত নহে। পথ্যাপথ্যের বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইয়া কার্য্য করিবে।

৬। গাঁদালের ঝোল—ভাল কথায় গাঁদালের পাতার অপর নাম গন্ধভাদালিয়া। ইহা বার্লী, আরারুট, সাগু ইত্যাদি সহ ঝোলে খাইতে ভাল লাগে। ওলাউঠা রোগের পর অন্ন পথ্যের অনেক পূর্ব্বে রোগীর পক্ষে ইহা বড় উপকারী। ইহা অতি স্নিগ্ধকারক, পরিপাক-শক্তি-বর্দ্ধক, বলকারক ও ধাতুপোষক। গাঁদালের ঝোলে অনেক প্রকার মসলা ব্যবহার করা উচিত নহে। সামান্য রকম হরিদ্রা বাটা, ধনে বাটা এবং লবণ জলে গুলিয়া জ্বালে চড়াইতে হয়। উহা যখন উত্তমরূপে ফুটিতে থাকে, তখন তাহাতে কয়েক খানি কচি ডুমুর ও তাজা কাঁচকলা কুচাইয়া এবং কয়েকটী গাঁদালপাতা ছাড়িয়া দিতে হয়। ক্ষণকাল উহা জ্বালে থাকিলে সুসিদ্ধ হইয়া একটু ঘন হইয়া আসিলে নামাইতে হয়। কেহ কেহ গাঁদালের কিছু ডাঁটা পাতা জল দিয়া একটু সৈন্ধব লবণ, জোয়ান ও আদ্রক সহ সিদ্ধ করিয়া ঝোল প্রস্তুত করেন।

৭। সিদ্ধ সাগু সরু চাউলের ভাত অপেক্ষা গুরুপাক খাদ্য। সরু চাউলের ভাত উদরে এক ঘণ্টার মধ্যে জীর্ণ হয়, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে জলসিদ্ধ সাগু উদরে জীর্ণ হইতে এক ঘণ্টা পয়তাল্লিশ মিনিট লাগে। তজ্জন্য রোগীকে কিরূপ করিয়া সাগু প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

৮। পথ্য দিবার সময় রোগীর পেট ভারী না হয়, কিম্বা পরে পেট না ফাঁপে তাহার প্রতি ভাল করিয়া দৃষ্টি রাখিবে। একেবারে অনেকটা না খাওয়াইয়া অল্প অল্প খাওয়ান ভাল। দুগ্ধপোষ্য

পান্তা ভাতের আমানী।

শিশুর মাতা যেরূপ দুগ্ধ খাওয়াইবার সময় শিশুর পেট দেখিয়া খাওয়ান, সেইরূপ ওলাউঠা রোগীর পেট দেখিয়া খাওয়ান উচিত।

৯। যখন রোগের বিশেষ উপশম হইবে, তখন অন্যান্য বলকারক পথ্য যথা,—সাগু, যবের বা ভাতের মণ্ড, সজীব মাগুর বা শিঙ্গী মাছের ঝোল, এবং যাহা সহজে জীর্ণ হয় এইরূপ খাদ্য খাইতে দিবে।

১০। ঝোল রন্ধন কালে যৎসামান্য মসলা ব্যবহার করিবে। বেশী মসলাযুক্ত খাদ্য ব্যবহারে পেট গরম করিয়া পাকস্থলীর অসুস্থতা জন্মায়। ওলাউঠা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াই গুরুপাক খাদ্য অর্থাৎ যে রন্ধনে অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলাদি ব্যবহার হইয়া থাকে এরূপ খাদ্য একেবারে ত্যজ্য।

১১। অনেক সময়ে প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় প্রস্রাব সহজে হইবার নিমিত্ত কেবল এক ছটাক বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ অর্দ্ধ সের ঠাণ্ডা জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাইতে দিতে হয়।

১২। ওলাউঠা রোগের পর অতি সাবধানে ও বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পথ্য দিবে।

১৩। পূর্ব্বোক্ত প্রকার আহারের ব্যবস্থা দ্বারা রোগী দুই তিন দিবস ভাল অবস্থায় থাকিলে, পরে ঘুঁটের পোরে সিদ্ধ করা ভাত দিবে। কয়েক দিন দুই বেলা ভাত না দিয়া বৈকালে জল আরারুট বা বার্লী অথবা এক ছটাক পরিমাণে দুগ্ধ মিশাইয়া খাইতে দিবে। এইরূপ পথ্যের পর যখন তীক্ষ্ণ ক্ষুধা দাঁড়াইবে, তখন হইতে হাঁড়ীর ভাত ব্যঞ্জন খাওয়াইতে আরম্ভ করা উচিত। এই সময়ে অধিক পরিমাণে ব্যঞ্জন খাওয়া ভাল নহে।

১৪। দুই তিন বৎসরের ভাল সরু দাদখানি চাউল ধুইয়া হাঁড়িতে জল দিয়া তৎসঙ্গে এক ধান্য পরিমাণ সৈন্ধব লবণ দিবে। যখন ঘুঁটের পোরে অর্দ্ধেকের উপর সিদ্ধ হইয়া আসিবে, তখন ফেন গালিয়া পুনরায় নূতন জল দিয়া সুসিদ্ধ করিয়া আবার ফেন গালিলে ঐ ভাত রোগীর পক্ষে বড উপকারী।

১৫। অন্ন পথ্য সহ্য হইলে তাহার পর স্নান করিতে দিবে। আবশ্যক হইলে, সমস্ত শরীর ভিজা গামছা নিঙড়াইয়া মুছাইয়া দিতে পারা যায়।

১৬। ডাইলের মধ্যে সোণামুগ, মসুরি, কিম্বা কাঁচা কলাইয়ের ঝোল, এবং তরকারীর মধ্যে তাজা ডুমুর, কাঁচাকলা, মানকচু, কচি পটল এবং তাজা বেগুন রোগীর পথ্য।

১৭। "বেলসুটা" ওলাউঠা রোগ আরোগ্যের এক প্রকার আহার ও ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে। কেহ কেহ বলেন যে, রোগী অনবরত রক্তের ন্যায় মলত্যাগ করিতেছে, এরূপ অবস্থায় বেলসুটা ব্যবহারে আরোগ্য হইতে দেখিযাছেন। সে কালের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা এক্ষণ পর্য্যন্ত ছেলেদের পেটের পীড়ায় সর্ব্বদা বেলসুটা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ জ্ঞান থাকা মন্দ নহে।

১৮। ওলাউঠা সারিয়া গিয়া কখন কখন জ্বর বিকার ও চক্ষুক্ষত প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইলে তদুপযোগী লঘু ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৯। কেহ কেহ বলেন রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে বার্লীর সহিত অত্যল্পপরিমাণে পুরাতন পোর্ট নামক সুরা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে শীঘ্র সবল হইতে পারে। কিন্তু আমার বহু কালের চিকিৎসাধীনে এ পর্য্যন্ত কখন এরূপ করিতে হয় নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।
প্রাচীন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার,
৩ নং চোরবাগান লেন, কলিকাতা।

মূল-ফসল।

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ফসল সমূহ উৎপাদনের জন্য মৃত্তিকার সুচারু কর্ষণ যেমন আবশ্যক, সারের আধিক্যও তেমনি আবশ্যক। বিশেষতঃ বীজ-বপনের বহু পুর্ব্বে ইহাদের জমী প্রস্তুত হওয়া চাই। এই জাতীয় ফসল সমূহের চাষের জন্য সমধিক যত্ন আবশ্যক। মূল-ফসল সমূহের উৎপাদন-প্রণালী নিম্নে বিবৃত হইল।

(১) মূলা ঃ—আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই রকম মূলা দেখিতে পাওয়া যায় (১) সাদা (২) লাল। মূল ভেদে আর এক প্রকার মূলা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূল বিটের ন্যায়। ভাদ্র, আশ্বিন মাস মূলার বীজ বুনিবার উপযুক্ত সময়। দক্ষিণাঞ্চলে বর্ষার প্রারম্ভে ইহার বুনানি আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ, ক্ষেত্রে দুই প্রকার চাষ দিয়া পাঁশ ছড়াইয়া দিলে মৃত্তিকা আল্‌গা হইয়া যায়। বিঘা প্রতি ১৫ মণ পাঁশই যথেষ্ট। সারি সারি করিয়া বুনিবার পর জমী একটু চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক।

(২) হরিদ্রা ঃ—হরিদ্রার চাষ সর্ব্বত্রই হয় না, তথাপি হরিদ্রা রীতিমত চাষ করিলে বেশ লাভ হইতে পারে। হলুদ চাষের জন্য মাটি উত্তমরূপে কর্ষিত হওয়া প্রয়োজন। অগ্রহায়ণ, পৌষ মাস হইতে ইহার জন্য চাষ দিয়া মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারা যায়। পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে হলুদের ক্ষেত্র কিছু নিম্ন হইলে সুবিধা হয়। হলুদ চাষে সাধারণতঃ সার ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু ফসল ভাল করিবার জন্য বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ গোবর ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিঘা প্রতি ৮ মণ হরিদ্রার বীজ আবশ্যক হয়। বৈশাখ মাসে জল হইলেই জমী সমান করিয়া, হলুদের গেঁড়ো বসাইতে হয়। প্রত্যেক গেঁড়োর মধ্যে ১ ফুট ব্যবধান থাকা আবশ্যক। এবং প্রত্যেক সারির মধ্যে ২ হাত জমী বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে পুঁতিবার সময় যাহাতে জলে গেঁড়ো না পচিয়া যায় তজ্জন্য সারির মধ্যস্থিত জমী হইতে এক কোদালী মাটি লইয়া গেঁড়োর উপর রাখিয়া দেওয়া উচিত। উক্ত জমী আর ২।১ বার নিড়াইয়া দেওয়া ব্যতীত হলুদ চাষে অধিক পরিশ্রম আবশ্যক হয় না। গাছ শুকাইতে আরম্ভ হইলেই বুঝিতে হইবে যে হলুদ তুলিবার সময় হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে অধিকাংশ গাছ শুকাইতে আরম্ভ হয় কিন্তু জমী এবং দেশ বিশেষে এই সময়ের অগ্র পশ্চাৎও ঘটিয়া থাকে। হলুদ তুলিবার সময় যদি ছোট বড় হলুদগুলি বাছিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে পরিশ্রমের অনেক পরিমাণ লাঘব হইয়া থাকে। এই সময় বীজের হলুদও বাছিয়া ফেলিতে হয়। বীজের জন্য যে সমস্ত হলুদ রাখিতে হইবে তাহাকে পাতা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া স্নিগ্ধ স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। সাধারণতঃ কৃষকেরা নিম্নলিখিত প্রণালীতে হলুদ পরিষ্কার করে। গোবরের জলে অনেকক্ষণ ফুটাইবার পর হলুদগুলি নামাইয়া লইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে উহাদিগকে হস্ত অথবা কোন উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বেশ করিয়া ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়। এইরূপে প্রস্তুতীকৃত হইলে হলুদ বিক্রয়ের যোগ্য হইয়া থাকে। হলুদ চাষে নিম্নলিখিত পরিমাণে লাভ হইতে পারে ঃ—

চাষের খরচ, বীজের মূল্য ইত্যাদি ২২৲-২৫৲ টাকা। বিঘা প্রতি উৎপন্ন ২৫ মণ হলুদের দর ২৲-৫৲ হিসাবে ৫০৲ হইতে ১২৫৲ টাকা।

শতকরা প্রায় ৪০৲।৫০৲ লাভ হইতে পারে।

(৩) আদ্রক (আদা) ঃ—হলুদের ন্যায় আদার চাষ ও বেশ লাভজনক। বিশেষতঃ আদার দাঁড়ার উপর লঙ্কা, বেগুণ, প্রভৃতি গাছ জন্মান যাইতে পারে। তাহাতে আদার গাছের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আদার চাষ অনেকটা হলুদের মত। মাটি আল্‌গা হইলেই আদার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আদার জন্য মাঘ, ফাল্গুন, মাসে ক্ষেত্রে বেশ করিয়া চাষ দিতে হয়। বিঘা প্রতি ১০ মণ হিসাবে গোবর সার ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে ১ হাত অন্তর আদার বীজ অর্থাৎ অঙ্কুর সহিত আদা বসাইতে হয়, বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ ৬ মণ। বীজ পুঁতিয়া তাহার উপর অল্প পরিমাণ মাটি চাপা দিয়া ক্ষেত্রে আইল বাঁধিয়া দিতে হয়। যাহাতে আগাছা প্রভৃতি না জন্মাইতে পারে

তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। আদা ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুইবার নিড়ানী করিলেই চলে। এই ক্ষেত্রে যাহাতে জল না জমিতে পারে তজ্জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করা উচিত। ফাল্গুন মাসে আদা তুলিতে আরম্ভ করা যায়। হলুদের ন্যায় আদাকে পরিষ্কার করিবার কোনও গোল নাই। ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া জলদ্বারা পরিষ্কার করিয়া বিক্রয় করিলেই চলে। তবে তুলিবার সময় যাহাতে আদার চাব না ভাঙ্গে তদ্বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়। একবিঘা ভূমিতে ৩৫।৪০ মণ আদা জন্মিতে পারে, সুতরাং ইহাতে নিম্নলিখিত পরিমাণে লাভ হয়।

এক বিঘা জমি চাষ করিতে খরচ	৩০৲
মণ করা ৪৲ দর হইলে ৪০ মণের দাম	১৬০৲
লাভ	১২৫৲

ইহাতে এই প্রকার লাভ সত্বেও যে কেন ইহার চাষ বহুল পরিমাণে হয় না তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। আদার অনেক গুণ। ইহা অনেক ব্যারামে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে চিনির রসে রাখিলে অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

(৪) কপি ঃ—কপির চাষ পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না। এখনও পল্লিগ্রামে অনেকেই কপির চাষ কিরূপে করিতে হয় তাহা জানে না। কিন্তু কপি একটী লাভ জনক ফসল। তজ্জন্য ইহার চাষের প্রণালী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইল।

কপি, উদ্ভিদ জগতের ক্রুসিফারী (Crucifere) নামক শ্রেণীর অন্তর্গত। সরিষা রাই প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। গরম পড়িলে কপির পাতা ভেদ করিয়া যে দীর্ঘ শিষ উঠিয়া পুষ্প প্রসব করে তাহার সহিত সরিষা, রাই প্রভৃতির শিষের সাদৃশ্য অনেকেই হয়ত দেখিয়াছেন। উদ্ভিদ জগতে মৃত্তিকা এবং বাহ্য অবস্থা ভেদে যে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে কপি তাহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উক্ত কারণে কপির অন্যূন ২০ প্রকার জাতি ভেদ হইয়াছে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ কয়েক প্রকার কপি উৎপন্ন হইয়া থাকে যথা:—বাঁধা কপি, ওল কপি, ফুলকপি এবং কাস্ত্রি কপি। উহাদের উপাদান প্রথা অনেকটা এক প্রকার।

কপির জন্য হালকা অথচ উর্ব্বরা মাটি হইলেই ভাল হয়। ফুলকপির জন্য অধিক সার ও জলের আবশ্যক হয়। বিট, গাজর প্রভৃতির চাষ অপেক্ষা কপির চাষে বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমতঃ যে মাটি শালগমের পক্ষে শক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাতে কপির চাষ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ (যে সময়ে কপি মানুষের পক্ষে অখাদ্য হইয়া উঠে) তখন ইহা গরু, ছাগল প্রভৃতিকেও খাওয়ান যাইতে পারে এবং তাহাদের মল সংগ্রহ করিলে উত্তম সার হয়। তৃতীয়তঃ কপির চারা স্বতন্ত্র জমিতে প্রস্তুত হয় বলিয়া কপির জমী চাষ করিবার ও সার দিবার অনেক সময় পাওয়া যায়। কপি গাছের শিকড় শীঘ্র লাগিয়া যায়। কপি যদি বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করিতে হয় তবে তাহার জন্য বিঘা প্রতি ১৫ মণ খৈল এবং সাধারণ ব্যবহারের জন্য ১০ মণ খৈল ব্যবহার করিতে হয়। কপি গাছের জন্য বিঘা প্রতি এক মণ "সুপার ফসফেট" ব্যবহৃত হইতে পারে। কপি গাছ পাতাময় বলিয়া ইহার জন্য নাইট্রেট অব সোডা (Nitrate of Soda) ব্যবহার করিলেও বেশ উপকার দর্শে। গাছের গোড়ায় অল্প পরিমাণে উক্ত দ্রব্য ছড়াইয়া দিতে হয়।

ভাদ্রমাসের পূর্ব্ব হইতে খৈল পচা সার অথবা গোবরসার মাটির সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া দিতে হয়। সার উত্তম রূপে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। পরে ঐ মাটিতে টব পুরিয়া প্রত্যেক টবে ৵০ আন্দাজ কপির বীজ ফেলিবে। বীজ যেন মৃত্তিকার সহিত নিম্নে না যায়। টব গুলি এমন স্থানে রাখিবে যেন দিবসে মৃদু উত্তাপ পায় অথচ রৌদ্র না লাগে এবং রাত্রে শিশির ভোগ করে। ৩।৪ দিবসের মধ্যে চারা বাহির হইবে। চারা বাহির হইলে চারায় যাহাতে বৃষ্টির জল লাগিতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক বৃষ্টির জল লাগিলে চারা পচিয়া যাইবে।

পূর্ব্ব হইতে কপির জন্য ভাটি প্রস্তুত করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত রূপে সার প্রদান করিয়া ৬।৭ বর্গ ফুট পরিমিত পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে উচ্চ জমী প্রস্তুত করিতে হয়। টবস্থিত কপির চারায় দুই জোড়া পাতা বাহির হইলে ঐ গুলিকে উঠাইয়া উক্ত ভাটিতে বসাইতে হয়। টবের ন্যায় ভাটিকেও রৌদ্র এবং বৃষ্টিতে হইতে রক্ষা করা উচিত।

তার পর কপির জন্য ক্ষেত প্রস্তুত করা দরকার। শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগ হইতে কোদালী দ্বারা

মাটি খুঁড়িয়া ফেলিতে হয় উক্ত সময় ক্ষেত্রস্থিত আগাছা সমূহ নষ্ট করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রে দেড় হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া উক্ত গর্ত্তে খৈল পচাইতে হয়। এইরূপে প্রত্যেক গর্ত্তে এক পোয়া আন্দাজ খৈল ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়। ঐ খৈল সম্পূর্ণরূপ পচিয়া গেলে মাটির সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া দিতে হয়।

কপির ভাটির সম্বন্ধে আরও কিছু জানা আবশ্যক। কপির চারাগুলিতে প্রায়ই জল সিঞ্চন করিতে হয়। কিন্তু ভাটিতে যাহাতে জল বন্ধ না হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত ভাটির মাটি মধ্যে মধ্যে উস্কাইয়া দিতে হয়। এই রূপে আশ্বিন মাসের শেষে চারা গুলি বেশ পরিপুষ্ট হইবে। সেই সময়ে ঐ গুলিকে উঠাইয়া ক্ষেত্রে বসাইয়া দিবে। চারা বসাইবার সময় যাহাতে গাছের প্রকৃত মূল মুড়িয়া না যায় এবং যাহাতে সম্পূর্ণ সরল ভাবে থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা গাছ বাড়িবে না। এক বিঘা জমীতে প্রায় ৬৪৫৩ চারা আবশ্যক হয়। চারা বসাইয়া তিন চারি দিন পর্য্যন্ত সকালে ও বৈকালে জল সেচন করা আবশ্যক। পরে জল বন্ধ করিলে চারাগুলি ধরিয়া যাইবে। এই সময় নিড়ানির দ্বারা মাটি খুসিয়া দিয়া এবং দাঁড় বাঁধিয়া জল সেচন করিতে হয়। যাহাতে জল বন্ধ না হয় এরূপ ভাল বন্দোবস্ত করা উচিত। তৎপর যাহাতে কপিক্ষেত্রে কোনও রূপ আগাছা না জন্মে তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। এইরূপে কপি গাছ গুলি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে এবং অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে বিক্রয়োপযোগী হইবে।

এক বিঘায় কপি চাষে সর্ব্বশুদ্ধ খরচ	৩০৲
কপি বিক্রয় করিয়া মূল্য পাওয়া যাইতে পারে	১২৫৲
লাভ	৯৫৲

কপির গাছে যে সমস্ত পোকা লাগে তাহার নিবারণ প্রণালী তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

(৫) ছালাদ (Lettuce) :— ছালাদ্ দেখিতে অনেকটা কপির মত। ছালাদ্ সাধারনতঃ দুই প্রকার (১) ক্যাবেজ্ (Cabbage) (২) কস্ (Cos)। ছালাদের জন্য উত্তম সার পূর্ণ জমী আবশ্যক এবং তাহা বিশেষ রূপে কর্ষিত হওয়াও চাই। আমাদের দেশে কস্ অপেক্ষা ক্যাবেজই ভাল রকম হয়। ছালাদের জন্য বিঘা প্রতি ১৫ মণ সরিষার খৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে। উত্তম সারপূর্ণ জমীতে ভাটি করিয়া তাহাতে কপি বীজের ন্যায় কাঠা প্রতি ১ ভরি হিসাবে বীজ ফেলিতে হয়। ঐই সমস্ত বীজ হইতে চারা বাহির হইলে তাহাতে পিঁপড়ে লাগিবার সম্ভাবনা সুতরাং তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য আশ্বিন মাসে ইহার বীজ বুনিবার উত্তম সময়। কপি ক্ষেত্রের ন্যায় ছালাদের ক্ষেত্রও প্রস্তুত করা যায়। দুই জোড়া পাতা বাহির হইলেই উহাদিগকে খাঁদায় রোপণ করিতে হয়। কলিকাতা অঞ্চলে কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে কস্ বপন করা উচিত নহে। জমীতে ১ ফুট অন্তর ছালাদ বসাইতে হয় এবং যে সময় বাঁধিবার উপযুক্ত হইবে তখন বিচালীর দ্বারা গাছ জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। ৪।৫ দিনের মধ্যেই ছালাদ বাঁধা কপির মত হইয়া উঠে। সেই সময় উহাদিগকে উঠাইয়া লইতে হয়। ছালাদের ক্ষেত্রে ও বেশ করিয়া জল সিঞ্চন করিতে হয় কিন্তু জল বদ্ধ হইলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ছালাদ চাষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে ঠিক তালিকা দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ জমী এবং জল বায়ু ভেদে অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

(৬) ওলকপি :— ইহারও চাষ বাঁধা কপির ন্যায়। ১০।১২ ইঞ্চি অন্তরে ইহাকে এক বারে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। নাড়িয়া বসাইলে ইহার গাছ ভাল হয় না।

(৭) আর্টিচোক্ (হাতিচেক্) :— ইহারও চাষ ঠিক কপির মত। প্রত্যেক গাছের মধ্যে ১৮ ইঞ্চি ব্যবধান রাখিবে।

(৮) ফুলকপি, ব্রোকোলি (Broccoli) এবং ব্রুসেলস্ স্প্রাউট (Brussels Spout) :— ইহাদের চাষ কপির মত। এই সমস্ত ফসল উত্তমরূপ প্রস্তুত করিতে হইলে মাটি সুচারুরূপে কর্ষিত হওয়া চাই এবং সারেরও প্রাচুর্য্য আবশ্যক। ইহাদিগকে বপন করিবার উপযুক্ত সময় আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাস। ফুলকপি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেই ভাল হয়।

শ্রীহরিদাস মিত্র
কাশিপুর কৃষিশালা।

মৌমাছি-রক্ষা।

ষষ্ঠ সংখ্যক কমলায় মোমের ব্যবসা ও মোম পরিষ্কার করিবার প্রণালী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মোম বিশেষতঃ বাঙ্গালার মোম ইংলণ্ডে যেরূপ আদরে গৃহীত হইয়া থাকে তাহাতে উত্তরোত্তর এই ব্যবসায়ের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা। কিন্তু বিগত ২৫ বৎসরের রপ্তানির হিসাবে দেখা যায় যে ইহার অবস্থা সমভাবেই রহিয়াছে। এদেশ হইতে বৎসরে প্রায় চারি লক্ষ টাকার মোম বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বাঙ্গালা হইতে আড়াই লক্ষ টাকার অধিক চালান হয়। ১৯০২-০৩ সালের পরমিটের হিসাবে প্রকাশ যে এই বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে ৪৪৮১ হন্দর মোম বিদেশে রপ্তানি হয়, ইহার মূল্য ৩,৮৪,৭৫৩ টাকা। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে ৩০২০ হন্দর রপ্তানি হয়, আর বোম্বাই হইতে ৭৬২ হন্দর, মাদ্রাজ হইতে ৪২৭ হন্দর, ব্রহ্মদেশ হইতে ২৩০ হন্দর, এবং সিন্ধুপ্রদেশ হইতে ৪২ হন্দর রপ্তানি হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে বাঙ্গালাতেই অধিক পরিমাণে মোম উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখেরবিষয় এব্যবসায় প্রধানতঃ অশিক্ষিত লোকদিগের দ্বারা পরিচালিত বলিয়াই ইহার কোনরূপ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। জঙ্গলী লোকেরা অরণ্য হইতে যে পরিমাণ মৌচাক সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহা গালাইয়া যে মোম উৎপন্ন হয় তাহাতেই এই ব্যবসায় চলে। কিন্তু যাহাতে মৌ-চাকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় সে পক্ষে কোন ব্যবসায়ী কোনরূপ চেষ্টা করেন না এবং এইরূপ চেষ্টা করিলে যে তাহা সম্ভব ইহাও কাহার ধারণা নাই। এই কারণেই এই ব্যবসা এ প্রকার সমভাবে রহিয়াছে। য়ুরোপ ও মার্কিনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই ব্যবসায় পরিচালিত হয় বলিয়া তথায় ইহার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ইংলণ্ডে এদেশের মোমের যে আদর তাহার কারণ এখানকার প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে উহা ভালরূপ রিফাইন হয়। এইজন্য যে সময়ে য়ুরোপে বড় একটা রৌদ্র হয় না সেই সময়ে তথায় এদেশের মোম অধিক পরিমাণে চালান হইয়া থাকে। কিন্তু জাপান ও মার্কিনের মোম আরও ভাল হয় বলিয়া তাহা এখানকার মোম অপেক্ষাও অধিক দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

অতএব যেরূপে য়ুরোপে ও মার্কিনে মোম প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা শিক্ষা করা আমাদিগের বিশেষ আবশ্যক। প্রথমতঃ যাহাতে মৌ-চাকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় সেদিকে মনোযোগ প্রদান করা বিশেষ আবশ্যক। য়ুরোপের মধ্যে রুষদেশে মোমের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। রুষের কৃষিজীবিরা চিনির পরিবর্ত্তে মধু ব্যবহার করিয়া থাকে এবং উহাদিগের দিন ধর্ম্ম মন্দিরে রাত্রে মোমবাতি জ্বালান হয় বলিয়া তথাকার লোক মৌচাক সংগ্রহে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে। রুষের যে সকল প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প জন্মায় তথায় মৌমাছিদিগের চাক বাঁধিবার সুবিধার জন্য কৃত্রিম চাক তৈয়ার করিয়া বৃক্ষাদিতে ঝুলাইয়া রাখা হয়। মৌমাছি সকল মধু সংগ্রহ করিয়া সেই কৃত্রিম চাকে আশ্রয় লইয়া থাকে। যখন এই সকল চাক হইতে মোম পাইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করে, তখন কৃত্রিম চাকের অধিকারীরা আস্তে আস্তে উহা ভাঙ্গিয়া লয় এবং যাহাতে মৌমাছিরা একেবারে তথা হইতে উড়িয়া পলায়ন না করে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে। এ বিষয় জর্ম্মানীতে অধিকতর সুব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে লোকে মৌমাছি রক্ষা করিয়া মোম সংগ্রহ করিতে শিক্ষালাভ করে রাজসরকার হইতে সে বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করা হইয়া থাকে। যাঁহারা মৌমাছি রক্ষা করিতে বিশেষ পটু তাঁহাদিগকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া গ্রামে গ্রামে পাঠান হয়। তাঁহারা গ্রামবাসীদিগকে চাক নির্ম্মাণের কৌশল বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। এই সকল শিক্ষককে রীতিমত পরীক্ষা করিয়া সরকার হইতে প্রশংসাপত্র প্রদান করা হইয়া থাকে। যে সকল গ্রামবাসী চাক রক্ষায় বিশেষ পটুতা প্রদর্শন করেন তাঁহারাও রাজভাণ্ডার হইতে পুরস্কার লাভ করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে অনেক গ্রামে সভা আছে। সেই সকল সভায় মৌমাছিদিগের স্বভাব, তাহাদিগের চাকের ব্যবস্থা, মধুসংগ্রহ প্রণালী ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে এবং তাহাতে লোকে মৌমাছির চাক রক্ষা করিতে শিক্ষালাভ

করে। ইহাতে সে দেশে মৌচাকের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে এবং সে জন্য মোমের ব্যবসায়েরও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

মার্কিন যুক্ত রাজ্যে মৌমাছি রক্ষা করা একটা বিশেষ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এজন্য তথায় নানাপ্রকার নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষেও যে এইরূপ মৌমাছি রক্ষা করিয়া মোমের ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে ফুল উৎপন্ন হয়। এই সকল ফুল হইতে যে মধু উৎপন্ন হয় তাহা যার পর নাই স্বাদু ও সুমিষ্ট। পার্ব্বত্য প্রদেশের অরণ্য জাত মধু বা শ্রীহট্টের কমলা ফুলের মধুর যাঁহারা আস্বাদন লইয়াছেন, তাঁহারা একথার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। এখানকার মধুর এই মিষ্টতার জন্য পুর্ব্বকালে পর্ত্তুগীজ ও ওলান্দাজেরা এদেশ হইতে মধু লইয়া যাইতেন এবং এখানকার মোমের মূল্য সুলভ বলিয়া তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহারা ক্রয় করিতেন। অতএব এই পুষ্পপ্রধান-দেশে যে অনায়াসে মৌচাক রক্ষার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কীট তত্ত্ববিদেরা বলেন এদেশের মৌমাছি সকল তিন প্রণালীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে পাহাড়ে মৌমাছি, যাহাকে তাঁহারা Apis dorsata বলেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা সচরাচর খোলা জায়গাতেই চাক বাঁধিয়া থাকে। পাহাড়ের গুহায় অথবা তলদেশে এবং বৃক্ষাদির নিম্নদেশে ইহাদিগের চাক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের প্রস্তুত এক এক খানি চাক এত ভারি যে অনেক সময়ে একজন লোক তাহা বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না। ইহাদিগের এক এক খানি চাকে ৫ সের হইতে ১০ সের মধু ও এক সের হইতে দেড় সের মোম প্রস্তুত হয়।

আর এক শ্রেণীর মৌমাছি আছে তাহাদিগকে গেছো মৌমাছি বলে। ইহাদিগের বৈজ্ঞানিক নাম Apis Indica। এই গেছো মৌমাছিদিগের আবার দুইটি পৃথক পৃথক দল আছে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের চাক তৈয়ার করিয়া থাকে। শীতকালে ইহারা গাছের কোটরে বা শুষ্ক গাছের ফাটালে চাক বাঁধে। এই চাকগুলির অনেক সময়ে স্তরে স্তরে বাঁধা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি এক এক খানি চাকে উপর্য্যুপরি সাতটি পর্য্যন্ত স্তর দেখা গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহারা গাছের শাখাতেই চাক বাঁধিয়া থাকে। এই সকল চাক প্রায় মানুষের হাতের সমান দেখা যায়, কখন কখনও বা তদপেক্ষা বড়ও দেখা গিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর মৌমাছিকে কুসুমী ও কুসুমে মাছি বলে। বৈজ্ঞানিকেরা উহাকে Apis flarea বলেন। ইহাদিগের আকার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং ইহারা যে চাক বাঁধে তাহাও ক্ষুদ্র। ইহারা বাঁশ গাছ, বেণা ঝোড় অথবা বাকস ফুলের গাছের মত ঝোপে অণ্ডাকৃতি চাক সকল বাঁধিয়া থাকে। এই জাতীয় মৌমাছি দিগের হুল নাই বলিয়া অনেকে অনুমান করেন ইহাদিগের চাক ভাঙ্গিতে বড় একটা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মৌমাছিকে সহজেই কৃত্রিম চাকে চাক বাঁধিতে আকৃষ্ট করা যাইতে পারে। বসন্ত কালে ব্রহ্ম দেশের লোক তাহাদিগের একটি পর্ব্বোপলক্ষে তথায় মৌমাছিদিগের চাক বাঁধিবার জন্য বাঁশের কৃত্রিম চাক প্রস্তুত করিয়া দেয়। এই সকল চাকে অনেক মৌমাছি আশ্রয় লইয়া থাকে এবং তাহারা তথায় মধু সঞ্চয় ও মোম উৎপন্ন করে। এতদ্দারা ব্রহ্ম বাসিদিগের জীবিকা অর্জ্জনের বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। ব্রহ্ম দেশের অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠ নির্ম্মিত বলিয়া তথায় অনেক বাড়ীতেই মৌচাক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের বোধ হয় আমাদের দেশের যে সকল মাঠে ফুল ফুটে তাহার নিকটে যদি কাঠের চাক তৈয়ার করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মৌমাছিরা গাছ বা ঝোপে চাক না বাঁধিয়া কৃত্রিম চাকেই মধু সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং তদ্দারা মধু ও মোম সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই মোমের ব্যবসায়ের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। "কমলাতে" মোমের ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরে সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে এ বিষয়ে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। একটু চেষ্টা করিলে এদেশের মোমের কারবারের যে সবিশেষ উন্নতি হইতে পারে ইহা আমরা বিলক্ষণ রূপে অবগত আছি। যাঁহা-

দিগের মোমের কারখানা আছে তাঁহারা যদি রিফাইন করা সম্বন্ধে একটু সতর্কতা অবলম্বন করেন তাহা হইলে বাঙ্গালার মোম উক্ত মূল্যে বিলাতের বাজারে বিক্রয় করিতে পারেন। অতএব এদেশের সাধারণ লোক দিগকে কৃত্রিম চাক বাঁধিতে শিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেন্টের বিশেষ কর্ত্তব্য। যাহাতে গ্রাম বাসীরা যত্ন করিয়া মৌচাক সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয় সে বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দান করা আবশ্যক তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এখানকার অপেক্ষা আরও অধিক মোম উৎপন্ন হইবে ও তদ্বারা লোকের জীবিকার একটি পথ প্রশস্ত হইবে।

বাণিজ্য-বিদ্যা শিক্ষা।

আমাদের দেশের যুবকেরা সচরাচর তিনটি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাকেন। ডাক্তারী, ওকালতী ও ইঞ্জিনিয়ারী এই তিনটি ব্যবসায়ের দিকে বাল্যকাল হইতে ছাত্রদিগের লক্ষ্য থাকে। যাঁহারা এই তিনটির কোনটিতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তাঁহাদিগের চাকরী ব্যতীত আর কোন ভরসা নাই। বাঙ্গালা দেশে উচ্চ অঙ্গের কোন প্রকার ব্যবসা না থাকাতে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষিত তাঁহারা ব্যবসাকে ঘৃণার চক্ষেই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। এমন কি যাঁহাদের কোনরূপ জাতিগত ব্যবসা আছে তাঁহাদিগের শিক্ষিত সন্তানেরাও স্বজাতীয় বা স্ববংশের পরিচালিত কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে সম্মত নহেন। সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক প্রভৃতি জাতি বংশ-পরম্পরা ক্রমে ব্যবসায়ী। ইহাঁদিগের অনেকেরই অতুল ধন সম্পত্তির মূল ব্যবসা। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত সুবর্ণ বণিক তাহা উপেক্ষা করিয়া রাজপদ তদভাবে ইংরাজ সওদাগরের অধীনে চাকরী লাভের জন্য লালায়িত। বাঙ্গালী যে চিরদিন ব্যবসায়ে এরূপ বীতস্পৃহ ছিলেন তাহা নহে। যে দেশের সওদাগরেরা অজয় নদীর কূল হইতে ডিঙ্গা বাহিয়া সিংহলে যাইতেন, যে দেশে সওদাগরগণ চিরদিন রাজার অমাত্যগণ মধ্যে পরিগণিত সে দেশের লোক ব্যবসায়ানুরাগী ছিল না ইহা কখন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমাদিগের বোধ হয় বৈদেশিক শাসনের নানা প্রকার অসুবিধার জন্যই লোকে ধন সঞ্চয়ের এই শ্রেষ্ঠ উপায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং ইংরেজ শাসনের প্রথমাবস্থায় চাকুরীতে বিনা আয়াসে অধিক অর্থোপার্জ্জন হয় দেখিয়া লোকে ইহাতেই বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। তাই আজ চাকুরীতে আবার লোকের বিরাগ উপস্থিত হইয়াছে, স্বাধীন ব্যবসায়াবলম্বনের দিকে বাঙ্গালী যুবকের মতি ফিরিয়াছে।

এ হেন সময়ে গবর্ণমেন্ট আমাদিগের যুবক বৃন্দের সেই বাসনা চরিতার্থ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া দেশের লোক যার পর নাই আনন্দিত

হইয়াছেন। তাই আজ দলে দলে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের বাণিজ্য-শিক্ষা শ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছে, দেশে একটা পরিবর্ত্তনের মহা যুগ আসিতেছে বলিয়া অনেকে আশান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ আশা করিবার পূর্ব্বে এই নূতন শিক্ষার ব্যবস্থায় যুবকদিগের স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বনের কি পরিমাণ সুবিধা হইবে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। এই প্রবন্ধে আমাদিগের সাধ্যমত সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

একমাত্র ভূমির উপসত্বের উপর যে দেশের লোক নির্ভর করে, দারিদ্র্য যে তাহাদিগের চিরসহচর, ইহা সতঃসিদ্ধ সত্য। কেবল ভূমির উপসত্ব কেন, কেবল একটি বিশেষ ব্যবসায়ে দেশশুদ্ধ লোক নিযুক্ত থাকিলে কখনই তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। পৃথিবীর যে সকল দেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, সেই সকল দেশ স্বার্থে ও সম্পদে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের সম্পদের দিনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সে সময়ে ভারতবাসী নানাবিধ শিল্প বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল বলিয়াই লোকের ঘর ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু কোন দেশই রাজ সাহায্য ব্যতিরেকে এই সকল উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। প্রধানতঃ রাজ-পরিবার ও রাজ-সরকারের প্রয়োজন পরিপূরণের জন্যই দেশীয় শিল্পাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। যে দেশের রাজা বিদেশ জাত সামগ্রী দ্বারা আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ করেন, সে দেশে দেশীয় শিল্প, সুতরাং বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে না। এই জন্যই দেশীয় রাজার শাসনে ভারতে শিল্প বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মুসলমান সম্রাটেরা ইরান তুরান পরিত্যাগ করিয়া ভারতে স্থায়ীরূপে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের শাসন কালেও ভারতের শিল্প বাণিজ্যের তাদৃশ ক্ষতি হয় নাই। তখন ভারতে রেল ছিল না স্থানান্তরে যাতায়াতের ও দ্রব্য সম্ভার প্রেরণের এখনকার মত সুবিধা ছিল না; ভারতের কৃষকেরা তখনও বৃষ্টির জন্য দেবতার উপর নির্ভর করিত সুতরাং এখনকার মত তখনও হাজা শুকায় শস্য হানি হইত; কিন্তু কদাপি দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইত না। তিন বৎসর অন্তর অন্নাভাবে লোকে অকালে জীবলীলা সম্বরণ করিত না, আর দেশের বারআনা লোক প্রতিদিন অর্দ্ধাশনে জীবনযাপন করিত না।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ হইতেই যে এ দেশের লোক বিশেষরূপে অন্ন-কষ্ট ভোগ করিতেছে এ কথা কোন রূপেই অস্বীকার করা যায় না। ইহার কারণ রাজ-সরকারের প্রয়োজন পূরণের জন্য ইংরেজ এ দেশের উপর নির্ভর করেন না। যতদূর সম্ভব তাঁহাদিগের প্রয়োজন তাঁহারা আপনাদিগের স্বদেশজাত সামগ্রী দ্বারা মিটাইয়া থাকেন। যতদিন বিলাত হইতে প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার কিছু কিছু অসুবিধা ছিল, ততদিনও এ দেশের অনেক ব্যবসা কতক পরিমাণে মাথা তুলিয়া ছিল, কিন্তু সুয়েজ খাল খননাবধি ইংলণ্ডের সহিত ভারতের দূরত্ব হ্রাস হওয়াতে ভারতের খাঁটি শিল্পাদি একেবারে নষ্ট হইল। ইংরেজ এ দেশে ব্যবসা করিতে আসিয়া রাজা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াছিলেন রাজা হইয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অতএব তাঁহাদিগের শাসনাধীনে যে বিলাতী ব্যবসায়েরই বিস্তার হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাঁহাদিগের সাহায্যের অভাবে ভারতের ব্যবসা সমূহ ক্রমশঃই লোপ পাইল, তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুলে আশ্রয় লইল, সকলেই এক মাত্র মাতা বসুন্ধরার বক্ষ হইতে অন্ন দোহন করিতে বাধ্য হইল, কাজেই এক মুষ্টি শত জনে বণ্টন করিয়া অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হইতেছে।

শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে যেরূপ দেখা গেল, রাজপদ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। সকল দেশেই, মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত লোকে প্রধানতঃ রাজসেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইংরেজ রাজ্যে তাহারও ব্যতিক্রম। এ দেশের উচ্চ রাজপদ সমূহ একমাত্র ইংরেজের অধিকৃত। সে পদ ভারতবাসীর লাভ করিবার কোনরূপ আশা নাই। ইহাতে দেশের বহুসংখ্যক লোকের অন্নার্জ্জনের একটি পথ সঙ্কীর্ণ হইয়াছে আর যে সকল ইংরেজ এ দেশে আসিয়া ব্যবসা করেন, তাঁহারা ত এদেশ বাসিদিগকে উচ্চপদ একেবারেই প্রদান করেন না। ইংরেজ সওদাগরেরা আপনাদের স্বদেশবাসী দিগকেই তাঁহাদিগের কারবারের উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই সকল নানা কারণে এ

দেশীয় লোকের অন্নার্জ্জন ও স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। অধুনা ইংরেজ রাজ তাহা কতক পরিমাণে বুঝিয়াছেন। সেই জন্যই আজ কাল মধ্যে মধ্যে শিল্প শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা প্রভৃতির আন্দোলন শুনিতে পাওয়া যায়। এতাবৎ কাল এ দেশের বিদ্যালয় সমূহে সাহিত্য প্রধান শিক্ষা প্রদত্ত হইত। ইহাতে শিক্ষিত লোকের ব্যবসায়ে বড়ই প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিদ্যালয় সমূহে ব্যবসা-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা প্রদানে যাঁহারা সমর্থ নহেন তাঁহারা অনর্থক সে জন্য চেষ্টা করিতে সময় নষ্ট না করিয়া ব্যবসায় শিক্ষা করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন, এই অভিপ্রায়ে রাজপুরুষেরা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অভিপ্রায় যে অতি মহৎ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল সভ্যদেশেই দেশের শ্রেণী বিশেষের যুবকদিগের জন্য এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ বিষয় অন্যান্য দেশাপেক্ষা ইংলণ্ডকে পশ্চাৎপদ দেখিতে পাওয়া যায়। জর্ম্মানী বা আমেরিকায় ব্যবসা শিক্ষার যেরূপ সুব্যবস্থা আছে, ব্যবসায়ী ইংরেজের স্বদেশে তেমন সুব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। জর্ম্মানীতে প্রায় দুই শত বৎসরের অধিককাল হইতে বিদ্যালয় সমূহে ব্যবসায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি ষ্টাট্‌গর্টের বৃটিস কন্সাল এ বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে দেখা গেল যে ১৮৯২ সালে সমস্ত জর্ম্মাণ রাজ্যে ১৭৫টি বাণিজ্য বিদ্যালয় বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে উহার সংখ্যা ৪২৯টি হইয়াছে। এগুলি সমস্তই সরকারী বিদ্যালয়, ইহা ব্যতীত অনেক বে-সরকারী বাণিজ্য বিদ্যালয় আছে। ১৮৯২ সালে এ সকল সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা ১২ হাজার ছিল এক্ষণে তাহা ৪৮ হাজারে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে জর্ম্মানীর শিল্প বাণিজ্যের যে এত উন্নতি পরিদৃষ্ট হয় এই সকল বাণিজ্য বিদ্যালয়ই তাহার নিদান। গত ২০ বৎসরে জর্ম্মানীর বাণিজ্যের এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে, বাণিজ্যের পরমমিত্র ইংরেজ জাতিকে অবধি রক্ষানীতি অবলম্বনে উদ্যোগী হইতে হইয়াছে। যাহাতে জর্ম্মানেরা নানাদেশে আপনাদের বাণিজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, সেজন্য ঐ সকল বাণিজ্য বিদ্যালয়ে নানা দেশের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বাণিজ্য সম্বন্ধে সকল তত্ত্বই এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং ইহার ফল যাহা ফলিয়াছে আমরা তাহা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদিগের রাজপুরুষেরা এদেশবাসীদিগকে যে বাণিজ্য বিদ্যা শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে উল্লিখিতরূপ ফললাভের আশা আছে কি না? আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই এই শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ, ইংরেজ বণিকদিগের মুখাপেক্ষী। কি প্রণালীতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে তাহার জন্য তাঁহারা এই বণিকদিগের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। যাঁহারা এদেশের লোককে নিম্নতন পদ ভিন্ন অন্য কোন পদ দেন না, তাঁহারা এ বিষয়ে যেরূপ পরামর্শ দিবেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সরকার, ছাত্রদিগের বাণিজ্য বিদ্যার পারদর্শিতা স্থির করিবার জন্য বিলাতের বণিকসভার পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইংরেজ সওদাগরেরা তাহাতে একেবারেই অসম্মত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, যে সকল যুবক তাঁহাদিগের গদীতে শিক্ষানবিশী করে তাহাদিগের দ্বারা তাঁহাদিগের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় সুতরাং—ঐরূপ উচ্চ পরীক্ষার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, কর্ত্তৃপক্ষ বাণিজ্য শিক্ষা দিবার, যে ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা কেবলমাত্র কতকগুলি যুবককে সওদাগরী আপিসের কেরাণীগিরীর উপযুক্ত করিবার জন্য। ইহাই যদি এই শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য হয় তাহাতে দেশের বিশেষ কি উপকার হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বাস্তবিক সওদাগরেরা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা নহে। তাঁহাদিগের কার্য্যাদি পরিচালনের জন্য যেরূপ বিদ্যার আবশ্যক তাহা তাঁহাদিগের কার্য্যালয়ে শিক্ষানবীশ থাকিলেই লোকে শিখিতে পারে, সে জন্য অধিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। মানিয়া লইলাম যাহারা কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা করিবে তাহারা সাধারণ শিক্ষানবীশগণ অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত হইবে, কিন্তু তাহাতে লাভের প্রত্যাশা কি আছে? সওদাগরেরা কি সেই

সকল লোককে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় উচ্চ বেতন দিবেন? আর কলিকাতায় কয়জন সওদাগর আছেন যাঁহারা তাঁহাদিগের এদেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্তরূপ উচ্চ বেতন দিতে পারেন? সওদাগরেরা তাঁহাদিগের কল কারখানাতে যখন এদেশীয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ইঞ্জিনিয়ারদিগকে নিযুক্ত করেন না, তখন যে সকল পদে তাঁহাদিগের বাণিজ্যনীতি অবগত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাতে যে এদেশীয়গণকে নিযুক্ত করিবেন তাহা অসম্ভব। সরকারী কার্য্যালয় অপেক্ষা সওদাগরী কার্য্যালয়ে বর্ণ বৈষম্য বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল কারণেই আমরা মনে করি যে, কর্ত্তৃপক্ষ যে বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে প্রত্যক্ষরূপে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আমরা দেখিতে পাই না। আমাদিগের যুবকদিগকে বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষাদান যে, একান্ত আবশ্যক তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদিগের অধীতবিদ্যা যাহাতে তাহারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে তাহারও সুব্যবস্থা করিতে হইবে। গবর্মেণ্টকে এদেশীয় বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কি তাঁহারা করিতে পারিবেন? যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থের জন্য এদেশজাত বস্ত্রের উপর তাঁহারা অন্যায়রূপে মাশুল গ্রহণ করিতেছেন তখন আর তাঁহাদিগের নিকটে আশা কোথায়? তাঁহারা যদি এ সম্বন্ধে আর কিছু না করেন কেবল পূর্ব্বতন শাসকদিগের আদেশমাত্র অনুসরণ করেন তাহা হইলেও এদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে। লর্ড রীপণ বলিয়াছিলেন যে, সরকারী ব্যবহারের জন্য এদেশের উৎপন্ন সামগ্রী পাওয়া গেলে আর বিদেশী জিনিস লওয়া হইবে না। এই আদেশ মত যদি কার্য্য হয় তাহা হইলেও দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে—কিন্তু আদেশ পালন না করিয়া তাঁহার নানা কৌশলে তাহা ভঙ্গ করিয়া উহার সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন! তখন আর যুবকদিগকে বাণিজ্য-বিদ্যা শিখাইয়া কি হইবে?

এ বিষয়ে গবর্ণণ্টের ন্যায় দেশের ধনীদিগেরও কর্ত্তব্য আছে। পাশ্চাত্য দেশের ধনীগণ দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তাঁহাদিগের ধন নিয়োগ করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইয়া থাকেন। স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়াও দেশের হিতসাধন করা যায়। আমরা আমাদিগের ধনীদিগকে নিঃস্বার্থ হইয়া তাঁহাদিগের ধনের ব্যবহার করিতে বলি না, তাঁহারা যদি কেবল ধনবৃদ্ধির জন্য দেশের উন্নতিকল্পে শিল্পাদি কার্য্যে ধন নিয়োগ করেন তাহা হইলেও তাঁহারাও উপকৃত হন ও দেশের লোকের উপকার করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহারা নিজে জমীদার তাঁহাদিগের নিজের ইষ্টের জন্য শিল্পাদির উন্নতিতে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। তাঁহাদিগের সকল প্রজাই যদি ভূমির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে ব্যক্তিগত লভ্যাংশ হ্রাস হইবে সুতরাং তাঁহাদিগেরও আয় হ্রাস হইবে। কিন্তু প্রজারা যদি ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করে তাহা হইলে ভূমির উপসত্ব বৃদ্ধি হইবে এবং তাহাতে তাঁহারাও অধিকতর লাভবান হইবেন। দেশের ধনীগণ এই সকল বিষয় বিচার করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে এবং রাজা দেশীয় ব্যবসায়ের পৃষ্ঠপোষকতা না করিলে কেবল পুঁথিগত বাণিজ্য বিদ্যায় দেশের দারিদ্র্য ঘুচবে না।

গুটি পোকা।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে রেশম তসর ও গরদের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। যে পট্ট বা কৌষেয় বস্ত্রের কথা আমরা পুরাতন পুস্তকাদিতে পাঠ করিয়া থাকি তাহা উপরোক্ত তিন প্রকার বস্ত্রের অন্যতম নাম মাত্র। গুটী বয়িত অণ্ডাকার কোষ হইতে যে সূত্রী প্রাপ্ত হওয়ায় যায় তাহাকেই কৌষিক বা কৌষের সূত্র বলে। গুটী পোকা নানা জাতীয় এবং সেই জন্য কৌষেয় সূত্রও নানা প্রকার। কোন কোন কৌষেয় সূত্র স্থূল ও পাংশুবর্ণ, কতকগুলি সূক্ষ্ম ও হরিদ্রাভ; কিন্তু সর্ব্বোত্তম কৌষেয় সূত্র সূক্ষ্ম, কোমল ও শ্বেতবর্ণ।

অনেকে অনুমান করেন যে পূর্ব্বে ভারতবর্ষে গুটী পোকা ছিল না; ইহা চীনদেশ হইতে এখানে আনীত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন বিশেষ কারণ নাই। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, চীনবাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে গুটীর চাষ এবং গুটী তন্তু হইতে বস্ত্র বয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

প্রাচীন চীন গ্রন্থকার হাওয়াইনান্তজী (How-ainantze) স্বরচিত গ্রন্থে রেশম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে চীনের হোওয়ান্তী (Howanti) নামক সম্রাটের পাটরাণী সিলিংশী (Se-ling-She) স্বদেশে সর্ব্বপ্রথমে গুটীর চাষ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সিলিংশী অতি বুদ্ধিমতী ও উদ্যোগশীলা রমণীছিলেন কারুকার্য্যে তাঁহার অতিশয় আগ্রহ ও যত্ন ছিল। তিনি স্বহস্তে গুটী কীট প্রতিপালন করিতেন এবং গুটী কোষ হইতে স্বয়ং সূত্র নিষ্কাশন করিয়া বস্ত্র বয়ন আরম্ভ করেন। রেশম-বস্ত্র নির্ম্মাণোপযোগী তৎকালিক যাবতীয় যন্ত্রই তাঁহার দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের মতে এই সিলিংশী মহারাণী খৃষ্টীয় শতাব্দীর সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসরের অনেক পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

কখন কি প্রকারে ভারতবর্ষে গুটীর চাষ আরম্ভ হইয়াছে ইহার প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় না। তথাপি ইহা নিঃসন্দেহ, যে খৃষ্টীয় শকারম্ভের অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে গুটীজাত কৌষেয় বস্ত্র এদেশে ব্যবহৃত হইত।

ইউরোপ মহাদেশে যে চীনদেশ হইতে গুটী আনীত হইয়াছিল ইহার বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সময়ে জষ্টীমিয়ান (Justinian) রোম রাজ্যের মহারাজা ছিলেন, সেই সময়ে (খৃষ্টীয় ৫৫২ সালে) দুই জন পারস্য দেশীয় খৃষ্টান সন্ন্যাসী, চীন হইতে গুটীর অণ্ড আনিয়া কনষ্টাণ্টীনোপল নগরে গুটী চাষ আরম্ভ করেন। ইহাঁরা চীন দেশে প্রবাস কালে গুটীর প্রতিপালন, কোষ হইতে সূত্র নিষ্কাশন ও কৌষেয় বস্ত্র বয়ন প্রক্রিয়াদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে চীন রাজ্যে এইরূপ রাজাজ্ঞা ছিল যে, কোন ব্যক্তি উক্ত রাজ্যের বাহিরে গুটী পোকা লইয়া গেলে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীদ্বয় এই রাজাজ্ঞা প্রযুক্ত প্রকাশ্য ভাবে গুটী পোকা লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ফিরিবার সময়ে নিজ ২ শূন্যগর্ভ বংশ নির্ম্মিত যষ্টির ভিতরে গুটীর ডিম্ব লুকাইয়া রাখিয়া তাহা স্বদেশে আনিয়াছিলেন।

চীনদেশে তুঁত গাছে গুটি জন্মিয়া থাকে। শ্বেত ও কৃষ্ণ ফল ভেদে তুঁত গাছ দুই প্রকার। শ্বেত তুঁত বৃক্ষের রস গুটী পোকার সুখাদ্য ও পরিপোষক। চীন বাসীরা এই বৃক্ষেই গুটী প্রতিপালন করে। শ্বেত তুঁত গাছের উৎপন্ন গুটী কোষের সূত্র যে রূপ সূক্ষ্ম, শুভ্র, চিক্কণ ও দৃঢ় হইয়া থাকে অন্য গাছের কোষে সে রূপ সূত্র পাওয়া যায় না। হিমালয়, আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার ও ছোট নাগপুরে কয়েক জাতীয় তসর কীট পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বিহার ও আসামের তসর খুব প্রসিদ্ধ। আসাম অঞ্চলে এরণ্ড বৃক্ষে যে তসর প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই এণ্ডি (এরণ্ডী) বলে। ছোটনাগপুরের তসর কোষ কয়েক জাতীয় বন্য বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে শাল, কুল, তুঁত কুসুম, আসন প্রভৃতি প্রধান।

তসর বস্ত্র দীর্ঘস্থায়ী এবং বহুপরিশ্রমজনিত বলিয়া উহা অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মূল্য। পূর্ব্বকালে কেবল রাজা মহারাজার গৃহে তসর ও গরদ ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান কালে তসর বস্ত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয় বলিয়া স্বল্পসম্পত্তিশালী ব্যক্তিও তসর ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু উৎকৃষ্ট তসর অর্থাৎ গরদ ও রেশম ব্যবহার করা এখনও সকলের পক্ষে সহজ নহে। কৌষেয় বস্ত্র হিন্দু মতে পবিত্র ও শুদ্ধ।

রোম রাজ্যের প্রথম সম্রাট্ অগষ্টস কৈসরের সময়ে রোম রাজ্যে তসর ও রেশম অজ্ঞাত ছিল। সম্রাট্ তিবেরিয়সের সময়ে রাজবংশীয়া অঙ্গনাকুল ব্যতিরেকে অপর কেহ রেশম বিনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইত। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে সম্রাট্ মর্কসএন্টোনিনস চীন সম্রাট সন্নিধানে এই অভিপ্রায়ে দূত প্রেরণ করেন যেন চীনে প্রস্তুত রেশমী বস্ত্রের ব্যবসা রোম রাজ্যে প্রচলিত হয়। তাঁহার এই উদ্যম কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছিল। সম্রাট হোনিওগেবালস স্বয়ং চীনজাত রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতেন। কথিত আছে সম্রাট অরিলিয়স এত ব্যয়কুণ্ঠ অথচ বিলাসপ্রিয় ছিলেন যে স্বয়ং কৌষেয় বস্ত্র ব্যবহার করিলেও আপনার মহিষীকে তাহা পরিধান করিতে দিতেন না। ইয়ুরোপে সর্ব্ব প্রথমে রোমীয়েরা এবং তৎপর গ্রীক্ ও ফরাসীরা রেশমের ব্যবহার শিক্ষা করেন। ইংলণ্ডে রোমীয়েরা রেশমজাত বস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন।

পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে বনে জঙ্গলে তসর কীট পাওয়া যাইলেও আমরা তৎপ্রতি যথোচিত মনঃসংযোগ করি না। আমাদের দেশে তসর কার্য্যে কেবল নীচ শ্রেণীর লোকে হস্তার্পণ করিয়া থাকে। তসরের চাষে শিক্ষিত ও ধনবান মণ্ডলী হস্তার্পণ করিলে আমাদের নিজের লাভ যে অনেক হইবে এ বিষয়ে অল্প লোকে চিন্তা করিয়া থাকেন। তসরের চাষে ইয়ুরোপীয় বণিকেরা এদেশে যেরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন তাহা অনেক বড়২ জমীদারের বার্ষিক আয় অপেক্ষা অনেক অধিক। অনেক ভদ্র ও ঋদ্ধিমান লোকের বড় বড় বাগান আছে, সেই সকল বাগানে গুটী পোকা আপনা হইতেই কোষ নির্ম্মাণ করে। যদি বাগানের মালিকেরা তাহার অনুসন্ধান করিতেন অথবা গুটী লাগাইবার গাছ লাগাইয়া গুটীর চাষ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের আয়ের একটী প্রশস্ত পথ উদ্ঘাটিত হইত। আমাদের গৃহে যে সকল অবিবাহিত বালক বালিকা, অসংখ্য বিধবা ও নিষ্কর্ম্মা লোক আছেন যদি তাহারা তসরের সূত্র প্রস্তুত করিবার নিয়মাদি শিক্ষা করিতেন তাহা হইলে অনেকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অনেকটা সুবিধা হইত। আমরা জাতিগত ব্যবসায় সর্ব্ব সাধারণের পরিণত না করিলে জাতীয় উন্নতির কিছুমাত্র আশা করিতে পারি না। এক্ষণে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সন্তান দরজীর ও পাদুকা বিক্রয় ব্যবসায়ের অনুসরণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। গুটী চাষের ব্যবসা উপর্যুক্ত ব্যবসায়ের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। পুরাকালে রাজবংশীয়েরা যে কার্য্যে লিপ্ত হইতেন, বর্ত্তমানে কি না সেই কার্য্য কয়েক ইতর জাতীয়দের হস্তে একচেটিয়া হইয়া রহিয়াছে ?

তসর কীট অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। এই কীট যখন অণ্ড হইতে নির্গত হয় তখন উহার শরীর দৈর্ঘ্যে প্রায় এক সুত অর্থাৎ এক ইঞ্চির অষ্টমাংশ মাত্র। ইহারা স্বভাবতঃ বড় ভোজনপ্রিয় এজন্য যেখানে খাদ্য পায় সেস্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যায় না। ডিম ফুটিবার দশ বার দিন পরে ইহারা একবার আপনাদের খোলস ফেলিয়া দেয়। খোলস পড়িয়া গেলে ইহাদের গাত্র কোমল চর্ম্মে আবৃত থাকে এবং তাহার উপরে একপ্রকার রস দেহ হইতে নির্গত হইয়া আইসে। এক সপ্তাহের মধ্যে এই রস দেহের উপরে শুষ্ক হইয়া পুনরায় একটী খোলস পড়ে। ইহারা প্রায় ৫বার পর্য্যন্ত খোলস ত্যাগ করে এবং এক দেড় মাসের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক হইয়া কোষ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। জাতি বিশেষের প্রকৃতি অনুসারে এক একটী কোষ ৫।৭ দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়। কোষ প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত পূর্ণবয়স্ক গুটী কীট ২।৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। এই কীটের শরীর অঙ্গুরী গ্রন্থিতে নির্ম্মিত। ইহাদের আট জোড়া (১৬) পা ও ৭টী চক্ষু আছে। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় ইহাদের মস্তকে নাসারন্ধ্র নাই কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে শরীরের উভয় পার্শ্বে ৯ টী করিয়া ১৮টী বায়ু সেবন যন্ত্র আছে। ইহাদের মস্তকে যে দুটী দাগ দেখিতে পাওয়া যায় সাধারণতঃ লোকে তাহাকেই চক্ষু বলে ; বাস্তবিক সে দুটী চক্ষু নহে—মস্তকের অংশ মাত্র। ইহাদের দাঁত করাতের দাঁতের মত সাজান, এজন্য অতি শীঘ্র ভোজ্য দ্রব্য কর্ত্তন করিতে পারে। ইহাদের পরিপাক শক্তিও ভোজন শক্তির অনুরূপ। ইহারা কীটাবস্থায় এত বুভুক্ষু যে, দশ বারটি পূর্ণবয়স্ক কীট একটী দশ বার হাত উচ্চ তুত, অথবা অন্য কোন

খাদ্য বৃক্ষের সমস্ত পত্রই খাইয়া গাছটীকে কাষ্ঠ মাত্র সার করিয়া ফেলে।

কোষ নির্ম্মাণ সময় উপস্থিত হইলে তসরকীট ক্ষুধাহীন হইয়া পড়ে। তখন ইহাদের মুখের দুই প্রান্তস্থ দুইটী ছিদ্র হইতে এক প্রকার লালা নির্গত হয়। এই দুই ছিদ্র নিঃসৃত লালা একত্র হইয়া শুষ্ক হইলে তসর হইয়া যায়। এক একটী কোষের নির্ম্মাণে ৫।৭ দিন মাত্র অতিবাহিত হইলেও সূত্রের দৈর্ঘ্য সামান্য হয় না। কোন কোন কোষে ৮০০ হাত পর্য্যন্ত সূত্র পাওয়া যায়। প্রায় কোন কোষে ১০০ হাতের কম সূত্র থাকে না। কোষ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে গুটীর জীবনের দুই অবস্থা অতীত হইয়া যায় ইহা আমরা ইতি মধ্যে দেখিয়াছি। কোষের ভিতরেও দুই অবস্থা হইয়া থাকে। যখন সূত্র প্রস্তুত শেষ করিয়া ফেলে তখন গুটী দুই তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোষের মধ্যে শঙ্খাকার ধারণ করে। পরে অতি সুন্দর চাকচিক্যশালী পতঙ্গ হইয়া কোষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আইসে। পতঙ্গাবস্থায় গুটীর দাঁত থাকে না। মুখ হইতে লালা স্বরূপ এক প্রকার তরল বস্তু দ্বারা কোষের এক প্রান্ত ভিজাইয়া তাহার উপর মুখ নাড়িতে থাকে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা কোষে ছিদ্র করিয়া পতঙ্গটী বাহির হইয়া উড়িয়া যায়। পতঙ্গাবস্থায় ইহারা ৩।৪ দিন মাত্র জীবিত থাকে এবং পতঙ্গিনী অণ্ড প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। পতঙ্গের জীবন কালও পতঙ্গিনীর জীবনকাল অপেক্ষা বড় বেশী নহে।

কোষ হইতে সূত্র নিষ্কাশন করিতে হইলে প্রথমে কোষগুলিকে এ দেশে ক্ষার জলে সিদ্ধ করিয়া লয়। তৎপরে কোষের উপরের ত্বক উঠাইয়া ফেলে, পরে ৩।৪ টী ত্বকহীন কোষ জলে একত্র রাখিয়া একটি কাটী দ্বারা তাহাদিগকে জলের মধ্যে নাড়িতে থাকে। নাড়িতে নাড়িতে কোষ হইতে সূতার খেইগুলি কাটীতে জড়াইয়া যায়। পরে সেইগুলি ধরিয়া লাটাইয়ে জড়াইয়া লয়। ঐরূপে তসর সূত্র নিষ্কাশন করা হয়।

C. Kumar

কলা ও কলার পালো।

আমাদিগের দেশের সকল ব্যবসাই ক্রমে ক্রমে বিদেশীয়দিগের হস্তগত হইতেছে। ইংরাজেরা পূর্ব্বে কেবল রেশম, নীল, চা এইরূপ দুই চারিটি এদেশজাত সামগ্রীর ব্যবসায় করিতেন মাত্র। নীল ও চা-র ব্যবসায়-প্রধানতঃ তাঁহাদিগের মূলধনেই উন্নতিলাভ করিয়াছে। ভারতের বিবিধ খনিতেও তাঁহাদের মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধনার্জ্জনের জন্য যত অধিক সংখ্যক য়ুরোপীয় এদেশে আসিতেছে ততই তাহারা সকল প্রকার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতেছে, সুতরাং এদেশীয় লোকের উপার্জ্জনের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। যে ব্যবসায়ে একবার য়ুরোপীয় মূলধন নিয়োজিত হয়, তাহা আর এদেশীয়গণের আয়ত্তে অধিক দিন থাকে না। সম্প্রতি নীল ও চা-র ব্যবসায় একটু মন্দা পড়াতে তাঁহারা অন্যবিধ ব্যবসায়াবলম্বনের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা দেখিলে তাঁহাদিগের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বিহারী নীলকরেরা এক্ষণে ইক্ষুর চাষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। যাহাতে তাঁহারা বিদেশের আমদানী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, সেজন্য নানা প্রকার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহাদিগের উদ্যোগ দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যেই এই ইক্ষুর আবাদ তাঁহাদিগের আয়ত্তাধীন হইবে, এদেশীয়েরা কেবল ইক্ষুক্ষেত্রে মজুরী করিয়া দিনপাত করিবে। সেইরূপ চা-করেরা চা-বাগানে রিয়া মুর্গা প্রভৃতির আবাদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক চা-কর তাঁহাদিগের বাগিচার অনাবাদী জমিতে মুর্গা বসাইতেছেন। রিয়া ও মুর্গার সূত্রের য়ুরোপে দিন দিন কিরূপ আদর হইতেছে তাহা আমরা কমলাতে অনেক বার প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও আমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। কেবল চাকরী করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ভিন্ন কোন উচ্চতর বাসনা আমাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। এই চাকরীর পথও ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহা দেখিতেছি ও বুঝিতেছি, তথাপি সেই সঙ্কীর্ণ পথে পরস্পরে সংগ্রাম করিতেছি। কিন্তু পথান্তর অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার উপায় অবলম্বনের জন্য কোন চেষ্টাই করিতেছি না। সম্প্রতি কলার আবাদের ন্যায় সামান্য কারবারের দিকে ইংরাজদিগের কিরূপ দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা ইংরেজী ব্যবসা সম্বন্ধীয় পত্রাদি পাঠ করিলে বিশেষরূপ অনুভূত হয়। এই কারবার এক প্রকার আমাদিগের নিজস্ব, ইহার ভবিষ্যৎ কিরূপ আশাপ্রদ তাহা আমরা আজ এক বৎসর ধরিয়া কমলার পাঠকদিগকে বিদিত করিয়া আসিতেছি। দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত কাহাকেও আগ্রহের সহিত এই ব্যবসায়ের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কোন কোন ইংরেজ রীতিমত কলার আবাদ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে যে অল্পদিন পরেই ইংরাজেরা আমাদিগকে কলা দেখাইয়া ইহার অমৃতরস আস্বাদন করিবেন।

দক্ষিণ ভারতে মালবার উপকূলস্থ জমি কলার আবাদের বিশেষ উপযোগী। সমস্ত মাদ্রাজ প্রদেশেই কলা একটা বিশেষ ফসলের মধ্যে পরিগণিত। তথায় প্রায় ষাটি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কলা দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আফ্রিকার য়ুগণ্ডা (Uganda) প্রদেশে যে কদলীক্ষেত্র সকল দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে বলেন দক্ষিণ ভারতের কলাগাছ হইতেই তাহা রোপিত হইয়াছে। পশ্চিম ঘাটের নিকটস্থ স্থান সমূহেও প্রভূত কদলীক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানে কিরূপে কলার আবাদ হইয়া থাকে আমরা তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি।

গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে তথাকার বিস্তৃত অরণ্য সকল কলার আবাদ করিবার জন্য পরিষ্কার করা হয়। তাহারা বনের সমুদয় বৃক্ষ কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম পত্র লতাদি আগুন দিয়া পোড়াইয়া ফেলে। ইহাতে জমীর উপর যে ছাই পড়ে তাহাতে ভূমি বিশেষরূপ উর্ব্বরাশক্তি লাভ করে। তাহার পর তাহারা তথায় কলাগাছ বসাইবার জন্য এক ফুট করিয়া এক একটি গর্ত্ত খনন করে এবং

বর্ষা আরম্ভ হইলেই উহা রোপণ করে। তথাকার লোক কোন প্রকার নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ইহার আবাদ করে না, সুতরাং গাছ রোপণ সম্বন্ধে কোথাও একটা নির্দ্দিষ্ট প্রথা দেখা যায় না। এক বিঘা জমীতে তিন শতের অধিক গাছ রোপণ করা হইয়াছে, ইহা অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। গাছ রোপণ করা হইলে, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে কাহাকেও বড় একটা দেখা যায় না। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরতা গুণে গাছগুলি বৃদ্ধি পায়, এবং এক বৎসর পরে যথেষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে।

যাঁহাদিগের কৃষি বিষয়ে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে, এই আবাদে একটু অধিক যত্ন করিলে যে আরও অধিক ফল লাভ হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য কোন কোন য়ুরোপীয় কৃষি ব্যবসায় তথায় কলার আবাদ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমাদিগের মনে হয় নিম্ন বঙ্গেও কলার আবাদ মন্দ হয় না; য়ুরোপীয়েরা যেরূপ উদ্যোগী তাহাতে যদি এদিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি পড়ে তাহা হইলে ইহা-তেও তাঁহারা সোণা ফলাইতে পারেন। বিশেষতঃ আজকাল কলাগাছের আঁশের প্রতি তাঁহা-দিগের যেরূপ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহাতে অত্যল্প-কাল মধ্যেই যে তাঁহারা ইহার আবাদে মনোনিবেশ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য আমরা পুনঃ পুনঃ আমাদিগের দেশবাসীদিগকে এই ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে যত্নবান হইতে পরামর্শ দিতেছি। এই কলার আবাদ সম্বন্ধে আমরা দুই একটি বিশেষ তত্ত্ব তাঁহাদিগের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি।

যত পরিমাণ ভূমিতেই কলাগাছ রোপণ করা হউক না, এটি স্মরণ রাখা চাই যে, প্রত্যেক গাছের চারি পাশে যেন প্রচুর স্থান থাকে এবং যে গর্ত্তে গাছ বসান হইবে, তাহাও যেন দুই ফুট গভীর হয় এবং পরিসরেও সেইরূপ দুই ফুট হয়। তাহার পর প্রত্যেক গাছ দশ ফুট অন্তর বসান আবশ্যক। এক সারির গাছ যেমন প্রত্যেকটি অন্যটি হইতে দশ ফুট অন্তরে বসিবে, সেইরূপ প্রত্যেক সারিও অন্য সারি হইতে দশ ফুট অন্তরে থাকা উচিত। গর্ত্তগুলির উল্লিখিতরূপ পরিসর ও গভীরতা হইলে তাহার চারিদিকে অনেক আলগা মাটী থাকিবে তাহাতে গাছগুলির সার গ্রহণের বিশেষ সহায়তা হইবে। গর্ত্তগুলি খনন করা হইলে তাহাতে ছাই ও পোড়া-মাটী দিতে হইবে এবং তৎপরে গর্ত্তের মাটি দিয়া উহা পুরাইয়া দিতে হইবে। গাছগুলি সংগ্রহের পর তাহা রোপণ করিবার পূর্ব্বে দুই দিন রৌদ্রে রাখা আবশ্যক। কিন্তু এমন সময়ে উহা রোপণ করা আবশ্যক যে, কোন প্রকারে বৃষ্টির জলের অভাব না হয়। আষাঢ় মাসের প্রথমে রোপণ করিতে পারিলে কোনরূপে অসুবিধার সম্ভাবনা নাই। গাছগুলি এরূপ ভাবে বসাইতে হইবে যে, তাহা কোনরূপে হেলিয়া না পড়ে। ইহার পর আর বিশেষ কোন তদ্বির আবশ্যক নাই। তবে বর্ষাকালে আবাদে আগাছা জন্মিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, এজন্য সেগুলি মধ্যে মধ্যে তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই সকল আগাছা তুলিয়া গাছের গোড়াতে দিলে ভাল হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে কলার আবাদে লাঙ্গল দেওয়া হয়। দুই সারি গাছের মধ্যে যে স্থান থাকে তাহা লাঙ্গল দিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিলে গাছের শিকড়ের অগ্রভাগ সকল ছিন্ন হয় এবং সে জন্য তাহার চারি-দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশাল শিকড় গজায়, উহা ভূমি হইতে অধিক পরিমাণে রস সংগ্রহ করিয়া গাছের পরিপুষ্টির সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু এই লাঙ্গল দিবার সময় বিশেষরূপে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। যাহাতে গাছের শিকড় সকল গাছ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রয়োজন। এক বৎসর পরেই এই সকল গাছে কলা জন্মিবে। কলা পরিপক্ক হইলে গাছগুলি ছেদন করিয়া তাহার আঁশ বাহির করা যাইতে পারে। যদি তাহা না করা হয় তাহা হইলে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া চারা গাছের গোড়ায় দিলে তাহার বিশেষ পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু আমা-দিগের বিবেচনায় চারা গাছে অন্য সার দিয়া, কাটা গাছ হইতে আঁশ বাহির করাই লাভজনক।

কলা বিক্রয় না করিয়া যদি উহার পালো প্রস্তুত করা যায় এবং তাহা বিক্রয় করা হয়, তাহাতে অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে পরিপুষ্ট কদলী নরম হইবার পূর্ব্বেই কাঁদি কাটিয়া ফেলা হয়। তাহার পর কলার ছাল ছাড়াইয়া

পাতলা পাতলা চক্রাকারে কাটিয়া উহা রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়। যখন উহা শুকাইয়া চূর্ণ করিবার উপযোগী হয় তখন গোধূম বা অন্য শস্যের ন্যায় উহা জাঁতায় পিষিয়া পালো বা ময়দা করা হয়। জাঁতায় চূর্ণ করিয়া উহা সূক্ষ্মবস্ত্রে বা চালুনী দিয়া ছাঁকিয়া লইলে ভাল হয়। এই কদলী চূর্ণ বা কলার পালো প্রায় ছয় আনা সের দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

এই প্রণালীর আবাদে দক্ষিণ ভারতে এক কাঁদিতে প্রায় ৩০০ কলা উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক কাঁদিতে ১৫ হইতে কুড়ি ছড়া কলা দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় উন্নত প্রণালীর আবাদে কিরূপ ব্যয় হইয়া থাকে তাহার একটি তালিকা এস্থলে প্রদত্ত হইল:--

তিন শত বিঘা জমীর জঙ্গল কাটাই, পোড়ান ইত্যাদির ব্যয়	...	৪০০০	টাকা
জমী সমান করা	... ...	৫০০	”
গর্ত্ত খনন	... ...	৩০০	”
চারার দাম	... ...	৫০০	”
চারা বসান	... ...	১০০	”
আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি	...	২০০০	”
তদারকের ব্যয়	... ...	৫৪০	”
আবাদে রাস্তা ঘাট গুদাম ইত্যাদি নির্ম্মাণের ব্যয়	...	৩০০	”
বেড়া দেওয়া	... ...	৫০০	”
কাঁদি কাটাই	... ...	১০০	”
		৮৮৪০	”
ইহাতে ৭০ হাজার কাঁদি উৎপন্ন হইবে ।০ হিসাবে তাহার মূল্য	...	১০,০০০	
লাভ	... ...	১১৬০	

কিন্তু এই ৪০ হাজার কাঁদি পিষিয়া পালো করিলে প্রত্যেক কাঁদিতে দুই সের করিয়া পালো উৎপন্ন হইবে। উহা ছয় আনা সের দরে বিক্রয় হইলে ৩০ হাজার টাকা পাওয়া যাইতে পারে। পালো প্রস্তুত করিতে সের করা এক আনা খরচ হইলে ১০ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। ইহাতে ১১,১৬০ টাকা লাভ হইবে। ইহা ব্যতীত আঁশ বিক্রয়ের দ্বারা আরও লাভ হইতে পারে।

এই সকল দেখিয়া কি আমাদের দেশের একজন লোকও এই ব্যবসায়ে মনোযোগী হইবেন না। নূতন পন্থা অবলম্বন ভিন্ন আমাদিগের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় নাই। এক দিকে সকলে দৌড়িলে অর্দ্ধাশনে চিরজীবন কাটাইতে হইবে। ভদ্র লোকের ঘরে যেরূপ অন্নক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। কমলাকে লাভ করিতে হইলে উদ্যোগের প্রয়োজন, অতএব সকলে সেই জন্য উদ্যোগী হউন।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

তিল।

ইতিহাস।

উদ্ভিদ্‌বেত্তাগণ বলেন যে তিল-শস্য আফ্রিকা দেশে প্রথমে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থাবলিতে উল্লেখ হেতু অতি পুরাকাল হইতে ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। Sesame এই শব্দটির গ্রীক্ লাটিন্ ও আরব্য ভাষায় মূল পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ইহা যে শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় তাহাও আরব্য পারস্য ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। ইউ, এন্ দত্ত তাঁহার ভৈষজ্য গ্রন্থে বলেন যে সংস্কৃত ভাষায় তৈল শব্দ তিল শব্দ হইতে উৎপন্ন। সেই জন্য মনে হয় প্রাচীন ভারতবাসীগণ প্রথমে তিল হইতে তৈল প্রস্তুত করিতেন। ভাব-প্রকাশে তিন প্রকার তিলের বিষয় উক্ত আছে—শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত। তন্মধ্যে কৃষ্ণ তিলই ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এবং ঐ জাতি হইতেই প্রচুর পরিমাণে তৈল নিষ্কাশিত হইত। শ্বেত তিল অনেকটা মাঝামাঝি রকমের। "তিল স্থানং" অর্থে অল্প স্থান, ইহা প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়। ইহা হইতে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হইত এবং তজ্জন্য ইহার চাষোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রেরও নামে তিল শব্দের সম্বন্ধ দেখা যায়। তিল-ধেনু, তিল-পিষ্টক, তিল-ভৃষ্ট, তিলান্ন, তিলহোম প্রভৃতি শব্দেও অনুমিত হয় যে অতি পুরাকাল হইতে ভারতবাসিগণ ইহার ব্যবহার জানিতেন ও তজ্জন্য ইহার চাষও করা হইত। মনুসংহিতার ৩য় অধ্যায়ে তিল সংক্রান্ত অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা শ্রাদ্ধের একটী প্রধান উপকরণ বলিয়া উক্ত আছে। মনুসংহিতা অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদ পুরাণাদি হইতে সঙ্কলিত বলিয়া নির্দ্ধারিত, এজন্য মনে হয় ইহা অনেক পূর্ব্ব হইতে ভারতে জ্ঞাত ছিল। Pliny (A.D. 80) বলেন যে তিল তৈল সিন্ধু হইতে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া য়ুরোপে আমদানী হইত, ইহার পর প্রাচীন গ্রন্থকারগণ গুজরাট প্রভৃতি স্থান হইতে তিল তৈলের রপ্তানি বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আইন আকবরি গ্রন্থে শ্বেত ও কৃষ্ণ তিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। দিল্লী, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি সহরের বাগিচায় ইহার চাষ হইত বলিয়া উল্লেখ আছে। অধুনা ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে ইংরাজ শাসনে ইহার চাষের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

অতঃপর ইহা প্রতীয়মান হইল যে তিল, ভারতের ধান্যাদি শস্যের সঙ্গে সঙ্গে অতি পূর্ব্বকাল হইতে চাষ করা হইত। ইহা ভারতের জলবায়ু অনুযায়ী জন্মিয়া থাকে। গরম দেশে শীত শস্য হিসাবে, ও শীতল দেশে গরম শস্য হিসাবে ইহা জন্মাইতে পারে। গাঞ্জাম প্রদেশে ইহা বর্ষাকালে জন্মিয়া থাকে। বালি জমি তিলের উপযোগী স্থান।

বর্ণনা।

তিলের গাছগুলি দুই বা আড়াই হাত লম্বা হয়। ইহারা বনে জঙ্গলে আপনি প্রায়ই জন্মায় না। ইহা প্রতি বৎসরেই ফল পাকিবার পর মরিয়া যায়। কৃষ্ণ তিলের গাছের কাণ্ড মরিচা ধরার ন্যায় একটু লোহিতাভ হয়। পাতা ঘোর সবুজ বর্ণ হইয়া থাকে। ফুল গুলি ঘোর লাল বর্ণ এবং ফল গুলি কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া থাকে।

তৈল।

তিল, তৈল প্রাপ্ত হইবার জন্যই চাষ করা হয়। দুই প্রকার বীজই প্রায়ই দেখা যায়—সফেদ ও কাল। কৃষ্ণ তিলই তৈলের অধিক উপযোগী। ফাল্গুনের গোড়ায় ইহার চাষ হয় ও বৈশাখে ইহা পাকিয়া থাকে। সফেদগুলি জ্যৈষ্ঠে চাষ হয় ও শ্রাবণের গোড়ায় পাকিয়া থাকে। যে উপায়ে সরিষার তৈল সরিষা হইতে পাওয়া যায়, তিল তৈলও ঠিক সেই উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিল তৈল বেশ পরিষ্কার এবং হরিদ্রা বর্ণ। ইহা গন্ধহীন ও বিকৃত হয় না। তিলে Olein (তৈল-পদার্থ) শতকরা ৭৫ ভাগে বর্ত্তমান। কোন তৈলে দশ ভাগ তিল তৈল মিশ্রিত থাকিলে তাহা ধরিবার কৌশল এই যে, এক ড্রাম মিশ্রিত তৈলে এক ড্রাম সালফিউরিক ও নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করিলে সবুজবর্ণ হইয়া যাইবে। এই বর্ণ অন্য কোন তৈল হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভারতবর্ষে তিল তৈল, পাক কার্য্যে, মাখিবার জন্য, সাবান প্রস্তুত করিতে ও প্রদীপে জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিলাতে ইহা প্রধানতঃ সাবান প্রস্তুত করিতে ও আলো জ্বালিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে অলিভ অয়েলের মত বলিয়া ইহা

তাহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ তিলের তৈলই ঔষধার্থে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতের নানা গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের জন্যও ইহা প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বাদামের (almond) তৈলে ও ঘৃতে ভেজাল দিবার জন্য ইহা প্রধান উপযোগী। বিলাত হইতে যে অলিভ তৈল এখানে আমদানী হয় তাহা অৰ্দ্ধেক বিলাতে তৈয়ারী তিলের তৈল। ভারতের কোন কোন স্থানে গড়া তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ইহা বাদামের, তিলেরও কুসুম ফুলের বীজ এই তিনের মিশ্রণ মাত্র।

ভারতের প্রায় সমুদায় গন্ধ দ্রব্যের মূল-তিল তৈল। ইহা সমুদায় গন্ধ পদার্থ হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত সুগন্ধি হইয়া থাকিতে পারে বলিয়া, ইহার নিজের কোন বিশেষ গন্ধ নাই বলিয়া এবং ইহা বিকৃত বা ঘন হইয়া যায় না বলিয়া সমুদায় গন্ধ দ্রব্যে ইহার ব্যবহার এত উপযোগী। কোন সুগন্ধিপুষ্প হইতে গন্ধ প্রস্তুত করিতে গেলে এক গুণ পুষ্প ও তিন গুণ তৈল একটী বোতলের মধ্যে ৪০ দিন রৌদ্রে রাখিয়া দিলে তিল তৈল পুষ্পের সমস্ত গন্ধ লইতে সমর্থ হয়। আতর প্রস্তুতে কিরূপে তিলের ব্যবহার হয় তাহা আমরা গন্ধদ্রব্য শির্ষক প্রবন্ধে আতর প্রস্তুত প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তিল তৈল সুগন্ধি করিয়া ফুলেল তৈল বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ইয়ুরোপে তিল তৈলের পরিবর্ত্তে গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য চর্ব্বি ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু আমাদের দেশে উষ্ণাধিক্য হেতু উহা শীঘ্র বিকৃত হইয়া যায় বলিয়া তিল তৈল অধিক উপযোগী।

খইল।

সিন্ধুদেশে ইহাকে 'খাড়' বলে এবং ইহাই গো মেষাদি পশুর খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। বোম্বাই প্রদেশে ইহা পশু খাদ্য রূপে প্রচলিত ও তাহারা ইহা খাইলে পুষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্জাবে খৈল পশুদের খাদ্যও চলে ও গরীব লোকেরা ইহা ময়দার সহিত মিশাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ঔষধ।

হিন্দু ভৈষজ্য গ্রন্থাবলীতে তিন প্রকার তিলের বিষয় উক্ত আছে। এই খৈল খোষ্টাই দুগ্ধবর্দ্ধক বলিয়া উক্ত আছে। অর্শ রোগীদের ইহা উপযোগী, কারণ ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। তিল বাটিয়া মাখমের সহিত অর্শে প্রয়োগ করা হয়, তিল হইতে প্রস্তুত মিষ্টান্নও অর্শ রোগীর পক্ষে উপকারী। তিল ও ইহার তৈল অন্যান্য ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া আমাশয় রোগীদিগের জন্য ব্যবহার করা হয়। দূষিত ঘা বা ক্ষত বাঁধিবার জন্য এই তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা কোন কোন ঔষধে অলিভ তৈলের স্থান অধিকার করে। পঞ্জাবে ইহা বাত ও স্ফোটক আরাম করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা অঙ্গে মাখিলে ত্বক কোমল হয়, অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে ইহা বিরেচকের কার্য্য করিতে সমর্থ। বাধক বেদনায় গরম জলে ইহার বীজ গুঁড়াইয়া মিশ্রিত করিয়া কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া থাকিলে সমস্ত বেদনা অপসৃত হয়। বীজ পাচন করিয়া চিনির সহিত মিশাইয়া সর্দ্দিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। মিরাট প্রদেশে, প্রত্যূষে তিল ফুলে যে শিশির পড়ে তাহা চক্ষের ব্যাধিতে প্রয়োগ হইয়া থাকে; যুক্ত প্রদেশে, তিলের পাতা হইতে এক প্রকার আটাযুক্ত পদার্থ পাওয়া যায়, পাতা জলে ভিজাইয়া রাখিলে জল সেই আটায় চট চটে হইয়া যায়। তাহা কলেরা, আমাশয়, প্রভৃতি ব্যারামে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে পাতা হইতে সে পরিমাণে আটা পাওয়া যায় না। করদ রাজ্যে পাতা ও মূল হইতে প্রাপ্ত পাচন কেশ সংস্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাতে কাঁটা ফুটিয়া যাইলেও তাহা অনায়াসে না বাহির করিতে পারিলে তিলের তৈল অভিষেক করিলে শীঘ্র কাটা বাহির হইতে পারে। ইহাতে কাঁটাটি গলিয়া গিয়া পুঁজের সহিত বাহির হইয়া আইসে।

অন্য ব্যবহার।

তিল তৈল অতি শুভ্র উজ্জ্বল আলোক প্রদান করে বটে কিন্তু ইহা শীঘ্র শীঘ্র জলিয়া যায়। পাতা হইতে প্রস্তুত পাচন কেশ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। তিল কাটি শুকাইয়া গেলে জ্বালানি ও সার রূপে ব্যবহৃত হয়। রেশম রং করিবার জন্য এই তৈল ব্যবহৃত হয়। ইহাতে রেশমে পাতলা কমলালেবুর রঙের আকার হয়।

মান্দ্রাজে চাষ।

ফাল্গুনের শেষে জমিতে দুই তিন বার চাষ দিয়া রাখিলে পর বৃষ্টিতে জমি ভিজিয়া গেলে চৈত্রের শেষে উৎকৃষ্ট বীজ বপন হয়। প্রতি বিঘায় পাঁচ পোয়া বীজ বুনিতে হয়। বীজ কলাইতে আট দশ দিন লাগে। দুই চারি দিনের পরে জমি নিড়াইয়া দেওয়া হয়। দুই মাসের মধ্যেই ফুল ফুটিয়া থাকে ও আর এক মাস পরে সুঁটি পাকিয়া যায়। ঐ শস্যের উপর পোকা মাকড়ের বড় অত্যাচার হয়। কাটা হইয়া গেলে গাছগুলিকে একটা আচ্ছাদনের মধ্যে জমা করিতে হয়। আট দিনের পর গাছগুলি শুকাইয়া যাইলে সেগুলি আছড়াইয়া বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজগুলি কলে বা ঘানিতে পিষিয়া লওয়া হয়।

পঞ্জাবে।

অন্যান্য ফসলের সহিত ইহার চাষ হয়। কেবল কৃষ্ণ তিলেরই আবাদ অধিক হয়। গাছ রেশমের গুটির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রায় মরিয়া যায়। তথায় ১৫ সের বীজ হইতে ৩ সের তৈল পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে।

ঢাকা জেলায় লক্ষীমা নদীর ধারে ইহার চাষ হয় এবং ধান্যের সহিত সংগ্রহ করা হয়। পুরাতন কাটিগুলি ক্ষেত্রের উপর জ্বালাইয়া সেই ক্ষেত্রে দুই চারি বার চাষ দেওয়া হয়। মাঘ মাসের গোড়ায় ইহার আবাদ হয়। দেড় সের তিল বীজ ও দশ সের আমন ধানের বীজ এক সঙ্গে এক বিঘা জমিতে চাষ করা হয়। এক মাসের মধ্যে দুইবার নিড়াইতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিল কাটা হয় পরে ঝাড়িয়া লইতে হয়। প্রতি বিঘায় ২।৩ মণ তিল পাওয়া যায়। ধানের সহিত চাষ করিলে তিল উত্তমরূপে জন্মাইয়া থাকে।

সিন্ধুদেশে।

সিন্ধুপ্রদেশের প্রায় সমুদায় জেলায় ইহার চাষ হইয়া থাকে। তথায় বীজগুলি পাকিতে সাড়ে চারি মাস লাগে। প্রতি বিঘায় প্রায় এক মণ বীজ পাওয়া যায়। সিন্ধুদেশে প্রায় ৩০ লক্ষ বিঘা জমিতে ইহার আবাদ হয়।

উত্তর পশ্চিম দেশে।

তথায় দুই প্রকার বীজ দেখা যায়। শ্বেত তিলকে তিল এবং কৃষ্ণতিলকে তিলি বলে। তিল শস্য পাকিতে অনেক দেরী লাগে এই জন্য ইহা জহর শস্যের সহিত রোপণ করা হয়। ইহা তুলার চাষের সহিতও আবাদ করা হয়। মানুষের খাদ্যের নিমিত্ত তথায় তিল তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আশ্বিনের শেষে তিলের আবাদ হয়। বুন্দেল-খণ্ডপ্রদেশে ইহার আবাদ অধিক। দুই তিনবার জমিতে চাষ দিয়া পরে ইহাতে বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কখনও কখনও তুলার গাছের ধারে ধারে লাইন করিয়া পোতা হয়। তুলার সহিত বিঘা প্রতি দুই সের বীজ বপন করা হয়। শস্য পাকিলে গাছ কাটিয়া জড় করিতে হয়। কাটি-গুলিকে তিল কোটা বলে এবং জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বিঘায় দেড় মণ হইতে দুই মণ বীজ পাওয়া যায়।

তৈল নিষ্কাষণ প্রণালী।

মান্দ্রাজে যথেষ্ট পরিমাণে তিল জন্মাইয়া থাকে। অপরিষ্কৃত তিল হইতে নিষ্কাষিত তৈল দেখিতে নানা বর্ণের হইয়া যায় ও ব্যবহার করিতে অসুবিধা হয়। সুন্দর পরিষ্কৃত তৈল প্রাপ্ত হইতে হইলে প্রথমতঃ গরম জলে বীজগুলিকে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। তাহাতে বীজের খোলার বর্ণ একে-বারে নষ্ট হইয়া যায়। এবং বীজগুলি সাদা দেখায়। পরে বীজগুলিকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তৈল নিষ্কা-ষিত করিতে হয়। কেহ তৈল নিষ্কাষণের সময় বীজের সহিত বাবলার আটা মিশ্রিত করে। তাহাতে তৈলের মাত্রা তেমন বৃদ্ধি পায় না বটে তবে তাহা দেখিতে আরও সুশ্রী ও ঘন হইয়া থাকে বলিয়া দামে বিক্রয় হয়।

বোম্বাই প্রদেশে ঘানিগাছেই ইহা নিষ্কাষিত হইয়া থাকে। তথায় ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য তিসী প্রভৃতি সমান পরিমাণে লইয়া একত্রে মাড়া হয়। প্রত্যেক ঘানিগাছে সাধা-রণতঃ আট সের বীজ দুই ঘণ্টার মধ্যে নিষ্কাষিত হইয়া থাকে।

ব্যবহার।

বিলাতে এই তৈল প্রধানতঃ সাবান প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। তথায় আলোক জ্বালাইবার জন্য নারিকেল তৈল অপেক্ষা ইহার অধিক ব্যবহার হয়, কারণ ইহা অধিক ঠাণ্ডায় জমিয়া যায় না।

ভারতবর্ষে ইহা রন্ধনকার্য্যে, অঙ্গে মাখিবার জন্য এবং সাবান প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গদেশে ইহার তেমন প্রচুর আবাদ নাই বলিয়া ইহার তত প্রচলন নাই। যেটুকু তৈল এখানে উৎপাদিত হয় তাহা প্রায়ই সরিষার তৈলের ন্যায় ঘানি গাছে নিষ্কাষিত করা হয় এবং গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতেই ইহার প্রধান ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ ফ্রান্সেই ইহা অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে এবং তথা হইতে য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশে অলিভ তৈলের সহিত ভেজাল দিবার জন্য চালান হইয়া থাকে।

তিলের যেরূপ রপ্তানি, বঙ্গদেশে ইহার চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ইহা যে পরে তিলি শস্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব চাষীমাত্রেরই ইহার চাষে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীবিরিঞ্চিমোহন কর।

সেকাল আর একাল।

৺রাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গদেশে বিজাতীয়তা ও ইংরাজানুকরণ-প্রিয়তার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল তখন এই গ্রন্থ সেই স্রোতকে জাতীয়তা ও হিন্দুত্বের দিকে পরিচালিত করিতে বিশেষ সহায়তা করে। এই গ্রন্থে বঙ্গ সমাজের সেকালের অবস্থার সহিত একালের অবস্থার তুলনা করিয়া সমীচীন ভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে সুবিজ্ঞতা ও সুরসিকতার সুন্দর সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ইহা যেমন কৌতুকাবহ ও আমোদকর, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজী সংবাদ পত্রে ইহার প্রশংসা-পূর্ণ সমালোচনা পাঠ করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড নর্থব্রুক নিজ ব্যয়ে ইহার ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া লয়েন। অনেক দিন এই গ্রন্থ প্রচার সম্বন্ধে কোন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, তজ্জন্য বর্ত্তমান কালের অনেকেই ইহা পাঠ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র। ডাকমাশুল /০।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।

৺রাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

বঙ্গ সমাজে চিন্তা, ভাব ও মত সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। সেই অল্প সংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" উচ্চ স্থান অধিকার করে। যে সময়ে এই গ্রন্থ প্রচারিত হয় তখন সর্ব্বদেশে হিন্দুধর্ম্ম নিকৃষ্ট ও হীনধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। এই গ্রন্থেই সর্ব্ব প্রথমে এই সত্য প্রতিপাদিত হয় যে পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ প্রচারের পর হইতেই এদেশের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। এই গ্রন্থ প্রচারের কয়েক বৎসর পরে থিওসফিষ্ট দলের আবির্ভাব হয়। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা, অধ্যাপক মোক্ষমূলার, তদানীন্তন কালের ভারতের প্রধান সংবাদপত্র "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার" সম্পাদক জেমস্ রুটলেজ সাহেব এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য ও গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় "এডুকেশন গেজেট" সংবাদ পত্রে এই গ্রন্থ সমালোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম্মরূপ তরণী জলমগ্ন হইতেছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাহার কাণ্ডারী হইয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গদর্শনে" এই গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া বলেন, "রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।" হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি এক্ষণে পৃথিবীর নানাদেশে যে শ্রদ্ধা ভক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, এই বাঙ্গলা গ্রন্থ তাহার অন্যতম কারণ। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয়। এরূপ গৌরবের সামগ্রী বঙ্গের গৃহে গৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র। ডাকমাশুল /০

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু;

৺রাজনারায়ণ বসুর বাটী, বৈদ্যনাথ দেওঘর, এই ঠিকানায় মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

গেঞ্জী মোজার ব্যবসা।

ইংরেজ শাসনে আমাদিগের পরিচ্ছদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আর আমাদের কেবল মাত্র ধুতি ও একখানা দোছোট হইলে চলেনা। যাঁহারা ইংরেজের অধীনস্থ কার্য্যালয়ে কাজ কর্ম্ম করেন অথবা ইংরেজের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করেন, কিম্বা তাঁহাদিগের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ইংরেজের পছন্দসই পোষাক না পরিলে চলে না। নগ্নদেহে নগ্নপদে ইংরেজের নিকট উপস্থিত হইলে কাহারও সম্মান লাভের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই ইংরেজের পরিচ্ছদের অনুকরণে আমাদিগের পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহার মধ্যে অনেক জিনিষ ইংরেজের দেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। এদেশে এখন ভদ্রলোক মাত্রেই মোজা, গেঞ্জিফ্রক প্রভৃতি বিলাতী পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল সামগ্রীর জন্য এদেশের কত টাকা যে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তাহার নির্ণয় নাই। ১৯০১ সালের শেষ ভাগে শ্রমশিল্পের শিক্ষা বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য যে এক কনফারেন্স বসিয়াছিল তাহার রিপোর্টে প্রকাশ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় বৎসরে এক কোটি ছাপান্ন লক্ষ টাকার পোষাক পরিচ্ছদ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এই সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদের অনেক সামগ্রী যে অনায়াসে এ দেশে প্রস্তুত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য অদ্য আমরা সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হয় তন্মধ্যে মোজা, গেঞ্জীফ্রক প্রভৃতির পরিমাণ বড় অল্প নহে। বাণিজ্যবিষয়ক হিসাব পত্রে ইহার স্বতন্ত্র তালিকা না থাকাতে আমরা কত মূল্যের মোজা প্রভৃতি আমদানী হয় তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না, কিন্তু আজ কাল ইহা আপামর সাধারণে যেরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে যে অনেক টাকার এই সকল সামগ্রী আমদানী হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে মোজা গেঞ্জীফ্রক একমাত্র ইংলণ্ড হইতেই এদেশে আমদানী হইত, এজন্য তাহা এখনকার মত সুলভ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সুইজরলণ্ড, জর্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ হইতে ইহা আমদানী হওয়াতে অনেক সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ইংলণ্ড অপেক্ষা ঐ সকল দেশে মজুরীর হার কম বলিয়াই উহারা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণে সুইজরলণ্ড বা জর্ম্মাণীতে যদি সুলভে গেঞ্জী মোজা প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা হইলে ভারতবর্ষেই বা কেননা উহা আরও সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারিবে। সকল সভ্য দেশাপেক্ষা এখানকার মজুরী যেরূপ সুলভ তাহাতে চেষ্টা করিলে আমরা অনেক শিল্প সামগ্রী অন্যান্য দেশাপেক্ষা অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত করিতে পারি, বিশেষতঃ মোজা, গেঞ্জীফ্রক প্রভৃতি সামান্য সামান্য দ্রব্য সম্বন্ধে আমরা অনায়াসে য়ুরোপীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারি। ধুতি সাড়ী প্রভৃতি তন্তুজাত কাপড়ের কল স্থাপন করা যেরূপ ব্যয়-সাধ্য, মোজা গেঞ্জীর কল সেরূপ নহে। ইংলণ্ডে সচরাচর এই সকল সামগ্রী হস্তচালিত কলে প্রস্তুত হইয়া থাকে, জর্ম্মাণীতেও সেইরূপ। অতএব এদেশে যদি ঐরূপ হস্তচালিত কল আনিয়া এখানকার মজুরদিগের দ্বারা গেঞ্জী মোজা বয়ন করা হয় তাহা হইলে উহা য়ুরোপের প্রস্তুত সামগ্রী অপেক্ষা সুলভে বিক্রয় করা যাইতে পারে। এক্ষণে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে,মোজা বা গেঞ্জী বয়ন করিতে যে সূতার প্রয়োজন তাহা যখন য়ুরোপ হইতে আনিতে হইবে তখন আর লাভ কিরূপে হইবে? কেন না মোজা আমদানী করিতেও যে ব্যয় সূতা আমদানী করিতেও সেই ব্যয় পড়িবে। কথা সত্য। কিন্তু এস্থলে আর একটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। এক জোড়া বিলাতী মোজার এদেশে এইরূপ পড়তা হয়ঃ—

সূতার মূল্য।
মোজা তৈয়ারীর মজুরী।
জাহাজ ভাড়া।

এখন বিলাত হইতে সূতা কিনিয়া আনিতে হইলে কেবল সূতার মূল্য ও জাহাজ ভাড়া বিলাতী মোজার সহিত সমান পড়িবে কিন্তু মজুরী অনেক কম পড়িবে সুতরাং এই মজুরীতেই আমরা বিলাতী মোজা অপেক্ষা লাভ করিতে পারি। আমরা আপাততঃ বিলাতী সূতা আমদানী করি-

য়াই এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিতে বলি, কেননা তাহা হইলে উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে। দিল্লী প্রভৃতি স্থানে আজ কাল যে গেঞ্জী মোজা হইতেছে তাহা এতদ্দেশী সূতায় বয়ন করা হয় বলিয়া তাদৃশ পরিচ্ছন্ন হয় না এজন্য অনেকে তাহা পছন্দ করেন না। তাহার পর ক্রমে এ দেশের কলে বিলাতী সূতার মত পরিষ্কার সূতা তৈয়ার হইলে তখন তদ্দ্বারা প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে।

এই গেঞ্জী মোজা তৈয়ারে অধিক মূলধনের প্রয়োজন করে না। দশ পাউণ্ড হইতে সতের পাউণ্ড মূল্যের মধ্যে মোজা প্রভৃতি বুনিবার কল ক্রয় করিতে পারা যায়। ইহাতে ৪০ রকমের সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারিবে এবং তাহাতে প্রতিদিনে ২৪ জোড়া মোজা তৈয়ার করিতে পারা যাইবে। এই ২৪ জোড়া মোজায় প্রতিদিন ৬ টাকা হইতে ৭॥ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা। কলিকাতায় এই কার্য্য করিবার আরও বিশেষ সুবিধা আছে। মজুর দ্বারা উহা না চালাইয়া অনায়াসে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা (Electric power) উহা চালান যাইতে পারে। আজ কাল অনেকে যেমন ময়দার কল, কামার দোকানের কার্য্য বিজলীতে চালাইতেছেন, গেঞ্জী মোজায় কল সেইরূপে চালাইলে আরও সুবিধা হইতে পারে। এরূপ অল্প মূলধনে এরূপ লাভজনক কার্য্যে অনেকে অনায়াসে নিযুক্ত হইতে পারেন ও তদ্দ্বারা কেরাণীগিরীর লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

লণ্ডনে Automatic Knitting Machine Company এই মোজা বুনিবার কল বিক্রয় করেন। তাঁহারা একাধিক কল লইলে অপেক্ষাকৃত সুলভে বিক্রয় করেন। তাঁহাদিগের ঠিকানা 67, Southwark Street, London, S. E. জাপানী কল সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জাপান হইতেও সুবিধা দরে কল আনান যাইতে পারে। আমরা আশা করি দুই এক জন উদ্যমশীল যুবা এই সহজসাধ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা অর্জ্জনে চেষ্টাবান হইবেন। কলিকাতায় আমড়াতলার গলিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ আঢ্য নামে জনৈক ভদ্রলোক এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু একজন বা দুই জনের দ্বারা সমস্ত দেশের প্রয়োজন পূরণ হওয়া অসম্ভব। অতএব আমরা আশা করি নগেন্দ্রবাবুর ন্যায় অন্যান্য শিক্ষিত লোক এই নূতন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন।

কেবল পুরুষ কেন, অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকগণও ঘরে বসিয়া এই সমস্ত হস্ত চালিত কলে কার্য্য করিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে গৃহস্থ মাত্রেরই অন্তঃপুরবাসিনী প্রাচীনাগণ অবসরকালে চরকা কাটিয়া দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেন, এখন চরকা কাটা উঠিয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে এই কার্য্য অনায়াসে চালান যাইতে পারে।

জাপানে এই কার্য্যের জন্য অনেক কোম্পানী আছে। তাঁহারা কল খরিদ করেন এবং সেই কল গৃহস্থদিগকে ব্যবহারের জন্য দিয়া থাকেন এবং কল ছাড়া সূতাও যোগাইয়া থাকেন। গৃহস্থ রমণীগণ ঘরে মোজা গেঞ্জী বুনিয়া সেই সমস্ত কোম্পানীকে দিয়া থাকেন। কোম্পানী তজ্জন্য তাহাদিগকে বানি দেন এবং উহা বিক্রয় করিয়া লাভ করেন। প্রত্যেক গৃহস্থের নিকটে অল্প অল্প মাল পাইলেও বহু গৃহস্থের নিকট অনেক মাল সংগ্রহ হয় এবং ব্যবসা বেশ চলে, অথচ গৃহস্থগণকেও বাজারে খরিদ বিক্রীর কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আমাদের দেশেও ঐরূপ না হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।